শরৎ রচনাবলী

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত   ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

৩১ অশ্বিনী দত্ত রোড ॥ কলিকাতা ২৯

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ ॥ দীপান্বিতা, ১৩ই কার্তিক ১৩৮৫
মূল্য ॥ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ—এক শত দশ টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী ॥ শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র

শরৎ সমিতি এই শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশনায় শ্রীমতী মণিকা চট্টোপাধ্যায় ও মেসার্স এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছে।

শরৎ সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় কর্তৃক ৩১ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা ২৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীমিহির মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের কথা

'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' প্রথম প্রকাশ করেন কলকাতার বসুমতী সাহিত্য মন্দির। এ'রা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে সাত খণ্ডে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছিলেন; উক্ত রচনাবলীতে শরৎচন্দ্রের সব রচনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৩৫ সালের পরে যে-সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সে-সকল রচনার কথা ছেড়ে দিলেও প্রথম দিককার কিছু কিছু বইও গ্রন্থকারের অনুমোদিত এই সুলভ সংগ্রহ থেকে বাদ পড়েছিল।

১৯৫১ সালে শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র দ্বিতীয়বার শরৎ রচনাবলী প্রকাশ করতে শুরু করেন। পরে এম. সি. সরকার এন্ড সন্স এর ভার নেন এবং ১৩ খণ্ডে 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে এমন কিছু কিছু রচনা আছে যা অপরের অনুলিখিত এবং সেজন্য নিঃসংশয়িতভাবে শরৎচন্দ্রের রচনা বলে স্বীকৃত হতে পারে না। আবার শরৎচন্দ্রের অনেক রচনা যা পূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি এবং এখন হস্তগত হয়েছে তা এখানে স্থান পায়নি। এই সংগ্রহ সাধারণ ক্রেতার পক্ষে দুর্মূল্যও বটে।

শরৎ সমিতি অপেক্ষাকৃত সুলভ, ব্যাপক ও প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত করতে অগ্রসর হয় এবং ১৩৮২-১৩৮৪ সালে পাঁচ খণ্ডে প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতারা অগ্রিম মূল্য দিয়ে এই সংস্করণের গ্রাহক হয়ে যাওয়ায় এবং পাঠকবর্গের মধ্যে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

প্রামাণ্য পাঠোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে দেখতে হয়েছে। এদের মধ্যে অনেক সংস্করণ আবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এ কাজে আমরা বহু প্রতিষ্ঠান ও শরৎচন্দ্রের অনুরাগী বন্ধু এবং আত্মীয়ের সাহায্য পেয়েছি। এ'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চৈতন্য লাইব্রেরি, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরি, প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার। দেবানন্দপুর শরৎ-স্মৃতি পাঠাগার, নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ-শালা প্রভৃতি থেকে আমরা নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। শরৎচন্দ্রের বাজেশিবপুরের প্রতিবেশী অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীসৌরেন্দ্র-মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের আত্মীয় শ্রীনন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়—এ'রা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। সলিসিটর শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ দেব আইন সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযোগ্য পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং স্বত্বাধিকারীদের সলিসিটর শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ মিত্রও সর্বস্তরে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এই অবসরে এ'দের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শরৎ সমিতির সদস্য ও কর্মিবৃন্দ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাও স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুশীল সোম ও শ্রীদেবব্রত দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর কাগজের দাম ও মুদ্রণব্যয় খুব বেড়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও সাধারণ ক্রেতাদের সুবিধার জন্য আমরা এ সংস্করণের দাম মাত্র দশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

শরৎ সমিতি
৩১ অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা ২৯
দীপান্বিতা
১৩ই কার্তিক ১৩৮৫

সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদকীয়

মুনিদেরও মতিভ্রম হয়, মুদ্রাকরদের তো কথাই নেই। যে-সকল গ্রন্থের বহু সংস্করণ হয় তাদের মধ্যে মুদ্রাকরের মৌলিকতা এখানে ওখানে প্রবেশ করে। সাহিত্যস্রষ্টারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলিত হয়েছেন কিন্তু এঁদেরও ভুলভ্রান্তি হয় এবং তাঁরাও সব সময় সতর্ক থাকেন না। হয়ত সেইজন্যই ব্রহ্মা নিজের কাজের সংশোধনের জন্য নানা জন্মের ব্যবস্থা করেছেন এবং গ্রন্থকাররাও বিভিন্ন সংস্করণে অদল-বদল করে থাকেন। পিতামহ ব্রহ্মাকে ছেড়ে দিয়ে পার্থিব জগতের ব্রহ্মাদের সৃষ্টি বিচার করতে বসলে বিভ্রান্ত হতে হয়। তবু সম্পাদকবর্গকে এই দুরূহ কাজে হাত দিতে হবেই— স্রষ্টার যথার্থ সৃষ্টিকে পাঠকের কাছে তুলে দিতে না পারলে তাঁদের কর্তব্য করা হবে না। আবার এ কর্তব্য কখনও সমাপ্তও হয় না। প্রতি সংস্করণেই নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আমরা প্রথম সংস্করণে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম, এবারেও তাহাই অনুসৃত হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে যে পাঠ সুষ্ঠু বলে মনে হয়েছে তাহাই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ পড়ে অনেক উৎসাহী পাঠক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেইজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। নিজেদের ভুলভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছি, তবে গ্রন্থকারকে সংশোধন করতে প্রলুব্ধ হইনি।

কলিকাতা
দীপান্বিতা
১৩ই কার্তিক ১৩৮৫

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

শ্রীকান্ত

প্রথম পর্ব

এক

আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র-সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাড়ি পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না! বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী-লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনি অসংগত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে —সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না! সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যুষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ্'। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট্ শব্দ এবং মারো

শালাকে, ধরো শালাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ্ করিয়া ভাঙিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে—পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্‌গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল সেই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই! শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দুটি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিনকালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

ছুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, তুমি? সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাধা কোথাকার!

গাধাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—না।

ছেলেবেলা মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছি ইতিপূর্বে এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙে নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি? ঐ, ওই দিক থেকে ওরা আসচে—আচ্ছা, তবে খুব ক'ষে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য, সে এতটুকুও হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয়; এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করিল তোর নাম কি রে?

শ্রী—কা—ন্ত—

শ্রীকান্ত? আচ্ছা। বলিয়া সে তাহার জামার পকেট হইতে একমুঠা শুকনা পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেচি—চিবো।

কি এ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাস্‌নে? কোথাকার গাধা রে! বেশ নেশা হবে—চিবো। চিবিয়ে গিলে ফ্যাল্।

নেশা জিনিসটার মাধুর্য তখন ত আর জানি নাই! তাই ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হ'লে সিগ্রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগ্রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগ্রেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ রে, সে কি টান! এক টানে সিগ্রেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক--আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে?

ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না- ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

তারপরে মাসখানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বাঁশিতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না। বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশি বাজায় কে--রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসচে নাকি?

বড়দা বলিলেন, হুঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা নেই---আচ্ছা, ও-জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন! ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা? ওর শিগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার। তা, সে পথে নদী-নালাই থাক আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।

ধন্যি ছেলে! বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশির সুর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখানি জোর এবং এম্‌নি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অম্‌নি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উঁচে। তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম, হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিঙ ডিঙ্গাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাশের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এম্‌নি এক সময়ে সে তাহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ,

পণ্ডিতজী বাড়ি গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই, এবং হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, ইস্কুল হইতে রেলিঙ ডিঙ্গাইয়া বাড়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার শখও তাহার আদৌ ছিল না। এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশজন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না। ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, দশ-পনর দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এমনি একদিন উদ্দেশ্য-বিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার ত এ সাজে নাই বাপু! গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়িতে আসিয়াছিলে—তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ কথা আমাকে লক্ষবার বলিয়াছে; নিজেকে নিজে আমি এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত মন-প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য-প্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে-সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাশের পড়া'র বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে 'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাক-ঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল।

মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ত তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাশের মধ্যে যে-সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ; সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকারে এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওযাটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁ-আঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল!—আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখেমুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন? ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদা'র 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা-কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও'ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এম্নি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদা-গাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী। ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও!

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতিবৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি।

যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই। পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়িতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে— মাছ ধ'রে আনতে। যাবি?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাড়া অন্ধকার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে—একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না—আমি সত্যিই এই রাত্রে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহ্বানে এই স্তব্ধ-নিবিড় নিশীথে এই বাড়ির সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া, একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না। অনতিকাল পরে গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ংকর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচিভেদ্য আঁধার-তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জলধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'রে পা টিপে টিপে নেবে যা, সাবধানে নাবিস্, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে, কিন্তু তুমি?

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাব্‌ব। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না। ভয়ে বুকের ভিতরটা এমনি ঢিপঢিপ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না! মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্তগর্জন ছাড়া কোনও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণে ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট্ কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল, কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে?

আমি বলিলাম, নাঃ—

ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই— সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা, এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এই ভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল— অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙ্গাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এম্‌নি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না, বাড়েও না, থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক-একবার ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়? সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ তাইত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে পড়লে ডিঙিসুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টানতে পারিস?

পারি।

তবে টান্।

আমি টানিতে শুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া। ওর মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক'রে? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন? চল্ তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ! তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয়

পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই -ব্যাটারা ভারী পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ্ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেল্‌লে ব'লে—আর পালাবার জো নেই, তখন ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই, তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁত্‌রে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস্! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোষনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর।

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূরে? ছ-সাত কোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিত হ'য়ে থাক্‌লেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে আর এ দিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনর হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিবাই আমার বীরহৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম। তার পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্‌মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া ওপার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলো মোহানার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান গেল।

ধীবর প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না তখন এধার হইতে ওধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙ্গাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাৎলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রুই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল্। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতিপরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি? কি হ'ল?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালারা টের পেয়েছে--চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসচে--ঐ দ্যাখ!

তাই ত বটে! প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা। পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর একহাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট্ শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে বসে বুনো শুয়ার তাড়াচ্চে।

বুনো শুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্চি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট-পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না- সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না--সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো, করেত্--জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে- কোথাও ডাঙ্গা নেই দেখচিস নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক-নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল--ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সংকুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্নতন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত! এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে! ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল--মরতে একদিন ত হবেই- এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে --ভগবান! টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক্ সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর-কলকল্লোল নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম, অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্ধিত হইতেছে, এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল! কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডান দিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

তিন

বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই!

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে কথা কহিল। বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই! কি করব শ্রীকান্ত, আজ একটু দেরি হবেই—অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর্ না কেন? ঐখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি গুটিশুটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। ঐ ডোবে, ঐ ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে। আর কানে আসিতে লাগিল—জলস্রোতের সেই একটানা হুঙ্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া? সে ত আমার তন্ময় হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়! কিন্তু ঐ যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বলে যে, ওই বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! আসল যা কিছু, তা এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে যা দেখায়, বিভোর হইয়া সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিতর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া আমার নির্জীব মনটা তখন বোধ করি এম্‌নি-কিছু-একটা শান্ত ছবির অন্তরেই বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুবসাঁতার দিয়া একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটু তুলিয়া দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে আর ছিল না; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দুচক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্রোতের তর্জন। বোধ করি আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস শ্রীকান্ত; আমি এখ্‌খুনি ফিরে আসব—তোর কিচ্ছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। এমনিই ত সর্বকালের মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি, শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ,—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল,—আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া, কাঁদিয়া, গান গাহিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল, এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল—সেই যে সর্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন—বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র, মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ—তাহার কে কবে

অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স! যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ভ ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে! প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে! তখন সংগীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহু-দূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়ে যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বল্‌বি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাস্‌নে যেন, ঠিক আমি হলেও না,—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্‌ব—খবরদার কিন্তু- বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনই ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা দিয়া বরফ-গলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই! আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি, এই নিশা অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যেমনি আড়চোখে চাই, অমনি সেও যেন মাথা নীচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে এইদিকেই আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর অপর দুইজন হিন্দুস্থানী! কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ, এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—ঐ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে! পাক আর নাই পাক, ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, এ কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। যাক! যাহারা আসিল তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লাগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি-এক-প্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাঁহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম!

হাঁ, তা মানুষের স্বভাবই ত এই! একটুখানি দোষ পাইলে পূর্ব-মুহূর্তের সমস্তই নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ! ছিঃ! এম্‌নি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ

করিল! এতক্ষণ এই মাছচুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেননা ছেলেবেলায় টাকাকড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি; আর সব --অন্যায় বটে—কিন্তু কেমন করিয়া যেন সে সব ঠিক চুরি নয়--এম্নিই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে। আমারও তাই ছিল। না হইলে, এই 'টুং' শব্দটি কানে যাইবামাত্র এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই একমুহূর্তে এমন শুষ্ক তৃণের মত ঝরিয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকাকড়ির সহিত ইহার সংস্রব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ক্রোধে বোধ করি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য পাইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ ছিঃ! এ কি! এ কাজ ত জেলখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস্নি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না।

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ ব'সে থাকতে পারত না, তা জানিস? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আস্ব, তোকে শুধু ডেকে আন্ব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখের উপর সদ্য মেঘমুক্ত যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের সব রাগ অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনো ঐ সব দেখেচো?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি--লোকে বলে, তাই শুনেচি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি রামনাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চ'লে যাস্, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হ'লেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করছে—তারা সব অন্তর্যামী কিনা!

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্রোত যেন উল্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাব। যাব আর আসব। কেমন?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, 'না' বলিবার পথ ত একপ্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে, এই মাত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না এবং তখন হইতেই গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মৎস্যপ্রার্থীর শুভাগমন না হইতে পারে; কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মট্কাইয়া ঈষদুষ্ণ রক্তপান এবং মাংস-চর্বণের ইতিহাসও ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তর্তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড়বন মাথা তুলিয়া এই দুটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদেরই আত্মীয়-

পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি তাঁহার কাছে বোধ করি 'রামনামে'র জোরে ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতিবশতঃ এ জায়গাটা একটি ছোটখাটো হ্রদের মত হইয়াছিল -শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি করে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ, ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেছে, ইন্দ্র!

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই ত পোড়াতে পারে না--মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্‌খানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত -সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চ'লে যায়,—আরে দূর! ভয় কি রে! ও শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করচে। আচ্ছা আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না--কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা একা আমি এই পথে যাই-আসি--তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম--অস্ফুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না--সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে! এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়--তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিন দিন আস্‌তে পারিনি।

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিস নে। আমার সঙ্গে তুইও চল্‌—কিন্তু কারুকে এ কথা বলিস নে যেন।

আমি অস্ফুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেম্‌নি স্পর্শ করিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়াচড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপর যে গাছপালা নাই, স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এইজন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস্‌' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না! গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ—শুধু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়নশব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক্‌-নিস্তব্ধ হইয়া এই [illegible] দৃশ্যটির পানে চাহিয়া

রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নধর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউ-বনের মধ্যে জলে রেখে আসি!

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের বেশি কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে! একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বাঁধাবাঁধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা! তাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত- কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কি না, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া - তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে! আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েচে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা- -এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ণ সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এমনি খাঁটি কথা সে বলিতে পারিত। তাই আমি অনেক সময়ে ভাবিয়াছি, ওই বয়সে কাহারো কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায়? এখন কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত! তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা, বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি: কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই

বা কি আসে যায়। তোমরা যাহা ইচ্ছা বুঝ না, তাহারা যা তাই ত থাকে। সোনা মনে করিয়া তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার সত্যকার মূল্যবৃদ্ধি হয় না, আর পিতল বলিয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেও তাহার দাম কমে না। সেদিনও সে পিতল, আজও সে পিতলই। তোমার মিথ্যার জন্য তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ীও হয় না, ভ্রূক্ষেপও করে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটাই পরিপূর্ণ সত্য। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও না। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, কোন দিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত বিচিত্র নয়।

কিন্তু তাহার পক্ষে বিচিত্র না হইলেও কাহারও পক্ষেই যে বিচিত্র নয়, এমন কথা বলিতেছি না। ঠিক এই উপলক্ষে আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্নকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন—কোনমতেই তাঁহার সৎকারের লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে, তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই শহরেই রেলগাড়ি হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই দুইরাত্রি বাস করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 'বিলাত-ফেরত' এবং সে সময়ে 'একঘরে'। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই 'একঘরে'র বাটীতে মরিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সৎকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল প্রত্যেকেরই বাটীর কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল গতরাত্রি এগারোটা পর্যন্ত হারিকেন-লণ্ঠন হাতে সমাজপতিরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলাঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, 'ঘাট' মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়িতেই বলিয়া দিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই; কারণ জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙ্গালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাঁহারা এইরূপ নির্যাতন করিতেছেন তাঁহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনা চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে এই কথা তাঁহাদের গোচর করিল, জানি না। দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু 'ঘাট' মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায় পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, 'ঘাট' মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনিই মার্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ; অর্থাৎ কাহারও বাটীতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই; কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হউক, আমি নিশ্চয় জানি—যাঁহারা জানেন তাঁহারা এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটিই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই; এবং ডাক্তারবাবু সেদিন অমন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না

করিয়া দিলে, কোনদিন এ ব্যাধি তাঁহাদের আরোগ্য হইত কি না তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধমগ্ন বনঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক—আজ আর না।

আমি খুশি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে; তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্, আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া।

আমি কম্পিতকণ্ঠে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই ব'সে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে বোস।

চার

পা আর চলে না—এমনি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এমনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

যতীনদা প্রায় আমার সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মত্ত চীৎকার শব্দে—এসেচে শ্রীকান্ত—এই এল, মেজদা! বলিয়া বাড়ি ফাটাইয়া আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানার পাপোশের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গভীর মনোযোগের সহিত 'পাশের পড়া' পড়িতেছিলেন। মুখ তুলিয়া একটিবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহারও সেই ভাব। শাস্তি দিবার এত বড় মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ। সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও উভয় গণ্ডের

উপর যে-সকল ঘটনা ঘটিবে তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আর যে দাঁড়াইতে পারি না! অথচ কর্মকর্তারও ফুরসৎ নাই। তাঁহারও যে আবার 'পাশের পড়া'!

আমাদের এই মেজদাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। সেই, যাঁহার কঠোর তত্ত্বাবধানে কাল সন্ধ্যাকালে আমরা পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম, এবং ক্ষণেক পরেই যাঁহার সুগম্ভীর 'ওঁ-ওঁ' রবে ও সেজ উল্টানোর চোটে গত রাত্রির সেই 'দি রয়েল বেঙ্গল'কেও দিশাহারা হইয়া একেবারে ডালিমতলায় ছুটিয়া পালাইতে হইয়াছিল—সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে আছে না কি; বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমুতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই। না খাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল্ ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙ্গা—ছল্ছল্ করছে, বলি জ্বরটর হয়নি ত? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই। এই যে বেশ গা গরম হয়েচে। এমন-সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে তবে আমার রাগ যায়। তোমাকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদেয় ক'রে তবে আমার আর কাজ। চল্ ঘরে গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া। বলিয়া তিনি বার্তাকু-ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগম্ভীরকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়। মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্‌নে বলচি শ্রীকান্ত।

পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন, সতে! পিসিমা অত্যন্ত রাশভারী লোক। বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; কখনও, কোন কারণেই, তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ্ সতীশ, যখন-তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জান্‌তে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব! বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্চে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে! কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারুকে তুই জিজ্ঞেসা পর্যন্ত কর্‌তে পাবিনে—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারো নাই—সে কথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট-পাঁচেক পরেই খুট্ করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি দম লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই। তুই, আমি, যতে একঘরে পড়ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন! ওকে

আমরা আর কেয়ার কর্‌ব না। বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোটদাকে এই শুভ-সংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি! আমি! আমার জন্যেই হ'ল তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়! মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছোটদের যে-সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয়-বস্তুটিকেও অসঙ্কোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না; রবিবারে দুপুর রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাস খেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত। শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাঁহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এমনি সমস্ত অত্যাচার! অথচ 'না' বলিবার জো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্যন্ত নাই। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন যাও, একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙ্গে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে, ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হউক, আপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যক, কারণ স্কুলের সময় হইতেছে। আমার জ্বর—সুতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত-আট দিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়েছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। কিন্তু সেটা যে অনেক দিন পরে, একথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার তখন জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল কে একজন অদূরে একটা শর-ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ মাছ ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটুখানি ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল, আমার ডানদিকে বোস্। ভাল আছিস ত রে শ্রীকান্ত? বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে যে যেখানে আছে এক মুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল! চক্ষের পলকে সর্বাঙ্গের রক্ত চঞ্চল, উদ্দাম হইয়া বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিসটা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন, তা নয়, বোধ করি বা অসাধ্য। কারণ বলিতে গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্য-রাশি—যেমন বুকের রক্ত তোলপাড় করা—উদ্দাম চঞ্চল হইয়া আছাড় খাওয়া—তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই-সব ছাড়া ত আর পথ নাই! কিন্তু কতটুকু ইহাতে বুঝাইল? যে জানে না,

তাহার কাছে আমার মনের কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল! আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব, এবং সেই বা কি করিয়া তাহা জানিবে? যে নিজের জীবনে একটি দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি, সে এমনি অকস্মাৎ এতই অভাবনীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পাশে গিয়াও বসিলাম। কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি--না রে শ্রীকান্ত! আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়। আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, খাস্‌নি! দেখ্ রে শ্রীকান্ত, তুই চলে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলুম—যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন দিয়ে ডাক্‌লে কখনো কেউ মারতে পারে না। মা এসে তাদের এম্‌নি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে পারে না। বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শিতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি? ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন। যে যা ব'লে দেয় তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস নে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি? ইন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার? আমার কখ্‌খনো অসুখ করে না। কখনো কিছু হয় না। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ্ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেব। যদি তুই দুবেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুরদেবতার নাম করিস্—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি। তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না—তুই আপনি টের পাবি। আমার মতন যেখানে খুশি যা, যা খুশি কর্, কোন ভাবনা নেই বুঝলি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হুঁ। বঁড়শিতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?

কোথায়?

ওপারে মাছ ধরতে?

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে। তাহার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর এক দিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে— কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

উহার সম্বন্ধে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিঁধিয়াছে। কোন মতেই সেই সেদিনের মাছ-বিক্রিটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি বা চুপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিব্যি দিলে ভাই? তোমার মা?

না, মা নয়। বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সুতাটা ধীরে ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়িতে বলে দিস্‌নি?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলাম তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে, কিন্তু, তাহাও করিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে সর্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এখন তাহাও নাই, এবং কি-একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না, বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখানি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনারাও এ কথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর এক-জনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত

কঠিন অন্তর্দৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তার অকারণে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই?

তোর—তোর কাছে টাকা আছে?

ক' টাকা?

ক' টাকা? এই—ধর্‌, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে? বলিয়া আমি ভারি খুশি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলাম। এ কয়টি টাকাই আমার ছিল। ইন্দ্রর কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কৈ খুশি হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি এক-রকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে? চক্ষের নিমেষে আমার সে রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে? ইন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটিবার যেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে, এ টাকাও নেবে না; মনে করবে, আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি ক'রে এনেচি! যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না, দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত? আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়েদেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্‌, আমি নিয়ে যাব; আবার তখ্‌খুনি ফিরিয়ে আন্‌ব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটি ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার 'না' বলিবার সাধ্য রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্বাগ্রে ইহাই মনে পড়িল আজ যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই আমার ভাল হইবে না। কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজদার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শাস্তি কামনা করিতে পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া! নাই বা কথা রাখিলাম; এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়! যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শরঝাড়ের নীচে সেই ছোট্ট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে নৌকাটিতে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই। সেই দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে জিনিসটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারা জীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম? জীবনে এমন-সব শুভমুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত

পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথেঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রর দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ-সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ, যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পাবে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পুণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কি না। থাকিলেও কোথায় কিভাবে আছেন, তাঁহার নির্দেশমত কখনো কোন সংবাদ লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করিয়াছি, তাহা যিনি সব জানিতে পারেন, তিনিই জানেন।

শ্মশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষমূলে ডিঙি বাঁধিয়া যখন দুজনে রওনা হইলাম, তখনও অনেক বেলা ছিল। কিছু দূরে গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পর্ণকুটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগি এবং ছানাগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা-দুই ছাগল ম্যাঁ-ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমেষে অস্ফুট চীৎকারে মুরগিগুলাকে আরও ত্রস্ত ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া কাছে গিয়া তাহার পেট্‌টা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলাগোছের লোক প্রবল কাসির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড় মালা। গায়ের জামা এবং পরনের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং একপ্রকার হল্‌দে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহ্‌জী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া, আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল এবং প্রস্তুত হইলে শাহ্‌জী সেই কাসির উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো।

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না। শাহ্‌জী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু উত্তরের জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপুড় করিয়া রাখিল। তার পরে দুজনের মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহ্‌জী হিন্দিতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙ্গলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উন্মত্ত চীৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ

উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তারপরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, বেলা যায়; তুমি সেখানে যাবে না?

কোথায় শ্রীকান্ত?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না?

দিদির জন্যই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ি।

এই তোমার দিদির বাড়ি! এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান! ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বলব। সাপ খেলাব দেখাব শ্রীকান্ত?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তুমি সাপ খেলাবে কি? কামড়ায় যদি? ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল; এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আল্‌গা করিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখ্‌রো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না, শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখ্‌রো সাপই খেলাইবে, এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল; এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রর হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্ রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে? ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায়? ইন্দ্রর লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে? আমি বলিলাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে। ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিক-ওদিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক্ ব্যাটাকে! বুনো-সাপ ধরে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে দিদি! এসো না, এসো না; ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটিবাঁধা কতকগুলো শুক্‌নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-সবজি। পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামাকাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপান, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দুগাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি? ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেছে। তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেছে, এ ত বড় আশ্চর্য! কি বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—কিন্তু কি ক'রে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্র বলিল, ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো-সাপ।

উনি ঘুমোচ্চেন বুঝি? ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্চে। চেঁচিয়ে মরে গেলেও উঠ্‌বে না। তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না? আচ্ছা এসো, আমি ধ'রে দিচ্চি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহ্‌জীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্তের জন্য চোখ

দুটি তাঁহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল. কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন. ওরে পগলা. অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখ্‌খুনি ধ'রে দিচ্চি দ্যাখ। বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র টিপ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিযা পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল. দিদি. তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে। তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন. এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখদুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রর দিদি হঠাৎ বার-দুই এম্‌নি শিহরিয়া উঠিলেন যে. ইন্দ্রর সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত. সে আশ্চর্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না. কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন. ছি দাদা. এমন কাজ আর কখ্‌খনো করো না। এ-সব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা কর্‌তে আছে ভাই? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল. না হ'লে আজ কি কান্ড হ'ত বলত?

আমি কি তেম্‌নি বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্‌ করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সুতা-বাঁধা কি একটা শুক্‌না শিকড় দেখাইয়া বলিল. এই দ্যাখো দিদি. আট-ঘাট বেঁধে রেখেচি কিনা! এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুব্‌লে ছেড়ে দিত? শাহ্‌জীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে? এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না; আর তাই যদি বা কামড়াত—তাতেই বা কি! শাহ্‌জীকে টেনে তুলে তক্ষুনি বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি. ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধঘণ্টা? একঘণ্টা? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল. বলিল. আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো-তিনটে রয়েচে—আর আমি কতদিন ধ'রে চাইচি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল. আমাকে তোমরা যা বল আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে তবে ব'লে দাও না কেন? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না. কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে. তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আনিয়া কহিলেন. হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়িতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস্‌ রে?

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল. তবে না ত কি! নিদ্রিত শাহ্‌জীকে একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল. কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্চে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোশামোদ করচি নে দিদি. তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্তর আদায় ক'রে নেবো। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া. সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া. শাহ্‌জীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত কহিল. শাহ্‌জী গাঁজা-টাঁজা খান বটে. শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসীমড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এত বড় ওস্তাদ উনি! হাঁ দিদি, তুমিও মড়া বাঁচ'তে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্যন্ত কম লোককেই

দেখিয়াছি। কিন্তু সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক দিয়াই গেল না। বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি করে তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাকব। তুমি কটা মড়া বাঁচিয়েচ দিদি?

দিদি কহিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্তর শাহ্‌জী দেয়নি? দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, ইন্দ্র মিনিটখানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শীগ্‌গির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কাকে কড়ি-চালা বলে, তাইত জানিনে ভাই।

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্‌! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর প'ড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কাম্‌ড়ে ধ'রে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়। এম্‌নি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধুলো-পড়া এ-সব জান ত? আর যদি নাই জান্‌বে ত অমন সাপটাকে ধ'রে দিলে কি করে? বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে দিদির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ-সব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস ভাই, তা হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙে ব'লে আমার বুকখানা হালকা ক'রে ফেলি। বল্‌ তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব—যা বলবে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বৈ কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে। যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমি ত কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই! বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপসা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অস্ফুট কিরণ-রেখা গাছের ঘনবিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব! কিন্তু ভেবে দেখ্‌ছি, এখনও সে সময় আসেনি। আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহ্‌জীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না। আমরা তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

কি জানি কেন আমি এই অত্যল্প কালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে?

দিদি বললেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দুজনে জোচ্চুরি ক'রে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া

লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ্ জোচ্চোর সব—আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। সভয়ে সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে—ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

ব্যবসা বার ক'রে দিচ্চি—চল্‌রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা। বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না, কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল, কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি—এই নাও।

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জোচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম করে এনেচি—

ওঃ—ভারী দিদি! বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহ্‌জীর নেশার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া? বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা। রাস্তায় তোমাকে দেখ্‌তে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া হুয়া! বদমাস ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—আর বলে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল ক'রে বাঁচাব তোমাকে! বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শাহ্‌জী চমকাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড! সেই যে সাধুভাষায় বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাঙলা করিয়া ডাকিল, শোন ইন্দ্রনাথ, কি হয়েচে বল ত? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙলা বলিতে শুনিলাম।

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এত দিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐ স্তব্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে, তোমার কানাকড়ির বিদ্যে নাই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর।

শাহ্‌জীর চোখ-দুটা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস্ তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্ছে—চল্ না। রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পা যে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর আবার কানে আসিল—কেন বললি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র

আর্তস্বর পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল; আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে; সে কাঁটা ছাড়াই ত অর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়। এমনি করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে যখন কোন মতে শাহ্‌জীর বাড়ির প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরু-শিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহ্‌জী লোকটি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশি শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয় সে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রা শাহ্‌জীর সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজরে পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড়-জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরেচে—এই দ্যাখ। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে দে—এই খবরদার! ঠিক্ অম্‌নি ব'সে থাকো। উঠ্‌লেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার কর্‌ব—হারামজাদা শুয়ার। নে, তুই টেনে বাঁধ—দেরি করিস নে। বলিয়া সে চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহ্‌জী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন কর্‌তে পার। আমি তোমার হাত বাঁধব। বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নেমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা। বাবার কত টাকা যে চুরি ক'রে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বস্‌ল। শ্রীকান্ত নজর রাখ্, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিই।

জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, 'ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি কর্‌ব না,' সেই দিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবুও কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ'লে দিদিকে ও খুন ক'রে ফেলবে, ও খুন করতে পারে।

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষমাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এম্‌নি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজিও তাহার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্তত করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার

মূল্য। কারণ সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই-সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ত নিজের কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি-হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর! তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর্ ভাই, আর কখনো এ বাড়িতে আসিস্ নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্ নে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু নয়। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমরা দু'জন!—আয় শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না তাহা পরে যত বেশিই বুঝিয়া থাকি না কেন তখন বুঝি নাই। তথাপি আমি অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সেই টাকা-পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্দ্র প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্মকর্ম! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দু'জনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

শ্মশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনও চলিয়াছি, কিন্তু কেন জানি না, আজ আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমনি বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্রে কেমন করিয়া বাড়ি ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষরাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ি যা শ্রীকান্ত! তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও আর আমার সামনে আসিস্ নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছয়

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ির যে কঠিন শাসনপাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া অকর্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথেঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত, তাহার

কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত। ছেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা, জিম্‌ন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার। তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে কেনই বা দুদিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প শুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে, কিংবা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনিই দাঁড়ায়। বোধ করি ভাগ্যবশে পরবর্তী জীবনে অনেক 'বড়' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে দেখিতে 'বন্ধু' প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্বপাশ দাসত্বের বেড়ি হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন-চারমাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। 'মেঘনাদবধ' হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করিতে পারিয়া একবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারী আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন! কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্প-কালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ্‌সিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এম্‌নি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উলটাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের

ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুট্ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর একটা আঙ্গুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র। চুপিচুপি কহিল, আয় শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকচেন। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়। বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পেঁীছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দুজনে শাহ্জীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি আর বেশি নাই।

একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহ্জীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্রো সাপ লম্বা হইয়া আছে।

দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বকশিশ পায় তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরিয়া দিদির পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহ্জীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশি নেই। বললেন, আয় দুজনে একসঙ্গেই যাই, ব'লে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধ'রে দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে ঐ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তার পরে দুজনেরই খেলা সাঙ্গ হ'ল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্জীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই, তাই এই ভিক্ষে করি, এঁর একটু তোমরা উপায় ক'রে দিয়ে যাও। আঙ্গুল দিয়া কুটীরের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ, আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে থাকতে পাই! সকাল হ'লে সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ ক'রে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহ্জীকে কি কবর দিতে হবে?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হাঁ, মুসলমান বৈ কি।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম এ জবাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিল। তাই বোধ করি, মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার

কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দুকন্যা নহেন।

বাকী রাতটুকু কাটিয়া গেলে, ইন্দ্র সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহ্‌জীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরের কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্যলতার আচ্ছাদন। প্রিয়বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশে-পাশে বনের পাখিরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল, আজ সে নাই। কাল প্রভাতে কে ভাবিয়াছিল, আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে জানিত, একজনের শেষ-মুহূর্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দুদিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চোখ তুলিল, তার পরে উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত নারীর ভূ-লুণ্ঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তার পরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মাটি দিয়া সিঁথির সিন্দুর তুলিয়া ফেলিযা সদ্য-বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহ্‌জী তাহার স্বামী ছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি।

দিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক্‌ হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বৈ ত নয়। নইলে আমি নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেচি দিদি—সেই জন্যেই আমার যখন-তখন এই কথাই মনে হয়েচে,—আমাকে মাপ কোরো দিদি, তুমি কি ক'রে এর মধ্যে আছ,—তোমার কেমন ক'রে এমন দুর্মতি হয়েছিল! কিন্তু এখন আমি আর কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে। এখখনি চল।

দিদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ।

কেন পার না দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দ্র হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে আমিও জানি! তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা; কিন্তু তোমার তাতে কি? কার সাধ্যি তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার।

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক

ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ। সে পাওনাদারকে তুমি কি ক'রে বাধা দেবে ভাই! তা হয় না, আজ তোমরা বাড়ি যাও—আমার অল্প-স্বল্প যা কিছু আছে বিক্রি ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি। কাল-পরশু একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়িতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব? কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই! তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলেন। বলিতে বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরচে না। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হচ্ছে তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না। সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেমনি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দুজনেই মনে মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইশারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল, দিদি নেই—কোথায় চ'লে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল, কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজ করা হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর-একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গে বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। কিন্তু আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিয়ো না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি। কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিয়ো। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে

বলিয়া যাইতে পারিতাম! অথচ কেন যে বলি নাই—বলি-বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিযাই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না। অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোন মতেই বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়িতেই ছিলেন—ইঁহাকেই হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুষ্কর্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক্ বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়? এ লজ্জা কি মর্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক সে কথা! তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জনাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে খিড়কির দ্বার খুলিয়া আমার স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম তিনি কোন মতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা ছাড়া আমি আমার মুসলমানী।

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দুটি সোনার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি। তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই। আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিয়ো না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার দিদি, যেখানেই থাকুক, ভালই থাকিবে; কেননা দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি
অন্নদা

সাত

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা-কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু মাকড়ি-দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রি করিয়া শাহ্‌জীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ, মুখে মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে-পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালক-দুটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা-পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্বে কতদিন কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রের কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাইবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব! সেই জ্বলন্ত শিখায় যাহা আমি দিব, তাহাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র! ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক সে কথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানি চিরদিন তেমনিই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ তাহা জানি। তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে,—সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাঁহার এই-সব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যেখানে যত দূরেই হউক, এ দেশের বাহিরে হইলেও হয়ত এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই-সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি

স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তার পরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিনমাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, —তে থিয়েটার হবে, যাবি? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিযাছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক!

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রর মাস্‌তুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল.এ পাস করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালো-পানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী। তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুট্‌চে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্চি নতুনদা। আমার শীত করচে না—এই নাও, বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়। আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল। ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারি মুশকিল হ'ল, হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক। কলিকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এই রেত ঠেলে

উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া, নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন ক'রে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমায় থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ ক'রে ধরেচে। ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম। চল্, যেমন ক'রে পারিস নিয়ে চল্। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইঁহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁতমুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত ব'সে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, না খুলে—

হ্যাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি ক'রে ফেলি আর কি! নে—যা করছিস্ কর।

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম! পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভার-কোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দুটা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টামোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা। সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাসনে? ইন্দ্র বল না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম, তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সংকীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এতরাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনদা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকে ভয় করিনে তা জানিস্! কিন্তু তা ব'লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় - আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না। ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা—

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকীসুরে সঙ্গীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হুঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি.এ. পাস করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক্, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙ্গালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনতে পাই কি করিয়া? তখন তাহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন, আর কোন কালে নয়। অথচ ঘণ্টাকয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক্ সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদীর দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া, এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে - ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুনদা, ও নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারে'র জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র একপাটি। ইন্দ্র সেই

ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল--শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না! তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন এই দিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আর্তচীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয় মাত্র রহিল না যে নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব। আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তুমি পাগল হয়েচ ভাই! ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক শ্রীকান্ত, আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস--আমি চললুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখদুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না, সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব। যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা'হোক-একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তুই ক্ষেপেচিস্ শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ, পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদ-বিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস নে—জলে গিয়ে পড়বি।

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই! সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি!

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি--ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠ-মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু

প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙ্গায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প ?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্বোধের মত সে-সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলোবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ-সব কখনো চোখে দেখি নাই—এই-সমস্ত অবিশ্রান্ত বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতে-ছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই-সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মূর্ছিত হইতেছিলেন সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে –পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃপুনঃ শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্র খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্রকবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনু-গ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

আট

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়ই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই-সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে ? যেমন করিয়া বলি তেমন করিয়া ত তাহারা একটির পর একটি শৃংখলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে ? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না! কে তবে নূতন করিয়া এ-সব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয় তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না! ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ একসময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব বলিবার সময়েও ঠিক তাহা ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ত আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাই জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয় যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গোপনে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি! সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ জিনিসটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্যন্ত, চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ গোড়াতেই যদি বলি যে একটা প্রেমের ইতিহাস—মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার ভাষাটা হয়ত তাহাকেও ডিঙ্গাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বলা আবশ্যক।

সে বহুকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপসা হইয়া গেছে। যাঁর মুখখানি

মনে করিলেই, কি জানি কেন প্রথম যৌবনের উচ্ছৃংখলতা আপনি মাথা হে'ট করিয়া দাঁড়াইত. সে দিদিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁহার শিকার-পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এ'র সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি. গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এন্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম. তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন. ভাবি নাই। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। তবে কিনা. আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতিটা একটু বাড়াইযাই করে, না হইলে সত্য সত্যই যে অতখানি বিদ্যা অমন বেশি পরিমাণে ওই বয়সটাতেও অর্জন করিতে পারিয়াছিলাম. সে অহঙ্কার করা আমার শোভা পায় না, অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল। কিন্তু যাক সে কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেন. রাজা-রাজড়ার সাদর আহ্বান কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিন্দুর ছেলে. শাস্ত্র অমান্য করিতেও ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ-বারো ক্রোশ পথ গজপৃষ্ঠে গিয়া দেখি. হাঁ. রাজপুত্রের সাবালকেব লক্ষণ বটে! গোটা-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা ভৃত্যদের, একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা ভাগ করিয়া জন-দুই বাইজী ও তাঁহাদের সাঙ্গো-পাঙ্গদেব আড্ডা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাসকামরায় অনেকক্ষণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন কি আদরের আতিশয্যে দাঁড়াইবাব আযোজন করিয়া. তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা বিহ্বল কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু সেটা. তাঁহাদেব যে অবস্থা. তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে বাজকুমার যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পর সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাগন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম. কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম. এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যা-হোক একটু ঝাপসা দেখি. আর সবাই ছুঁচোর মত কানা।

বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি। কিন্তু এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো বাস্তবিকই এতক্ষণ তাহার একটা সুকঠিন কাজ হইতে-ছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে যেন শুধুমাত্র আমার জন্যই, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়ারী। সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—বেশ!

পিয়ারী মুখ নীচু করিয়া হাসিল। তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস রাত্রির মত শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ তন্দ্রাভিভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য। নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন তাহার দলবল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয্যে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে, তোমার গান দু-সপ্তাহ ধ'রে প্রত্যহ শুনতে পাব।

বাইজী প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে পরিষ্কার বাঙলা করিয়া কহিল, টাকা নিয়েছি, আমাকে ত গাইতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনর-ষোল দিন ধ'রে এঁর মোসাহেবি করবেন? যান, কালকেই বাড়ি চ'লে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি, কাঠ হইয়া গেলাম এবং কি জবাব দিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল। সকালে সোরগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনরটা, তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধশুক্‌নো নদীর উভয় তীর। এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমুলগাছ, ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে হইবে। শিমুল গাছে-গাছে ঘুঘু গোটাকয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায় দুটো চকাচকি ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে করিতেই সবাই দু-এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়া ছিল, তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে শ্রীকান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ওকি, বন্দুক রেখে দিলে যে!

আমি পাখি মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছর্‌রা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমারসাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা অবশ্য আলাদা।

সুরযুর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ্ সরম হ্যায়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না; সুতরাং জবাব দিলাম, সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়! যাক্, আমি তাঁবুতে ফিরিলাম—কুমারসাহেব, আমার শরীরটা ভাল নেই, বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর-এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি, বেয়ারা আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতে-ছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায়?

তা' জানিনে।

তুমি কে?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙ্গালী?

আজ্ঞে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।

বাইজী হিন্দু?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই; আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যেই হোক, বাঙ্গালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সম্মুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে সম্মুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ওকি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না?

রতন আসিয়া গড়গড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল,—তুমি তামাক খাও তা জানি; কিন্তু দেব কিসে? অন্য জায়গায় যা কর, তা কর। কিন্তু আমি জেনেশুনে আমার গড়গড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে! আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্ছি—ওরে ও—

থাক থাক, চুরুটে কাজ নেই; আমার পকেটেই আছে।

আছে? বেশ তা হ'লে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোসো: ঢের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা কেউ বলতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে?

ভাল লাগলো না।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা ক'রে কি আমোদ পায়, তা তারাই জানে। বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল তাহার চোখ-দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হয়ত আমার মনের ভুল। পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্য সত্যই মৃদু ও আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা হ'লে যত্নটত্ন করবার আর কেউ নেই বল। পিসিমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা করচ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েচ?

এতক্ষণ পর্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই শেষ কথাটা কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেচি ব'লেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইচই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল: কহিল, লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া, মমতা ভালবাসাটা কি কিছু নয়? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু, আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, তখন ছেলেবেলার ডাকনাম শুনে কি আমাকে চিনতে পারবে? তা ছাড়া আমি তোমাদের ও গ্রামের মেয়েও নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায় বল?

না, সে আমি বলব না।

তবে তোমার বাবার নাম কি বল?

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল তিনি স্বর্গে গেছেন। ছি-ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ করতে পারি?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম তা যদি না পারো, আমাকে চিনলে কি ক'রে সে কথা বোধ হয় উচ্চারণ করতে দোষ হবে না?

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিযা আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, না, তাতে দোষ নাই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

বলেই দেখ না।

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুর্বুদ্ধির তাড়ায়—আর কিসে? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলেছিলে, ভাগ্যি সূর্য্যিদেব তা শুকিয়ে নিয়েচেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হয়ে থাকতো। বলি বিশ্বাস করতে পারো কি?

সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমারই ভুল। তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে, পিয়ারীর ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাশা করিয়া বলিতেছে, এবং মনে মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্য সত্যই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এতক্ষণে কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে হইল, সে নিজের লজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর,

তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলাম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গি, তা তুমি ঠিক ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটায় অবিশ্বাস করতে পারেনি। তা এতই যদি বুদ্ধিমান, মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এই চাকরি ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না। যাও, চট্‌পট স'রে পড়।

ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম, চাকরি যতদিন হয়, ততদিনই ভাল। বসে না থাকি বেগার খাটি—জান ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয়ত বা কিছু মনে করে বসবে।

পিয়ারী কহিল, করলে সে ত তোমার সৌভাগ্য ঠাকুর! এ কি আর একটা আপসোসের কথা?

উত্তর না দিয়া যখন আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধু-মহলে, কুমারসাহেবের দরবারে প্রকাশ করলে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয়ত ফিরে যেতে পারে।

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য পরিহাস আমার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

স্বস্থানে আসিয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া চুরুট ধরাইয়া মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে এ? আমার পাঁচবছর বয়সের ঘটনা পর্যন্ত, আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূরে দৃষ্টি যায়, ততদূরে পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে। পিসিমার কথা পর্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু কিসের জন্য? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি? তখন কথায় কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসা-টাসা কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রূপটাও আমাকে যেন অবিশ্রান্ত মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম আটটা ঘুঘুপাখি মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম; এবং এইভাবেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিন-চারিদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিশাপ ফলিল নাকি, প্রাণিহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ কারণ ছিল তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল; সে হাজির হইলেই, আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোনদিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিয়া, অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ সে প্রতিমুহূর্তেই আমার সহিত চোখাচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্বাক হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে যে যেখানে ছিল আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া

বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে এই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যাঁরা চোখে দেখেছেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজি পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ত নাস্তিক—ম্লেচ্ছ। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম, দেখুন এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, ম্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেচেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেচেন, না হয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন? আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শ্মশানেই অনেক রাত্রে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপ্ সেখি মৎ করো বাবু। বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহাভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদের খল্‌খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজ, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন এক সময়ে কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা গর্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব, আপ্ যায়েগা?

যায়েগা বৈ কি!

যায়েগা! আচ্ছা, আপ্‌কা খুশি। প্রাণ যানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমি ত শুধু হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় খর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখি মারিতে পারি না কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না, তাহারা মুরগি খায়; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্যকালে ভাগিয়া যায়; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁতকপাটি লাগে, এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে-সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজা রাজড়াদের আনন্দোদয় হয় এবং তাহাদের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করিয়া যায় না—অর্থাৎ তাঁহারাও দুকথা কহিতে পারেন, সেই সব কথাবার্তা।

ইহাদের দলে একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল, সে শিকার করিতে জানে না; এবং কথাটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ

ইতিপূর্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না। বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ভূত মান না?

একেবারে না।

কেন মান না?

মানি না, নেই ব'লে, এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অত সহজে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না। কারণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ-সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে মূর্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন, কিন্তু আমার হাতে লাঠি থাকতে ভূতই বল আর প্রেতই বল, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাকবে ত?

ঠিক থাকবে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ—রাত্রি এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই।

দেখিলাম, তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটিই মনে মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ-সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে- সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর। ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে - সেই দিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছমছম যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এত বড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালির সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত স্নিগ্ধ শান্তস্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিম-শয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায়, লজ্জায়, নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাস-কাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহকাল ত্যাগ করিয়া যে লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোনো স্মার্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।

আমার পিসিমা যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহাকে সাহায্য করিতেন, এ কথা আমি এবং বাটীর বুড়ী ঝি ছাড়া আর জগতে কেহই জানে না। পিসিমা একদিন দুপুরবেলা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে শোকে গিয়ে

দেখিস; এই ছুঁড়িটাকে এক-আধবার গিয়ে দেখিস না। সেই অবধি আমি মাঝে মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসিমার পয়সায় এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম। তাঁর শেষকালে একা আমিই কাছে ছিলাম। মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই। বিশ্বাস না করিলেও যে ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি।

সেদিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারোটার পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ; আমি খাটের অদূরে বহু প্রাচীন অর্ধভগ্ন একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত তুলিয়া আমার কানটা তাঁর মুখের কাছে আনিয়া, ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তুই বাড়ি যা।

সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে?

তা হোক। প্রাণটা আগে। ভুল বকিতেছেন ভাবিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাচ্ছি!—জলটা একটু থামুক। নিরুদিদি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, না, না, শ্রীকান্ত, তুই যা। যা ভাই যা—আর এতটুকু দেরি করিস নে—তুই পালা। এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম, আমাকে যেতে বলছ কেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, যাবিনি, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখ্‌চিস নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস বলে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে?

তার পরে সেই যে শুরু করিলেন—ঐ খাটের তলায়! ওই মাথার শিয়রে! ওই মারতে আসচে! ওই নিলে! ওই ধ'লে! এ চীৎকার শুধু থামিল শেষরাত্রে যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে। সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই! বোধ করি বা যেন কি-সব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন অমাবস্যার ঘোর দুর্যোগ তুচ্ছ করিয়াও, বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না এ কথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরু-দিদির কালো কালো সেপাই-সান্ত্রীর ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ-সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্চেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম। এতরাত্রে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমানকর স্পর্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়; গত তিন-চারি দিনের উভয়-পক্ষের ব্যবহারগুলো স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিলাম, আজ আমার সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য; আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, বড় দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। নইলে বাইজীই আসবেন বললেন। —কি সর্বনাশ! এই তাঁবুতে এতরাত্রে, এত লোকের সুমুখে! বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বল গে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজ আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা হ'লে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আসচি বাবু, বাইজীর কোনদিন এতটুকু কথার কখনো নড়চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল।

বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই-চারি জন জাগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুট্‌টা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল, হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, শ্মশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম—কেন?

কেন আবার কি? ভূত-প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা হ'লে আর ফিরে আসতে হবে! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম না। ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য কি? যাহাকে চিনি না, জানি না, সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুমি কি কোন দিন শান্ত সুবোধ হবে না? তেমনি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে, আমিও তা হ'লে সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ, চল! আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল, আহা! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না! বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলি সঙ্গে করে দুপুর রাত্রে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন! বলি, বাড়িতে কি একেবারে আউট্‌ হয়ে গেছ নাকি? ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই, বলিতে বলিতেই তাহার তীব্রকণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল; কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপথে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি। তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জান? তুমিই যে এত অধঃপথে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল?

মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, আমার তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, তা আমি জানি—শুনলে কি তুমি খুশি হবে? হ'লে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবে দেখো, আত্মপ্রকাশ করবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চল্‌লুম।

পিয়ারী বিদ্যুদ্‌গতিতে পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল, দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই, যে তুমি যাবে বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা বলে দিচ্চি, বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক-পা পিছাইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগ্‌লায়—এমন অনেক কীর্তি করে, আবার দরকার হ'লে ঘাড় মট্‌কেও খায়। পিয়ারী মলিন হইয়া গেল; এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়াও পাইল না। তারপরে বলিল, আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক

কীর্তি করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মটকাবার জন্যেই পথ আগ্‌লায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে। আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, এ ত তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বৈ কি! যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই ত তোমার বলবার কথা! একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যে হোক--নিজের মরণ আমি নিজে রটাই নি। মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা? তাহার মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম--এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পূর্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিযাছিলেন। তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা আমি মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন, কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এম্‌নি ধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালের সর্দার-পোড়ো, সেই সময়ে ইহার দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলা তামার শলার মত--কতগুলি তাহা গুণিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচকব্রাহ্মণ ভঙ্গকুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন--ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবাগোবা ভালোমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্ন টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না—তা জামাই খুঁজচেন। একশ-একটি টাকা দিন—একবার এ-পিঁড়িতে ব'সে আর একবার ও-পিঁড়িতে ব'সে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্চি। দুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—দুটো ষাঁড় কেনার খরচাটাও দেবেন না? কথাটা অসঙ্গত নয় তথাপি অনেক কষা-মাজা ও সাধি-সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রফা হইয়া একরাত্রে একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইদিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন-জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে প্লীহা-জ্বরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর-দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল। এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, তুমি কি ভাবছ, বলব?

কি ভাবচি?

তুমি ভাবছ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি। কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মারধর করেছি। মার খেয়ে চুপ ক'রে কেবল

কেঁদেচে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি। আজ যদি একটা কথা বলচে ত শুনিই না! নাহয় নাই গেলাম শ্মশানে। এই না?

আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

পিয়ারীও হাসিয়া কহিল, হবেই ত। ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়? সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে! চল, একটু বসি গে, অনেক কথা আছে। রতন, বাবুর বুটটা খুলে দিয়ে যা রে। হাসচ যে?

হাসচি, কি ক'রে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করো, তাই দেখে।

পিয়ারীও হাসিল; কহিল, তাই বৈ কি। পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়; কিন্তু জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়? আচ্ছা, আজই নাহয় কথা কইচি; কিন্তু প্রত্যহ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যখন বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, তখন ক'টা কথা কয়েছিলুম শুনি? সে কি তোমার মারের ভয়ে নাকি? মনেও ক'রো না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে—দেখে চিনতেও পারোনি। বলিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতেই তাহার দুই কানের হীরাগুলা পর্যন্ত দুলিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলুম যে, ভুলে যাবো না? বরং আজ চিনতে পেরেচি দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চললুম।

পিয়ারীর হাসিমুখ এক নিমেষেই একেবারে বিবর্ণ ম্লান হইয়া গেল। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, ভূত-প্রেত না মানো, সাপখোপ, বাঘ-ভালুক, বুনো শুয়ার এগুলোকে ত বনে-জঙ্গলে অন্ধকার রাত্রে মানা চাই।

আমি বলিলাম, এগুলোকে আমি মেনে থাকি, এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি।

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে-ধাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না সে ভয় আমার খুবই ছিল; তবু ভেবেছিলাম, কান্নাকাটি ক'রে হাতে-পায়ে ধরলে শেষ পর্যন্ত হয়ত নাও যেতে পারো। কিন্তু আমার কান্নাই সার হ'ল। আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া পুনরায় কহিল, আচ্ছা যাও—পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না। কিন্তু একটা-কিছু হ'লে, এই বিদেশ বিভূঁয়ে রাজ-রাজড়া বন্ধু-বান্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের ওপর ব'লে তুমি পৌরুষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? বিপদের সময় আমি ত আর বলতে পারব না—এ'কে চিনিনে; বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। আমি যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না? একশবার 'বাইজী' ব'লে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না এ কি আর তুমি মনে মনে বোঝো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভালো হ'তো। তোমাদের একটা শিক্ষা হ'তো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা, একবার যদি ভালোবেসেচে, ত মরেচে।

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভালো সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে, আমাকে বেঁধো! এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভালমন্দ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি, তখনকার; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম, বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা-কিছু হবে। হ'লে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল, দুর্গা! দুর্গা! ছিঃ! এমন কথা ব'লো না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসো—এ সত্যি আর যাচাই করে কাজ নেই। আমার কি সেই কপাল যে, নিজের হাতে নেড়েচেড়ে সেবা ক'রে, দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ, সবল করে তুলব! তা হ'লে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ করে নিলুম। বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল, তাহা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ ক'রে দেবেন, বলিয়া আমি আর দেরি না করিয়া, তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাশা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল, সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠের দুর্গা! দুর্গা! নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌঁছিল। আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতেই পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি— এ কি বিরাট্ অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পিলেরোগা মেয়েটা তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল, এবং বঁইচি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বিস্ময় সেজন্যেও নয়। নভেল নাটকেও বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শতকোটী মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

বাপ্!

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে-যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে! মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখিটা একবার 'বাপ্' বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম। এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুলগাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূরে আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডালপালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল! ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক-পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু—অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুড়ির মত শিমুলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল; আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারে নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন

কি না, এই দুটা নশ্বর চক্ষে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা শুরু হইবার আর বেশি দেরি নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোন সাহায্য করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্ম-ভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে ভূত-প্রেত থাক বা না থাক, তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঙ্গালী কার্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙ্গালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ়-বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়—অন্ততঃ আমার পক্ষে ত নয়। তবে কিনা, মানুষের রুচি ভিন্ন। যদি বা কাহারও হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রে রাত্রি জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অথচ এম্‌নি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কতকগুলো ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই, আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। যতই কেননা বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু-একটা অজানা গোছের থাকে—এ সংস্কার হাড়ে-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে—তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানে না যে মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলাগোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশেপাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'uncanny feeling' ঠিক সেই ধরনের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশি করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুত এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্র—আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এই-সব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু সেটা যে কত বড় ভ্রম এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুসরণ করিতে গিয়াছিলাম, এক মুহূর্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই রামনামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়াখেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, একফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশেপাশে হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি

কন্‌কনে ঠান্ডা নিশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠান্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কান্ডের মধ্যেও কিন্তু এ কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এম্‌নি সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলা গলার সমবেত চীৎকার কানে পেঁৗছিল—বাবুজী! বাবুসাব! সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চীৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন! শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা-দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম। খানিক পরেই টের পাইলাম, সে-ই বটে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া, চেঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না -আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যিই নাপিত, তাহাতে আর ভুল নাই।

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু-একটা ভাঙিগয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙিগয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছটুলাল—সে তব্‌লা বাজায়; এবং আর একজন পিয়ারীর দরোয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, চলুন—তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল, বাবু, ধন্য আপনার সাহস। আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেচি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই এক মাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু, আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে বসে কাঁদচেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা; তোরা পিছনে যা। আমি এক-একমাসের মাইনে তোদের বকশিশ দিচ্ছি। আমি বললুম, ছটুলাল আর গণেশকে সংগে নিয়ে আমি যেতে পারি মা; কিন্তু পথ চিনিনে। এমন সময় চৌকিদার হাঁক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকিদার ছ' টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি ছেলের কান্না শুনতে পেয়েছেন? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া, আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল; কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙিগবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন, বাবু?

আমি বলিলাম, না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমরা যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেছেন, বাবু? মার কান্না দেখলে কিন্তু—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ, ছটুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর আগ্রহে, সজলচক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, আসুন।

মুহূর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রকৃতিস্থ কেহ নাই! সবাই আকণ্ঠ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে! ছি ছি! এই মাতালের দল লইয়া যাইব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতেই পারি না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আসুন—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না রতন, এখন নয়—আমি চললুম।

রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে বসে আছেন—

পথ চেয়ে? তা হোক! তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে বোলো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়; আমার বড় ঘুম পেয়েছে রতন, আমি চললুম! বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহংকারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলো পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোন মতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ! এই ত ক্রিটিসিজম্‌। একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখলেই কি চলিবে? এই দেখ বই-খানার যত ভুল-ভ্রান্তি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে! তা দিক। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই-সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভ-প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকড়ির মূল্য নাই? তোমার কোটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভান্ডটুকু একমুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!

এই ত আমি অন্নদাদিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অম্লান দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই! দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কত গভীর স্তব্ধ রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমানিকস্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে, কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! দিদি, আর কাহাকেও এ সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয়া যাইত, তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত, তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাত ঘড়া মোহর পাই ত অন্নদাদিদিকে একটা মস্ত সিংহাসনে বসাই, বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁর সিংহাসনের চতুর্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যান্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিদেশ লইয়া বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্ভট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা—সে-সব মনে করিলেও এখন হাসি পায়; চোখের জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল, আমাকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কিনা, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এম্‌নি মৃদু কথা, ঠোঁটে এম্‌নি মধুর হাসি, ললাটে এম্‌নি অপরূপ আভা, চোখে এম্‌নি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এম্‌নি সতী, এম্‌নি সাধ্বী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এম্‌নি অনির্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে, এম্‌নি করিযা সেও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোঁটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বুকের একান্তে একটুখানি ব্যথা বাজিল? আমার সন্ন্যাসিনী দিদির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার বিন্দু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ, এমনিই বটে! ছয়টা দিন আগে, আমার অন্তর্যামী আসিয়াও যদি এ কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অন্তর্যামি! তোমার এই শুভকামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।

কিন্তু তবু ত খরিদ্দার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অন্নদাদিদির আশীর্বাদে পাকা সোনার ছড়াছড়ি তার মধ্যেও যে এক দুর্ভাগা পিতলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল—এ কি কম আশ্চর্যের কথা!

আমি বেশ বুঝিতেছি, যাঁরা খুব কড়া সমঝদার তাঁরা আমার আত্মকথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত ফেনিয়ে কি বলতে চাও তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াই পিয়ারীর মুখ মনে করিয়া তোমার ব্যথা বাজিয়াছিল—এই ত? যাহাকে মনের দোরগোড়া হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাকেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ—এই ত? তা বেশ! এ যদি সত্য হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অন্নদা-দিদির নামটা আর তুলিয়ো না। কারণ তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানবচরিত্র বুঝি। জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সতী সাধ্বীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কস্মিন্‌কালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে এই ঝুটায় তোমাকে ভুলাইতে পা[illegible]ত না।

তা বটে। তর্ক আর নয়; আমি টের পাইয়াছি মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক। আমি ত নিজে জানি, আমি কোন্ নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রিচ্' করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ, হিপোক্রিট্ তখন আমাকে চুপ করিযাই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট্ আমি ছিলাম না; হম্‌বগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায় কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না।

বাবুসাব! রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহুলোক আমার গতরাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দরোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বড় তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে হৈহৈ করিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ্নতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে শুরু করিলাম। কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে-এগারোটার পর অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিস্তর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতরে ঢুকলে, না বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একটা বালির ঢিপিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর? বসে কি দেখলে?

ধু-ধু করছে বালির চর।

আর?

কশাড় ঝোপ, আর শিমুলগাছ।

আর?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ-সব ত জানি হে! বলি, সে-সব কিছু—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর কুছ্ নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, না। উত্তর শুনিয়া এক-তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা কভি হো নহি সক্‌তা। আপ্ গয়া নহি। তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম। কারণ, রাগ হইবারই কথা, কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিব্যি শ্রীকান্ত, কি দেখলে সত্যি বল।

সত্যিই বলচি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা-তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতেও কি পাওনি?

তা পেয়েছি।

এক মুহূর্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি, শুনিবার জন্য তাহারা আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাখি বাপ্ বলিয়া উড়িয়া গেল; কেমন করিয়া শিশুকণ্ঠে শকুনিশিশু শিমুলগাছের উপর গোঁঙাইয়া-গোঁঙাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কেমন করিয়া হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলো দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম তুষারশীতল নিশ্বাস আমার ডান কানের উপর ফেলিতে লাগিল। আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু আজ হইতে এই বুড়ার শপথ রহিল বাবুজী, আর কখনো এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটী-কোটী প্রণাম—এ শুধু

তাঁদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। এই বলিয়া সে ঝোঁকের মাথায় খপ্ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিল।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা শুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু কখনো সংকুচিত, কখনো প্রসারিত, কখনো নির্বাপিত, কখনো প্রজ্বলিত করিয়া সে শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিশ্বাস ফেলার এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্যন্ত মাথার চুল কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ চোখে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। এবং তাহার নিজের দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝরা অশ্রুর ধারা-দুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন কি জন্য যে চোখের জল গড়াইয়াছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অশ্রুকলুষিত তন্মগত মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় আঁকিয়া গেল। গল্প শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া, অনুমতি লইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজেদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্যন্ত তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য কখনও দেখি নাই, অথচ ব্যথার পরিবর্তে খুশিই হইলাম। কেন তাহা জানি। যদিচ যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্বে এ কাজ কোনদিন করিও নাই, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু জনমনের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছিল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং প্রণয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি, ইহারই গোপন ইশারায় আমার শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত করিলাম না যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল; এবং সে নিজেও গল্প-শেষে তেমনি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল আমার কোন্ এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়াও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ—না-হয় একছত্র লেখা—যা হোক একটা গোপনে হাতে দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্তি! দীঘিটা প্রায় আধ ক্রোশ দীর্ঘ। উত্তরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায়

শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটি যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙ্গা ঘাট ছিল, তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্যের তির্যক্ রশ্মিচ্ছটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপরে ক্রমশঃ সূর্য ডুবিযা দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল, অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত শৃগাল ভয়ে ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না -এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিযা কত লোক কতবার আসিযাছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই-সমস্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারী-রূপে দেখা দিযা সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না তাহাই যে নাই এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিযাছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদেব মতই সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিয়ো না। এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, তাল-বেতাল সিদ্ধির গল্প, আর কত তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়া-ছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিয়ো না, তোমাকে আর কখনো সেস্থানে যাইতে বলি না, কিন্তু যাহারা এ কাজ পারে তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিয়ো না!

তখন সকালবেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নিরর্থক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এখন এই কথাগুলাই এই নির্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকার চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতের প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলো যেন আতসবাজির বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা নয়। কাল ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর শুরু করে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ আর শেষ হয় না। এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই। দিক্ ভুল করিয়া ত আর-এক দিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটা-কয়েক তেঁতুলগাছ জড়া-জড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত করিয়া অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নীচে

দিয়া পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এমনি অন্ধকার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর্‌গুর্‌ করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয়ত? বাঁধই ত বটে! পা-দুটা যেন ভাঙিয়া আসিতে লাগিল; তবুও টানিয়া টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই! ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান! আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া টলিয়া সেই ধুলো-বালুর উপরেই মূর্ছিতের মত ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পোঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদটা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচিভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি আঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য নয়। কারণ নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বৃদ্ধ পাগল ছিল; সে দিনের বেলা বাড়ি বাড়ি ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহুক্লেশে খড়া বাহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই; এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘুণাগ্রেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়—আট দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায়; এবং ভূতের দৌরাত্ম্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেমনি কিছু ছিল, হয়ত ছিল না। কিন্তু যাক গে!

বলিতেছিলাম যে সেই ধুলো-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছিঃ ছিঃ, ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য! আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়! এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিস্‌ না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্‌। কথাগুলো কানে শুনিয়াছিলাম, কিম্বা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ—চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এম্‌নি একরকম করিয়া বজায় থাকে; একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু-চোখ মেলিয়া

চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানও নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ একরকম।

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে, আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে; এবং সেজন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলকধাঁধার মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে!

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোনপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিতচক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু-চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম! কখনও এ-সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু-চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁশ ছিল না। হুঁশ হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশেপাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্বার বাঁধের

উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুইখানা গরুর গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ জন-কয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম কাহারা এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর-কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম, এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দুইখানি গো-শকট পাঁচ-ছয়জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক-দুটা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল; এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের একটা ঝাঁকড়া গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশি বাকী নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—

সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কি বাড়ি যাচ্ছিস্?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ি যাচ্ছি—মা গাড়িতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। গাড়িতে উঠে এসো, কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা?

উঠে এসো বলচি!

না, তা পারব না, সময় নেই। ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে। পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকরের সামনে আর ঢলাঢলি কোরো না—তোমার পায়ে পড়ি একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম; পিয়ারী গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ দিয়া কহিল, আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে?

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, জান না? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন?

বলিলাম, এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।

মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কিনা জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম আকাশ ফরসা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, না।

না কি-রকম? এমনভাবে চলে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা ত তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কান্তদা, কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও—কিংবা যেখানে খুশি যাও, কিন্তু ওখানে আর একদণ্ডও না।

আমি বলিলাম, আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে।

পিয়ারী কহিল, থাক পড়ে। তাদের ইচ্ছা হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে, নাহয় থাক গে। তার দাম বেশি নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশি নয় সত্য; কিন্তু যে মিথ্যা কুৎসার রটনা হবে, তার দাম ত কম নয়!

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি এই সময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ করে রইলে যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জানো কান্তদা, যে কলম দিয়ে সারা-জীবন শুধু জালখত তৈরি করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল?

না।

পিয়ারী হাতের আঙটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশি হাঁটতে হবে।

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে কিংবা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করিতে পারিলাম, দুটি চক্ষের সজল-করুণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারংবার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙ্গা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিসগুলা চোখে পড়িবামাত্র একটি নিষ্ফল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হ'য়েছিলেন?

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগার

পিয়ারীর কাছে যে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বারবার লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোন দিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করে নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা 'নিবেদন' ছিল, যাহা

আমি আজও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপসা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচখচ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সে দিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়া ছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বত্থ গাছের ফাঁক দিয়া আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা স্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম—তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম সেটা 'বাড়' স্টেশন, এবং পাটনার আর দেরি নাই তখন হঠাৎ সেখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু-আনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুশি হইয়া দোকানের সন্ধানে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দহি এবং শর্করা সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক। জীবনে অমন কত যায়—সেজন্যে ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টা-খানেক ঘুরিতে না ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দধি ও চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভুরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থানত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, জলটা 'খানকার বড় বদ।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম। মস্ত ধুনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্ধমুদ্রিত চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাঁহার আশেপাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা-দুই উট, গোটা-দুই টাট্টু ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উঁকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটি ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারি করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম; এবং চক্ষের পলকে সাধু বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয় যাক গে পিয়ারী,—এই মুক্তি-মার্গের সিংহদ্বার ছাড়িয়া তিলার্ধ যদি অন্যত্র যাই, আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়!

সাধুজী বললেন, কেঁও বেটা?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী, মুক্তি-পথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুশি হইয়া বলিলেন, বাত তেরা সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা রামজীকা খুশি। যিনি দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরি করিয়া 'বাবা'কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ তৈয়ারি হইতেছিল সন্ধ্যার জন্যে। তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অন্য প্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সর্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

আমি পরমানন্দে আর একবার বাবার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা একসুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া-দশেক ছোট-বড় রুদ্রাক্ষ-মালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়--সাজগোজ করিয়া, খানিকটা ধুনির ছাই মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে! দেখিলাম, তাঁহারও রস-বোধ আছে; তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একঠো।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার!

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটুখানি টিন-মোড়া আরশি। তা হোক, একটুখানি দেখিলাম, যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন! তা যাক।

ঘণ্টা-খানেক পরে গুরুমহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-অধ ঠহ্‌রো।

মনে মনে বহুত আচ্ছা বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায় কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরূহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভণ্ড পাষণ্ডেরা কিপ্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে হইলেই বা কি-কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন ঘন মুখবিবর দ্বারা শোষণ করতঃ নাসারন্ধ্রপথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য উপকার, তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্ধন করিলেন। এইরূপে সেদিন মোক্ষপথের অনেক নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত হইয়া গুরুমহারাজের তৃতীয় চেলাগিরিতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেমনি। চা, রুটি, ঘৃত, দধিদুগ্ধ, চুড়া শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে আমার শুক্‌নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া! সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সর্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাপর কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্বর ডিঙ্গাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের

দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না. আমি বলিতেছি, বাঙ্গলা দেশের মত সেখানকার মেয়েরা 'হাতজোড়া—আর একবাড়ি এগিয়ে দেখ' বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরি না করিয়া ভিক্ষা করি কেন. তাহার কৈফিয়ত তলব করিত না। ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না। এম্নি দিন যায়। দিন-পনর ত সেই আমবাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক্‌ মোক্ষসাধন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর বাঁচি না! অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালী যত সেরাই হোক, এ বিষয়ে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী-চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশি অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিকভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরুমহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

"ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা
যিনহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা—"

অর্থাৎ স্ট্রাইক্‌ দি টেন্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়! সন্ন্যাসীর যাত্রা কিনা! পা-বাঁধা টাট্টু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কষিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তার পরে রওনা হইয়া ক্রোশ-দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা ফেলা হইল। জায়গাটি মনোরম. গুরুমহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা ত হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পৌঁছিতে যে কয় মাস লাগিবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিন জনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্তির জন্য চেষ্টাচরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ির খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটা বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে-বোনা গুণচটের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গিটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগার বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন উদাস চাহনি, আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙ্গলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠোঁট-দুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ি কি বর্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন?"

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ি কি বর্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ি এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিছু জানিনে। ঐ যে অশ্বত্থ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি। ও-সোমবারে দিদি

গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এরা বলে, না—সে কলেরায় মরেছে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখ্‌ছি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়িতে এদের শ্বশুরবাড়িটিই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিল কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত, খেত না, শুত না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিনরাত কাঁদি; কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না।

তোমাকে কি এরা মারধোর করে?

করে না? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বল্‌বে ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে? নইলে আমি—বলিতে আমি কোনমতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদির দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, এবং সেও মারধোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে যাইবার সংকল্প করিয়াছে। তিনি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে বলা যায় না। খুব সম্ভব, তোমার চিঠিপত্র ইহারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কি না; এবং পৌঁছাইলেও সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এম্‌নি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে, এবং এই আদর্শ হিন্দু-সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল; এই উপায়েই সনাতন হিন্দুজাতিটা যখন আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার প্রচণ্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই নাই। কে কোথায় দুটো হতভাগা মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বলিয়া ইহার কঠোর বন্ধন একবিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগলামি। কিন্তু মেয়েটার কান্না যে লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই, এ প্রশ্ন নিজের নিকট হইতে থামাইয়া রাখে যে—কোনমতে টিঁকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিঁকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল-ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক ছোটখাটো দ্বীপের অনেক ছোটখাটো জাতিরা মানুষ-সৃষ্টির শুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে, তাহাদেরও এমন-সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা য়ুরোপের অনেক জাতির অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন, কিন্তু তাই বলিয়াই যে ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা ঝাঁক বাঁধিয়া দেখা

দেয় না, এমনই এক-আধটা ক্বচিৎ আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙ্গালী মেয়ে-দুটির খোট্টার ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি এরূপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারা এই দুরূহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যা-দুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে-সমাজ এই দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে-সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ 'জাতিভেদ' বলিয়া যে একটা বড়রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই, এইরকম একটা কথা; কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না- 'হয় নাই', 'হইবে না' বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবলকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেমনি কঠিন। যাক্ গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এ গ্রামটা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়; সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক করে না; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে আর তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া এই-সকল বেহারী পল্লীগুলিতে কোনরকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না। ইতিপূর্বে বাঙ্গলার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা, জলবায়ু—কোনটাই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু কেবল পালাই-পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তনের সুর কানে আসে না। দেবমন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলাও সেরূপ গম্ভীর মধুর শব্দ করে না। এ দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই তেমন মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না! এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এই-সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোন দিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রা করা হইল, এবং সাধুবাবা যথাশক্তি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হোক, কিংবা মুনি আমার মন বুঝিয়াই হোক পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা সে এখন থাক, পাপতাপ অনেক করিয়াছি, সাধুসঙ্গে দিন-কতক পবিত্র হইয়া আসি গে। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোট বাঘিয়া। আরা স্টেশন হইতে ক্রোশ-আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সদাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না-পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি—গোপনে তিনি যে-সকল সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। অতএব তাঁর নাম রামবাবু। কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া যে জমিজমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন,

অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, এই ছোটা-বড়া বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই-সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবিচলিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সংকল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার-চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথাই বলিব। নিছক 'পেটের দায়ে সাধুজী' আপনারা ত আমাকেই জানেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও এই দুটো দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিটাও যে আমার খুব মোটা তাও নয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বল্পতাই বলুন—খুব বেশি; এবং প্রাণের ভয়টা ইহাদের নিতান্তই কম, 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছেই; কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধুনির ছাই এবং দু ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে-সকল বস্তু হু-হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী—কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রীক কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড়-ছেলের বসন্ত দেখা দিয়াছে এবং ছোটছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচৈতন্য। বাঙ্গালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গল্পের মধ্যে মাস-খানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে-দুটি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত ঢের দূরের কথা। তবে মাঝের একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন-পনর পরে রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা, তুমি ত সত্যিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে তারা কখ্খনো বাঁচবে না। কৈ, যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল। রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও; আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী-লীলার অবসানে উত্তরাধিকার-সূত্রে টাট্টু এবং উট-দুটা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে-দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পালাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না; যে বাড়িতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তার পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিতেন, শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ-ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম রাতজাগা এবং পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্‌টিপ্ করিতে

লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম, অপরাহ্ণবেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি নটা-দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাব। কিন্তু তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু জায়গা দিতে হবে।

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ন্যাসীদাদা? গাড়ি ত দুটোর বেশী পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই দিদি! সকাল থেকেই বেশ জ্বর এসেচে।

জ্বর? বল কি গো? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নূতন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে, বাড়ির ভিতর ঘরে-ঘরে তালা বন্ধ—জনপ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম তাহার সুমুখ দিয়াই এই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ-ছয়খানা গরুর গাড়ি মৃত্যুভীত নরনারী বোঝাই লইয়া স্টেশনে যাইত। সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যুষেই স্টেশনের কাছে একটা গাছ-তলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না, সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড ছিল। পূর্বে এটি মোসাফিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনে গরু-বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোক স্টেশন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায়, জনকয়েক কুলীর সাহায্যেই এই শেডখানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না; কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং পনর টাকা বেতনে স্টেশনে চাকরি করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন, এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন; দুপুরবেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইযা যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম আর বেশিক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে আর করাই হইবে না।

তা বটে, কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবিলাম গরীবের টেলিগ্রাফের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি!

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার হুঁশ আছে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা হোক, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি 'না না' বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেউ নাই। তবে পাটনার পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোস্টকার্ড

লিখে দেন, যে শ্রীকান্ত আরা স্টেশনের বাইরে একটা টিনশেডের মধ্যে মরণাপন্ন হ'য়ে পড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্চি, চিঠি এবং টেলিগ্রাফ দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্চি, বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্-ব্যাগ। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা দুই-তিন ঔষধের শিশি, এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন লাল-চেক র‍্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তার পরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ানো—এমনি কত কি ব্যাপার।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম ইনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুস্বরে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বঙ্কু, বরফটা একবার কেন বদ্‌লে দিলিনে বাবা!

ছেলেটি বলিল, দিচ্চি, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন বসন্ত নয়, তখন ত আর কোন ভয় নেই মা।

পিয়ারী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়েমানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাবনা করতে হবে না বঙ্কু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়্,—আর রাত জাগিস্ নে।

বঙ্কু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম, পিয়ারী!

পিয়ারী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দুগুলা আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌চ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি আরা?

হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ি যাব।

কোথায়?

পাটনায়। আমার বাড়ি ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?

এই ছেলেটি কে রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা কয়ো না, ঘুমোও—কাল সব কথা বলব। বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বার

যাহাতে অচৈতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তারি-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা-কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে লইয়া জন-দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং শহরের ভালমন্দ নানাবিধ চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে অন্য ক্ষতি না হোক, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বঙ্কু আর দেরি করিস নে বাবা, এই বেলা একখানা সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ ক'রে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে সাহস করিনে।

বঙ্কুর অতৃপ্ত নিদ্রা তখনও দু চক্ষু জড়াইয়া ছিল; সে মুদ্রিত-নেত্রে অব্যক্ত-স্বরে জবাব দিল, তুমি খেপেচ মা, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে-মুখে জল দে দেখি! তার পরে নাড়ানাড়ির কথা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ্।

বঙ্কু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া স্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে ডাকিলাম, পিয়ারী! আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপর ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙল?

আমি ত জেগেই আছি। পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন?

তা ত বরাবরই করচি পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'ল?

তেরো দিন, বলিয়া সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলেপিলেদের সামনে আর আমাকে ও ব'লে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী ব'লে ডেকেচো, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, আচ্ছা। তারপরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচ, কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাইনে।

তবে কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চার দিনেই বোধ হয় একরকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই কটা দিন অপেক্ষা ক'রে বাড়ি যাও।

তখন তুমি কি করবে শুনি?

সে যা হয় একটা হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তার পর সুমুখে উঠিয়া আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, তিন-চার দিনে না হোক দশ-বারো দিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কত দিনে সারবে, আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগ আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর-একরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। তুমি জানো যে একমাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও। ওগো দয়াময়! আমার উপর যদি তোমার এতই দরদ তবে যাই হোক্ গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে! এসে দেখি, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথায় প'ড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েছে; সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দুগাছা পেতলের বালা। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে! বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টলটল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বঙ্কু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে কথা আর কি বলব বাবা! উঃ, কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে। মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দুজনের চার-চক্ষুর দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয়নি—দেবে না! শহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েছে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু অনেক প্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনা পর্যন্ত পোঁছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌঁছিয়া বার-তেরো দিনের মধ্যেই একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্বে দেখি নাই, তাহা নয়। জিনিসগুলি ভালো এবং বেশি মূল্যের, তা বটে; কিন্তু এই মারোয়াড়ী-পাড়ার মধ্যে এই-সকল ধনী ও অল্পশিক্ষিত শৌখিন মানুষের সংস্রবে এত সামান্য জিনিসপত্রেই এ সন্তুষ্ট রহিল কি করিয়া? ইতিপূর্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরনের ঘরদ্বার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। সেখানে ঢুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া? ইহার ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি, দেওয়ালগিরি, আয়না, গ্লাসকেসের মধ্যে আনন্দের পরিবর্তে আশঙ্কা হয়—সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবকাশটুকুও বুঝি মিলিবে না। বহুলোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার উপহাররাশি এমনি ঠাসাঠাসি গাদাগাদি-ভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিপাতমাত্রেই মনে হয়, এই অচেতন জিনিসগুলোর মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যেন এই বাড়ির মধ্যে একটুখানি জায়গার জন্য এমনি ভিড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষারেষি ঠেলাঠেলি করিতেছে! কিন্তু এ বাড়ির কোন ঘরে আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত একটা বস্তুও চোখে পড়িল না; এবং যাহা চোখে পড়িল, সেগুলি যে গৃহস্বামিনীর আপনার প্রয়োজনেই আহৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার নিজের ইচ্ছা এবং অভিরুচিকে অতিক্রম করিয়া আর কাহারও প্রলুব্ধ অভিলাষ যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝা গেল। আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটা নামজাদা বাইজীর গৃহে গানবাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহা ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম; কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নাই। মেজেটি সাদা পাথরের, দেয়ালগুলি দুধের মত সাদা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। ঘরের একধারে একটি ছোট তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, একটি কাঠের আলনায় খান-কয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলমারি। আর কোথাও কিছু নাই। জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল—চৌকাঠের বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ করি ক্লান্তিবশতঃই তাহার শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হইলে ঘরে আর কিছু বসিবার জায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিতাম। সুমুখের খোলা জানালা ঢাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ; তাহারই ভিতর দিয়া ঝিরঝির করিয়া বাতাস আসিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা মিষ্ট শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই। সোজা আলনার কাছে গিয়া শুষ্ক-বস্ত্রে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, আঁ--চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? না, না, বোস বোস,--যেতে হবে না; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসছি, বলিয়া লঘু পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া, হাসিয়া কহিল, আমার ঘরে ত কিছুই নেই; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত? আমাকে নয় ত?

আমি বলিলাম, আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি করব? আমি অত লোভী নই।

পিয়ারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। কথাটায় সে যে ব্যথা পাইতে পারে বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ দুই-এক দিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সংকল্প করিতেছিলাম, বেফাঁস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, নিজের জিনিস বুঝি কেউ চুরি করতে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি?

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিনমুখে কহিল, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না—দয়া করে সে সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার ঢের।

তাহার শুদ্ধস্নাত প্রফুল্লহাসি মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলাটাতেই ম্লান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসিটুকুর মধ্যে কি যেন একটা মাধুর্য ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবামাত্র ক্ষতিটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলাম, লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জান। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধুলোবালির উপরেই ম'রে থাকতে হ'ত, কেউ ততদূর গিয়ে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা পর্যন্তও করত না। সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে, সুখের দিনে না হোক দুঃখের দিনে যেন মনে করি—নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলেই কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো?

নিশ্চয়।

তা হ'লে আমার জন্যই প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা হ'লে ওটা দাবি করতে পারি বল?

তা পার। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, তবু ভাল যে নিজের দামটা এতদিনে টের পেয়েচ। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তামাশা থাক—অসুখ ত একরকম ভাল হ'ল, এখন যাবে কবে মনে করচ?

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, কোথাও যাবার ত আমার এখন তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব ভাবছি।

পিয়ারী কহিল, কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসচে। বেশি-দিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।

আমি বলিলাম, ভাবলেই বা। তাকে ত তোমার ভয় ক'রে চলতে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও আমি নড়ছি নে।

পিয়ারী বিরসমুখে বলিল, তা কি হয়' বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকালবেলায় আমার ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বঙ্কু, কি পড় তুমি?

ছেলেটি অতিশয় সাদাসিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এন্ট্রান্স পাশ করেছি।

এখন তা হলে বাঁকিপুর কলেজে পড়চ ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমরা ক'টি ভাইবোন?

ভাই আর নেই। চারটি বোন।

তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে?

আজ্ঞে হাঁ। মা-ই বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি দেশের বাড়িতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো তোমাদের দেশের বাড়িতে গেছেন?

অনেকবার। এই ত পাঁচ-ছ'মাস হ'ল এসেছেন।

সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না?

বঙ্কু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হলোই বা। আমাদের 'একঘরে' ক'রে রেখেচে ব'লে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করতে পারিনে! আর অমন মা-ই বা ক'জনের আছে!

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে? কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বঙ্কু কহিতে লাগিল, আচ্ছা আপনিই বলুন, গানবাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দে পরচর্চা ত করেন না! বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই আট-দশজন ছেলের পড়ার খরচ দেন; শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন?

আমি বলিলাম, না; এ ত খুব ভাল কাজ।

বঙ্কু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত। আমাদের গাঁয়ের মত পাজী গাঁ কি কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠাবাড়ি তৈরি হ'ল। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বললেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইঁটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চার হাজার টাকা খরচ ক'রে তাই ক'রে দিলেন, ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না। অমন জল—কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মরে যায় যে আমাদের কোঠাবাড়ি তৈরি হ'ল! বুঝলেন না?

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে! এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না?

বঙ্কু একটু হাসিয়া কহিল, তাই ত। কিন্তু সে কি বেশি দিন চলে? প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না, কিন্তু এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—বামুন-কায়েতরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবু, পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট?

আমি কহিলাম, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গবার যে একটা কথা আছে, এ যে দেখি তাই।

বঙ্কু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই! এমন গাঁয়ে আলাদা, একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন? প্রত্যুত্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। হাঁ-না স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বঙ্কুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যিই ভালবাসে। অনুকূল শ্রোতা পাইয়া শক্তির আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাঁহার অজস্র স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময়ে তাহার হুঁশ হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্চি।

কাল?

হাঁ, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি! অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্চে?

বলিলাম, সকাল পর্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেছে।

তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই, বলিয়া ছেলেটি চিন্তিতমুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম; যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে, ছেলেটি লজ্জা পাইল বটে; এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল; কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন। বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলাম, ছেলেটি খুবই সরল বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে

বলিয়াছিল, আর বেশি দিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে। কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া বোধ হইল; মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; এবং সে যে সংসারে সব দিক্ দিয়া সর্ব-প্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে যে-মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাউক, কিন্তু এ কথাও সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসামত্ত বসন্ত-দিনে কে যে ভাল-বাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না; কিন্তু এই নামটা পর্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্মরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না! আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এত দিন চলুক না, স্নেহ যতই মাধুর্য ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের মধ্যে লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা, যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে পাই নাই—ছল করিয়া একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ক হইয়া সেইখানেই বসিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার সময় ধুনুচিতে ধূপধুনা দিয়া সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন, ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাক্, ঠান্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্ ভাল?

না, সেও তোমার ভুল। ঠান্ডা গরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা ত সত্যি? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না! রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিতে পারে না? এ বাড়ির চাকরগুলোর মত 'বাবু'-চাকর আর পৃথিবীতে নেই। বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার ভুলের জন্য বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়িশুদ্ধ লোকের দোষ দেখতে পাও!

কৌতূহলী হইয়াই প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন?

রতন কহিল, সে কি কারো জানবার জো আছে! বড়লোকের রাগ বাবু শুধু শুধু হয় আবার শুধু শুধু যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল! দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল, তখন তোদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে রতন? আর বড়লোকের বাড়িতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও যাস্‌নে কেন?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল,

তোর কাজটা কি? ওঁর মাথা ধরেছে—বঙ্কুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আট্‌টা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্‌। কাল থেকে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্‌—এখানে হবে না। বুঝলি?

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওডিকোলন জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই নাকি বাড়ি যাবে? আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরিবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, কাল সকালেই যাব।

সকাল ক'টার গাড়িতে যাবে?

সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ি জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কাউকে না হয় স্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দসাড়া নীরব হইল; বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু শুধু হয়। কথাটা আর কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি নাই থাক, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক্‌, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতি বড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোন দিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া, ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল, পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমতটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি! তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলো ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙিল। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে, মাথা এত ভারি যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবু যাইতেই হইবে। এ বাটীতে নিজেকে আর একদণ্ডও বিশ্বাস নাই, সে যে-কোন মুহূর্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। নিজের জন্যও তত নয়। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলে-মেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া ...। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া

বাহির করিয়া আনিব—এতবড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবন্ধ হইয়া থাকিবে?

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়! যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয়?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তা হলে বাড়ি পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাড়িতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব।

পিয়ারী বলিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পালকিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এমনি গম্ভীর, এমনি স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজিও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে তখন কতবড় একটা আসন্ন-বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনি ধারা একটা-কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পালকিতে উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না —ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পালকি লইয়া স্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহজীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সংকল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

শ্রীকান্ত

দ্বিতীয় পর্ব

এক

এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক যখন সত্যই পড়িল, তখন বুঝিলাম, বিস্ময় এবং সঙ্কোচ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য করিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করা চলিবে না।

তাই, আজ আবার এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতছিন্ন গ্রন্থিগুলা আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ি ফিরিয়া আসার পরে আমার এই সুখে-দুঃখে-মেশানো জীবনটাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার নিজের নয়। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে, যাহার নিতান্ত গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদলাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর-একরকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল, --কোথাও যেন আর ঘর-বার, আপনার-পর রহিল না। এমনি একপ্রকার অনির্বচনীয় উল্লাসে অন্তর-বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে রোগ বলিয়া, বিপদকে বিপদ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনেই হইল না। সংসারের কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধার যেন আর লেশমাত্র সংস্রব রহিল না।

এসব অনেক দিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। অথচ হারাইয়াছি বলিয়াও কোন দিন ক্ষোভ করি না। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয় যে-শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিরাট শক্তি! আর মনে হয়, সেদিন আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্বল হাতের উপর এতবড় গুরুভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুটি হাতের উপরেই আমার সেদিনের সেই অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত বোঝা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু যাক সে কথা।

রাজলক্ষ্মীকে পোঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল অনেকদিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঞ্ঝাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাস্তু! এতদিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি!

আকাশকুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা শুকনা পাপড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদি বা দু-এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত, হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলা আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এমনিভাবে আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেয়েলী কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠুক্‌ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার

অক্ষর এবং নাম-সইর পানে চাহিয়া সহসা নিজের চোখ-দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এই যে, বছর বারো-তেরো পূর্বে এই 'গঙ্গাজলে'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এ গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদি বা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে বটে। মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যত প্রকারে কল্পনা করা যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান নাই।

সে যাই হোক, গঙ্গাজল যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাকা দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে সুপাত্র যখন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূঢ়া কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই এই হতভাগ্য সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর পায়ের তলায় সজোরে একটা ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে-পথও আমার বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে পারি না পারি, পরখ করিবার জন্য একদিন রাত্রে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারারাত্রি ট্রেনে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ণ। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসর পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া এবং দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সোপান-স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি কি গহনা আছে, এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং করিলে কত টাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল না। বলিলেন, তাঁর কোন-এক আত্মীয় বর্মামুল্লুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে —শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙ্গালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয়--এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং মোহ-ভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। গঙ্গাজল-মায়ের বর্মামুল্লুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। 'লাল' হইবার আশায় নহে—আমার মধ্যে যে 'ভবঘুরে'টা কিছুদিন হইতে ঝিমাইতেছিল, সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতি-পূর্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন মতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যতপ্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরন দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাতছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া শুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, বিদ্যা-সাধ্যি দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল; এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমন কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মুর্খ হইয়াও, সুধমাত্র স্ত্রীর আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপরে দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও চব্বিশ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না; এবং এজন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতূহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ যিনি সুদীর্ঘ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিলরূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না—সে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচ শত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রস্থান করিলাম। কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এক উপায় ছিল পিয়ারীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধেও মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদও জানিতাম না। সেই পৌঁছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লেখে নাই। বোধ করি, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্ততঃ তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নীচের বসিবার ঘরের বারান্দায় দেখিলাম, দুজন উর্দিপরা দরোয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরোয়ানজীর পরিবর্তে কেন যে তাহার এমন দুজন বাহারে দরোয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব কিংবা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক হইয়া গেল। পরে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

এইমাত্র আসচি রতন। খবর সব ভাল?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু। ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আসচি, বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিব ঠাকরুন ওপরেই আছেন?

আছেন, বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চহাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপ্‌ধপ্ করিতেছে। তাকিয়াগুলায় অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরনে বাঙ্গালীর মত ধুতি-পিরান থাকিলেও, মাথার উপর কাজ-করা মসলিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। একজোড়া বাঁয়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবল্‌চী এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম। পিয়ারীর গায়ে মুজ্‌রার পোশাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজসজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক--ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। তার পরে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এ কি! শ্রীকান্তবাবু যে! কবে এলেন?

আজই।

আজই? কখন? কোথা উঠলেন?

ক্ষণকালের জন্য হয়ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, এখানকার সমস্ত লোককেই ত তুমি চেন না, নাম শুনলে চিনতে পারবে না।

যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি এ যজ্ঞের যজমান তিনিই। বলিলেন, আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে; বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নীচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম। বিচারের সময় বেশি ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোনমতেই প্রকাশ পাইলে চলিবে না। আমার মুখের কথায়, আমার চোখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের ক্ষোভ বা অভিমানের একটি বিন্দুও বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে আসিয়া যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলাম, বাইজীবিবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাঁকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনের জোরটা তাঁর যাচাই করে নিতুম। বলি, করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!

প্রশংসা শুনিয়া কর্মকর্তা বাবুটি আহ্লাদে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক; দেখিলাম, তিনি বাঙ্গলা বলিতে না পারিলেও বেশ বুঝেন। কিন্তু পিয়ারীর কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়--রাগে, তাহাও বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া তেমনি হাসিমুখে বাঙ্গলা করিয়া কহিলাম, আমার আসার জন্যে আপনাদের আমোদ-আহ্লাদের যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গানবাজনা চলুক।

বাবুটি এত খুশি হয়ে উঠিলেন যে আবেগে আমার পিঠের উপর একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা বাবু!--পিয়ারীবিবি, একঠো ভালা সঙ্গীত হোক।

সন্ধ্যার পরে হবে--আর এখন নয়, বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলার একজন জমিদার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারীবিবিকে তিনি সাত-আট বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়িতে তিন-চারবার মুজ্‌রা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন; কখনও কখনও দশ-বারো দিন পর্যন্ত থাকেন—মাস-তিনেক পূর্বেও একবার আসিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—এইবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিবার পূর্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, বাইজীকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন এসেচি।

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ শান্তস্বরে; কহিল, উনি আমার দেশের লোক।

আমি হাসিয়া কহিলাম, বাবুজী, মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে—তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না। কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন, এবং তাঁর চাকর আসিয়া যেই জানাইল, সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করা হইয়াছে, তিনি তখনই প্রস্থান করিলেন। তবল্‌চী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাৎ কেন এমন বিকল হইয়া গেল তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস নে? যা এখান থেকে, বলিয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ির ভার-কেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এখন হঠাৎ আসা হ'ল যে?

বলিলাম, দেশের লোক, অনেকদিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম বাইজী!

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমার পরিহাসে সে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া বলিল, আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ত?

থাকতে বল, থাকব।

আমার আর বলাবলি কি! তবে তোমার হয়ত অসুবিধা হবে। যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে—

বাবু শুচ্ছেন? বেশ! আমি নীচে শোবো, তোমার নীচের ঘরগুলোও ত চমৎকার।

নীচে শোবে? বল কি! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দু-দিনেই এতবড় পরমহংস হয়ে উঠলে কি করে?

মনে মনে বলিলাম, পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনোনি। মুখে বলিলাম, আমার তাতে মান-অভিমান একবিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে কর ত সেটা একেবারে নিরর্থক। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খাবার-শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশী বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে বলো, না থাকে দরকার নেই—আমার কম্বল সম্বল আছে।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে কোনরকম দুঃখ হবে না ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না। কারণ স্টেশনে পড়ে থাকার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ গাছতলায় প'ড়ে থাকতুম, এত অপমান সহ্য করতুম না।

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া পারিলাম না। সে যে কি কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম। কিন্তু শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলাম, আমি এত নির্বোধ নই যে, মনে করব তুমি ইচ্ছে ক'রে আমাকে নীচে শুতে ব'লে অপমান করচ। তোমার সাধ্য থাকলে তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক্, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে

পাঠিয়ে দাও গে, আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পিয়ারী কহিল, তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝবে না ত বুঝবে কে? যাক, বাঁচলুম! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ আসার সত্যি কারণটা শুনতে পাইনে কি?

বলিলাম, প্রথম কারণটা শুনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক ব'লে।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্মায় যাচ্ছি। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখতে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরি হয়েছে, আসুন।

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারী ঘুম পাচ্চে। ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা আছে; বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নীচের ঘরে না ক'রে এ ঘরে করা হ'ল কেন?

রতন আশ্চর্য হইয়া কহিল, নীচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই ত কথা ছিল।

সে অবাক হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে? আপনি কি যে তামাশা করেন বাবু! বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব শোবেন কোথায়?

রতন কহিল, বঙ্কুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়-হাত চওড়া তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেলফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরি হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এ-সব তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্বিকার ঔদাসীন্যে মনে মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা ঈর্ষার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয়ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?

না, তা জানিনে।

তবে?

ফিরতেই হবে, এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।

নেই? তুমি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো নাকি?

কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু সংসারের এই একটা ভারী আশ্চর্য যে মানুষের দুর্বলতা কখন কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোনদিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানিনে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু একজনের জানি। যদি কোনদিন ফিরে আসি ত শুধুই তোমার জন্যই আসব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙ্গিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট-দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে ব'স, এ অবস্থায় কেউ দেখলে সে ভারী আশ্চর্য হয়ে যাবে।

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠব।

কি কথা বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো! তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলায়ই সব পথ বন্ধ কে[illegible] অজ্ঞানে, অভাবে প'ড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করিনে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হ'লে তুমিও আটকাতে পারবে না।

আমি জবাব দিবার পূর্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাইত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয়নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখব। বলিয়া সম্মতির জন্যে অপেক্ষামাত্র না করিয়া আমার পায়ের বালিশটা টানিয়া লইয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'তে পারে তা হ'লে? এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া কিসের জন্যে বর্মায় যেতে চাচ্চ শুনি?

চাকরি করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল; কিন্তু আমাকে ঠকিও না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো?

সেটা বিলক্ষণ জানি; এবং কি করতে বল তুমি?

আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুশি হইল; হাসিমুখে বলিল, মেয়েমানুষে চিরকাল যা ব'লে থাকে, আমিও তাই বলি। একটা বিয়ে ক'রে সংসারী হও—সংসারধর্ম প্রতি-পালন কর।

প্রশ্ন করিলাম, সত্যি খুশি হবে তাতে?

সে মাথা নাড়িয়া, কানের দুল দুলাইয়া সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়! একশ' বার। এতে আমি সুখী হব না ত সংসারে কে হবে শুনি?

বলিলাম, তা জানিনে, কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল! বাস্তবিক এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে বিয়ে না ক'রে আমার আর উপায় নেই।

পিয়ারী আর একবার তাহার কানের স্বর্ণাভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি ত তা হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব। কিন্তু মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করব, তা বলে দিচ্চি।

আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসিমুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল, কহিল, বেশ ত, ভালই ত! স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ-দুঃখ জানিনে রাজলক্ষ্মী; যা স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্চি।

পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও—চালাকি করতে হবে না—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যে নয়; চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হল?

পড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়িনে।

তা হ'লে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।

আমি জানতেও চাইনে, বলিয়া সে ঝুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটো কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তার পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপের সম্মুখে, মেজের উপর সেই দুইখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলা বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তারপরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলেবেলা দেখেচি।

মার চিঠি পড়লে?

হাঁ, কিন্তু খুড়ীমার চিঠিতে এমন-কিছু লেখা নেই যে তোমাকে তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর থাক ভাল, না থাক ভাল, এ মেয়ে আমি কোনমতেই ঘরে আনব না।

কিরকম মেয়ে ঘরে আনতে চাও, শুনতে পাই কি?

সে আমি এখনি কি ক'রে বলব! বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হ'লে আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর একজন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক, যথাসময়ে তাই নাহয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু

এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার ক'রে দিয়ো। শ' পাঁচেক টাকা হ'লেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।

পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়ীমার কথা মিথ্যে হ'তে দেব না; একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বলচি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে—

নইলে কি?

নইলে আবার কি! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার ক'রে তবে কথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা ক'রো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সে নাহয় নাই পারব; কিন্তু তুমি বর্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম, কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, সাহস! এ কি একটা শক্ত কথা ব'লে তুমি মনে কর?

আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এই-সমস্ত বাড়িঘর, জিনিসপত্র, বিষয়-আশয় তার কি হবে?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বঙ্কুকে দিয়ে যাবো।

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অতদূরে না গেলেই কি নয়? এ-সব তোমার কি কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না?

বলিলাম, না, কোনদিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ি হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এতবড় দুর্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখনি ডাকবে, তখনি ফিরে আসব। যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী!

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে?

হাঁ, চিরদিন থাকব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না।

পিয়ারী অপলকচক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফোঁটা গাল বাহিয়া টপটপ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়; যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস ক'রো না।

পলকের জন্য দুইজনের চোখাচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।

দুই

এক-একটা কথা দেখিয়াছি সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলা পর্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেমনি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এতবড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোনমতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, চাকর-বাকরদের সামনেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বলচি আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়! একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে সে এতবড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্যামী জানেন। আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরোয়ান গাড়ির কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয়ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষা দেবে?

বলিলাম, দেব।

পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রার যে ধরন, তাতে - আচ্ছা যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা করব না—খবর দেব, বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আমার পায়ের ধূলো লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক গে, যেও না!

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ ও ঘড়ঘড় শব্দে অপরাহ্নবেলা মুখরিত হইয়া উঠিল! কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কান্নাই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

তিন

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিতে না নামিতে, এক খাঁকি-কুর্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না-আসা পর্যন্ত আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়িতে আসিতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড় রাস্তার অন্তর্বর্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁশুটে, গেরুয়া—একটু কুয়াসা করিয়াও ছিল—মনে হইল একপাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোটঘাট লইয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারা-রাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যুষে সর্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান

অধিকার করিয়া লইবে বলিয়া। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ায় যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্যন্ত এই কয়লাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নীচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার জায়গা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে; সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনর শ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকলে বসেছিলে—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগ্‌দরি হোগা।

ডগ্‌দরি পদার্থটি কি বাপু?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি।

জিনিসটা আরও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি-না-বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সংকুচিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙ্গালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্কোচে ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দর্জির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিলে বুঝাইয়া দিল যে, বর্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি কসাইখানার যাত্রীদের পর্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুনযাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এতবড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল? ক্রমশঃ 'পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি' আসন্ন হইয়া উঠিল,—সাহেবডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্তী অবস্থায় বেশি ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না, তথাপি পুরোবর্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্ধ অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য বাঙ্গালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান-বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তারসাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার-চিত্তে সেই-সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাতটা সেদিন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না। সে যাই হোক, পাস করা যখন অবশ্য কর্তব্য, তখন আর উপায় কি? যথাসময়ে চোখ বুজিয়া সর্বাঙ্গ সংকুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পাস হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণ-ক্রিয়া যে কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে কল-কারখানায় দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন

সম্মুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, মাদ্রাজী, মারহাট্টী, বাঙ্গালী, চীনা, খোট্টা, উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী সুদ্ধমাত্র পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগে ডাঙ্গা হইতে জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল; এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া এই দল স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল; আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এককোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত চক্ষের পলকে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া বাক্স-পেটরার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর-আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেচি; যদি বলেন, নীচে আনি।

বলিলাম, না; বরঞ্চ আমাকেও কোন মতে উদ্ধার ক'রে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া, তাহার সহিত হাতাহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া, পা ফেলিতে পারি এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া কম্বল ও সতরঞ্চির এক-আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিসপত্র দেখাইয়া দিয়া বকশিশ লইয়া প্রস্থান করিল। এখানেও সেই ব্যাপার--বিছানা পাতিবার জায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নির্বিষ্টচিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। স্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই-ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙ্গালী থাকে ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল-- যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, তাহা সেইখানেই দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে এতগুলা সঙ্গীতবিশারদ একসঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নীচে নামা উচিত হইবে কি না, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে না মুগ্ধ হয়, সে খুন করিতে পারে, না এমনি কি-একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কি না জানি না; না হইলে, কাবুলিয়ালা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! একপ্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিতেছিল! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি, হঠাৎ দেখি একব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক

লোকের চোখরাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগতযৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এতবড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়াভুরু আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায়, ইটি আমার পরি--

কথাটা শেষ না হতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল—পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা ব'লে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্চি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর--

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত-বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ-দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায়, দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখলেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাত-বোষ্টমীর কথাগুলা মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং শহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা শুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এ দেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই।

আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্টশান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্রপীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল!

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন-কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশভাজা বিক্রি করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙ্গার নীচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মসুরি-খেঁসারি

সব একাকার করে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ হ'ল যে-যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্তিমান নোংরা একজোড়া কাবুলিয়ালা আপাদমস্তক সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অতবড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল?

পরিবার কহিল, মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হ'লে—

নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্যি একহাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্যন্ত বলচি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিসনে—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগ্য কাবুলীকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পারিনে। ওই দেখুন ভাঙ্গা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস; এর বেশি যদি কিছু জানতে চান ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, তা যাক, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত!

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুঁটলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখাও গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাবুলী জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটিও অমনি বেঁধে দেয়! ফেলিস নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাসে আমি ত হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র-কর্কশ-শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিয়া টগর চীৎকার করিয়া উঠিল—জাত তুলে কথা ক'য়ো না বলচি মিস্তিরী—ভাল হবে না, তা বলচি—

চীৎকার-শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালোমতোই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাশা করেচি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার সুর আরও এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, কিসের তামাশা! জাত তুলে আবার তামাশা কি! মোচলমানের রুটি দিয়ে মালসা-ভোগ হবে? তোর কৈবত্তর মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্ গে—বাপের পিণ্ডি দিস্!

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—হারামজাদি, তুই বাপ তুলিস্!

টগর কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্! বলিয়াই আকর্ণ মুখব্যাদন করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে

দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া ভুলিয়া উচ্চ-কণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা ছি-ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল—সবসুদ্ধ একটা কান্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এতবড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙ্গালী নরনারীর দ্বারা এক-জাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরোয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাশা দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গালীন্ তো বহুত আচ্ছি লড়নেওয়ালী হ্যায়! হট্‌তি নাহি!

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

চার

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন্ কোন্ শর্তাদি নির্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, শর্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ক্র্যাপ-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অপরের ব্যূহ ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতাপুরুষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলাফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধগোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্তা, নীচে যাও; কাপ্তান কইচে ছাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট-পনের পরেই দেখিলাম কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেন্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানাপত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশি ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—ত। অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষকোটি হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাহাদের মুহূর্ত বিলম্ব হয় না—এ-সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির

বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে পালাইয়া বেড়াইবার আর জো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্তেন দূরবীন হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলো ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব-কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্রতরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই সাইক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ংগম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হালকা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে; পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি-একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া সুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাতজোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ-দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এতবড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এতবড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট্! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে সেই অপরিমেয় গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ংকর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ডগোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজসুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজসুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেনসাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্তে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগিগুলা বার-কতক ঝট্‌পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর-একপ্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদি বা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এইভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক্, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি-না ম্যা-ম্যা করি, মা-মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয়ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি বা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্স্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া মিস্ত্রীমশায়

সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিস্ত্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিল, মশায়, সাড়েবত্রিশভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র যে-যার কোটে ফিরে এসেচি। আজিকার মিশামিশি সাড়েবত্রিশভাজায় চলে কিনা, জানি না; কিন্তু এখন পর্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন-চারশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত অনেক দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ' লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। বমি এবং অনুরূপ আর দুটা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তারবাবু জাহাজের মেথর ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবু আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন। তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্ছে; বোধ করি একটা হ্যাঁমক পেয়েছিলেন, না?

হ্যাঁমক কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্চে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, ডাক্তারবাবু, অধমও এই নরক-কুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্বল বলিয়া এখানে ঢুকিতে পারি নাই। শুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকী রাত্রিটা ফার্স্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি কি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এমনি খুশি হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকী দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, শুধু ডেকচেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা, ক্ষুধার তাড়নে নির্জীবের মত এই কেদারাটার উপরে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্যবস্তুর চিন্তা করিতেছি—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জিদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুমশায়, একটি বাঙ্গালী মেয়েলোক আপনাকে ডাক্‌তেচে।

মেয়েলোক? বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে! কিন্তু আমাকে কেন? Trial by ordeal ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোনদিন যে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, ঘণ্টাখানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, না বাবুমশায়, বড় কাতর হয়ে ডাক্‌তেচে—

কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষ-মানুষটি কি করচে?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাক্‌তেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেক দূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল; তাহারই আড়ালে একটি বাইশ-তেইশ বছরের বাঙ্গালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাছেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপরে এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে আস্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল, কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইলাম।

সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ,

বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি; কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। আমার অন্নদাদিদির কপালও বড় ছিল—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিন্দুর ডগ্‌ডগ্‌ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা—আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙ্গাপেড়ে শাড়ি।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েচে। তবে মনে হয় ডাক্তারবাবু লোক ভাল—কিন্তু, কি প্রযোজন?

তিনি বলিলেন, ডাকলে যদি ভিজিট দিতে হয়, ত কাজ নেই, ইনি না হয় কষ্ট করে উপরেই যাবেন। বলিয়া সেই রুগ্ন লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, জাহাজের ডাক্তারকে ডাকলে বোধ করি কিছু দিতে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, এঁর হয়েচে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটি এঁর স্বামী। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ি থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখচি জ্বর খুব বেশি, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্ত-বাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক।

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, চা খান ত?

বলিলাম, হাঁ।

বিস্কুট?

তাও খাই!

আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি ক'রে?

বলিলাম, স্ত্রীলোকটি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠাবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে করেচেন?

বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, তা হলে জুটে পড়ুন, নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা; তাতে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্চে। যা হোক্, বেশি দিন টিকবে না, তা ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে যায়।

অবাক হইয়া বলিলাম, আপনি এ-সব কি বলচেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছোঁড়াটা বার ক'রে আন্‌চে, না ওকেই বার করে এনেচে, কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্তবাবু? খুব forward, না? দিব্যি কথাবার্তা কয়।

বলিলাম, এ রকম ধারণা আপনার মনে কি করে এল?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কিনা, একটা-না-একটা আছেই! গতবারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল। একবার বর্মায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখবেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।

বর্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ত্রীর খবর লইতে নীচে গেলাম। 'সপরিবার' মিস্ত্রীমশাই তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, ঐ মেয়েমানুষটি কে মশাই?

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিতেছিল—ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি?

মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশাই, মাগীর ছোট মন! কে বাঙ্গালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে—খবরটা নিতেও দোষ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সেই দুটি গো-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গন্ডা মিস্তিরি মানুষ হয়ে গেল—এখন ও আমার চোখে ধুলো দেবে? আরে, তুই ডাক্তার না বদ্যি যে, যেই একটু জল আনতে গেছি, অমনি ছুটে দেখতে গেছিস? কেন, কে ও? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি মিস্তিরি! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাবো? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব—তুই যা পারিস তা করিস। বলিয়া ফলারে মন দিল।

টগরও শুধু একটা 'আচ্ছা' বলিয়া তাহার পাগড়ি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এমনি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয় অহর্নিশ সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখতে হইবে, নাহয় যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া টগরের এই বিদ্বেষ, ডাক্তারবাবুর এমন কুৎসিত তীব্র কটাক্ষ—সে কে, এবং কি? টগর কহিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাক্তারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কান্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে; আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজী আছেন।

এমনিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অন্তর্যামী নয়, কিংবা তাহার ভ্রম-প্রমাদ কখনো হয়। সবাই কহে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জহুরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভালো ভাবিয়া নির্বোধ হওয়াতেই যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশিই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নরনারীর উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, অত্যন্ত forward, তা বটে। এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, বাড়ি বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ঔষধে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল, তথাপি এই স্ত্রীলোকটি সমস্ত আলাপ আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্‌ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব,

তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্বে বর্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনিও মাসখানেক পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করায় অভিভাবকহীন হইয়া বাপের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণীদাদাকে রাজী করিয়া বর্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না করে কোনমতে দেশের বাড়িতে পড়ে থাকলেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার কোন খোঁজ নেন না, কিছু জানেন?

না, কিছু জানিনে।

তার পূর্বে কোথায় ছিলেন, তা জানেন?

জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন; কিন্তু কত চিঠি দিয়েচি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোনদিন আমার ফিরে আসেনি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবতঃ হেতু এইমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙ্গালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্মরমণী লইয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেকে আছে, যাহারা সারাজীবন আর কখনো দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, বরং ঠিক তার উলটো। তিনি যে বেঁচে আছেন এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

খপ্ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল।

আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাবচেন, আমি জানি।

জানেন?

জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাবতে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা হোক, আমি ভয় করিনে—আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব।

তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাবছেন, আমি ঘর করতে রাজী হ'লেই ত হ'ল না; আমার সতীন রাজী হবে কি না, এই ত?

বাস্তবিক, আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, বেশ তাই যদি হয় ত কি করবেন?

এইবার অভয়ার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, সে বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু! আমার রোহিণীদাদা বড্ড সাদাসিধে ভাল মানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই করব; কিন্তু এ-সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

সে-কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখেচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন্—কেরেন্টিন্। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine. তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে, এবং সে Port Health Officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় না ক'রে আপনার আসা উচিত ছিল না; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিস নিজে কাঁধে করে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়—ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয়; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে স্টিমে ফুটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতিকার নেই, ডাক্তারবাবু?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তবে ডাক্তারসাহেব জাহাজে উঠলে একবার আপনার জন্য ব'লে দেখব, তাঁর কেরানীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজী--কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দুইজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেন্ড অফিসার ৬-৭ জন খালাসীকে এলোপাতাড়ি লাথি মারিতেছে; এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটি অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সহিত ইতিপূর্বে কোনদিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজও কলহ হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত—একদিন তোমাকে এজন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এভাবে লাথি মারা ভারি অন্যায়।

লোকটা জবাব দিল, মার ছাড়া ক্যাটল্ সিধা হয়?

ডাক্তারবাবু একটু স্বদেশী। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই কাপ্তেনসাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।

হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, Doctor, they are your countrymen; you ought to be proud of them!

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধুলো ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাক্তারবাবুর মুখের উপর দুহাতের বুড়ো আঙ্গুল-দুটা নাড়িয়া দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার ক'রে হাসচিস যে!

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ ক'রে খায়ে হাসতেচি মোরা?

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তিনি চৌকির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল।

বেলা এগারটার সময় Quarantine-এর কাছাকাছি একটা ছোট স্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাকি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমার তাড়া ছিল না, কারণ ডাক্তার-বাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ কতকটা অন্যমনস্কের মত নিরীক্ষণ করিতে-ছিলাম, হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ, আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে শহরে গিয়েই নামব।

অভয়া কহিল, না—না, শিগ্‌গির গুছিয়ে নিন।

বলিলাম, আমার এখনও ঢের সময় আছে।

অভয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতে যেতে পারবেন না।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে না।

অভয়া বলিল, তা হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও-জায়গায় যাব না। ওখানকার সব কথা শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টলটল করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন—এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনে। উঠুন, নীচে চলুন। আপনি না থাকলে ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা মেয়েমানুষ কি করব বলুন ত?

নিজের জিনিসপত্র লইয়া যখন ছোট স্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তারবাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন, ফিরুন--আপনার হুকুম হয়েচে—আপনি--

আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর একটা হুকুমে আমাকে যেতেই হচ্চে।

সহসা বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?

তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।

না না, তার দরকার নেই, আমি জানতাম। Good-bye, চললুম! বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

পাঁচ

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য—ভদ্রলোকের জন্য নয়; এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে এবং কর্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন, কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। সাহেবরা ইহাও জানেন যে, কুলির জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জাম এমন-কিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেন্টিন্ যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, তাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই। এ সকলই সত্য, তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোটঘাট সুমুখে লইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পরে মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দুরদৃষ্ট। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। তাঁহারা যে-যাহার লোটা-কম্বল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বোঝাগুলি তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া, স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিণীদাদা একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি--এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব--শুইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি বাঁচেন! অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি

এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোঁচকা-বুঁচকিগুলি! অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে! অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে; এক স্কন্ধে ভর করিয়াছেন এক নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায় নারী, অপর স্কন্ধে ঝুলিতেছেন তেমনি অপরিচিত এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ। মোটঘাটগুলা ত সব ফাউ। এই-সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এক অজানা জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি কল্পনা করিয়া পাঠক হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদবোধ হইতে পারে; হয়ত কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া মন বলিতেছিল, এতবড় গাধা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে! কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না, তবে এক-জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাঙ্গিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও এইবার চোখে পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথায় লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিবে, না, হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেচেন—মনে করবেন না যেন। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যাননি, তার নাম দান। এতবড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয়ত খুব কমই পাবেন, তা ব'লে রাখচি। কিন্তু সে কথা যাক। জিনিসপত্তর এইখানেই প'ড়ে থাক, চলুন, এঁকে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়।

বোঁচকা-বুঁচকির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি রোহিণীদাদাকে পিঠে করিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল, অন্যান্য জিনিসপত্র সেইখানেই পড়িয়া রহিল। অবশ্য সে-সকল আমাদের খোয়া যায় নাই, ঘণ্টা-দুই পরে তাহাদের আনাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাল্পনিক বিপদের চেয়ে ঢের সুসহ। প্রথম হইতেই ইহা স্মরণ থাকিলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা ছাড়া পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাটীতেও যখন বড়কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ ত মোটে কেরেন্টিন। জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরূপ বেশ forward হইতে পারে তাহা বোধ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, হয়েচে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার আমি করচি।

বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা-দুটি শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি করবেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কি কম রয়েচে? জিনিসগুলি আনতে হবে, একটা ভাল ঘর যোগাড় করে আপনাদের দুজনের বিছানা তৈরি করে দিতে হবে, রান্না করে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি হবে, তবে ত একটু বসতে পাবো। না না, মাথা খান, উঠবেন না; আমি এক্ষুনি সমস্ত ঠিকঠাক করে দিচ্চি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবচেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এ-সব যোগাড় করব কি ক'রে, না? তা বৈ কি! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে! সে আমি না আর কেউ? বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটিকয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া কেরেন্টিনের অফিস ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই একজন চাপরাসী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব-ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিসপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দুখানি খাটিয়ার উপর

দুজনের বিছানা পর্যন্ত তৈরি হইয়া গিয়াছে। একধারে নূতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা, কাঠ সমস্তই মজুত। মাদ্রাজী ডাক্তারের সঙ্গে অভয়া ভাঙ্গা হিন্দিতে কথাবার্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে নিয়ে এ বেলার মত চারটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ও বেলা তখন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন খালাসীকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইহারই অভিভাবকতায় এখানের দিনগুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয় বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভয়াতে আমি দুটো জিনিস শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা সে কোনদিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, তাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া দিত, আমরা এক-জায়গার যাত্রী মাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই—দু'দিন পরে হয়ত সারা জীবনের মধ্যেও আর কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আর এমন আনন্দের পরিশ্রমও কখনও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্যেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, এ ত সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে রোহিণীদাদারই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথা-ব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্যেই ত আপনাদের এত দুঃখ।

হয়ত খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘণ্টায় দুটা বাজিতেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আপনাদের চা তৈরি ক'রে আনি—দুটো বাজল।

মনে মনে বলিতাম, তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন, পুরুষমানুষ ত! যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝবেনই।

তার পরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমরাও সরকারি ছাড়পত্র পাইয়া আর-একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুনে যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, শহরে মোসাফিরখানায় দুই-একদিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া তবে আমি নিজের জায়গায় যাইব, এবং যেখানেই থাকি, তাহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

শহরে যেদিন পদার্পণ করিলাম, সে দিনটি ব্রহ্মবাসীদের কি একটা পর্বদিন। আর পর্বও তাহাদের লাগিয়াই আছে। দলে দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোশাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সুতরাং আনন্দ-উৎসবে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা- সকল বয়সের স্ত্রীলোকই অপূর্ব পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া, গান গাইয়া সমস্ত পথটা মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের রং অধিকাংশই খুব ফরসা; মেঘের মত চুলের বোঝা ত শতকরা নব্বুই জন রমণীর হাঁটুর নীচে পড়ে। খোপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা—ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই—দ্বিধা-সঙ্কোচলেশ-হীন—যেন ঝরনার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের দেশের তুলনায় মনে মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, এই ত চাই! এই নইলে আবার জীবন! তাহাদের সৌভাগ্যটা সহসা যেন ঈর্ষার মত বুকে বাজিল। কহিলাম, এই যে ইহারা চতুর্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছনে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্পষ্ট মনে আছে। বচসা বাধিয়াছে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া লইয়া। গাড়োয়ান আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান। সে কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা, আর তিনজন ভদ্রঘরের ব্রহ্মরমণী গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—না, পাঁচ আনা; মিনিট দুই-তিন তর্কা-

তার্কের পরেই, বলং বলং বাহুবলং। পথের ধারে একটা লোক মোটা মোটা ইক্ষুদণ্ড গাদি করিয়া বিক্রি করিতেছিল, অকস্মাৎ তিনজনেই ছুটিয়া গিয়া তিনগাছা হাতে তুলিয়া হতভাগা গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সে কি এলোপাতাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতেও পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে একে আটকায় ত ওর বাড়ি মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত তার বাড়ি মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—কিন্তু সে শুধু তামাশা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগড়ি, কোথায় গেল হাতের ছিপটি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পিয়াদা! চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল!

সবে বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে ভদ্রঘরের অবলারাও যে একটা জোয়ান-মদ্দ পুরুষমানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া লাঠিপেটা করিতে পারে—ক্রমশঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে লাগিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিংবা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিংবা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব—কিন্তু আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।

ছয়

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসায় নূতন ঘরকন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গুনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশি সময় লাগে নাই। কারণ কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কতবড় ভ্রান্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং সুদ্ধমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙ্গালী বর্মা মুল্লুকে পদার্পণ করামাত্রই পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং এখনকার মত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুটের মাথায় এক ঝাঁকা তরিতরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়াছিল—জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, ব'লে দিতে পারেন?

লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন্ নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়িকে খুঁজছেন?

বলিলাম, সে ত জানিনে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি! শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব'লে।

লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—ওঃ—মিস্তিরী। অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত দেখতে পাইনে! তখন বড়সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি। আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম! কেটে যে জোড়া দিতে পারি। তবে কি জানেন মশাই—

দেখিলাম, অজ্ঞাতে লোকটার এমন জায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, তা হলে নন্দ ব'লে কোন লোককে আপনি জানেন না।

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেঙ্গুনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্তিরী বললেন? আসচেন কোত্থেকে? বাঙ্গলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজচেন?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!

লোকটা কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি করে? আসুন আমার সঙ্গে। বরাতে করে খাচ্চে মশাই, নইলে নন্দ পাগড়ি নাকি আবার একটা মিস্তিরী। মশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, সে দেবে আপনার চাকরি ক'রে? তা সাহেবকে ব'লে দিতেও পারে একটা যোগাড় ক'রে, কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন? তা হলে আঠারো আনা পাঁচসিকে রোজ ধরতেও পারে। এর বেশি নয়!

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উমেদারিতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় যোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্র-লোকদের মেসে যান না?

কহিলাম, মেস কোথায়, সে ত চিনি না!

সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ও-বেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এত বেলায় নন্দের সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমুচ্চে। ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙ্গালে আর রক্ষে থাকবে না মশাই।

সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মধ্যে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দাঠাকুরের হোটেল রয়েচে—চান করে সেবা করে ঘুম দিয়ে বেলা পড়লে তখন দেখা যাবে। চলুন।

হরিপদর সহিত গল্প করিতে করিতে দাঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিং রুমে জন-পনর লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজীতে দুটা কথা আছে instinct এবং prejudice. কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সংস্কার। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়, কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, খাওয়া-ছোঁওয়া বস্তুটা যে instinct হিসাবে সংস্কার নয়, তাহা দাঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ প্রথম টের পাইলাম; এবং সংস্কার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে এই যে অসংখ্য জাতিভেদের শৃংখল—তাহা দুপায়ে পরিয়া ঝমঝম করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক; কিন্তু এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিস জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে-কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচার প্রচলিত নাই, তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রই বেশ দেখিতে পাওয়া যায় এই ছাপ্পান্ন পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারও যায়। কারণ জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সেও একই কথা—না খেলেও, সে ওই খাওয়াই ধরে নিতে হবে। নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। বর্মা ত তিন-চার দিনের পথ; অথচ দেখি, পনর আনা বাঙ্গালী ভদ্রলোকই—বোধ করি ব্রাহ্মণই বেশি হইবেন, কারণ এ যুগে তাঁহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে সস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ পাচক ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে হবিষ্যান্ন

পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটপাড়ার ভট্‌চাযিদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী! যাঁহারা নিতান্তই এই-সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা রুটি, ফলটা পাকড়টাও ছাড়েন না। অথচ সেই একদম নিষিদ্ধ মাংস হইতে বর্তমানে রম্ভা পর্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদাগাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড-রুমে রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই। তবে আরাম এইটুকু যে, বর্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি কোন গতিকে শাস্ত্রকারের কোর্ডিসিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয়ত আবার একটা ছোটখাটো ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক, ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্যন্তই থাক। হোটেলে যাহারা সারি সারি পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর, ওয়ার্কশপে কাজ করে। সাড়ে-দশটার ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। শহরের প্রান্তে মস্ত একটি মাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা, এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দাঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্মা আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিযাছি যে, ছোটজাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্‌ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দাঠাকুর আসিয়া আমাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন, একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থেকে আমার কাছে আহার করুন, চাকরি-বাকরি হ'লে পরে দাম চুকিয়ে দেবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেন না, একমাস থেকে এবং খেয়ে দাম না দিয়েও ত চলে যেতে পারি?

দাঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই?

বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দাঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, তবেই দেখুন! বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপ অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতেনাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকাকড়ি, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকিবার জন্য বর্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাই হোক, দাঠাকুরের কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙ্গালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া আমার খাবার জায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং রুমে বহু লোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকেও সেখানে না দিয়ে এখানে দিচ্ছ কেন?

সে কহিল, তারা যে নোয়াকাটা বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্কমেন, আমি ভদ্রলোক! হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কাটতে হবে সে ত এখনও ঠিক হয়নি। যাই হোক, আজ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়ো!

ঝি কহিল, আপনি বামুনমানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন?

ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙ্গালী বটে, কিন্তু একজন ডোম আছে।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না,

জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাল জাত; কায়েত আছে, কৈবর্ত আছে, সদ্‌গোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাতসমুদ্দুর-পারে এসে কি অত বাম্‌নাই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গাস্তান ক'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির করলেই হবে।

হয়ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারিজন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চলতি-মুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্তানটা হয়ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিত্তির কোনকালেই করে না। বিদেশের আবহাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলে মাত্র দুটি হুঁকা আছে; একটি ব্রাহ্মণের, অপরটি যাহারা ব্রাহ্মণ নয় তাহাদের। আহারাদির পর কৈবর্তের হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্মকার-মশাই স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন-দুই পরে এই কর্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না?

কর্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বৈ কি।

তবে?

ও কি আর প্রথমে ডোম ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, বলেছিল, কৈবর্ত। তার পর সব জানাজানি হয়ে গেল।

তখন তোমরা কিছু বললে না?

কি আর বলব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে বলতেই হবে। তবে লজ্জা পাবে, এইজন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হ'লে কি হ'ত?

লোকটা যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর কারও রক্ষে ছিল? তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরিনে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে আর সবাই সমান; নবশাখই বলুন আর হাড়ি-ডোমই বলুন কিছুই কারো গায়ে লেখা থাকে না; সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিটচে। আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ খায় না, গাঁজা খায় না--আচার-ব্যবহারে কার সাধ্যি বলে ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে; আর ঐ লক্ষ্মণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি একবার ব্যবহারটা? ব্যাটা দু-দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। আমরা সবাই না থাকলে এতদিন ওকে জেলে মেথরের ভাত খেতে হ'ত যে!

লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহার ডোমত্ব গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে-দেশে ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত চর লাগাইয়া তাহাদের আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর এতবড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে; এবং শুদ্ধ তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সে কথা উত্থাপন পর্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এতবড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই। যাক্‌। বহুদিন পর্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার যে অক্ষর-পরিচয় আছে এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্তে জানিয়াছে, আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজি জানি, সেই মুহূর্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজি-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাহাও সত্য; কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু এইজন্যই আমার কত সৎসঙ্কল্পই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু সে কথা আজ থাক। দেখিলাম বাঙালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল, কিন্তু আজ তাহারা আর-একভাবে পরিবর্তিত হইয়া একেবারে খাঁটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে। পুরুষদের মনে মনে হয়ত আজও একটা সাবেক জাতের স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙালী, অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী নই, বাঙালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে, শুধু বাঙালী হলেই যথেষ্ট এবং চট্টগ্রামী বাঙালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই ব্যস্। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজী হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা ভালবাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; তাহারাও বলে, আমরা বাঙালী। আবার তাহাদের বিবাহের সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান—এবার কিন্তু আর একতিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থ-ই হিন্দু এবং দুর্গা-পূজা হইতে শুরু করিয়া ষষ্ঠী-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

সাত

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল শহরের এক প্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনর-ষোল দিনের মধ্যে ওদিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ-শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও বাহির হই। ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাকরি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল! যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটি যে ঠিক তেমনি প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাঙলা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া এতবড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকী রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বাঙালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ মাস-মাহিনায় পরের চাকরি করিয়া মরণ পর্যন্ত কোনমতে হাড়-মাংসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণীবাবুরও যে সে-ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাকরি যোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবাগোবা-বেচারা-গোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্যন্ত যেন ভয় করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক, একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া

দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণীদাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নবজলধরমণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরুগম্ভীর; কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু যে! ভাল ত?

বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

যান, ভিতরে গিয়ে বসুন।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ত?

হুঁ—ভেতরে যান না। তিনি ঘরেই আছেন।

তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন।

না—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একরকম খুন হবার জো হয়েচি, দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণীদাদার মধ্যেও যে এতখানি গাম্ভীর্য এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই দুরূহ। কিন্তু ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটি কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসিমুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিলাম, চলুন না রোহিণীদা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে।

রোহিণীদা জবাব দিলেন, গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা জানেন শ্রীকান্তবাবু?

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আহ্বানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতে চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও একগ্লাস জল। গণনায় নিরূপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্বাহ্ণ হইতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণীদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন—তাই তাঁহার মরণ হইলে তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন? এতদিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও কিছু না; আপনি কেমন আছেন বলুন।

কেমন আছি সে ত নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা চাকরির যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। রোহিণীবাবু যে বলছিলেন—আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণীদা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পটপট শব্দে ঘরে ঢুকিয়া কাহারও প্রতি দৃকপাতমাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে অর্ধেকটা এবং বাকীটুকু দুই-তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গেলাসটা কাঠের মেঝের উপর ঠকাস করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—যাক, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে ক্ষিধে পেলে খেতে দেবে!

আমি অবাক হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, ক্ষিধে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে কথা কানেও তুলিলেন না—বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু অর্ধমিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

সারাদিন অফিসে খেটে খেটে ক্ষিধেয় গা-মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্তবাবু—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটুকু বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?

তাঁহার মুখের ভঙ্গিতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম, কিন্তু সেখানে লুচি-মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী বলিলেন, দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে?

আমি জিজ্ঞাসুমুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই সে ধীরে ধীরে বলিল, মাথা ধ'রে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ?

অভয়া তেমনি শান্তভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

তুচ্ছ বৈ কি?

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হতে পারে, কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি করে!

রোহিণী ফোঁস করিয়া গর্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ—এ কথা আমি বলেচি?

অভয়া বলিল, বলবে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্চো।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্চি! ওঃ তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে?

অভয়া কহিল তোমাকে ব'লে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করতে?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন! ওঁর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলুম—বাড়ি ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সক্রোধে উত্তর দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, দুটো রেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—বলিতে বলিতেই তাঁহার কান্নায় কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখ হেঁট করিল—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে ত চোখেই দেখিলাম। কিন্তু ইহার নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও সে যে ক্ষুধা এবং খাবার তৈরির ত্রুটি হইতে বহু দূরে দিয়া বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। তবে কি স্বামী-অন্বেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেরই কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে—এখন তা হলে আসি।

অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আবার কবে আসবেন?

অনেক দূরে—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুকরা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয় করবেন। আপনাকে এর বেশি আমি বলতে চাইনে। বলিয়া, আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঠিকানাটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দার সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণীদাদাকে আশেপাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্যন্ত কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চায়ের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, এবং একবাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত হস্তাক্ষর। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাহার পূর্বেকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে—আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি যে কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বার বার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশি আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে কোন একটা বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইংগিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারংবার চোখেই দেখিয়াছি; কিন্তু তার পরে? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিংবা আর কোন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা অফিসে চাকরি যোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল, জানি না—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই; লুচিও জোটে। তথাপি যে কিরকম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল, এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে, অভয়ার স্বামী লোকটি যেই হোক, এবং যেখানে যেভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উমেদারিতে লাগিয়া গেলাম; কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না।

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দাঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাতের তরকারি প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু চাকরি আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না; যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিককাল পরেও ঠিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। কাহার 'পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকরি পাবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না। এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণী-বাবুকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরিতরকারি কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম—যদিচ তাঁহার গায়ের জামাকাপড় জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ-সীমায় পৌঁছিয়াছে—তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মাথায় একটা ছাতি পর্যন্ত নাই, কিন্তু আহার্য দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিতেছেন; সেদিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই-বাছাইয়ের অবধি নাই। হাংগামা ও পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই-সব কেনাকাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র ব্যাকুল স্নেহ যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সূর্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই-সকল লইয়া তাঁহার বাড়ি পৌঁছান একান্তই চাই, কেন যে এই-সকলের মূল্য দিবার জন্য চাকরি তাঁহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং আমি পাই নাই।

ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়া একরাশ মোট হাতে লইয়া, শতচ্ছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামাকাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে। আর আমি? বস্ত্রের সামান্য মলিনতায় প্রতিপদেই যেন সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছি।

রোহিণীদা চলিয়া গেলেন—আমি তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না, এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে আমার দুচক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম, এবং নিজের মনেই বার বার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এতবড় শক্তি, এতবড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এতবড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অন্ধ সংস্কার আমার কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়—শেষ পর্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুন কাঠের প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইঁহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি বস্তুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি 'সাহেব' হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও দেখিলাম, বেশ বাঙ্গলা জানেন। কারণ কলিকাতার অফিস হইতে তিনি বদলি হইয়া বর্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাকরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর—মাহিনাও প্রায় আড়াই গুণ বেশি পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে একলক্ষ আশীর্বাদ করিয়া হাড়-বাহির-করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাত-মোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়! আমাদের হোটেলের দাঠাকুর নেহাত মিথ্যা বলেন না।

গাড়ি ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণীদা অফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক, আমার ত ছিল না। অতএব অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণীদা জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুণ্নকণ্ঠে কহিল, তোমাকে বরাবর বলচি রোহিণীদাদা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম ক'রো না, তুমি কি কিছুতেই শুনবে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশি টাকায়? দিন ত বেশ চলে যাচ্চে।

রোহিণীদার দুচক্ষু দিয়া স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্যন্ত রাখতে পারচি নে, খেটে খেটে দুবেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল! বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ত শ্রীকান্তবাবু, এঁর অন্যায়! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে বাড়ি এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নটা পর্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি অত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি, না? বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না—আমার বিধাতাপুরুষেরও ছিল কি না সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েক দিন হইল, বর্মা রেল কোম্পানির অফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড়সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে,

অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানীর চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা! আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কিনা, তাই আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছ!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই।

রোহিণীবাবু কি বলেন?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ওমুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জানব বলুন? তা ছাড়া, তিনি নিজেই বা জানবেন কি ক'রে? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই কহিল, একটা কথা। আমার জন্যে তিনি একবিন্দু দায়ী ন'ন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চীৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরি হবে?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থই অকূল-পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না সত্য, কিন্তু নারীর এতরকমের উলটা-পালটা ব্যবস্থা আমি দেখিয়াছি যে, বাহির হইতে এই দুটা চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কতবড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্তির মত মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল; কিন্তু দশহাত না যাইতেই মনে পড়িল ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ি ঢুকিতেই চোখে পড়িল —ঠিক দ্বারের সম্মুখেই অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না—তাহার এই নিগূঢ় অপরিসীম বেদনার একজন নির্বাক সাক্ষী এ জগতে বিদ্যমান রহিল।

আট

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা আসিয়া পর্যন্তই আমার মনে ছিল, কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না। তার পরে, লিখিবই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এমনি ভারী হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ-কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা দুই-তিন পরে সাহিত্যচর্চা সাঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে; কিন্তু পাছে সকালবেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাঠাইতে

লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্রনারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর-একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল, কিন্তু অভয়ার এই পরম এবং চরম সংকটের কালে যে রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, প্রশ্নটা উলটাদিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ না পাওয়ার সমস্যাই বার বার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একটিবারেও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতাপুরুষ আমার উপরেই নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন চার-পাঁচ পরে আমার একজন বর্মা কেরানী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরে নীল পেন্সিলে বড়সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট-কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরানীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ চুরির অভিযোগে সস্পেন্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী। ইহারও চার-পাঁচ পাতা-জোড়া কৈফিয়ত ছিল। বর্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাকরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরানীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরনে হ্যাট-কোট—কিন্তু যেমন পুরনো, তেমনি নোংরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড়-ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে বা ছিটকাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা—তাহার ইহকাল-পরকাল; সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সংকুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক, সে সুশ্রী এবং সে মার্জিতরুচি ভদ্রমহিলা; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা, যে-দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যুত্তরে লোকটা মিনিট-দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দোষ; তবে সে থাকায় প্রোম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনার লোক ভর্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। একবিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাকরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি? আপনার মত কর্মদক্ষ লোকের বর্মামুলুকে কাজের ভাবনা কি? রেলওয়ের চাকরি গেলে কদিনই বা আপনাকে ব'সে থাকতে হয়েছিল?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বলচেন তা নেহাত মিথ্যে বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলি-ম্যান, অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা—

আপনি কি বর্মার মেয়ে বিয়ে করেচেন নাকি?

লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেবব্যাটা রিপোর্টে লিখেচে বুঝি? এই থেকেই বুঝবেন শালার রাগ।—বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বলেচেন মশাই। আমি ত তাই সবাইকে বলি, যা

করব, তা বোল্ডলি স্বীকার করব। আমার অমন ভেতরে এক, বাইরে আর নেই। আর পুরুষমানুষ—বুঝলেন না? যা বলব, তা স্পষ্ট বলব মশাই, আমার ঢাক্-ঢাক্ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাকরি ক'রে খেতে হবে—বুঝলেন না মশাই!

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দেশে কি কেউ নেই?

লোকটা অম্লানমুখে কহিল, আজ্ঞে না, কেউ কোথাও নেই—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সুয্যিমামার দেশে আসতে পারতাম? মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে-সে ঘরের ছেলে নই, আমরাও একটা জমিদার। এখনো আমার দেশের বাড়িটার পানে চাইলে আপনার চোখ ঠিকরে যাবে। কিন্তু অল্প বয়সেই সবাই মরেহেজে গেল,—বললাম, দূর হোক গে; বিষয়-আশয় ঘরবাড়ি কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুষ্টিদের বিলিয়ে দিয়ে বর্মায় চলে এলাম।

একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অভয়াকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাকে জানলেন কি ক'রে?

বলিলাম, এমন ত হ'তে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এ অফিসে দরখাস্ত করেচে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, ওঃ—তাই বলুন। তা স্বীকার করচি, একসময় সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—

এখন?

কেউ নয়। তাকে ত্যাগ ক'রে এসেচি।

তার অপরাধ?

লোকটা বিমর্ষতার ভান করিয়া বলিল, কি জানেন, ফ্যামিলি-সিক্রেট বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হ'লাম। নইলে সাধ ক'রে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা দিয়ে মাড়ায়! আপনিই বলুন না—এ কি সোজা মনের ঘেন্না!

জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যাবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ, তেমনি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্কোচে দিল—পর হইয়াও আমি তাহা উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তার এই অপবাধের কথা আপনি আসবার সময় ত ব'লে আসেন নি! এখানে এসেও কিছুদিন যখন চিঠিপত্র এবং টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও ত লিখে জানান নি।

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট স্থূল ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এই নিন কথা! জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্রলোক, শুধু চুপিচুপি সহ্য করতেই পারি—ছোটলোকেব মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক পিটে প্রচার করতে পারিনে। থাক গে, সে-সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই—এ-সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তাহ'লে কেসটা ত আপনিই ডিস্পোজ করবেন? যাক, বাঁচা গেল, কিন্তু তাও ব'লে রাখচি, সাহেবব্যাটাকে অমনি অমনি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার পেছনে না লাগেন। আমারও মুরুব্বির জোর আছে, এটা যেন তিনি মনে বোঝেন। বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি বলি, হারামজাদাকে হেড অফিসে টেনে আনা যায় না?

আমি বলিলাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, নিন তামাশা রাখুন। বড়সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়েই এসেচি ভাবেন? তা মরুক গে, আর একবার আমার সঙ্গে লেগে যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা,

বড়সাহেবের অর্ডারটা আজই বার ক'রে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? নটার গাড়িতেই চ'লে যেতুম, রাত্তিরটা কষ্ট পেতে হ'ত না; কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ খোশামোদ জিনিসটা এম্‌নি যে, সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া বুঝিয়াও—ক্ষুণ্ণ করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উলটা কথাটা মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ বাধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, বড়সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখবেন।

এক মুহূর্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিস্‌মিস্‌ করবার নোটই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছলছল করিতে লাগিল—হাত জোড় করিয়া কহিল, বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীকে মারবেন না বাবু, ছেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলো পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরানী, দরোয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জন্যেই বর্মায় এসেচে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে, কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে—তার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন—আপনার চাকরি আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখব। না হ'লে আর আমার সঙ্গে দেখা ক'রে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে।

এই নীচপ্রকৃতির লোকগুলা যে অত্যন্ত ভীরু হয় তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল এম্‌নি সময়ে আসবেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?

সে অমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্মা-মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ; তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়া মুখ তুলিতে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে বার বার আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?

কথাটা শুনিয়া খুশি হইব কি চোখের জল ফেলিব, ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাই পুনঃপুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনদিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা সে কাহার উপর জানি না—একদিকে যেমন নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই এক নিরাশ্রয় রমণীর ততোধিক নিরুপায় প্রশ্নে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল; পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্যন্ত

পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আজ সে বেশি কথা না কহিয়া শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার পরের দিন আবার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার একছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে ব'লে কি হবে—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করুন গে, বড়সাহেব এবার মাপ করেচেন।

সে হাসিমুখে কহিল, বড়সাহেবের ভাবনা আমি আর ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি; এই বলিয়া আবার সে বলিতে শুরু করিয়া দিল—তেমনি নির্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য, এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার ধৈর্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল; না হইলে অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, শুধু বর্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে)। কিন্তু আজ রাত্রেই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে-বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলেপুলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রী-ছাঁদ, তেমনি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে পরতে দেবে, না মরলে এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল, বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনরকমে নাহয় ছিলাম; কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেছে—একবার ভেবে দেখুন দেখি ব্যাপারটা!

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন?

আজ্ঞে না, এখন প্রোমের পোস্টমাস্টার মশায়ের ওখানেই রাখব। তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশ থাকবে। কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা ঠিক ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।

অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিলে, আমিও আমার দিনের কাজে মন দিবার জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নীচেই অভয়ার লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল। তার পরে কতবার যে সেই দু-ছত্র পড়িয়াছি এবং আরো কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজপত্র কিছু দিয়ে আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে-চারিটা বাজিয়া গেছে এবং কেরানীর দল দিনের কর্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ি প্রস্থান করিয়াছে।

নয়

আবার অভয়ার স্বামীর পত্র পাইলাম। পূর্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার সে যে কি সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহাই সসম্ভ্রমে ও সবিস্তারে নিবেদন করিয়া আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে, এবং তাহার একদিকে তাহার বর্মী স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া, অন্যদিকে অভয়াকে আনিবার জন্য প্রত্যহ সাধ্যসাধনা করিতেছে; কিন্তু কোন-মতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্মিণীর এই প্রকার অবাধ্যতায় সে অতিশয় মর্মপীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা যে শুধু কলিকালের ফল, এবং সত্যযুগে যে

এরূপ ঘটিত না—বড় বড় মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত যে—দৃষ্টান্ত-সমেত তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া সে লিখিয়াছে, হায়! সে আর্য-ললনা কৈ! সে সীতা-সাবিত্রী কোথায়! যে আর্যনারী স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে চিতায় প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতেন, তাঁরা কোথায়? যে হিন্দু-মহিলা হাস্যবদনে তাহার কুষ্ঠ-গলিত স্বামীদেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী! কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ? আর কি আমরা সে-সকল চক্ষে দেখিব না? আর কি আমরা- ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুইপাতা-জোড়া বিলাপ। কিন্তু অভয়া পতিদেবতাকে এই পর্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস করিতেছে তাই নয়, সে আজ পরম বন্ধু পোস্টমাস্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে-একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্যন্ত যে ইজ্জত নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক, না বুঝিয়া হোক আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায় তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি করা হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঞ্ঝাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত।

সেই পর্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্বেই গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্বল, কত অপটু, কত অসহায় এই একটা কথাই ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরলচিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না! নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে নানা কারণে এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ-বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সতীধর্মের একটা অপূর্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা —যাহা আমার অন্নদাদিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে—আমার সে যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি সবাই অন্নদাদিদি নয়; সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত অতবড় বুকও সকল নারীতে থাকে না; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রন্থকারমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই, কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম; এবং সেই অপদার্থ, পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিণীটাকে বেশ করিয়া যে দুকথা শুনাইয়া আসিব, তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে কি হয় নাই। অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা বাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে ত, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এছাড়া আর কি, সে ত আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। ডান দিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উনুন জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বঁটি পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই; কারণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘর-দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্মাধর্ম, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দার মোড়াটার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?

সাড়া দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবু? ওঃ—বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দুজনেই চুপচাপ। আমি প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণীদা, আর কেন এখানে! চলুন আমার সংগে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্চে, তাই!

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আর কি!

তা বটে! কিন্তু এ-সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই-না তিরস্কার করিব, কতই-না সৎপরামর্শ দিব ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম, সব ভাসিয়া গেল। এতবড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি—নীতিশাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশি পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদ্বেষ! সমস্ত সাধুসঙ্কল্প যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না।

রোহিণী কহিল, সে প্রাইভেট টিউশানিটা ছাড়িয়া দিয়াছে; কারণ তাহাতে শরীর খারাপ করে। তাহার অফিসটাও ভাল নয়—বড় খাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি!

চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এই রোহিণীর মুখেই কিছুদিন পূর্বে ঠিক উলটা কথা শুনিয়াছিলাম। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আর এই রাঁধাবাড়া, অফিস থেকে ক্লান্ত হ'য়ে এসে ভারী বিরক্তিকর। কি বলেন শ্রীকান্তবাবু?

বলিব আর কি! আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ ত জানা কথা।

তথাপি সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। কল্পনার ত কেহ সীমানির্দেশ করিয়া দিতে পারে না, সুতরাং সে কথা ধরি না। কিন্তু অসম্ভব আশা যে কোনভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কয়টা কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না যে, যে হত-ভাগ্যের গৃহের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা যদি খাড়া রাখিতে না পারে, ত ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য সংসারে আর কাহারও নাই।

বাসায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল ভদ্দরলোক।

তাই আমার ঘরে!

আহারাদির পরে এই ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। বছর-চারেক পরে নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের সন্ধান মিলিয়াছে। তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য

নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মশাই, গল্পে শুনি, আগে কামরূপের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের ভেড়া ক'রে ধরে রাখত। কি জানি সেকালে তারা কি করত; কিন্তু একালে বর্মামেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে একতিল কম নয়, সে আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

আরও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোট ভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাঁধিয়া লাগিব, কথা দিলাম। কেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোট ভাইয়ের বর্মা-শ্বশুরবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বড় ভাই আড়ালে রাস্তার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোট ভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেল করিয়া প্রাতঃভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, শুধু স্ত্রী তাহার একটি ছোট বোন লইয়া এবং জন-দুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের জীবিকা বর্মা-চুরুট তৈরি করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল। আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর বন্ধু ভাবিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; কিন্তু পুরুষেরা তেমনি অলস; ঘরের কাজকর্ম হইতে শুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয়। কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনের অন্ন বাড়িতে ধ্বংস করিয়া বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে লোকে আশ্চর্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি-ছি করিয়া, ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে।

মিনিট-দশেকের মধ্যে 'বাবুসাহেব' দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ইংরাজি পোশাক, হাতে দু-তিনটা আঙটি, ঘড়ি-চেন—কাজকর্ম কিছুই করিতে হয় না—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ সচ্ছল। তাঁহার বর্মা-গৃহিণী হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট, দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু-টারু এমনি কি-একটা যেন হইবে। যাক্ গে, আমরা নাহয় তাঁকে শুধু বাবু বলিযাই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি কে।

বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, আপনি ত কলকেতিয়া, কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে ভ্রাতৃরত্নের দর্শনাভিলাষে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে বাবুটির পদধূলি পড়িল এবং উভয় ভ্রাতায় বহুক্ষণ কথাবার্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি দাদা বলিয়া ডাক দিয়া যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিসফিস মন্ত্রণা, আলাপ-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্ণে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি একদিনের জন্যেও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। দিন-চারেক পরে দাদাটি আমাকে একগাল হাসিয়া কানে কানে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ি যাইতেছেন। শুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল; জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত?

দাদা বলিলেন, আবার! রাম রাম ব'লে একবার জাহাজে চড়তে পারলে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

দাদা কহিলেন, বাপ রে! তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে! বেটির যে যেখানে আছে, রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে। বলিয়া চোখ দুটো মিটমিট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ফ্রেণ্ড লিভ মশাই, ফ্রেণ্ড লিভ—এ আর বুঝলেন না?

অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি ত তা হলে ভারী কষ্ট পাবে?

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একেবারে হাসিয়াই আকুল। কোনমতে হাসি থামিলে, বলিতে লাগিলেন, শোন কথা একবার! বর্মা-বেটিদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এঁটোকাঁটার বিচার, না আছে একটা জাতজন্ম। বেটিরা সব নেপ্পী (একপ্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ঙাপি' বলে) খায়, মশাই নেপ্পী খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নী পালায়। এ ব্যাটা-বেটীদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোটজাত ব্যাটারা—

থামুন মশাই, থামুন, আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধ'রে বাজার হালে খাওয়াচ্চে, পরাচ্চে, আর কিছু না হোক তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে!

দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে অবাক করলেন মশাই! পুরুষবাচ্চা বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে বয়সের দোষে নাহয় একটা শখ ক'রেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত আর জানতে বাকী নেই, এর না-হয় একটু জানাজানি হ'য়েই পড়েচে—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এমনি ক'রেই বেড়াতে হবে! ভাল হ'য়ে সংসার-ধর্ম ক'রে পাঁচজনের একজন হ'তে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে ঢুকে যে মুরগি পর্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না, করলে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বলচি, না মিথ্যে বলচি!

বস্তুতঃই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। অফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু অফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভেবে দেখলাম, আপনার পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি—ব'লে যাওয়াই ভালো। এ বেটিরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জাশরম, না আছে একটা ধর্মজ্ঞান! জানোয়ার বললেই ত চলে!

বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি-একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্যই ছিল। কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াই ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি, তাই তাঁকে see off করিতে জাহাজঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুইশ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিকে-ওদিকে চাহিতেই সেই বর্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ-দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙ্গা। ছোটবাবু মহা ব্যস্ত। তাঁহার দুচাকার গাড়ি লইয়া তোরঙ্গ বিছানা লইয়া, আরও কত কি যে লটবহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়ধাপ করিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহার মুহূর্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিসপত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সব ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙ্গর-তোলা চলিতে লাগিল—এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্য-সম্ভারের হেফাজত করিয়া, জায়গা ঠিক করিয়া তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময় ভাবি, ইঁহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা-ভগিনী-জননীর জাতি। তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘ কাল স্বামীর

সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে। তাহারই বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এতবড় নির্দয় বিদ্রুপ ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল! লোকটা এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের দুচক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি-সব বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশেপাশে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহবা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্মা-ভাষায় এবং বাঙ্গলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙ্গলাটা কথঞ্চিৎ মার্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়,—একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আসিব, তা আমিই জানি। ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙ্গালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙ্গলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ' টাকা তামাক কিনতে দিলি—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভরল না—অমনি তোর বাড়িটাও বিক্রি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম একটা দাঁও মারা গেল। এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না!

আশেপাশে লোকগুলা অবরুদ্ধ হাস্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাষ্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন। মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে বা।

খালাসীরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, বাবু সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেককালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন ক'রে হোক দুশ-আড়াইশ' টাকা দাম হবে—এটাই বা ছাড়ি কেন!

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। যথা লাভ! বলিয়া লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ জেটি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে! কেহ বা বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে বলিতে গেল, কি মজাটাই করলে! হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল। এমনি কত কি মন্তব্য। শুধু আমি কেবল সেই সকলের হাসি-তামাশার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে আস্তে কহিল, বাবুজী এসেছেন দিদি, ওঠো!

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আমার সান্ত্বনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, বাবুজী, বাড়ি আমার আজ খালি হইয়া গেছে। কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া ঢুকিব। একমাসের জন্য তামাক কিনিতে গেছেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব। বিদেশে না জানি কত কষ্টই হবে, কেন আমি যাইতে দিলাম। রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন আমাদের চলিতেছিল;

—কেন তবে বেশি লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে পাঠাইলাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে বাবুজী, আমি পরের মেলেই তাঁর কাছে চলিয়া যাইব। এমনি কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়া-মায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।

একটু থামিয়া আবার বার দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।

চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ির দরজা আটকাইয়া বলিল, না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা খাইয়া আসিবে চল।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ি চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবুজী, রংপুর কত দূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন জায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, মিলে বৈ কি।

সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্যবশতঃই হোক বা চক্ষুলজ্জাতেই হোক, বা হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এতবড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে, ত মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার চোখের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটি তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশি নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দাঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই-সমস্ত গোলমাল যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু-একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে-কোন নর-নারী তিন দিন একত্রে বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্বীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না। আবার বাবুটির দিক দিয়া হিন্দু আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দুসমাজ তাহাদের গ্রহণ নাহয় নাই করিল, কিন্তু আপামরসাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারা জীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করা, নাহয় এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ ধর্ম কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে ত—সে হিন্দুরই হোক, বা আর কোন জাতিরই হোক—এতবড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এই-সকল কথা নাহয় সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিব, কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনাদোষে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া, তাহাকে মুখ ভ্যাঙচাইয়া পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি, আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব, আইয়ে।

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা-বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার-দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু লজ্জার যে মূর্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দু-রকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পাপিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্মা মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এ-সব অভ্যাসমত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ-সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই।

দশ

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ-সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন ব'লে। আজ দুজনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে 'বাবু' বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরশু। কি হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

যে-সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তব্ধকঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীধর্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি যে স্ত্রী হ'য়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতদূরে এসে তাঁর শান্তিভঙ্গ করেচি,—মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্ধা পুরুষমানুষ সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ত চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই, তোমাকে বার বার চিঠি লিখে জবাব পাইনে—

তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বললেন, আজ তার জবাব দিচ্চি। এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটা আর-একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায়

আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু যে অন্ধ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল! আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং, বেশ করিয়াছ—এ কথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ—এমন কথাও মুখ্ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চ'লে আসাটা যে অন্যায় এ কথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই কিন্তুটার বিচারই ত আপনার কাছে চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন সুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইচি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার ছাড়া ত কর্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা। তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ ব'লে আমারি উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা কিন্তু পর্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে চ'লে আসাটা আমার অন্যায় হয়নি, কিন্তু—এই কিন্তুটার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এইজন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?

অভয়া কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না।

কহিলাম, তা হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চ'লে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারী মন খারাপ হ'য়ে আছে। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্মা-মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বলতে পারিনে।

কহিলাম, আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদা-দিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এঁদের কারুর স্থানই আপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদাদিদির সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিয়া চাহিয়া

দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তার পরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানিনে। এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি ব'লেই তুলনা দিতে পারলুম। তারপরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দুজনের দেখা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চির-দিনের জন্যে অমর হ'য়ে ছিল, সেইদিন তার প্রমাণ হ'য়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তার পরে?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, তার পরে এমন একদিন এসে পড়ল, যেদিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হ'ল জানেন?

জানি। তার পরে আব নেই।

অভয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই—এমনি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বলতে পারেন?

না, তাও পারিনে। তা ছাড়া আজ আমাব মন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে আছে যে, এই-সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর একদিন ভেবে দেখব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে-ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েচি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বলতে পারি; সে ভার অসহ্য হ'লেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাবলেও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী! তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেচি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া চমকিয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম, তা না হ'লে সে এত স্বচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতেই চাইত।

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার জো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে: আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েচে ব'লে আমাকেও এখন তার দরকার নেই! দেখুন, আমি নিজেও বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাইনি। তাব থেকে এই বুঝেচি, দুঃখ জিনিসটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার কথা বুঝেচি শ্রীকান্তবাবু! অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন! কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েচি আমি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল, এঁদের সঙ্গে

আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারীজন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু ক'রে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণ-দুটা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েচেন, তিনি কি তাতেই খুশি হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুশি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ব'লে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্‌নিই বটে! সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে; যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু? আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয়ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না- তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন?

ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্তবাবু?

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে কহিল, যাক, আপনারা জায়গা নাই দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথাটায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্যি হয়, তাহলে কি তারা অন্যায়-টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে, আর আপনারা ন্যায়ধর্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেচি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেচি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্চে। শুনেচি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে একঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরি হয়নি। আমরা হয়ত চোখে দেখে যেতে পাব না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্র আসবে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্মা দেশটাও একটা মুসলমান-প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত, কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার ক'রে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোন্‌টাতে সত্যকার ধর্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু?

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জানলেন কি করে? আমার ত মনে হয় না, এতবড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষ-মানুষের মধ্যেও বেশি আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা ব'লে ভাবতে ত অন্ততঃ আমি কোন মতেই পারবো না।

অভয়া ম্লানমুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাব না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়ে আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতের বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

এগার

মনোহর চক্রবর্তী বলিয়া একটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দাঠাকুরের হোটেলে একটা হরি-সংকীর্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিতেন। কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন জানিতাম না। এই মাত্র শুনিয়াছিলাম—তাঁর নাকি অনেক টাকা, এবং সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প,—জীবনে যদি উন্নতিলাভ করতে চান ত আপনাকে এমন গুটিকয়েক সৎপরামর্শ দিতে পারি, যার মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যাঁর কাছে এই উপদেশ পেয়েছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মাহিনা পেতেন; কিন্তু মরবার সময় বাড়িঘর, পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রেখে গিয়েছিলেন। বলুন ত, একি সোজা কথা! আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজের কথাটা এইখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মাহিনাপত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল—বর্মায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করচেন বলুন দেখি! ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়ে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। দেখতেই ত পান আমি কোন লোকের কথায় থাকি না; কিন্তু আমার কথা মত,

বেশি নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি; আমি বলচি আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্যন্ত করতে পারবেন।

এই সৌভাগ্যের জন্য অন্তরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ তথ্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন, জানি না; তবে কিনা, তিনি ভিতরে ভিতরে সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজমন্ত্রস্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দান-টান করার কথা ছেড়ে দিন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়—এক কোমর মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। সে কথা বলি না—নিজের মুখে রক্ত-উঠা কড়ি—আজকালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলেপুলে, পরিবারের জন্য রেখেথুয়ে তবে ত?—সে কথা ছেড়েই দিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন,—যার সংসারে দেখবেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দেবেন না। বেশি নয়, দু-চার দিন আসা-যাওয়া ক'রেই নিজে হতেই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলে দুটাকা চেয়ে বসবে। দিলে ত গেলই, তা ছাড়া বাইরের ঝগড়া ঘরে টেনে আনা! দু-দুটাকার মায়া কিছু আর সত্যই কেউ ছাড়তে পারে না—তাগাদা করতেই হয়। তখন হাঁটাহাঁটি ঝগড়াঝাঁটি,—কেন, আমার তাতে আবশ্যক কি, বলুন দেখি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্রসন্তান, তাই কথাটা চট্ ক'রে বুঝলেন; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা ব্যাটারা সাতজন্মেও বুঝবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কর্জ ক'রে আর একজনকে টাকা এনে দেবে—এই ছোটলোক ব্যাটারা এমনি আহাম্মুক!

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট ত দু ভরি সোনা এনে রেখে যাও না, দিচ্ছি দশ টাকা ধার! কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত!

তিনি বলিলেন, ঠিক নয় আবার! একশ বার ঠিক! আর দেখুন ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয়ত দু-এক ঘা নিজের গায়েই লাগবে; তা ছাড়া একপক্ষ সাক্ষী মেনে বসবে। তখন কর ছুটাছুটি আদালাতে। বরঞ্চ থেমে গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরে এসে দুটো ভালমন্দ পরামর্শ দাও, পাঁচজনের কাছে নাম হবে। কি বলেন?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না; তখ্‌খনি ব'লে বসবে, দাদা মরি—এ বিপদে দুটাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। নাহয় ত বলবে, এসো রাত্রি জাগতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভূঁয়ে আমার কিছু-একটা—মা-শীতলা না করুন, এই নাক-কান মলচি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের দুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়ে আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের! তারা কখ্‌খনো ওরূপ স্থানে যায় কি? কখ্‌খনো না। নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে ব্যস্! হয়ে গেল। তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি! তার পরে ভাল হলে আবার যেমন মেলা-মেশা, সব তেমনি। মশাই, কারুর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখনো যেতে নাই।

অফিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু-পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশি মানসিক উন্নতি হওয়া আমার সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি মনের মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব

পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই; এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই; এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ তা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবনযাত্রার কার্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন—বাঙ্গালী পিতামাতার বিরুদ্ধে এতবড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিশের সি. আই. ডি.র লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কতবড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইঁহাবই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন!

সেই অবধি অভয়ার বাড়ির দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলি মিলাইয়া লইয়া আগাগোড়া জিনিসটা জ্ঞানের দ্বারা একরকম করিয়া দেখিতে পারিতাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাঁহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না। আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ম বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ-ভোগ করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষ বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের মানদণ্ডে একদিকে যত বেশি দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর-একদিকে তত বড় সুখের বোঝা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে! তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকু স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছে মনে করিয়া নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও চতুর্গুণ আহার্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্ধ সংশয় উত্থিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখ-ভোগের কঠোরতা দেখিয়া দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না, তাহা নয়, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের ঈর্ষাকুল হইয়া উঠে; এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য, এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে, এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে,—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ি যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উলটাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক কতকগুলা দুঃখ-ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্কন্ধে ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বিধবার আচরণ বলুন,—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দুবিসর্গ সম্বন্ধ নাই। বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, তাহা আমি মানি না। বস্তুতঃ ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে-কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ, না হয় ত নাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য নাহয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ত সব শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশে সকল যুগে বিধবার চালচলনটাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে ভেবে এসেছে। ইহাই নিরর্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পণ্ড ক'রে দেবার এতবড় ছায়াবাজি আর নাই।

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুত, তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাশা করিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি ভারী forward; কিন্তু, তখন দুজনের কেহই ভাবি নাই—এই forward কথাটার অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা-কাটাকাটি করিত না—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত একরকম—কাজ আর-একরকম ছিল না বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না—কেমন একরকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হোক, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, এ কথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল,—ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এমনি একটা কুণ্ঠিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতেছিল বলিয়া, না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন শহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। হায় রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটি যন্ত্র-তন্ত্র, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই একমুহূর্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ শহরের চৌদ্দ আনা লোকই হয় চাকুরিজীবী, নাহয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পলাইবারও জো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই-সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে। 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্বেই লোকে ছুটিতে শুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কাহার যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি-একটা সামান্য কাজের জন্য সকালে বাহির হইয়াছি। শহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দু-মিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি,

মানুষের প্রত্যেক চলাফেরাটি পর্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে, আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই। আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, অনেক দিন ত আমাদের ওদিকে যাননি—আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেচি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেন্ট্রিতে ভুগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি করি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেচেন!

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কিনা চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধমকে।

একটু আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ যাঁহাদের জানা নাই যে, পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী জাতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজি কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাহারা চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দুটাকা বেশি মাহিনা দিয়া তবেই ত্রিবেদী-চতুর্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function একত্রে combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙালী বামুনদের আজিও এ কাজে রাজী করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উঁহাদেরই। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জন করিতে হিন্দুস্থানীর এক-মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। (মুরগি রাঁধাইতে আরও চার আনা, আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্থের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুস্থানীরা—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর combined hand-কে আমি কেন ধমক দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধমক শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যাণ্ডটি মনোহরবাবুর নূতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন—শুধু ডিসেন্ট্রির খাতিরে অল্পদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই, আপনি কি সহজ লোক! শহরসুদ্ধ লোক আপনার কথায় মরে বাঁচে, তা কি আর জানিনে ভাবচেন! বেশি নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ত ওর চৌদ্দ বচ্ছর জেল হয়ে যাবে, সে কি আমি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ করে শাসিত করে।

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্যন্ত শুনি নাই—তাঁহাকে, বেশি নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই, একটা লোকের চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা,—আমার এতবড় অদ্ভুত শক্তির কথা এতবড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined hand-কে শাসন করিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার।

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া এখন কাঁদ-কাঁদ হইয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়িতে 'দেও' আছে, এখানে সে কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানাপ্রকারের 'ছায়া' রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়িতে যান, ত সে অনায়াসে চাকরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে—

যে অন্ধকার ঘর তা 'ছায়া'র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

Combined hand কহিল, কোই চুহা-উহা সড়ল্ হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম।—চুহা কি রে? এ ঘরে মরে নাকি?

সে হাতটা উলটাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ায় শহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নাই; এমন ভদ্র বাড়িওয়ালাও আর নাই, এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান মেস করিয়া বাস করে, তাহারা যেমন শিষ্টশান্ত তেমনি অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন-ব্যাটাকে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না; কিন্তু কি আশ্চর্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের কুঁচকি ফুলে উঠেচে। সত্যি-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কুঁচকিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাকতে পাঠান নি কেন, শীঘ্র পাঠান।

তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়। আনলেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তা ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন প্রায় দুটাকার ধাক্কা।

বলিলাম, তা হোক, ডাকতে পাঠান।

কে যাবে মশাই? তেওয়ারী বেটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে রাঁধবেই বা কে?

আচ্ছা আমিই যাচ্ছি,—বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, ইনি আপনার কে?

বলিলাম, কেউ না। এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে?

বলিলাম, জানি না। বোধ হয় কেউ নেই।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার; কিন্তু সবচেয়ে দরকার এঁকে প্লেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাকবেন না এ ঘরে—আর দেখুন, আমাকে ফিস্‌ দেবার দরকার নেই।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি!

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, 'পিলেগ' কথাটা ভারী বুঝে।

তখন আমাকে যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইস-ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম, আমি আর তিনি—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া। এইভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা দুটা বাজিয়া গেলে, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া

যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্ণের কাছাকাছি সে ক্ষণেকের জন্য সচেতনভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিন শ গিনি আছে—স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজলেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের 'মেস'টা। তাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশি রকম নড়াচড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে-সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারটা বাজিতে চলিল, কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে; কৌতূহল-বশে সেই ছিদ্রপথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল। সুমুখের খাটের উপর দুইজন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথোলিকরা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়। সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক-দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই একমুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘণ্টা-দুই ছটফট করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল!

কিন্তু তামাশাটা এই যে, যিনি জানাশুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহারই মৃতদেহটা এবং গিনি-পোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকী রাতটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, এ কথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক, মনোহর ত ঠেলাগাড়ি চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন,—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ণ। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিংবা সত্য সত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলিব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু মনোহরের ন্যায় আইস-ব্যাগ লইয়া টানাটানি করাটা সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে দেরি হইল না। কারণ চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এতবড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধুলোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্তব্য নহে,—অশাস্ত্রীয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ সেই যে রেঙ্গুনের আর-এক প্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাপিষ্ঠা পতিতা নারী আছে,—এতদিন যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয় সে মরুক।

হয়ত তাহাতে কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ি আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

বার

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশি ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চললুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এতবড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরচে না অভয়া। এখনও গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েচে, এখনও জ্ঞান আছে—এখনও ভদ্রভাবে প্লেগ হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত করে বল, আচ্ছা যাও।

অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম তা হলে নূতন ক'রে ঘর সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হ'ল।

কিন্তু খুব সম্ভব, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন-দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

অফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন অফিসের পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র; আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময় এই শর্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমে সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, আমি মরিলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না যাহা তোমার না জানিলেই নয়, কিন্তু আমার ত তা নয়! আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এতবড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পার নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয়, যে, তুমি ভাল আছো।

আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্কুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বঙ্কুর সে ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর-একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো এসো, আমার মাথার দিব্যি রহিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়াই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সেদিন আমি এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধে একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটি নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি সুদ্ধমাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য। আজ আমার গুরুদেবের শ্রীমুখেব কথাগুলি বার বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়িতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে, গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন,

আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মন্তর নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা নেবে না? বলিলাম, আমি মহা-পাপিষ্ঠা। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, তা হলে ত আরও বেশি দরকার মা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্যি পরিচয় দিইনি দিলে এ বাড়ির যে চৌকাঠও আপনি মাড়াতে চাইতেন না। গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ি নাহয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়িতে কেন আসবো না মা?

আমি চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হতে হবে' সে কথা কি সত্য নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা। কিন্তু সে ভয় যার নাই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নেই কেন?

তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, একবাড়ির মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর-একজনকে তা স্পর্শ করে না—কেন বলতে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয়ত করে, কিন্তু যে সবল সে কাটিয়ে উঠে, যে দুর্বল সেই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটা রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটি কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে দেয়, সেই অপরাধই আর-একজন হয়ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত বিধিনিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধতে পারে না। সঙ্কোচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায়, যা অধর্ম, তা কি সবল-দুর্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায় অধর্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা, বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা হলে সংসারে সবলে-দুর্বলে কোন প্রভেদ থাকত না। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ত্রিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত অন্ততঃ এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলছে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে— তাদের কর্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।

শ্রীকান্তদা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তাঁর ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইতেছি। তাঁর কর্মের বিচার একটু সাবধানে করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত-সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে—এই নাও।

অভয়া দুই-তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপরে শতযোজন দূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজই অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, শ্রীকান্তদাদা—

বাধা দিয়া বলিলাম, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে।

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা বন্ধ ক'রো না।

অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই-সব মতলব আঁটা হচ্ছে?

কেন, আমি কি মানুষ নই?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে! রোহিণীবাবু বেচারা অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হ'য়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার ভারী ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি অসুখ ব'লে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম, আজ তা হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য নয় বটে।

অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তুমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে একবার যাও শ্রীকান্তদাদা। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে। কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার বড় প্রয়োজন। পরদিনই অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও একমাসের ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাবার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্তদাদা, একটা কথা দাও।

কি কথা দিদি?

সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে মীমাংসা করে দিতে পাবে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল?

স্বীকার করিয়া জাহাজঘাটের উদ্দেশে গাড়িতে গিয়া বসিলাম। অভয়া গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর-একবার নমস্কার করিল; বলিল, রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েচি। কিন্তু জাহাজের ওপরে কটা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো, শ্রীকান্তদাদা, আর তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে।

আচ্ছা বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার দুটি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

তের

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বংকু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়িতে অপেক্ষা করচেন। আপনি নেবে যান, আমি জিনিসপত্র নিয়ে পরে যাচ্চি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্বাদে। আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ির কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ি করে পিছনে আসিস---দুটো বাজে, এখনও ওঁর নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আমরা বাসায় চললুম। গাড়োয়ানকে যেতে বলে দে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন যে-আজ্ঞে বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয়নি ত?

না।

বড্ড অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ করেছিল বটে, বড্ড নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্চে না! বাড়ি থেকে কবে এলে?

পরশু; অভয়ার কাছে আসবার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আসতেই ত হ'তো—দুদিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল। এই হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল। এবং সংগে সংগে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে

লুকাইতে পারিলাম না। সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্চে আমাকে, রোগা?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হাঁ রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্যটন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিল—এমনি ক্লান্ত, এমনি পরিশ্রান্ত! নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু জায়গা অন্বেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ বললে না যে?

কহিলাম, নাই শুনলে!

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি। সত্যি?

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমনি অপ্রতিভ করে দাও যে—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখাদেখি ত সম্পর্ক নয় যে সেজন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই। কারণ, একে ত লোকে ও কথা বলে না, তা ছাড়া বললেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে মনে জানো যে—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি অন্তর্যামী কিনা, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েচো! আমি কখ্‌খনো ও কথা ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি করে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেমনি কি এখনো দেখতে আছি নাকি? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েচ।

রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসি-মুখখানি আমার মুগ্ধদৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ও দেশের আবহাওয়া কি সহ্য হচ্চে না?

কহিলাম, না হলে ত উপায় নেই। যেমন করে হোক সহ্য করিয়ে নিতেই হবে।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম, রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ, যে দেশের জল-বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার আশায় নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ ঘোর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ হইল না। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সে সত্যি। তা ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙ্গালী রয়েছেন। তাঁদের যখন সইচে, তখন তোমারই বা সইবে না কেন? কি বল?

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এইপ্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আঘাত করিল। তাই শুধু একটা ইঙ্গিতে সায় দিয়াই নীরব হইয়া রহিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার প্লেগের কাহিনীটা কিভাবে রাজলক্ষ্মীর শ্রুতিগোচর করিব। সুদূর প্রবাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনকার সহস্রপ্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের ভিতর কি ঝড় উঠিবে দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কিরূপ অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে, কত রঙে ভরিয়া যে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিযাছি, তাহা বলিতে পারি না। এখন সেইটাই আমাকে সবচেয়ে লজ্জায় বিঁধিল। মনে হইল, ছি ছি—ভাগ্যে কেহ কাহারো মনের খবর পায় না। নইলে—কিন্তু থাক গে সে কথা। মনে মনে বলিলাম, আর যাহাই করি সেই মরণ-বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে যাইব না।

বৌবাজারের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সিঁড়ি—তোমার ঘর তেতলায়। একটু শুয়ে পড় গে। আমি যাচ্চি। বলিয়া সে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ি হইতে আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই। একখানি দামী সূর্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্যন্ত সে কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেমনি করিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিখিবার সাজসরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখমলের চটিজুতাটি পর্যন্ত ঠিক তেমনি সযত্নে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরামচৌকি আমি সর্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি সেইভাবে জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহারি উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাঁটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহানার কাছে শুনা যাইতেছে।

স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ণ-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। কহিল, ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারি গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে দেব। বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আসব?

হাঁ, নিয়ে আয়। আর বঙ্কু বাড়ি থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস।

আমি আবার চোখ বুঁজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে বঙ্কু? একবার এদিকে আয় দিকি।

তাহার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেমনি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটু ব'স। কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ করে দরোয়ান সঙ্গে করে একবার বাজারে যা বাবা। কিচ্ছুই নেই।

দেখিলাম, এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্বে কোনদিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্যন্ত করে নাই: কিন্তু তা নাহয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বঙ্কুর সম্মুখে অবাধ দর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বঙ্কুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত আজিকার আচরণের কতই না প্রভেদ।

জিনিসপত্রর ফর্দ করিয়া বঙ্কু প্রস্থান করিল। রতনও চা ও তামাক দিয়া নীচে চলিয়া গেল। পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—আচ্ছা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশি ভালবাসে বলতে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশি ভালবাসে।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জানলে?

বলিলাম, যেমন করেই জানি, সত্যি কিনা বল ত?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক, বেশি ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই সংসারে এতবড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে এ ত তাঁর অবশ্য-কর্তব্য ছিল না। অথচ সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থ-ত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। এবং সে হিসাবে যা-কিছুই ইহার কঠিন দুঃখ, যা-কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েছে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলিনি। পুরুষমানুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। শখ ফুরালে, কিংবা হালে পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্যগণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে—এই ত বলচ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি! তার নিন্দিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে আসতে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্যাদা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত কোন মেয়েমানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।

কথাটা এদিক হইতে কোনদিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাদাসিধা চুপচাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই চক্ষের পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম, চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই। কেননা আমার বিশ্বাস, যা-কিছু পাপ, যা-কিছু অপরাধ সে তাঁর অন্তরের তেজে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ নির্মল করে দিয়েচে। তা নইলে ত আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

হীন কেন?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ! স্বামী-পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে নাকি? সে পাপ ধ্বংস করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাকলে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আগুনের কথা থাক। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, পুরুষমানুষ চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল, চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী; কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটতে পারে না। মেয়েমানুষকে সহ্য করতেই হয়। নইলে ত সংসার চলতে পারে না।

কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেয়েমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার! একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ তা হলে তুমি আগুন আগুন কি বক্‌ছিলে?

রাজলক্ষ্মী সহাস্য মুখে কহিল, কি বক্‌ছিলুম শুনবে? আজই ঘণ্টা-দুই পূর্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভয়ার চিঠি পেয়েচি। আগুনটা কি জান? সেদিন প্লেগ ব'লে যখন তাঁর সবে-পাতা সুখের ঘরকন্নার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে নির্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বলচি তাঁর আগুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাতে ছিল না। কর্তব্য ব'লে বুঝলে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে, দ্বিধায় পিছুতে দেয় না, আমি তাকেই এতক্ষণ আগুন আগুন ব'লে বকে মর-ছিলুম। আগুনের এক নাম সর্বভুক জানো না? সে সুখ-দুঃখ দুই-ই টেনে নেয়—তার বাচবিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেছেন জানো? তিনি রোহিণীবাবুকে সার্থক করে তুলতে চান। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়াই শুধু সংসারের অপরের জীবনের সার্থকতা পৌঁছাতে পারে। আর ব্যর্থ হতে শুধু একটা জীবন একাকীই ব্যর্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানা দিক দিয়ে নিষ্ফল করে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না? বলিয়া সে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তার পরে দুজনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার

মাথার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া রুক্ষ চুলগুলা নিরর্থক চিরিয়া চিরিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, তিনি খুব শিক্ষিতা, না? নইলে এত তেজ হয় না।

বলিলাম, হ্যাঁ, যথার্থ-ই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েচেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বরাবর চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম, এ লোভ তাঁর আছে নাকি? কৈ আমি ত শুনিনি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ, এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! তুমি ত বেশ!

কহিলাম, তা হলে তোমারও আছে নাকি?

যাও—বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি পশ্চিমের খোলা-জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল-দুটিতে নানাবর্ণের দ্যুতি ঝিক্‌মিক্ করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আত্মসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কেন, আমার কি ছেলেমেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েচি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেচি—একটি-দুটি নাতি-নাতনী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কুর বিয়ে ত এখনো দশ-বারদিন দেরি আছে; চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।

কহিলাম, তাও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি? রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। নাহয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘ কালব্যাপী অকাল থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন-তখন ব্যান্ডের কর্নেট এবং ব্যাগপাইপের বাঁশি বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের স্টেশনযাত্রার পথেও এমনি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে, তাহলে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না; তাহলে সৃষ্টি থাকে কি করে?

তাহার অসামান্য গাম্ভীর্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ, আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। অন্ততঃ আমাদের এ দেশে ত নেই বললেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকাই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্নার সাধ-আহ্লাদ নেই?

কহিলাম, সাধ-আহ্লাদ থাকলেই যে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে, তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই আমাকে বুঝিয়ে দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র-নির্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থদের সম্বন্ধেই, তার কারণও তুমি জানো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে কহিল, তোমার ও মত ভুল।

আমারও কেমন জিদ চাপিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুল হলেও তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বঙ্কুর বাপ যখন তোমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে মাত্র বাহাত্তরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সেদিন এখনো এত পুরানো হয়নি যে তোমার মনে নেই।

তবে নাকি সে লোকটার নেহাত পেশা বলেই রক্ষে; নইলে ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি-একটি ছেলেপুলে হতো—একবার ভেবে দেখ দেখি অবস্থাটা?

রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, ভগবান যাদের পাঠাতেন তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই, যা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এইজন্য?—এই-সব ছেলে মানুষ করতে?

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, নাহয় তিনি নাই দেখতেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হ'তো।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ সরকারী এবং বেসরকারী অফিস কোয়ার্টার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ অফিসে কেরানী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেন ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু খাদ্যসামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ী, কাহারও রুমালে বাঁধা একটু পাঁঠার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু তরিতরকারি এবং ফলমূল। সাতদিনের পরে গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলেমেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্যমত অল্প-স্বল্প মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেন ধরিবার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, কেন এঁরা সব এমনভাবে ইস্টিশনের দিকে ছুটচেন? আজ কি?

আমি ফিরিয়া চাহিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এঁরা সব অফিসের কেরানী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ি যাচ্চেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্চেন। পাড়াগাঁয়ে ত এ-সব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ছেলে-মেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্চেন, না?

আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, আঃ—ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি স্ফূর্তি—কেউ চেঁচামেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্নাঘরে দৌড়বে—বাড়িতে বাড়িতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ির জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ গা, এঁদের মাইনে কত?

বলিলাম, কেরানীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ-ত্রিশ-কুড়ি—এমনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়িতে ত এঁদের মা আছেন, ভাইবোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম, লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলিকাতার বাসাখরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ—বাঙ্গালী কেরানী-জীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

রাজলক্ষ্মীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি জান না। এঁদের বাড়িতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।

তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনাবোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এঁদের ঘরকন্নার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি এঁদের চোদ্দ-আনা লোকের কিছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, নাহয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এঁদের ছেলেমেয়েদের কথা শুনবে?

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না-না, শুনব না, শুনব না—আমি চাইনে শুনতে।

সে যে প্রাণপণে অশ্রু সংবরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া শেষে নিজের কৌতূহলের কাছে পরাজয় মানিয়া, আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলেপুলের কথা। কিন্তু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মিছিমিছি বাড়িয়ে ব'লো না। দোহাই তোমার!

তাহার মিনতি করার ভঙ্গি দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলাম না; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের সহিত বলিলাম, বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা, তুমি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তোমাকে শোনাতাম না, যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষা ক'রে ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে। অস্বীকার করলে নাস্তিক ব'লে হয়ত আবার আমাকে গালমন্দ করবে, কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব বাপ-মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই ক'রো—আমি যা জানি তাই শুধু বলব। কেমন?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তার মায়ের উপরেই থাকে ব'লে আমার মনে হয়। ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই ভারটা নেবার উপায় আছে কিনা—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ চালাকি ক'রো না—সে আমি জানি।

জানো? যাক, তা হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা নাহয় মেনেই নাও!

রাজলক্ষ্মী ম্লানমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে একফোঁটা দুধ পাবার জো নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ! বলিলাম, যাক, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানাপুকুরের জল, আর বিদেশী কৌটাভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয়ত এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্যও জোটে, কিন্তু, সে সৌভাগ্য এ-সব ঘরে বেশিদিন থাকার আইন নেই। মাস-চারেকের মধ্যেই আর একটি নূতন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, হাঁ, হাঁ, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না! তুমি তারপরে বল।

কহিলাম, তারপর ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়া জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বললুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্তি হবার মুলতুবির ফুরসতে—ঐগুলো খাঁটি দেশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সূতিকাগৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে করে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন-কতক চ্যাঁচানো।

রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাঁচানো কেন?

বলিলাম, ওটা মায়ের স্বভাব বোলে। এমন কি কেরানীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন!

বাছা রে!

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও নাহয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিকটা অগোচরেই থাকিত। বাঙ্গলার ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও নাহয় এ কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশি ক্ষতি হইত! ঠিক এমনি সময় রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক কেরানী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের ভাল। তুমি ত পাষাণ। তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখকষ্ট এমন আহ্লাদ করে বর্ণনা করচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে। বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ি পোঁছতে এঁদের আগ্রহটাও ভেবে দেখবার বিষয়।

রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমিও ত তাই বলচি! আজ বাবা আসচে বলে ছেলেপুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? ওঁদের মাইনে হয়ত কম, তেমনি বাবুয়ানিও নেই। কিন্তু, তাই বলে কি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, এত কম? কখ্‌খনো নয়। অন্ততঃ—এক শ দেড় শ টাকা, আমি নিশ্চয় বলচি।

বলিলাম, হতেও পারে। আমি হয়ত ঠিক জানিনে।

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরানীর জন্যও মাসে দেড় শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপরিও কত পান!

কহিলাম, উপরিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, তোমাকে যতই দেখচি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্ছে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো ব'লেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বেঁধো।

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাত-দুটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ি আসিয়া স্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্বাহ্ণেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম; যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতরে গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেন পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরিতরকারির পুঁটুলি এবং অন্য হাতে দাঁড়সুদ্ধ একটি মাটির পাখি লইয়া শুধু প্লাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্যভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুঙ্কার ছাড়িয়া একলম্ফে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং বঙ্কু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কানা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শশব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার বার বলিতে লাগিল, দেখতে পাইনি মা, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, যা হবার হয়েচে, আপনি শীঘ্র যান, আপনার ট্রেন ছেড়ে দিল বলে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুকরা কয়টা কুড়াইবার জন্য বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া

আসিয়া সে আর একদফা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙগা অংশগুলো সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ গেল সোমবারে বাড়ি থেকে আসবার সময় বলে দিলে, আমার জন্যে একটি পাখি-পুতুল কিনে এনো না! কিনতে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কিনা—দু আনা—তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মার-বাঁচি করে আট-আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম, কিন্তু এমনি অদেষ্ট দেখুন না যে, দোড়গোড়ায় এনে ভেঙ্গে গেল! রোগা মেয়েটার হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেঁদে বলবে, বাবা আনলে না। যা হোক টুকরোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বলব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সযত্নে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড্ড লেগেচে—আমি দেখতে পাইনি। লোকসানকে লোকসানও হ'লো, গাড়িটাও পেলুম না—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধঘন্টা আগে গিয়ে দেখতে পেতুম। বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্লাটফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বঙ্কু পাঁড়েজীকে লইয়া কি-একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেছে নাকি? কোথায় লাগল?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপি চুপি কহিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেচে—কিন্তু সে এমন জায়গায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও জো নেই, বোঝবারও জো নেই।

চৌদ্দ

শ্রীমান বঙ্কুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই-সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল, সেকেন্ড ক্লাশ ফার্স্ট ক্লাশে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত, তাও ত আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ি ছিল? কেন রেল কোম্পানীকে মিছে এতগুলো টাকা বেশি দেওয়া?

বঙ্কুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠায় বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম; কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফরমে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন?

লোকটি কহিলেন, বর্ধমান।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপিচুপি বলিল, তা হলে ত উনি অনায়াসে আমাদের গাড়িতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম, ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ করিয়া বলিল, না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথা-বার্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।

বুঝিলাম, এক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বঙ্কু এবং নিজের চাকরবাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়িতে উঠার দৃষ্টিকটুতা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙগুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিলাম, কাজ কি একটা বাজে লোককে গাড়িতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাকে জব্দ করবার এতবড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো! এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন স্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁহাকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়িতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহুল্য তাঁহাকে রাজী করাইতে ক্লেশ পাইতে হইল না, অনুরোধমাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেন গোটা-দুই স্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা স্টেশন উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি আশপাশের গ্রামগুলোর খবর পর্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাঁহাদের জন্য সে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্ধমানের কাছাকাছি আসিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া সে তাহারই মধ্যে হইতে বাছিয়া একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ি বাহির করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক হইলেন। পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না না, মা, সরলাকে আমি আসচে বারে পুতুল কিনে দেব, আপনি কাপড় রেখে দিন। তা ছাড়া এ যে বড্ড দামী কাপড় মা!

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রখানি তাহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশি দাম নয়। আর দাম যাই হোক, এখানি তার হাতে দিয়ে বলবেন, তার মাসি তাকে ভাল হ'য়ে পরতে দিয়েচে।

ভদ্রলোকের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। আধঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্বাদ করুন সে ভাল হ'য়ে উঠুক; কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তার মাসি যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত। বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একটা মাসি-পিসি থাকলে বেঁচে যেতুম মশাই। এইবার কিন্তু আপনার মেয়েটি চটপট সেরে উঠবে দেখবেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা তখন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুজনের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখদুঃখের কথা—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং যে প্রশ্ন নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা দশ-বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নূতনও নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয়ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিসটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়—সে আমিও জানি, এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যেদিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া!

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দাম আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্বস্ব দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে

নাই; আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা-বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মারিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাৎ সন্দেহ হয়, তাহারা আছে কি নাই। তাহাই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখ-দুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।

বর্ধমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কান্নাটা কার কল্যাণে হ'লো? সরলা, না তার মায়ের?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?

বলিলাম, কাজে কাজেই। মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার জো নেই। সে যাক, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল শুনতে পাইনে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে, সে শুনে তোমার লাভ নেই।

কহিলাম, লাভের আশা করিনে--শুধু লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিংবা তাহার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার বাপের জন্য ঝরাটা আমি পছন্দ করিনে।

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম, এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না, ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু সে ত হইলই না, বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ এইদিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কিন্তু বহুক্ষণ মৌন ছিলাম, কথা কহিবার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম। বলিলাম, বর্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তরই দিল না, তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দুঃখে যে কানই দাও না। এ বিলেত-ফেরতের বিদ্যা শিখলে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, বিলেত-ফেরতের উপর যে তোমার ভারি ভক্তি দেখি!

বলিলাম, হাঁ, তাঁরা ভক্তির পাত্র যে!

কেন, তারা তোমাদের করলে কি?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু পাছে কিছু করে এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ তোমাদের অন্যায়। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে—সব দিক থেকেই বার করে দিয়েচ। তবু যদি তারা তোমাদের জন্য এতটুকুও করে, তাতেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কহিলাম, আমরা ঢের বেশি কৃতজ্ঞ হতুম যদি তারা সেই রাগে পুরাপুরি মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম সমাজকে নষ্ট করছে, যারা হিন্দু বলে মনে করে, তারা হিন্দু সমাজকে ত্যক্ত করে মারছে। ওরা নিজেরা

কি, যদি তাই আগে ঠিক করে নিয়ে পরের জন্যে কাঁদতে বসতো, তাতে হয়ত ওদের নিজেদেরও মঙ্গল হ'তো, যাদের জন্য কাঁদে তাদেরও হয়ত একটু উপকার হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু আমার ত তা মনে হয় না!

বলিলাম, না হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে, সে অন্য কথা। কৈ—তার ত কোন জবাব দাও না!

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো, সে জন্যে আটকাবে না। আগে তোমার ক্ষিদে পাক, তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা করে যে-কোনও স্টেশন থেকে যা মেলে খাবার কিনে গিলতে দেবে—এই ত? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখচি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি তোমার বিশ্বাস হয়?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার উপর থাকবে না?

তা বটে! বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরের স্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের জায়গাটা চাহিয়া লইল এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া, থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল। দেখিলাম, এ বিষয়ে একবিন্দু ভুলচুক কোথাও নাই; আমি যাহা-কিছু ভালবাসি সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটি ভোজন সমাধা করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস খেগে যা—আর তোদের গাড়িতে অন্য কেউ যদি খায় দিস।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কৈ তুমি খেলে না?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, আমার ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেচে। কত বলচি, মা ইস্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই যাবি, না দাঁড়িয়ে তর্ক করবি?

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ট্রেন ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

বাধা দিয়া কহিলাম, পরে দেখব অখন। কিন্তু—

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার 'কিন্তু' গেয়ে লেকচার দিতে হবে না, আমি বুঝেচি। আমি মুসলমানকে ঘৃণাও করিনে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করিনে। করলে নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুম না।

কিন্তু নিজে খেলে না কেন?

মেয়েমানুষের খেতে নেই।

কেন?

কেন আবার কি? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।

কিন্তু পুরুষমানুষের নিষেধ নেই?

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, না। পুরুষমানুষের জন্যে আবার অত বাঁধাবাঁধি আইন-কানুন কিসের জন্যে? তারা যা ইচ্ছে খাক, যা ইচ্ছে পরুক, যেমন করে হোক সুখে থাক্, আমরা আচার পালন ক'রে গেলেই হ'লো। আমরা শত কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি! এই যে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখছিলে?

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু কষ্ট সইতে না পারাটা আমাদেরও গৌরবের কথা নয়।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, এতে তোমাদের এতটুকু অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয় যে, কষ্ট সহ্য করতে যাবে। লজ্জার কথা আমাদেরই—যদি না পারি।

কহিলাম, এ ন্যায়শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে? কাশীর গুরুদেব?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুঁকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার যা-কিছু শিক্ষা সে তোমারই কাছে। তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।

বলিলাম, তাহলে গুরুর কাছে ঠিক উলটোটাই শিখে রেখেচ। আমি কোনদিন বলিনে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই চিরদিন মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে আমাদের চেয়ে একতিল ছোট নও।

রাজলক্ষ্মীর চোখ-দুটি সহসা ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। বলিল, সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখতে পেরেচি। তোমার মত সবাই যদি এমনি করে ভাবতে পারতো, তাহলে পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুনতে পেতে। কে বড় কে ছোট, এ সমস্যাই কখনো উঠত না।

অর্থাৎ এ সত্য নির্বিচারে সবাই মেনে নিত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ্যাঁ।

আমি তখন হাসিয়া কহিলাম, ভাগ্যে পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা। কিন্তু আপনাদের এত হীন মনে করতে তোমার লজ্জা করে না?

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কিনা সন্দেহ। অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।

আমি কহিলাম, তা বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এমনি বদ্ধমূল যে, এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধ করি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়ের চেয়ে তোমরাই আজ সত্যি সত্যি ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে ক'রে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে ক'রে ছোট করে দিয়েচ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।

কথাটা অকস্মাৎ যেন নূতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি যেটুকু ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে তামাশা করেছিলে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে ত জানো না?

জানি না, তাহা স্বীকার করিতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস জানবার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাপসা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশি, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি করে, তাকে মেনে চলেই বা কি করে।

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমিই বা এত বুঝবে কি করে? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখ-দুঃখ ভোগ করোনি; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভাবতে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে, সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেমনি ভুল হয়েচে।

বলিলাম, তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের আইনে হচ্চে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি কি করে জানলে দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশি জ্ঞান নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি করে থাকবে? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে নাকি? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জানবে কোথা থেকে! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশি নিন্দে করে বেড়ায় যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল ক'রে পরের সমাজ, না জানো ভালো ক'রে নিজেদের সমাজ।

বলিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে ব'লে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাকে তামাশা করচ, তা জানি। কিন্তু তামাশা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ির গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়! অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরদের চেয়েও বেশি খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও, কিন্তু অন্য দেশের রানী ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রো না, আমি এই কথাটাই তোমাকে বলচি।

বলিলাম, তর্কশাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে ডোবাবার জো করে তুলেচ বটে, কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্চিনে, তা মানচি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিচ্ছু নেই।

বলিলাম, থাকলেও সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্চে। কিন্তু তোমার কথাটা একরকম বুঝতে পেরেচি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে জন্যেই হোক ছোট-বড় উঁচু-নীচু সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না—চায়ও না। এতে যে কত অনিষ্ট হয়েচে, সে আমিই টের পেয়েচি।

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন করে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ত আমার এই দশা। কিন্তু আগেকার কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ ইতিহাসটা ঠিক জানিনে।

সে কহিতে লাগিল, কখ্খনো ছিল না। সেখানে কখ্খনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয আজ আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি সত্যিই এত কষ্ট?

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, আমার কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ির গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট স্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে শুরু করিলে বলিলাম কি করলে তোমার বাকী জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেচি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিচ্ছু না থাকে—একেবারে নিরাশ্রয়, তা হলেই—

আবার দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে, সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েচে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেদিন অভয়ার কথা শুনেচি, সেই দিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ ত তুমি জানো না।

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে সত্যি; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক, আমার মত দুঃখ যে তারা কোনদিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি ক'রে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বলচি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আনচো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি!

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জন দিতে হবে না। কিন্তু, তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধুলোর মত ফেলে দিয়েচে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা ভুল। তুমি ঘুমোও— এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও কয়ো না। বলিয়া সে উঠিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম এবং পিয়ারীর বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এরা সব আমার ভাড়াটে।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, হাসলে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায় আমাকেই খাওয়া-পরা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়; বেঁচে থাকলে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পারো না?

আমিও হাসিয়া বলিলাম, পারি বৈ কি। এমনিধারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্নবস্ত্র যোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি!

তা ছাড়া দু-একজন আমার কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু জানলে কি ক'রে?

পিয়ারী একটুখানি শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন অসময়ে যাঁরা আমার সদ্গতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ত প্রাণ থাকতে ভোলা যায় না কিনা!

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজরে রেখেচি যাতে লোকের আর বেশি উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখতে ইচ্ছা করে রাজলক্ষ্মী!

মলে দেখো! আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরি হলে তোমাকে তুলব অখন। বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আজ যে

বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম। গুরুদেব তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সেজন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম, আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসতে চাই।

পিয়ারী বলিল, বঙ্কুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরী আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি।

একটু মুশকিলে পড়িলাম। আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়া সেখানে কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানে থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমেষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয়ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক দুর্নাম জিনিসটা এমনি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামের ভয় না ক'রে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন-রাত কাটল। ভাগ্যি সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলেনি? সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনাশুনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না।

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা, মানুষ-হিসাবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবার একটা সীমা আছে—সেটা ডিঙিয়ে যেও না।

একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, কলঙ্কই বটে! কিন্তু আমি হ'লে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোটমানুষ রাজলক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তস্বরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিইনি। সেজন্য তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না। কিন্তু ছোটমানুষ ব'লে যে তোমাকে ভাবতে পারিনি। তা হলে ত বাঁচতুম, গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্তা বন্ধ নাকি?

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, কিছু বলবে?

বলিলাম, চল প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত, যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি?

চাও না?

না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না।—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুরবেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে কি তুমি থাকতে পারো যে, এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করচ।

রাজলক্ষ্মী শান্ত-গম্ভীর মুখে বলিল, সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।

তবে ইচ্ছেটা কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও একরকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও একরকম করে তা বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি। কিন্তু--

সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু কিছুই না। কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরচি--, বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাবচে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে করচে! ছিঃ ছিঃ, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার করে তুলেচি।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বুড়োবয়সে এ-সব কি আমায় সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও। তবে পারো যদি, বর্মা যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যেয়ো। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধারও অন্তর্ধান হইল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এ-সব মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্য সত্যই কি-একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকালবেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জলখাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য হইয়াই পিয়ারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ি নাই, সাজসজ্জা করিয়া, জুড়িগাড়ি চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। জুড়ি-গাড়িই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না- তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সংবাদে বিস্বাদ হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, ঘরে আলো জ্বলিল, রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা ভয় করিতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কিনা ভাবিতেছি, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ির সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়িতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙ্গালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ি ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

পনর

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার!

রাজলক্ষ্মী শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তা হলে কি করতে?--খুন?

হাসিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অতবড় নবাবী শখ নেই। তা ছাড়া এই

বিংশ-শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর নরাধম কে আছে যে, সংসারের এই এতবড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেবে? বরঞ্চ আশীর্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘ-জীবিনী হও, তোমার রূপ ত্রিলোকজয়ী হোক, তোমার কণ্ঠ বীণানিন্দিত এবং ঐ দুটি চরণকমলের নৃত্য উর্বশী তিলোত্তমার গর্ব খর্ব করুক---আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করিয়া ধন্য হই!

পিয়ারী কহিল, এ-সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থম্। সে যাক আমি এই একটার ট্রেনে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙ্গালীর পরম তীর্থ চাকরিস্থান—অর্থাৎ বর্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে কর না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চলে যাচ্চো?

বলিলাম, পাপমুখে এখনও বলতে পারিনে। এ গোলকধাঁধাঁ যদি পার হতে পারি তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার করতে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছে? একেবারেই না। বরঞ্চ জ্ঞানে-অজ্ঞানে অত্যাচার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চলে যাবে?

হাঁ।

আমাকে বিনা-অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই। আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, শুনবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে! যাবে যাও—বলিয়া রূপ ও অলংকারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সদর-দরজায় একখানা গাড়ি থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া ক'রো—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

তা নাহয় হ'লো, কিন্তু ফিবে বঙ্কুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কখনো বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে সেইরকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা করে থাকি, তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে করবে?

বলিলাম, পিয়ারী, এগুলো যে দাসীবাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ত মানাচ্চে না!

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর পিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরক্তমুখে চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনে, তা জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজ হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিও না। আজ এমন করে তুমি চলে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা আজ তোমার-আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ করলুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেচি, দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া আর চলবে না।

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কেন?

কহিলাম, অপ্রিয় সত্য সহ্য করতে পারবে?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সংকল্প ত্যাগ করিব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের ওপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ এরকম কাজ আমি মাঝে মাঝে করবই?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙ্গে পড়বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, দেখিলাম, তাহার দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি?

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল; কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত ও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নও, ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো করতে পারো না, অপরকেও করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হ'য়ে যাবো, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? সে তুমি কেমন করে বাধা দেবে বল ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না!

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হতে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা করবার বস্তু নয় লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত।

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্বদা দেখা যায় না! যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়।

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ করে চলে যাবে?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, বর্মা যাবার পূর্বে আমি আর একবার দেখা করে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম, এ কথা আমি কখনো মানবো না। বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয়ত একটার ট্রেন ধরিতে পারি; নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

বকশিশের লোভে গাড়ি প্রাণপণে ছুটিয়া স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই পশ্চিমের ট্রেন প্ল্যাটফরম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। খবর লইয়া জানিলাম, আধঘণ্টা পরেই একটা ট্রেন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকী দিন-কয়টা কাটাইয়া দিব।

সুতরাং পশ্চিমের পরিবর্তে পূবের টিকিট কিনিয়াই আধঘণ্টা পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয় শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্নবেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়িটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘরদুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমনে ও বাস করিবার সংকল্প শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ ত সুখের কথা, আহ্লাদের কথা! এইবার একটি বিয়ে-থা করে সংসারী হ শ্রীকান্ত! আমরা দেখে চক্ষু জুড়োই।

বলিলাম, সেই জন্যেই ত এসেচি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই।

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামী-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতে-ছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, আমি বাহিরের ঘরেই নাহয় থাকব—ঘরে ঢুকিয়া দেখি এক-কোণে চুন এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, তাই ত! এগুলো দেখেশুনে কোথাও এখন সরাতে হবে দেখচি। এ ঘরটা ত ছোট নয়—ততক্ষণ না হয় এই ধারে একটা তক্তাপোশ পেতে—কি বলিস্ শ্রীকান্ত।

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত নাহয় তাই হোক।

বস্তুতঃ এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্মায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা টিপটিপ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য হইলাম না।

রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, ওটা গরম। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।

তথাস্তু। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল—বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছুই না, ওটা ম্যালোয়ারী; ওতে ভাত খাওয়া চলে।

কিন্তু আজ আর সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না, রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয়ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর

ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দডাক্তার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ি টিপিয়া, জিব দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র 'কেনা দাম'টুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল--আমার ঠাকুরদাদা আসিয়া বলিলেন, তাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক--তোমার পিসিমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন--

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা একটু মুশকিলে পড়িয়াছেন। এমনি-ভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দডাক্তার আসিয়া যথারীতি ঔষধ দিয়া তিন দিনের বাকী কেনা দামটুকু প্রার্থনা করিলেন। শয্যা হইতে কোনমতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম--মনিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দডাক্তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, আজ্ঞে না, যায়নি কিছুই।

কিন্তু তাঁহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাবিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক, তুমি আমার পর নও, দামের জন্য ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়াও পরমাত্মীয়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, এ কথা কেউ যেন না শোনে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে বোঝা যাবে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়া প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাশা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চা' এ কথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না; সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম না। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলেই যাহা হয় করিব--সম্ভবতঃ অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যন্ত্রের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়াই হোক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন, এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এমনি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সেদিন কোনদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান-দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাকপিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে দূরে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল। দেখি, কোচমানের পাশে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। গাড়োয়ান কহিল, মা, দেরি হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?

একটু দাঁড়াও, বলিয়া সে অবিচলিত ধীর পদক্ষেপেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া হাত দিয়া আমার কপালের, বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জ্বর নাই। ও-বেলায় সাতটার গাড়িতে যাওয়া চলবে কি? ঘোড়া খুলে দিতে বলব?

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, এই দুদিন জ্বরটা বন্ধ হয়েচে। কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাহয় আজ থাক। রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই; হিম লাগতে পারে, কাল সকালেই যাবে।

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন্ সাহসে? তুমি কি মনে কর তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না?

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, বেশ যা হোক! এইখানেই মানুষ হলাম, আর এখানে আমাকে চিনতে পারবে না? যে দেখবে সেই ত চিনবে।

তবে?

কি করব বল? আমার কপাল, নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?

এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই ত হ'তো।

তা কি কখনও হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই স্থির থাকতে পারি?

বলিলাম, তুমি নাহয় স্থির হলে, কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির করে তুললে। এখনি সবাই এসে পড়বে, তখন তুমিই বা মুখ দেখাবে কি করে, আর আমিই বা জবাব দেব কি!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর-একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেমনি উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল, লজ্জা-সরম আমার যা-কিছু এখন সব তুমি।

ইহার পরে আবার বলিবই বা কি, শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কুর বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

এখন কোথা থেকে আসচো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েচি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়?—পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হলে—তারপরে—

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেখানেই রেজেস্ট্রী করতে হবে। লেখাপড়া সব একরকম ক'রে রেখেই এসেচি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দানপত্র? কাকে কি দিলে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি-দুটো ত বঙ্কুকেই দিয়েচি। শুধু কাশীর বাড়িটা গুরুদেবকে

দেব ভেবেচি। আর কোম্পানীর কাগজ, গয়না-টয়নাগুলো ত আমার বুদ্ধি-বিবেচনামত একরকম ভাগ করে এসেচি, এখন শুধু তুমি বললেই—

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, তা হলে তোমার নিজের রইল কি? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হ'লো, যদি সে শেষে তোমাকেই খেতে না দেয়?

আমি কি তাই চাইচি নাকি? নিজের সমস্ত দান ক'রে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো? তুমি ত বেশ!

অধৈর্য আর সংবরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলাম, হরিশ্চন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে? খাবে কি? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হতে যাবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমাকে এ বুদ্ধি যে দিয়েচে, সেই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাববে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম ক'রো না—স্থির হয়ে শোও।

স্থির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্যকর-রঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি অপরূপ শোভায় সৌন্দর্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা দ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নেই।

এই নির্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল বোধ করি কেহই হিসাব করি নাই, সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম। এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুরদাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরদা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন খবরটা তাঁহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ি করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেই জন্যেই বোধ হয় এখন পর্যন্ত বাড়ির মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুরদা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্চে এ'কে কোথায় দেখেচি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমেষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যেই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটি চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

শ্রীকান্ত

তৃতীয় পর্ব

এক

একদিন যে ভ্রমণকাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদ্ঘাটিত করিবার আর আমার প্রবৃত্তি ছিল না। আমার সেই পল্লীগ্রামের যিনি ঠাকুরদাদা তিনি যখন আমার সেই নাটকীয় উক্তির প্রত্যুত্তরে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন এবং রাজলক্ষ্মীর ভূমিষ্ঠ প্রণামের প্রত্যুত্তরে শুধু যেভাবে শশব্যস্তে দুই পা হটিয়া গিয়া বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেশ বেশ—বেঁচেবর্তে থাকো! বলিয়া সকৌতুকে ডাক্তারটিকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন রাজলক্ষ্মীর মুখের যে ছবি দেখিয়াছিলাম সে ভুলিবার বস্তু নয়, ভুলিও নাই; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম সে আমারই একান্ত আমার—বহির্জগতে তাহার যেন কোন প্রকাশ কোনদিনই না থাকে—কিন্তু এখন ভাবিতেছি, এ ভালই হইল যে, সেই বহুদিবসের রুদ্ধ দুয়ার আবার আমাকে আসিয়াই খুলিতে হইল। যে অজানা রহস্যের উদ্দেশে বাহিরের ক্রুদ্ধ সংশয় অবিচারের রূপ ধরিয়া নিরন্তর ধাক্কা দিতেছে—এ ভালই হইল যে, সেই অবরুদ্ধ দ্বার নিজের হাতেই অর্গলমুক্ত করিবার অবকাশ পাইলাম।

ঠাকুরদাদা চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপরে মুখ তুলিয়া একটুখানি নিষ্ফল হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে আমি তাঁকে ছুঁয়ে ফেলতুম না; কিন্তু কেন তুমি ও কথা বলতে গেলে? তার ত কোন দরকার ছিল না! এ শুধু—

বাস্তবিক এ শুধুই কেবল আপনাদের আপনি অপমান করিলাম। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাজারের বাইজী অপেক্ষা বিধবা-বিবাহের পত্নী যে ইঁহাদের কাছে উচ্চ আসন পায় না—সুতরাং নীচেই নামিলাম, কাহাকেও এতটুকু তুলিতে পারিলাম না, এই কথাটাই বলিতে গিয়া রাজলক্ষ্মী আর শেষ করিতে পারিল না।

সমস্তই বুঝিলাম। আর এই অবমানিতার সম্মুখে বড় কথার আস্ফালন করিয়া কথা বাড়াইতে প্রবৃত্তি হইল না। যেমন নিঃশব্দে পড়িয়াছিলাম, তেমনি নীরবেই পড়িয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর একটা কথাও কহিল না, ঠিক যেন আপনার ভাবনার মধ্যে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল; তার পরে সহসা অত্যন্ত কাছে কোথাও ডাক শুনিয়া যেন চমক ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রতনকে ডাকিয়া কহিল, গাড়িটা শীগ্‌গির ঠিক করতে বলে দে রতন, নইলে সেই রাত্রি এগারটার ট্রেনে আবার যেতে হবে। কিন্তু সে হলে কিছুতেই চলবে না—ভারি হিম লাগবে।

মিনিট-দশেকের মধ্যেই রতন আমার ব্যাগটা লইয়া গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিল এবং আমার শোবার বিছানাটা বাঁধিয়া লইবার ইঙ্গিত জানাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে আর আমি একটা কথাও কহি নাই, এখনও কোন প্রশ্ন করিলাম না। কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

দিনকয়েক পূর্বেই এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আজ আবার তেমনি এক সায়াহ্নবেলায় নীরবে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলাম। সেদিনও কেহ আদর করিয়া গ্রহণ করে নাই, আজিও কেহ সস্নেহে বিদায় দিতে অগ্রসর হইয়া আসিল না। সেদিনও এমনিই ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমনিই বসু-মল্লিকদের গোপাল-মন্দির হইতে আরতির কাঁসরঘণ্টার রব অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। তথাপি সেদিনের সঙ্গে আজিকার প্রভেদটা যে কত বড়, সে কেবল আকাশের দেবতারাই দেখিতে লাগিলেন।

বাঙ্গলার এক নগণ্য পল্লীর জীর্ণ ভগ্ন গৃহের প্রতি মমতা আমার কোনকালেই ছিল না, ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়াকেও ইতিপূর্বে আমি ক্ষতিকর বলিয়া কোনদিনই বিবেচনা করি নাই; কিন্তু আজ যখন নিতান্ত অনাদরের মধ্য দিয়াই এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কোনদিন কোন ছলে ইহাতে আবার কখনো প্রবেশ করিব তাহার কল্পনা পর্যন্ত যখন মনে স্থান দিতে পারিলাম না, তখনই এই অস্বাস্থ্যকর সামান্য গ্রামখানি একেবারে সকল দিক দিয়া আমার চোখের উপর অসামান্য হইয়া দেখা দিল; এবং যে গৃহ হইতে এইমাত্র নির্বাসিত হইয়া আসিলাম, আমার সেই পিতৃ-পিতামহের জীর্ণ মলিন আবাস-খানির প্রতি আজ যেন আর লোভের অবধি রহিল না।

রাজলক্ষ্মী নীরবে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখের আসনটি গ্রহণ করিল এবং বোধ হয় কদাচিৎ কোন পরিচিত পথিকের অশোভন কৌতূহল হইতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতেই গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রেলস্টেশনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথের দুই ধারে যদৃচ্ছা-বর্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতবন সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া গাড়ি যখন অত্যন্ত সাবধানে অত্যন্ত মন্থর গমনে চলিতে লাগিল, আমি তখন দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন আমার পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথই বরযাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে-পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধূবেশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলাবালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম। তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।

দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধূলাবালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহুকোটি অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায়, তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কিনা জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী তেমনি স্থির হইয়া আছে। আঁধার কোণের মধ্যে তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অনুভব করিলাম সে চোখ মুদিয়া যেন চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেছে। মনে মনে বলিলাম তাই যাক। আজ হইতে নিজের চিন্তা-তরণীর হালখানা যখন তাহারই হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন এই অজানা নদীর কোথায় ঘূর্ণী, কোথায় চড়া, সে-ই খুঁজিয়া বাহির করুক!

এ জীবনে নিজের মনটাকে আমি নানা দিকে নানা অবস্থায় যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ধাতটা আমি চিনি। অত্যন্ত কিছুই ইহার সহে না। অত্যন্ত সুখ, অত্যন্ত স্বাস্থ্য, অত্যন্ত ভাল থাকা ইহাকে চিরদিন পীড়িত করে। কেহ অত্যন্ত ভালবাসিতেছে জানিবামাত্রই যে মন অহরহ পালাই পালাই করে, সে মন যে আজ কত দুঃখে হাল ছাড়িয়াছে, তাহা এ মনের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কে জানিবে!

বাহিরের কালো আকাশের প্রতি একবার দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম, ভিতরের অদৃশ্যপ্রায় নিশ্চল প্রতিমার দিকেও একবার চক্ষু ফিরাইলাম, তাহার পরে জোড়হাতে আবার যে কাহাকে নমস্কার করিলাম জানি না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম, ইহার আকর্ষণের দুঃসহ বেগ আমার নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছে—বহুবার বহু পথে পলাইয়াছি, কিন্তু গোলকধাঁধার মত সকল পথই যখন বারংবার আমাকে ইহারই হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন আর আমি বিদ্রোহ করিব না—এইবার আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলাম। এতকাল জীবনটাকে নিজের হাতে রাখিয়াই বা কি পাইয়াছি? কতটুকু সার্থক করিয়াছি? তবে, আজ যদি সে এমন হাতেই পড়িয়া থাকে যে নিজের জীবনটাকে এমন আকণ্ঠ-মগ্ন পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারিয়াছে, সে কিছুতেই আর একটা জীবনকে তাহারই মধ্যে আবার ডুবাইয়া দিবে না।

কিন্তু এ-সকল ত গেল আমার নিজের পক্ষ হইতে; কিন্তু অন্য পক্ষের আচরণ ঠিক আবার সেই পূর্বেকার মত শুরু হইল। সমস্ত পথের মধ্যে একটাও কথা হইল না, এমন কি স্টেশনে পৌঁছিয়াও কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। অল্প সময়েই কলিকাতা যাইবার গাড়ির ঘণ্টা পড়িল, কিন্তু রতন টিকিট-কেনার কাজ ফেলিয়া যাত্রিশালার ক্ষুদ্র এককোণে আমার জন্য শয্যারচনায় প্রবৃত্ত হইল। অতএব বুঝা গেল এদিকে নয়, আমাদিগকে সেই ভোরের ট্রেনে পশ্চিমে রওনা হইতে হইবে। কিন্তু সেটা পাটনায় কিংবা কাশীতে কিংবা আর কোথাও, তাহা জানা না গেলেও এটা বেশ বুঝা গেল, এ-বিষয়ে আমার মতামত একেবারেই অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী অন্যত্র চাহিয়া অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়া ছিল। রতন হাতের কাজ শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, মা, খবর পেলাম একটু এগিয়ে গেলে ভাল খাবার সব রকমই পাওয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া কয়েকটা টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল, বেশ ত, তাই যা না। কিন্তু দুধটা একটু দেখেশুনে নিস্, বাসী-টাসি আনিস নে যেন।

রতন কহিল, মা, তোমার নিজের জন্যে কিছু—

না, আমার জন্যে চাইনে।

এই 'না' যে কিরূপ তাহা আমরা সবাই জানি এবং সকলের চেয়ে বেশি জানে বোধ হয় রতন নিজে। তবুও সে বার-দুই পা ঘষিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কাল থেকেই ত একরকম—

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কহিল, তুই কি শুনতে পাস্‌নে রতন? কালা হয়েচিস্?

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রতন চলিয়া গেল। কারণ, ইহার পরেও তর্ক করিতে পারে এমন প্রবল পক্ষ ত আমি কাহাকেও দেখি না। আর প্রয়োজনই বা কি? রাজলক্ষ্মী মুখে স্বীকার না করিলেও আমি জানি রেলগাড়িতে বা রেলের সম্পর্কিত কাহারও হাতে কিছু খাইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। নিরর্থক কঠোর উপবাস করিতে ইহার জোড়া কোথাও দেখি নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কতদিন কত জিনিস ইহার বাটীতে আসিতে দেখিয়াছি, দাসী-চাকরে খাইয়াছে, দরিদ্র প্রতিবেশীর ঘরে বিতরিত হইয়াছে, পচিয়া নষ্ট হইয়া ফেলা গিয়াছে; কিন্তু এ-সকল যাহার জন্য সে মুখেও দিত না। জিজ্ঞাসা করিলে, তামাশা করিলে, হাসিয়া বলিত, হাঁ আমার আবার আচার! আমার আবার খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার! আমি ত সব খাই!

আচ্ছা, চোখের সামনে তার পরীক্ষা দাও?

পরীক্ষা? এখন? ওরে বাস রে! তা হলে আর বাঁচতে হবে! এই বলিয়া সে না-বাঁচিবার কোন কারণ না দেখাইয়াই অত্যন্ত জরুরি গৃহকর্মের অছিলায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সে মাছ-মাংস দুধ-ঘি খায় না আমি ক্রমশঃ জানিয়াছিলাম, কিন্তু এই না-খাওয়াটাই তাহার পক্ষে এত অশোভন এত লজ্জার যে, ইহার উল্লেখেই সে যে লজ্জায় কোথায় পলাইবে খুঁজিয়া পাইত না। তাই সহজে আর খাওয়া লইয়া অনুরোধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। রতন ম্লানমুখে চলিয়া গেল, তখনও কথা কহিলাম না; খানিক পরে ঘটিতে গরম দুধ এবং ঠোঙ্গায় মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী আমার জন্য দুধ ও কিছু

খাবার রাখিয়া রতনের হাতেই যখন সমস্তটা তুলিয়া দিল, তখনও কিছু বলিলাম না, এবং রতনের করুণ চক্ষের নীরব মিনতিও স্পষ্ট বুঝিয়া তেমনই নির্বাক্ রহিলাম।

আজ কারণে-অকারণে কথায় কথায় তাহার না-খাওয়াটাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। কিন্তু একদিন ঠিক এরূপ ছিল না। তখন উপহাস পরিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন কটাক্ষও কম করি নাই। কিন্তু যত দিন গিয়াছে, ইহার আর একটা দিকও ভাবিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছি। রতন চলিয়া গেলে আমার সেই কথাগুলাই আবার মনে পড়িতে লাগিল।

কবে, এবং কি ভাবিয়া যে সে এই কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল আমি জানি না। তখনও আমি ইহার জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়ি নাই। কিন্তু প্রথম যখন সে অপর্যাপ্ত আহার্য-বস্তুর মাঝখানে বসিয়া স্বেচ্ছায় দিনের পর দিন গোপনে নিঃশব্দে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছিল, সে কত কঠিন! কিরূপ দুঃসাধ্য! কলুষ ও সর্ববিধ আবিলতার কেন্দ্র হইতে আপনাকে এই তপস্যার পথে অগ্রসর করিতে কতই না সে নীরবে সহিয়াছে! আজ এ বস্তু তাহার পক্ষে এমন সহজ এমন স্বাভাবিক যে, আমাদের চক্ষে পর্যন্ত ইহার গুরুত্ব নাই, বিশেষত্ব নাই—ইহার মূল্য যে কি তাহাও ঠিক জানি না, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে, তাহার এই কঠিন সাধনার সবটুকুই কি একেবারে বিফল, একেবারে পণ্ডশ্রম হইয়া গেছে? আপনাকে বঞ্চিত করিবার এই যে শিক্ষা, এই যে অভ্যাস, এই যে পাইয়া ত্যাগ করিবার শক্তি, এ যদি না জীবনের মধ্যে তাহার অলক্ষ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিতে পাইত, আজ কি এমনি স্বচ্ছন্দে, এমনি অবলীলাক্রমে সে আপনাকে সর্বপ্রকারে ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিত? কোথাও কি কোন বন্ধনেই টান ধরিত না? সে ভালবাসিয়াছে। এমন কত লোকেই ত ভালবাসে, কিন্তু সর্বত্যাগের দ্বারা তাহাকে এমন নিষ্পাপ, এমন একান্ত করিয়া লওয়া কি সংসারে এতই সুলভ?

যাত্রিশালায় আর কোন লোক ছিল না, রতনও বোধ করি কোথাও একটু অন্তরাল খুঁজিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম, একটা মিটমিটে আলোর নীচে রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিল; কহিল, তুমি ঘুমোও নি?

না, কিন্তু এই ধুলোবালির উপর একলাটি চুপচাপ না থেকে আমার বিছানায় গিয়ে বসবে চল। এই বলিয়া তাহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম; কিন্তু নিজের কাছে আনিয়া আর কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল আস্তে আস্তে তাহার একটা হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এমনি গেল। আমার সন্দেহ যে অমূলক নয়, সে কেবল হঠাৎ তাহার চোখের কোণে হাত দিয়া অনুভব করিলাম। ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই রাজলক্ষ্মী আমার প্রসারিত পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চাপিয়া রহিল, কোনমতেই তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে পারিলাম না।

আবার তেমনি নীরবে সময় কাটিতে লাগিল। সহসা একসময় বলিয়া উঠিলাম, একটা কথা এখনো তোমাকে জানানো হয়নি লক্ষ্মী!

সে চুপিচুপি কহিল কি কথা?

ইহাই বলিতে গিয়া সংস্কারবশে প্রথমটা একটু বাধিল, কিন্তু থামিলাম না; কহিলাম, আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিলাম, এর ভাল-মন্দর ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার।

বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেই স্তিমিত আলোকে সে আমার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব? তুমি বাঁয়া-তবলা বাজাতে পারবে না, সারেঙ্গী বাজাতেও পারবে না। আর—

বলিলাম, আরটা কি? পান-তামাক যোগান? না, সেটা কিছুতেই পেরে উঠব না।

কিন্তু আগের দুটো?

বলিলাম, ভরসা দিলে পারতেও পারি। বলিয়া নিজেও একটু হাসিলাম।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি পারো?

বলিলাম, আশা করতে ত দোষ নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। তার পরে নিঃশব্দ-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, দ্যাখ, মাঝে মাঝে তাই যেন আমার মনে হ'ত; আবার ভাবতাম, যে মানুষ নিষ্ঠুরের মত বন্দুক নিয়ে কেবল জানোয়ার মেরে বেড়াতেই ভালবাসে, সে এর কি ধার ধারে? এর ভেতরের এতবড় বেদনাকে অনুভব করাই কি তার সাধ্য! বরঞ্চ শিকার করার মত আঘাত দিতে পারাতেই যেন তার বড় আনন্দ। তোমার দেওয়া অনেক দুঃখই কেবল এই ভেবে আমি সইতে পেরেছি।

এবার চুপ করিয়া থাকার পালা আমার। তাহার অভিযোগের মূলে যুক্তি লইয়া বিচার চলিতেও পারিত, সাফাই দিবার নজিরেরও হয়ত অভাব হইত না, কিন্তু সমস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইল। তাহার সত্য অনুভূতির কাছে মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল। কথাটাকে সে ঠিকমত বলিতেও পারে নাই, কিন্তু সঙ্গীতের যে অন্তরতম মূর্তিটি কেবল ব্যথার ভিতর দিয়াই কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, সেই করুণায় অভিষিক্ত সদাজাগ্রত চৈতন্যই যেন রাজলক্ষ্মীর ঐ দুটো কথার ইঙ্গিতে রূপ ধরিয়া দেখা দিল, এবং তাহার সংযম, তাহার ত্যাগ, তাহার হৃদয়ের শুচিতা আবার একবার যেন আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দিল।

তথাপি একটা কথা তাহাকে বলিতেও পারিতাম। বলিতে পারিতাম, মানুষের একান্ত বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলো যে কি করিয়া একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে সে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। না হইলে আমি স্বহস্তে জীবহত্যা করিতে পারি, এতবড় পরমাশ্চর্য নিজের কাছে আর আমার কি আছে? যে একটা পিপীলিকার মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারে না, রক্তমাখা যূপকাষ্ঠের চেহারা যাহার আহার-নিদ্রা কিছুদিনের মত ঘুচাইয়া দিতে পারে, যে পাড়ার অনাথ আশ্রয়হীন কুকুর-বেড়ালের জন্য ছেলেবেলায় কতদিন নিঃশব্দে উপবাস করিয়াছে - তাহার বনের পশু, গাছের পাখির প্রতি লক্ষ্য যে কি করিয়া স্থির হয়, এ ত কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। আর, এ কি শুধু কেবল আমিই এমনি? যে রাজলক্ষ্মীর অন্তর-বাহির আমার কাছে আজ আলোর ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে, সে কেমন করিয়া এতদিন বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া পিয়ারীর জীবন যাপন করিতে পারিল!

এই কথাটাই মনে আনিয়াও মুখে আনিতে পারিলাম না। কেবল তাহাকে ব্যথা দিব না বলিয়াই নয়, ভাবিলাম কি হইবে বলিয়া? দেব ও দানবে অনুক্ষণ কাঁধ মিলাইয়া মানুষকে যে কোথায় কোন্ ঠিকানায় অবিশ্রাম বহিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কি আমি জানি? কি করিয়া যে ভোগী একদিনে ত্যাগী হইয়া বাহির হইয়া যায়, নির্মম নিষ্ঠুর একমুহূর্তে করুণায় গলিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এ রহস্যের কতটুকু সন্ধান পাই! কোন্ নিভৃত কন্দরে যে মানবাত্মার গোপন সাধনা অকস্মাৎ একদিন সিদ্ধিতে ফুটিয়া উঠে তাহার কি সংবাদ রাখি? ক্ষীণ আলোকে রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলাম, এ যদি আমার ব্যথা দিবার শক্তিটাকেই কেবল দেখিতে পাইয়া থাকে এবং ব্যথা গ্রহণ করিবার অক্ষমতাকে স্নেহের প্রশ্রয়ে এতদিন ক্ষমা করিয়াই চলিয়া থাকে ত অভিমান করিবার আমার কি-ই বা আছে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

বলিলাম, তবু ত এ নিষ্ঠুরের জন্যই সর্বত্যাগ করলে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, সর্বত্যাগ আর কই? নিজেকে ত তুমি নিঃস্বত্ব হয়েই আজ আমাকে দিয়ে দিলে, সে ত আর চাইনে বলে ত্যাগ করতে পারলাম না।

বলিলাম, হাঁ, নিঃস্বত্ব হয়েই দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে ত তুমি আপনি দেখতে পাবে না - তাই, সে উল্লেখ আমি করবো না।

দুই

বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া আমাকে যে বেশ শক্ত করিয়াই ধরিয়াছিল তাহা পশ্চিমের শহরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই বুঝা গেল। পাটনা স্টেশন হইতে রাজলক্ষ্মীর বাড়িতে আমি

অনেকটা অচেতন অবস্থাতেই নীত হইলাম। ইহার পরের মাসটা আমাকে জ্বর, ডাক্তার এবং রাজলক্ষ্মী প্রায় অনুক্ষণ ঘেরিয়া রহিল।

জ্বর যখন ছাড়িল, তখন ডাক্তারবাবু বেশ স্পষ্ট করিয়াই গৃহস্বামিনীকে জানাইয়া দিলেন যে, যদিও এই শহরটা পশ্চিমেরই অন্তর্গত এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়াও খ্যাতি আছে, তথাপি তাঁহার পরামর্শ এই যে, রোগীকে অচিরে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক।

আবার একবার বাঁধা-ছাঁদা শুরু হইয়া গেল, কিন্তু এবার কিছু ঘটা করিয়া। রতনকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এবার কোথায় যাওয়া হবে রতন?

দেখিলাম, এই নব-অভিযানের সে একেবারেই বিরুদ্ধে। সে খোলা দরজার প্রতি নজর রাখিয়া আভাসে ইঙ্গিতে এবং ফিসফিস করিয়া যাহা কহিল তাহাতে আমি যেন দমিয়া গেলাম। রতন কহিল, বীরভূম জেলার এই ছোট গ্রামখানির নাম গঙ্গামাটি। ইহার পত্তনি যখন কেনা হয় তখন সে একবার মাত্র মোক্তারজী কিষণলালের সহিত সেখানে গিয়াছিল। মা নিজে কখনও যান নাই—একবার গেলে পলাইয়া আসিতে পথ পাইবেন না। গ্রামে ভদ্রপরিবার নাই বলিলেই হয়,—কেবল ছোটজাতে ভরা,—তাদের না ছোঁয়া যায়, না আসে তারা কোন কাজে।

রাজলক্ষ্মী কেন যে এই-সব ছোটজাতির মধ্যে গিয়া বাস করিতে চাহিতেছে, তাহার হেতু যেন কতকটা বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গামাটি বীরভূমের কোথায়?

রতন জানাইল, সাঁইথিয়া না কি এমনি একটা ইস্টিসান হইতে প্রায় দশ-বারো ক্রোশ গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। পথ যেমন দুর্গম, তেমনি ভয়ানক। চারিদিকে মাঠ আর মাঠ। তাতে না হয় ফসল, না আছে একফোঁটা জল। কাঁকুরে মাটি, কোথাও রাঙ্গা, আবার কোথাও যেন পুড়িয়া কালো হইয়া আছে। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আমাকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ কহিল, বাবু, মানুষে যে সেখানে কি সুখে থাকে আমি ত ভেবে পাইনে। আর যারা এই-সব সোনার জায়গা ছেড়ে সে-দেশে যেতে চায় তাদের আর কি বলবো!

মনে মনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিলাম। এই-সকল সোনার স্থান ত্যাগ করিয়া কেন যে সেই মরুভূমির মধ্যে নির্বান্ধব ছোটলোকের দেশে রাজলক্ষ্মী আমাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহা ইহাকে বলাও যায় না, বুঝানও চলে না।

শেষে বলিলাম, বোধ হয় আমার অসুখের জন্যই যেতে হচ্ছে রতন। এখানে থাকলে ভাল হবার আশা কম, এ ভয় সব ডাক্তারেই দেখাচ্ছেন।

রতন বলিল, কিন্তু অসুখ কি কারও হয় না বাবু? সারাবার জন্যে কি তাদের সব ঐ গঙ্গামাটিতেই যেতে হয়?

মনে মনে বলিলাম, জানি না তাহাদের সব কোন্ মাটিতে যাইতে হয়। হয়ত তাহাদের পীড়া সোজা, হয়ত তাহাদের সাধারণ মাটির উপরেই সারে। কিন্তু আমাদের ব্যাধি সহজও নয়, সাধারণও নয়, ইহার জন্য হয়ত ওই গঙ্গামাটিরই একান্ত প্রয়োজন।

রতন কহিতে লাগিল, মায়ের খরচের হিসেবপত্রও আমরা কেউ কোনদিন ভেবে পেলাম না। সেখানে না আছে ঘরদোর, না আছে কিছু। একজন গোমস্তা আছে, তার কাছে হাজার-দুই টাকা পাঠানো হয়েছে একটা মেটে বাড়ি তৈরি করবার জন্যে। দেখুন দেখি বাবু, এ কি-সব অনাছিষ্টি কাণ্ডকারখানা! চাকর বলে যেন আর আমরা কেউ মানুষ নয়!

তাহার ক্ষোভ এবং বিরক্তি দেখিয়া বলিলাম, নাই গেলে রতন অমন জায়গায়! জোর করে ত তোমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারে না!

আমার কথায় রতন কোন সান্ত্বনা লাভ করিল না। কহিল, মা পারেন। কি জানি বাবু কি জাদুমন্ত্র জানেন, যদি বলেন, তোমাদের সব যমের বাড়ি যেতে হবে, এতগুলো লোকের মধ্যে আমাদের এমন সাহস কারও নেই যে বলে, না। বলিয়া সে মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।

কথাটা রতন নিতান্তই রাগ করিয়া বলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে সে যেন অকস্মাৎ একটা নূতন তথ্যের সংবাদ দিয়া গেল। কেবল আমিই নয়, সকলেরই ঐ এক দশা! ওই জাদুমন্ত্রের কথাটাই ভাবিতে লাগিলাম। মন্ত্রতন্ত্রে যে সত্যই বিশ্বাস করি তাহা নয়, কিন্তু

এক-বাড়ি লোকের মধ্যে কাহারও যখন এতটুকু শক্তি নাই যে যমের বাড়ি যাইবার আদেশটাকে পর্যন্ত অবহেলা করে, তখন সে বস্তুটাই বা কি!

ইহার সমস্ত সংস্রব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আমি কি না করিয়াছি! বিবাদ করিয়া বিদায় লইয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়া দেখিয়াছি, এমন কি দেশত্যাগ করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেছি—জীবনে আর না দেখা হয়; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই একটা গোল বস্তুর উপর সরলরেখা টানিবার মত বারংবার কেবল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া নিজের দুর্বলতার কাছেই পরাজিত হইলাম, এই কথাটা মনে করিয়া অবশেষে যখন আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন রতন আসিয়া আজ আমাকে এই খবরটা দিয়া গেল - রাজলক্ষ্মী জাদুমন্ত্র জানে!

তাই বটে! অথচ, এই রতনকেই জেরা করিলে জানা যাইবে, সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করে না।

হঠাৎ দেখি মস্ত একটা পাথরের বাটিতে কি কতকগুলো লইয়া এই পথেই রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া নীচে চলিয়াছে। ডাকিয়া কহিলাম, শোন, সবাই বলে তুমি নাকি জাদুমন্ত্র জান?

সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কি জানি?

বলিলাম, জাদুমন্ত্র!

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, হাঁ, জানি। বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আমার গায়ের জামাটা ঠাওর করিয়া দেখিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ওটা কালকের সেই বাসী জামাটা না?

নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, হাঁ, সেইটাই বটে; কিন্তু থাক, বেশ ফরসা আছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ফরসার কথা নয়, পরিষ্কারের কথা বলছি। তার পরে একটুখানি হাসিয়া বলিল, বাইরের ওই দেখান ফরসাটা নিয়েই চিরকাল গেলে। ওটা তাচ্ছিল্য করতেও আমি বলিনে, কিন্তু যে ভেতরটা ঘামে-ঘামে নোংরা হয়ে ওঠে সেটা দেখতে শিখবে কবে? বলিয়া সে রতনকে ডাক দিল। কেহই জবাব দিল না। কারণ কর্ত্রীর এইপ্রকার উচ্চ মধুর আহ্বানের সাড়া দেওয়া এ বাড়ির বিধি নয়; বরঞ্চ মিনিট পাঁচ-ছয় গা-ঢাকা দিয়া থাকাই নিয়ম।

রাজলক্ষ্মী তখন হাতের পাত্রটা নামাইয়া রাখিয়া পাশের ঘর হইতে একটা কাচা জামা আনিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার মন্ত্রী রতনকে বোলো, যতক্ষণ সে জাদুমন্ত্র না শিখচে ততক্ষণ যেন এই দরকারী কাজগুলো হাত দিয়েই করে। এই বলিয়া সে পাথরের বাটিটা তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

জামাটা বদলাইতে গিয়া দেখিলাম তাহার ভিতরটা যথার্থই মলিন হইয়া গেছে। হইবার কথা, এবং আমিও যে আর কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহাও নয়, কিন্তু আমার মনটা ছিল নাকি ভাবিবার দিকেই, তাই অতি তুচ্ছ খোলসটার অন্তর-বাহিরের বৈসাদৃশ্যই আমাকে আবার নূতন আঘাত দিল।

রাজলক্ষ্মীর শুচিবায়ুগ্রস্ততা অনেক সময়েই আমাদের কাছে নিরর্থক, পীড়াদায়ক, এমন কি অত্যাচার বলিয়াও ঠেকিয়াছে, এবং এখনই যে তাহার সমস্তটাই একমুহূর্তে মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গেল, তাহাও সত্য নয়, কিন্তু এই শেষ শ্লেষটুকুর মধ্যে যে বস্তুটা আমি এতদিন মন দিয়া দেখি নাই তাহাই দেখিতে পাইলাম। যেখানে এই অদ্ভুত মানুষটির ব্যক্ত ও অব্যক্ত জীবনের ধারা দুটা একান্ত প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছে, ঠিক সেই স্থানটাতেই আজ গিয়া আমার চক্ষু পড়িল। একদিন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, শৈশবে রাজলক্ষ্মী যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকেই পিয়ারী তাহার উন্মত্ত যৌবনের কোন অতৃপ্ত লালসার পঙ্ক হইতে এমন করিয়া অতি সহজে সহস্র দল-বিকশিত পদ্মের মত চক্ষের নিমিষে বাহির করিয়া দিল? আজ মনে হইল সে ত পিয়ারী নয়—সে রাজলক্ষ্মীই বটে! রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারী এই দুটি নামের মধ্যে যে তাহার নারী-জীবনের কতবড়

ইঙ্গিত গোপন ছিল, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়াই মাঝে মাঝে সংশয়ে ভাবিয়াছি, একের মধ্যে আর একজন এতকাল কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল! কিন্তু মানুষ যে এমনিই! তাই ত সে মানুষ!

পিয়ারীর সমগ্র ইতিহাস আমি জানিও না, জানিতেও ইচ্ছা করি না। রাজলক্ষ্মীরই যে সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি তাও নয়; শুধু এইটুকুই জানি, দু'জনের মর্মে ও কর্মে চিরদিন কোন মিল কোন সামঞ্জস্যই ছিল না, চিরদিনই উভয়ে পরস্পরের উলটা স্রোতে বহিয়া গেছে। তাই একের নিভৃত সরসীতে যখন শুদ্ধ সুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অনুক্ষণ দলের পর দল মেলিয়াছে তখন অপরের দুর্দান্ত জীবনের ঘূর্ণিবায়ু সেখানে ব্যাঘাত করিবে কি, প্রবেশের পথই পায় নাই। তাই ত তাহার একটি পাপড়িও খসে নাই, এতটুকু ধূলাবালিও উড়িয়া গিয়া আজও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শীতের সন্ধ্যা অচিরে গাঢ় হইয়া আসিল, আমি কিন্তু সেইখানে বসিয়া ভাবিতেই লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, মানুষ ত কেবল তাহার দেহটাই নয়! পিয়ারী নাই, সে মরিয়াছে। কিন্তু একদিন যদি সে তার ওই দেহটার গায়ে কিছু কালি দিয়াই থাকে ত সেইটুকুই কি কেবল বড় করিয়া দেখিব, আর রাজলক্ষ্মী যে তাহার সহস্র-কোটি দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া আজ তাহার অকলঙ্ক শুভ্রতায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বিদায় দিব! মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুলভ্রান্তি দিয়া মানুষের বিচার করিব; আর যে দেবতা সকল দুঃখ, সকল ব্যথা, সকল অপমান নিঃশব্দে বহন করিয়াও আজ সস্মিত মুখে তাহারই মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে বসিতে দিবার কোথাও আসন পাতিয়া দিব না? সেই কি মানুষের সত্যকার বিচার হইবে? আমার মন যেন আজ তাহার সকল শক্তি দিয়া বলিতে লাগিল, না না, কখনই না, এ কখনই না! এমন যে হইতেই পারে না।

সে বেশিদিন নয়—নিজেকে দুর্বল, শ্রান্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর হাতে একদিন আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন সেই পরাভূতের আত্মত্যাগের মধ্যে বড় একটা দীনতা ছিল। আমার মন যেন ইহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু আজ আমার সেই মন যেন সহসা সবলে এই কথাটাই বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ও দান দানই নয়, ও ফাঁকি। যে পিয়ারীকে তুমি জানিতে না, সে তোমার জানার বাহিরেই পড়িয়া থাক। কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তোমারই ছিল, আজ তাহাকে তুমি সকল চিত্ত দিয়া গ্রহণ কর, এবং যাঁহার হাত দিয়া সংসারের সকল সার্থকতা নিরন্তর ঝরিতেছে, ইহারও শেষ সার্থকতা তাঁহারই হাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

নূতন চাকরটা আলো আনিতেছিল, তাহাকে বিদায় দিয়া অন্ধকারেই বসিয়া রহিলাম, এবং মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীর সকল ভাল-মন্দের সহিত আজ তাহাকে নিলাম। এইটুকুই আমি পারি, কেবল এইটুকুই আমার হাতে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত যাঁহার হাতে সেই অতিরিক্তের বোঝা তাঁহাকেই দিলাম। বলিয়া সেই অন্ধকারেই খাটের বাজুর উপর নীরবে মাথা রাখিলাম।

পূর্বের মত পরদিনও যথারীতি আয়োজন চলিল, এবং তাহার পরের দিনও সারাদিন-ব্যাপী উদ্যমের অবধি রহিল না। সেদিন দুপুরবেলায় প্রকাণ্ড একটা সিন্দুকে থালা-ঘটি-বাটি, গাড়ু-গেলাস, বকুনো পিলসুজ অপর্যাপ্ত ভরা হইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়া ও-সমস্ত দেখিতেছিলাম। একসময়ে ইশারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব হচ্চে কি? তুমি কি আর ফিরে আসতে চাও না নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, ফিরে কোথায় আসব শুনি?

আমার মনে পড়িল, এ-বাড়ি সে বঙ্কুকে দান করিয়াছে। কহিলাম, কিন্তু ধর যদি সে-জায়গা তোমার বেশিদিন ভাল না লাগে?

রাজলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ করবার দরকার নেই। তোমার ভাল না লাগলে চলে এসো, আমি তাতে বাধা দেব না।

তাহার কথার ভঙ্গিতে আমি আঘাত পাইয়া চুপ করিলাম। এটা আমি বহুবার

দেখিয়াছি, সে আমার এই ধরনের কোন প্রশ্নই যেন সরলচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। আমিও যে তাহাকে অকপটে ভালবাসিতে পারি, কিংবা তাহার সংস্রবে স্থির হইয়া বাস করিতে পারি, ইহা কিছুতেই যেন তাহার মনের সঙ্গে গাঁথিয়া এক হইয়া উঠিতে চাহে না। সংশয়ের আলোড়নে অবিশ্বাস একমুহূর্তেই এমন উগ্র হইয়া বাহিরে আসে যে, তাহার জ্বালা বহুক্ষণ অবধি উভয়ের মনেই রি-রি করিয়া জ্বলিতে থাকে। এই অবিশ্বাসের আগুন যে কবে নিবিবে এবং কেমন করিয়া নিবিবে, আমি তাহার কোন কিনারাই ভাবিয়া পাই না। সেও ইহারই সন্ধানে অবিশ্রাম ঘুরিতেছে—এবং গঙ্গামাটি এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করিয়া দিবে কি না, সে তথ্য যাঁহার হাতে তিনি অলক্ষ্যে চুপ করিয়াই আছেন।

সর্ববিধ আয়োজনে আরও দিন-চারেক কাটিল এবং আরও দিন-দুই গেল শুভক্ষণের প্রতীক্ষায়। তার পরে একদিন সকালে অপরিচিত গঙ্গামাটির উদ্দেশে আমরা সত্য সত্যই যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথটা আমার ভাল কাটিল না—মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। আর সকলের চেয়ে খারাপ কাটিল বোধ করি রতনের। সে মুখখানা অসম্ভব ভারী করিয়া গাড়ির এককোণে চুপচাপ বসিয়া রহিল; স্টেশনের পর স্টেশন গেল, কোন কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না। কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। স্থানটা জানা কি অজানা, ভাল কি মন্দ স্বাস্থ্যকর কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভরা, সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না; আমি ভাবিতেছিলাম, যদিচ জীবনটা আমার এতদিন নিরুপদ্রবে কাটে নাই, ইহার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুলচুক, অনেক দুঃখ-দৈন্যই গিয়াছে, তবুও সে-সব আমার অত্যন্ত পরিচিত। এই দীর্ঘ দিনে তাহাদের সহিত মোকাবিলা ত বটেই, বরঞ্চ এক প্রকারের স্নেহই জন্মিয়া গেছে। তাহাদের জন্য আমিও কাহাকে দোষ দিই না, আমাকেও আর বড় কেহ দোষ দিয়া সময় নষ্ট করে না। কিন্তু এই যে কোথায় কি-একটা নূতনত্বের মধ্যে নিশ্চিত চলিয়াছি, এই নিশ্চয়তাই আমাকে বিকল করিয়াছে।

আজ নয় কাল বলিয়া আর দেরি করিবার রাস্তা নাই। অথচ ইহার না জানি ভাল, না জানি মন্দ। তাই ইহার ভাল-মন্দ কোনটাই আজ আর কোনমতেই ভাল লাগে না। গাড়ি যতই দ্রুতবেগে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্তী হইতে চলিয়াছে ততই এই অজ্ঞাত রহস্যের বোঝা আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে, কত কি যে মনে হইতে লাগিল তাহার অবধি নাই। মনে হইল, অচির ভবিষ্যতে হয়ত আমাকেই কেন্দ্র করিয়া একটা বিশ্রী দল গড়িয়া উঠিবে, তাহাদের না পারিব লইতে, না পারিব ফেলিতে। তখন কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না, ভাবিতেও সমস্ত মনটা যেন হিম হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী জানালার বাহিরে দুচক্ষু মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। সহসা মনে হইল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকেই আমার ভালবাসিতেই হইবে; কোথাও কোনদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এতবড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে! অথচ একটা দিন পূর্বেও এই দ্বিধার যাঁতাকল হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। তখন মনে মনে সবলে বলিয়াছিলাম, তোমার সকল ভাল-মন্দের সঙ্গেই তোমাকে নিলাম লক্ষ্মী। অথচ আজ আমার মন এমন বিক্ষিপ্ত, এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাই ভাবি, সংসারে করিব বলায় এবং সত্যকার করায় কত বড়ই না ব্যবধান।

তিন

সাঁইথিয়া স্টেশনে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীর গোমস্তা কাশীরাম স্বয়ং স্টেশনে আসিতে পারেন নাই—সেদিকের ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু জন-দুই লোক পাঠাইয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহার রোকায় অবগত হওয়া গেল যে, ঈশ্বরেচ্ছায় 'অত্র' অর্থাৎ তিনি এবং তাঁহার গঙ্গামাটির সমস্ত কুশল। আদেশমত বাহিরে খানচারেক গো-যান অপেক্ষা করিতেছে—তাহার দুইখানি খোলা এবং দুইখানি ছই-দেওয়া। একখানিতে পুরু করিয়া খড়, আর খেজুরপাতার চাটাই বিছান—সেখানি স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরানীর। অপরখানিতে সামান্য কিছু খড় আছে বটে, কিন্তু চাটাই

নাই। সেখানি ভৃত্যাদি অনুচরগণের জন্য। খোলা দুইখানিতে মালপত্র বোঝাই হইবে। এবং যদ্যপি স্থানসঙ্কুলান না হয় ত পাইকদিগকে হুকুম করিলে বাজার হইতে আরও একটা যোগাড় করিয়া আনিবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, আহারাদি সমাপনপূর্বক সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রা করাই বিধেয়। কারণ অন্যথা কর্ত্রীঠাকুরানীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এবং এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত করাইতেছেন যে, পথে ভয়াদি কিছু নাই—স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারেন।

কর্ত্রীঠাকুরানী রোকা পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র, এবং যে ইহা দিল তাহাকে ভয়াদির কোন প্রশ্ন না করিয়া কেবল প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বাবা, কাছাকাছি একটা পুকুর-টুকুর আছে দেখিয়ে দিতে পার, একটা ডুব দিয়ে আসি?

আছে বৈ কি মাঠান্। উই যে হোথাকে—

তা হলে চল ত বাবা দেখিয়ে দেবে; বলিয়া সে তাহাকে এবং রতনকে সঙ্গে লইয়া কোথাকার কোন্ অজানা পুকুরে স্নানাহ্নিক করিতে চলিয়া গেল। অসুখ প্রভৃতির ভয় দেখান নিরর্থক বলিয়া আমি প্রতিবাদও করিলাম না। বিশেষতঃ ইহাতেই যদি বা সে কিছু খায়, বাধা দিলে সেটাও তাহার আজিকার মত বন্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু আজ সে মিনিট-দশেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই চলিতেছিল, সামান্য দুই-একটা বিছানা খুলিয়া গাড়িতে পাতা হইতেছে। আমাকে সে কহিল, তুমি কেন এইবেলা কিছু খেয়ে নাও না? সমস্তই ত আনা হয়েচে।

বলিলাম, দাও।

গাছতলায় আসন পাতিয়া একটা কলাপাতে সে সমস্ত গুছাইয়া দিতেছে, আমি নিস্পৃহ-চিত্তে কেবলমাত্র তাহার প্রতি চাহিয়া আছি, এমন সময়ে এক মূর্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল নারায়ণ!

রাজলক্ষ্মী তাহার ঝুঁটি-করা ভিজে চুলের উপর বাঁ হাতের পিছন দিয়া আঁচলটা আর একটুখানি টানিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আসুন।

অকস্মাৎ এই নিঃসঙ্কোচ নিমন্ত্রণের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম এক সাধু দাঁড়াইয়া। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তাহার বয়স বেশি নয়, বোধ হয় কুড়ি-একুশের মধ্যে, কিন্তু যেমন সুকুমার তেমনি সুশ্রী। চেহারাটা কৃশতার দিকেই—হয়ত একটু দীর্ঘকায় বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু রঙ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। চোখ, মুখ, ভ্রূ ও কপালের গঠন নিখুঁত বলিলেই হয়। বাস্তবিক, পুরুষের এত রূপ আর আমি কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তাহার পরিধানে গেরুয়া বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে ছিন্ন—গ্রন্থিবাঁধা। গায়ের গেরুয়া পাঞ্জাবীরও যেমন জীর্ণ দশা, পায়ের পাঞ্জাবী জুতাজোড়াটিও প্রায় তদ্রূপ; হারাইলে দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। রাজলক্ষ্মী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসন পাতিয়া দিল। মুখ তুলিয়া কহিল, আমি ততক্ষণ খাবার ঠিক করি, আপনাকে মুখ-হাত ধোবার জল দিক?

সাধু কহিলেন, তা দিক, কিন্তু আপনার কাছে আমি অন্য প্রয়োজনে এসেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আচ্ছা, আপনি খেতে বসুন, সে পরে হবে এখন। বাড়ি ফেরবার টিকিট চাই ত? সে আমি কিনে দেব। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

সাধুজী গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, না, সে প্রয়োজন নেই। আমি খবর নিয়েচি আপনারা গঙ্গামাটি যাচ্চেন। আমার সঙ্গে একটা ভারী বাক্স আছে, সেটা যদি কতকটা পথ আপনাদের গাড়িতে তুলে নেন। আমিও ওই দিকেই যাচ্চি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আর বেশি কথা কি! কিন্তু আপনি নিজে?

আমি হেঁটেই যেতে পারব। বেশি দূর নয়, ক্রোশ ছয়-সাত হবে।

রাজলক্ষ্মী আর কিছু না বলিয়া রতনকে ডাকিয়া জল দিতে বলিল, এবং নিজে পরিপাটি করিয়া সাধুজীর খাবার সাজাইতে নিযুক্ত হইল। এই কাজটি রাজলক্ষ্মীর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাহার জোড়া পাওয়া ভার।

সাধু খাইতে বসিলেন, আমিও বসিলাম। রাজলক্ষ্মী খাবারের হাঁড়ি লইয়া পাশেই রহিল। মিনিট-দুই পরে রাজলক্ষ্মী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুজী, আপনার নামটি?

সাধু খাইতে খাইতে কহিলেন, বজ্রানন্দ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাপ্ রে বাপ্! ডাকনামটি?

তাহার কথার ধরনে চাহিয়া দেখিলাম তাহার সমস্ত মুখখানি চাপাহাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হাসিল না, আমিও আহারে মন দিলাম। সাধুজী বলিলেন, সে নামের সঙ্গে আর ত কোন সম্বন্ধ নেই—নিজেরও না, পরেরও না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই সায় দিয়া কহিল, তা বটে! কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সাধুজী, আপনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন কত দিন?

প্রশ্নটি অত্যন্ত অভদ্র। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই বটে, কিন্তু যে পিয়ারীর মুখখানি আমি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে আবার তাহাকেই মনে পড়িয়া গেল। সেই পুরানো দিনের সমস্ত সরসতা তাহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে যেন সজীব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

সাধু একটা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, আপনার এ কৌতূহল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না, ভালমানুষটির মত মাথা নাড়িয়া কহিল, তা সত্যি। তবে একবার নাকি ভারি ভুগতে হয়েছে তাই—এই বলিয়া সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, হাঁ গা, বল ত তোমার সেই উট আর টাট্টুঘোড়ার গল্পটি? সাধুজীকে একবার শুনিয়ে দাও ত—আহা হা! ষাট্ ষাট্! কে বুঝি বাড়িতে নাম করচে।

সাধুজী বোধ হয় হাসি চাপিতে গিয়াই একটা বিষম খাইলেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই, কর্ত্রীঠাকুরানীর আড়ালে কতকটা অনুচরের মতই ছিলাম। এখন সাধুজী বিষম সামলাইয়া যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সহিত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি তা হলে একবার সন্ন্যাসী—

আমার মুখে লুচি ছিল, বেশি কথার জো ছিল না, তাই ডান হাতের চারটা আঙ্গুল তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম—উহুঁ হুঁ—একবার নয়, একবার নয়—

এবার সাধুজীর গাম্ভীর্য আর বজায় রহিল না, সে এবং রাজলক্ষ্মী দু'জনেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সাধু কহিলেন, ফিরলেন কেন?

লুচির ডেলাটা তখনও গিলিতে পারি নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিলাম।

রাজলক্ষ্মী তর্জন করিয়া উঠিল, বলিল, তাই বৈ কি! আচ্ছা, একবার নাহয় আমারি জন্যে—তাও ঠিক সত্যি নয়—আসলে ভয়ানক অসুখে পড়েই—কিন্তু আর তিনবার?

কহিলাম, সেও প্রায় কাছাকাছি—মশার কামড়ে। ওটা কিছুতেই চামড়ায় সইল না। আচ্ছা—

সাধু হাসিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি বজ্রানন্দ বলেই ডাকবেন। আপনার নামটি—

আমার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী জবাব দিল। কহিল, ওঁর নামে কি হবে? উনি বয়সে অনেক বড় ওঁকে দাদা বলেই ডাকবেন। আর আমাকেও বৌদিদি বলে ডাকলে রাগ করব না। আর আমি কোন না বয়সে তোমার বছর-পাঁচেকের বড় হব!

সাধুজীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমিও এতটা প্রত্যাশা করি নাই। বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম—এ সেই পিয়ারী। সেই স্বচ্ছ, সহজ স্নেহাতুরা আনন্দময়ী! সেই যে আমাকে কোনমতেই শ্মশানে যাইতে দিতে চাহে নাই, এবং কিছুতেই রাজসংসর্গে টিঁকিতে দিল না—এ সেই! এই যে ছেলেটি তাহার কোথাকার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে—সেখানকার সমস্ত অজানা বেদনা রাজলক্ষ্মীর বুক জুড়িয়া টান ধরিয়াছে। কোনমতে ইহাকে সে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চায়।

সাধু বেচারা লজ্জার ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া কহিল, দেখুন, দাদা বলতে আমার তত আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীদের ও-সব বলে ডাকতে নেই।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র অপ্রতিভ হইল না। কহিল, নেই কেন? দাদার বৌকে সন্ন্যাসীরা কিছু মাসি বলেও ডাকে না, পিসি বলেও ডাকে না—ও ছাড়া আমাকে তুমি আর কি বলে ডাকবে শুনি?

ছেলেটি নিরুপায় হইয়া শেষে সলজ্জ হাসিমুখে কহিল, আচ্ছা বেশ। ছ-সাত ঘণ্টা আরও আছি আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে যদি দরকার হয় ত তাই বলেই ডাকব। রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হলে ডাক না একবার!

সাধু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দরকার হলে ডাকব বলেচি—মিছিমিছি ডাকাডাকি উচিত নয়।

রাজলক্ষ্মী তাহার পাতে আরও গোটা-চারেক সন্দেশ ও বরফি দিয়া কহিল, বেশ, তা হলেই আমার হবে। কিন্তু নিজের দরকারে যে কি বলে তোমাকে ডাকবো ঠাউরে পাচ্ছিনে। আমাকে দেখাইয়া কহিল, ওঁকে ত ডাকতুম সন্ন্যাসীঠাকুর বলে। সে আর হয় না, ঘুলিয়ে যাবে। তোমাকে নাহয় ডাকব সাধুঠাকুরপো বলে, কি বল?

সাধুজী আর তর্ক করিলেন না, অতিশয় গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, বেশ তাই ভাল।

তিনি এদিকে যাই হোন, দেখিলাম আহারাদির ব্যাপারে তাঁহার রসবোধ আছে। পশ্চিমের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের তিনি কদর বুঝেন এবং কোনটির কিছুমাত্র অমর্যাদা করিলেন না। একজন সযত্নে পরম স্নেহে একটির পর একটি দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আর একজন নিঃশব্দে নিঃসঙ্কোচে গলাধঃকরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। মনে মনে বুঝিলাম সাধুজী পূর্বে যাহাই করুন, সম্প্রতি এরূপ উপাদেয় ভোজ্য এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে সেবা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ত্রুটি একটা বেলার মধ্যে সংশোধন করিবার প্রয়াস করিতে দেখিলে দর্শকের পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং রাজলক্ষ্মী আরও গোটা-কয়েক পেঁড়া এবং বরফি সাধুজীর পাতে দিতেই অজ্ঞাতসারে আমার নাক এবং মুখ দিয়া এক-সঙ্গে এতবড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, রাজলক্ষ্মী এবং তাহার নূতন কুটুম্ব দুজনেই চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি রোগা মানুষ, তুমি উঠে হাত-মুখ ধোও গে না। আমাদের সঙ্গে বসে থাকবার দরকার কি?

সাধুজী একবার আমার প্রতি, একবার রাজলক্ষ্মীর প্রতি এবং তাহার পরে হাঁড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, দীর্ঘশ্বাস পড়বার কথাই বটে, কিছুই যে আর রইল না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আরও অনেক আছে। বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ঠিক এমনি সময় রতন পিছনে আসিয়া বলিল, মা চিঁড়ে ত ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ কি দই কিছুই তোমার জন্যে পাওয়া গেল না।

সাধু বেচারা অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আপনাদের আতিথ্যের উপর ভয়ানক অত্যাচার করলুম, বলিয়া সহসা উঠিবার উপক্রম করিতেই রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো যদি ওঠো! মাইরি বলচি আমি সমস্ত ছড়িয়ে ফেলে দেব।

সাধু ক্ষণকাল বিস্ময়ে বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিলেন যে, এ কেমন স্ত্রীলোক যে এক-দণ্ডের পরিচয়েই এতবড় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল! রাজলক্ষ্মীর পিয়ারীর ইতিহাসটা না জানিলে বিস্ময়ের কথাই বটে। তার পরে তিনি একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, খেতে আমার কিছুই বাধে না, কিন্তু আপনারও ত কিছু খাওয়া চাই। আমার মাথা খেয়ে ত আর সত্যি সত্যি পেট ভরবে না।

রাজলক্ষ্মী জিভ কাটিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, ছি ছি, অমন কথা মেয়েমানুষকে বলতে নেই ভাই, আমি এ-সব খাইনে, আমার সহ্য হয় না। চাকরদের খাবার ঢের আছে। আজ রাতটা বৈ ত নয়, যা হোক একমুঠো চিঁড়ে-টিঁড়ে খেয়ে একটু জল খেলেই আমার চলে যাবে। কিন্তু ক্ষিদে থাকতে তুমি যদি উঠে যাও, তা হলে তাও আমার খাওয়া হবে না ঠাকুরপো। বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞেস কর। বলিয়া সে আমাকে আপীল করিল।

কাজেই এতক্ষণে আমাকে কথা কহিতে হইল। বলিলাম, এ যে সত্যি সে আমি হলফ নিয়ে বলতে রাজী আছি সাধুজী। মিথ্যে তর্ক করে লাভ নেই ভায়া, পার হাঁড়িটা উপুড় না হওয়া পর্যন্ত সেবাটা যেমন চলচে চলুক, নইলে ও আর কোন কাজেই আসবে না। খাবারটা ট্রেনে এসেচে, সুতরাং অনাহারে মারা গেলেও ওঁকে তার একবিন্দু খাওয়ান যাবে না। এটা ঠিক কথা।

সাধু কহিলেন, কিন্তু এ-সব খাবার ত গাড়িতে ছোঁয়া যায় না!

আমি বলিলাম, সে মীমাংসা আমি এতদিনে শেষ করে উঠতে পারলাম না ভায়া, আর তুমি কি এক আসনেই নিষ্পত্তি করতে পারবে? তার চেয়ে বরঞ্চ কাজ সেরে উঠে পড়, নইলে সূর্য্যি ডুব দিলে হয়ত চিঁড়ে-জলও গলা দিয়ে গলবার পথ পাবে না। বলি, ঘণ্টাকয়েক আরও ত তুমি সঙ্গে আছ, শাস্ত্রের বিচার পার ত পথে যেতে যেতেই বুঝিয়ো, তাতে কাজ না হোক অন্ততঃ অকাজ বাড়বে না। এখন যা হচ্ছে তাই চলুক।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে সমস্ত দিনই উনি কিছুই খাননি?

বলিলাম, না। তা ছাড়া কালও কি নাকি একটা ছিল, শুনুচি, দুটো ফলমূল ছাড়া কালও আর কিছু ওঁর মুখে যায়নি।

রতন পিছনেই ছিল, ঘাড় নাড়িয়া কি যেন একটা বলিতে গিয়া--বোধ হয় মনিবের গোপন চোখের ইঙ্গিতে—হঠাৎ থামিয়া গেল।

সাধু রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এতে আপনার কষ্ট হয় না?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু হাসিল; কিন্তু আমি কহিলাম, সেটা প্রত্যক্ষ এবং অনুমান কোনটাতেই জানা যাবে না। তবে চোখে যা দেখেচি তাতে আরও দু-একটা দিন বোধ হয় যোগ করা যেতে পারে।

রাজলক্ষ্মী প্রতিবাদ করিয়া কহিল, তুমি দেখেচ চোখে? কখ্খনো না।

ইহার আমিও জবাব দিলাম না, সাধুজীও আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। বেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া নীরবে ভোজন শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

রতন এবং সঙ্গের দুজনের আহার সমাধা হইতে বেলা গেল। রাজলক্ষ্মী নিজের ব্যবস্থা কি করিল সেই জানে।

আমরা গঙ্গামাটির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অন্ধকারও কোথাও কিছু ছিল না। মালবোঝাই গাড়ি দুইটা সকলের পিছনে, রাজলক্ষ্মীর গাড়ি মাঝখানে ও আমার গাড়িটা ভাল বলিয়া সকলের অগ্রে। সাধুজীকে ডাকিয়া কহিলাম, ভায়া, হাঁটার ত আর কমতি নেই, আজকের মত না হয় আমার এটাতেই পদার্পণ কর না?

সাধু কহিলেন, সঙ্গেই ত রইলেন, না পা[illegible]ল নাহয় উঠেই বসব--কিন্তু এখন একটু হাঁটি।

রাজলক্ষ্মী মুখ বাড়াইয়া বলিল, তা হলে আমার বডিগার্ড হয়ে চল ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে কইতে যাই। এই বলিয়া সে সাধুজীকে নিজের গাড়ির কাছে ডাকিয়া লইল।

সম্মুখেই আমি। মাঝে মাঝে গাড়ি, গরু ও গাড়োয়ানের সম্মিলিত উপদ্রবে তাঁহাদের আলাপের কিছু কিছু অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেও অধিকাংশই শুনিতে শুনিতে গেলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি তোমার এদিকে নয়, আমাদের দেশের দিকেই, সে তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। কিন্তু আজ কোথায় চলেচ সত্যি বল ত ভাই?

সাধু কহিলেন, গোপালপুরে।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের গঙ্গামাটি থেকে সেটা কতদূর?

সাধু জবাব দিলেন, আপনার গঙ্গামাটিও জানিনে, আমার গোপালপুরও চিনিনে, তবে সম্ভবতঃ ও দুটো কাছাকাছিই হবে। অন্ততঃ তাই ত শুনলাম।

তা হলে এতরাত্রে গ্রামই বা কি করে ঠাওরাবে, যাঁর ওখানে যাচ্চ তাঁর বাড়িই বা কি করে খুঁজে পাবে?

সাধুজী একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, গ্রামটা ঠাওরান শক্ত হবে না, কারণ পথের উপরেই নাকি একটা শুক্‌নো পুকুর আছে, তার দক্ষিণ দিয়ে ক্রোশখানেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে। আর বাড়ি খোঁজবার দুঃখ পোহাতে হবে না, কারণ সমস্তই অচেনা। তবে গাছতলা একটা পাওয়া যাবেই এ আশা আছে।

রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিল, এই শীতের রাত্রে গাছতলায়? ওই সামান্য কম্বলটা

মাত্র অবলম্বন করে? সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না ঠাকুরপো।

তাহার উদ্বেগ আমাকে পর্যন্ত আঘাত করিল। সাধু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, কিন্তু আমাদের ত ঘরবাড়ি নেই, আমরা ত গাছতলাতেই থাকি দিদি।

এবার রাজলক্ষ্মীও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে দিদির চোখের সামনে নয়। রাত্রে ভাইকে আমরা নিরাশ্রয়ের মধ্যে পাঠাই নে। আজ আমার সঙ্গে চল, কাল তোমাকে আমি নিজে উদ্যোগ করে পাঠিয়ে দেব।

সাধু চুপ করিয়া রহিলেন। রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, তাহাকে না জানাইয়া যেন কোন জিনিস গাড়ি হইতে স্থানান্তরিত না করা হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাসী-ঠাকুরের বাক্সটা আজ রাত্রির মত আটক করা হইল।

আমি বলিলাম, তা হলে ঠান্ডায় আর কষ্ট নাই করলে ভায়া, এসো না আমার গাড়িতে।

সাধু একটু ভাবিয়া কহিলেন, থাক এখন। দিদির সঙ্গে একটু কথা কইতে কইতে যাই।

আমিও ভাবিলাম, তা বটে! নূতন সম্বন্ধটা অস্বীকারের দিকেই সাধুজীর মনে মনে লড়াই চলিতেছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তবুও শেষরক্ষা হইল না। হঠাৎ এক-সময়ে যখন তিনি অঙ্গীকার করিয়াই লইলেন, তখন অনেকবার মনে হইল একটু সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঠাকুর পালালেই কিন্তু ভাল করতে—শেষে আমার দশা না হয়! অথচ চুপ করিয়া রহিলাম।

দুজনের কথাবার্তা অবাধে চলিতে লাগিল। গরুর গাড়ির ঝাঁকানিতে এবং তন্দ্রার ঝোঁকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলাপের সূত্র হারাইতে থাকিলেও কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া চলিতে চলিতে আমারও সময়টা মন্দ কাটিল না।

বোধ করি একটু তন্দ্রামগ্নই হইয়াছিলাম, সহসা শুনিলাম—প্রশ্ন হইল, হাঁ আনন্দ, তোমার ঐ বাক্সটিতে কি আছে ভাই?

উত্তর আসিল, গোটা-কয়েক বই আর ওষুধপত্র আছে দিদি।

ওষুধ কেন? তুমি কি ডাক্তার?

আমি সন্ন্যাসী। আচ্ছা, আপনি কি শোনেন নি দিদি, আপনাদের ওদিকে কিরকম কলেরা হচ্ছে?

কৈ না! সে কথা ত আমাদের গোমস্তা আমাকে জানান নি। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কলেরা সারাতে পার?

সাধুজী একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, সারাবার মালিক ত আমরা নই দিদি, আমরা শুধু ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এও দরকার, এও তাঁরই হুকুম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ন্যাসীতেও ওষুধ দেয় বটে, কিন্তু ওষুধ দেবার জন্যেই ত সন্ন্যাসী হতে হয় না। আচ্ছা আনন্দ, তুমি কি কেবল এইজন্যই সন্ন্যাসী হয়েছ ভাই?

সাধু কহিলেন, সে ঠিক জানিনে দিদি। তবে দেশের সেবা করাও আমাদের একটা ব্রত বটে।

আমাদের? তবে বুঝি তোমাদের একটা দল আছে ঠাকুরপো?

সাধু জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজলক্ষ্মী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু সেবা করার জন্য ত সন্ন্যাসী হবার দরকার হয় না ভাই। তোমাকে এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে বল ত?

সাধু এ প্রশ্নেরও বোধ হয় উত্তর দিলেন না, কারণ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই কাহারও শুনিতে পাইলাম না। মিনিট-দশেক পরে কানে গেল সাধু কহিতেছেন, দিদি, আমি ছোট্ট সন্ন্যাসী, আমাকে ও-নাম না দিলেও চলে। কেবল নিজের কতকগুলো ভার ফেলে দিয়ে তার জায়গায় অপরের বোঝা তুলে নিয়েছি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল না। সাধু বলিতে লাগিলেন, আমি প্রথম থেকেই দেখতে পেয়েচি, আপনি আমাকে ক্রমাগত ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করচেন! কেন জানিনে, বোধ হয় দিদি বলেই। কিন্তু যাদের ভার নিতে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েচি, এরা যে কত দুর্বল, কত

রুগ্ন, কিরূপ নিরুপায় এবং সংখ্যায় কত, এ যদি একবার জানেন ত ও-কথা আর মনেও আনতে পারবেন না।

ইহারও রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না। কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে প্রসঙ্গ উঠিল এইবার উভয়ের মন এবং মতের মিল হইতে বিলম্ব হইবে না। সাধুজীও ঠিক জায়গাতেই আঘাত করিলেন। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, ইহার সুখ, ইহার দুঃখ, ইহার অভাব আমি নিজেও নিতান্ত কম জানি না; কিন্তু এই সন্ন্যাসীটি যেই হোন, তিনি এই বয়সেই আমার চেয়ে ঢের বেশি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন এবং ঢের বড় হৃদয় দিয়া তাহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শুনিতে শুনিতে চোখের ঘুম জলে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল এবং বুকের ভিতরটা ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে ব্যথায় যেন মথিত হইয়া যাইতে লাগিল। ও-গাড়ির অন্ধকার কোণে একাকী বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা প্রশ্নও করিল না, একটা কথাতেও কথা যোগ করিল না। তাহার নীরবতায় সাধুজী কি ভাবিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু এই একান্ত স্তব্ধতার পরিপূর্ণ অর্থ আমার কাছে গোপন রহিল না।

দেশ বলিতে যেথায় দেশের চোদ্দ-আনা নরনারী বাস করেন, সেই পল্লীগ্রামের কাহিনীই সাধু বিবৃত করিতে লাগিলেন। দেশে জল নাই, প্রাণ নাই, স্বাস্থ্য নাই-- জঙ্গলের আবর্জনায় যেথায় মুক্ত আলো ও বায়ুর পথ রুদ্ধ, যেথায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম যেথায় বিকৃত, পথভ্রষ্ট, মৃতকল্প, জন্মভূমির সেই দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরেও পড়িয়াছি, নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না-থাকা যে কতবড় না-থাকা, মনে হইল আজিকার পূর্বে তাহা যেন জানিতামই না। দেশের এই দৈন্য যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দীনতা, আজিকার পূর্বে তাহার ধারণাই যেন আমার ছিল না।

শুষ্ক শূন্য বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। পথের ধূলো শিশিরে ভিজিয়া ভারী হইয়াছে; তাহারই উপর দিয়া গাড়ির চাকা এবং গরুর ক্ষুরের শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়, আকাশে জ্যোৎস্না পাণ্ডুর হইয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারই ভিতর দিয়া শীতের এই স্তব্ধ নিশীথে আমরা অজানার দিকে ধীরমন্থরগতিতে অবিশ্রাম চলিয়াছি। অনুচরদিগের মধ্যে কে জাগিয়া, আর কে নাই, জানা গেল না,—সবাই শীত-বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নীরব। কেবল একা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গ লইয়াছে এবং পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাইভগিনীর অসহ্য বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।

সহসা সাধু রাজলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মনে হয় তোমাকে যেন আমি চিনতে পেরেচি দিদি। মনে হয় তোমাদের মত মেয়েদের নিয়ে গিয়ে একবার তোমাদেরই ভাইবোনদের নিজের চোখে দেখাই।

রাজলক্ষ্মী প্রথমে কথা বলিতে পারিল না; তার পরে ভাঙ্গা গলায় কহিল, আমার কি সে সুযোগ হতে পারে আনন্দ! আমি যে মেয়েমানুষ, এ কথা কি করে ভুলব ভাই!

সাধু কহিলেন, কেন হতে পারে না দিদি? আর তুমি মেয়েমানুষ, এই কথাটাই যদি ভোলো ত কষ্ট করে তোমাকে ও-সব দেখিয়ে আমার কি লাভ হবে?

চার

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, গঙ্গামাটি কি তোমাদের জমিদারি দিদি?

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, দেখচ কি ভাই, আমরা একটা মস্ত জমিদার।

এবার উত্তর দিতে গিয়া সাধুও একটুখানি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, মস্ত জমিদারি কিন্তু মস্ত সৌভাগ্য নয়, দিদি! তাঁহার কথায়, তাঁহার পার্থিব অবস্থা সম্বন্ধে আমার একপ্রকার সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে দিক দিয়া গেল না। সে সরলভাবে

তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে কথা সত্যি আনন্দ। ও-সব যত দূর হয়ে যায় ততই ভাল।

আচ্ছা দিদি, উনি ভাল হয়ে গেলেই তোমরা আবার শহরে ফিরে যাবে?

ফিরে যাব? কিন্তু আজ সে ত অনেক দূরের কথা ভাই!

সাধু কহিলেন, পার ত আর ফিরো না দিদি। এই-সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ-কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেচে। যখন কাছে ছিলে তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাওনি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্মম দুঃখ তাদের দিতে পারনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েচ, দুঃখের ভাগও তেমনি নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ-দৈন্য বোধ করি এমন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কানায় কানায় বলতে যে কি বোঝায় তোমাদের শহরবাসের সর্ব-প্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে পার দিদি—

হাঁ আনন্দ, বাড়ির জন্য মন তোমার কেমন করে না?

সাধু সংক্ষেপে কহিলেন, না। সে বেচারা বুঝিল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল, কেবল সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

সাধু কহিলেন, কিন্তু বাড়ি ত এখন আর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী আবার অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আনন্দ, এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে কি তুমি শান্তি পেয়েচ?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে! সন্ন্যাসীর অত লোভ! না দিদি, আমি কেবল পরের দুঃখের ভার নিতে একটু চেয়েচি, তাই শুধু পেয়েচি।

রাজলক্ষ্মী আবার নীরব হইয়া রহিল। সাধু কহিলেন, উনি বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েচেন, কিন্তু এইবার একটু তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসি গে। আচ্ছা দিদি, কখনো দু-চারদিন যদি তোমাদের অতিথি হই, উনি কি রাগ করবেন?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, উনিটি কে? তোমার দাদা?

সাধুজীও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, নাহয় তাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আর আমি রাগ করব কি না জিজ্ঞেসা করলে না? আচ্ছা চল ত একবার গঙ্গামাটিতে, তারপর তার বিচার হবে।

সাধুজী কি বলিলেন শুনিতে পাইলাম না, বোধ করি কিছুই বলিলেন না। ক্ষণেক পরে আমার গাড়িতে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, দাদা, আপনি কি জেগে আছেন?

আমি জাগিয়াই ছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। তখন আমারই পার্শ্বে সাধুজী একটুখানি স্থান করিয়া লইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। একবার ইচ্ছা হইল একটুখানি সরিয়া গিয়া বেচারীকে আর একটু জায়গা দিই, কিন্তু পাছে নড়াচড়া করিতে গেলে তাঁহার সন্দেহ জন্মে আমি জাগিয়া আছি, কিংবা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে, এবং এই গভীর নিশীথে আর একদফা দেশের সুগভীর সমস্যা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই ভয়ে করুণা-প্রকাশের চেষ্টা মাত্র করিলাম না।

গঙ্গামাটিতে গাড়ি কখন প্রবেশ করিল আমি জানিতে পারি নাই, জানিলাম যখন গাড়ি আসিয়া থামিল আমাদের নূতন বাটীর দ্বারপ্রান্তে। তখন সকাল হইয়াছে। গোটা-চারেক গো-যানের বিবিধ এবং বিচিত্র কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বে ভিড় বড় কম জমে নাই। রতনের কল্যাণে পূর্বাহ্নেই শুনিয়াছিলাম এটা নাকি মুখ্যতঃ ছোটজাতির গ্রাম। দেখিলাম, রাগ করিয়া কথাটা সে নিতান্ত মিথ্যা কহে নাই। এই শীতের ভোরেও পঞ্চাশ-ষাটটি নানা বয়সের ছেলে-মেয়ে উলঙ্গ এবং অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বোধ করি এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া তামাশা দেখিতে জমা হইয়াছে। পশ্চাতে বাপ-মায়ের দলও যথাযোগ্যভাবে উঁকিঝুঁকি

মারিতেছে। ইহাদের আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদে ইহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে আর যাহার মনে যাহাই থাক, রতনের মনের মধ্যে বোধ হয় সংশয়ের বাষ্পও রহিল না। তাহার ঘুম-ভাঙ্গা মুখ একনিমিষেই বিরক্তি ও ক্রোধে ভীমরুলের চাকের মতন ভীষণ হইয়া উঠিল। কর্ত্রীকে দর্শন করিবার অতি-ব্যগ্রতায় গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘেঁষিয়া আসিয়াছিল, রতন এমন একটা বিকট ভঙ্গি করিয়া তাহাদের তাড়া করিল যে, গাড়োয়ান দু'জন সুমুখে না থাকিলে সেইখানেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিত। রতন কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, যত সব ছোটজেতের মরণ! দেখচেন বাবু, ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্ধা—যেন রথ-দোল দেখতে এসেচে! আমাদের মত সব ভদ্দরলোক কি এখানে থাকতে পারে বাবু! এখুনি সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে একাকার করে দেবে।

'ছোঁয়াছুঁয়ি' কথাটা সর্বাগ্রে কানে গেল রাজলক্ষ্মীর। তাহার মুখখানি যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

সাধুজী নিজের বাক্স নামাইতে ব্যস্ত ছিলেন। কাজটা সমাধা করিয়া তিনি একটা লোটা বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং কাছাকাছি যে ছেলেটিকে পাইলেন অকস্মাৎ তাহারই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ওরে ছেলে, যা ত ভাই, এখানে কোথা ভাল পুকুর-টুকুর আছে—একঘটি জল নিয়ে আয়—চা খেতে হবে। বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া, সম্মুখের একজন প্রৌঢ়গোছের লোককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মোড়লের পো, কাছাকাছি কার গরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, একছটাক দুধ চেয়ে আনি। গাঁয়ের টাট্‌কা খাঁটি জিনিস—চায়ের রঙটা যা দাঁড়াবে দিদি, বলিয়া তিনি একবার আমার ও একবার তাঁহার দিদির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দিদি কিন্তু এ উৎসাহে কিছুমাত্র যোগ দিলেন না। অপ্রসন্নমুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, রতন, যা ত বাবা, ঘটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয়।

রতনের মেজাজের খবরটা ইতিপূর্বে দিয়াছি। তার উপর এই শীতের সকালে যখন কে-একটা অচেনা সাধুর জন্য কোথাকার একটা নিরুদ্দেশ জলাশয় উদ্দেশ করিয়া জল আনিবার ভার পড়িল, তখন আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। একমুহূর্তেই তাহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার চেয়েও ছোট সেই হতভাগ্য বালকটার উপর। তাহাকে সে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিয়া উঠিল, নচ্ছার পাজি ব্যাটা! ঘটি ছুঁলি কেন তুই? চল্‌ হারামজাদা, ঘটি মেজে জলে ডুবিয়ে দিবি। বলিয়া সে কেবল চোখ-মুখের ভঙ্গিতেই ছেলেটাকে যেন গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল।

তাহার কাণ্ড দেখিয়া সাধু হাসিলেন, আমিও হাসিলাম। রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, গ্রামটা যে তোলপাড় করে তুললে আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোয়াতেই চা চাই!

সাধু বলিলেন, গৃহীদের রাত পোহায় নি বলে বুঝি আমাদেরও পোহাবে না? বেশ ত! কিন্তু দুধের যোগাড় যে করা চাই। আচ্ছা, বাড়িটার মধ্যে ঢুকে দেখা যাক কাঠকুটো উনুন-টুনুন আছে কিনা। ওহে কর্তা, চল না দাদা, কার ঘরে গরু আছে একটু দেখিয়ে দেবে। দিদি, কালকের সেই হাঁড়িটায় বরফি কিছু ছিল না? না, গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে তাকে শেষ করেচেন?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। পাড়ার যে দু-চারজন মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহারাও মুখ ফিরাইল।

এমন সময় গোমস্তা কাশীরাম কুশারীমহাশয় হন্তদন্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার তিন-চারজন লোক, কাহারো মাথায় ঝুড়িভরা শাকসবজি ও তরিতরকারি, কাহারো হাতে ঘটিভরা দুধ, কাহারো হাতে দধির ভাণ্ড, কাহারো হাতে একটা বৃহদায়তন রোহিত মৎস্য। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সামান্য একটু বিলম্বের জন্য বহুবিধ কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন। লোকটিকে আমার ভাল বলিয়াই মনে হইল। বয়স পঞ্চাশের উপর গিয়াছে। কিছু কৃশ, দাড়িগোঁফ কামানো—রঙটি ফরসার দিকেই। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন।

কিন্তু সাধুজী এ-সকল প্রচলিত ভদ্রতার ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তরকারির ঝুড়িটা স্বহস্তে নামাইয়া লইয়া তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন; দুধ যে খাঁটি সে বিষয়ে নিঃসংশয় মত দিলেন, এবং মৎস্যটির ওজন কত তাহা অনুমান করিয়া ইহার আস্বাদ-সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই আশান্বিত করিয়া তুলিলেন।

এই সাধুমহারাজের শুভাগমন-সম্বন্ধে গোমস্তা মহাশয় পূর্বাহ্নে কোন সংবাদ পান নাই; তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিল, সন্ন্যাসী দেখে ভয় পাবেন না কুশারীমশাই, ওটি আমার ভাই। একটু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর বার বার গেরুয়া ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠেচে।

কথাটা সাধুজীর কানে গেল। কহিলেন, এ কাজটা তত সহজে হবে না দিদি। বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন। ইহার অর্থ আমিও বুঝিলাম, রাজলক্ষ্মীও বুঝিল। সে কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে দেখা যাবে।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কুশারীমহাশয় বন্দোবস্ত বড় মন্দ করেন নাই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া তিনি নিজে সরিয়া গিয়া পুরাতন কাছারি-গৃহটিকেই কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তন করিয়া দিব্য বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ভিতরে রান্না এবং ভাঁড়ারঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। ঘরগুলি মাটির, খড় দিয়া ছাওয়া, কিন্তু বেশ উঁচু এবং বড়। বাহিরে বসিবার ঘরখানিও চমৎকার পরিপাটি। প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, পরিষ্কার এবং মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা। একধারে একটি ছোট কূপ এবং তাহারই অদূরে গোটা দুই-তিন টগর ও শেফালি বৃক্ষ। আর একদিকে অনেকগুলি ছোট-বড় তুলসীগাছের সারি এবং গোটা-চারেক যুঁই ও মল্লিকা ফুলের ঝাড়। সবসুদ্ধ জায়গাটা দেখিয়া যেন তৃপ্তিবোধ হইল।

সকলের চেয়ে উৎসাহ দেখা গেল সন্ন্যাসীভায়ার। যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতেই উচ্চকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন এমন আর কখনও দেখেন নাই। আমি কলরব না তুলিলেও মনে মনে খুশিই হইয়াছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার ভাইয়ের জন্য রান্নাঘরে চা তৈরি করিতেছিল, অতএব মুখের ভাব তাহার চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মনের ভাব তাহার কাহারও কাছে অবিদিত ছিল না। কেবল দলে ভিড়িল না রতন। সে মুখখানা তেমনি ভারী করিয়াই একটা খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

চা প্রস্তুত হইল। সাধুজী কল্যকার অবশিষ্ট মিষ্টান্নযোগে পেয়ালা-দুই চা নিঃশব্দে পান করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে কহিলেন, চলুন না, গ্রামখানা একবার দেখে আসা যাক। বাঁধটাও দূরে নয়, অমনি স্নানটাও সেরে আসা যাবে। দিদি, আসুন না জমিদারি পরিদর্শন করে আসবেন। বোধ হয় ভদ্রলোক বড় কেউ নেই—লজ্জা করবার বিশেষ আবশ্যক হবে না। সম্পত্তিটি ভাল, দেখে লোভ হচ্চে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, তা জানি। সন্ন্যাসীদের স্বভাবই ওই।

আমাদের সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ এবং আরও একজন চাকর আসিয়াছিল, তাহারা রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, না মহারাজ, অমন টাট্‌কা মাছের মুড়ো তোমাকে দিয়ে ভরসা হয় না, নেয়ে এসে রান্নাটা আমিই চড়িয়ে দেব। এই বলিয়া সে আমাদের সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত রতন কোন কথায় বা কাজে যোগদান করে নাই। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময়ে সে অত্যন্ত ধীর গম্ভীরস্বরে কহিল, মা, ঐ যে বাঁধ না পুকুর কি একটা পোড়াদেশের লোকে বলে, ওতে যেন আপনি নামবেন না। ভয়ানক জোঁক আছে, এক-একটা নাকি এক হাত করে।

মুহূর্তে রাজলক্ষ্মীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া গেল—বলিস কি রতন, এদিকে কি বড্ড জোঁক নাকি?

রতন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাইত শুনে এলুম।

সাধু তাড়া দিয়া উঠিলেন, আজ্ঞে হাঁ, শুনে এলে বৈ কি! ব্যাটা নাপ্‌তে ভেবে ভেবে আচ্ছা ফন্দি বার করেচে! ইহার মনের ভাব এবং জাতির পরিচয় সাধু পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ

করিয়াছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, দিদি, ওর কথা শুনবেন না, আসুন। জোঁক আছে কি না, সে পরীক্ষা নাহয় আমাদের দিয়েই হয়ে যাবে।

তাঁহার দিদি কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেন না, জোঁকের নামে একেবারে অচল হইয়া কহিলেন, আমি বলি আজ নাহয় থাক আনন্দ। নতুন জায়গা, বেশ না জেনেশুনে অমন দুঃসাহস করা ভাল হবে না। রতন, তুই নাহয় ওঠ বাবা, এইখানেই দু ঘড়া জল কুয়ো থেকে তুলে দে। আমাকে আদেশ হইল—তুমি রোগামানুষ, তুমি যেন আর কোথাকার কোন জলে নেয়ে এস না। বাড়িতেই দু ঘটি জল মাথায় দিয়ে আজকের মত নিরস্ত হও।

সাধু হাসিয়া বলিলেন, আর আমিই কি এত অবহেলার দিদি, যে আমাকেই কেবল সেই জোঁকের পুকুরে পাঠিয়ে দিচ্চেন?

কথাটা বেশি কিছু না, কিন্তু এইটুকুতেই রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু যেন হঠাৎ ছলছল করিয়া আসিল। সে ক্ষণকাল নীরবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে যেন অভিষিক্ত করিয়া কহিল, তুমি যে ভাই মানুষের হাতের বাইরে। যে বাপ-মায়ের কথা শোনেনি, সে কি একটা কোথাকার অজানা-অচেনা বোনেরই কথা রাখবে?

সাধু প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া সহসা একটু থামিয়া কহিলেন, এই অজানা-অচেনা কথাটি বলবেন না দিদি। আপনাদের সবাইকে চিনব বলেই ত ঘর ছেড়ে আসা, নইলে আমার কি দরকার ছিল বলুন ত? এই বলিয়া তিনি একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন, এবং আমিও পিছুপিছু তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

দুইজনে এইবার বেশ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামখানিকে দেখিয়া লইলাম। গ্রামখানি ছোট এবং আমরা যাহাদের ছোটজাত বলি তাহাদেরই। বস্তুত, ঘর-দুই বারুজীবী এবং এক ঘর কর্মকার ব্যতীত গঙ্গামাটিতে জলাচরণীয় কেহ নাই। সমস্তই ডোম এবং বাউরী-দের বাস। বাউরীরা বেতের কাজ এবং মজুরি করে এবং ডোমেরা চাঙ্গারি, কুলা, চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। গ্রামের উত্তর দিকে যে জলনিকাশের বড় নালা আছে, তাহারই ওপারে পোড়ামাটি। শোনা গেল, ও গ্রামখানা বড় এবং উহাতে অনেক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির বাস আছে। আমাদের কুশারীমহাশয়ের বাটীও ওই পোড়ামাটিতেই। কিন্তু পরের কথা পরে হইবে, আপাততঃ নিজেদের গ্রামের যে অবস্থা চোখে দেখা গেল তাহাতে দৃষ্টি জলে ঝাপসা হইয়া আসিল। বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাঙ্গলাদেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। একছটাক জমিজায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙ্গারি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সংগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এমন করিয়াই এই অশুচি অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয়ত এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা-কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এতবড় লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।

কিন্তু সাধু যে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন আমি জানিতাম না। তিনি হঠাৎ কহিলেন, দাদা, এই হচ্চে দেশের সত্যিকার ছবি। কিন্তু মন খারাপ করবার দরকার নেই। আপনি ভাবছেন এ-সব বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয়, কিন্তু তা মোটেই নয়।

আমি ক্ষুব্ধ এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এটা কিরকম কথা হ'ল সাধুজী?

সাধুজী বলিলেন, আমাদের মত যদি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তাহলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেচি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত?

কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেছি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েচি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ-পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন! এই বলিয়া সাধু নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিলাম না, এবং তাঁহার কথাটারও ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, জলের অভাবে হেমন্তের ধানটা প্রায় আট-আনা রকম শুকাইয়া গিয়া ইতিমধ্যেই অভাবের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। সাধু কহিলেন, দাদা, যে ছলেই হোক ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েচেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ এ বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন তা ভাবিনে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল, তাতে জমিদারি করার পাপের বোঝাটা কতক হালকা হয়।

আমি মনে মনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, জমিদারি এবং প্রজা আমারই বটে! কিন্তু পূর্বেও যেমন জবাব দিই নাই, এবারও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গেছে। কাল অপরাহ্ণের মত আজও আমাদের উভয়কে খাইতে দিয়া রাজলক্ষ্মী একপাশে বসিল। সমস্ত রান্না সে নিজে রাঁধিয়াছে, সুতরাং মাছের মুড়া ও দধির সর সাধুর পাতেই পড়িল। সাধুজী বৈরাগী মানুষ, কিন্তু সাত্ত্বিক এবং অসাত্ত্বিক, নিরামিষ এবং আমিষ কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ দেখা গেল না, বরঞ্চ এরূপ উদ্দাম অনুরাগের পরিচয় দিলেন যাহা ঘোর সাংসারিকের পক্ষেও দুর্লভ। রান্নার ভাল-মন্দের সমঝদার ব্যক্তি বলিয়াও যেমন আমার খ্যাতি ছিল না, আমাকে বুঝাইবার দিকেও রাঁধুনীর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

সাধুর তাড়া নাই, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে আহার করিতে লাগিলেন। চর্বণ করিতে করিতে কহিলেন, দিদি, সম্পত্তিটি সত্যিই ভাল, ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছেড়ে যেতে ত তোমাকে আমরা সাধচি নে ভাই?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, সন্ন্যাসী-ফকিরকে কখনো এত প্রশ্রয় দেবেন না দিদি, ঠকবেন। তা সে যাই হোক, গ্রামটি বেশ, কোথাও একজন এমন চোখে পড়ল না যার জল ছোঁয়া যায়। এমন একটা ঘর দেখলাম না যার চালে এক আঁটি আস্ত খড় আছে—যেন ঋষিদের আশ্রম!

আশ্রমের সহিত অস্পৃশ্য গৃহগুলির একদিক দিয়া যে উৎকট সাদৃশ্য ছিল, সেই কথা মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল, শুনলুম সত্যিই নাকি এ গাঁয়ে কেবল ছোটজাতের বাস,—একঘটি জলের প্রত্যাশাও কারও কাছে নেই। বেশি-দিন দেখচি থাকা চলবে না।

সাধু একটু হাসিলেন, আমি কিন্তু নীরব হইয়া রহিলাম। কারণ, রাজলক্ষ্মীর মত করুণাময়ীও কোন্ সংস্কারের মধ্য দিয়া এতবড় লজ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারিল আমি তাহা জানিতাম। সাধুর হাসি আমাকে স্পর্শ করিল কিন্তু বিদ্ধ করিল না। তাই, কথা কহিলাম না সত্য, তথাপি আমার মন ওই রাজলক্ষ্মীকেই উদ্দেশ করিয়া ভিতরে ভিতরে বলিতে লাগিল, লক্ষ্মী, মানুষের কর্মই কেবল অস্পৃশ্য ও অশুচি হয়, মানুষ হয় না। না হইলে পিয়ারী কিছুতেই আজ আবার লক্ষ্মীর আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে পারিত না। আর সে কেবল সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, মানুষকে কেবলমাত্র মানুষের দেহ বলিয়া আমি কোনদিন ভুল করি নাই! সে পরীক্ষা আমার ছেলেবেলা হইতে বহুবার হইয়া গিয়াছে। অথচ, এ-সকল কথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিবারও জো নাই—বলিবার প্রবৃত্তিও আর আমার নাই।

উভয়ে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। রাজলক্ষ্মী আমাদের পান দিয়া বোধ করি নিজেও কিছু খাইতে গেল। কিন্তু আন্দাজ ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে নিজেও যেমন সাধুজীকে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল, আমিও তেমনি বিস্মিত হইলাম। দেখি, ইতিমধ্যে কখন তিনি বাহিরে গিয়া একটি লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং ঔষধের

সেই ভারী বাক্সটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিজেও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কাল এই কথাই ছিল বটে, কিন্তু আজ তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম। মনেও করি নাই, এই প্রবাসে রাজলক্ষ্মীর এত আদর-যত্ন উপেক্ষা করিয়া সাধুজী অনিশ্চয় অন্যত্রের জন্য এমন সত্বর উন্মুখ হইয়া উঠিবেন। স্নেহের শৃঙ্খল এত সহজে কাটিবার নয়, রাজলক্ষ্মীর নিভৃত মনের মধ্যে বোধ হয় এই আশাই ছিল, সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি যাচ্ছ নাকি আনন্দ?

সাধু বলিলেন, হাঁ দিদি, যাই। এখন না বেরুলে পোঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

সেখানে কোথায় খাবে, কোথায় শোবে? আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই!

আগে ত গিয়ে পোঁছই দিদি!

কবে ফিরবে?

সে ত এখন বলা যায় না। কাজের ভিড়ে যদি না এগিয়ে যাই ত একদিন ফিরতেও পারি।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, তার পরে সে মাথার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন ফিরতেও পার? না, সে কিছুতেই হবে না।

কি হবে না তাহা বুঝা গেল,—তাই সাধু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, যাবার হেতু ত আপনাকে বলেচি দিদি।

বলেচ? আচ্ছা, তবে যাও। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া সবেগে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত সাধুজী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তার পরে আমার প্রতি চাহিয়া লজ্জিতমুখে কহিলেন, আমার যাওয়া বড় দরকার।

আমি ঘাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিলাম, জানি। ইহার অধিক আর কিছু বলিবার ছিল না। কারণ, আমি অনেক দেখিয়া জানিয়াছি স্নেহের গভীরতা কিছুতেই কালের স্বল্পতা দিয়া মাপা যায় না; এবং এই বস্তুটা কাব্যের জন্য কবিরা কেবল শূন্য কল্পনাই করেন নাই--সংসারে ইহা যথার্থই ঘটে। তাই, একের যাওয়ার প্রয়োজনও যতখানি সত্য, অপরের আকুল কণ্ঠের একান্ত নিষেধটাও ঠিক ততখানি সত্য কি না, এ লইয়া আমার মনের মধ্যে বিন্দু-পরিমাণও সংশয়ের উদয় হইল না। আমি অত্যন্ত সহজেই বুঝিলাম, এই লইয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত অনেক ব্যথাই ভোগ করিতে হইবে।

সাধুজী কহিলেন, আমি চললাম। ওদিকের কাজ যদি মেটে ত হয়ত আবার আসব, কিন্তু এখন এ কথা জানাবার আবশ্যক নেই।

আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাই হবে।

সাধুজী কি একটা বলিতে গিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আশ্চর্য দেশ এই বাঙ্গলা দেশটা। এর পথেঘাটে মা-বোন, সাধ্য কি এ'দের এড়িয়ে যাই। এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা শুনিয়া আমারও দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মনে হইল, তাই বটে। দেশের সমস্ত মা-বোনের বেদনা যাহাকে টান দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, তাহাকে একটি মাত্র ভগিনীর স্নেহ, দধির সর এবং মাছের মুড়ো দিয়া ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া?

পাঁচ

সাধুজী ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিরহব্যথাটা রতনের কিরূপে বাজিল অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, সম্ভবতঃ মারাত্মক তেমন কিছু হইবে না; কিন্তু একজন ত দেখিলাম কাঁদিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি রহিলাম আমি। লোকটার সহিত পুরাপুরি চব্বিশ ঘণ্টাও ঘনিষ্ঠতা হইতে পায় নাই; তথাপি আমারও মনে হইতে লাগিল, আমাদের এই অনারব্ধ সংসারের মাঝখানে তিনি যেন মস্তবড় একটা ছিদ্র করিয়া দিয়া গেলেন। এই

অনিষ্টটি আপনা হইতেই সারিয়া উঠিবে কিংবা নিজেই তিনি আবার একদিন অকস্মাৎ তাঁহার প্রচণ্ড ঔষধের বাক্সটা ঘাড়ে করিয়া ইহা মেরামত করিতে সশরীরে ফিরিয়া আসিবেন, বিদায়কালে কিছুই বলিয়া গেলেন না। অথচ আমার নিজের খুব যে বেশি উদ্বেগ ছিল তাও নয়। নানা কারণে এবং বিশেষ করিয়া কিছুকাল হইতে জ্বরে ভুগিয়া দেহ ও মনের এমনই একটা নিস্তেজ নিরালম্ব ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র রাজলক্ষ্মীর হাতেই সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় ভাল-মন্দর দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছিলাম। সুতরাং কিছুর জন্যই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার আমার আবশ্যকও ছিল না, শক্তিও ছিল না। তবুও মানুষের মনের চঞ্চলতার যেন বিরাম নাই। বাহিরের ঘরে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া একাকী বসিয়া আছি, কত কি যে এলোমেলো ভাবনা আনাগোনা করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই, সম্মুখের প্রাঙ্গণতলে আলোর দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসন্ন রাত্রির ইঙ্গিতে অন্যমনস্ক মনটাকে মাঝে মাঝে এক-একটা চমক দিয়া যাইতেছে, মনে হইতেছে এ জীবনে যত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে তাহাদের সহিত আজিকার এই অনাগত নিশার অপরিজ্ঞাত মূর্তি যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব নারীর অবগুণ্ঠিতা মুখের মত রহস্যময়। অথচ, এই অপরিচিতার কেমন প্রকৃতি কেমন প্রথা কিছুই না জানিয়া একেবারে ইহার শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতেই হইবে, মধ্যপথে আর ইহার কোন বিচারই চলিবে না। আবার পরক্ষণেই যেন অক্ষম চিন্তার সমস্ত শৃঙ্খলই একনিমিষে ভাঙ্গিয়া বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে। এমনি যখন মনের অবস্থা, সেই সময় পাশের দ্বারটা খুলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। তাহার চোখ-দুটো সামান্য একটু রাঙ্গা, একটু যেন ফুলা-ফুলা। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কহিলাম, আশ্চর্য কি! যে ভার, যে শ্রান্তি তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ, আর কেউ হলে ত ভেঙ্গেই পড়ত, আর আমি হলে ত দিনরাতের মধ্যে চোখ খুলতেই পারতুম না, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিতুম।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের ম্যালেরিয়া ছিল না। যাই হোক তুমি ত দিনের বেলায় ঘুমোও নি?

বলিলাম, না, কিন্তু এখন ঘুম পাচ্চে, হয়ত একটু ঘুমোব। কারণ, কুম্ভকর্ণের যে ম্যালেরিয়া ছিল না এমন কথাও বাল্মীকি মুনি কোথাও লিখে যাননি।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, ঘুমোবে এই অবেলায়! রক্ষে কর তুমি, জ্বর কি তা হলে আর কোথাও বাকি থাকবে? সে-সব হবে না,—আচ্ছা, যাবার সময় আনন্দ কি আর কিছু তোমাকে বলে গেল?

প্রশ্ন করিলাম, কি রকম কথা তুমি আশা কর?

রাজলক্ষ্মী কহিল, এই যেমন কোথায় কোথায় যাবে; কিংবা—

এই কিংবাটাই আসল প্রশ্ন। কহিলাম, কোথায় কোথায় যাবেন তার একপ্রকার আভাস দিয়ে গেছেন, কিন্তু এই কিংবাটার সম্বন্ধে কিছুই বলে যাননি। আমি ত তাঁর ফিরে আসার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখিনে।

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু আমি কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা এই লোকটিকে কি তুমি বাস্তবিক চিনেচ? আমাকে যেমন একদিন চিনতে পেরেছিলে?

সে আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, না।

কহিলাম, সত্যি বল, কখনো কোনদিন কি দেখনি?

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তোমার কাছে আমি সত্য করতে পারব না। অনেক সময় আমার বড় ভুল হয়। তখন অপরিচিত লোককেই মনে হয় কোথায় যেন তাকে দেখেচি, তার মুখ যেন আমার অত্যন্ত চেনা, কেবল কোথায় দেখেচি সেইটিই মনে করতে পারিনে। আনন্দকেও হয়ত কখনো দেখে থাকব।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আজ আনন্দ চলে গেল বটে, কিন্তু যদি সে কখনো ফিরে আসে ত তার বাপ-মায়ের কাছে আবার একদিন তাকে ফিরিয়ে দেব এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

আমি বলিলাম, তাতে তোমার গরজ কি?

সে কহিল, অমন ছেলে চিরদিন ভেসে বেড়াবে এ কথা ভাবলেও যেন আমার বুকে শূল বেঁধে। আচ্ছা, তুমি নিজেও ত সংসার ছেড়েছিলে—সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে কি সত্যিকার আনন্দ কিছু আছে?

কহিলাম, আমি সত্যিকার সন্ন্যাসী হইনি, তাই ওর ভেতরকার সত্যি খবরটি তোমাকে দিতে পারব না। যদি কোনদিন সে ফিরে আসে এ সংবাদ তাকেই জিজ্ঞাসা কোরো।

রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, বাড়িতে থেকে কি ধর্মলাভ হয় না? সংসার না ছাড়লে কি ভগবান পাওয়া যায় না?

প্রশ্ন শুনিয়া আমি করজোড়ে বলিলাম, এর কোনটার জন্যেই আমি ব্যাকুল নই লক্ষ্মী, এ-সব ঘোরতর প্রশ্ন আমাকে তুমি কোরো না, আবার আমার জ্বর আসতে পারে।

রাজলক্ষ্মী হাসিল, তারপর করুণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু মনে হয় সংসারে আনন্দর ত সমস্তই আছে, তবু সে ধর্মের জন্য এই বয়সেই সব ছেড়ে দিয়ে এসেচে; কিন্তু তুমি ত তা পারনি?

বলিলাম, না, এবং ভবিষ্যতেও পারব মনে হয় না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন মনে হয় না?

কহিলাম, তার প্রধান কারণ যাকে ছাড়তে হবে সেই সংসারটা যে আমার কোথায় এবং কি প্রকার তা আমার জানা নেই, এবং যার জন্যে ছাড়তে হবে সেই পরমাত্মার প্রতিও আমার লেশমাত্র লোভ নেই। এতদিন তাঁর অভাবেই কেটে গেছে এবং বাকি ক'টা দিনও অচল হয়ে থাকবে না এই আমার ভরসা। অন্যপক্ষে তোমার ঐ আনন্দভায়াটিও গেরুয়া সত্ত্বেও যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যেই বেরিয়ে এসেচেন আমার তা বিশ্বাস নয়। তার কারণ, আমিও বার-কয়েক সাধু-সঙ্গ করেচি, তাঁদের কেউই আজও ওষুধের বাক্স ঘাড়ে করে বেড়ানকে ভগবৎ-লাভের উপায় নির্দেশ করে দেননি। তা ছাড়া তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও ত চোখে দেখলে!

রাজলক্ষ্মী মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তবে কি সে মিছামিছিই ঘরসংসার ছেড়ে এই কষ্ট করতে বার হয়েচে? সবাই কি তোমার মতই মনে কর?

বলিলাম, না, মস্ত প্রভেদ আছে। সে ভগবানের সন্ধানে বার না হলেও মনে হয়, যার জন্যে পথে বেরিয়েচে সে তারই কাছাকাছি, অর্থাৎ আপনার দেশ। তাই তার ঘরবাড়ি ছেড়ে আসাটা ঠিক সংসার ছেড়ে আসা নয়—সাধুজী কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটি সংসার ছেড়ে বড় সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেচেন।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারিল না, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, যাবার সময় সে কি তোমাকে কিছু বলে গেল?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না, তেমন কিছু নয়।

কেন যে একটুখানি সত্য গোপন করিলাম তাহা নিজেও জানি না। কিন্তু বিদায়কালে সাধুজীর শেষ কথাটা তখন পর্যন্ত আমার কানে তেমনি বাজিতেছিল। যাবার সময় সেই যে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, বিচিত্র দেশ এই বাঙলা দেশটা! এর পথেঘাটে মা-বোন—সাধ্য কি তাদের ফাঁকি দিয়ে যাই!

ম্লানমুখে রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, আমারও মনের মধ্যে অনেক দিনের অনেক ভুলে-যাওয়া ঘটনা ধীরে ধীরে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তাই বটে! তাই বটে! সাধুজী, তুমি যেই হও, এই অল্প বয়সেই আমার এই কাঙাল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ। না হইলে ইহার যথার্থ রূপটির খবর আজ এমন সহজেই এই কয়টি কথায় দিতে পারিতে না। জানি, অনেক দিনের অনেক ত্রুটি অনেক বিচ্যুতি আমার মাতৃভূমির সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পঙ্ক লেপিয়াছে, তবুও, এ সত্য যাচাই করিবার যাহার সুযোগ মিলিয়াছে, সে-ই জানে ইহা কত বড় সত্য!

এইভাবে নীরবে মিনিট দশ-পনের কাটিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, এই উদ্দেশ্যই যদি তার মনে থাকে, একদিন আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে আমি বলে

দিচ্চি। এ দেশে নিছক পরের ভাল করতে যাওয়ার যে দুর্গতি হয়তো সে আজও জানে না। এর স্বাদ কতক আমি জানি। আমারই মত একদিন যখন সংশয়ে, বাধায়, কটু কথায় তার সমস্ত মন তিক্তরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সে পালিয়ে আসার পথ পাবে না।

আমি সায় দিয়া কহিলাম, অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ-সব দুঃখের কথা যেন সে বেশ জানে।

রাজলক্ষ্মী বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, কখ্খনো না, কখ্খনো না। জানলে সে পথে কেউ যাবে না আমি বলচি।

এ কথার আর জবাব ছিল না। বঙ্কুর মুখে শুনিয়াছিলাম, একদিন ইহার অনেক সাধু-সংকল্প, অনেক পুণ্যকর্ম তাহার শ্বশুরবাড়ির দেশে অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিল। সেই নিষ্কাম পরোপকারের ব্যথা অনেকদিন ইহার মনে লাগিয়াছিল। যদিচ, আরও একটা দিক দেখিবার ছিল, কিন্তু সেই অবলুপ্ত বেদনার স্থানটা চিহ্নিত করিয়া তুলিতেও আর প্রবৃত্তি হইল না, তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ রাজলক্ষ্মী যাহা বলিতেছিল তাহা মিথ্যা নয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হয়? কেন একের শুভচেষ্টা অপরে এমন সন্দেহের চক্ষে দেখে? কেন এগুলি বিফল করিয়া দিয়া মানুষ সংসারের দুঃখের ভার লঘু করিতে দেয় না? মনে হইল, সাধুজী যদি থাকিতেন, কিংবা যদি কখনো ফিরিয়া আসেন, এই জটিল সমস্যার মীমাংসার ভার তাঁকেই দিব।

সেদিন সকাল হইতে নিকটেই কোথা হইতে মাঝে মাঝে সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, এই সময়ে জনকয়েক লোক রতনকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। রতন সম্মুখে আসিয়া কহিল, মা, এরা আপনাকে রাজবরণ দিতে এসেছে, —এসো না হে, দিয়ে যাও না। বলিয়া সে একজন প্রৌঢ়গোছের লোককে ইঙ্গিত করিল। লোকটির পরিধানে হরিদ্রারঙে ছোপান একটি কাপড়, গলায় নূতন কাঠের মালা। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিয়া বারান্দার নীচে হইতেই নূতন শালপাতায় একটি টাকা ও একটি সুপারি রাজলক্ষ্মীর পদতলের উদ্দেশে রাখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং কহিল, মাঠাকরুন, আজ আমার মেয়ের বিয়ে।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং পুলকিতচিত্তে কহিল, মেয়ের বিয়েতে এই বুঝি দিতে হয়!

রতন কহিল, না মা, তা নয়, যার যেমন সাধ্য সে তেমনি জমিদারকে দেয়, এরা ছোটজাত ডোম, এর বেশী আর কোথায় কি পাবে বলুন, এই কত কষ্টে—

কিন্তু নিবেদন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই টাকাটা ডোমের শুনিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, তবে থাক থাক এ-ও দিতে হবে না—তোমরা এমনিই মেয়ের বিয়ে দাও গে—

এই প্রত্যাখ্যানে কন্যার পিতা এবং ততোধিক রতন নিজে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠিল; সে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, এই রাজবরণের সম্মানটা গ্রহণ না করিলে কোনমতেই চলিবে না। রাজলক্ষ্মী কেন যে ঐ সুপারিশুদ্ধ টাকাটা লইতে কিছুতেই চাহে না, ঘরের ভিতরে বসিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম এবং রতনই বা কি জন্য যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিল তাহাও আমার অবিদিত ছিল না। খুব সম্ভব দেয় টাকাটা আরও বেশি, এবং গোমস্তা কুশারীমহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই ইহারা এই কৌশল করিয়াছে; এবং রতন 'হুজুর' ইত্যাদি সম্ভাষণের পরিবর্তে তাহাদের মুখপাত্র হইয়া আর্জি পেশ করিতে আসিয়াছে। সে যে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াই আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তাহার এই সংকট অবশেষে আমিই মোচন করিলাম। উঠিয়া আসিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, আমি নিলাম, তোমরা বাড়ি গিয়ে বিয়ের উদ্যোগ করো গে।

রতনের মুখ গর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং রাজলক্ষ্মী অস্পৃশ্যের প্রতিগ্রহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল। খুশি হইয়া কহিল, এ ভালই হ'ল যে, যাঁর মান্য তিনি স্বহস্তে নিলেন, এই বলিয়া সে হাসিল।

মধু ডোম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, পহর রেতের

মধ্যেই লগন, একবার যদি পায়ের ধুলো দেন! এই বলিয়া সে একবার আমার ও একবার রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি করুণ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি সম্মত হইলাম. রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু হাসিয়া সানাইয়ের শব্দটা আন্দাজ করিয়া বলিল. ওই বুঝি তোমার বাড়ি মধু? আচ্ছা, যদি সময় পাই ত আমিও গিয়ে একবার দেখে আসব। রতনের প্রতি চাহিয়া কহিল. বড় তোরঙ্গটা খুলে দেখ ত রে, আমার নতুন শাড়িগুলো আনা হয়েচে কিনা। যা মেয়েটিকে একখানা দিয়ে আয়। মিষ্টি বুঝি এ দেশে কিছু পাওয়া যায় না? বাতাসা মেলে? আচ্ছা, তাই বেশ। অমনি তাও কিছু কিনে দিয়ে আসিস রতন। হাঁ মধু, তোমার মেয়ের বয়স কত? পাত্তরের বাড়ি কোথায়? লোক কতগুলি খাবে? এ গাঁয়ে ক'ঘর তোমরা আছ?

জমিদারগৃহিণীর একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে মধু সসম্ভ্রমে এবং সবিনয়ে যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল তাহার কন্যার বয়স বছর-নয়েকের মধ্যেই, পাত্র যুবাপুরুষ—ত্রিশ-চল্লিশের বেশি হইবে না—বাড়ি ক্রোশ-পাঁচেক উত্তরে কি একটা গ্রামে—সে একটা তাহাদের বড় সমাজ, সেখানে জাতীয় ব্যবসা কেহ করে না—সকলেরই চাষবাস পেশা—মেয়ে বেশ সুখেই থাকিবে. তবে ভয় শুধু এই রাত্রিটার জন্য। কারণ বরযাত্রীর সংখ্যা কত হইবে এবং তাহারা কোথায় কি ফ্যাসাদ বাধাইয়া দিবে, তাহা আজ প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত কোনমতেই অনুমান করিবার জো নাই। তাহারা সকলেই সমৃদ্ধ ব্যক্তি; কি করিয়া যে মান-মর্যাদা বজায় রাখিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন হইবে এই ভয়েই মধু কাঁটা হইয়া আছে। এই-সকল সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সে পরিশেষে সকাতরে শুনাইল যে. তাহার চিঁড়া গুড় এবং দধি সংগ্রহ হইয়াছে, এমন কি শেষকালে খান-দুই করিয়া বড় বাতাসাও পাতে দিতে পারিবে; কিন্তু তথাপি যদি কোন গোলযোগ হয় ত তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী সকৌতুকে ভরসা দিয়া কহিল, গোলযোগ কিছু হবে না মধু. তোমার মেয়ের বিয়ে নির্বিঘ্নে হবে আমি আশীর্বাদ করচি। খাবার জিনিস এত জোগাড় করেচ, তোমার বেয়াইয়ের দল খেয়ে খুশি হয়ে বাড়ি যাবে।

মধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সঙ্গের লোক-দুইটিকে লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল. এই আশীর্বচনের উপর বরাত দিয়া সে বিশেষ কোন সান্ত্বনা লাভ করিল না; আজ রাত্রির জন্য কন্যার পিতার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ জাগিয়া রহিল।

শুভকর্মে পায়ের ধুলো দিব বলিয়া মধুকে ভরসা দিয়াছিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই যাইতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা বোধ করি আমাদের কাহারও মনে ছিল না। সন্ধ্যার কিছু পরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার আয়-ব্যয়ের একটা খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল, আমি বিছানায় শুইয়া মুদ্রিতনেত্রে কতক বা শুনিতেছিলাম, কতক বা শুনিতেছিলাম না, কিন্তু অদূরে বিবাহবাটীর কলরোল কিছুক্ষণ হইতে যেন কিঞ্চিৎ অসাধারণ রকমের প্রখর হইয়া কানে বাজিতেছিল। সহসা রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া সহাস্যে কহিল, ডোমের বাড়ির বিয়ে, মারামারি এব একটা অঙ্গ নয় ত?

বলিলাম, উঁচুজাতের নকল যদি করে থাকে ত বিচিত্র নয়। সে-সব কথা তোমার মনে আছে ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হুঁ। তারপর ক্ষণকাল কান খাড়া করিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাস্তবিক, এ পোড়া দেশে যা ক'রে আমরা মেয়েদের বিলিয়ে দিই. তাতে ইতর-ভদ্র সবাই সমান। ওরা চলে গেলে আমি খোঁজ নিয়ে শুনলাম. ওই যে কাল সকালে ঐ ন'বছরের মেয়েটাকে কোন্ অপরিচিত সংসারে টেনে নিয়ে যাবে, আর কখনও হয়ত আসতে পর্যন্ত দেবে না। এদের নিয়মই এই। বাপ ছ'গণ্ডা টাকায় মেয়েটাকে আজ বিক্রি করে দেবে। 'একবার পাঠিয়ে দাও' এ কথা মুখে আনবারও জো থাকবে না। আহা! মেয়েটা সেখানে কতই না কাঁদবে—বিয়ের সে কি জানে বল?

এ-সকল দুর্ঘটনা ত জন্মকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, একরকম সহিয়াও গিয়াছে, আর ক্ষোভ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং প্রত্যুত্তরে কেবল মৌন হইয়াই রহিলাম।

জবাব না পাইয়া সে কহিল. আমাদের দেশে ছোট-বড় সব জাতের মধ্যেই বিয়েটা কেবল বিয়েই নয়—এটা ধর্ম, তাই যা, নইলে—

ভাবিলাম বলি, একে যদি ধর্ম বলিয়াই বুঝিয়াছ ত এত নালিশ কিসের? আর যে ধর্মকর্মে মন প্রসন্ন না হইয়া গ্লানির ভারে অন্তর কালো হইয়া উঠিতে থাকে তাহাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করাই যায় বা কিরূপে?

কিন্তু আমার বলিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী নিজেই পুনশ্চ কহিল, কিন্তু এ-সব বিধি-ব্যবস্থা করে গেছেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি; শাস্ত্রবাক্য মিথ্যাও নয়, অমঙ্গলেরও নয়, আমরা কি-ই বা জানি, আর কতটুকুই বা বুঝি!

ব্যস! যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না। এ সংসারে যাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল, সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের জন্য বহুপূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ায় নূতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই। এ কথা রাজলক্ষ্মীর মুখে এই নূতন শুনিলাম না, আরও অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি এবং বরাবরই চুপ করিয়া গিয়াছি। আমি জানি ইহার জবাব দিতে গেলেই আলোচনাটা প্রথমে উষ্ণ এবং পরক্ষণেই ব্যক্তিগত কলহে নিরতিশয় তিক্ত হইয়া উঠে। ত্রিকালদর্শীদের আমি তাচ্ছিল্য করিতেছি না, রাজলক্ষ্মীর মত আমিও তাঁহাদের অতিশয় ভক্তি করি; শুধু এই কথাটাই ভাবি, তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরাজি-আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয়ত সত্য সত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথাগুলো যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কেমন করিয়া পাইত জানি না, কিন্তু এখন এই অস্পষ্ট দীপালোকে আমার মুখের চেহারাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, তবুও যেন আমার নিভৃত চিন্তার ঠিক দ্বারপ্রান্তেই আঘাত করিল। কহিল, তুমি ভাবচ এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি—ভবিষ্যতের বিধিব্যবস্থা কেউ পূর্বাহ্ণেই নির্দেশ করে দিতে পারে না। কিন্তু আমি বলচি, পারে। আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেচি, এ কাজ তাঁরা না পারলে সজীব মন্ত্রগুলোকেও কখনো দেখতে পেতেন না। বলি, এটা ত মানো, আমাদের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলির প্রাণ আছে? তারা জীবন্ত?

বলিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি না মানতে পার, কিন্তু তবুও এ সত্য। তা নইলে আমাদের দেশের এই পুতুলখেলার বিয়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ-বন্ধন হতে পারত না। এ-সমস্তই ত ওই সজীব মন্ত্রের জোরে! সেই ঋষিদের কৃপায়! অবশ্য, অনাচার আর পাপ কোথায় নেই? সে সর্বত্রই আছে। কিন্তু আমাদের এ দেশের মত সতীত্বই কি তুমি আর কোথাও দেখাতে পারো?

বলিলাম, না। কারণ, এ তাহার যুক্তি নয়—বিশ্বাস।

ইতিহাসের প্রশ্ন হইলে তাহাকে দেখাইতে পারিতাম, এই পৃথিবীতে সজীব মন্ত্রহীন আরও দেশ আছে যেথায় সতীত্বের আদর্শ আজও এমনিই উচ্চ। অভয়ার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারিতাম, এই যদি, তবে তোমাদের জীবন্ত মন্ত্র নর-নারী উভয়কেই এক আদর্শে বাঁধিতে পারে না কেন? কিন্তু এ-সকলের প্রয়োজন ছিল না। আমি জানিতাম তাহার চিত্তের ধারাটা কিছুদিন হইতেই কোন্ দিক দিয়া বহিতেছে।

দুষ্কৃতির বেদনা সে ভাল করিয়াই জানে। যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে কলুষিত না করিয়া কেমন করিয়া যে সে এ জীবনে লাভ করিবে তাহার কিছুই সে ভাবিয়া পায় না। তাহার দুর্বশ হৃদয় ও প্রবুদ্ধ ধর্মবৃত্তি—এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন্ সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া এই দুঃখের জীবনে তাহার তীর্থের মত সুপবিত্র হইয়া উঠিবে সে তাহার কোন কিনারাই দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি পাই। নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া পর্যন্ত অপরের গোপন আক্ষেপ প্রতিনিয়তই আমার চোখে পড়ে। বেশ স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু তবু যেন দেখিতে পাই তাহার যে দুর্মদ কামনা এতদিন অত্যুগ্র নেশার মত তাহার সমস্ত মনটাকে উতলা-উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যেন আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার প্রাপ্তিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে। এই হিসাবের

অঙ্কগুলায় কি আছে জানি না, কিন্তু শূন্য ছাড়া যদি আর কিছুই আজ আর সে না দেখিতে পায় ত, কেমন করিয়া কোথায় গিয়া যে আবার আমি নিজের এই শতচ্ছিন্ন জীবন-জালের গ্রন্থি বাঁধিতে বসিব, এ চিন্তা আমার মধ্যে বহুবার আনাগোনা করিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া কিছুই পাই নাই, কেবল এই কথাটাই নিশ্চয় জানিয়া আছি যে, চিরদিন যে পথে চলিয়াছি, প্রয়োজন হয় ত আবার সেই পথেই যাত্রা শুরু করিব। নিজের সুখ ও সুবিধা লইয়াই কাহারও সমস্যা জটিল করিয়া তুলিব না।

কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, যে মন্ত্রের সজীবতার আলোচনায় আমাদের মধ্যে একমুহূর্তে বিপ্লব বহিয়া গেল, তাহার প্রসঙ্গ লইয়া পাশের বাড়িতেই যে তখন মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল, এ সংবাদ দু'জনের কেহই জানিতাম না।

অকস্মাৎ পাঁচ-সাতজন গোটা-দুই আলো লইয়া অত্যন্ত সোরগোল করিয়া একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক দিল, হুজুর! বাবুমশায়!

আমি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম, রাজলক্ষ্মীও সবিস্ময়ে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নালিশটা তাহারা সকলেই একসঙ্গে এবং সমস্বরে করিতে চায়। রতনের পুনঃ পুনঃ বকুনি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কেহই চুপ করিতে পারিল না। যাহা হউক, ব্যাপারটা বুঝা গেল। কন্যাসম্প্রদান বন্ধ হইয়া আছে, কারণ মন্ত্র ভুল হইতেছে বলিয়া বরপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতের ফুল-জল প্রভৃতি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। বাস্তবিক, এ কি অত্যাচার! পুরোহিতসম্প্রদায় অনেক কীর্তিই করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া জোর করিয়া আর একজন সমব্যবসায়ীর ফুল-জল প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া, এবং শারীরিক বলপ্রয়োগে তাহার মুখ চাপিয়া স্বাধীন ও সজীব মন্ত্রোচ্চারণে বাধা দেওয়া—এমন অত্যাচার ত কখনও শুনি নাই।

রাজলক্ষ্মী কি যে বলিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না; কিন্তু রতন ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া মস্ত একটা ধমক দিয়া কহিল, তোদের আবার পুরুত কি রে? এখানে, অর্থাৎ জমিদারিতে আসিয়া পর্যন্ত সে 'তুমি' বলিবার যোগ্য কাহাকেও পায় নাই, কহিল, ডোম-ডোকালির আবার বিয়ে, তাদের আবার পুরুত! এ কি আমাদের বামুন-কায়েত-নবশাক পেয়েচিস যে বিয়ে দিতে আসবে বামুনঠাকুর? এই বলিয়া সে বারবার আমার ও রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি সগর্বে চাহতে লাগিল। এখানে মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে রতন জাতিতে নাপিত।

মধু ডোম নিজে আসিতে পারে নাই, কন্যাসম্প্রদানে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি যাহা বলিতে লাগিল তাহাতে যদিচ বুঝা গেল ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরা নিজেদের পুরোহিত, তথাপি রাখাল পণ্ডিত তাহাদের ব্রাহ্মণেরই সামিল। কারণ, তাহার গলায় পৈতা আছে এবং সে তাহাদের দশকর্ম করায়। এমন কি, সে তাহাদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত খায় না। সুতরাং এতবড় সাত্ত্বিকতার পরেও আর প্রতিবাদ চলে না। অতএব, আসল ও খাঁটি ব্রাহ্মণের সহিত অতঃপর যদি কোন প্রভেদ থাকে ত সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সে যাহা হউক, ইহাদের ব্যাকুলতায় ও অদূরে বিবাহবাটীর প্রবল চীৎকারশব্দে আমাকে যাইতে হইল। রাজলক্ষ্মীকে কহিলাম, তুমিও চল না, বাড়িতে একলা কি করবে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে মাথা নাড়িল, কিন্তু শেষে কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না। চল, বলিয়া আমার সঙ্গ লইল। আসিয়া দেখিলাম, মধুর সম্বন্ধী অত্যুক্তি করে নাই। বিবাদ তুমুল হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। একদিকে বরপক্ষীয় প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন এবং অন্যদিকে কন্যাপক্ষীয়ও প্রায় ততগুলি। মাঝখানে প্রবল ও স্থূলকায় শিবু পণ্ডিত দুর্বল ও ক্ষীণজীবী রাখাল পণ্ডিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

আমরা সসম্মানে একটা মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করিয়া শিবু পণ্ডিতকে এই

অতর্কিত আক্রমণের হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, হুজুর, মন্তরের 'ম' জানে না এই ব্যাটা, আবার নিজেকে বলে পণ্ডিত! বিবাহটাই আজ ভেস্তে দিত।

রাখাল মুখ ভ্যাঙাইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, হাঁ দিত। পাঁচখানা গাঁয়ে ছাদ্দ, বিয়ে নিত্যি দিচ্ছি, আর আমি জানিনে মন্তর!

মনে ভাবিলাম, এখানেও সেই মন্ত্র! কিন্তু বাটীতে রাজলক্ষ্মীর কাছে নাহয় মৌন থাকিয়াই তর্কের জবাব দিয়াছি, কিন্তু এখানে যদি যথার্থ-ই মধ্যস্থতা করিতে হয় ত বিপদে পড়িতে হইবে। অবশেষে বহু বাদবিতণ্ডায় স্থির হইল যে, রাখালই মন্ত্র পাঠ করাইবে, কিন্তু ভুল যদি কোথাও হয় ত শিবুকে আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। রাখাল রাজী হইয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিল এবং কন্যার পিতার হাতে কয়েকটা ফুল এবং বর-কন্যার দুই হাত একত্র করিয়া দিয়া যে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিল তাহা আমার আজও মনে আছে। এগুলি সজীব কিনা জানি না, এবং মন্ত্র-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ হয়, বেদে ঠিক এই কথাগুলিই ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া যান নাই।

রাখাল পণ্ডিত বরকে বলিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

রাখাল কন্যাকে বলিলেন, বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ।

বালিকা কন্যার উচ্চারণে পাছে ত্রুটি হয় এইজন্য মধু তাহার হইয়া উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শিবু পণ্ডিত দু হাত তুলিয়া বজ্রগর্জনে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্তরই নয়। বিয়েই হ'ল না।

পিছনে একটা টান পাইয়া ফিরিয়া দেখি রাজলক্ষ্মী মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং উপস্থিত সমস্ত লোকই একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল পণ্ডিত লজ্জিতমুখে কি-একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কথা কেহ কানেই লইল না; সকলেই সমস্বরে শিবুকে অনুনয় করিতে লাগিল, পণ্ডিতমশাই, মন্তরটি আপনিই বলিয়ে দিন, নইলে এ বিয়েই হবে না—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সিকি দক্ষিণে ওঁকে দিয়ে আপনিই বারো আনা নেবেন পণ্ডিতমশাই।

শিবু পণ্ডিত তখন ঔদার্য দেখাইয়া কহিলেন, রাখালের দোষ নেই, আসল মন্তর আমি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কেউ জানেই না। বেশি দক্ষিণে আমি চাইনে; আমি এইখান থেকেই মন্ত্রপাঠ করচি, রাখাল ওদের পড়াক। এই বলিয়া সেই শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং পরাজিত রাখাল নিরীহ ভালমানুষটির মত বর-কন্যাকে আবৃত্তি করাইতে লাগিল।

শিবু কহিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

শিবু কহিলেন, মধু, এবার তুমি বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ।

সকন্যা মধু ইহাই আবৃত্তি করিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে পদার্পণ করে নাই।

শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিলেন, বিপিন, তুমি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহা।

বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে বহু সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

শিবু কহিলেন, বর-কন্যা দু'জনেই বল, যুগল মিলনং নমঃ।

বর এবং কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল। ইহার পরে বিরাট হরিধ্বনিসহকারে বর-কন্যাকে বাটীর মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমার চতুষ্পার্শ্বে একটা গুঞ্জনরোল উঠিল—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে, হাঁ, একজন শাস্তর-জানা লোক বটে! মন্তর পড়ালে বটে! রাখাল পণ্ডিত এতকাল আমাদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

সমস্তক্ষণ আমি গম্ভীর হইয়াই ছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত এই অসীম গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়াই রাজলক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। ওখানে কি করিয়া যে সে আপনাকে সংবরণ করিয়া বসিয়াছিল আমি জানি না, কিন্তু ঘরে আসিয়া হাসির প্রবাহে

তাহার যেন দম বন্ধ হইবার জো হইল। বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া সে কেবলই বলিতে লাগিল, হাঁ, একজন মহামহোপাধ্যায় বটে! রাখাল এতদিন এদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

প্রথমটা আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না; তাহার পরে কহিলাম, মহামহোপাধ্যায় দু'জনেই। অথচ, এমনি করেই ত এতকাল এদের মেয়ের মা এবং মেয়ের ঠাকুরমার বিয়ে হয়েচে। রাখালের যাই হোক, শিবু পণ্ডিতের মন্ত্রগুলোও ঠিক ঋষিরুবাচ বলে মনে হ'ল না, কিন্তু তবু ত এদের কোন মন্ত্রই বিফল হয়নি। এদের দেওয়া বিবাহ-বন্ধন ত আজও তেমনি দৃঢ় তেমনি অটুট আছে!

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং একদৃষ্টে চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল।

ছয়

সকালে উঠিয়া শুনিলাম কুশারীমহাশয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক সেই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি একা নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিযা কহিল, না, আমিও আছি।

যাবে?

যাব বৈ কি।

তাহার এই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খাওয়া বস্তুটা যে হিন্দু-ধর্মের কি, এবং সমাজের কতখানি ইহার উপর নির্ভর করে, রাজলক্ষ্মী তাহা জানে—এবং কতবড় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে মানিয়া চলে আমিও তাহা জানি, অথচ এই তাহার জবাব। কুশারীমহাশয় সম্বন্ধে বেশি-কিছু জানি না, তবে বাহির হইতে তাঁহাকে যতটা দেখা গিয়াছে, মনে হইয়াছে তিনি আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ; এবং ইহাও নিশ্চিত যে, রাজলক্ষ্মীর ইতিহাস তিনি অবগত নহেন, কেবল মনিব বলিয়াই আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে আজ সেখানে গিয়া, কি করিয়া কি করিবে আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ, আমার প্রশ্নটা বুঝিয়াও সে যখন কিছুই কহিল না, তখন ইহারই নিহিত-কুণ্ঠা আমাকেও নির্বাক্ করিয়া রাখিল।

যথাসময়ে গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া।

কহিলাম, যাবে না?

সে কহিল, যাবার জন্যেই ত দাঁড়িয়ে আছি। এই বলিয়া সে গাড়ির ভিতরে গিয়া বসিল।

রতন সঙ্গে যাইবে, সে আমার পিছনে ছিল। ঠাকুরানীর সাজসজ্জা দেখিয়া সে যে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমিও আশ্চর্য হইয়া-ছিলাম; কিন্তু সেও যেমন প্রকাশ করিল না, আমিও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। বাড়িতে সে কোনকালেই বেশি গহনা পরে না, কিছুদিন হইতে তাহাও কমিতেছিল। কিন্তু আজ দেখা গেল, গায়ে তাহার কিছুই প্রায় নাই। যে হারটা সচরাচর তাহার গলায় থাকে সেইটি এবং হাতে একজোড়া বালা। ঠিক মনে নাই, তবুও যেন মনে হইল, কাল রাত্রি পর্যন্ত যে চুড়ি-কয়গাছি দেখিয়াছিলাম সেগুলিও যেন সে আজ ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়াছে। পরনের কাপড়খানিও নিতান্ত সাধারণ, বোধ হয় সকালে স্নান করিয়া যাহা পরিয়াছিল তাহাই।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম, একে একে যে সমস্তই ছাড়লে দেখচি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, এমন ত হতে পারে, এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়তি ছিল সেইগুলোই একে একে ঝরে যাচ্ছে! এই বলিয়া সে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল, রতন কাছাকাছি আছে কি না; তার পরে গাড়োয়ানটাও না শুনিতে পায় এমনি অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেশ ত, সে

আশীর্বাদই কর না তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যার বদলে অনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্বাদই তুমি কর।

চুপ করিয়া রহিলাম। কথাটা এমন একদিকে চলিয়া গেল যাহার জবাব দিবার কোন সাধ্যই আমার ছিল না। সেও আর কিছু না বলিয়া মোটা বালিশটা টানিয়া লইয়া গুটিসুটি হইয়া আমার পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল। আমাদের গঙ্গামাটি হইতে পোড়ামাটিতে যাইবার একটা অত্যন্ত সোজা পথ আছে। সম্মুখের শুষ্ক-জল খাদটার উপরে যে সংকীর্ণ বাঁশের সাঁকো আছে, তাহার উপর দিয়া গেলে মিনিট-দশেকের মধ্যেই যাওয়া যায়, কিন্তু গরুর গাড়িতে অনেকখানি রাস্তা ঘুরিয়া ঘণ্টা-দুই বিলম্বে পোঁছিতে হয়। এই দীর্ঘ পথটায় দু'জনের মধ্যে আর কোন কথাই হইল না। সে কেবল আমার হাতখানা তাহার গলার কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমানোর ছল করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

কুশারীমহাশয়ের দ্বারে আসিয়া যখন গো-যান থামিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অতিশয় সম্মানিত অতিথি বলিয়াই বোধ হয় সদরে না বসাইয়া একেবারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তা ছাড়া, অনতিবিলম্বেই বুঝা গেল, শহর হইতে দূরবর্তী এই-সকল সামান্য পল্লীঅঞ্চলে অবরোধের সেরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত নাই। কারণ আমাদের শুভাগমন প্রচারিত হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের অনেকেই যাহারা খুড়ো, জ্যাঠা, মাসিমা ইত্যাদি প্রীতি ও আত্মীয় সম্বোধনে কুশারী ও তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিয়া একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে প্রবেশ করিয়া তামাশা দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেই অবলা নহেন।

রাজলক্ষ্মীর ঘোমটা দিবার অভ্যাস ছিল না, সেও আমারই মত সম্মুখের বারান্দায় একখানি আসনের উপর বসিয়াছিল। এই অপরিচিত রমণীর সাক্ষাতেও এই অনাহূতের দল বিশেষ কোন সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। তবে সৌভাগ্য এইটুকু যে, আলাপ করিবার ঔৎসুক্যটা নিতান্তই তাহার প্রতি না হইয়া আমার প্রতিই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কর্তা অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার ব্রাহ্মণীও তেমনি, কেবল বাড়ির বিধবা মেয়েটিই রাজলক্ষ্মীর পাশে স্থির হইয়া বসিয়া একটা তালপাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল। আর, আমি কেমন আছি, কি অসুখ, কতদিন থাকিব, জায়গাটা ভাল মনে হইতেছে কি না, জমিদারি নিজে না দেখিলে চুরি হয় কি না, ইহার নূতন কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি কি না, ইত্যাদি অর্থ ও ব্যর্থ নানাবিধ প্রশ্নোত্তরমালার ফাঁকে ফাঁকে কুশারীমহাশয়ের সাংসারিক অবস্থাটা একটু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বাটীতে অনেকগুলি ঘর এবং সেগুলি মাটির; তথাপি মনে হইল কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা সচ্ছল ত বটেই, বোধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের একধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা-দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে, তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা-দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী-বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লী নিকান-মুছান ঝরঝর করিতেছে এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপুষ্ট গো-বৎস ঘাড় কাত করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে। তাহাদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী পরিবারের অন্নের মত দুগ্ধেরও বিশেষ কোন অনটন নাই। দক্ষিণের বারান্দার দেয়াল ঘেঁষিয়া ছয়-সাতটা বড় বড় মাটির কলসী বিড়ার উপর বসান আছে। হয়ত গুড় আছে, কি কি আছে জানি না, কিন্তু যত্ন দেখিয়া মনে হইল না যে তাহারা শূন্যগর্ভ কিংবা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম ঢেরা-সমেত পাট এবং শণের গোছা বাঁধা রহিয়াছে; সুতরাং বাটীতে যে বিস্তর দড়িদড়ার আবশ্যক হয় তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না।

কুশারীগৃহিণী খুব সম্ভব আমাদের অভ্যর্থনার কাজেই অন্যত্র নিযুক্তা, কর্তাটিও এক-

বারমাত্র দেখা দিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছিলেন; তিনি অকস্মাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া অনুপস্থিতির কৈফিয়ত আর একপ্রকারে দিয়া কহিলেন, মা, এইবার যাই, আহ্নিকটা সেরে এসে একেবারে বসি। বছর পনর-ষোলর একটি সুন্দর সবলকায় ছেলে উঠানের একধারে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত আমাদের কথা-বার্তা শুনিতেছিল, কুশারীমহাশয়ের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, বাবা হরিপদ, নারায়ণের অন্ন বোধ করি এতক্ষণে প্রস্তুত হ'ল, একবার ভোগটি দিয়ে এসো গে বাবা। আহ্নিকের বাকিটুকু শেষ করতে আর আমার দেরি হবে না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আজ মিছাই আপনাকে কষ্ট দিলাম--বড় দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আর দেরি না করিয়া চক্ষের পলকে নিজেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পরে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠাঁই করার খবর পেঁছিল। বাঁচা গেল। কেবল অতিরিক্ত বেলার জন্যে নয়, এইবার আগন্তুকগণের প্রশ্নবাণে বিরতি অনুভব করিয়াই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অব্যাহতি দিয়া যে যাঁহার বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু খাইতে বসিলাম কেবল আমি একা! কুশারীমহাশয় সঙ্গে বসিলেন না, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হেতুটা তিনি সবিনয়ে এবং সগৌরবে নিজেই ব্যক্ত করিলেন। উপবীত-ধারণের দিন হইতে ভোজনকালে সেই যে মৌনী হইয়াছিলেন, সে ব্রত আজও ভঙ্গ করেন নাই: সুতরাং একাকী নির্জন গৃহে এই কাজটা তিনি এখনও সম্পন্ন করেন। আপত্তি করিলাম না, আশ্চর্যও হইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে যখন শুনিলাম, আজ তাহারও নাকি কি একটা ব্রত আছে—পরান্ন গ্রহণ করিবে না, তখনই আশ্চর্য হইলাম। এই ছলনায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম এবং ইহার কি যে প্রয়োজন ছিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথা চক্ষের পলকে বুঝিয়া লইয়া কহিল, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না, ভাল করে খাও। আমি যে আজ খাব না, এ'রা সবাই জানতেন।

বলিলাম, অথচ আমি জানতাম না। কিন্তু এই যদি, কষ্ট স্বীকার করে আসার কি আবশ্যক ছিল?

ইহার উত্তর রাজলক্ষ্মী দিল না, দিলেন কুশারীগৃহিণী। কহিলেন, এ কষ্ট আমিই স্বীকার করিয়েচি বাবা। মা যে এখানে খাবেন না তা জানতাম; তবু আমরা যাঁদের দয়ায় দুটি অন্ন পাই, তাঁদের পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়বে এ লোভ সামলাতে পারলাম না। কি বল মা? এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিলেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এর জবাব আজ নয় মা, আর একদিন আপনাকে দেব। এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া, কুশারীগৃহিণীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলাম। পল্লীগ্রামে, বিশেষ এইরূপ সুদূর পল্লীতে ঠিক এমনি সহজ সুন্দর কথাগুলি যেন কোন রমণীর মুখেই শুনিবার কল্পনা করি নাই; কিন্তু এখনও যে এই পল্লী অঞ্চলেই আরও একটি ঢের বেশি আশ্চর্য নারীর পরিচয় পাইতে বাকী ছিল, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার পরিবেশনের ভার বিধবা কন্যার উপর অর্পণ করিয়া কুশারীগৃহিণী তালপাখা হাতে আমার সুমুখে বসিয়াছিলেন। বোধ হয়, বয়সে আমার অনেক বড় হইবেন বলিয়াই মাথার উপর অঞ্চলখানি ছাড়া মুখে কোন আবরণ ছিল না। তাহা সুন্দর কিংবা অসুন্দর মনেই হইল না। কেবল এইটুকুই মনে হইল, ইহা সাধারণ বাঙ্গালী মায়ের মতই স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। দ্বারের কাছে কর্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া ছিলেন; বাহির হইতে তাঁহার মেয়ে ডাকিয়া কহিল, বাবা, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। বেলা অনেক হইয়াছিল এবং এই খবরটুকুর জন্যই বোধ হয় তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তথাপি একবার বাহিরে ও একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখন একটু থাক মা, বাবুর খাওয়াটা—

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না তুমি যাও, মিথ্যে সময় নষ্ট কোরো না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হয় না-আমি জানি।

কুশারী সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন; কহিলেন, নষ্ট আর কি হবে, বাবুর খাওয়াটা হয়েই যাক না।

গৃহিণী কহিলেন, আমি থাকতেও যদি খাওয়ার ত্রুটি হয় ত তোমার দাঁড়িয়ে থাকলেও সারবে না। তুমি যাও—কি বল বাবা? এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, হয়ত বা ত্রুটি বাড়বে। আপনি যান কুশারীমশায়, অমন অভুক্ত চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন পক্ষেই সুবিধে হবে না। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনে হইল সম্মানিত অতিথির আহারের স্থানে উপস্থিত না থাকিবার সঙ্কোচটা সঙ্গে লইয়াই গেলেন। কিন্তু এইটাই যে আমার মস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা কিছুক্ষণ পরেই আর অবিদিত রহিল না। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, নিরামিষ আলোচালের ভাত খান; জুড়িয়ে গেলে আর খাওয়াই হয় না, তাই জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাও বলি বাবা, যারা অন্নদাতা তাঁদের পূর্বে নিজের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করাও কঠিন।

কথাটায় মনে মনে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, বলিলাম, অন্নদাতা আমি নই; কিন্তু তাও যদি সত্যি হয়, সেটুকু এত কম যে, এটুকু বাদ গেলে বোধ করি আপনারা টেরও পেতেন না।

কুশারীগৃহিণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানি ধীরে ধীরে যেন অতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। তার পরে কহিলেন, তোমার কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয় বাবা, ভগবান আমাদের কিছু কম দেননি; কিন্তু এখন মনে হয় এত যদি তিনি নাই দিতেন, হয়ত এর চেয়ে তাঁর বেশি দয়াই প্রকাশ পেত। বাড়িতে ওই ত কেবল একটা বিধবা মেয়ে— কি হবে আমাদের গোলাভরা ধানে, কড়াভরা দুধে, আর কলসী কলসী গুড় নিয়ে? এ-সব ভোগ করবার যারা ছিল তারা ত আমাদের ত্যাগ করেই চলে গেছে।

কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল এবং ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, অনেক গভীর বেদনাই এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত আছে। ভাবিলাম, হয়ত তাঁহার কোন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ওই যে ছেলেটিকে ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া হতাশ্বাস পিতা-মাতা আর কোন সান্ত্বনাই পাইতেছেন না। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, রাজলক্ষ্মীও কোন কথা না কহিয়া কেবল তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমারই মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙ্গিল তাঁহার পরের কথায়। তিনি আপনাকে আপনি সংবরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও ত তোমরাই অন্নদাতা। কর্তাকে বললাম, মনিবকে দুঃখের কথা জানাতে লজ্জা নেই, আমাদের মাকে-বাবাকে নিমন্ত্রণের ছল করে একবার ধরে আন, আমি তাঁদের কাছে কেঁদেকেটে দেখি যদি তাঁরা এর কোন বিহিত করে দিতে পারেন। এই বলিয়া এইবার তিনি অঞ্চল তুলিয়া নিজের অশ্রুজল মোচন করিলেন। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, সেও আমারই মত সংশয়ে পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্বের মত এখনও দু'জনে মৌন হইয়া রহিলাম।

কুশারীগৃহিণী এইবার তাঁহাদের দুঃখের ইতিহাস ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত শুনিয়া বহুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা বাহির হইল না; কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে, এ কথা বিবৃত করিয়া বলিতে ঠিক এতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মী পরান্ন গ্রহণ করিবে না শুনিয়াও এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ হইতে শুরু করিয়া কর্তাটিকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত কিছুই বাদ দেওয়া চলিত না। কিন্তু সে যাই হোক কুশারীগৃহিণী তাঁহার চক্ষের জল ও অস্ফুট বাক্যের ভিতর দিয়া ঠিক কতখানি যে ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানি না এবং ইহার কতখানি যে সত্য তাহাও একপক্ষ শুনিয়া নিশ্চয় করা কঠিন; কিন্তু আমাদের মধ্যস্থতায় যে সমস্যা আজ তাঁহারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সনির্বন্ধ আবেদন করিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মধুর ও তেমনি কঠোর।

কুশারীগৃহিণী যে দুঃখের ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন তাহার মোট কথাটা এই যে, গৃহে তাঁহাদের খাওয়া-পরার যথেষ্ট সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও শুধু যে কেবল সংসারটাই তাঁহাদের বিষ হইয়া গিয়াছে তাই নয় সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁহারা লজ্জায় মুখ দেখাইতে

পারিতেছেন না এবং সমস্ত দুঃখের মূল হইতেছে তাঁহার একমাত্র ছোট জা সুনন্দা; এবং যদিচ তাঁহার দেবর যদুনাথ ন্যায়রত্নও তাঁহাদের কম শত্রুতা করেন নাই, কিন্তু আসল অভিযোগটা তাঁহার সেই সুনন্দার বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহী সুনন্দা ও তাঁহার স্বামী যখন সম্প্রতি আমাদেরই প্রজা, তখন যেমন করিয়াই হোক ইহাদের বশ করিতে হইবে। ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরূপ। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী যখন স্বর্গগত হন তখন তিনি এ বাড়ির বধূ। যদু কেবল ছয়-সাত বছরের বালক। এ বালককে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহারই উপরে পড়ে এবং সেদিন পর্যন্ত এ ভার তিনি বহন করিয়াই আসিয়াছেন। পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে একখানি মাটির ঘর, বিঘা দুই-তিন ব্রহ্মোত্তর জমি এবং ঘরকয়েক যজমান। মাত্র এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার স্বামীকে সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে হয়। আজ এই যে প্রাচুর্য, এই যে সচ্ছলতা, এ-সকল সমস্তই তাঁহার স্বকৃত উপার্জনের ফল। ঠাকুরপো কোন সাহায্যই করেন নাই, সাহায্য কখনও তাঁহার কাছে প্রার্থনাও করা হয় নাই।

আমি কহিলাম, এখন বুঝি তিনি অনেক দাবি করছেন?

কুশারীগৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, দাবি কিসের বাবা, এ ত সমস্তই তার। সমস্তই সে নিত, সুনন্দা যদি না মাঝে পড়ে আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিত।

আমি কথাটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আপনার এই ছেলেটি?

তিনিও প্রথমটা বুঝিতে পারিলেন না, পরে বুঝিয়া বলিলেন, ওই বিজয়ের কথা বলচ? ও ত আমাদের ছেলে নয় বাবা, ও একটি ছাত্র। ঠাকুরপোর টোলে পড়ত, এখনও তার কাছেই পড়ে, শুধু আমার কাছে থাকে। এই বলিয়াই তিনি বিজয় সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া কহিতে লাগিলেন, কত দুঃখে যে ঠাকুরপোকে মানুষ করি সে শুধু ভগবান জানেন এবং পাড়ার লোকেও কিছু কিছু জানে। কিন্তু নিজে সে আজ সমস্ত ভুলেচে, শুধু আমরাই ভুলতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সে-সব যাক বাবা, সে অনেক কথা। আমি ঠাকুরপোর পৈতে দিলাম, কর্তা তাকে পড়ার জন্যে মিহিরপুরে শিবু তর্কালঙ্কারের টোলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা, ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি বলে আমি নিজে কত দিন গিয়ে মিহিরপুরে বাস করে এসেচি, সেও আজ তার মনে পড়ে না। যাক— এমন করে কত বছরই না কেটে গেল। ঠাকুরপোর পড়া সাঙ্গ হ'ল, কর্তা তাকে সংসারী করবার জন্যে মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময়ে বলা নেই কহা নেই, হঠাৎ একদিন শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করে এনে উপস্থিত। আমাকে নাই বলুক বাবা, অমন দাদার পর্যন্ত একটা মত নিলে না।

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মত না নেওয়ার কি বিশেষ কারণ ছিল?

গৃহিণী কহিলেন, ছিল বৈ কি। ওরা আমাদের ঠিক স্ব-ঘরও নয়, কুলে শীলে মানেও ঢের ছোট। কর্তা রাগ করলেন, দুঃখে লজ্জায় বোধ করি এমন মাসখানেক কারও সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত কইলেন না; কিন্তু আমি রাগ করিনি। সুনন্দার মুখখানি দেখে প্রথম থেকেই যেন গলে গেলাম। তার উপর যখন শুনতে পেলাম, তার মা মারা গেছে, বাপ ঠাকুরপোর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে পেয়ে আমার কি যে হ'ল তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সে যে একদিন তার এমন শোধ দেবে, এ কথা তখন কে ভেবেছিল! এই বলিয়া তিনি হঠাৎ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বুঝিলাম, এইখানে ব্যথাটা অতিশয় তীব্র, কিন্তু নীরবে রহিলাম। রাজলক্ষ্মীও এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁরা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে তিনি ঘাড় নাড়িয়া যাহা ব্যক্ত করিলেন তাহাতে বুঝা গেল, ইঁহারা আজও এই গ্রামেই আছেন। ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা কহিলেন না, তাঁহার সুস্থ হইতে একটু বেশি সময় গেল। কিন্তু আসল বস্তুটা এখন পর্যন্ত ভাল করিয়া বুঝাই গেল না। এদিকে আমার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কারণ কান্নাকাটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। সহসা তিনি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং আমার থালার দিকে

চাহিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাক বাবা, সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে শেষও হবে না, তোমাদের ধৈর্য থাকবে না। আমার সোনার সংসার যারা চোখে দেখেচে, কেবল তারাই জানে, ছোটবৌ আমার কি সর্বনাশ করে গেছে। কেবল সেই লঙ্কাকাণ্ডটাই তোমাদের সংক্ষেপে বলব।

যে সম্পত্তিটার উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর, সেটা এক সময়ে একজন তাঁতির ছিল। বছরখানেক পূর্বে হঠাৎ একদিন সকালে তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেটিকে সঙ্গে করে বাড়িতে এসে উপস্থিত। রাগ করে কত কি যে ব'লে গেল তার ঠিকানা নেই, হয়ত তার কিছুই সত্য নয়, হয়ত তার সমস্তই মিথ্যে। ছোটবৌ স্নান করে যাচ্ছিল রান্নাঘরে, সে যেন সেই-সব শুনে একেবারে পাথর হয়ে গেল। তারা চলে গেলেও তার সে ভাব আর ঘুচতে চাইল না। আমি ডেকে বললাম, সুনন্দা, দাঁড়িয়ে রইলি, বেলা হয়ে যাচ্চে না? কিন্তু জবাবের জন্য তার মুখের পানে চেয়ে আমার ভয় হ'ল। তার চোখের চাহনিতে কিসের যেন একটা আলো ঠিকরে পড়চে, কিন্তু শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে ফ্যাকাশে—বিবর্ণ। তাঁতি-বৌয়ের প্রত্যেক কথাটি যেন বিন্দু বিন্দু করে তার সর্বাঙ্গ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। সে তখ্‌খনি আমার জবাব দিলে না, কিন্তু আস্তে আস্তে কাছে এসে বললে, দিদি, তাঁতিবৌকে তার স্বামীর বিষয় তোমরা ফিরিয়ে দেবে না! তার ঐটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্বস্ব বঞ্চিত করে সারাজীবন পথের ভিখারী করে রাখবে?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, শোন কথা একবার! কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেলে ইনি কিনে নিয়েচেন। নিজের কেনা বিষয় কে কবে পরকে ছেড়ে দেয় ছোটবৌ?

ছোটবৌ বললে, কিন্তু বট্‌ঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায়?

রাগ করে জবাব দিলাম, সে কথা জিজ্ঞেস কর্‌ গে যা তোর বট্‌ঠাকুরকে—বিষয় সে কিনেচে। এই বলে আহ্নিক করতে চলে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সত্যিই ত। যে বিষয় নীলাম হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে দিতেই বা ছোটবৌ বলে কি করে?

কুশারীগৃহিণী কহিলেন, বল ত বাছা! কিন্তু এ কথা বলা সত্ত্বেও তাঁহার মুখের উপর লজ্জার যেন একটা কালো ছায়া পড়িল। কহিলেন, তবে ঠিক নিলাম হয়েই ত বিক্রি হয়নি কিনা তাই। আমরা হলাম তাদের পুরুত-বংশ। কানাই বসাক মৃত্যুকালে এঁর উপরেই সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন ত আর ইনি জানতেন না, সেই সঙ্গে একরাশ দেনাও রেখে গিয়েছিল!

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমি উভয়েই কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কি যেন একটা নোংরা জিনিস আমার মনের ভিতরটা একমুহূর্তেই একেবারে মলিন করিয়া দিয়া গেল। কুশারীগৃহিণী বোধ করি ইহা লক্ষ্য করিলেন না। বলিলেন, জপ-আহ্নিক সমস্ত সেরে ঘণ্টা-দুই পরে ফিরে এসে দেখি সুনন্দা সেইখানে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে, কোথাও একটা পা পর্যন্ত বাড়ায় নি। কর্তা কাছারি সেরে এখ্‌খুনি এসে পড়বেন; ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে খামার দেখতে গেছে, তারও ফিরতে দেরি নেই। বিজয় নাইতে গেছে, এখ্‌খুনি এসে ঠাকুরপুজোয় বসবে। রাগের পরিসীমা রইল না; বললাম, তুই কি রান্না-ঘরে আজ ঢুকবি নে? ওই বজ্জাত তাঁতিবেটীর ছেঁড়া কথা নিয়েই সারাদিন বসে থাকবি?

সুনন্দা মুখ তুলে বললে, না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয়, সে যদি তোমরা ফিরিয়ে না দাও ত আমি রান্নাঘরে ঢুকব না। ওই নাবালক ছেলেটার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী-পুত্রকেও খাওয়াতে পারব না, ঠাকুরের ভোগ রেঁধেও দিতে পারব না। এই বলে সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। সুনন্দাকে আমি চিনতাম। সে যে মিথ্যা কথা বলে না, সে যে তার অধ্যাপক সন্ন্যাসী বাপের কাছে ছেলেবেলা থেকে অনেক শাস্ত্র পড়েচে, তাও জানতাম; কিন্তু সে যে মেয়েমানুষ হয়েও এমন পাষাণ-কঠিন হতে পারবে তাই কেবল তখনো জানতাম না। আমি তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে গেলাম। পুরুষেরা সব বাড়ি ফিরে এলেন। কর্তার খাবার সময় সুনন্দা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। আমি দূর থেকে হাত জোড় করে বললাম, সুনন্দা, একটু ক্ষমা দে, ওঁর খাওয়াটা হয়ে যাক। সে এটুকু অনুরোধও

রাখলে না। গণ্ডূষ করে খেতে বসছিলেন, জিজ্ঞেসা করলে, তাঁতিদের সম্পত্তি কি আপনি টাকা দিয়ে নিয়েছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যাননি, এ ত আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেচি। তবে এত টাকা পেলেন কোথায়?

যে কখনো কথা কয় না তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে কর্তা প্রথমে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, এ-সব কথার মানে কি বৌমা?

সুনন্দা উত্তর দিলে, এর মানে যদি কেউ জানে ত সে আপনি। আজ তাঁতিবৌ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল। তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার কাছে বাহুল্য—কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় যার তাকে যদি ফিরিয়ে না দেন ত আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামী-পুত্রকে খেতে দিতে পারব না।

আমার মনে হ'ল বাবা, হয় আমি স্বপ্ন দেখচি, নাহয় সুনন্দাকে ভূতে পেয়েছে। যে ভাশুরকে সে দেবতার বেশি ভক্তি করে তাঁকেই এই কথা! উনিও খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মত বসে রইলেন; তার পরে জ্বলে উঠে বললেন, বিষয় পাপের হোক, পুণ্যের হোক, সে আমার—তোমার স্বামী-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায় তোমরা আর কোথাও যেতে পার। কিন্তু বৌমা, তোমাকে আমি এতকাল সর্বগুণময়ী বলেই জানতাম, কখনো এমন ভাবিনি। এই বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সেদিন সমস্তদিন আর কারও মুখে ভাত-জল গেল না। কেঁদে গিয়ে ঠাকুরপোর কাছে পড়লাম, বললাম, ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি কোলে করে মানুষ করেছি—তার এই প্রতিফল! ঠাকুরপোর চোখ-দুটো জলে ভরে গেল, বললে, বৌঠান, তুমি আমার মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদের বড় যে, সে ধর্ম। আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। শ্বশুরমহাশয় সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কখ্খনো ভুল করেনি।

হায়রে পোড়া কপাল! তাকেও যে পোড়ারমুখী ভেতরে ভেতরে এত বশ করে রেখেছিল, আজ আমার তায় চোখ খুলল। সেদিন ভাদ্রসংক্রান্তি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থেকে থেকে ঝরঝর করে জল পড়চে, কিন্তু হতভাগী একটা রাত্তিরের জন্যেও আমাদের মুখ রাখলে না, ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমার শ্বশুরের কালের একঘর প্রজা মরেহেজে বছর-দুই হ'ল চলে গেছে, তাদেরই ভাঙ্গা ঘর একখানি তখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল; শিয়াল-কুকুর-সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে তাতেই গিয়ে সেই দুর্দিনে আশ্রয় নিলে। উঠোনের জল-কাদা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলাম, সর্বনাশী, এই যদি তোর মনে ছিল, এ সংসারে ঢুকেছিলি কেন? বিনুকে পর্যন্ত যে নিয়ে চললি, তুই কি শ্বশুরকুলের নামটা পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে দিবিনে প্রতিজ্ঞা করেচিস? কিন্তু কোন উত্তর দিলে না। বললাম, খাবি কি? জবাব দিলে, ঠাকুর যে তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর রেখে গেচেন, তার অর্ধেকটাও ত আমাদের। কথা শুনে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হ'ল। বললাম, হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চলবে না। তোরা নাহয় না খেয়ে মরতে পারিস, কিন্তু আমার বিনু? বললে, একবার কানাই বসাকের ছেলের কথা ভেবে দেখ দিদি। তার মত একবেলা এক সন্ধ্যে খেয়েও যদি বিনু বাঁচে, ত সেই ঢের।

তারা চলে গেল। সমস্ত বাড়িটা যেন হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। সে রাত্রিতে আলো জ্বলল না, হাঁড়ি চড়ল না। কর্তা অনেক রাত্রে ফিরে এসে সমস্ত রাত ওই খুঁটিটা ঠেস দিয়ে বসে কাটালেন। হয়ত বিনু আমার ঘুমোয় নি, হয়ত বাছা আমার ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করচে। ভোর না হতেই রাখালকে দিয়ে গরু-বাছুর পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু রাক্ষুসী ফিরিয়ে দিয়ে তারই হাতে বলে পাঠালে, বিনুকে আমি দুধ খাওয়াতে চাইনে, দুধ না খেয়ে বেঁচে থাকবার শিক্ষা দিতে চাই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া কেবল একটা সুগভীর নিশ্বাস পড়িল; গৃহিণীর সেই দিনের সমস্ত বেদনা ও অপমানের স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল, এবং আমার হাতের ডাল-ভাত শুকাইয়া একেবারে চামড়া হইয়া উঠিল।

কর্তার খড়মের শব্দ শুনা গেল, তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা হইয়াছে। আশা করি

তাঁহার মৌনব্রত অক্ষুণ্ণ-অটুট থাকিয়া তাঁহার সাত্ত্বিক আহারের আজ কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই, কিন্তু এদিকের ব্যাপারটা জানিতেন বলিয়াই বোধ করি আমার তত্ত্ব লইতে আর আসিলেন না। গৃহিণী চোখ মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, তার পর গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে মুখে কি দুর্নাম, কি কেলেঙ্কারী বাবা—সে আর তোমাদের কি বলব! কর্তা বললেন, দু'দিন যাক, দুঃখের জ্বালায় তারা আপনিই ফিরবে। আমি বললাম, তাকে চেনো না, সে ভাঙবে কিন্তু নুইবে না। আর তাই হ'ল। একটার পর একটা করে আজ আট মাস কেটে গেল, কিন্তু তাকে হেঁট করতে পারলে না। কর্তা ভেবে ভেবে আর আড়ালে কেঁদে কেঁদে যেন কাঠ হয়ে উঠতে লাগলেন। ছেলেটা ছিল তাঁর প্রাণ, আর ঠাকুরপোকে ভালবাসতেন ছেলের চেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে না পেরে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁতিদের যাতে কষ্ট না হয় তিনি করবেন; কিন্তু সর্বনাশী জবাব দিলে, যা তাদের ন্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে দিলেই তবে ঘরে ফিরব তার এক ছটাক কোথাও বাকি থাকতে যাব না। অর্থাৎ তার মানে, নিজেদের অবধারিত মৃত্যু।

আমি গেলাসের জলে হাতখানা একবার ডুবাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তাঁদের কি করে চলে?

কুশারীগৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, এর জবাব আব আমাকে দিতে ব'লো না বাবা। এ আলোচনা কেউ করতে এলে আমি কানে আঙুল দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই,—মনে হয় বুঝিবা আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আট মাস এ বাড়িতে মাছ আসে না, দুধ-ঘির কড়া চড়ে না। সমস্ত বাড়িটার ওপর কে যেন এক মর্মান্তিক অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তিনজনেই আমরা স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আবার যখন গাড়িতে গিয়া বসিলাম, কুশারীগৃহিণী সজল-কণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর কানে কানে বলিলেন, মা, তারা তোমারই প্রজা। আমার শ্বশুরের দরুন যে জমিটুকুর ওপর তাদের নির্ভর সেটুকু তোমার গঙ্গামাটিতেই।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তিনি পুনশ্চ বলিযা উঠিলেন, মা তোমার বাড়ি থেকেই চোখে পড়ে। নালার এ-দিকে যে ভাঙা পোড়ো ঘরটা দেখা যায়, সেইটে।

রাজলক্ষ্মী তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

গাড়ি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন কথাই কহিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কহিলাম, লক্ষ্মী, যার লোভ নেই, যে চায় না, তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া অল্প একটুখানি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি। তোমার কাছে আমার আর কিছুই না হোক এ শিক্ষা হয়েচে।

সাত

আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারীমহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃজায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। মানুষকে এত শীঘ্র এবং এত সহজে রাজলক্ষ্মী আপনার করিয়া লইতে পারে যে, সুনন্দা যে একদিন আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। না হইলে এই আশ্চর্য মেয়েটিকে জানিবার সুযোগ আমার কখনও ঘটিত না। অধ্যাপক যদু তর্কালঙ্কারের ভাঙাচোরা দু-তিনখানা ঘব আমাদের বাড়ির পশ্চিমে মাঠের এক প্রান্তে চাহিলেই সোজা চোখে পড়ে —এখানে আসিয়া পর্যন্তই পড়িয়াছে, কেবল এক বিদ্রোহিণী যে ওইখানে তার স্বামী-পুত্র লইয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহাই জানিতাম না। বাঁশের পুল পার হইয়া একটা কঠিন অনুর্বর মাঠের উপর দিয়া মিনিট-দশেকের পথ; মাঝখানে গাছপালা প্রায় কিছুই নাই, অনেকদূর

পর্যন্ত বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া যখন ওই জীর্ণ শ্রীহীন ঘরগুলি চোখে পড়িল তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত একপ্রকার অভূতপূর্ব ব্যথা ও আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম; এবং যে বস্তু অনেকদিন অনেক উপলক্ষে দেখিয়াও বার বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংসারে কোন-কিছুরই কেবলমাত্র বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বলিবার জো নাই। কে বলিবে ওই পোড়ো বাড়িটা শিয়াল-কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে! কে অনুমান করিবে ওই কয়খানা ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শকুন্তলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে; হয়ত স্মৃতি ও ন্যায়ের মীমাংসা ও বিচার লইয়া ছাত্র-পরিবৃত এক নবীন অধ্যাপক মগ্ন হইয়া থাকেন! কে জানিবে উহারই মধ্যে এই বাঙ্গলাদেশের এক তরুণী নারী ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখিতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে!

দক্ষিণের জানালা দিয়া বাটীর মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় মনে হইল উঠানের উপর কি যেন একটা হইতেছে—রতন আপত্তি করিতেছে এবং রাজলক্ষ্মী তাহা খণ্ডন করিতেছে, সুতরাং কণ্ঠস্বরটা তাহারই কিছু প্রবল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া গেল; কহিল, ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝি? যাবেই ত। রতন, তুই গলাটা একটু খাটো কর বাবা, নইলে আমি ত আর পারিনে।

এইপ্রকার অনুযোগ এবং অভিযোগে কেবল রতনই একা নয়, বাড়িসুদ্ধ সকলেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। অতএব সেও চুপ করিয়া রহিল, আমিও তেমনি কথা কহিলাম না।

দেখিলাম একটা বড় চাঙ্গারিতে চাল-ডাল-ঘি-তেল প্রভৃতি এবং আর-একটা ছোট পাত্রে এতজ্জাতীয় নানাবিধ ভোজ্যবস্তু সজ্জিত হইয়াছে। মনে হইল, এইগুলির পরিমাণ ও তাহাদিগকে বহন করিবার শক্তিসামর্থ্য-প্রসঙ্গেই রতন প্রতিবাদ করিতেছিল। ঠিক তাই। রাজলক্ষ্মী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, শোন এর কথা! এই ক'টা চাল-ডাল বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না! এ যে আমি নিয়ে যেতে পারি রতন। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া স্বচ্ছন্দে বড় ঝুড়িটা তুলিয়া ধরিল।

বাস্তবিক ভার হিসাবে মানুষের পক্ষে, এমন কি রতনের পক্ষেও এগুলি বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু কঠিন ছিল আর একটা কাজ। ইহাতে তাহার মর্যাদাহানি হইবে। কিন্তু মনিবের কাছে লজ্জায় এই কথাটাই সে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজেই এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া কহিলাম, তোমার যথেষ্ট লোকজন আছে, প্রজারও অভাব নেই—তাদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, রতন নাহয় খালি হাতে সঙ্গে যাক।

রতন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী একবার আমার ও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হতভাগা আধঘণ্টা ধরে ঝগড়া করলে, তবু বললে না যে, ও-সব ছোট কাজ রতনবাবুর নয়। যা, কাউকে ডেকে আন্ গে।

সে চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে উঠেই এ-সব যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মানুষের খাবার জিনিস সকালে পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোথায় পাঠান হচ্ছে? এবং তার হেতু?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হেতু মানুষে খাবে এবং যাচ্ছে বামুনবাড়িতে।

কহিলাম, বামুনটি কে?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় ভাবিল নামটা বলিবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, দিয়ে বলতে নেই, পুণ্যি কমে যায়। যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস, তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দশটা, বাহিরের ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া কাজের অভাবে একখানা পুরানো সাপ্তাহিক কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম, একটা অচেনা কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণে মুখ তুলিয়া দেখিলাম—আগন্তুক অপরিচিতই বটে। কহিলেন, নমস্কার বাবুমশায়।

আমিও হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, বসুন।

ব্রাহ্মণের অতিশয় দীন বেশ—পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মলিন উত্তরীয়। পরিধানের বস্ত্রখানি তেমনি মলিন, উপরন্তু দু-তিন স্থানে গ্রন্থি বাঁধা। পল্লী-গ্রামের ভদ্রব্যক্তির আচ্ছাদনের দীনতা বিস্ময়ের বস্তুও নয়। কেবলমাত্র ইহার উপরেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অনুমান করাও চলে না। তিনি সম্মুখে বাঁশের মোড়াটার উপরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজা, ইতিপূর্বেই আমার আসা কর্তব্য ছিল, ভারি ত্রুটি হয়ে গেছে।

আমাকে জমিদার মনে করিয়া কেহ আলাপ করিতে আসিলে আমি মনে মনে যেমন লজ্জিত হইতাম, তেমনি বিরক্ত হইতাম; বিশেষত ইহারা যে-সকল নিবেদন ও আবেদন লইয়া উপস্থিত হইত এবং যে-সকল বদ্ধমূল উৎপাত ও অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিত তাহাতে আমার কোন হাতই ছিল না। ইঁহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারিলাম না; কহিলাম, বিলম্বে আসার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ একেবারে না এলেও আমি ত্রুটি নিতাম না—ও-রকম আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অসময়ে এসে আপনার কাজে হয়ত ব্যাঘাত করলাম, আমি আর একদিন আসব। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন?

আমার বিরক্তিটা তিনি অনায়াসে লক্ষ্য করিলেন। একটু মৌন থাকিয়া শান্তভাবে বলিলেন, আমি সামান্য ব্যক্তি, প্রয়োজনও যৎসামান্য। মাঠাকরুন আমাকে স্মরণ করেচেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাকতে পারে—আমার কিছু নেই।

জবাবটা কঠোর কিন্তু সত্য, এবং আমার প্রশ্নের তুলনায় অসঙ্গতও নয়। কিন্তু এখানে আসিয়া পর্যন্ত নাকি এরূপ জবাব শুনাইবার লোক ছিল না, তাই ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে কেবল বিস্ময়াপন্ন নয়, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। অথচ মেজাজ আমার স্বভাবতঃ রুক্ষও নয়, অন্যত্র কোথাও এ কথায় কিছু মনেও হইত না; কিন্তু ঐশ্বর্যের ক্ষমতা জিনিসটা এতই বিশ্রী যে, সেটা পরের ধার করা হইলেও তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন মানুষে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে না। অতএব অপেক্ষাকৃত ঢের বেশি রূঢ় উত্তরই হঠাৎ মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঝাঁজটা তার উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্বেই দেখিলাম পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল এবং রাজলক্ষ্মী তাঁহার পূজার আসন হইতে অসমাপ্ত আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়াই উঠিয়া আসিল। দূর হইতে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কহিল, এরই মধ্যে উঠবেন না, আপনি বসুন। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মা, আপনি ত আমার সংসারের অনেক দিনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন, এতে প্রায় আমাদের পনর দিনের খাওয়া চলে যাবে। কিন্তু সম্প্রতি অকাল চলচে, ব্রত-নিয়ম কিছুরই দিন নেই। ব্রাহ্মণী আশ্চর্য হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন—

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, আপনার ব্রাহ্মণী কেবল বারব্রতের দিনক্ষণগুলোই শিখে রেখেচেন, কিন্তু প্রতিবেশীর তত্ত্ব নেবার কালাকাল বিচারটা আমার কাছে শিখে যেতে বলে দেবেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এতবড় সিধেটা কি তা হলে মা—

প্রশ্নটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিলেন না, কিন্তু আমি এই দাম্ভিক ব্রাহ্মণের অনুক্ত বাক্যের মর্মটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু ভয় হইল আমারই মত না বুঝিয়া রাজলক্ষ্মী হয়ত একটা শক্ত কথা শুনিবে। লোকটির এক-দিকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত থাকিলেও আর একদিকের পরিচয় ইতিপূর্বেই পাইয়া ছিলাম; সুতরাং এমন ইচ্ছা হইল না যে, আমারই সম্মুখে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু একটা সাহস এই ছিল যে, কেহ কোনদিন মুখোমুখি রাজলক্ষ্মীকে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারিত না। ঠিক তাহাই হইল। এই বিশ্রী প্রশ্নটাকেও সে অত্যন্ত সহজে পাশ কাটাইয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, তর্কালঙ্কারমশাই, শুনেচি আপনার ব্রাহ্মণী ভারী রাগী মানুষ—বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে পড়লে হয়ত চটে যাবেন, নাহলে এ কথার জবাব তাঁকেই দিয়ে আসতাম।

এতক্ষণে বুঝিলাম ইনিই যদুনাথ কুশারী। অধ্যাপক মানুষ, প্রিয়তমার মেজাজের উল্লেখে নিজের মেজাজ হারাইয়া ফেলিলেন; হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, না মা, রাগী হবে কেন, নিতান্তই সোজা মানুষ। আমরা দরিদ্র, আপনি গেলে ত তার উপযুক্ত সম্মান করতে পারব না, তিনিই আসবেন। একটু সময় পেলে আমিই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, তর্কালঙ্কারমশাই, আপনার ছাত্র ক'টি?

কুশারী বলিলেন, পাঁচটি। এ দেশে বেশি ছাত্র ত পাবার জো নেই—অধ্যাপনা কেবল নামমাত্র।

সব ক'টিকেই খেতে-পরতে দিতে হয়?

না। বিজয় ত দাদার ওখানে থাকে, একটির বাড়ি গ্রামের মধ্যেই, কেবল তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, এই দুঃসময়ে এ ত সহজ নয় তর্কালঙ্কারমশাই!

ঠিক এই কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন ছিল। না হইলে অভিমানী অধ্যাপকের উত্তপ্ত হইয়া উঠার কিছুমাত্র বাধা ছিল না। অথচ এবার তাঁহার মনটা একেবারে ও-দিক দিয়াই গেল না! অতি সহজেই গৃহের দুঃখ-দৈন্য স্বীকার করিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, কি করে যে চলে সে কেবল আমরা দুটি প্রাণীই জানি। কিন্তু তবু ত ভগবানের উদয়াস্ত আটকে থাকে না মা! তা ছাড়া উপায়ই বা কি? অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্যদেবের কাছে যা পেয়েচি, সে ত কেবল ন্যস্ত ধন—আর একদিন সে ত ফিরিয়ে দিতেই হবে মা! একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, একদিন এই ভার ছিল দেশের ভূস্বামীর উপর, কিন্তু এখন দিনকাল সমস্তই বদলে গেছে। সে অধিকারও তাঁদের নেই, সে দায়িত্বও গেছে। প্রজার রক্তশোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই। তাঁদের ভূস্বামী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তাতে যেন আবার বাধা দেবেন না।

কুশারী লজ্জা পাইয়া নিজেও হাসিলেন; কহিলেন, বিমনা হয়ে আপনার কথাটা আমি মনেই করিনি। কিন্তু বাধা দেব কেন? সত্যিই ত এ আপনাদেরই কর্তব্য।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমরা পুজো-আচ্চা করি, কিন্তু একটা মন্তরও হয়ত শুদ্ধ আবৃত্তি করতে পারিনে—এও কিন্তু আপনার কর্তব্য, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্চি।

কুশারী হাসিয়া বলিলেন, তাই হবে মা! এই বলিয়া তিনি বেলার দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল; যাইবার সময় আমিও কোনমতে একটা নমস্কার সারিয়া লইলাম।

তিনি চলিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী কহিল, আজ তোমাকে একটু সকাল সকাল নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে হবে।

কেন বল ত?

দুপুরবেলা একবার সুনন্দার বাড়িতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে কেন? তোমার বাহন রতন আছে ত?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, ও বাহনে আর কুলোবে না, তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আর কোথাও আমি একপাও নড়চি নে।

বলিলাম, আচ্ছা, তাই হবে।

আট

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন সুনন্দা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহাকে পরমাত্মীয়ের মত কাছে পাইয়াছিলাম। ইহার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত করিয়া না বলিলেও কথাটাকে প্রত্যয় না করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয়ের

ইতিহাসটা বিশ্বাস করান শক্ত হইবে হয়ত। অনেকেই মনে করিবেন ইহা অদ্ভুত; হয়ত অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ-সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙ্গালী, বাঙ্গলাদেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থঘরে এমন হয় তাহা ত কখনো দেখি নাই! তা বটে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এ দেশেরই মানুষ এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তত্রাচ ইহা সত্য।

রাজলক্ষ্মী ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি তাহাদের ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া কোথায় একটু ছায়া আছে খোঁজ করিতেছি, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা আসিয়া কহিল, আসুন, ভেতরে আসুন।

তর্কালংকারমশাই কোথায়? বিশ্রাম করচেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না, তিনি হাটে গেছেন। মা আছেন, আসুন। বলিয়া সে অগ্রবর্তী হইল, এবং যথেষ্ট দ্বিধাভরেই আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। একদা কোনকালে হয়ত এ বাটীর সদর দরজা কোথাও ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত। অতএব ভূতপূর্ব একটা ঢেঁকিশালার পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় নিশ্চয়ই ইহার মর্যাদা লঙ্ঘন করি নাই। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সুনন্দাকে দেখিলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই বাড়িটির মতই একেবারে আভরণবর্জিত। সম্মুখের অপরিসর বারান্দার একধারে মুড়ি ভাজিতেছিল,—বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া,—আমাকে জীর্ণ একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া দিয়া নমস্কার করিল। কহিল, বসুন। ছেলেটিকে বলিল, অজয়, উনুনে আগুন আছে, একটু তামাক সেজে দাও বাবা। রাজলক্ষ্মী বিনা আসনে পূর্বে উপবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সলজ্জ হাস্যে কহিল, আপনাকে কিন্তু পান দিতে পারব না, পান আমাদের বাড়িতে নেই।

আমরা কে, অজয় বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে তাহার গুরুপত্নীর কথায় সহসা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, নেই? তাহলে পান বুঝি আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে মা?

সুনন্দা তাহার মুখের দিকে একমুহূর্ত মুখ টিপিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ওটা হঠাৎ আজ ফুরিয়ে গেছে, না কেবল হঠাৎ একদিনই ছিল অজয়? এই বলিয়া সহসা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, ও-রবিবারে ছোট মোহন্তঠাকুরের আসবার কথায় এক পয়সার পান কেনা হয়েছিল—সে প্রায় দিন-দশেকের কথা। এই! এতেই আমার অজয় একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে, পান হঠাৎ ফুরাল কি করে? এই বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। অজয় মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, বাঃ—এই বুঝি! তা বেশ ত, হলই বা ফুরোলই বা—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে সদয়কণ্ঠে কহিল, তা সত্যিই ত ভাই, ও পুরুষমানুষ, ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে!

অজয় একজনকেও তাহার অনুকূলে পাইয়া কহিতে লাগিল দেখুন ত! দেখুন ত! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা তেমনি সহাস্যে বলিল, হাঁ, মা ভাবেন বৈ কি! না দিদি, আমার অজয়ই হ'ল বাড়ির গিন্নী—ও সব জানে। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে, মায় বাবুগিরি পর্যন্ত—এইটেই ও স্বীকার করতে পারে না।

কেন পারব না! বাঃ—বাবুগিরি কি ভাল! ও ত আমাদের—, বলিতে বলিতে কথাটা আর শেষ না করিয়াই সে বোধ করি আমার জন্য তামাক সাজিতেই বাহিরে প্রস্থান করিল।

সুনন্দা কহিল, বামুন-পণ্ডিতের ঘরে হত্তুকীই যথেষ্ট, খুঁজলে এক-আধটা সুপুরিও হয়ত পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, আমি দেখচি,—এই বলিয়া সেও যাইবার উদ্যোগ করিতেই রাজলক্ষ্মী সহসা তাহার আঁচল ধরিয়া কহিল, হত্তুকী আমার সইবে না ভাই, সুপুরিতেও কাজ নেই। তুমি একটুখানি আমার কাছে স্থির হয়ে বোসো, দুটো কথা কই। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে পার্শ্বে বসাইল।

আতিথ্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই নীরব রহিল। এই অবকাশে আমি আর-একবার নূতন করিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া লইলাম। প্রথমেই মনে

হইল, বস্তুতঃ এই দারিদ্র্য জিনিসটা সংসারে কতই না অর্থহীন, একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে। এই যে আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী-ঘরের সামান্য একটি মেয়ে, বাহির হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই—না আছে রূপ, না আছে বস্ত্র-অলঙ্কার; এই ভগ্নগৃহের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অভাব-অনটনের ছায়া—কিন্তু তবুও সে যে ওই ছায়ামাত্রই, তার বেশি কিছু নয়, সে কথাও যেন সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকী থাকে না। অভাবের দুঃখটাকে এই মেয়েটি কেবলমাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দূরে রাখিয়াছে—জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এতবড় সাহস তাহার নাই। অথচ মাসকয়েক পূর্বেও ইহার সমস্তই ছিল—ঘরবাড়ি, লোকজন, আত্মীয়-বন্ধু—সচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিল না—শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে একখণ্ড জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মত—মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম সুনন্দার বুঝি বয়স হয়েচে। ও হরি! একেবারে ছেলেমানুষ!

অজয় বোধ হয় তাঁহার গুরুদেবের হুঁকাতেই তামাক সাজিয়া আনিতেছিল; সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ছেলেমানুষ কিরকম! ওই অত বড় বড় ছেলে যার, তার বয়স বুঝি কম! এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। চমৎকার স্বচ্ছন্দ সরল হাসি। অজয় নিজেই উনুন হইতে আগুন লইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় পরিহাস করিয়া কহিল, কি জানি কি জাতের ছেলে বাবা তুমি, কাজ নেই তোমার উনুন ছুঁয়ে। আসল কথা, জ্বলন্ত অঙ্গার চুল্লী হইতে উঠানো শক্ত বলিয়া সে আপনি গিয়া আগুন তুলিয়া কলিকাটার উপরে রাখিয়া দিয়া অজয়ের হাতে দিল, এবং হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। সাধারণ পল্লীরমণী-সুলভ হাসি-তামাশা হইতে আরম্ভ করিয়া কথায়বার্তায় আচরণে কোনখানে কোন বিশেষত্ব ধরিবার জো নাই, অথচ, ইতিমধ্যে যে সামান্য পরিচয়টুকু তাহার পাইয়াছি তাহা কতই না অসামান্য! এই অসাধারণতার হেতুটা পরক্ষণেই আমাদের দু'জনের কাছেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

অজয় আমার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, মা, ওটা তাহলে তুলে রেখে দি'?

সুনন্দা ইঙ্গিতে সায় দেওয়ায় তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, আমারই অদূরে একখণ্ড কাঠের পিঁড়ার উপর মস্ত মোটা একটা পুঁথি এলোমেলোভাবে খোলা পড়িয়া আছে। এতক্ষণ কেহই উহা দেখি নাই। অজয় তাহার পাতাগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে ক্ষুন্নস্বরে কহিল, মা 'উৎপত্তি-প্রকরণ'টা ত আজো শেষ হ'ল না, কবে আর হবে! ও আর হবেই না।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কিসের পুঁথি অজয়?

যোগবাশিষ্ঠ।

তোমার মা মুড়ি ভাজছিলেন আর তুমি শোনাচ্ছিলে?

না, আমি মার কাছে পড়ি।

অজয়ের এই সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুনন্দা হঠাৎ যেন লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি কহিল, পড়াবার মত বিদ্যে ত ওর মায়ের ছাই আছে। না দিদি, দুপুরবেলা একলা সংসারে কাজ করি; উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না, ছেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায় তার বারো আনা আমি শুনতেই পাই নে। ওর কি, যা হোক একটা বলে দিলে।

অজয় তাহার যোগবাশিষ্ঠ লইয়া প্রস্থান করিল। রাজলক্ষ্মী গম্ভীরমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্তকয়েক পরে সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাড়িটা আমার কাছাকাছি হ'লে আমিও তোমার চেলা হয়ে যেতুম ভাই। একে ত জানিনে কিছুই, তাতে আহ্নিক-পুজোর কথাগুলোও যদি ঠিকমত বলতে পারতুম!

মন্ত্রোচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সন্দিগ্ধ আক্ষেপ আমি অনেক শুনিয়াছি—ওটা আমার অভ্যাস ছিল; কিন্তু সুনন্দা এই প্রথমে শুনিয়াও কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র। কি জানি সে কি মনে করিল। হয়ত ভাবিল, যে তাৎপর্য বুঝে না, প্রয়োগ জানে না, শুধু অর্থহীন আবৃত্তির পরিশুদ্ধতায় তার এত দৃষ্টি কেন? হয়ত বা ইহা

তাহার কাছেও নূতন নয়,—আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মুখে এম্‌নি সকরুণ লোভ ও মোহের কথা সে অনেক শুনিয়াছে, ইহার উত্তর দেওয়া বা প্রতিবাদ করাও আর প্রয়োজন মনে করে না। অথবা এ-সকল কিছু নাও হইতে পারে, কেবল স্বাভাবিক বিনয়বশেই মৌন হইয়া রহিল। তবুও এ কথাটা ত মনে না করিয়া পারিলাম না, সে যদি আজ তাহার এই অপরিচিত অতিথিটিকে নিতান্তই সাধারণ মেয়েদের সমান করিয়া, ছোট করিয়া দেখিয়া থাকে ত আবার একদিন তাহার অতিশয় অনুতাপের সহিত মত বদলাইবার প্রয়োজন হইবে।

রাজলক্ষ্মী চোখের পলকে আপনাকে সামলাইয়া লইল। আমি জানি কেহ হাঁ করিলে সে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে। আর সে মন্ত্রতন্ত্রের ধার দিয়াও গেল না। এবং একটু পরেই নিছক ঘরকন্না ও গৃহস্থালীর কথা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের মৃদু-কণ্ঠের সমস্ত আলোচনা আমার কানেও গেল না, কান দিবার চেষ্টাও করিলাম না। বরঞ্চ, তর্কালঙ্কারের থেলো হুঁকায় অজয়-দত্ত শুষ্ক সুকঠোর তামাকু প্রাণপণ করিয়া নিঃশেষ করিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই দুটি রমণী অস্পষ্ট মৃদুস্বরে সংসারযাত্রা সম্বন্ধে কোন্ জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে লাগিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু তাহাদেরই অদূরে হুঁকাহাতে নীরবে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আজ সহসা একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী অভিযোগ আছে, মেয়েদের আমরা হীন করিয়া রাখিয়াছি। এই শক্ত কাজটা যে কেমন করিয়া করিয়াছি এবং কোথায় উহার প্রতিকার, এ কথা অনেকবার অনেক দিক দিয়া আমি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আজ সুনন্দাকে ঠিক এমন করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে বোধ করি সংশয় চিরদিন রহিয়াই যাইত।

দেশে ও বিদেশে রকমারি স্ত্রী-স্বাধীনতা কতই না দেখিয়াছি। ইহার যে নমুনা বর্মা-মুলুকে পা দিয়াই চোখে পড়িয়াছিল তাহা ভুলিবার জো কি! জন-তিনেক ব্রহ্মসুন্দরী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া একটা ষণ্ডামার্ক পুরুষকে আখপেটা করিতেছেন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত ও ঘর্মাক্ত-কলেবর হইয়া উঠিয়াছিলাম। অভয়া মুগ্ধচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, 'শ্রীকান্তবাবু, আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা যদি এমনি—'। আমার খুড়ামশাই একবার জন-দুই মারোয়াড়ী রমণীর নামে নালিশ করতে গিয়েছিলেন, তাহারা রেলগাড়িতে নাকি খুড়ার নাক ও কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল। শুনিয়া খুড়ীমা আমায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত! থাকিলে আমার খুড়ামশাই নিশ্চয় ঘোরতর আপত্তি করিতেন, কিন্তু ইহাতেই যে নারীজাতির হীন অবস্থার প্রতিবিধান হইত, তাহাও ত অসংশয়ে বলা যায় না। ইহাই যে কোথায় এবং কিরূপে হয়, সুনন্দার ভগ্নগৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া আজ নিঃশব্দে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম। কেবল একটা 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করা ছাড়া সে আমার সহিত দ্বিতীয় বাক্যালাপ করে নাই, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও যে কোন বড় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও নয়, কিন্তু সেই যে অজয়ের মিথ্যা আড়ম্বরের প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে জানাইয়াছিল, এ বাড়িতে পান নাই; কিনিবার মত সামর্থ্য নাই,—এখানে উহা দুর্লভ বস্তু! তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাটা যেন আমার কানে বাজিতেই ছিল। তাহার সঙ্কোচ-লেশহীন এইটুকু পরিহাসে দারিদ্র্যের সমস্ত লজ্জা কোথায় যে লজ্জায় মুখ লুকাইল, সারাক্ষণের মধ্যে আর তাহার দেখাই মিলিল না। একমুহূর্তেই জানা গেল এই ভাঙ্গা বাড়ি, এই জীর্ণ গৃহসজ্জা, এই দুঃখ দৈন্য অনটন—এই নিরাভরণ মেয়েটি তাহাদের অনেক উপরে। অধ্যাপক পিতা দিবার মধ্যে তাঁহার কন্যাকে তাঁহার অশেষ যত্নে ধর্ম ও বিদ্যাদান করিয়া শ্বশুরকুলে পাঠাইয়াছিলেন; তৎপরে সে জুতামোজা পরিবে কি ঘোমটা খুলিয়া পথে বেড়াইবে, কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে স্বামী-পুত্র লইয়া ভাঙ্গা বাড়িতে বাস করিবে, তথায় মুড়ি ভাজিবে, কি যোগবাশিষ্ঠ পড়াইবে, সে চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মেয়েদের আমরা হীন করিয়াছি কিনা এ তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই দিক দিয়া যদি তাহাদের বঞ্চিত করিয়া থাকি ত সে কর্মের ফলভোগ অনিবার্য। অজয়ের 'উৎপত্তি-প্রকরণ' উঠিয়া না পড়িলে সুনন্দার লেখাপড়ার কথা আমরা জানিতেও পারতাম না। তাহার মুড়িভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সরল ও সামান্য হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়া যোগবাশিষ্ঠের

ঝাঁজ কোথাও উঁকি মারে নাই। অথচ স্বামীর অবর্তমানে অপরিচিত অতিথির অভ্যর্থনা করিতেও তাহার কোনখানে বাধিল না। নির্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের সে এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে, শাসন ও সংশয়ের দড়িদড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাও বোধ করি কোনদিন তাহার স্বামীর মনে উঠে নাই। অথচ ইহারই প্রহরা দিতে ঘরে ঘরে কত প্রহরীই না সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এদিকে বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। এই দরিদ্র গৃহ-লক্ষ্মীর কত কাজই না পড়িয়া আছে মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল এবং বিদায় লইয়া কহিল, আজ চললুম, যদি বিরক্ত না হও ত আবার আসব।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমারও কথা কইবার লোক কেউ নেই, যদি অভয় দেন ত মাঝে মাঝে আসব।

সুনন্দা মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

পথে আসিতে আসিতে রাজলক্ষ্মী কহিল, মেয়েটি চমৎকার। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। ভগবান এদের বেশ মিলিয়েছেন।

আমি কহিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এদের ও-বাড়ির কথাটা আজ আর তুললুম না। কুশারীমহাশয়কে আজও ভাল চিনতে পারিনি, কিন্তু এরা দুটি জা'ই বড় চমৎকার।

বলিলাম, খুব সম্ভব তাই; কিন্তু তোমার ত মানুষে বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, দেখ না চেষ্টা করে যদি এদের আবার মিল করে দিতে পার।

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তোমাকে বশ করাটা তার প্রমাণ নয়। চেষ্টা করলে ওটা অনেকেই পারত।

বলিলাম, হতেও পারে। তবে চেষ্টার যখন সুযোগ ঘটেনি তখন তর্ক করায় ফল হবে না।

রাজলক্ষ্মী তেমনি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা গো আচ্ছা। দিন এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে ভেবে রেখো না।

আজ সারাদিনটাই কেমন একটা মেঘলাটেগোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ণ-সূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা-দুই তেঁতুলগাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙ্গিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব মনে হইল। হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয়; হয়ত যে আলো আর এক নারীর কাছ হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আঙ্গুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল ত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডান দিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে। কহিলাম, বস্তু থাকলে ছায়া পড়ে—বোধ হয় ওটা আর নেই।

আগে ছিল?

লক্ষ্য করে দেখিনি, ঠিক মনে পড়চে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আমার পড়চে—ছিল না। এতটুকু বয়স থেকে ওটা দেখতে শিখেছিলাম। এই বলিয়া সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লেগেচে। মনে হচ্চে এতদিন পরে একটি সঙ্গী পেলাম। এই বলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল। আমি কিছু কহিলাম না, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, সে ঠিক সত্য কথাটাই কহিয়াছে।

বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু ধূলো-পা ধুইবার অবকাশ মিলিল না, শান্তি ও

তৃপ্তি দুই-ই একই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। দেখি, বাহিরের উঠান ভরিয়া জন দশ-পনর লোক বসিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রতন বোধ হয় এতক্ষণ বক্তৃতা করিতেছিল, তাহার মুখ উত্তেজনা ও নিগূঢ় আনন্দে চক্‌চক্‌ করিতেছে; কাছে আসিয়া কহিল, মা, বার বার যা বলেচি ঠিক তাই হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী অধীরভাবে কহিল, কি বলেছিলি আমার মনে নেই, আর একবার বল্‌।

রতন কহিল, নবুনেকে পুলিশের লোক হাতকড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেছে।

বেঁধে নিয়ে গেছে! কখন? কি করেছিল সে?

মালতীকে সে এক্কেবারে খুন করে ফেলেচে।

বলিস কি রে! তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না না, মাঠাকরুন, এক্কেবারে খুন করেনি। খুব মেরেচে বটে, কিন্তু মেরে ফেলেনি।

রতন চোখ রাঙ্গাইয়া কহিল, তোরা কি জানিস? তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। গেল কোথা? তোদের সুদ্ধ হাতে দড়ি পড়তে পারে জানিস?

শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ সরিবার চেষ্টাও করিল। রাজলক্ষ্মী রতনের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুই ওধারে দাঁড়া গে যা। যখন জিজ্ঞেস করব বলিস। ভিড়ের মধ্যে মালতীর বুড়া বাপ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা সবাই তাহাকে চিনিতাম, ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে সত্যি বল ত বিশ্বনাথ! লুকালে কিংবা মিছে কথা কইলে বিপদে পড়তে পার।

বিশ্বনাথ যাহা কহিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কাল রাত্রি হইতে মালতী তাহার পিতার বাটীতে ছিল। আজ দুপুরবেলা সে পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্বামী নবীন কোথায় লুকাইয়া ছিল, একাকী পাইয়া বিষম প্রহার করিয়াছে—এমন কি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথমে এখানে আসে, কিন্তু আমাদের দেখা না পাইয়া কুশারীমহাশয়ের সন্ধানে কাছারি বাটীতে যায়, সেখানে তাঁহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া সোজা থানায় গিয়া সমস্ত মারধরের চিহ্ন দেখাইয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবীনকে ধরাইয়া দেয়। সে তখন ঘরেই ছিল, নিজের হাতে দুটো চাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে বসিতেছিল, সুতরাং পলাইবার সুযোগ পায় নাই। দারোগাবাবু লাথি মারিয়া ভাত ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। সে মালতীকে যেমন দেখিতে পারিত না, নবীনের প্রতিও তেমনি প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া আমার উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাকে এক শ' বার বলেচি, ছোটলোকদের এ-সব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে তুমি যেয়ো না। যাও এখন সামলাও গে—আমি কিছু জানিনে। এই বলিয়া সে আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, নবুনের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আর ও হারামজাদী যদি মরে থাকে ত আপদ গেছে।

কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমরা সবাই যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। বকুনি খাইয়া মনে হইতে লাগিল কাল এমনি সময়ে মধ্যস্থ হইয়া ইহাদের যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা ভাল হয় নাই। না করিলে এ দুর্ঘটনা হয়ত আজ ঘটিত না। কিন্তু আমার মতলব ভাল ছিল। ভাবিয়াছিলাম, প্রেমলীলার যে অদৃশ্য চাপা-স্রোতটা অন্তরালে বহিয়া সমস্ত পাড়াটাকে নিরন্তর ঘুলাইয়া তুলিতেছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে হয়ত ভাল হইবে। দেখিতেছি ভুল করিয়াছি। কিন্তু তার পূর্বে সমস্ত ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা প্রয়োজন। মালতী নবীন ডোমের স্ত্রী বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া পর্যন্ত দেখিতেছি, সমস্ত ডোম-পাড়ার মধ্যে সে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বিশেষ। কখন কোন্‌ পরিবারের মাঝে সে যে অগ্নি-কাণ্ড বাধাইয়া দিবে, এ লইয়া কোন মেয়ের মনেই শান্তি নাই। এই যুবতী মেয়েটা যেমন সুশ্রী তেমনি চপল। সে কাঁচপোকার টিপ পরে, নেবুর তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, পরনে তার মিলের চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি, তাহার মাথার ঘোমটা পথেঘাটে ঘাড়ে নামিয়া পড়িবার

কোন বাধা নাই। এই মুখরা মেয়েটাকে মুখের সামনে বলিবার কাহারো সাহস নাই, কিন্তু অগোচরে তাহার নামের সঙ্গে যে বিশেষণ পাড়ার মেয়েরা যোগ করিয়া দেয়, তাহা লেখা চলে না। প্রথমে নাকি মালতী নবীনের ঘর করিতে চাহে নাই, বাপের বাড়িতেই থাকিত। বলিত, ও আমাকে খাওয়াবে কি? এবং সেই ধিক্কারেই নাকি নবীন দেশত্যাগী হইয়া কোঁথায় কোন শহরে গিয়া পিয়াদাগিরির চাকরি করিয়া বছরখানেক হইল গ্রামে ফিরিয়াছে। আসিবার সময় মালতীর রূপার পৈঁচা, মিহি সুতার শাড়ি, রেশমের ফিতা, এক বোতল গোলাপজল এবং একটা টিনের তোরঙ্গ সঙ্গে আনিয়াছে এবং এইগুলির পরিবর্তে স্ত্রীকে শুধু ঘরে আনা নয়, তাহার হৃদয় পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু এ-সকল আমার শোনা কথা। আবার কবে হইতে যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগিল, ঘাটে যাবার পথে আড়ি পাতিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, এবং অতঃপর যাহা শুরু হইয়া গেল, আমি ঠিক জানি না। আমরা ত আসিয়া অবধি দেখিতেছি, ইহাদের বাক্ ও হাত-যুদ্ধ কোনদিন কামাই যায় না। মাথা ফাটাফাটি কেবল আজ নয়, আরও দিন-দুই হইয়া গেছে—বোধ করি এই জন্যও আজ নবীন মোড়ল স্ত্রীর মাথা ভাঙিয়া আসিয়াও নিশ্চিন্তচিত্তে আহারে বসিতেছিল, কল্পনাও করে নাই পুলিশ ডাকিয়া মালতী তাহাকে বাঁধিয়া চালান দিবে। কাল সকালে প্রভাতী রাগিণীর ন্যায় মালতীর তীক্ষ্ণকণ্ঠ যখন গগন ভেদ করিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ঘরের কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া কহিল, বাড়ির পাশে রোজ এ হাঙ্গামা সহ্য হয় না—নাহয় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে হতভাগীকে তুমি দূর করে দাও।

বলিলাম, নবীনটাও কম পাজী নয়। কাজকর্ম করবে না, কেবল টেরি কেটে আর মাছ ধরে বেড়াবে, আর হাতে পয়সা পেলেই তাড়ি খেয়ে মারপিট শুরু করবে। বলা বাহুল্য, এ-সকল সে শহরে শিখিয়া আসিয়াছিল।

দুই-ই সমান! বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, কাজকর্ম করবেই বা কখন? হারামজাদী তার সময় দিলে ত!

বস্তুতঃ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের গালিগালাজ ও মারামারির মকদ্দমা আরও বার-দুই করিয়াছি—কোন ফল হয় নাই। আজ ভাবিলাম খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাকাইয়া আনিয়া এইবার শেষ মীমাংসা করিয়া দিব। কিন্তু ডাকিতে হইল না, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়ে-পুরুষে বাড়ি ভরিয়া গেল। নবীন কহিল, বাবুমশায়, ওকে আর আমি চাইনে—নষ্ট মেয়েমানুষ। ও আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাক।

মুখরা মালতী ঘোমটার ভিতর হইতে কহিল, ও আমার শাঁখা-নোয়া খুলে দিক।

নবীন বলিল, তুই আমার রূপোর পৈঁচে ফিরিয়ে দে।

মালতী তৎক্ষণাৎ হাত হইতে সে-দুইগাছা টানিয়া খুলিয়া দূরে করিয়া ফেলিয়া দিল।

নবীন কুড়াইয়া লইয়া কহিল, আমার টিনের তোরঙ্গ তুই নিতে পাবিনে।

মালতী কহিল, আমি চাইনে। এই বলিয়া সে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল।

নবীন তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া মালতীর শাঁখা পটপট করিয়া ভাঙিয়া দিল এবং নোয়াগাছটা টানিয়া খুলিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, যা, তোকে বিধবা করে দিলাম।

আমি ত অবাক হইয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন বুঝাইয়া বলিল যে, এরূপ না হইলে মালতীর নিকা করা আর হইত না—সমস্তই ঠিকঠাক আছে।

কথায় কথায় ব্যাপারটা আরও বিশদ হইল। বিশ্বেশ্বরের বড়জামায়ের ভাই আজ ছয় মাস ধরিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে। তাহার অবস্থা ভাল, বিশুকে সে কুড়ি টাকা নগদ দিবে, এবং মালতীকে পায়ে মল, হাতে রূপোর চুড়ি এবং নাকে সোনার নথ দিবে বলিয়াছে, এমন কি এগুলি সে বিশুর কাছে জমা রাখিয়া পর্যন্ত দিয়াছে।

শুনিয়া সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। কিছুদিন হইতে যে একটা কদর্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং না জানিয়া হয়ত আমি তাহার সাহায্যই করিলাম। নবীন কহিল, আমি ত এই চাই। শহরে গিয়ে এবার মজা করে চাকরি করব—তোর মত অমন দশগণ্ডা বিয়ে করব। রাঙামাটির হবি মোড়ল ত তার মেয়ের জন্য সাধাসাধি

করচে, তার পায়ের নোখেও তুই লাগিস নে। এই বলিয়া সে তাহার রূপার পৈঁচা ও তোরঙ্গের চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল। এই আস্ফালন সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহার শহরের চাকরি কিংবা হরি মোড়লের মেয়ে কোনটার আশাই তাহার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

রতন আসিয়া কহিল, বাবু, মা বলচেন এ-সব নোংরা কাণ্ড বাড়ি থেকে বিদায় করুন।

আমাকে করিতে কিছু হইল না, বিশ্বেশ্বর মোড়ল তাহার মেয়েকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পাছে আমার পায়ের ধুলো লইতে আসে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, যাক, যা হইল তা ভালই হইল। মন যখন ভাঙ্গিয়াছে এবং উপায় যখন আছে, তখন ব্যর্থ আক্রোশে নিত্য-নিয়ত মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘর করার চেয়ে এ ভাল।

কিন্তু আজ সুনন্দার বাটী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, গত কল্যকার নিষ্পত্তি অমন নিছক ভালই হয় নাই। সদ্যবিধবা মালতীর উপর নবীন স্বামিত্বের দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও মারপিটের অধিকার ছাড়ে নাই। সে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় গিয়া হয়ত সমস্ত সকালটা লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছে এবং একসময়ে একাকী পাইয়া বিষম কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটাই বা গেল কোথায়?

সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিমের জানালা দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, খুব সম্ভব মালতী পুলিশের ভয়ে কোথায় লুকাইয়া আছে, কিন্তু নবীনকে সে যে ধরাইয়া দিয়াছে, ভালই করিয়াছে। হতভাগার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—মেয়েটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। নীরবে বাহির হইয়া পাশের ঘরের চৌকাঠে পা দিয়াই কিন্তু কি একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখি মস্ত একটা কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা ধরিয়া তাহারি উপর মাথা খুঁড়িতেছে। রাজলক্ষ্মীর হাতের প্রদীপটা পড়িয়া গেলেও জ্বলিতেছিল, তুলিয়া ধরিতেই সেই মিহি সুতার চওড়া কালাপেড়ে শাড়ি চোখে পড়িল।

বলিলাম, এ মালতী!

রাজলক্ষ্মী কহিল, হতভাগী, সন্ধ্যাবেলায় আমায় ছুঁলি? ইস্! এ কি বল্ ত?

প্রদীপের আলোকে ঠাহর করিয়া দেখিলাম, তাহার মাথার ক্ষত হইতে পুনরায় রক্ত ঝরিয়া অপরের পা-দুখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগিনীর কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িল; কহিল, মা, আমাকে বাঁচাও—

রাজলক্ষ্মী কটুকণ্ঠে কহিল, কেন তোর আবার হ'ল কি?

সে কাঁদিয়া কহিল, দারোগা বলচে কাল সকালেই তাকে চালান দেবে—দিলেই পাঁচ বচ্ছরের জেল হয়ে যাবে।

আমি কহিলাম, যেমন কর্ম তেমনি শাস্তি হওয়া ত চাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ'লই বা জেল, তাতে তোর কি?

মেয়েটার কান্না যেন দমকা ঝড়ের মত তাহার বুক ফাটিয়া উঠিল; বলিল, বাবু বলেন বলুন, মা, ও কথা তুমি ব'লো না—তার মুখের ভাত আমি খেতে দিইনি। বলিতে বলিতে সে আবার মাথা কুটিতে লাগিল; কহিল, মা, আমাদের তুমি এইবারটি বাঁচিয়ে দাও, আমরা বিদেশে কোথাও চলে গিয়ে ভিক্ষে করে খাব। নইলে তোমারি পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে মরব।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল; ধীরে ধীরে তাহার একরাশ এলোচুলের উপর হাত রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা আচ্ছা, তুই চুপ কর্—আমি দেখচি।

দেখিতেও হইল। রাজলক্ষ্মীর বাক্স হইতে শ-দুই টাকা সেই রাত্রেই কোথায় গিয়া অন্তর্হিত হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নবীন মোড়ল কিংবা মালতী কাহাকেও সকাল হইতে গঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া গেল না।

নয়

তাহাদের সম্বন্ধে সবাই ভাবিল, যাক, বাঁচা গেল! রাজলক্ষ্মীর তুচ্ছ কথায় মন দিবার সময় ছিল না; সে উহাদের দুই-চারিদিনেই বিস্মৃত হইল; মনে পড়িলেও কি যে মনে করিত সেই জানে। তবে, পাড়া হইতে যে একটা পাপ বিদায় হইয়াছে তাহা অনেকেই ভাবিত। কেবল রতন খুশি হইল না। সে বুদ্ধিমান, সহজে মনের কথা ব্যক্ত করে না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইত জিনিসটা সে একেবারেই পছন্দ করে নাই। তাহার মধ্যস্থ হইবার, কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ গেল, ঘরের টাকা গেল—এতবড় একটা সমারোহ কাণ্ড রাতারাতি কোথা দিয়া কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন নিজেকেই অপমানিত, এমন কি আহত জ্ঞান করিল। তথাপি সে চুপ করিয়াই রহিল। আর বাটীর যিনি কর্ত্রী, তাঁহার ত কোনদিকে খেয়ালমাত্র নাই। যত দিন কাটিতে লাগিল সুনন্দা ও তাহার কাছ হইতে মন্ত্রতন্ত্রের উচ্চারণশুদ্ধির লোভ তাহাকে যেন পাইয়া বসিতে লাগিল। কোনদিন তথায় যাওয়ার তাহার বিরাম ছিল না। সেখানে সে কি পরিমাণে যে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতেছিল তাহা আমি জানিব কি করিয়া? আমি কেবল জানিতেছিলাম তাহার পরিবর্তন। তাহা যেমন দ্রুত, তেমনি অভাবিত। দিনের বেলায় আহারটা আমার চিরকাল একটু বেলাতেই সাঙ্গ হইত। রাজলক্ষ্মী বরাবর আপত্তি করিয়াই আসিয়াছে, অনুমোদন কখনও করে নাই—সে ঠিক; কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধনের জন্য কখনও আমাকে লেশমাত্র চেষ্টা করিতেও হয় নাই। কিন্তু আজকাল দৈবাৎ কোনদিন অধিক বেলা হইয়া গেলে মনে মনে লজ্জা বোধ করি। রাজলক্ষ্মী বলিত, তুমি রোগামানুষ তোমার এত দেরি করা কেন? নিজের শরীরের পানে না চাও, দাসী-চাকরদের মুখের দিকে ত চাইতে হয়। তোমার কুঁড়েমিতে তারা যে মারা যায়। কথাগুলো ঠিক সেই আগেকার তবুও ঠিক তা নয়। সেই সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুর যেন আর বাজে না--বাজে বিরক্তির এমন একটা কুশাগ্র সূক্ষ্ম কটুতা, যাহা চাকর-দাসী কেন, হয়ত আমি ছাড়া ভগবানের কানেও তাহার নিগূঢ় রেশটুকু ধরা পড়ে না। তাই ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও দাসী-চাকরদের মুখ চাহিয়া তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নানাহারটা সারিয়া লইয়া তাহাদের ছুটি করিয়া দিতাম। কিন্তু এই অনুগ্রহের প্রতি চাকর-দাসী যাহারা, তাহাদের আগ্রহ ছিল কি উপেক্ষা ছিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু রাজলক্ষ্মী দেখিতাম ইহার মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কোনদিন রতন, কোনদিন বা দরোয়ান সঙ্গে যাইত, কোনদিন বা দেখিতাম সে একাই চলিয়াছে, ইহাদের কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার সময় পর্যন্ত হয় নাই। প্রথমে দুই-চারি দিন আমাকে সঙ্গে যাইতে সাধিয়াছিল। কিন্তু ওই দুই চারি দিনেই বুঝা গেল, কোন পক্ষ হইতেই তাহাতে সুবিধা হইবে না। হইলও না। অতএব আমি আমার নিরালা ঘরে পুরাতন আলস্যের মধ্যে এবং সে তাহার ধর্মকর্ম ও মন্ত্রতন্ত্রের নবীন উদ্দীপনার মধ্যে নিমগ্ন থাকায় ক্রমশঃই উভয়ে যেন পৃথক্ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইতাম, সে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের পথ দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। একাকী সমস্ত দুপুরবেলাটা যে আমার কি করিয়া কাটে, এদিকে খেয়াল করিবার সময় তাহার ছিল না—সে আমি বুঝিতাম। তবুও যতদূর পর্যন্ত তাহাকে চোখ দিয়া অনুসরণ করা যায়, না করিয়া পারিতাম না। পায়েহাঁটা আঁকাবাঁকা পথের উপর তাহার বিলীয়মান দেহলতা ধীরে ধীরে দূরান্তরালে কোন্ এক সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত--অনেকদিন সেই সময়টুকুও যেন চোখে আমার ধরা পড়িত না; মনে হইত ওই একান্ত সুপরিচিত চলনখানি যেন তখনও শেষ হয় নাই—সে যেন চলিয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ চেতনা হইত। হয়ত চোখ মুছিয়া আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তার পরে বিছানায় শুইয়া পড়িতাম। কর্মহীনতার দুঃসহ ক্লান্তিবশতঃ হয়ত বা কোনদিন ঘুমাইয়া পড়িতাম—নয়ত নিমীলিত চক্ষে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম। অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলাগাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে, মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি-বা আমার

নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে। ভয় হইত, এমন বুঝি বা আর বেশিদিন সহিতে পারিব না। রতন বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে বলিত, বাবু, একবার তামাক দেব কি? এমন কতদিন হইয়াছে, জাগিয়াও সাড়া দিই নাই, ঘুমানোর ভান করিয়াছি; ভয় হইয়াছে, পাছে সে আমার মুখের উপর বেদনার ঘূণাগ্র আভাসও দেখিতে পায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরবেলায় রাজলক্ষ্মী সুনন্দার বাটীতে চলিয়া গেলে সহসা আমার বর্মার কথা মনে পড়িয়া বহুকালের পরে অভয়াকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যে ফার্মে কাজ করিতাম, তাহার বড়-সাহেবকেও একখানা পত্র লিখিয়া খবর লইব। কি খবর লইব, কেন লইব, লইয়া কি হইবে, এত কথা তখনও ভাবি নাই। সহসা মনে হইল জানালার সুমুখ দিয়া যে রমণী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ত্বরিতপদে সরিয়া গেল, সে যেন চেনা—সে যেন মালতীর মত। উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখা গেল না। সেই মুহূর্তেই তাহার আঁচলের রাঙ্গা পাড়টুকু আমাদের প্রাচীরের কোণটায় অন্তর্হিত হইল।

মাসখানেকের ব্যবধানে ডোমদের সেই শয়তান মেয়েটাকে সবাই একপ্রকার ভুলিয়াছে, আমিই কেবল তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জানি না কেন, আমার মনের একটা কোণে ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটার সেই সন্ধ্যাবেলাকার চোখের জলের এক ফোঁটা ভিজা দাগ তখনও পর্যন্তও মিলায় নাই। প্রায়ই মনে হইত, কি জানি কোথায় তাহারা আছে। জানিতে সাধ হইত, এই গঙ্গামাটির অসৎ প্রলোভন ও কুৎসিত ষড়যন্ত্রের বেষ্টনের বাহিরে মেয়েটার স্বামীর কাছে থাকিয়া কিভাবে দিন কাটিতেছে! ইচ্ছা করিতাম, এখানে তাহারা আর যেন শীঘ্র না আসে। ফিরিয়া গিয়া চিঠিটা শেষ করিতে বসিলাম। ছত্রকয়েক লেখার পরেই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, রতন। তাহার হাতে সাজা কলিকা, গুড়গুড়ির মাথায় বসাইয়া দিয়া নলটি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, বাবু তামাক খান।

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, আচ্ছা।

রতন কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল না। নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, বাবু, এই রতন পরামাণিক যে কবে মরবে তাই কেবল সে জানে না।

তাহার ভূমিকার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল; রাজলক্ষ্মী হইলে বলিত, জানলে লাভ ছিল, কিন্তু কি বলতে এসেচিস বল্। আমি কিন্তু শুধু মুখ তুলিয়া হাসিলাম। রতনের গাম্ভীর্যের পরিমাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না; কহিল, মাকে সেদিন বলেছিলাম কিনা ছোটলোকের কথায় মজবেন না! তাদের চোখের জলে ভুলে দু'দু'শ টাকা জলে দেবেন না; বলুন, বলেছিলাম কি না! আমি জানি, সে বলে নাই। এ সদভিপ্রায় তাহার অন্তরে ছিল বিচিত্র নয়—কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা সে কেন, বোধ হয় আমারও সাহস হইত না। কহিলাম, ব্যাপার কি রতন?

রতন কহিল, ব্যাপার যা বরাবর জানি—তাই।

কহিলাম, কিন্তু আমি যখন এখনও জানিনে তখন একটু খুলেই বল।

রতন খুলিয়াই বলিল। সমস্ত শুনিয়াই মনের মধ্যে যে কি হইল বলা কঠিন। কেবল মনে আছে, ইহার নিষ্ঠুর কদর্যতা ও অপরিসীম বীভৎসতার ভারে সমস্ত চিত্ত একেবারে তিক্ত বিবশ হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল, রতন সবিস্তারে ইহার ইতিবৃত্ত এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যেটুকু সত্য সে ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছে, তাহা এই যে, নবীন মোড়ল সম্প্রতি জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভগিনীপতির সেই বড়লোক ছোটভাইকে স্যাঙা করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে গঙ্গামাটিতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে! মালতীকে একপ্রকার স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ করি বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে রাজলক্ষ্মীর টাকাগুলোর যথার্থই এইভাবে সদ্গতি হইয়াছে।

সেই রাত্রে আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী এ সংবাদ শুনিল। শুনিয়া কেবল আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রতন, সত্যি নাকি? ছুঁড়িটা সেদিন আচ্ছা তামাশা করলে ত! টাকাগুলো গেল—অবেলায় আমাকে নাইয়ে মারলে!—ও কি, তোমার খাওয়া হয়ে গেল নাকি, তার চেয়ে খেতে না বসলেই ত হয়?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোনদিনই আমি বৃথা চেষ্টা করি না—আজও চুপ করিয়া রহিলাম। তবে একটা বস্তু উপলব্ধি করিলাম। আজ নানা কারণে আমার একেবারে ক্ষুধা ছিল না, প্রায় কিছুই খাই নাই—তাই আজ সেটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু কিছুকাল হইতে যে আমার খাওয়া ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল, সে তাহার চোখে পড়ে নাই। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে তাহার নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, ইহার লেশমাত্র কম-বেশি লইয়া তাহার আশঙ্কা ও অভিযোগের অবধি থাকিত না—কিন্তু আজ যে কারণেই হোক একজনের সেই শ্যেনদৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেছে বলিয়াই যে অপরের গভীর বেদনাকেও হা-হুতাশের দ্বারা প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিব, সে-ও আমি নই। তাই উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিনগুলা একভাবেই আরম্ভ হয়, একভাবেই শেষ হয়। আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ কোন দুঃখ-কষ্টের নালিশও নাই। শরীর মোটের উপর ভালই আছে। পরদিন প্রভাত হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল, যথারীতি স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলাম। সুমুখের সেই খোলা জানালা এবং তেমনি বাধাহীন উন্মুক্ত শুষ্ক মাঠ। পাঁজিতে আজ বোধ হয় বিশেষ কোন উপবাসের বিধি ছিল; রাজলক্ষ্মীর তাই আজ সেইটুকু সময় অপব্যয় করিতে হইল না—যথাসময়ের কিছু পূর্বেই সুনন্দার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অভ্যাসমত বোধ করি বহুক্ষণ তেমনিই চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ স্মরণ হইল কালকার অসমাপ্ত চিঠি দুটা আজ শেষ করিয়া বেলা তিনটার পূর্বেই ডাকবাক্সে ফেলা চাই। অতএব আর মিথ্যা কালহরণ না করিয়া অবিলম্বে তাহাতেই নিযুক্ত হইলাম। চিঠি দুখানা সম্পূর্ণ করিয়া যখন পড়িতে লাগিলাম, তখন কোথায় যেন ব্যথা বাজিতে লাগিল, কি যেন একটা না লিখিলেই ভাল হইত; অথচ নিতান্তই সাধারণ লেখা, তাহার কোথায় যে ত্রুটি, বার বার পড়িয়াও ধরিতে পারিলাম না। একটা কথা আমার মনে আছে। অভয়ার পত্রে রোহিণী-দাদাকে নমস্কার জানাইয়া শেষের দিকে লিখিয়াছি, তোমাদের অনেকদিন খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ, কেমন করিয়া তোমাদের দিন কাটিতেছে, কেবলমাত্র কল্পনা করা ছাড়া জানিবার চেষ্টা করি নাই। হয়ত সুখেই আছ, হয়ত নাই, কিন্তু তোমাদের জীবনযাত্রার এই দিকটাকে সেই যে একদিন ভগবানের হাতে ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পর্দা টানিয়া দিয়াছিলাম, আজও সে তেমনি ঝুলানো আছে; তাহাকে কোনদিন তুলিবার ইচ্ছা পর্যন্তও করি নাই। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার দীর্ঘকালের নয়, কিন্তু যে অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া একদিন আমাদের পরিচয় আরম্ভ এবং আর একদিন সমাপ্ত হয়, তাহাকে সময়ের মাপ দিয়া মাপিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। যেদিন নিদারুণ রোগাক্রান্ত হই, সেদিন সেই আশ্রয়হীন সুদূর বিদেশে তুমি ছাড়া আমার যাইবার স্থান ছিল না। তখন একটি মুহূর্তের জন্যও তুমি দ্বিধা কর নাই—সমস্ত হৃদয় দিয়া পীড়িতকে গ্রহণ করিয়াছিলে। অথচ তেমনি রোগে, তেমনি সেবা করিয়া আর কখনো যে কেহ আমাকে বাঁচায় নাই, এ কথা বলি না; কিন্তু আজ অনেক দূরে বসিয়া উভয়ের প্রভেদটাও অনুভব করিতেছি। উভয়ের সেবার মধ্যে, নির্ভয়ের মধ্যে, অন্তরের অকপট শুভকামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় স্নেহের মধ্যে গভীর ঐক্য রহিয়াছে; কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটি স্বার্থলেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা, এমন অনির্বচনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র সেবা করিয়াই আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়াছে। আমার আরোগ্যের মধ্যে এতটুকু চিহ্ন রাখিতে একটি পা-ও কখনো বাড়ায় নাই, তোমার এই কথাটাই আজ বারংবার মনে পড়িতেছে। হয়ত অত্যন্ত স্নেহ আমার সহে না বলিয়াই, হয়ত বা স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি তাহারই জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তোমাকে আর একবার মুখোমুখি না দেখা পর্যন্ত ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাহেবের চিঠিখানাও শেষ করিয়া ফেলিলাম। একসময়ে তিনি আমার সত্য সত্যই বড় উপকার করিয়া-ছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছি। প্রার্থনা কিছুই করি নাই, কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে সহসা গায়ে পড়িয়া এমন ধন্যবাদ দিবার ঘটা দেখিয়াও নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করিতে লাগিল। ঠিকানা লিখিয়া খামে বন্ধ করিতে গিয়া দেখি সময় উত্তীর্ণ

হইয়া গেছে, এত তাড়াতাড়ি করিয়াও ডাকে দেওয়া গেল না, কিন্তু মন তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিল। মনে হইল এ ভালই হইল যে, কাল আর একবার পড়িয়া দেখিবার সময় মিলিবে।

রতন আসিয়া জানাইল কুশারীগৃহিণী আসিয়াছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, তিনি ত বাড়ি নেই, ফিরে আসতে বোধ করি সন্ধ্যা হবে।

তা জানি, এই বলিয়া তিনি জানালার উপর হইতে একটা আসন টানিয়া লইয়া নিজেই মেঝের উপর পাতিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, কেবল সন্ধ্যা কেন, ফিরে আসতে ত প্রায় রাত হয়েই যায়।

লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিলাম, ধনী-গৃহিণী বলিয়া ইনি অতিশয় দাম্ভিকা। কাহারও বাড়ি বড় একটা যান না। এ বাড়ির সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যবহার অনেকটা এইরূপ; অন্ততঃ এতদিন ঘনিষ্ঠতা করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই। ইতিপূর্বে মাত্র বার-দুই আসিয়াছেন। মনিববাড়ি বলিয়া একবার নিজেই আসিয়াছিলেন এবং আর একবার নিমন্ত্রণ রাখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে আজ অকস্মাৎ স্বেচ্ছায় আগমন করিলেন এবং বাটীতে কেহ নাই জানিয়াও—আমি ভাবিয়া পাইলাম না।

আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আজকাল ছোটগিন্নীর সঙ্গে ত একেবারে এক-আত্মা।

না জানিয়া তিনি একটা ব্যথার স্থানেই আঘাত করিলেন; তথাপি ধীরে ধীরে বলিলাম, হাঁ, প্রায়ই ওখানে যান বটে। কুশারীগৃহিণী কহিলেন, প্রায়? রোজ, রোজ! প্রত্যহ! কিন্তু ছোটগিন্নী কি কখনও আসে? একটি দিনও না! মানীর মান রাখবে সুনন্দা সে মেয়েই নয়! এই বলিয়া তিনি আমার মুখের প্রতি চাহিলেন। আমি একজনের নিত্য যাওয়ার কথাই কেবল ভাবিয়াছি, কিন্তু আর একজনের আসার কথা মনেও করি নাই; সুতরাং তাঁহার কথায় হঠাৎ একটু যেন ধাক্কা লাগিল। কিন্তু ইহার উত্তর আর কি দিব? শুধু মনে হইল ইঁহার আসার উদ্দেশ্যটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, এবং একবার এমনও মনে হইল যে, মিথ্যাসঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলি, আমি নিতান্তই নিরুপায়, অতএব এই অক্ষম ব্যক্তিটিকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কোন লাভ নাই। বলিলে কি হইত জানি না, কিন্তু না বলার ফলে দেখিলাম সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার চক্ষের পলকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং কবে, কাহার কি ঘটিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, ইহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাঁহার শ্বশুরকুলের বছর-দশেকের ইতিহাস প্রায় রোজনামচার আকারে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাঁহার গোটাকয়েক কথার পরেই কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণও ছিল। মনে করিয়াছিলাম, একদিকে আত্মপক্ষের স্তুতিবাদ, দয়াদাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি যাহা-কিছু শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গুণাবলী মনুষ্যজন্মে সম্ভবপর সমস্তগুলিরই বিস্তৃত আলোচনা—এবং অন্যদিকে যত কিছু ইহারই বিপরীত তাহারই বিশদ বিবরণ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া সন, তারিখ, মাস, প্রতিবেশী সাক্ষীদের নামধাম-সমেত আবৃত্তি করা ভিন্ন তাঁহার এই বলার মধ্যে আর কিছুই থাকিবে না। প্রথমটা ছিলও না—কিন্তু হঠাৎ একসময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কুশারীগৃহিণীর কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে। একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েচে? তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তার পরে ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, হবার আর কি বাকী রইল বাবু? শুনলাম, কাল নাকি ঠাকুরপো হাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুন বেচতেছিলেন।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইল না, এবং মন ভাল থাকিলে হয়ত হাসিয়াই ফেলিতাম। কহিলাম, অধ্যাপক মানুষ তিনি হঠাৎ বেগুনই বা পেলেন কোথায়, আর বেচতেই বা গেলেন কেন?

কুশারীগৃহিণী বলিলেন, ওই হতভাগীর জ্বালায়। বাড়ির মধ্যেই নাকি গোটাকয়েক গাছে বেগুন ফলেছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিল হাটে বেচতে—এমন করে শত্রুতা করলে আমরা গাঁয়ে বাস করি কি করে?

বলিলাম, কিন্তু একে শত্রুতা করা বলচেন কেন? তাঁরা ত আপনাদের কিছুর মধ্যেই নেই। অভাব হয়েছে, নিজের জিনিস বিক্রি করতে গেছেন, তাতে আপনার নালিশ কি?

আমার জবাব শুনিয়া কুশারীগৃহিণী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, এই বিচারই যদি করেন, তাহলে আমার বলবার আর কিছু নেই, মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই—আমি উঠলাম।

শেষের দিকে তাঁহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আপনার মনিব-ঠাকরুনকে জানাবেন, তিনি হয়ত সকল কথা বুঝতেও পারবেন, আপনার উপকার করতেও পারবেন।

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, আর আমি কাউকে বলতেও চাইনে, আমার উপকার করেও কারও কাজ নেই। এই বলিয়া তিনি সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আগে আগে কর্তা বলতেন, দু'মাস যাক, আপনিই ফিরে আসবে। তারপরে সাহস দিতেন, থাকো না আরও মাস-দুই চেপে, সব শুধরে যাবে—কিন্তু এমনি করে মিথ্যে আশায় আশায় প্রায় বছর ঘুরে গেল। কিন্তু কাল যখন শুনলাম সে উঠানের দু'টো বেগুন পর্যন্ত বেচতে পেরেচে, তখন কারও কথায় আর আমার কোন ভরসা নেই। হতভাগী সমস্ত সংসার ছারখার করে দেবে, কিন্তু ও-বাড়িতে আর পা দেবে না। বাবু, মেয়েমানুষে যে এমন শক্ত পাষাণ হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তিনি কহিতে লাগিলেন, কর্তা ওকে কোনদিন চিনতে পারেন নি, কিন্তু আমি চিনেছিলাম। প্রথম প্রথম এর-ওর-তার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিসপত্র পাঠাতাম; উনি বলতেন, সুনন্দা জেনেশুনেই নেয়—কিন্তু অমন করলে তাদের চৈতন্য হবে না। আমিও ভাবতাম, হবেও বা! কিন্তু একদিন সব ভুল ভেঙ্গে গেল। কি করে সে জানতে পারে, যতদিন যা-কিছু দিয়েচি, একটা লোকের মাথায় সমস্ত টান মেরে আমাদের উঠানের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে কর্তার তবুও চৈতন্য হ'ল না—হ'ল আমার।

এতক্ষণে আমি তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম। সদয়কণ্ঠে কহিলাম, এখন আপনি কি করতে চান? আচ্ছা, তাঁরা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোনপ্রকার শত্রুতা করবার চেষ্টা করেন?

কুশারীগৃহিণী আর একদফা কাঁদিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, পোড়াকপাল, তা হলে ত একটা উপায় হ'ত। সে আমাদের এমনি ত্যাগ করেচে যে, কোনদিন যেন আমাদের চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি, এমনি কঠিন, এমনি পাষাণ মেয়ে! আমাদের দু'জনকে সুনন্দা তার বাপ-মায়ের বেশি ভালবাসত; কিন্তু যেদিন থেকে শুনেচে তার ভাশুরের বিষয় পাপের বিষয়, সেই দিন থেকে তার সমস্ত মন যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবে না। কিন্তু এতবড় সম্পত্তি কি আমরা ফেলে দিতে পারি বাবু? সে যেমন দয়ামায়া-হীন—ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতেও পারে, কিন্তু আমরা ত তা পারিনে।

কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু আস্তে আস্তে কহিলাম, আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কুশারীগৃহিণী নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সত্যি বলচি বাবু, এদের মাঝে পড়ে আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতে চায়। কিন্তু শুনতে পাই আজকাল সে মার নাকি বড় বাধ্য—কোন একটা উপায় হয় না? আমি যে আর সইতে পারিনে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেন না—তেমনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

দশ

(মানুষের পরকালের চিন্তার মধ্যে নাকি পরের চিন্তার ঠাঁই নাই,) না হইলে আমার খাওয়া-পরার চিন্তা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিতে পারে এতবড় বিস্ময় সংসারে আর কি

আছে? এই গঙ্গামাটিতে আমরা কতদিনই বা আসিয়াছি, এই ক'টা দিনের মধ্যেই হঠাৎ সে কতদূরেই না সরিয়া গেল! আমার খাবার কথা জিজ্ঞেসা করিতে আসে এখন বামুন-ঠাকুর, আমাকে খাওয়াইতে বসে রতন। একপক্ষে বাঁচিয়াছি, সে দুর্লঙ্ঘ্য পীড়াপীড়ি আর নাই। রোগা শরীরে এগারোটার মধ্যে না খাইলে এখন আর অসুখ করে না। এখন যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা খাই। শুধু রতনের পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় ও বামুনঠাকুরের সখেদ আত্ম-ভর্ৎসনায় স্বল্পাহারের বড় সুযোগ পাই না—সে বেচারা ম্লানমুখে কেবলি মনে করিতে থাকে, তাহারই রান্নার দোষে আমার খাওয়া হইল না। কোনমতে ইহাদের সন্তুষ্ট করিয়া বিছানায় গিয়া বসি। সম্মুখের সেই খোলা জানালা, আর সেই ঊষর প্রান্তরের তীব্র তপ্ত হাওয়া। মধ্যাহ্নের দীর্ঘ দিনমান কেবলমাত্র এই ছায়াহীন শুষ্কতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কাটিতে চাহিত না, তখন একটা প্রশ্ন সবচেয়ে আমার বেশি মনে পড়িত—সে আমাদের সম্বন্ধের কথাটা। ভাল আমাকে সে আজও বাসে, ইহলোকে আমিই তার একান্ত আপনার, কিন্তু লোকান্তরে তার কাছে আমি তত বড়ই পর। তাহার ধর্মজীবনের আমি যে সঙ্গী নই, সেখানে আমাকে দাবি করিবার যে তাহার কোন দলিল নাই, হিন্দুঘরের মেয়ে হইয়া এ কথা সে ভুলে নাই। এই পৃথিবীটাই শুধু নয়, ইহারও অতীত যে স্থানটা আছে, পাথেয় তাহার শুধু আমাকে কেবল ভালবাসিয়াই অর্জন করা যাইবে না, এ সংশয় বোধ করি খুব বড় করিয়াই তাহার মনে উঠিয়াছে।

সে রহিল এই লইয়া, আর আমার দিনগুলা কাটিতে লাগিল এমনি করিয়া। কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের দিবারম্ভ হয় শ্রান্তিতে, অবসান হয় অবসন্ন গ্লানিতে। নিজের আয়ুষ্কালটাকে নিজের হাত দিয়া প্রতিনিয়ত হত্যা করিয়া চলা ব্যতীত সংসারে আর যেন আমার কিছু করিবার নাই। রতন আসিয়া মাঝে মাঝে তামাক দিয়া যায়, সময় হইলে চা আনিয়া দেয়—কিছু বলে না। কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার বোধ হয়, সে পর্যন্ত আমাকে যেন কৃপার চক্ষে দেখিতে শুরু করিয়াছে। কখনো বা হঠাৎ আসিয়া বলে, বাবু, জানালাটা বন্ধ করে দিন, আগুনের ঝলক আসচে। আমি বলি, থাক। মনে হয়, কত লোকের গায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এই উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাকে এইমাত্র ছুঁইয়া আসিল। হয়ত, সে আমারই মত তাহার অনেকদিনের সুখ-দুঃখের শিশুসঙ্গীটিকে স্মরণ করিতেছে। আর আমাদের উভয়ের সেই অন্নদাদিদি! ভাবিতাম, হয়ত এতদিনে তাঁহার সকল দুঃখের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কখনও মনে হয়, এই কোণেই ত বর্মাদেশ, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়ার স্পর্শটুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছে না! অভয়াকে মনে পড়িলে সহজে সে আমার মন ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। রোহিণীদা এখন কাজে গিয়াছেন, আর তাহাদের ছোট্ট বাসাবাড়ির সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া অভয়া তাহার সেলাই লইয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলা আমারি মত সে ঘুমাইতে পারে না, এতদিনে—হয়ত, কোন ছোট্ট শিশুর কাঁথা, কিংবা ছোট বালিশের অড়, কিংবা এমনি কিছু তাহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র গৃহিণীপনা!

বুকের মাঝখানে গিয়া যেন তীরের মত বিঁধে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সংস্কার, যুগ-যুগান্তরের ভাল-মন্দ বিচারের অভিমান আমারও ত রক্তের মধ্যে প্রবহমান। কেমন করিয়া অকপটে তাহাকে দীর্ঘায়ু হও বলিয়া আশীর্বাদ করি! কিন্তু মন যে সরমে সঙ্কোচে একেবারে ছোট হইয়া আসিতে চায়।

কর্মনিরতা অভয়ার শান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। তাহারি পাশে নিষ্কলঙ্ক ঘুমন্ত বালক। যেন সদ্যফোটা পদ্মের মত শোভায় সম্পদে গন্ধে মধুতে টলটল করিতেছে। এতখানি অমৃত বস্তুর জগতে কি সত্যই প্রয়োজন ছিল না? মানবসমাজে মানব-শিশুর মর্যাদা নাই, নিমন্ত্রণ নাই—স্থান নাই বলিয়া ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে হইবে? কল্যাণের ধনকেই চির অকল্যাণের মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম আর নাই?

অভয়াকে আমি চিনি। এইটুকুকে পাইতে সে যে তাহার জীবনের কতখানি দিয়াছে, তাহা আর কেহ না জানে আমি ত জানি। হৃদয়হীন-বর্বরতার কেবলমাত্র অশ্রদ্ধা ও উপহাসের

দ্বারাই সংসারে সকল প্রশ্নের জবাব হয় না। ভোগ! অত্যন্ত মোটা রকমের লজ্জাকর দেহের ভোগ! তাই বটে! অভয়াকে ধিক্কার দিবার কথাই বটে!

বাহিরের তপ্ত বাতাসে চোখের তপ্ত অশ্রু আমার নিমেষে শুকাইত। বর্মা হইতে চলিয়া আসার কথাটা মনে পড়িত। ঠিক সেই সময়টায় তখন রেঙ্গুনে মরণের ভয়ে ভাই বোনকে, ছেলে বাপ-মাকেও ঠাঁই দিত না। মৃত্যু-উৎসবে উদ্দণ্ড মৃত্যুলীলা শহরময় চলিয়াছে—তেমনি সময়ে যখন আমি মৃত্যুদূতের কাঁধে চড়িয়া তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন নূতন-পাতা ঘরকন্নার মোহ ত তাহাকে একটা মুহূর্তও দ্বিধায় ফেলে নাই! সে কথা ত শুধু আমার আখ্যায়িকার এই কয়টা লাইন পড়িয়াই বুঝা যাইবে না, কিন্তু আমি ত জানি সে কি! আরও অনেক বেশি আমি জানি। আমি জানি কিছুই অভয়ার কাছে কঠিন নয়, মৃত্যু—সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা -এই-সব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।

কাজের জন্য পুরানো মনিবের কাছে দরখাস্ত করিয়াছি, ভরসা আছে আবেদন নামঞ্জুর হইবে না। সুতরাং আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে। ইতিমধ্যে দুই তরফেই অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। তাহার ভারও সামান্য নয়, কিন্তু সে ভার সে জমা করিয়াছে আপনার অসামান্য সরলতায় ও স্বেচ্ছায়, আর আমার জমিয়া উঠিয়াছে তেমনি অসাধারণ বলহীনতায় ও ইচ্ছাশক্তির অভাবে। কি জানি, ইহাদের রঙ ও চেহারা সেদিন মুখোমুখি কেমনতর দেখিতে হইবে।

একাকী সমস্ত দিন প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন বেলা পড়িলে একটুখানি বেড়াইতে বাহির হইতাম। দিন পাঁচ-সাত হইতে ইহা একপ্রকার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। ধূলাময় যে পথটা দিয়া একদিন আমরা গঙ্গামাটিতে আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়া কোন কোন দিন অনেকদূর পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম। অন্যমনে আজও তেমনি চলিয়াছিলাম, সহসা দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে ধূলার পাহাড় সৃষ্টি করিয়া কে-একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। সভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়সওয়ার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘোড়া থামাইল, ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার নাম শ্রীকান্তবাবু না? আমাকে চিনতে পারেন?

বলিলাম, নাম আমার তাই বটে, কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না।

লোকটি ঘোড়া হইতে নামিল। পরনে তাহার ছিন্ন ও মলিন সাহেবী পোশাক, মাথায় জরাজীর্ণ সোলার হ্যাট খুলিয়া হাতে লইয়া কহিল, আমি সতীশ ভরদ্বাজ। থার্ডক্লাস থেকে প্রোমোশন না পেয়ে সার্ভে-স্কুলে পড়তে যাই, মনে পড়ে না?

মনে পড়িল। খুশি হইয়া কহিলাম, তাই বল, তুমি আমাদের ব্যাঙ। এখানে সাহেব সেজে যাচ্ছ কোথায়?

ব্যাঙ হাসিয়া কহিল, সাহেব কি আর সাধে সাজি ভাই, রেলওয়ে কনস্ট্রাক্‌শনে সাব-ওভারসিয়ারী চাকরি করি, কুলি তাড়াতেই জীবন যায়, হ্যাট-কোট না থাকলে কি আর রক্ষা ছিল? এতদিন তারাই আমাকে তাড়াত। সোপলপুরে একটু বরাত সেরে ফিরচি—মাইলটাক দূরে আমার তাঁবু, সাঁইথিয়া থেকে যে নতুন লাইন বসচে তাতেই কাজ। যাবে আমার ওখানে? চা খেয়ে আসবে?

অস্বীকার করিয়া কহিলাম, আজ নয়, কোনদিন সুযোগ হয় আসব।

ব্যাঙ তখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—শরীর কেমন, কোথায় থাকি, এখানে কি সূত্রে আসা, ছেলে-মেয়ে কয়টি, তাহারা কে কেমন আছে, ইত্যাদি।

জবাবে বলিলাম, শরীর ভাল নয়, থাকি গঙ্গামাটিতে, যে সূত্রে এখানে আসা তাহা অত্যন্ত গোলমেলে। ছেলে-মেয়ে নাই, অতএব তাহারা কে কেমন আছে এ প্রশ্ন নিরর্থক।

ব্যাঙ সাদাসিধাগোছের লোক। আমার উত্তরগুলা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অপরের ব্যাপার বুঝিতেই হইবে এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তি সে নয়। সে নিজের কথাই বলিতে লাগিল। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, তরিতরকারি মেলে, মাছ এবং দুধ চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়; তবে লোকজন নাই, সঙ্গীসাথীর অভাব, কিন্তু কষ্ট বিশেষ হয় না, কারণ সন্ধ্যার পরে একটু

নেশা-ভাঙ করিলেই বেশ চলিয়া যায়। সাহেবরা হাজার হোক বাঙ্গালীর চেয়ে ঢের ভাল—টেম্পোরারি গোছের তাড়ির শেড একটা খোলা হইয়াছে—যত ইচ্ছে খাও, তার নিজের ত একরকম পয়সা লাগে না বলিলেই হয়—সবই ভাল—কনস্ট্রাক্‌শনে দু'পয়সা আছেও বটে, এবং আমার জন্যে বড়সাহেবকে ধরিয়া চাকরি একটা অনায়াসে করিয়া দিতে পারে—এমনি সব তাহার সৌভাগ্যের ছোট-বড় কাহিনী! ব্যাঙ তাহার বেতো ঘোড়ার মুখ ধরিয়া অনেক-দূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে বকিতে বকিতে চলিল; বার বার জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি নাগাইদ তাহার ক্যাম্পে পায়ের ধূলা দিতে পারি, এবং ভরসা দিয়া জানাইল যে, পোড়ামাটিতে প্রায়ই তাহার কাজ থাকে, ফিরিবার পথে একদিন আমার গঙ্গামাটিতে সে নিশ্চয় গিয়া উপস্থিত হইবে।

সেদিন বাড়িতে ফিরিতে আমার একটু রাত্রি হইল। পাচক আসিয়া জানাইল আহার প্রস্তুত। হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের কাছে বসিয়া পড়িল, হাসিমুখে কহিল, তুমি কিন্তু কিছুতেই অমত করতে পাবে না বলে রাখচি।

কহিলাম, না, আমার অমত নেই।

কি তা না শুনেই?

কহিলাম, আবশ্যক মনে হয় ব'লো একসময়।

রাজলক্ষ্মীর হাসিমুখ গম্ভীর হইল, কহিল, আচ্ছা—হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল আমার থালার উপরে। কহিল, ভাত খাচ্চ যে বড়? তুমি জান রাত্রে তোমার ভাত সহ্য হয় না—তুমি কি তোমার অসুখটা আমাকে সারাতে দেবে না ঠিক করেচ?

ভাত আমার ভালই সহ্য হইতেছিল, কিন্তু সে কথা বলিয়া লাভ নাই। রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্নকণ্ঠে ডাক দিল, মহারাজ! পাচক দ্বারের কাছে আসিতেই তাহাকে থালা দেখাইয়া ততোধিক তীব্রস্বরে কহিল, কি এ? তোমাকে বোধ হয় একহাজার বার বলেচি ভাত বাবুকে কিছুতেই রাত্রে দেবে না—তোমাকে একমাসের মাইনে আমি জরিমানা করলুম। অবশ্য টাকার দিক দিয়া জরিমানার কোন অর্থ নাই, তাহা সকল চাকরেই জানে, কিন্তু তিরস্কারের দিক দিয়া তাহার অর্থ আছে বৈ কি! মহারাজ রাগ করিয়া কহিল, ঘি নেই, আমি কি করব?

নেই কেন তাই শুনি?

সে জবাব দিল, দু-তিনদিন জানিয়েচি আপনাকে ঘি ফুরিয়েচে, লোক পাঠান। আপনি না পাঠালে আমার দোষ কি?

সংসার খরচের সাধারণ ঘি এইখানেই পাওয়া যাইত কিন্তু আমার জন্য আসিত সাঁইথিয়ার নিকটবর্তী কি একটা গ্রাম হইতে। তাহা লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইতে হইত। কথাটা রাজলক্ষ্মীর অন্যমনস্ক কর্ণরন্ধ্রে হয় প্রবেশ করে নাই, নাহয় ত সে ভুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কবে থেকে নেই মহারাজ?

তা হবে পাঁচ-সাতদিন।

এই পাঁচ-সাতদিন তাঁকে ভাত খাওয়াচ্চ? রতনকে ডাকিয়া কহিল, আমিই যেন ভুলেছিলাম, কিন্তু তুই কি আনিয়ে দিতে পারতিস নে বাবা! এম্‌নি করেই কি সবাই মিলে আমাকে জব্দ করতে হয়!

রতন মনে মনে তাহার ঠাকুরানীর উপর খুশি ছিল না। দিবারাত্রি বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র থাকায় এবং বিশেষ করিয়া আমার প্রতি ঔদাসীন্যে তাহার বিরক্তির একশেষ হইয়া ছিল, কর্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি জানি মা, তুমি গেরাহ্যি করলে না দেখে ভাবলুম ভাল দামী ঘি বোধ হয় আর চাইনে। নইলে পাঁচ-ছদিন ধরে রোগামানুষকে আমি ভাত খেতে দিই!

রাজলক্ষ্মীর বলিবার কিছুই ছিল না, তাই ভৃত্যের কাছে এতবড় খোঁচা খাইয়াও সে কিছুক্ষণ নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করিয়া বোধ করি সেইমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং আমার পায়ের কাছে আসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, তুমি কি ঘুমোলে?

বলিলাম, না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তোমাকে পাবার জন্যে আমি যা করেচি, তার অর্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এতদিনে পেতুম। কিন্তু তোমাকে পেলুম না।

বলিলাম, হতে পারে মানুষকে পাওয়া আরও শক্ত।

মানুষকে পাওয়া? রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, যাই হোক, ভালবাসাটাও ত একরকমের বাঁধন, বোধ হয় এও তোমার সয় না—গায়ে লাগে।

এ অভিযোগের জবাব নাই, এ অভিযোগ শাশ্বত ও সনাতন। আদিম মানব-মানবী হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এ কলহের মীমাংসক কেহ নাই—এ বিবাদ যেদিন মিটিবে, সংসারের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য সেদিন তিক্ত বিষ হইয়া উঠিবে। তাই উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া নীরব হইয়া রহিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উত্তরের জন্য রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিল না। জীবনের এতবড় সর্বব্যাপী প্রশ্নটাকেও সে যেন একনিমিষে আপনা-আপনিই ভুলিয়া গেল। কহিল, ন্যায়রত্ন ঠাকুর বলছিলেন একটা ব্রতের কথা,—কিন্তু একটু কঠিন বলে সবাই নিতে পারে না, আর এত সুবিধাই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

অসমাপ্ত প্রস্তাবের মাঝখানে মৌন হইয়া রহিলাম; সে বলিতে লাগিল, তিন দিন একরকম উপোস করেই থাকতে হয়, সুনন্দারও ভারি ইচ্ছে,—দু'জনের একসঙ্গেই তা হলে হয়ে যায়, কিন্তু—এই বলিয়া সে নিজেই একটু হাসিয়া বলিল, তোমার মত না হলে ত আর—

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মত না হলে কি হবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা হলে হবে না।

কহিলাম, তবে এ মতলব ত্যাগ কর, আমার মত নেই।

যাও—তামাশা করতে হবে না।

তামাশা নয়, সত্যি আমার মত নেই—আমি নিষেধ করচি।

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমরা যে সমস্ত স্থির করে ফেলেচি। জিনিসপত্র কিনতে লোক গেছে—কাল হবিষ্যি করে পরশু থেকে যে—বাঃ! এখন নিষেধ করলে হবে কেন? সুনন্দার কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? ছোটঠাকুর—বাঃ! এ কেবল তোমার চালাকি। আমাকে মিছিমিছি রাগাবার জন্যে—না, সে হবে না, তুমি বল তোমার মত আছে।

বলিলাম, আছে। কিন্তু তুমি কোনদিনই ত আমার মতামতের অপেক্ষা কর না লক্ষ্মী, আজই বা হঠাৎ কেন তামাশা করতে এলে? আমার আদেশ মানতে হবে এ দাবি আমি ত কখনো তোমার কাছে করিনি।

রাজলক্ষ্মী আমার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল, আর কখনও হবে না, এইবারটি শুধু প্রসন্ন মনে আমাকে হুকুম দাও।

কহিলাম, আচ্ছা। কিন্তু ভোরেই তোমাকে হয়ত যেতে হবে, আর রাত ক'রো না, শুতে যাও।

রাজলক্ষ্মী গেল না, আস্তে আস্তে আমার পায়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কেবলি মনে হইতে লাগিল, সে স্নেহস্পর্শ আর নাই। সেও ত বেশিদিনের কথা নয়, আরা রেলওয়ে স্টেশন হইতে আমাকে যেদিন সে কুড়াইয়া বাড়ি আনিয়াছিল, সেদিন এমনি করিয়াই পায়ে হাত বুলাইয়া আমাকে সে ঘুম পাড়াইতে ভালবাসিত। ঠিক এমনিই নীরবে, কিন্তু মনে হইত তাহার দশ অঙ্গুলি যেন দশ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়া নারীহৃদয়ের যাহা-কিছু আছে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আমার এই পা-দুটার উপরে উজাড় করিয়া দিতেছে। অথচ, এ আমি চাহি নাই, এই লইয়াই যে কেমন করিয়া কি করিব সেও ভাবিয়া পাই নাই। বানের জলের মত—আসার দিনেও আমার মত চাহে নাই, হয়ত যাবার দিনেও তেমনি মুখ চাহিবে না। চোখ দিয়া আমার সহজে জল পড়ে না, ভালবাসার কাঙালবৃত্তি করিতেও আমি পারি না। জগতে কিছুই নাই, কাহারো কাছে কিছু পাই নাই, দাও দাও বলিয়া হাত বাড়াইয়া থাকিতে আমার

লজ্জা করে। বইয়ে পড়িয়াছি এই লইয়া কত বিরোধ, কত জ্বালা, মান-অভিমানের কতই না প্রমত্ত আক্ষেপ—স্নেহের সুধা গরল হইয়া উঠার কত না বিক্ষুব্ধ কাহিনী! এ-সকল মিথ্যা নয় জানি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে বৈরাগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া বলিতে লাগিল, ছি ছি ছি!

বহুক্ষণ পরে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী যখন সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, তখন জানিতেও পারিল না যে, নিদ্রাবিহীন নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। অশ্রু পড়িতেই লাগিল, কিন্তু আজিকার আয়ত্তাতীত ধন একদিন আমারই ছিল বলিয়া ব্যর্থ হাহাকারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

এগার

সকালে উঠিয়া শুনিলাম, অতি প্রত্যুষেই রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেছে, এবং তিন দিনের মধ্যে যে বাড়ি আসিতে পারিবে না, এ খবরও পাইলাম। হইলও তাহাই। সেখানে বিরাট কাণ্ড কিছু যে চলিতে লাগিল তাহা নয়, তবে দু-দশজন ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যে গতিবিধি হইতেছে, কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হইয়াছে, তাহার আভাস জানালায় বসিয়াই অনুভব করিতাম। কি ব্রত, কিরূপ তাহার অনুষ্ঠান, সম্পন্ন করিলে স্বর্গের পথ কতখানি সুগম হয়, ইহার কিছুই জানিতাম না, জানার কৌতূহলও ছিল না। রতন প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিত। বলিত, আপনি একবারও গেলেন না বাবু?

জিজ্ঞাসা করিতাম, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

রতন একটু মুশকিলে পড়িত। সে এইভাবে জবাব দিত যে, আমার একেবারে না যাওয়াটা লোকের চোখে যেন কেমন কেমন ঠেকে। হয়ত বা কেউ মনে করে, এতে আমার অনিচ্ছা। বলা যায় না ত!

না, বলা কিছুই যায় না। প্রশ্ন করিতাম, তোমার মনিব কি বলেন?

রতন বলিত, তাঁর ইচ্ছে ত জানেন, আপনি না থাকলে কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কি করবেন, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, রোগা শরীর, এতখানি হাঁটলে অসুখ করতে পারে। আর এসে হবেই বা কি!

বলিলাম, সে ত ঠিক। তা ছাড়া তুমি ত জান রতন, এই-সব পূজা-অর্চনা ধর্মকর্মের মাঝখানে আমি ভয়ানক বেমানান হয়ে পড়ি। যাগযজ্ঞের ব্যাপারে আমার একটু গা-আড়াল দিয়ে থাকাই ভাল। ঠিক না?

রতন সায় দিয়া বলিত, সে ঠিক। কিন্তু আমি বুঝিতাম রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়া আমার উপস্থিতি তথায়—কিন্তু থাক সে।

হঠাৎ মস্ত একটা সুখবর পাইলাম। মনিবের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিবার অজুহাতে গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীমহাশয় সস্ত্রীক গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বলিস কি রতন, একেবারে সস্ত্রীক?

আজ্ঞে হাঁ। তাও আবার বিনা নেমন্তন্নে।

বুঝিলাম ভিতরে রাজলক্ষ্মীর কি একটা কৌশল আছে। সহসা এমনও মনে হইল, হয়ত এইজন্যই সে নিজের বাটীতে না করিয়া অপরের গৃহে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছে।

রতন কহিতে লাগিল, বিনুকে কোলে নিয়ে বড়গিন্নীর সে কি কান্না! ছোট মাঠাকরুন স্বহস্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন, খেতে চাননি বলে আসন পেতে ঠাঁই করে ছোট মেয়ের মত তাঁকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিলেন। মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ব্যাপার দেখে বুড়ো কুশারীঠাকুরমশাই ত একেবারে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠলেন—আমার ত বোধ হয় বাবু, কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে ছোট-মাঠাকরুন এবার ওই ভাঙ্গা কুঁড়েটার মায়া কাটিয়ে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। তা যদি হয় ত গাঁ-সুদ্ধ সবাই খুশি হবে। আর এ কীর্তি যে আমার মায়ের, সেও কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্চি বাবু।

সুনন্দাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এতখানি আশান্বিত হইতে পারিলাম না, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর উপর হইতে আমার অনেকখানি অভিমান শরতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত দেখিতে দেখিতে সরিয়া গিয়া চোখের সুমুখটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

এই দুটি ভাই ও জায়েদের মধ্যে বিচ্ছেদ যেখানে সত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, মনের মধ্যে এতটুকু চিড় না খাইয়াও বাহিরে যেখানে এতবড় ভাঙ্গন ধরিয়াছে—সেই ফাটল জোড়া দিবার মত হৃদয় ও কৌশল যাহার আছে তাহার মত শিল্পী আর আছে কোথায়? এই উদ্দেশ্যে কতদিন হইতেই না সে গোপনে উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে। একান্তমনে আশীর্বাদ করিলাম, এই সদিচ্ছা যেন তাহার পূর্ণ হয়। কিছুদিন হইতে আমার অন্তরের মধ্যে নিভৃতে যে ভার সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অনেকখানি হালকা হইয়া গিয়া আজিকার দিনটা আমার বড় ভাল কাটিল। কোন্ শাস্ত্রীয় ব্রত রাজলক্ষ্মী নিয়াছে আমি জানি না, কিন্তু আজ তাহার তিনদিনের মিয়াদ পূর্ণ হইয়া কাল আবার দেখা হইবে, এই কথাটা বহুদিন পরে আবার যেন নূতন করিয়া স্মরণ হইল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী আসিতে পারিল না, কিন্তু অনেক দুঃখ করিয়া রতনের মুখে খবর পাঠাইল যে, এমনি অদৃষ্ট একবার দেখা করিয়া যাইবারও সময় নাই—দিন-ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। নিকটে কোথায় বক্রেশ্বর বলিয়া তীর্থ আছে, সেখানে জাগ্রত দেবতা এবং গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহাতে অবগাহন-স্নান করিলে শুধু কেবল সেই-ই নয়, তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের তিনকোটি জন্মের যে যেখানে আছে সবাই উদ্ধার হইয়া যাইবে। সঙ্গী জুটিয়াছে, দ্বারে গরুর গাড়ি প্রস্তুত, যাত্রাক্ষণ প্রত্যাসন্নপ্রায়। দু-একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু দরোয়ানের হাত দিয়া রতন পাঠাইয়া দিল, সে বেচারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া দিতে গেল। শুনিলাম ফিরিয়া আসিতে পাঁচ-সাতদিন বিলম্ব হইবে।

আরও পাঁচ-সাতদিন! বোধ করি অভ্যাসবশতঃই হইবে, আজ তাহাকে দেখিবার জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু রতনের মুখে অকস্মাৎ তাহার তীর্থযাত্রার সংবাদ পাইয়া অভিমান বা ক্রোধের পরিবর্তে বুকের মধ্যেটা আমার সহসা করুণা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পিয়ারী সত্য সত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে এবং তাহারই কৃতকর্মের দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্বদেহমনে যে বেদনার আর্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সংবরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই যে অশ্রান্ত বিক্ষোভ, নিজের জীবন হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার এই যে দিগ্বিহীন ব্যাকুলতা, ইহার কি কোন শেষ নাই? খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মত কি সে দিনরাত্রি অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া মরিবে? আর সেই পিঞ্জরের লৌহশলাকার মত আমিই কি চিরদিন তাহার মুক্তিপথের দ্বার আগলাইয়া থাকিব? সংসারে যাহাকে কোনকিছু দিয়া কোনদিন বাঁধিতে পারিল না, সেই আমার ভাগ্যেই কি শেষে এতবড় দুর্ভোগ লিখিয়া দিয়াছেন? আমাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে, আমার মোহ সে কাটাইতে পারে না। ইহারই পুরস্কার দিতে কি তাহার সকল ভবিষ্যৎ সুকৃতির গায়ে নিগড় হইয়া থাকিবে?

মনে মনে বলিলাম, আমি তাহাকে ছুটি দিব—সেবারের মত নয়, এবার একান্তচিত্তে, অন্তরের সমস্ত শুভাশীর্বাদ দিয়া চিরদিনের মত মুক্তি দিব, এবং যদি পারি, সে ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই আমি এ দেশ ছাড়িয়া যাইব। কোন প্রয়োজনে, কোন অজুহাতে, সম্পদ ও বিপদের কোন আবর্তনেই আর তাহার সম্মুখীন হইব না। একদিন নিজের অদৃষ্টই আমাকে এ সঙ্কল্প স্থির রাখিতে দেয় নাই, কিন্তু আর তাহার কাছে আমি কিছুতেই পরাভব মানিব না।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! একদিন পাটনা হইতে যখন বিদায় লইয়াছিলাম, পিয়ারী চুপ করিয়া তাহার দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তখন মুখে তাহার কথা ছিল না, কিন্তু সেই নিরুদ্ধ অন্তরের অশ্রুগাঢ় ফিরিবার ডাক কি সমস্ত পথটাই আমার কানে গিয়া পুনঃপুনঃ পৌঁছে নাই? কিন্তু ফিরি নাই। দেশ ছাড়িয়া সুদূর বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যে রূপহীন, ভাষাহীন দুর্বার আকর্ষণ আমাকে অহর্নিশি টানিতে লাগিল, দেশ-বিদেশের ব্যবধান তাহার কাছে কতটুকু? আবার একদিন ফিরিয়া

আসিলাম। বাহিরের লোকে আমার পরাজয়ের গ্লানিটাই দেখিতে পাইল, আমার মাথার অম্লানকান্ত জয়মাল্য তাহাদের চোখে পড়িল না।

এম্‌নিই হয়। আমি জানি, অচিরভবিষ্যতে আবার একদিন বিদায়ের ক্ষণ আসিয়া পড়িবে। সেদিনও হয়ত সে এমনি নীরব হইয়াই রহিবে, কিন্তু আমার শেষ বিদায়ের যাত্রাপথ ব্যাপিয়া সেই অশ্রুতপূর্ব নিবিড় আহ্বান হয়ত আর কানে পশিবে না।

মনে মনে বলিলাম, থাকার নিমন্ত্রণ শেষ হইয়া যখন যাওয়াটাই কেবল বাকী থাকে, সে কি ব্যথার বস্তু! অথচ এ ব্যথার অংশী নাই, শুধু আমারই হৃদয়ে গহ্বর খনিয়া এই নিন্দিত বেদনাকে চিরদিন একাকী থাকিতে হইবে। রাজলক্ষ্মীকে ভালবাসিবার অধিকার সংসার আমাকে দেয় নাই; এই একাগ্র প্রেম, এই হাসিকান্না, মান-অভিমান, এই ত্যাগ, এই নিবিড় মিলন—সমস্তই লোকচক্ষে যেমন ব্যর্থ, এই আসন্ন বিচ্ছেদের অসহ অন্তর্দাহও বাহিরের দৃষ্টিতে আজ তেম্‌নি অর্থহীন। আজ এই কথাটাই আমার সবচেয়ে বেশি বাজিতে লাগিল, একের মর্মান্তিক দুঃখ যখন অপরের কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে বড় ট্র্যাজিডি পৃথিবীতে আর আছে কি! অথচ, এম্‌নিই বটে। লোকের মধ্যেও বাস করিয়া যে লোক লোকাচার মানে নাই, বিদ্রোহ করিয়াছে, সে নালিশ করিবে গিয়া কাহার কাছে? এ সমস্যা শাশ্বত ও পুরাতন। সৃষ্টির দিন হইতে আজি পর্যন্ত এই প্রশ্নই বারংবার আবর্তিয়া চলিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের গর্ভে যতদূর দৃষ্টি যায় ইহার সমাধান চোখে পড়ে না। ইহা অন্যায়, অবাঞ্ছিত। তথাপি, এতবড় সম্পদ, এতবড় ঐশ্বর্যই কি মানুষের আর আছে? অবাধ্য নরনারীর এই অবাঞ্ছিত হৃদয়াবেগের কত নিঃশব্দ বেদনার ইতিহাসকেই না মাঝখানে রাখিয়া যুগে যুগে কত পুরাণ, কত কাহিনী, কত কাব্যেরই না অভ্রভেদী সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আজ ইহা যদি থামিয়া যায়? মনে মনে বলিলাম, থাক। রাজলক্ষ্মীর ধর্মে মতি হোক, তাহার বক্রেশ্বরের রাস্তা সুগম হোক, তাহার মন্ত্রোচ্চারণ নির্ভুল হোক, আশীর্বাদ করি তাহার পুণ্যার্জনের পথ নিরন্তর নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হোক, আমার দুঃখের ভার আমি একাই বহন করিব।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনে হইল, গঙ্গামাটির এই বাড়িঘর, পথঘাট, খোলা মাঠ, সকল বন্ধনই যেন আমার শিথিল হইয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী কবে ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু মন যেন আর একটা দণ্ডও এখানে থাকিতে চাহে না। স্নানের জন্য রতন তাগিদ শুরু করিয়াছে। কারণ, যাইবার সময় রাজলক্ষ্মী শুধু কড়া হুকুম দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, রতনকে তাহার পা ছুঁয়াইয়া দিব্য করাইয়া লইয়াছে যে, তাহার অবর্তমানে আমার এতটুকু অযত্ন বা অনিয়ম না হয়। খাবার সময় সকালে এগারোটা ও রাত্রে আটটার মধ্যে ধার্য হইয়াছে, রতনকে প্রত্যহ ঘড়ি দেখিয়া সময় লিখিয়া রাখিতে হইবে। কথা আছে, ফিরিয়া আসিয়া সে প্রত্যেককে একমাসের করিয়া মাহিনা বকশিশ দিবে। রান্না শেষ করিয়া বামুনঠাকুর ঘর-বাহির করিতেছে, এবং চাকরের মাথায় তরিতরকারি, মাছ, দুধ প্রভৃতি লইয়া প্রভাত না হইতেই যে কুশারীমহাশয় স্বয়ং আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেছেন, আমি তাহা বিছানায় শুইয়া টের পাইয়াছিলাম। ঔৎসুক্য কিছুতেই আর ছিল না—বেশ, এগারোটা এবং আটটাই সই। একমাসের উপরি মাহিনা হইতে আমার জন্য কেহ বঞ্চিত হইবে না তাহা নিশ্চিত।

কাল রাত্রে অতিশয় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, আজ নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই স্নানাহার শেষ করিয়া বিছানায় শুইতে না শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল চারিটার কাছাকাছি। কয়েকদিন হইতেই নিয়মিত বেড়াইতে বাহির হইতে-ছিলাম, আজিও হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

দ্বারের বাহিরে একজন লোক বসিয়াছিল, সে হাতে একখানা চিঠি দিল। সতীশ ভরদ্বাজের চিঠি, কে একজন অনেক কষ্টে এক ছত্র লিখিয়া জানাইয়াছে যে, সে অত্যন্ত পীড়িত। আমি না গেলে সে মরিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে তাহার?

লোকটা বলিল, কলেরা।

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। খুশি তাহার কলেরার জন্য নয়। গৃহের সংস্রব হইতে কিছুক্ষণের জন্যও যে দূরে যাইবার সুযোগ মিলিল ইহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

একবার ভাবিলাম, রতনকে ডাকিয়া একটা খবর দিয়া যাই, কিন্তু সময়ের অভাবে ঘটিয়া উঠিল না। যেমন ছিলাম, তেমনি বাহির হইয়া গেলাম, এ বাড়ির কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

প্রায় ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটিয়া শেষবেলায় গিয়া সতীশের ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। ধারণা ছিল, রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের ইনচার্জ এস. সি. বর্‌দাজের অনেক কিছু ঐশ্বর্য দেখিতে পাইব, কিন্তু গিয়া দেখিলাম হিংসা করিবার মত কিছু নয়। ছোট একটা ছোলদারি তাঁবুতে সে থাকে, পাশেই তাহার লতাপাতা খড়কুটা দিয়া তৈরি কুটীরে রান্না হয়। একটি হৃষ্টপুষ্ট বাউরী মেয়ে আগুন জ্বালিয়া কি একটা সিদ্ধ করিতেছিল, আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। এ সতীশের প্রণয়িনী।

ইতিমধ্যে রামপুরহাট হইতে একজন ছোকরাগোছের পাঞ্জাবী ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে সতীশের বাল্যবন্ধু জানিয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। রোগীর সম্বন্ধে জানাইলেন যে কেস সিরিয়াস্ নয়, প্রাণের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ট্রলি প্রস্তুত, এখন বাহির হইতে না পারিলে হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছিতে অতিশয় রাত্রি হইয়া যাইবে—ক্লেশের অবধি থাকিবে না। আমার কি হইবে সে তাঁহার ভাবিবার বস্তু নয়। কখন কি করিতে হইবে রীতিমত উপদেশ দিলেন, এবং ঠেলাগাড়িতে রওনা হইবার মুখে কি ভাবিয়া তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া গোটা দুই-তিন কৌটা ও শিশি আমার হাতে দিয়া কহিলেন, কলেরা কতকটা ছোঁয়াচে রোগের মত। ঐ ডোবার জলটা ব্যবহার করতে মানা করে দেবেন, এই বলিয়া তিনি মাটি-তোলা খাদটা হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আর যদি খবর পান কুলিদের মধ্যে কারও হয়েচে—হতে পারে—এই ঔষধগুলো ব্যবহার করবেন। এই বলিয়া তিনি রোগের কি অবস্থায় কোন্‌টা দিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

মানুষটি মন্দ নয়, মায়াদয়া আছে। আমার বাল্যবন্ধু কেমন থাকেন কাল যেন তিনি খবর পান, এবং কুলিদের উপরও যেন দৃষ্টি রাখিতে ভুল না হয়, আমাকে বার বার সাবধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ হইল ভাল। রাজলক্ষ্মী গিয়াছে বক্রেশ্বর দেখিতে, আর রাগ করিয়া আমি বাহির হইয়াছি পথে। পথেই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ। বাল্যকালের পরিচয়, অতএব বাল্যবন্ধু ত বটেই। তবে বছর-পনর খবরাখবর ছিল না, হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। কিন্তু দিন-দুয়ের মধ্যেই অকস্মাৎ এ কি ঘোরতর মাখামাখি! তাঁহার কলেরায় চিকিৎসার ভার, শুশ্রূষার ভার, মায় তাঁর শ-দেড়েক মাটিকাটা কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল আমার উপর! বাকি রহিল শুধু তাঁহার সোলার হ্যাট এবং টাটু ঘোড়াটি। আর বোধ হয় যেন ওই কুলি মেয়েটিও। তাহার মানভূমের অনির্বচনীয় বাউরী ভাষার অধিকাংশই ঠেকিতে লাগিল, কেবল এটুকু ঠেকিল না যে, মিনিট দশ-পনরর মধ্যেই সে আমাকে পাইয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছে। যাই, আর ত্রুটি রাখি কেন, ঘোড়াটিকে একবার দেখিয়া আসি গে।

ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টই এমনি। না হইলে রাজলক্ষ্মীই বা আসিত কিরূপে, অভয়াই বা আমাকে দিয়া তাহার দুঃখের বোঝা বহাইত কেমন করিয়া? আর এই ব্যাঙ এবং তাহার কুলি গ্যাঙ! কোন ব্যক্তির পক্ষেই ত এ-সকল ঝাড়িয়া ফেলিতে একমুহূর্তের অধিক সময় লাগিত না। আর আমিই বা সারাজীবন বহিয়া বেড়াই কিসের জন্য?

তাঁবুটা রেল কোম্পানির। সতীশের নিজস্ব সম্পত্তির একটা তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কয়েকটা এনামেলের বাসন, একটা স্টোভ, একটা লোহার তোরঙ্গ, একটা কেরোসিন তেলের বাক্স, এবং তাহার শয়ন করিবার ক্যাম্বিশের খাট, বহু-ব্যবহারে ডোঙার আকার ধারণ করিয়াছে। সতীশ চালাক লোক, এ খাটে বিছানার প্রয়োজন হয় না, একখানা যা-তা হইলেই চলিয়া যায়, তাই ডোরাকাটা একখানা শতরঞ্চি ছাড়া আর কিছুই সে কেনে নাই। ভবিষ্যতে কলেরা হওয়ার কোন ব্যবস্থাই তাহার ছিল না। ক্যাম্বিশের খাটে শুশ্রূষা করার অত্যন্ত অসুবিধা এবং একমাত্র শতরঞ্চি অতিশয় নোংরা হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাহাকে নীচে শোয়ানো ছাড়া উপায় নাই।

আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটির নাম কালীদাসী; জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী, কারও দু-একখানা বিছানা পাওয়া যাবে?

কালী কহিল, না।

কহিলাম, দুটি খড়-টড় যোগাড় করে আনতে পার?

কালী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, এখানে কি গরু আছে?

কহিলাম, বাবুকে তা হলে শোয়াই কোথায়?

কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল, হেথাকে। উ কি বাঁচ্‌বেক!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, এমন নির্বিকল্প প্রেম জগতে সুদুর্লভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র। তোমার কথাগুলি শুনলে আর শঙ্করের মোহ-মুদ্গর-পাঠের আবশ্যকতা থাকে না; কিন্তু আমার সেরূপ বিজ্ঞানময় অবস্থা নয়, লোকটা এখনও বাঁচিয়া; কিছু একটা পাতা চাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুর পরনের একখানা কাপড়চোপড়ও কি নেই?

কালী ঘাড় নাড়িল। তাহার মধ্যে দ্বিধা-সঙ্কোচ ছিল না। সে 'বোধ হয়' বলে না। কহিল, কাপড় নেই, পেন্টুলুন আছে।

পেন্টুলুন সাহেবী জিনিস, মূল্যবান বস্তু, কিন্তু তাহার দ্বারা শয্যারচনার কাজ চলে কি না ভাবিয়া পাইলাম না। সহসা মনে পড়িল, আসিবার সময় অদূরে একটা ছিন্ন জীর্ণ ত্রিপল দেখিয়াছিলাম; কহিলাম, চল না যাই, দু'জনে ধরাধরি করে সেটা নিয়ে আসি। পেন্টুলুন পাতার চেয়ে সে ভাল হবে।

কালী রাজী হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তখনও তাহা পড়িয়া ছিল, আনিয়া তাহাতেই সতীশ ভরদ্বাজকে শোয়াইয়া দিলাম। তাহারই একধারে কালী অত্যন্ত সবিনয়ে স্থান লইল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ধারণা ছিল, মেয়েদের নাক ডাকে না। কালী তাহাও অপ্রমাণ করিয়া দিল।

আমি একাকী সেই কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া। এদিকে সতীশের হাতে পায়ে ঘন ঘন খিল ধরিতেছে, সেক-তাপের প্রয়োজন, বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া কালীকে তুলিলাম; সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া জানাইল, কাঠকুটা নাই, সে আগুন জ্বালিবে কি দিয়া? নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতাম, কিন্তু আলোর মধ্যে সম্বল এই হ্যারিকেন লণ্ঠনটি। তথাপি একবার তাহার রান্নাঘরে গিয়া খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কালী মিথ্যা বলে নাই। এই কুটীরটা ছাড়া অগ্নিসংযোগ করিতে পারি এরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই। কিন্তু সাহস হইল না, পাছে প্রাণ বাহির হইবার পূর্বেই সতীশের সৎকার করিয়া ফেলি! ক্যাম্প খাট এবং কেরোসিনের বাক্স বাহিরে আনিয়া দেশলাই জ্বালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইলাম, নিজের জামা খুলিয়া পুঁটুলির মত করিয়া কিছু কিছু সেক দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া রোগীর কোন উপকারই তাহাতে হইল না।

রাত্রি দুটাই হইবে কি তিনটাই হইবে, খবর আসিল জন-দুই কুলির ভেদবমি হইতেছে। তাহারা আমাকে ডাক্তারবাবু বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহাদেরই আলোর সাহায্যে ঔষধপত্র লইয়া কুলি-লাইনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মালগাড়িতে তাহারা থাকে। ছাদবিহীন খোলা ট্রাকের সারি লাইনের উপর দাঁড়াইয়া আছে, মাটি কাটার প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিন জুড়িয়া দিয়া তাহাদের গম্যস্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

বাঁশের মই দিয়া ট্রাকের উপরে উঠিলাম। একধারে একজন বুড়াগোছের লোক শুইয়া আছে, তাহার মুখের পরে আলো পড়িতেই বুঝা গেল রোগ সহজ নয়, ইতিমধ্যেই অনেক-দূর অগ্রসর হইয়া গেছে। অন্যধারে জন পাঁচ-সাত লোক, স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই আছে, কেহ বা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারও বা তখন পর্যন্ত সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

ইহাদের জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একজন রোগী কৈ?

সে অন্ধকারে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আর-একখানা ট্রাক দেখাইয়া কহিল, উখানে।

পুনরায় মই দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এবার একজন স্ত্রীলোক। বয়স পঁচিশ-

ত্রিশের অধিক নয়, গুটি-দুই ছোট ছেলেমেয়ে তাহার পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। স্বামী নাই, সে গত বৎসর আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া অপর একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামে চা-বাগানে কাজ করিতে গিয়াছে।

এ গাড়িতেও আরও জন পাঁচ-ছয় স্ত্রী-পুরুষ ছিল, তাহারা একবাক্যে উহার পাষণ্ড স্বামীর নিন্দা করা ছাড়া আমার বা রোগিণীর কোন সাহায্যই করিল না। পাঞ্জাবী ডাক্তারের শিক্ষামত উভয়কেই ঔষধ দিলাম, শিশু-দুটাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও তাহাদের ভার লইতে স্বীকার করাইতে পারিলাম না।

সকাল নাগাদ আর একটি ছেলের ভেদবমি শুরু হইল, ওদিকে সতীশ ভরদ্বাজের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইয়াই আসিতেছে। বহু সাধ্যসাধনায় একজনকে পাঠাইলাম সাঁইথিয়া স্টেশনে পাঞ্জাবী ডাক্তারকে খবর দিতে। সে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তিনি আর কোথায় গিয়াছেন রোগী দেখিতে।

আমার সবচেয়ে মুশকিল হইয়াছিল সঙ্গে টাকা ছিল না। নিজে ত কাল হইতে উপবাসে আছি। নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে নাহয় হইল, কিন্তু জল না খাইয়া বাঁচি কিরূপে? সুমুখের খাদের জল ব্যবহার করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়া দিলাম, কিন্তু কেহই কথা শুনিল না। মেয়েরা মৃদুহাস্যে জানাইল, এ ছাড়া জল আর আছে কোথায় ডাক্তার? কিছুদূরে গ্রামের মধ্যে জল ছিল, কিন্তু যায় কে? তাহারা মরিতে পারে, কিন্তু বিনা পয়সায় এই ব্যর্থ কাজ করিতে রাজী নয়।

এমনি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রাকের উপরেই আমাকে দুইদিন তিনরাত্রি বাস করিতে হইল। কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলাম না, সব-কয়টাই মরিল, কিন্তু মরাটাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার নয়। মানুষ জন্মাইলেই মরে, কেহ দু'দিন আগে, কেহ দু'দিন পরে-- এ আমি সহজে এবং অত্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারি। বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাই না, এই মোটা কথাটা বুঝিবার জন্য এত শাস্ত্রালোচনা, এত বৈরাগ্যসাধনা, এত প্রকারের তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন হয় মানুষের কিসের জন্য? সুতরাং মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না।

পরদিন সকালে ভরদ্বাজের দেহত্যাগ হইল। লোকাভাবে দাহ করা গেল না, মা ধরিত্রী তাহাকে কোলে স্থান দিলেন।

ওদিকের কাজ মিটাইয়া ট্রাকে ফিরিয়া আসিলাম। না আসিলেই ছিল ভাল, কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। জনারণ্যের মাঝখানে রোগীদের লইয়া আমি নিছক একাকী। সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কতবড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রখর সূর্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নীচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্যন্ত কেহ নাই। সরকারী কাজ, মাটিকাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হপ্তার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি মিলিবে। অথচ তাহাদেরই স্বজাতি, তাহাদেরই ত ছেলে! গ্রামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমনধারা নয়। কিন্তু এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোক-গুলাকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটি কাটার জনাই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রাকের উপর জমা করা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানবহৃদয়-বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকী নাই! শুধু মাটি কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।

ভরদ্বাজ গিয়াছে, কিন্তু তাহার অমর কীর্তি তাড়ির দোকান অক্ষয় হইয়া আছে। সন্ধ্যাবেলায় নরনারীনির্বিশেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল, দুপুরবেলার রাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে, এ হাঙ্গামাটাও এ বেলায় মেয়েদের নাই। তাহার পরে কে বা কাহার কথা শুনে। জমাদারের গাড়ি হইতে ঢোল ও করতাল সহযোগে প্রবল সঙ্গীতচর্চা হইতে লাগিল, সে যে কখন থামিবে ভাবিয়া পাইলাম না। কাহারও জন্য তাহাদের মাথাব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের ট্রাকেই কে-একটা মেয়ের বোধ হয় জন-দুই

প্রণয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নাই। এদিকে ট্রাকে এক ব্যাটা কিছু অধিক তাড়ি খাইয়াছে; সে এমনি উচ্চ-কলরোলে স্ত্রীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিল যে, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। দূরের একটা গাড়ি হইতে কে একজন স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে বিলাপ করিতেছিল, তাহার মা ঔষধ চাহিতে আসায় খবর পাইলাম কামিনীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। লজ্জা নাই, শরম নাই, গোপনীয় কোথাও কিছু নাই—সমস্ত খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবনযাত্রার অবাধ গতি বীভৎস প্রকাশ্যতায় অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে। শুধু আমিই কেবল দল-ছাড়া। আসন্ন মৃত্যুলোক-যাত্রী মা ও তাহার ছেলেকে লইয়া গভীর আঁধার রাত্রে একাকী বসিয়া আছি।

ছেলেটা বলিল, জল—

মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক।

ছেলেটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তারপর চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে রহিল।

তৃষ্ণার জল না থাক, কিন্তু আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। হায় রে হায়! শুধু কেবল মানবের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিই নয়, নিজের সুদুঃসহ যাতনার প্রতিও কি অপরিসীম ঔদাসীন্য! এই ত পশু! এ ধৈর্যশক্তি নয়, জড়তা। এ সহিষ্ণুতা মানবতার ঢের নীচের স্তরের বস্তু।

আমাদের ট্রাকের অন্য লোকগুলা অকাতরে ঘুমাইতেছে। কালি-পড়া হ্যারিকেনের অত্যন্ত মলিন আলোকেও আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, মা ও ছেলে উভয়েরই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া খিল ধরিয়াছে। কিন্তু কি-ই বা আমার করিবার ছিল!

সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, সেদিকে চাহিয়া আমি বেদনায়, ক্ষোভে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বার বার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর্। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিযা নিয়া যা।

বার

সকালে খবর পেঁছিল আর দুইজন পীড়িত হইয়াছে। ঔষধ দিলাম, জমাদার সাঁইথিয়ায় সংবাদ পাঠাইয়া দিল। আশা করিলাম, এবার কর্তৃপক্ষের আসন টলিবে।

বেলা নয়টা আন্দাজ ছেলেটা মরিল। ভালই হইল। এই ত ইহাদের জীবন!

সম্মুখের মাঠের পথ দিয়া দুইজন ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়াছিলেন; কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে গ্রাম কত দূরে?

যিনি বৃদ্ধ, তিনি মুখটা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন, ঐ যে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, খাবার জিনিস কিছু মেলে?

অন্যজন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মেলে না কি রকম! ভদ্রলোকের গ্রাম—চাল, ডাল, ঘি, তেল, তরিতরকারি যা খুশি আপনার। আসছেন কোথা থেকে? নিবাস? মশায়, আপনারা?

সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া সতীশ ভরদ্বাজের নাম করিতে উভয়ে রুষ্ট হইয়া উঠিলেন; বৃদ্ধ বলিলেন, মাতাল, বদমাইস, জোচ্চোর! ইনি কোন্-একটা হাই-স্কুলের হেডমাস্টার!

তাঁহার সঙ্গী কহিলেন, রেলের লোক আর কত ভাল হবে! কাঁচা পয়সাটা বেশ হাতে ছিল কিনা!

প্রত্যুত্তরে সতীশের টাটকা কবরেব ঢিপিটা আমি হাত দিয়া দেখাইয়া জানাইলাম, এখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। কাল সে মরিয়াছে, লোকাভাবে দাহ করিতে পারা যায় নাই, ঐখানে মাটি দিতে হইয়াছে।

বলেন কি! বামুনের ছেলেকে—

কিন্তু উপায় কি?

শুনিয়া উভয়েই ক্ষুব্ধ হইয়া জানাইলেন যে, ভদ্রলোকের গ্রাম, একটুখানি খবর পাইলে যা হোক একটা উপায় নিশ্চয় হইয়া যাইত। একজন প্রশ্ন করিলেন, আপনি তাঁর কে?

বলিলাম, কেউ না। সামান্য পরিচয় ছিল মাত্র। এই বলিয়া কি করিয়া এখানে জুটিলাম সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ দিলাম। দুইদিন খাওয়া হয় নাই, অথচ, কুলিদের মধ্যে কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না।

খাওয়া হয় নাই শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং সঙ্গে যাইবার জন্য বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং, এই ভয়ানক ব্যাধির মধ্যে খালিপেটে থাকা যে মারাত্মক ব্যাপার তাহাও একজন জানাইয়া দিলেন।

বেশি বলিতে হইল না—বলার প্রয়োজনই ছিল না, ক্ষুৎপিপাসায় মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছিলাম—তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। পথে এই বিষয়েই আলাপ হইতে লাগিল। পাড়া-গাঁয়ের লোক, শহরের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু মজা এই যে, ইংরাজ রাজত্বের খাঁটি পলিটিক্সটুকু তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নয়। এ যেন দেশের লোকে দেশের মাটি হইতে, জল হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে অস্থিমজ্জা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

উভয়েই কহিলেন, সতীশ ভরদ্বাজের দোষ নেই মশায়, আমরা হলেও ঠিক অমনি হয়ে উঠতাম। কোম্পানি বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সে-ই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এঁদের ছোঁয়াচের গুণ!

ক্ষুধার্ত ও একান্ত ক্লান্তদেহে অধিক কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেলের লাইন পাতবার? কোন লোকে কি তা' চায়? চায় না। কিন্তু তবু চাই। দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়—কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশবাবুই মারা যেতেন? কখ্‌নো না। ম্যালেরিয়া, কলেরা হর্‌-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। কি বলেন মশাই? ঠিক নয়?

আলোচনা করিবার মত গলায় জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই! কেবলমাত্র এইজন্যই তেত্রিশ কোটি নরনারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীয় শাসনতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুদ্ধমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার জো নাই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার এই চিন্তাতেই যেন বাক্যযোজনা করিয়া কহিলেন, মশাই, ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে মানুষ আমি, আগে বিশ ক্রোশের মধ্যে রেলগাড়ি ছিল না, তখন কি সস্তা, আর কি প্রচুর জিনিসপত্রই না সেখানে ছিল। তখন কারও কিছু জন্মালে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তার একটু ভাগ পেত, এখন থোড়, মোচা, উঠানের দুই-আঁটি শাক পর্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায় না, বলে, থাক, সাড়ে-আটটার গাড়িতে পাইকেরের হাতে তুলে দিলে দু'পয়সা আসবে। এখন দেওয়ার নাম হয়েচে অপব্যয়—মশাই, দুঃখের কথা বলতে কি, পয়সা-করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে।

আর আপনারাই কি প্রাণভরে ভোগ করতে পায়? পায় না। শুধু ত আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পাওয়াটাই হয়েছে যেন তাদের একটিমাত্র পরমার্থ।

এই-সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্ছে এই রেলগাড়ি। শিরার মত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলের রাস্তা যদি না ঢুকতে পেত, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না

থাকত, আর সেই লোভে মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত, এত দুর্দশা দেশের হোতো না।

রেলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও কম নহে। বস্তুতঃ যে ব্যবস্থায় মানুষের জীবন-ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার প্রতিদিন অপহৃত হইয়া শৌখিন আবর্জনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা না জন্মিয়াই পারে না। বিশেষতঃ, দরিদ্র মানবের যে দুঃখ ও যে হীনতা এইমাত্র চোখে দেখিয়া আসিলাম, কোন যুক্তিতর্ক দিয়াই তাহার উত্তর মিলে না; তথাপি কহিলাম, আবশ্যকের অতিরিক্ত জিনিসগুলো অপচয় না করে যদি বিক্রি হয়ে অর্থ আসে সে কি নিতান্তই মন্দ?

ভদ্রলোক লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হ্যাঁ নিতান্ত মন্দ, নিছক অকল্যাণ।

ইঁহার ক্রোধ ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা ঢের বেশি প্রচন্ড। বলিলেন, এই অপচয়ের ধারণাটা আপনার বিলাতের আমদানী, ধর্মস্থান ভারতবর্ষের মাটিতে এর জন্ম হয়নি, জন্ম হতেই পারে না। মশাই, মাত্র নিজের প্রয়োজনটুকুই কি একমাত্র সত্য? যার নেই তার প্রয়োজন মিটানোর কি কোন মূল্যই পৃথিবীতে নেই? সেটুকু বাইরে চালান দিয়ে অর্থ সঞ্চয় না করাই হ'ল অপচয়, হ'ল অপরাধ? এই নির্মম, নিষ্ঠুর উক্তি আমাদের মুখ দিয়ে বার হয়নি, বার হয়েছে তাদের যারা বিদেশ থেকে এসে দুর্বলের গ্রাস কেড়ে নেবার দেশব্যাপী জালে ফাঁসের পর ফাঁস যোজনা করে চলেছে।

বলিলাম, দেখুন, দেশের অন্ন বিদেশে বার করে নিয়ে যাবার আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু একের উদ্বৃত্ত অন্নে অপরের চিরদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে থাকবে, এইটেই কি মঙ্গলের? তা ছাড়া, বাস্তবিক, বিদেশ থেকে এসে ত তারা জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় না? অর্থ দিয়ে কিনে নিয়েই ত যায়?

ভদ্রলোক তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ কিনেই বটে। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলা যেমন মাছের সাদর নিমন্ত্রণ!

এই ব্যঙ্গোক্তির আর উত্তর দিলাম না। কারণ, একে ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রান্তিতে বাদানুবাদের শক্তি ছিল না, অপিচ তাঁহার বক্তব্যের সহিত মূলতঃ আমার বিশেষ মতভেদও ছিল না।

কিন্তু আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকেই প্রতিপক্ষ জ্ঞানে অত্যন্ত উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, মশাই, ওদের উদ্দাম বণিকবুদ্ধির তত্ত্বকথাটুকুকেই সার সত্য বলে বুঝে আছেন, কিন্তু আসলে এতবড় অসৎ বস্তু পৃথিবীতে আর নেই। ওরা জানে শুধু ষোল আনার পরিবর্তে চৌষট্টি পয়সা গুনে নিতে—ওরা বোঝে কেবল দেনা আর পাওনা, ওরা শিখেচে শুধু ভোগটাকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকার করতে। তাইত ওদের পৃথিবী-জোড়া সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যসন জগতের সমস্ত কল্যাণ আচ্ছন্ন করে দিয়েচে। মশাই, এই রেল, এই কল, এই লোহা-বাঁধানো রাস্তা—এই ত হ'ল পবিত্র vested interest—এই গুরুভারেই ত সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি বলছিলেন একের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুটুকু চালান দেবার সুযোগ না থাকলে হয় নষ্ট হ'ত, নাহয় অভাবগ্রস্তেরা বিনামূল্যে খেত। একেই অপচয় বলছিলেন, না?

কহিলাম, হাঁ, তার দিক দিয়ে অপচয় বৈ কি।

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তরে অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এ-সব বিলাতি বুলি অর্বাচীন অধার্মিকের অজুহাত। কারণ, আর একটু যখন বেশি চিন্তা করতে শিখবেন, তখন আপনারই সন্দেহ হবে বাস্তবিক এইটেই অপচয়, না দেশের শস্য বিদেশে রপ্তানি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমানোটাই বেশি অপচয়! দেখুন মশাই, চিরদিনই আমাদের গ্রামে গ্রামে জন-কতক উদ্যমহীন, উপার্জন-বিমুখ উদাসীন প্রকৃতির লোক থাকত, তাদের মুদি-ময়রার দোকানে দাবা-পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বড়লোকের আড্ডায় গান-বাজনা করে, বারোয়ারী-তলায় মোড়লি ক'রে, আরও—এমনি সব অকাজেই দিন কাটত। তাদের সকলেরই যে ঘরের

মধ্যে অন্নসংস্থান থাকত তা নয়, তবুও অনেকের উদ্বৃত্ত অংশেই তাদের সুখে-দুঃখে দিন চলে যেত। আপনাদের অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিতদের যত আক্রোশ তাদের পরেই ত? যাক, চিন্তার হেতু নেই, এই-সব অলস, অকেজো, পরাশ্রিত মানুষগুলো এখন লোপ পেয়েছে। কারণ, উদ্বৃত্ত বলে ত আর কোথাও কিছু নেই, সুতরাং, হয় অন্নাভাবে মরেচে, নাহয় কোথাও গিয়ে কোন ছোট দাস্যবৃত্তিতে ভর্তি হয়ে জীবন্মৃতভাবে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে। মেহন্নতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু আমার মত যাদের বেশি বয়স হয়েছে তারাই জানে কি গেছে। জীবন-সংগ্রাম তাদের বিলুপ্ত করেছে—কিন্তু সমস্ত গ্রামের আনন্দটুকুও যেন তাদেরই সঙ্গে সহমরণে গেছে।

এই শেষ কথাটায় চকিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাকে অল্পশিক্ষিত, সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোক ব্যতীত কিছুই বেশি মনে হইল না—অথচ বাক্য যেন তাঁহার অকস্মাৎ আপনাকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল।

তাঁহার সকল কথাকেই যে অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিলাম তাহা নয়, কিন্তু অস্বীকার করিতেও বেদনা বোধ করিলাম। কেমন যেন সংশয় জন্মিল, এ-সকল বাক্য তাঁহার নিজের নয়, এ যেন অলক্ষিত আর কাহারও জবানি।

অতিশয় সঙ্কোচের সহিত প্রশ্ন করিলাম, কিছু যদি মনে না করেন—

না না, মনে করব কেন? বলুন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এ-সকল কি আপনার নিজেরই অভিজ্ঞতা, নিজেরই চিন্তার ফল?

ভদ্রলোক রাগ করিলেন। বলিলেন, কেন, এ-সব মিথ্যে নাকি? একটি অক্ষরও মিথ্যে নয় জানবেন।

না না, মিথ্যে ত বলিনি, তবু—

তবু আবার কি? আমাদের স্বামীজী কখনো মিথ্যে উচ্চারণ করেন না। তাঁর মত জ্ঞানী কেউ আছে নাকি?

প্রশ্ন করিলাম, স্বামীজী কে?

ভদ্রলোকের সঙ্গীটি ইহার উত্তর দিলেন। কহিলেন, স্বামী বজ্রানন্দ। বয়সে কম হলে কি হয়, অগাধ পণ্ডিত, অগাধ—

তাঁকে আপনারা চেনেন নাকি?

চিনিনে? বেশ! তিনি আমাদের আপনার লোক বললেই যে হয়! এঁর বাড়িতেই যে তাঁর প্রধান আড্ডা! এই বলিয়া তিনি সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া কহিলেন, আড্ডা ব'লো না নরেন,—বল আশ্রম। মশাই, আমি গরীব, যা পারি তাঁর সেবা করি। কিন্তু এ যেন বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ ত নয়, মানুষের আকৃতিতে দেবতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্প্রতি কতদিন আছেন আপনাদের গ্রামে?

নরেন কহিলেন, প্রায় মাস-দুই হবে। এ অঞ্চলে না আছে একটা ডাক্তার-বদ্যি, না আছে একটা ইস্কুল। এর জন্যেই তাঁর যত পরিশ্রম। আবার নিজেও একজন মস্ত ডাক্তার।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইল। ইনিই সেই আনন্দ। সাঁইথিয়া স্টেশনে আহারাদি করাইয়া রাজলক্ষ্মী যাঁহাকে পরম সমাদরে গঙ্গামাটিতে আনিয়াছিল। সেই বিদায়ের ক্ষণটি মনে পড়িল। রাজলক্ষ্মীর সে কি কান্না! পরিচয় ত মাত্র দু'দিনের, কিন্তু কতবড় স্নেহের বস্তুকেই যেন চোখের আড়ালে কোন্ ভয়ানক বিপদের মুখে পাঠাইয়া দিতেছে এমনি তাহার ব্যথা। ফিরিয়া আসিবার সে কি ব্যাকুল অনুনয়! কিন্তু আনন্দ সন্ন্যাসী। তাহার মমতাও নাই, মোহও নাই। নারীহৃদয়ের বেদনার রহস্য তাহার কাছে মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। তাই এতদিন এত কাছে থাকিয়াও অপ্রয়োজনে দেখা দিবার প্রয়োজন সে পলকের জন্যও অনুভব করে নাই, এবং ভবিষ্যতেও হয়ত কখনো এই প্রয়োজনের হেতু আসিবে না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ কথা শুনিলে যে কতবড় আঘাত পাইবে, সে শুধু আমিই জানি।

নিজের কথা মনে পড়িল। আমারও বিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন হইয়া আসিতেছে—যাইতেই হইবে তাহা প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করিতেছি—আমার প্রয়োজন রাজলক্ষ্মীর সমাপ্ত

হইয়া আসিতেছে, কেবল ইহাই ভাবিয়া পাই না, সেদিনের দিনান্তটা রাজলক্ষ্মীর কোথা দিয়া কেমন করিয়া অবসান হইবে।

গ্রামে পৌঁছিলাম। নাম মামুদপুর। বৃদ্ধ যাদব চক্রবর্তী তাহারই উল্লেখ করিয়া সগর্বে কহিলেন, নাম শুনে চমকাবেন না মশাই, আমাদের চতুঃসীমানার মধ্যে মুসলমানের ছায়াটুকু পর্যন্ত মাড়াতে হয় না। যেদিকে তাকান ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর সৎজাত। অনাচরণীয় জাতের বসতি পর্যন্ত নেই। কি বল নরেন, আছে?

নরেন সানন্দে সায় দিয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিল, একটিও না, একটিও না। তেমন গাঁয়ে আমরা বাস করিনে।

হইতে পারে সত্য, কিন্তু এত খুশি হইবারই বা কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

চক্রবর্তী-গৃহে বজ্রানন্দের সাক্ষাৎ মিলিল। হাঁ তিনিই বটে। আমাকে দেখিয়া তাঁর যেমন বিস্ময়, তেমনি আনন্দ।

দাদা যে! হঠাৎ এখানে? এই বলিয়া আনন্দ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। এই নরদেহধারী দেবতাকে সসম্মানে অভিবাদন করিতে দেখিয়া চক্রবর্তী বিগলিত হইয়া গেলেন। আশেপাশে আরও অনেকগুলি ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি যেই হই, সামান্য ব্যক্তি যে নয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় রহিল না।

আনন্দ কহিলেন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে দাদা?

উত্তর দিলেন চক্রবর্তী। আমার যে দিন-দুই আহার-নিদ্রা ছিল না, এবং বহু পুণ্যফলেই শুধু বাঁচিয়া আসিয়াছি ইহাই ব্যক্ত করিয়া কুলিদের মধ্যে মড়কের বিবরণ এমনি সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন যে, আমার পর্যন্ত তাক লাগিয়া গেল।

আনন্দ বিশেষ কোন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া, অপরের কান বাঁচাইয়া কহিলেন, এতটা দু'দিনের উপবাসে হয় না দাদা, একটু দীর্ঘকালের দরকার। কি হয়েছিল? জ্বর?

বলিলাম, আশ্চর্য নয়। ম্যালেরিয়া ত আছেই।

চক্রবর্তী আতিথ্যের ত্রুটি করিলেন না, খাওয়াটা আজ ভালরকমই হইল।

আহারান্তে প্রস্থানের আয়োজন করিতে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি হঠাৎ কুলিদের মধ্যে জুটেছিলেন কি করে?

বলিলাম, দৈবের চক্রান্তে।

আনন্দ সহাস্যে কহিলেন, চক্রান্তই বটে। রাগের মাথায় বাড়িতে বোধ হয় খবরও দেননি?

বলিলাম, না, কিন্তু সে রাগ করে নয়। দেওয়া বাহুল্য বলেই দিইনি। তা ছাড়া লোকেই বা পেতাম কোথায়।

আনন্দ বলিলেন, সে একটা কথা। কিন্তু আপনার ভালমন্দ দিদির কাছে বাহুল্য হয়ে উঠলো কবে থেকে? তিনি হয়ত ভয়ে ভাবনায় আধমরা হয়ে গেছেন।

কথা বাড়াইয়া লাভ নাই—এ প্রশ্নের আর জবাব দিলাম না। আনন্দ স্থির করিলেন জেরায় আমাকে একেবারে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। তাই স্নিগ্ধ মৃদুহাস্যে ক্ষণকাল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়া কহিলেন, আপনার রথ প্রস্তুত, বোধ করি সন্ধ্যার পূর্বেই গিয়ে বাড়ি পৌঁছিতে পারবেন। আসুন, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি।

বলিলাম, কিন্তু বাড়ি যাবার পূর্বে কুলিদের একটু খবর নিয়ে যেতে হবে।

আনন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তার মানে রাগ এখনো পড়েনি। কিন্তু আমি বলি, দৈবের ষড়যন্ত্রে দুর্ভোগ যা কপালে ছিল তা ফলেচে। আপনি ডাক্তারও নয়, সাধুবাবাও নয়, গৃহী লোক। এখন খবর নেবার যদি কিছু থাকে ত সে ভার আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। কিন্তু গিয়ে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর আনন্দ ভাল আছে।

দ্বারে গরুর গাড়ি তৈরি ছিল। গৃহস্বামী চক্রবর্তী আসিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ ন, এদিকে আর যদি কখনো আসা হয় এ বাড়িতে যেন পদধূলি দিয়া যান। তাঁহার আতিথ্যের জন্য সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু দুর্লভ পদধূলির আশা দিতে পারিলাম না। বাঙলাদেশ আমাকে অচিরে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কথা মনের মধ্যে

অনুভব করিতেছিলাম, সুতরাং কোনদিন কোন কারণেই এ প্রদেশে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা আমার পক্ষে সুদূরপরাহত।

গাড়িতে উঠিয়া বসিলে আনন্দ ছইয়ের মধ্যে মাথা গলাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, দাদা, এদিকের জলবাতাস আপনার সইছে না। আমার হয়ে দিদিকে বলবেন, পশ্চিম-মুলুকের মানুষ আপনি, আপনাকে যেন তিনি সে দেশেই নিয়ে যান।

বলিলাম, এ দেশে কি মানুষ বাঁচে না আনন্দ?

প্রত্যুত্তরে আনন্দ লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিলেন না। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করে কি হবে দাদা, শুধু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধটা তাঁকে জানাবেন। বলবেন, আনন্দ-সন্ন্যাসীর চোখ নিয়ে না দেখলে এর সত্যতা বোঝা যাবে না।

মৌন হইয়া রহিলাম। কারণ রাজলক্ষ্মীকে এ অনুরোধ জানানো যে আমার পক্ষে কত কঠিন, আনন্দ তাহার কি জানে?

গাড়ি ছাড়িলে তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কৈ, আমাকে ত একবারও যাবার নিমন্ত্রণ করলেন না দাদা?

মুখে বলিলাম, তোমার কত কাজ, তোমাকে নিমন্ত্রণ করা কি সোজা ভাই! কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা ছিল ইতিমধ্যে পাছে কোনদিন তিনি নিজেই গিয়া উপস্থিত হন। এই তীক্ষ্ণধী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি হইতে তখন কিছুই আর আড়ালে রাখিবার জো থাকিবে না। একদিন তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, মনে মনে হাসিয়া বলিতাম, আনন্দ, এ জীবনের অনেক কিছুই বিসর্জন দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব না, কিন্তু আমার লোকসানের সেই সহজ হিসাবটাই শুধু দেখিতে পাইলে; কিন্তু তোমার দেখার বাহিরে যে আমার সঞ্চয়ের অঙ্কটা একেবারে সংখ্যাতীত হইয়া রহিল! মৃত্যু-পারের সে পাথেয় যদি আমার জমা থাকে এদিকের কোন ক্ষতিকেই আমি গণনা করিব না। কিন্তু, আজ? বলিবার কথা কি ছিল? তাই নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া চক্ষের পলকে মনে হইল ঐশ্বর্যের সেই অপরিমেয় গৌরব যদি সত্যই আজ মিথ্যা মরীচিকায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে ত এই গলগ্রহ ভগ্নস্বাস্থ্য অবাঞ্ছিত গৃহস্বামীর ভাগ্যে অতিথি আহ্বান করিবার বিড়ম্বনা যেন না আর ঘটে।

আমাকে নীরব দেখিয়া আনন্দ তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, আচ্ছা, নূতন করে না-ই যেতে বললেন, আমার সাবেক নিমন্ত্রণ পুঁজি আছে, আমি সেই দাবিতেই হাজির হতে পারব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কাজটা কি নাগাদ হতে পারবে?

আনন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই দাদা, আপনাদের রাগ পড়বার ভিতরে গিয়ে উত্যক্ত করব না- তার পরেই যাব।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রাগ করিয়া যে আসি নাই তাহা বলিতেও ইচ্ছা হইল না।

পথ কম নহে, গাড়োয়ান ব্যস্ত হইতেছিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তিনি আর-একবার নমস্কার করিয়া মুখ সরাইয়া লইলেন।

এ অঞ্চলে যানবাহনের প্রচলন নাই, সে উদ্দেশ্যে পথ তৈরি করিয়াও কেহ রাখে নাই; গো-শকট মাঠ ভাঙ্গিয়া উঁচুনীচু খানাখন্দ অতিক্রম করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে লাগিল। ভিতরে অর্ধশায়িতভাবে পড়িয়া আনন্দ সন্ন্যাসীর কথার সুরটাই আমার কানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাগ করিয়া আসি নাই, ও বস্তুটা লাভেরও নয়—লোভেরও নয়, কিন্তু কেবলি মনে হইতে লাগিল, এও যদি সত্য হইত। কিন্তু সত্য নয়, সত্য হইবার পথ নাই। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, রাগ করিব কাহার উপরে? কিসের জন্য? কি তাহার অপরাধ? ঝরনার জলধারার অধিকার লইয়াই বিবাদ করা চলে, কিন্তু উৎসমুখে জলই যদি শেষ হইয়া থাকে ত শুষ্ক খাদের বিরুদ্ধে মাথা খুঁড়িয়া মরিব কোন্ ছলনায়?

এমনি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়াছিল হুঁশ করি নাই। হঠাৎ খালের মধ্যে গাড়ি গড়াইয়া পড়ায় ঝাঁকানি খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। সুমুখের চটের পর্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা হয়-হয়। গাড়ির চালকটি ছেলেমানুষ, বোধ করি বছর পনরর বেশি হইবে না। বলিলাম, ওরে, এত জায়গা থাকতে খানায় নামালি কেন?

ছেলেটি তাহার রাঢ়দেশের ভাষায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নামবো কিসের তরে? বলদ আপনি নেমে গেল।

নেমে গেল কি রে? তুই কি গরু সামলাতে পারিস নে?

না। বলদ নতুন যে।

খুব ভাল। কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

তার কি জানি! গঙ্গামাটি কখনো আসচি নাকি?

বলিলাম, কখনো যদি আসনি বাবা, তবে আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন হলে কেন? কাউকে জিজ্ঞেস কর্ না রে, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

উত্তরে সে কহিল, এদিকে লোক আছে নাকি? নেই।

ছেলেটার আর যাই দোষ থাক, জবাবগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি প্রাঞ্জল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই গঙ্গামাটির পথ চিনিস ত?

তেমনি সুস্পষ্ট উত্তর। কহিল, না।

তবে এলি কেন রে?

মামা বললে, বাবুকে নিয়ে যা। এই সোজা দক্ষিণে গিয়ে পূবে বাঁক ধরলেই গঙ্গামাটি। যাবি আর আসবি।

সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, আর বেশি বিলম্বও নাই। এতক্ষণ ত চোখ বুজিয়া নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম, ছেলেটার কথায় এবার ভয় পাইয়া বলিলাম, এই সোজা দক্ষিণের বদলে উত্তরে গিয়ে পশ্চিমে বাঁক ধরিস নি ত রে?

ছেলেটা কহিল, তার কি জানি!

বলিলাম, জানিস নে ত চল দু'জনে অন্ধকারে যমের বাড়ি যাই। হতভাগা, পথ চিনিস নে ত এলি কেন? তোর বাপ আছে?

না।

মা আছে?

না, মরে গেছে।

আপদ গেছে। চল্, তা হলে আজ রাত্রে তাদের কাছেই যাওয়া যাক! তোর মামার শুধু বুদ্ধি-বিবেচনা নয়, দয়ামায়া আছে।

আর খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পরে ছেলেটা কাঁদিতে লাগিল, জানাইল যে আর সে যাইতে পারিবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, থাকবি কোথায়?

সে জবাব দিল যে, সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবেলা সন্ধ্যাবেলায় আমার উপায়?

পূর্বে বলিয়াছি ছেলেটি স্পষ্টবাদী। কহিল, তুমি বাবু নেবে যাও। মামা বলে দেছে ভাড়া পাঁচ সিকে। কম দিলে আমাকে মারবে।

কহিলাম, আমার জন্যে তুমি মার খাবে সে কেমন কথা! একবার ভাবিলাম, এই গাড়িতেই যথাস্থানে ফিরিয়া যাই। কিন্তু কেমন যেন প্রবৃত্তি হইল না। রাত্রি আসন্ন, স্থান অপরিচিত, লোকালয় যে কোথায় এবং কতদূরে বুঝিবার জো নাই; কেবল সুমুখে একটা বড় আমকাঁঠালের বাগান দেখিয়া অনুমান করিলাম গ্রাম বোধ হয় খুব বেশি দূরে হইবে না। আশ্রয় হয়ত একটা মিলিবে। আর যদি নাই-ই মিলে তাহাতেই-বা কি? নাহয়, এমনি করিয়াই এবার যাত্রা শুরু হইবে।

নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। দেখিলাম, ছেলেটির শুধু কথাই নয়, কাজের ধারাও চমৎকার স্পষ্ট। নিমেষে গাড়ির মুখ ফিরাইয়া লইল, বৃষযুগল গৃহ প্রত্যাগমনের ইঙ্গিত-মাত্র চোখের পলকে চোখের অদৃশ্য হইয়া গেল।

তের

সন্ধ্যা শেষ হইল বলিয়া, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে যেমন করিয়া হউক আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

এ কাজ আমার পক্ষে নূতনও নহে, কঠিন বলিয়াও কোনদিন ভয় হয় নাই। কিন্তু আজ সেই আমবাগানের পাশ দিয়া পায়ে-চলা পথের রেখা ধরিয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন কেমন যেন উদ্বিগ্ন লজ্জায় মনের ভিতরটা ভরিয়া আসিতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন যে পথে চলিয়াছি সে যে বাঙ্গলার রাঢ় দেশ। ইহার সম্বন্ধে ত কোন অভিজ্ঞতা নাই! কিন্তু এ কথা স্মরণ হইল না যে, সে-সকল দেশের সম্বন্ধেও একদিন এমনি অনভিজ্ঞই ছিলাম, জ্ঞান যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা এমনি করিয়াই আপনাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, অপরে করিয়া দেয় নাই।

আসল কথা, কিসের জন্য যে সেদিন দ্বার আমার সর্বত্রই মুক্ত ছিল এবং আজ সঙ্কোচ ও দ্বিধায় তাহা অবরুদ্ধপ্রায়, সেই কথাটাই ভাবিয়া দেখিলাম না। সেদিনের সে-যাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, কিন্তু আজ যাহা করিতেছি সে শুধু সেদিনের নকল মাত্র। সেদিন বাহিরের অপরিচিতই ছিল আমার পরমাত্মীয়, তাদের পরে নিজের ভারার্পণ করিতে তখন বাধে নাই, কিন্তু সেই ভার আজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি একান্তভাবে ন্যস্ত হইয়া সমস্ত ভারকেন্দ্রটাই অন্যত্র অপসারিত হইয়া গেছে। তাই আজ অজানা-অচেনার মধ্যে চলিবার পা-দুটা আমার প্রতিপদেই ভারি হইয়া আসিতেছে। সেদিনের সেই-সব সুখ-দুঃখের ধারণায় আজ কতই না প্রভেদ! তথাপি চলিতে লাগিলাম। এই বনের মধ্যে রাত্রিযাপনের সাহসও নাই, শক্তিও গেছে—আজিকার মত কিছু একটা পাইতেই যে হইবে।

ভাগ্য ভাল, খুব বেশি দূরে হাঁটিতে হইল না। পত্রঘন কি একটা গাছের ফাঁক দিয়া অট্টালিকার মত দেখা গেল। সেই পথটুকু ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অট্টালিকাই বটে, কিন্তু মনে হইল জনহীন। সুমুখে লোহার গেট, কিন্তু ভাঙ্গা। শিকগুলার অধিকাংশই লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। খোলা বারান্দা, বড় বড় দুটো ঘর, একটা বন্ধ এবং যেটা খোলা তাহার দ্বারে আসিবামাত্র একজন কঙ্কালসার মানুষ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, ঘরে চার কোণে চারিটা লোহার খাট—একদিন গদি পাতা ছিল, কিন্তু কালক্রমে চটগুলা লুপ্ত হইয়াছে, আছে শুধু ছোবড়ার কিছু কিছু তখনও অবশিষ্ট, একটা তেপাই, গোটা-কয়েক টিন ও এনামেলের পাত্র, তাহাদের শ্রী ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনাতীত। অনুমান যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই বটে। বাড়িটি হাসপাতাল। এই লোকটি বিদেশী, চাকরি করিতে আসিয়া পীড়িত হইয়া দিন-পনর হইল ইন্‌ডোর পেশেন্ট হইয়া আছে। লোকটির সহিত প্রথম আলাপ এইরূপ ঘটিল—

বাবুমশায়, গোটা-চারেক পয়সা দেবেন?

কেন বল ত?

ক্ষিদেয় মরি বাবু, মুড়িটুড়ি দুটো কিনে খাব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি রোগী-মানুষ, যা তা খাওয়া তোমার বারণ নয়?

আজ্ঞে, না।

এখানে তোমাকে খেতে দেয় না?

লোকটি জানাইল যে, সকালে একবাটি সাগু দিয়াছিল তাহা সে কোন্‌কালে খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন হইতে সে গেটের কাছে বসিয়া থাকে, ভিক্ষা পায় ত আর একবেলা খাওয়া চলে, না হয় ত উপবাসে কাটে। ডাক্তার একজন আছেন, বোধ হয় যৎসামান্য হাত-খরচা মাত্র বন্দোবস্ত আছে, সকালবেলায় একবার করিয়া তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। আর একটি লোক নিযুক্ত আছে, তাহাকে কম্পাউন্ডারি হইতে শুরু করিয়া লণ্ঠনে তেল দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই করিতে হয়। পূর্বে একজন চাকর ছিল বটে, কিন্তু মাস-ছয়েক হইল মাহিনা না পাওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া গেছে, এখনও নূতন কেহ ভর্তি হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝাঁটপাট কে দেয়?

লোকটি বলিল, আজকাল আমিই দি। আমি চলে গেলে আবার যে নতুন রোগী আসবে সেই দেবে।

কহিলাম, বেশ ব্যবস্থা। হাসপাতালটি কার জান?

লোকটি আমাকে ওদিকের বারান্দায় লইয়া গেল: কড়ি হইতে একটি টিনের লণ্ঠন

ঝুলিতেছে। কম্পাউন্ডারবাবু বেলাবেলি সেটি জ্বালিয়া দিয়া কাজ সারিয়া ঘরে চলিয়া গেছেন। দেয়ালের গায়ে আঁটা মস্ত একটি মর্মর প্রস্তর-ফলক—সোনার জল দিয়া ইংরাজী অক্ষরে আগাগোড়া খোদাই-করা সন-তারিখসংবলিত শিলালিপি। জেলার যে সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট দয়া করিয়া ইহার উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম-ধাম সর্বাগ্রে, নীচে প্রশস্তি-পাঠ। কে একজন রায়বাহাদুর তাঁহার রত্নগর্ভা মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে জননী-জন্মভূমিতে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর শুধু মাতা-পুত্রই নয়, ঊর্ধ্বতন তিন-চারি পুরুষের বিবরণ। বোধ করি ছোটখাটো কুলকারিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকটি যে রাজসরকারে রায়বাহাদুরির যোগ্য তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ টাকা নষ্ট কবার দিক দিয়া ত্রুটি ছিল না। ইট ও কাঠ এবং বিলাতের আমদানি লোহার কড়ি-বরগার বিল মিটাইয়া অবশিষ্ট যদি বা কিছু থাকিয়া থাকে সাহেব শিল্পীর হাতে বংশগৌরব লিখাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। ডাক্তার ও রোগীর ঔষধ-পথ্যাদির ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবার হয়ত টাকাও ছিল না, ফুরসতও ছিল না।

প্রশ্ন করিলাম, রায়বাহাদুরের বাড়ি কোথায়?

সে কহিল, বেশি দূরে নয় কাছেই।

এখন গেলে দেখা হবে?

আজ্ঞে না, বাড়িতে তালাবন্ধ, তাঁরা সব কলকাতায় থাকেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে আসেন জান?

লোকটি বিদেশী, সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না, তবে কহিল যে, বছর-তিনেক পূর্বে একবার আসিয়াছিলেন এ কথা সে ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছে। সর্বত্র একই দশা, অতএব দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু ছিল না।

এদিকে অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেছিল, সুতরাং রায়বাহাদুরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করার চেয়ে জরুরি কাজ বাকি ছিল। লোকটিকে কিছু পয়সা দিয়া জানিয়া লইলাম যে, নিকটেই একঘর চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের বাটী। তাঁহারা অতিশয় দয়ালু, এবং রাত্রিটার মত আশ্রয় মিলিবেই। সে নিজেই রাজী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কহিল, তাহাকে ত মুদীর দোকানে যাইতেই হইবে, একটুখানি ঘুরপথ, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না।

চলিতে চলিতে তাহার কথায়বার্তায় বুঝিলাম, এই দয়ালু ব্রাহ্মণ পরিবার হইতে সে পথ্যাপথ্য অনেক রাত্রিই গোপনে সংগ্রহ করিয়া খাইয়াছে।

মিনিট-দশেক হাঁটিয়া চক্রবর্তীর বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার পথ-প্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই ঘরে আছেন?

কোন সাড়া আসিল না। ভাবিয়াছিলাম কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বাটীতে আতিথ্য লইতে চলিয়াছি, কিন্তু ঘরদ্বারের শ্রী দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। ওদিকে সাড়া নাই, এদিকে আমার সঙ্গীর অধ্যবসায়ও অপরাজেয়। তাহা না হইলে এই গ্রাম ও এই হাসপাতালে বহুদিন পূর্বেই তাহার রুগ্ন-আত্মা স্বর্গীয় হইয়া তবে ছাড়িত। সে ডাকের উপর ডাক দিতেই লাগিল।

হঠাৎ জবাব আসিল, যা যা, আজ যা। যা বলচি।

লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, প্রত্যুত্তরে কহিল, কে এসেচে বার হয়ে দেখুন না!

কিন্তু বিচলিত হইয়া উঠিলাম আমি। যেন চক্রবর্তীর পরমপূজ্য গুরুদেব গৃহ পবিত্র করিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছি।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর মুহূর্তে মোলায়েম হইয়া উঠিল—কে রে ভীম? বলিতে বলিতে গৃহস্বামী দ্বারপথে দেখা দিলেন। পরনের বস্ত্রখানি মলিন এবং অতিশয় ক্ষুদ্র, অন্ধকারে তাঁহার বয়স অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু খুব বেশি বলিয়াও মনে হইল না। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে ভীম?

বুঝিলাম, আমার সঙ্গীর নাম ভীম। ভীম বলিল, ভদ্দরলোক, বামুন। পথ ভুলে হাসপাতালে গিয়ে হাজির! আমি বললাম, ভয় কি, চলুন না ঠাকুরমশায়ের বাড়িতে রেখে আসি, গুরু আদরে থাকবেন।

বস্তুতঃ ভীম অতিশয়োক্তি করে নাই, চক্রবর্তী আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

স্বহস্তে মাদুর পাতিয়া বসিতে দিলেন এবং তামাক ইচ্ছা করি কি না জানিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া আনিলেন।

বলিলেন, চাকরগুলো সব জ্বরে পড়ে রয়েচে—করি কি!

শুনিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, এক চক্রবর্তীর গৃহ ছাড়িয়া আর এক চক্রবর্তীর গৃহে আসিয়া পড়িলাম। কে জানে আতিথ্যটা এখানে কিরূপ দাঁড়াইবে। তথাপি হুঁকাটা হাতে পাইয়া টানিবার উপক্রম করিয়াছি, সহসা অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, হ্যাঁ গা, কে মানুষটি এলো?

অনুমান করিলাম, ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্রবর্তীরই শুধু গলা কাঁপিল না, আমারও যেন হৃৎকম্প হইল।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, মস্ত লোক গো মস্ত লোক। অতিথি, ব্রাহ্মণ—নারায়ণ! পথ ভুলে এসে পড়েচেন—শুধু রাত্রিটা—ভোর না হতেই আবার সকালেই চলে যাবেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, হাঁ সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল—খেতে দেবে কি উনুনের পাঁশ?

আমার হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। চক্রবর্তী কহিলেন, আহা, কি যে বল তুমি! আমার ঘরে আবার চাল-ডালের অভাব। চল চল, ভেতরে চল, সব ঠিক করে দিচ্চি।

চক্রবর্তী গৃহিণী ভিতরে যাইবার জন্য বাহিরে আসেন নাই। বলিলেন, কি ঠিক করে দেবে শুনি? আছে ত খালি মুঠোখানেক চাল, ছেলেমেয়ে-দুটোকে রাত্তিরের মত সেদ্ধ করে দেবো। বাছাদের উপুসী রেখে ওকে দেব গিলতে? মনেও ক'রো না।

মা ধরিত্রি, দ্বিধা হও! না না। করিয়া কি একটা বলিতে গেলাম, কিন্তু চক্রবর্তীর বিপুল ক্রোধে তাহা ভাসিয়া গেল। তিনি তুমি ছাড়িয়া তখন তুই ধরিলেন, এবং অতিথি-সৎকার লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে যে আলাপ শুরু হইল, তাহার ভাষাও যেমন গভীরতাও তেমনি। আমি টাকা লইয়া বাহির হই নাই, পকেটে সামান্য যাহা-কিছু ছিল তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছিল। শুধু গলায় সোনার বোতাম ছিল, কিন্তু কেবা কাহার কথা শোনে! ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে চক্রবর্তী সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, অতিথি নারায়ণ। বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।

গৃহিণী কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট করিয়া কহিলেন, তা হলে ত বাঁচি। ভিক্ষে-সিক্ষে করে বাছাদের খাওয়াই।

এদিকে আমার ত প্রায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল; হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, চক্রবর্তীমশাই, সে নাহয় একদিন ভেবেচিন্তে ধীরে-সুস্থে করবেন—করাই ভাল—কিন্তু সম্প্রতি আমাকে হয় ছাড়ুন, নাহয় একগাছা দড়ি দিন, ঝুলে পড়ে আপনার আতিথ্যের দায় থেকে মুক্ত হই।

চক্রবর্তী অন্তঃপুর লক্ষ্য করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন, আক্কেল হ'ল? বলি শিখলি কিছু?

পালটা জবাব আসিল। হ্যাঁ। মুহূর্ত-কয়েক পরে ভিতর হইতে শুধু একখানি হাত বাহির হইয়া, দুম করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বসাইয়া দিয়া আদেশ হইল, যাও, শ্রীমন্তর দোকানে এটা রেখে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে এসো গে। দেখো যেন মিন্‌সে হাতে পেয়ে সব কেটে না নেয়।

চক্রবর্তী খুশী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আরে, না না, এ কি ছেলের হাতের নাড়ু?

চট করিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া বার-কয়েক টান দিয়া কহিলেন, আগুনটা নিবে গেছে। গিন্নী, দাও দিকি কলকেটা পালটে, একবার খেয়েই যাই। যাব আর আসব। এই বলিয়া তিনি কলিকাটা হাতে লইয়া অন্দরের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

ব্যস, স্বামী-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। গৃহিণী তামাক সাজিয়া দিলেন, কর্তা প্রাণ ভরিয়া ধূমপান করিলেন। প্রসন্নচিত্তে হুঁকাটি আমার হাতে দিয়া ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চাল আসিল, ডাল আসিল, তেল আসিল, নুন আসিল, যথাসময়ে রন্ধনশালায় আমার ডাক পড়িল। আহারে বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না, তথাপি নিঃশব্দে গেলাম। কারণ, আপত্তি

করা শুধু নিষ্ফল নয়, না বলিতে আমার আতঙ্ক হইল। এ জীবনে বহুবার বহুস্থানেই আমাকে অযাচিত আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সর্বত্রই সমাদৃত হইয়াছি বলিলে অসত্য বলা হইবে, কিন্তু এমন সংবর্ধনাও কখনো ভাগ্যে জুটে নাই; কিন্তু শিক্ষার তখনও বাকি ছিল। গিয়া দেখিলাম, উনুন জ্বলিতেছে, এবং অন্নের পরিবর্তে কলাপাতায় চাল ডাল আলু ও একটা পিতলের হাঁড়ি।

চক্রবর্তী উৎসাহভরে কহিলেন, দিন হাঁড়িটা চড়িয়ে, চটপট হয়ে যাবে। খাঁড়ি-মুসুরের খিচুড়ি, আলুভাতে, তোফা লাগবে খেতে। ঘি আছে, গরম গরম—

চক্রবর্তীর রসনা সরস হইয়া উঠিল কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে আমার কোন কথায় বা কাজে আবার একটা প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার নির্দেশমত হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম। চক্রবর্তীগৃহিণী আড়ালে ছিলেন, স্ত্রীলোকের চক্ষে আমার অপটু হস্ত গোপন রহিল না, এবার তিনি আমাকেই উদ্দেশ করিয়া কথা কহিলেন। তাঁহার আর যা দোষই থাক, সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জা বলিয়া যে শব্দগুলা অভিধানে আছে, তাহাদের অতিবাহুল্য দোষ যে ইঁহার ছিল না এ কথা বোধ করি অতিবড় নিন্দুকেও স্বীকার না করিয়া পারিবে না। তিনি কহিলেন, তুমি ত বাছা রান্নার কিছুই জান না।

আমি তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া বলিলাম, আজ্ঞে না।

তিনি বলিলেন, কর্তা বলছিলেন বিদেশী লোক, কে বা জানবে, কে বা শুনবে। আমি বললাম, তা হতে পারে না। একটা রাত্তিরের জন্যে একমুঠো ভাত দিয়ে আমি মানুষের জাত মারতে পারব না। আমরা বাবা অগ্রদানী বামুন।

আমার যে আপত্তি নাই, এবং ইহা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ ইতিপূর্বে করিয়াছি—এ কথা বলিতেও কিন্তু আমার সাহস হইল না পাছে স্বীকার করিলেও কোন বিভ্রাট ঘটে। মনের মধ্যে শুধু একটিমাত্র চিন্তা ছিল কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে এবং এই বাড়ির নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। সুতরাং, নির্দেশমত খিচুড়িও রাঁধিলাম, এবং পিণ্ড পাকাইয়া গরম ঘি দিয়া তোফা গিলিবার চেষ্টাও করিলাম। এ অসাধ্য যে কি করিয়া সম্পন্ন করিলাম আজও বিদিত নই, কেবলই মনে হইতে লাগিল চাল-ডালের তোফা পিণ্ড পেটের মধ্যে গিয়া পাথরের পিণ্ড পাকাইতেছে।

অধ্যবসায়ে অনেক-কিছুই হয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। হাতমুখ ধুইবারও অবসর মিলিল না, সমস্ত বাহির হইয়া গেল। ভয়ে শীর্ণ হইয়া উঠিলাম, কারণ এগুলো যে আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শক্তি আর ছিল না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল, কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম, কোথাও আমাকে একটু শোবার জায়গা দিন, মিনিট-পাঁচেক সামলে নিয়েই আমি সমস্ত পরিষ্কার করে দেব। ভাবিয়াছিলাম প্রত্যুত্তরে কি যে শুনিব জানি না, কিন্তু আশ্চর্য হইয়া চক্রবর্তীগৃহিণীর ভয়ানক কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ কোমল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তিনি অন্ধকার হইতে আমার সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন, তুমি কেন বাবা পরিষ্কার করতে যাবে, আমিই সব সাফ করে ফেলচি। বাইরের বিছানাটা এখনও করে উঠতে পারিনি, ততক্ষণ এসো তুমি আমার ঘরে গিয়ে শোবে।

না বলিবার সামর্থ্যও নাই, নীরবে অনুসরণ করিয়া তাহারই শতচ্ছিন্ন শয্যায় আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মাথা তুলিবারও শক্তি ছিল না, এমনি জ্বর। সহজে চোখ দিয়া আমার জল পড়ে না, কিন্তু এতবড় অপরাধের যে এখন কেমন করিয়া কি জবাবদিহি করিব এই কথা ভাবিয়া নিছক ও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কেই আমার দুই চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, বহুবার বহু নিরুদ্দেশ-যাত্রাতেই বাহির হইয়াছি, কিন্তু এতখানি বিড়ম্বনা জগদীশ্বর আর কখনও অদৃষ্টে লিখেন নাই। আর একবার প্রাণ-পণে উঠিয়া বসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু কোনমতেই মাথা সোজা করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আজ চক্রবর্তীগৃহিণীর সহিত মুখোমুখি আলাপ হইল। বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখের

মধ্যে দিয়াই নারীর সত্যকার গভীর পরিচয়টুকু লাভ করা যায়। তাঁহাকে চিনিয়া লইবার এমন কষ্টিপাথরও আর নাই, তাঁহার হৃদয় জয় করিবার এতবড় অস্ত্রও পুরুষের হাতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, ঘুম ভেঙ্গেচে বাবা?

চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি—কিছু বেশি হইতেও পারে। রঙটি কালো, কিন্তু চোখমুখ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থঘরের মেয়েদের মতই। রুক্ষতার কোথাও কিছু নাই, আছে শুধু সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া গভীর দারিদ্র্য ও অনশনের চিহ্ন আঁকা—চোখ মেলিয়া চাহিলেই তাহা ধরা পড়ে। কহিলেন, কাল আঁধারে দেখতে পাইনি বাবা, কিন্তু আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে তার তোমার বয়সই হ'ত।

ইহার আর উত্তর কি। তিনি হঠাৎ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, জ্বরটা এখনও খুব রয়েচে।

আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিলাম, কেউ একটুখানি সাহায্য করলে বোধ হয় হাসপাতালে যেতে পারব—সে ত আর বেশি দূরে নয়।

তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার কথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভরিয়া গেল। বলিলেন, দুঃখের জ্বালায় কাল কি-একটা বলেচি বলেই বাবা, রাগ করে ওই যমপুরীতে চলে যাবে? আর যাবে বললেই আমি যেতে দেব? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, আতুরের নিয়ম নেই বাবা। এই যে লোকে হাসপাতালে গিয়ে থাকে সেখানে কাদের ছোঁওয়া খেতে হয় বল ত? কিন্তু তাতে কি জাত যায়? আমি সাগুবার্লি তৈরি করে দিলে কি তুমি খাবে না?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে, বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই এবং শুধু পীড়িত বলিয়া নয়, অত্যন্ত নীরোগ শরীরেও আমার ইহাতে বাধা হয় না।

অতএব রহিয়া গেলাম। বোধ হয় সর্বসমেত দিন-চারেক ছিলাম। তথাপি সেই চারি-দিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। জ্বর একদিনেই গেল, কিন্তু বাকী দিন-কয়টা দুর্বল বলিয়া তাঁহারা নড়িতে দিলেন না। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়াই এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দিন কাটিতেছে এবং দুর্গতিকে সহস্রগুণে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে বিনাদোষে সমাজের অর্থহীন পীড়ন। চক্রবর্তীগৃহিণী তাঁহার অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেও এতটুকুও অবসর পাইলে আমার কাছে আসিয়া বসিতেন। মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেন, ঘটা করিয়া রোগের পথ্য যোগাইতে পারিতেন না, এই ত্রুটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবার কি ঐকান্তিক চেষ্টাই না তাঁহার দেখিতে পাইতাম। পূর্বে অবস্থা সচ্ছল ছিল, জমিজমাও মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহার নির্বোধ স্বামীকে লোকে প্রতারিত করিয়াই এই দুঃখে ফেলিয়াছে। তাহারা আসিয়া ঋণ চাহিত, বলিত, দেশে বড়লোক ঢের আছে, কিন্তু এতবড় বুকের পাটা কয়জনের আছে? অতএব এই বুকের পাটা সপ্রমাণ করিতে তিনি ঋণ করিয়া ঋণ দিতেন। প্রথমে হ্যান্ডনোট কাটিয়া এবং পরে স্ত্রীকে গোপন করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিয়া। ইহার ফল অধিকাংশ স্থলেই যাহা হয় এখানেও তাহাই হইয়াছে।

এ কুকার্য যে চক্রবর্তীর অসাধ্য নয় তাহা একটা রাত্রির অভিজ্ঞতা হইতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম। বুদ্ধির দোষে বিষয়-সম্পত্তি অনেকেরই যায় এবং তাহার পরিণামও অত্যন্ত দুঃখের হয়, কিন্তু এই দুঃখ যে সমাজের অনাবশ্যক, অন্ধ নিষ্ঠুরতায় কতখানি বাড়িতে পারে তাহা চক্রবর্তীগৃহিণীর প্রতি কথায় অস্থিমজ্জায় অনুভব করিলাম। তাঁহাদের দুইটিমাত্র শোবার ঘর। একটিতে ছেলেমেয়েরা থাকে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বাহিরের লোক হইয়াও আমি অধিকার করিয়া আছি। ইহাতে আমার সংকোচের অবধি ছিল না। বলিলাম, আজ ত আমার জ্বর ছেড়েচে এবং আপনাদেরও ভারি কষ্ট হচ্ছে। যদি বাইরের ঘরে একটা বিছানা করে দেন ত আমি ভারি তৃপ্তি পাই।

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা, আকাশে মেঘ করে আছে, বৃষ্টি যদি হয় ত ও-ঘরে এমন ঠাঁই নেই যে মাথাটুকু রাখা যায়। তুমি রোগা মানুষ, এ ভরসা ত করতে পারিনে বাবা।

তাঁহাদের প্রাঙ্গণের একধারে কিছু খড় সঞ্চিত ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাই

ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সময়ে মেরামত করে নেননি কেন? জলঝড়ের ত দিন এসে পড়চে।

ইহার প্রত্যুত্তরে জানিলাম যে, তাহা সহজে হইবার নয়। পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া এ অঞ্চলের চাষীরা তাঁহাদের কাজ করে না। গ্রামান্তরে মুসলমান ঘরামী আছে, তাহারাই ঘর ছাইয়া দেয়। যে-কোন কারণে হোক, এ বৎসর তাহারা আসিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বাবা, আমাদের দুঃখের কি সীমা আছে? সে বছর আমার সাত-আট বছরের মেয়েটা হঠাৎ কলেরায় মারা গেল; পুজোর সময় আমার ভাইয়েরা গিয়েছিল কাশী বেড়াতে, তাই আর লোক পাওয়া গেল না, ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে একা এঁকেই শ্মশানে নিয়ে যেতে হ'ল। তাও কি সৎকার করা গেল? কাঠকুটো কেউ কেটে দিলে না, বাপ হয়ে গর্ত খুঁড়ে বাছাকে পুঁতে রেখে ইনি ঘরে ফিরে এলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার পুরাতন শোক একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার মোট অভিযোগ এই যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের কোন্ কালে কে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ত অপরাধ? অথচ, শ্রাদ্ধ হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য এবং কেহ-না-কেহ দান গ্রহণ না করিলে সে শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। তবে দোষটা কোথায়? আর দোষই যদি থাকে ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করান কিসের জন্য?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন কঠিন, পূর্ব-পিতামহগণের কোন্ দুষ্কৃতির শাস্তিস্বরূপ তাঁহাদের বংশধরগণ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন তাহা এতকাল পরে আবিষ্কার করাও তেমনি দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধের দান লওয়া ভাল কি মন্দ জানি না। মন্দ হইলেও এ-কথা সত্য যে, ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ তাঁহারা করেন না, অতএব নিরপরাধ। অথচ প্রতিবেশী হইয়া আর একজন প্রতিবেশীর জীবনযাত্রার পথ বিনাদোষে মানুষে এতখানি দুর্গম ও দুঃখময় করিয়া দিতে পারে, এমন হৃদয়হীন নির্দয় বর্বরতার উদাহরণ জগতে বোধ করি এক হিন্দু সমাজ ব্যতীত আর কোথাও নাই।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, এ গ্রামে লোক বেশি নেই, জ্বর আর ওলাউঠায় অর্ধেক মরে গেছে। এখন আছে শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর রাজপুত। আমাদের যে কোন উপায় নেই বাবা, নইলে ইচ্ছে হয়, কোন মুসলমানের গ্রামে গিয়ে বাস করি।

বলিলাম, কিন্তু সেখানে ত জাত যেতে পারে।

চক্রবর্তীগৃহিণী এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলেন না, কহিলেন, আমার সম্পর্কে একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনি দুমকায় চাকরি করতে গিয়ে খ্রীষ্টান হয়েচেন। তাঁর ত আর কোন কষ্টই নেই।

চুপ করিয়া রহিলাম। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্মান্তর গ্রহণে মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্লেশবোধ হয়, কিন্তু সান্ত্বনাই বা দিব কি বলিয়া? এতদিন জানিতাম অস্পৃশ্য, নীচ জাতি যাহারা আছে তাহারাই শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যে নির্যাতন ভোগ করে, কিন্তু আজ জানিলাম কেহই বাদ যায় না। অর্থহীন অবিবেচনায় পরস্পরের জীবন দুর্ভর করিয়া তোলাই যেন এ সমাজের মজ্জাগত সংস্কার। পরে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেকেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অন্যায়, ইহা গর্হিত, তথাপি নিরাকরণেরও কোন পন্থাই তাঁহারা নির্দেশ করিতে পারেন না। এই অন্যায়েরই মধ্য দিয়া তাঁহারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত চলিতে সম্মত আছেন কিন্তু প্রতিকারের প্রবৃত্তি বা সাহস কোনটাই তাঁহাদের নাই। জানিয়া বুঝিয়াও অবিচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহাদের এমন করিয়া তিরোহিত হইয়াছে, সে জাতি যে দীর্ঘকাল বাঁচিবে কি করিয়া ভাবিয়া পাওয়া শক্ত।

দিন-তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, মা, আজ আমাকে বিদায় দিন।

চক্রবর্তীগৃহিণীর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল; বলিলেন, দুঃখীর ঘরে অনেক দুঃখ পেলে বাবা, তোমাকে কটুকথাও কম বলিনি।

এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। না না, সে কিছুই না—আমি মহাসুখে ছিলাম,

আমার কৃতজ্ঞতা—ইত্যাদি মামুলি ভদ্রবাক্য উচ্চারণ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইল। বজ্রানন্দের কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, ঘর ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে। এই বাঙগলাদেশের গৃহে গৃহে মা বোন, সাধ্য কি তাঁহাদের স্নেহের আকর্ষণ এড়াইয়া যাই। কথাটা কতবড়ই না সত্য!

নিরতিশয় দারিদ্র্য ও নির্বোধ স্বামীর অবিবেচনার আতিশয্য এই গৃহস্থঘরের গৃহিণীকে প্রায় পাগল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্তেই তিনি অনুভব করিলেন আমি পীড়িত, আমি নিরুপায়· আর তাঁহার ভাবিবার কিছু রহিল না। মাতৃত্বের সীমাহীন স্নেহে আমার রোগ ও পরগৃহবাসের সমস্ত দুঃখ যেন দুই হাত দিয়া মুছিয়া লইলেন।

চক্রবর্তী চেষ্টা করিয়া একখানি গো-যান সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, গৃহিণীর ভারি ইচ্ছা ছিল আমি স্নানাহার করিয়া যাই, কিন্তু রৌদ্র বাড়িবার আশঙ্কায় পীড়াপীড়ি করিলেন না। শুধু যাত্রাকালে দেবদেবীর নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিয়া কহিলেন, বাবা, যদি কখনও এদিকে এস আর একবার দেখা দিয়ে যেয়ো।

এদিকে আসাও কখনও হয় নাই, দেখা দিতেও আর পারি নাই, শুধু বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম, রাজলক্ষ্মী কুশারীমহাশয়ের হাত দিয়া তাঁহাদের অনেকখানি ঋণের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

চৌদ্দ

গঙগামাটির বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দ্বারের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ ও মঙগলঘট বসান। উপরে আম্রপল্লবের মালা দোলানো। বাহিরে অনেকগুলি লোক বসিয়া জটলা করিয়া তামাক খাইতেছে। গরুর গাড়ির শব্দে তাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল। বোধ হয় ইহারই মধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আর একজন যিনি অকস্মাৎ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখি, তিনি স্বয়ং বজ্রানন্দ। তাঁহার উল্লসিত কলরব উদ্দাম হইয়া উঠিল, এবং কে একজন ছুটিয়া ভিতরে খবর দিতেও গেল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে, তিনি আসিয়া সকল বিবরণ জানানো পর্যন্ত চারিদিকে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টারও যেমন বিরাম নাই, বাড়িসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তারও তেমনি অবধি নাই। ব্যাপার কি? অকস্মাৎ কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন ত? গাড়োয়ান ছোঁড়াটা ত গিয়ে বললে আপনাকে গঙগামাটির পথে নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেছে।

রাজলক্ষ্মী কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কি শাস্তিই তুমি দিলে! বজ্রানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু দেখ আনন্দ, আমার মন জানতে পেরেছিল যে আজ উনি আসবেনই।

হাসিয়া বলিলাম, দোরে কলাগাছ আর ঘটস্থাপনা দেখেই আমি বুঝেচি যে, আমার আসার খবরটি তুমি পেয়েচ।

কবাটের আড়ালে রতন আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে সেজন্যে নয়। আজ বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজন হবে কিনা! বক্রেশ্বর দেখে এসে মা—

রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল, তোকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না রতন, নিজের কাজে যা।

তাহার আরক্ত মুখের প্রতি চাহিয়া বজ্রানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কি জানেন দাদা, কোন একটা কাজে লেগে না থাকলে মানসিক উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সহ্য যায় না। ভোজের আয়োজনটা কেবল এইজন্যেই। না দিদি?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিল না, রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, ভয়ানক রোগা দেখাচ্চে দাদা, ইতিমধ্যে কাণ্ডটা কি ঘটেছিল বলুন ত? বাড়ি না ঢুকে হঠাৎ গা-ঢাকা দিলেন কেন?

গা-ঢাকা দিবার হেতু সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া আনন্দ কহিল, ভবিষ্যতে এরকম করে আর পালাবেন না। কিভাবে যে ওঁর দিনগুলো কেটেচে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তাহা জানিতাম। সুতরাং চোখে না দেখিয়াও আমি বিশ্বাস করিলাম। রতন চা ও তামাক দিয়া গেল। আনন্দ কহিল, আমিও বাইরে যাই দাদা। এখন আপনার কাছে বসে থাকলে আর একজন হয়ত ইহজন্মে আমার মুখ দেখবেন না। এই বলিয়া সে হাসিয়া প্রস্থান করিল।

খানিক পরে রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও ঘরে গরম জল গামছা কাপড় সমস্ত রেখে এলাম, শুধু গা-মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে ফেল গে। জ্বরের ওপর খবরদার যেন মাথায় জল ঢেলো না বলচি।

কহিলাম, কিন্তু স্বামীজী তোমাকে ভুল বলেছে, জ্বর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না-ই থাক, কিন্তু হতে কতক্ষণ?

কহিলাম, সে খবর তোমাকে সঠিক দিতে পারব না, কিন্তু গরমে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, স্নান করা দরকার।

রাজলক্ষ্মী কহিল, দরকার নাকি? তাহ'লে একা হয়ত পেরে উঠবে না, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এই বলিয়া সে নিজেই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আড়ি ক'রে আমাকেও কষ্ট দেবে, নিজেও কষ্ট পাবে? এত অবেলায় নেয়ো না, লক্ষ্মীটি।

এই ধরনের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে স্নেহের মাধুর্যরসে এমনিই ভরিয়া দিতে পারিত যে, সে জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সংকল্পই মাথা তুলিতে পারিত না। এ ব্যাপারটা তুচ্ছ, স্নান না করিলেও আমার চলিয়া যাইবে, কিন্তু চলিয়া যায় না এমন ব্যাপারও বহুবার দেখিয়াছি। তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু কেবল আমিই পাই নাই তাহা নয়, কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই। আমাকে তুলিয়া দিয়া সে খাবার আনিতে গেল।

বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণভোজনের পালাটা আগে শেষ হোক না'

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, রক্ষে কর তুমি, সে পালা শেষ হতে যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

গেলই বা।

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, তাই বটে। ব্রাহ্মণভোজন আমার মাথায় থাক, তার জন্যে তোমাকে উপোস করালে আমার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের বদলে একেবারে পাতালে মুখ করে দাঁড়াবে। এই বলিয়া সে আহার্য আনিতে প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে কাছে বসিয়া আজ সে আমাকে যাহা খাওয়াইতে বসিল তাহা রোগীর পথ্য। কর্মবাটীর যাবতীয় গুরুপাক বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না; বুঝা গেল, আমার আসার পরেই সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে। তথাপি আসা পর্যন্ত তাহার আচরণে তাহার কথা কহার ধরনে এমনই কি একটা অনুভব করিতেছিলাম যাহা শুধুই অপরিচিত নয়, অত্যন্ত নূতন। ইহাই খাওয়ানোর সময়ে একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অথচ কিসে এবং কেমন করিয়া যে সুস্পষ্ট হইল, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি অস্পষ্ট করিয়াও বুঝাইতে পারিতাম না। হয়ত এই কথাটাই প্রত্যুত্তরে বলিতাম যে, মানুষের অত্যন্ত ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজলক্ষ্মী খাওয়াইতে বসিল, কিন্তু খাওয়া-না-খাওয়া লইয়া তাহার আগেকার দিনের সেই অভ্যস্ত জবরদস্তি ছিল না, ছিল ব্যাকুল অনুনয়। জোর নয়, ভিক্ষা। বাহিরের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না, পড়ে শুধু মানুষের নিভৃত হৃদয়ের অপলক চোখ-দুটির দৃষ্টিতে।

খাওয়া শেষ হইল। রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি এখন যাই?

অতিথি-সজ্জন বাহিরে সমবেত হইতেছিলেন, বলিলাম, যাও।

আমার উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি হাতে লইয়া সে যখন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন বহুক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্যমনে সেইদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, রাজলক্ষ্মীকে যেমনটি রাখিয়া গিয়াছিলাম এই কটা দিন পরে তেমনটি ত আর ফিরিয়া পাইলাম না। আনন্দ বলিয়াছিল, কাল হইতেই দিদির একপ্রকার অনাহারে কাটিয়াছে, আজ জলস্পর্শ করেন নাই, এবং কাল কত বেলায় যে তাঁহার উপবাস ভাঙিবে

তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অসম্ভব নয়। চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি, ধর্মপিপাসু চিত্ত তাহার কোনদিন কোন কৃচ্ছ্রসাধনেই পরাঙ্মুখ নয়। এখানে আসিয়া অবধি সুনন্দার সাহচর্যে সেই অবিচলিত নিষ্ঠা তাহার নিরন্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। আজ তাহাকে অল্পক্ষণমাত্রই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছি, কিন্তু যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে সে এই অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, মনে হইল, তাহার নিন্দিত জীবনের সঞ্চিত কালিমা যত বড়ই হোক আর তাহার নাগাল পাইবে না। কিন্তু আমি? আমি যে তাহার পথের মাঝখানে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর মত সমস্ত অবরোধ করিয়া আছি!

কাজকর্ম সারিয়া নিঃশব্দপদে রাজলক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আলো কমাইয়া, অত্যন্ত সাবধানে আমার মশারি ফেলিয়া দিয়া সে নিজের শয্যায় গিয়া শুইতে যাইতেছিল, আমি কথা কহিলাম। বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণভোজনের পালা ত সন্ধ্যার পূর্বেই শেষ হয়েচে, এত রাত হ'ল যে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে চমকিত হইল, পরে হাসিয়া কহিল, আ আমার কপাল! আমি ভয়ে ভয়ে আসচি পাছে তোমার ঘুম ভাঙিয়া দিই। এখনো জেগে আছ, ঘুমোও নি যে বড়?

তোমার আশাতেই জেগে আছি।

আমার আশায়? তবে ডেকে পাঠাও নি কেন? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া মশারির একটা ধার তুলিয়া দিয়া আমার শয্যার শিয়রে আসিয়া বসিল। বরাবরের অভ্যাসমত আমার চুলের মধ্যে তাহার দুই হাতের দশ আঙুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, ডেকে পাঠাও নি কেন?

ডেকে পাঠালেই কি তুমি আসতে? তোমার কত কাজ!

হোক কাজ। তুমি ডাকলে না বলতে পারি এমন সাধ্যি আছে আমার?

ইহার উত্তর ছিল না। জানি, আমার আহ্বান সত্যই উপেক্ষা করিবার সাধ্য তাহার নাই। কিন্তু আজ এই সত্যকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার সাধ্য আমার কৈ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

ভাবচি।

ভাবচো? কি ভাবচো? এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে আমার কপালের উপরে তাহার মাথাটি ন্যস্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার উপর রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলে যে বড়?

রাগ করে গিয়েছিলাম তুমি জানলে কি করে?

রাজলক্ষ্মী মাথা তুলিল না, আস্তে আস্তে বলিল, আমি রাগ করে গেলে তুমি জানতে পার না?

কহিলাম, বোধ হয় পারি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি বোধ হয় পার, কিন্তু আমি নিশ্চয় পারি, আর তোমার পারার চেয়েও ঢের বেশি পারি।

হাসিয়া কহিলাম, তাই হোক। এ নিয়ে বিবাদ করে জয়ী হতে আমি চাইনে লক্ষ্মী, নিজে হারার চেয়ে তুমি হেরে গেলেই আমার ঢের বেশি লোকসান।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যদি জান তবে বল কেন?

কহিলাম, বলিনে ত আর! কিন্তু বলা যে অনেকদিন বন্ধ করেচি সেই খবরটাই তুমি জান না।

রাজলক্ষ্মী নীরব হইয়া রহিল। পূর্বে হইলে সে আমাকে সহজে অব্যাহতি দিত না, লক্ষ কোটি প্রশ্ন করিয়া ইহার কৈফিয়ত আদায় করিয়া ছাড়িত, কিন্তু এখন সে মৌনমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাকি এর মধ্যে জ্বর হয়েছিল? কোথায় ছিলে? বাড়িতে আমাকে খবর পাঠালে না কেন?

খবর না পাঠাইবার হেতু বলিলাম। একে ত খবর আনিবার লোক ছিল না, দ্বিতীয়তঃ যাঁহার কাছে খবর পাঠাইব, তিনি যে কোথায় জানিতাম না। কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে

ছিলাম তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। চক্রবর্তীগৃহিণীর নিকট আজই সকালে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। সেই দীনহীন গৃহস্থ পরিবারে যেভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম এবং যেমন করিয়া অপরিসীম দৈন্যের মধ্যেও গৃহকর্ত্রী অজ্ঞাতকুলশীল রোগগ্রস্ত অতিথিকে পুত্রাধিক স্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া কৃতজ্ঞতা ও বেদনায় আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া কহিল, যাতে তাঁরা ঋণমুক্ত হন, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও না কেন?

বলিলাম, থাকলে দিতাম, কিন্তু টাকা ত আমার নেই।

আমার এই-সকল কথায় রাজলক্ষ্মী মর্মান্তিক দুঃখিত হইত, আজও সে মনে মনে তেমনই দুঃখ পাইল, কিন্তু তাহার টাকা যে আমারও টাকা এ কথা সজোরে প্রতিপন্ন করিতে আগেকার দিনের মত আর কলহে প্রবৃত্ত হইল না, চুপ করিয়া রহিল।

এই জিনিসটা তাহার নূতন দেখিলাম। আমার এই কথার উপরে ঠিক এমনি শান্ত নিরুত্তরে বসিয়া থাকা আমাকেও বিঁধিল। কিছুক্ষণ পরে সে নিশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল, যেন দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়া সে তাহার চারিদিকে ঘনায়মান বাষ্পাচ্ছন্ন মোহের আবরণটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। ঘরের মন্দ আলোকে তাহার মুখের চেহারা ভাল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যখন সে কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিল, বর্মা থেকে তোমার চিঠির জবাব এসেচে। অফিসের বড় খাম, হয়ত জরুরী কিছু আছে ভেবে আনন্দকে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম।

তার পরে?

বড়সাহেব তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেচেন। জানিয়েচেন, তুমি গেলেই তোমার সাবেক চাকরি আবার ফিরে পাবে।

বটে!

হাঁ। আনবো চিঠিখানা?

না থাক। কাল সকালে দেখবো।

আবার দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। কি যে বলিব, কেমন করিয়া যে এই নীরবতা ভাঙ্গিব ভাবিয়া না পাইয়া মনের ভিতরটায় কেবল তোলপাড় করিতে লাগিল। হঠাৎ এক-ফোঁটা চোখের জল টপ্‌ করিয়া আমার কপালের উপরে আসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েচে, এ ত খারাপ সংবাদ নয়। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি বিদেশে চাকরি নিয়ে আবার চলে যাবার চেষ্টা করচ, আমাকে এ কথা জানাও নি কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি বাধা দেব?

কহিলাম, না। বরঞ্চ জানালে তুমি উৎসাহই দিতে। কিন্তু সেজন্য নয়—বোধ হয় ভেবেছিলাম এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার শোনবার তোমার সময় হবে না।

রাজলক্ষ্মী নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টাও আমার কাছে গোপন রহিল না। কিন্তু ক্ষণকাল মাত্র। ক্ষণেক পরেই সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, এ কথার জবাব দিয়ে আর আমার অপরাধের বোঝা বাড়াব না। তুমি যাও, তোমাকে আমি কিছুতেই বারণ করব না। এই বলিয়া সে পুনরায় মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিল, এখানে না এলে বোধ হয় আমি কোনদিন বুঝতে পারতাম না, তোমাকে কতবড় দুর্গতির মধ্যে টেনে এনেচি। এই গঙ্গামাটির অন্ধকূপে মেয়েমানুষের চলে, কিন্তু পুরুষের চলে না। এখানকার এই কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন ত তোমার আত্মহত্যার সমান। এ আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেউ কি তোমায় দেখিয়ে দিয়েচে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। আমি নিজেই দেখেচি। তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখতে পাইনি। তার বদলে কেবল তোমার লক্ষ্যহারা বিরস মুখই দিনরাত্রি চোখে পড়েচে। আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েচে, কিন্তু আর না।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে একটা জ্বালার ভাবই ছিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের অনির্বচনীয় করুণায় বিভোর হইয়া গেলাম। বলিলাম, তোমাকেই কি কম ছাড়তে হয়েচে লক্ষ্মী? গঙ্গামাটি ত তোমারও যোগ্য স্থান নয়; কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সংকোচে মরিয়া গেলাম। কারণ, অনবধানতাবশতঃ যে গর্হিত বাক্য আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তীক্ষ্নবুদ্ধিশালিনী এই রমণীর কাছে তাহা গোপন রহিল না। কিন্তু আমাকে আজ সে ক্ষমা করিল। বোধ হয় কথার ভালমন্দ লইয়া মান-অভিমানের জাল বুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় আর তাহার ছিল না। বলিল, বরঞ্চ আমিই গঙ্গামাটির যোগ্য নই। সকলে এ কথা বুঝবে না, কিন্তু তোমার বোঝা উচিত যে সত্যই আমাকে কিছু ছাড়তে হয়নি। পাষাণের মত যে ভার একদিন লোকে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল, কেবল তাই আর একদিন আমার ঘুচেচে। আর শুধু কি তাই! আজীবন তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমাকে পেয়ে ছাড়ার অসংখ্য গুণ যে ফিরে পেয়েচি, সে কি তুমিই জান না?

জবাব দিতে পারিলাম না। অন্তরের অজানা অভ্যন্তর হইতে কে যেন এই কথাই আমাকে বলিতে লাগিল, ভুল হইয়াছে, তোমার মস্ত ভুল হইয়াছে। না বুঝিয়া তাহাকে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছ। রাজলক্ষ্মী ঠিক এই তারেই আঘাত করিল, বলিল, ভেবেছিলাম তোমার জন্যেই এ কথা কখনো তোমাকে জানাব না, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারলুম না। এই কষ্টটাই আমার সবচেয়ে বেশি লেগেচে যে, তুমি অনায়াসে ভাবতে পেরেচ যে পুণ্যের লোভে আমি এমনি উন্মাদ হয়ে গেছি যে, তোমাকেও অবহেলা করতে শুরু করেচি। রাগ করে চলে যাবার আগে এ কথা তোমার একবারও মনে হয়নি যে, ইহকালে পরকালে রাজলক্ষ্মীর তোমার চেয়ে লোভের বস্তু আর কি আছে! বলিতে বলিতেই তাহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া আমার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষা মনে পড়িল না, শুধু মাথার উপর হইতে তাহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। রাজলক্ষ্মী বাঁ হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছিয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; তাহার পরে কহিল, প্রজাদের সব খাওয়া শেষ হ'ল কিনা আমি দেখে আসি গে। তুমি ঘুমোও। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাকে ধরিয়া রাখিলে হয়ত রাখিতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলাম না। সেও আর ফিরিয়া আসিল না--আমারও যতক্ষণ না ঘুম আসিল শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম, জোর করিয়া রাখিয়া লাভ হইত কি? আমার পক্ষ হইতে ত কোনদিন কোন জোরই ছিল না, সমস্ত জোরই আসিয়াছিল তাহার দিক দিয়া। আজ সে-ই যদি বাঁধন খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চায় ত আমি ঠেকাইব কোন্ পথে?

সকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রথমেই ওদিকের খাটের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী ঘরে নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল, কিংবা অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়া গেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি, সেখানে একটা কোলাহল উঠিয়াছে। রতন কেটলি হইতে গরম চা পাত্রে ঢালিয়াছে এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা স্টোভে করিয়া সিংগাড়া কিংবা কচুরি ভাজিয়া তুলিতেছে, এবং বজ্রানন্দ তাহার সন্ন্যাসীর নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়া এই-সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার ভিজা চুলের উপর আঁচল টানিয়া দিল এবং বজ্রানন্দ কলরব করিয়া উঠিল, এই যে দাদা! আপনার দেরি দেখে ভাবছিলাম বুঝি বা সমস্ত জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, হাঁ, তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে জুড়িয়ে জল হ'ত।

আনন্দ কহিল, দিদি, সন্ন্যাসী ফকিরকে খাতির করতে শিখুন। ও-রকম কড়া কথা বলবেন না। আমাকে বলিল, কৈ, তেমন ভাল দেখাচ্ছে না ত! হাতটা একবার দেখব নাকি?

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, রক্ষে কর আনন্দ, তোমার আর ডাক্তারিতে কাজ নেই, উনি বেশ আছেন।

আনন্দ বলিল, সেইটাই নিশ্চয় করবার জন্যে হাতটা একবার—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, তোমাকে হাত দেখতে হবে না। এখ্খুনি হয়ত সাগুর ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বলিলাম, সাগু আমি ঢের খেয়েচি, সুতরাং ও ব্যবস্থা করে দিলেও আর শুনব না।

শুনেও তোমার কাজ নেই। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্লেটে করিয়া খানকয়েক গরম কচুরি ও সিঙ্গাড়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। রতনকে কহিল, তোর বাবুকে চা দে!

বজ্রানন্দ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিল, অতএব সহজে হার মানিবার পাত্র নয়; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে গেল, কিন্তু দিদি, এতটা দায়িত্ব আপনার—

রাজলক্ষ্মী তাহার কথার মাঝখানেই থামাইয়া দিল, শোন কথা! ওর দায়িত্ব আমার নয় ত কি তোমার? আজ পর্যন্ত যত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওঁকে খাড়া রাখতে হয়েচে সে যদি শুনতে ত দিদির কাছে আর ডাক্তারি করতে যেতে না। এই বলিয়া সে বাকী সমস্ত খাবার একটা থালায় ঢালিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সহাস্যে কহিল, এখন খাও এগুলো, কথা বন্ধ হোক।

আনন্দ হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, আরে এত খাওয়া যায়!

রাজলক্ষ্মী বলিল, যায় না ত সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলে কেন? আরও পাঁচজন ভদ্র-লোকের মত গেরস্ত থাকলেই ত হ'ত!

আনন্দের দুই চক্ষু সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মত দিদির দল এই বাঙলা মুলুকে আছে বলেই ত, নইলে দিব্যি ক'রে বলচি, আজই এই গেরুয়া-টেরুয়াগুলো অজয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যেতাম। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে দিদি। পরশু থেকেই একরকম উপোস করে আছেন, আজ আহ্নিক-টাহ্নিকগুলো একটু সকাল সকাল সেরে নিন। এগুলোতে এখন স্পর্শদোষ ঘটেনি, বলেন ত নাহয়—, এই বলিয়া সে সম্মুখের ভোজ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বল কি আনন্দ, কাল আমার সমস্ত ব্রাহ্মণ এসে উঠতে পারেন নি!

আমি বলিলাম, আগে তাঁরা এসে উঠুন। তার পরে—

আনন্দ কহিল, তাহলে আমাকেই উঠতে হ'ল। তাদের নাম ও ঠিকানা দিন, পাষণ্ডদের গলায় গামছা দিয়ে এনে ভোজন করিয়ে ছাড়ব। এই বলিয়া সে উঠার পরিবর্তে থালা টানিয়া লইয়া নিজেই ভোজনে মন দিল।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, সন্ন্যাসী কিনা, দেবদ্বিজে অতিশয় ভক্তি।

এইরূপে আমাদের সকালের চা-খাওয়ার পালাটা যখন সাঙ্গ হইল তখন বেলা আটটা। বাহিরে আসিয়া বসিলাম। শরীরেও গ্লানি ছিল না, হাসি-তামাশায় মনও যেন স্বচ্ছ, প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর বিগত রাত্রির কথাগুলার সহিত তাহার আজিকার কথা ও আচরণের কোন ঐক্যই ছিল না। সে যে অভিমান ও বেদনায় ব্যথিত হইয়াই ওরূপ কহিয়া-ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রাত্রির স্তব্ধ আঁধার আবরণের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাকে বৃহৎ ও কঠোর কল্পনা করিয়া যে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়াছি, আজ দিনের আলোকে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জাও পাইলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

কল্যকার মত আজ আর উৎসবের ঘটা ছিল না, তথাপি মাঝে মাঝে আহূত ও অনাহূতের ভোজনলীলা সমস্ত দিনমান ব্যাপিয়াই অব্যাহত রহিল। বেলা গেল। আর একবার আমরা চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া ঘরের মেঝেতে আসন করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কাজকর্ম কতকটা সারিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্য আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বজ্রানন্দ কহিল, দিদি, স্বাগত!

রাজলক্ষ্মী তাহার প্রতি হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, সন্ন্যাসীর বুঝি দেবসেবা শুরু হ'ল, তাই এত আনন্দ?

আনন্দ কহিল, মিথ্যে বলেন নি দিদি। সংসারে যাবতীয় আনন্দ আছে তার মধ্যে ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দই শ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্রে বলেচেন, ত্যাগীর পক্ষে দ্বিতীয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ, সে তোমার মত ত্যাগীর পক্ষে।

আনন্দ উত্তর দিল, এও মিথ্যে নয় দিদি। আপনি গৃহিণী বলেই এর মর্মগ্রহণ করতে

পারেন নি। নইলে আমরা ত্যাগীর দল যখন আনন্দে মশগুল হয়ে আছি, আপনি তখন তিন দিন ধরে কেবল পরকে খাওয়াচ্ছেন, আর নিজে মরছেন উপবাস করে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মরচি আর কৈ ভাই? দিনের পর দিন ত দেখচি এ দেহটার কেবল শ্রীবৃদ্ধি হয়েই চলচে।

আনন্দ কহিল, তার কারণ, হতে বাধ্য। সেবারেও আপনাকে দেখে গিয়েছিলাম, এবারেও এসে দেখচি। আপনার পানে চাইলে মনে হয় না যে পৃথিবীর জিনিস দেখচি, এ যেন দুনিয়া ছাড়া আর কিছু।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে হাসিয়া কহিলাম, তোমার আনন্দর যুক্তির প্রণালীটা দেখলে?

শুনিয়া আনন্দও হাসিল, কহিল, এ ত যুক্তি নয়, স্তুতি। দাদা, সে দৃষ্টি থাকলে কি আর বর্মায় যেতেন চাকরির দরখাস্ত করতে? আচ্ছা দিদি, কোন্ দুষ্টবুদ্ধি দেবতাটি দিয়েছিলেন এই অন্ধ মানুষটিকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে? তাঁর কি আর কাজ ছিল না?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, দেবতার দোষ নেই ভাই, দোষ এই ললাটের। আর ওঁর দোষ ত অতিবড় শত্রুতেও দিতে পারবে না। এই বলিয়া সে আমাকে দেখাইয়া কহিল, পাঠশালে উনি ছিলেন সর্দার-প'ড়ো, যত না দিতেন পড়া ব'লে, তার ঢের বেশি দিতেন বেত। তখন পড়ি ত সবে বোধোদয়, বইয়ের বোধ ত খুবই হ'ল, বোধ হ'ল আর একরকমের। ছেলেমানুষ, ফুল পাব কোথায়, বনের বঁইচিফলের মালা গেঁথে ওঁকে করলাম বরণ। এখন ভাবি, তার সঙ্গে তার কাঁটাগুলোও যদি গেঁথে দিতাম! বলিতে বলিতে তাহার কুপিত কণ্ঠস্বর চাপাহাসির আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল।

আনন্দ কহিল, উঃ—কি ভয়ানক রাগ!

রাজলক্ষ্মী বলিল, রাগ নয়ত কি? কাঁটা তুলে দেবার আর কেউ থাকলে নিশ্চয় দিতাম। এখনো পাই ত দি। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আনন্দ ডাকিয়া কহিল, পালাচ্ছেন যে বড়?

কেন, আর কাজ নেই নাকি? চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ওঁর কোঁদল করবার সময় আছে, কিন্তু আমার নেই।

আনন্দ বলিল, দিদি, আমি আপনার অনুগত ভক্ত। কিন্তু এ অভিযোগে সায় দিতে আমারও লজ্জা করচে। উনি একটা কথাও কইলে নাহয় প্যাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু একদম বোবা মানুষকে ফাঁদে ফেলা যায় কি করে? করলেও ধর্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঐ ত হয়েছে আমার জ্বালা। বেশ, ধর্মে যা সয়, তাই নাহয় কর। চায়ের বাটিগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—আমি ততক্ষণ রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, দাদার কি বর্মা যাবার সঙ্কল্প এখনও আছে নাকি? কিন্তু দিদি কখ্খনো সঙ্গে যাবেন না তা আমাকে বলেছেন।

সে আমি জানি।

তবে?

তবে একলাই যেতে হবে।

বজ্রানন্দ কহিল, এই দেখুন আপনার অন্যায়। অর্থোপার্জনের আবশ্যক আপনাদের নেই, তবে কিসের জন্যে যাবেন পরের গোলামি করতে?

বলিলাম, অন্ততঃ অভ্যাসটা বজায় রাখতে।

এটা রাগের কথা দাদা।

কিন্তু রাগ ছাড়া কি মানুষের আর কোন হেতু থাকতে নেই আনন্দ?

আনন্দ কহিল, থাক্‌লেও অপরের পক্ষে বোঝা কঠিন।

ইচ্ছা হইল বলি, এ কঠিন কাজ অপরের করিবারই বা প্রয়োজন কি, কিন্তু বাদানুবাদে জিনিসটা পাছে তিক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় চুপ করিয়া গেলাম।

এম্‌নি সময়ে রাজলক্ষ্মী বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া এবার ভালমানুষের মত আনন্দের পার্শ্বে গিয়া স্থির হইয়া বসিল। আনন্দ

আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দিদি, উনি বলছিলেন, অন্ততঃ গোলামির অভ্যাস বহাল রাখবার জন্যেও ওঁর বিদেশ যাওয়া চাই। আমি বলছিলাম, তাই যদি চাই, আসুন না, আমার কাজে যোগ দেবেন। বিদেশে না গিয়ে দেশের গোলামিতেই দুই ভাইয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু উনি ত ডাক্তারি জানেন না আনন্দ?

আনন্দ কহিল, আমি কি শুধু ডাক্তারিই করি? ইস্কুল করি, পাঠশালা করি, তাদের দুর্দশা যে কত দিক দিয়ে কত বড় তা অবিশ্রাম বোঝাবার চেষ্টা করি।

তারা বোঝে?

আনন্দ কহিল, সহজে বোঝে না। কিন্তু মানুষের শুভ-ইচ্ছা যখন বুক থেকে সত্য হয়ে বার হয়, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় না দিদি।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। বোধ হয় সে বিশ্বাস করিল না, বোধ হয় সে আমার জন্য মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, পাছে আমিও সায় দিয়া বসি, পাছে আমিও—

আনন্দ প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়লেন যে বড়?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে স্নিগ্ধ মধুরকণ্ঠে কহিল, দেশের দুর্দশা যে কত বড় তা আমিও জানি আনন্দ। কিন্তু তোমার একলার চেষ্টায় আর কি হবে ভাই? আমাকে দেখাইয়া কহিল, আবার উনি যাবেন সাহায্য করতে? তবেই হয়েছে। তাহলে আমার মত ওঁর সেবাতেই তোমার দিন কাটবে, আর কারও কিছু করতে হবে না। এই বলিয়া সে হাসিল।

তাহার হাসি দেখিয়া আনন্দ নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ নেই দিদি ওঁকে নিয়ে, থাকুন উনি চিরকাল আপনার চোখের মণি হয়ে। কিন্তু একলা-দোকলার কথা এ নয়! একলা মানুষেরও আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি এত বড় যে, তার পরিমাণ হয় না। ঠিক বামনদেবের পায়ের মত। বাইরে থেকে সে দেখতে ছোট, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পদতলটুকু প্রসারিত হলে বিশ্ব আচ্ছন্ন করে দেয়।

চাহিয়া দেখিলাম, বামনদেবের উপমায় রাজলক্ষ্মীর চিত্ত কোমল হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে কিছুই কহিল না।

আনন্দ বলিতে লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক, বিশেষ কিছু করতে আমি পারিনে! কিন্তু একটা কাজ করি। সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখের অংশ আমি নিই দিদি।

রাজলক্ষ্মী অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, সে আমি জানি আনন্দ। তোমাকে দেখে প্রথম দিনই আমি তা বুঝেছিলাম।

আনন্দ বোধ হয় এ কথায় কান দিল না, সে নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল আপনাদের মত আমারও অভাব কিছুই ছিল না। বাবার যা আছে, বিপুল সুখে দিন কাটাবার পক্ষেও সে বেশি। আমার কিন্তু তাতে প্রয়োজন নেই। এই দুঃখীর দেশে সুখভোগের লালসাটাও যদি এ জীবনে ঠেকিয়ে রাখতে পারি সেই আমার ঢের।

রতন আসিয়া জানাইল, পাচক বলিতেছে খাবার প্রস্তুত।

রাজলক্ষ্মী তাহাকে ঠাঁই করিবার আদেশ দিয়া আমাদের কহিল, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল সেরে নাও আনন্দ, আমি বড় ক্লান্ত।

সে যে ক্লান্ত তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু ক্লান্তির দোহাই দিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই। উভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রঙ্গ-রহস্যে আজিকার প্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল আমাদের ভারী একটা প্রসন্নতার মধ্য দিয়া, সায়াহ্নের সভাও জমিয়াছিল হাস্য-পরিহাসে উজ্জ্বল হইয়া। কিন্তু ভাঙ্গিল যেন নিরানন্দের মলিন অবসাদে। আহারের জন্য দুজনে যখন রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম তখন কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না।

পরদিন সকালে বজ্রানন্দ প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। কাহারও কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই রাজলক্ষ্মী চিরদিন আপত্তি করে। দিনক্ষণের অজুহাতে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া অত্যন্ত বাধা দেয়। কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিল না। শুধু বিদায়

লইয়া যখন সে প্রস্তুত হইল, তখন কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আনন্দ, আবার কবে আসবে ভাই?

আমি নিকটেই ছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সন্ন্যাসীর চোখের দীপ্তি ঝাপসা হইয়া আসিল, কিন্তু সে মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আসব বৈ কি দিদি! যদি বেঁচে থাকি, মাঝে মাঝে উৎপাত করতে হাজির হবই।

ঠিক ত?

নিশ্চয়।

কিন্তু আমরা ত শীঘ্রই চলে যাব। যেখানে থাকব যাবে সেখানে?

আদেশ করলে যাব বৈ কি দিদি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেয়ো। তোমার ঠিকানা আমাকে লিখে দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।

আনন্দ পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া হাতে দিল। সন্ন্যাসী হইয়াও আমাদের উভয়কে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল এবং রতন আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলে আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

পনর

সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ তাহার ঔষধের বাক্স ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া যেদিন বাহির হইয়া গেল সেদিন শুধু যে সে এ বাড়ির সমস্ত আনন্দটুকুই ছাঁকিয়া লইয়া গেল তাই নয়, আমার মনে হইল যেন সে সেই শূন্য স্থানটুকু ছিদ্রহীন নিরানন্দ দিয়া ভরিয়া দিয়া গেল। ঘন শৈবাল-পরিব্যাপ্ত জলাশয়ের যে জলটুকু তাহার অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্যের অভিঘাতে আবর্জনা-মুক্ত ছিল, সে যেন তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লেপিয়া একাকার হইতে চলিল। তবুও ছয়-সাতদিন কাটিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী প্রায় সারাদিনই বাড়ি থাকে না। কোথায় যায়, কি করে জানি না, জিজ্ঞাসাও করি না। দিনান্তে একবার যখন দেখা হয় তখন হয় সে অন্যমনস্ক, নাহয় বড় কুশারীঠাকুর সঙ্গে থাকেন, কাজের কথা চলে। একলা ঘরের মধ্যে, যে আনন্দ আমার কেহ নয়, তাকেই বার বার মনে পড়ে। মনে হয় হঠাৎ যদি সে আবার আসিয়া পড়ে! শুধু কেবল আমিই খুশি হই তাই নয়, ওই যে রাজলক্ষ্মী বারান্দার ওধারে বসিয়া প্রদীপের আলোকে কি একটা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি জানি, সেও তেমনি খুশি হইয়া উঠে। এমনিই বটে! একদিন যাহাদের উন্মুখ যুগ্মহৃদয় বাহিরের সর্ববিধ সংস্রব পরিহার করিয়া একান্ত সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া থাকিত, আজ ভাঙ্গনের দিনে সেই বাহিরটাকেই আমাদের কত বড়ই না প্রয়োজন! মনে হয়, যে-কেহ হোক, একবার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলে যেন হাঁফ ফেলিয়া বাঁচি।

এমনি করিয়া দিন যখন আর কাটিতে চাহে না, তখন হঠাৎ একসময়ে রতন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখের হাসি সে আর চাপিতে পারে না। রাজলক্ষ্মী গৃহে ছিল না, অতএব তাহার ভীত হইবারও আবশ্যক ছিল না, তথাপি সে সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, শোনেন নি বুঝি?

কহিলাম, না।

রতন বলিল, মা দুর্গা করুন মায়ের এই মতিটি যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। আমরা যে দু-চারদিনেই যাচ্চি।

কোথায় যাচ্চি?

রতন আর একবার দ্বারের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, সে খবরটা সঠিক এখনো পাইনি। হয় পাটনায়, নাহয় কাশীতে, নাহয়—কিন্তু এ ছাড়া মার বাড়ি ত আর কোথাও নেই!

চুপ করিয়া রহিলাম। আমার এতবড় ব্যাপারেও নিরুৎসুকতা লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় সে ভাবিল আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাই সে চাপা গলায় সমস্ত শক্তি

নিয়োগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি বলচি এ সত্যি। যাওয়া আমাদের হবেই। আঃ—বাঁচা যায় তাহলে, না?

বলিলাম, হাঁ।

রতন অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিল, কষ্ট করে আর দু-চারদিন সবুর করুন, ব্যস্। বড়জোর হপ্তাখানেক, তার বেশি নয়। গঙ্গামাটির সমস্ত ব্যবস্থা মা কুশারীমশায়ের সঙ্গে শেষ করে ফেলেছেন, এখন বেঁধেছেঁদে নিয়ে একবার দুর্গা দুর্গা বলে পা বাড়াতে পারলে হয়। আমরা হলুম সব শহরের মানুষ, এখানে কি কখনো মন বসে? এই বলিয়া সে খুশির আবেগে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রতনের অজানা কিছুই নাই। তাহাদেরই মত আমিও যে একজন রাজলক্ষ্মীর অনুচরের মধ্যে, এবং ইহার অধিক কিছু নয় এ কথা সে জানে। সে জানে, কাহারও কোন মতামতেরই মূল্য নাই, সকলের সমস্ত ভাল লাগা-না-লাগা কর্ত্রীর ইচ্ছা ও অভিরুচির 'পরেই নির্ভর করে।

যে আভাসটুকু রতন দিয়া গেল সে নিজে তাহার মর্ম বুঝে না, কিন্তু তাহার বাক্যের সেই নিহিত অর্থ দেখিতে দেখিতে আমার চিত্তপটে সর্বদিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে। একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রচণ্ড আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধ্য আমার ছিল না, হেঁট হইয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে সে বড় করিয়া আনে নাই। ভাবিতাম, আমার জন্য সে অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু আজ চোখে পড়িল ঠিক তাহাই নয়। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থের কেন্দ্রটা এতকাল দেখি নাই বলিয়াই এরূপ ভাবিয়া আসিয়াছি। বিত্ত, অর্থ, ঐশ্বর্য—অনেক কিছুই সে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে কি আমারই জন্য? আবর্জনাস্তূপের মত সে-সকল কি তাহার নিজের প্রয়োজনেরই পথ রোধ করে নাই? আমি এবং আমাকে লাভ করার মধ্যে যে রাজলক্ষ্মীর কতবড় প্রভেদ ছিল সেই সত্য আজ আমার কাছে প্রতিভাত হইল। আজ তাহার চিত্ত ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব অন্যান্য আবর্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের একধারে অনাদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই। অস্বীকার করিও না কখনও।

পরদিন সকালেই জানিতে পারিলাম, ধূর্ত রতন তথ্য যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ভ্রান্ত নহে। গঙ্গামাটি-সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর নিজের মুখেই তাহা অবগত হইলাম। প্রভাতে নিয়মিত পূজো-আহ্নিক সমাধা করিয়া সে অপরাপর দিনের মত বাহির হইল না। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, পরশু এমনি সময়ে যদি খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আমরা বার হয়ে যেতে পারি ত সাঁইথিয়ায় পশ্চিমের গাড়ি অনায়াসে ধরতে পারব, কি বল?

বলিলাম, পারবে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এখানকার বিলি-ব্যবস্থা ত একরকম শেষ করে ফেললাম। কুশারী-মশাই যেমন দেখছিলেন শুনছিলেন, তেমনই করবেন।

কহিলাম, ভালই হ'ল।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। বোধ হয় প্রশ্নটা ঠিকমত আরম্ভ করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই শেষে কহিল, বঙ্কুকে চিঠি লিখে দিয়েচি, সে একখানা গাড়ি রিজার্ভ করে স্টেশনেই উপস্থিত থাকবে। কিন্তু থাকে তবেই ত!

বলিলাম, নিশ্চয় থাকবে। সে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, সাধ্যমত করবে না। তবুও—আচ্ছা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না?

কোথায় যাইতে হইবে এ প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। মুখে বাধিল। কেবল বলিলাম, যদি যাবার প্রয়োজন মনে কর ত যেতে পারি।

ইহার প্রত্যুত্তরে রাজলক্ষ্মীও কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কৈ, তোমার চা এখনো ত আনলে না?

কহিলাম, না, বোধ হয় কাজে ব্যস্ত আছে।

বস্তুতঃ চা আনিবার সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্বেকার দিনে ভৃত্যদের এতবড় অপরাধ সে কিছুতেই মার্জনা করিতে পারিত না, বকিয়া ঝকিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিত, কিন্তু এখন কি-একপ্রকারের লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল এবং একটা কথাও না কহিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্বাহ্ণে সকল প্রজারা আসিয়াই ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ডোমেদের মালতী মেয়েটিকে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহারা অন্যত্র গিয়া সংসার পাতিয়াছিল, দেখা হইল না। খবর পাইলাম, সেখানে স্বামী লইয়া সে সুখে আছে। কুশারী-সহোদরযুগল রাত্রি থাকিতেই সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁতিদের সম্পত্তি-ঘটিত বিবাদের সুমীমাংসা হওয়ায় তাঁহারা আবার এক হইয়াছিলেন। কি করিয়া যে রাজলক্ষ্মী কি করিল, সবিস্তারে জানিবার কৌতূহলও ছিল না, জানিও না। কেবল এইটুকু তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া জানিতে পারিলাম যে, কলহের অবসান হইয়াছে, এবং পূর্বসঞ্চিত বিচ্ছেদের গ্লানি কোন পক্ষের মনেই আর বিদ্যমান নাই।

সুনন্দা আসিয়া তাহার ছেলেকে লইয়া আমাকে প্রণাম করিল; কহিল, আমাদের যে আপনি শীঘ্র ভুলে যাবেন না সে আমি জানি। এ বাহুল্য প্রার্থনা আপনার কাছে আমি করব না।

সহাস্যে কহিলাম, আমার কাছে আবার কি কাজের প্রার্থনা করবে দিদি?

আমার ছেলেকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

কহিলাম, এই ত বাহুল্য প্রার্থনা, সুনন্দা। তোমার মত মায়ের ছেলেকে যে কোন্ আশীর্বাদ করা যায় সে ত আমিই জানিনে।

রাজলক্ষ্মী কি একটা প্রয়োজনে এই দিক দিয়া যাইতেছিল, কথাটা তাহার কানে যাইতেই ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার হইয়া জবাব দিয়া কহিল, ওর ছেলেকে তুমি এই আশীর্বাদ করে যাও যেন বড় হয়ে ও তোমার মত মন পায়।

হাসিয়া কহিলাম, বেশ আশীর্বাদ! তোমার ছেলেকে বুঝি লক্ষ্মী তামাশা করতে চায়, সুনন্দা।

কথা আমার শেষ না হইতেই রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, কি, তামাশা করতে চাই নিজের ছেলের সঙ্গে? এই যাবার সময়ে? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমিও ত ওর মায়ের মত, আমি প্রার্থনা করি ভগবান যেন ওকে এই বরই দেন। তার চেয়ে বড় ত আমি কিছুই জানিনে।

সহসা চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথাও না কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর সবাই মিলিয়া গঙ্গামাটি হইতে চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এমন কি রতন পর্যন্ত পুনঃপুনঃ চোখ মুছিতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সকলেই আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, শুধু দিতে পারিলাম না আমি। আমিই কেবল নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলাম, এ জীবনে এখানে ফিরিয়া আসিবার আমার সম্ভাবনা নাই। তাই যাবার পথে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রতি বার বার ফিরিয়া চাহিয়া কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যেন অপরিমেয় মাধুর্য ও বেদনায় পরিপূর্ণ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের এইমাত্র যবনিকা পড়িল; নাট্যশালার দীপ নিভিল—এইবার মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ সংসারের সহস্রবিধ ভিড়ের মধ্যে আমাকে রাস্তায় বাহির হইতে হইবে। কিন্তু জনতার মাঝখানে যে মনের অত্যন্ত সতর্কতায় পদক্ষেপ করিবার কথা, আমার সেই মন যেন নেশার ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরে আমরা সাঁইথিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মীর আদেশ ও উপদেশের কোনটাই বঙ্কু অবহেলা করে নাই। সে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজে আসিয়া স্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল, যথাসময়ে ট্রেন আসিলে মালপত্র বোঝাই দিয়া রতনকে চাকরদের কামরায় তুলিয়া দিয়া বিমাতাকে লইয়া গাড়িতে উঠিল। কিন্তু আমার সহিত সে

বিশেষ কোনরূপে ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিল না, কারণ, এখন তাহার দর বাড়িয়াছে, ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি লইয়া এখন সংসারে সে মানুষের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বঙ্কু বিচক্ষণ ব্যক্তি। সকল অবস্থাকেই মানিয়া লইয়া চলিতে জানে। এ বিদ্যা যাহার অধিগত হইয়াছে পৃথিবীতে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয় না।

গাড়ি ছাড়িতে তখনও মিনিট-পাঁচেক বাকী ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতা যাইবার ট্রেন আসিবে প্রায় শেষ রাত্রে। একধারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাজলক্ষ্মী তাহার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাতের ইশারায় আমাকে আহ্বান করিল। নিকটে যাইতেই কহিল, একবার ভিতরে এস। ভিতরে আসিতে সে হাত ধরিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, তুমি কি খুব শীঘ্রই বর্মায় চলে যাবে? যাবার আগে আর একটিবার দেখা দিয়ে যাবে না?

কহিলাম, যদি প্রয়োজন মনে কর যেতে পারি।

রাজলক্ষ্মী চুপিচুপি উত্তর দিল, সংসারে যাকে প্রয়োজন বলে সে নেই। শুধু আর একবার দেখতে চাই, আসবে?

আসব।

কলকাতায় পেঁছে চিঠি দেবে?

দেব।

বাহিরে গাড়ি ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং গার্ডসাহেব তাঁহার সবুজ আলো বার বার নাড়িয়া এই আদেশই কায়েম করিলেন। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধূলো লইয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল। আমি নামিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেই গাড়ি চলিতে শুরু করিল। অন্ধকার রাত্রি, ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল স্টেশনপ্লাটফর্মের গোটাকতক কেরোসিনের আলো মন্থর-গতিশীল গাড়ির সেই খোলা জানালার একটি অস্পষ্ট নারীমূর্তির উপরে বার-কয়েক আলোকপাত করিল।

কলিকাতায় আসিয়া চিঠি দিলাম এবং জবাবও পাইলাম। এখানে কাজ বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহা দিন পনরর মধ্যে শেষ হইল। এইবার বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে প্রতিশ্রুতিমত আর একবার রাজলক্ষ্মীকে দেখা দিতে হইবে। আরও সপ্তাহ-দুই এম্‌নিই কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল, এতদিনে কি জানি কি তাহার মতলব হইবে, হয়ত সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, হয়ত অত দূরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর-আপত্তি তুলিয়া জিদ করিতে থাকিবে—কিছুই অসম্ভব নয়। এখন সে কাশীতে। তাহার বাসার ঠিকানাও জানি, ইতিমধ্যে দুই-তিনখানা পত্রও পাইয়াছি, এবং ইহাও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার প্রতিশ্রুতির বিষয় কোথাও সে ইঙ্গিতে স্মরণ করাইবার প্রয়াস করে নাই। না করিবারই কথা! মনে মনে বলিলাম, আপনাকে এতখানি ছোট করিয়া আমিও বোধ করি মুখ ফুটিয়া লিখিতে পারিতাম না, তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাও। অকস্মাৎ দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিলাম। এ জীবনে সে যে এতখানি জড়াইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া যে এতদিন ভুলিয়া ছিলাম, ভাবিয়া আশ্চর্য হইলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখনও সময় আছে, তখনও গাড়ি ধরিতে পারি। বাসায় সমস্ত পড়িয়া রহিল, বাহির হইয়া পড়িলাম। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিস-গুলার প্রতি চাহিয়া মনে হইল, থাক্‌ এ-সকল পড়িয়া। আমার প্রয়োজনের কথা যে আমার চেয়েও বেশি করিয়া জানে তাহারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আর প্রয়োজনের বোঝা বহিব না। রাত্রে ট্রেনের মধ্যে কিছুতেই ঘুম আসিল না, অলস তন্দ্রার ঝোঁকে মুদিত দুই চক্ষুর পাতার উপরে কত খেয়াল, কত কল্পনাই যে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার আদি-অন্ত নাই। হয়ত, অধিকাংশই এলোমেলো, কিন্তু সবটুকু যেন একেবারে মধু দিয়া ভরা। ক্রমশঃ সকাল হইল, বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকজনের ওঠানামা, হাঁকাহাঁকি, দৌড়ঝাঁপের অবধি রহিল না, খর রৌদ্রতাপে চতুষ্পার্শ্বের কোথাও কোন কুহেলিকার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু আমার চক্ষে সমস্তই একেবারে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পথে ট্রেনের বিলম্ব হওয়ায় রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাটীতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা অধিক হইয়াছে। বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে একজন বৃদ্ধগোছের ব্রাহ্মণ বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চান?

কি চাই সহসা বলিতে পারিলাম না। তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কাকে খুঁজচেন?

কাহাকে খুঁজিতেছি ইহাও সহসা বলা কঠিন। একটু থামিয়া কহিলাম, রতন আছে?

না, সে বাজারে গেছে।

ব্রাহ্মণ সজ্জন ব্যক্তি। আমার ধূলিধূসর মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বোধ হয় অনুমান করিলেন যে, আমি দূর হইতে আসিতেছি। সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আপনি বসুন, সে শীঘ্রই ফিরবে। আপনার কি তাকেই শুধু দরকার?

নিকটে একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহার প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে বঙ্কুবাবু আছেন?

আছে বৈ কি। এই বলিয়া তিনি একজন নূতন চাকরকে ডাকিয়া বঙ্কুকে ডাকিয়া দিতে কহিলেন। বঙ্কু আসিয়া আমাকে দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, পরে তাহার নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া কহিল, আমরা ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বর্মায় চলে গেছেন।

এই আমরা যে কে কে, এ প্রশ্ন আমি আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বঙ্কু কহিল, আপনার জিনিসপত্র বুঝি এখনো গাড়িতেই—

না, জিনিসপত্র আমি কিছুই সঙ্গে আনিনি।

আনেন নি? রাত্রের গাড়িতেই ফিরবেন বুঝি?

কহিলাম, সম্ভব হলে তাই ফিরব ভেবেচি।

বঙ্কু কহিল, তাহলে একটা বেলার জন্যে আর দরকারই বা কি?

ভৃত্য আসিয়া ধুতি-গামছা হাতমুখ ধোবার জল প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্তই দিয়া গেল, কিন্তু আর কেহ আমার কাছে আসিল না।

খাবার ডাক পড়িল, গিয়া দেখিলাম, আমার ও বঙ্কুর ঠাঁই পাশাপাশি হইয়াছে। দক্ষিণের দরজা ঠেলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। গোড়ায় বোধ হয় তাহাকে চিনিতে পারি নাই। যখন পারিলাম, প্রথমটা চোখের সম্মুখে যেন সমস্ত কালো হইয়া উঠিল। এখানে কি আছে এবং কে আছে মনে পড়িল না। পরক্ষণেই মনে হইল নিজের মর্যাদা রাখিয়া, হাস্যকর কিছু একটা না করিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া এ বাড়ি হইতে আবার সহজ মানুষের মত বাহির হইতে পারিব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়িতে কষ্ট হয়নি ত?

এ ছাড়া সে আর কি বলিতে পারে! ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, বোধ হয় মুহূর্তকয়েকের বেশি নয়, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিলাম, না, কষ্ট হয়নি।

এইবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যে শুধু থানকাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত পিঠজোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশিও আর নাই। মাথার পরে ললাটের প্রান্ত পর্যন্ত আঁচল-টানা, তথাপি তাহারই ফাঁক দিয়া কাটা-চুলের দুই-চারিগোছা অলক কণ্ঠের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপবাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা মুখের 'পরে ফুটিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল; এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ভাতের গ্রাস আমার গলায় বাধিতেছিল, তবু জোর করিয়া গিলিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি। এবং আজ, শুধু একটা দিনের জন্যও সে যেন আমার খাওয়ার স্বল্পতা লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়।

আহারের শেষে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কু বলছিল তুমি নাকি আজ রাত্রের গাড়িতেই ফিরে যেতে চাও?

বলিলাম, হাঁ।

ইস্! আচ্ছা, কিন্তু তোমার জাহাজ ছাড়বে ত সেই রবিবারে।

তাহার এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে বিস্মিত হইয়া মুখের প্রতি চাহিতেই সে হঠাৎ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। পরক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তার ত এখনও তিনদিন দেরি।

বলিলাম, হাঁ, আরও কাজ আছে।

পুনরায় রাজলক্ষ্মী কি একটা বলিতে গিয়াও চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় আমার শ্রান্তি বা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা মুখে আনিতে পারিল না। খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, আমার গুরুদেব এসেচেন।

বুঝিলাম বাহিরে যে ব্যক্তির সহিত প্রথমেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তিনিই। ইঁহাকেই দেখাইবার জন্য সে আমাকে একবার এই কাশীতেই টানিয়া আনিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমার গাড়ি ছাড়িবে বারটার পরে। এখনও ঢের সময়। মানুষটি সত্যই ভাল। স্বধর্মে অবিচলিত নিষ্ঠাও আছে, উদারতারও অভাব নাই। আমাদের সকল কথাই জানেন, কারণ গুরুর কাছে রাজলক্ষ্মী গোপন কিছুই করে নাই। অনেক কথাই বলিলেন, গল্পচ্ছলে উপদেশও কম দিলেন না, কিন্তু তাহা উগ্রও নয়, আঘাতও করে না। সমস্ত কথা মনে নাই, হয়ত মন দিয়াও শুনি নাই, তবে এটুকু স্মরণ আছে যে, একদিন রাজলক্ষ্মীর যে এরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তিনি তাহা জানিতেন, তাই দীক্ষার সম্বন্ধেও তিনি প্রচলিত রীতি মানেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, যাহার পা পিছলাইয়াছে সদ্গুরুর প্রয়োজন তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক।

ইহার বিরুদ্ধে আর বলিবার কি আছে? তিনি আর একদফা শিষ্যার ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মশীলতার অজস্র প্রশংসা করিলেন; কহিলেন, এমন আর দেখি নাই। বস্তুতঃ, ইহাও সত্য এবং তাহা কাহারও অপেক্ষা আমি নিজেও কম জানি না। কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

সময় হইয়া আসিল, ঘোড়ার গাড়ি দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া আমি গাড়িতে গিয়া বসিলাম। রাজলক্ষ্মী পথে আসিয়া গাড়ির ভিতরে হাত বাড়াইয়া বার বার করিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় দিল, কিন্তু কথা কহিল না। বোধ হয় সে শক্তি তাহার ছিল না। ভালই হইল যে, অন্ধকারে সে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, কি যে বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। শেষ বিদায়ের পালাটা নিঃশব্দেই সাঙ্গ হইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে দুই চোখ দিয়া আমার ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সর্বান্তঃকরণে কহিলাম, তুমি সুখী হও, শান্ত হও, তোমার লক্ষ্য ধ্রুব হোক, তোমাকে হিংসা করি না, কিন্তু যে দুর্ভাগা সমস্ত বিসর্জন দিয়া একই সাথে একদিন তরণী ভাসাইয়াছিল এ জীবনে তাহার আর কূল মিলিবে না। ঘর্ঘর্ ঝর্ঝর্ করিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল, গঙ্গামাটির সকল স্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেদিন বিদায়ের ক্ষণে যে-সকল কথা মনে আসিয়াছিল, আবার তাহাই জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, এই যে এক জীবন-নাট্যের অত্যন্ত স্থূল এবং সাধু-উপসংহার হইল ইহার খ্যাতির আর অন্ত নাই। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিলে ইহার অম্লান দীপ্তি কোনদিন নিবিবে না, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত করিবার মত পাঠকেরও কোনদিন সংসারে অভাব ঘটিবে না—কিন্তু আমার নিজের কথা কাহাকেও বলিবার নহে—আমি চলিলাম অন্যত্র,—আমারই মত যে কলুষের পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছে, ভাল হইবার আর পথ নাই, সেই অভয়ার আশ্রয়ে। মনে মনে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, তোমার পুণ্যজীবন উন্নত হইতে উন্নততর হোক, তোমার মধ্য দিয়া ধর্মের মহিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হোক, আমি আর ক্ষোভ করিব না। অভয়ার চিঠি পাইয়াছি। স্নেহে, প্রেমে, করুণায় অটল অভয়া, ভগিনীর অধিক বিদ্রোহী অভয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বর্মা হইতে আসিবার কালে ক্ষুদ্র দ্বার-প্রান্তে তাহার সজল চক্ষু মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার সমস্ত অতীত ও বর্তমান ইতিহাস। চিত্তের শুচিতায়, বুদ্ধির নির্ভয়তায় ও আত্মার স্বাধীনতায় সে যেন আমার সমস্ত দুঃখ একনিমিষে আবৃত করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সহসা গাড়ি থামিতে চকিত হইয়া দেখিলাম স্টেশনে পৌঁছিয়াছি। নামিয়া দাঁড়াইতে আর এক ব্যক্তি কোচবাক্স হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

কে রে, রতন যে!

বাবু, বিদেশে চাকরের যদি অভাব হয় ত আমাকে একটু খবর দেবেন। যতদিন বাঁচব আপনার সেবার ত্রুটি হবে না।

গাড়ির লণ্ঠনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুই কাঁদচিস্ কেন বল্ ত?

রতন জবাব দিল না, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া পায়ের কাছে আর একবার ঢিপ করিয়া নমস্কার করিয়াই দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আশ্চর্য, এই সেই রতন!

চতুর্থ পর্ব

এক

এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরত-ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বার বার করিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগ্যেই বা পুনঃপুনঃ এমন ঘটে কেন? আমরণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না? এম্‌নি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া, কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্‌ রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকাডাকিতেও সেই বিদায় দেওয়া মনের সাড়া মিলে না, যদিবা কোন ক্ষীণকণ্ঠের অনুরণন কদাচিৎ কানে আসিয়া লাগে, আপন বলিয়া নিঃসংশয়ে চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে ভয় পাই।

এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার জীবনে আজ মৃত, বিসর্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ফিরিয়াছি—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠকাইবার কোথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। ওদিকটা নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই শেষ যে কতখানি শেষ, তাহা বলিবই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন?

কিন্তু এই ত সেদিন। কুমারসাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—দৈবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই, তথাপি হারানোটাকেই আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার বিশ্ব জুড়িয়া রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্মায় পৌঁছিব। কিন্তু এ যেন সর্বস্ব খোয়াইয়া জুয়াড়ীর ঘরে ফেরা। ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত—শুধু পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের চলাটা যেন আর না ফুরায়।

অ্যাঁ! একি শ্রীকান্ত যে!

এ যে একটা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে সে খেয়ালও করি নাই। দেখি, আমার দেশের ঠাকুর্দা ও রাঙাদিদি ও একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে ঘাড়ে মাথায় ও কাঁখে একরাশ মোটঘাট লইয়া প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া অকস্মাৎ আমার জানালার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন।

ঠাকুর্দা বলিলেন, উঃ কি ভিড়! একটা ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই, এই ত তিন-তিনটে মানুষ। তোমার গাড়িটি ত দিব্যি খালি,—উঠবো?

উঠুন, বলিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন-তিনটে মানুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া যাবতীয় বস্তু নামাইয়া রাখিলেন। ঠাকুর্দা কহিলেন, এ বুঝি বেশি ভাড়ার গাড়ি, আমার দণ্ড লাগবে না ত?

বলিলাম, না, আমি গার্ডসাহেবকে বলে দিয়ে আসচি।

গার্ডকে বলিয়া যথাকর্তব্য সমাপন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন তাঁহারা আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন। গাড়ি ছাড়িলে রাঙাদিদি আমার দিকে নজর দিলেন, চমকাইয়া বলিলেন, তোর এ কি ছিরি হয়েছে শ্রীকান্ত! এ যে মুখ শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেছে! কোথায় ছিলি এতদিন? ভ্যালা ছেলে যা হোক! সেই যে গেলি একটা চিঠিও কি দিতে নেই? বাড়িসুদ্ধ সবাই ভেবে মরি।

এ-সকল প্রশ্নের কেহ জবাব প্রত্যাশা করে না, না পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে না।

ঠাকুর্দা জানাইলেন, তিনি সস্ত্রীক গয়াধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই মেয়েটি তাঁর বড় শ্যালিকার নাতনী—বাপ হাজার টাকা গুণে দিতে চায়, তবু এত দিনে মনোমত একটি পাত্র জুটলো না। ছাড়লে না, তাই সঙ্গে করে আনতে হ'ল। পুঁটু, প্যাঁড়ার হাঁড়িটা খোল ত। গিন্নী, বলি দইয়ের কড়াটা ফেলে আসা হয়নি ত? দাও, শালপাতায় করে গুছিয়ে দাও দিকি গোটা-দুই প্যাঁড়া, একথাবা দই! এমন দই কখনো মুখে দাওনি ভায়া, তা দিব্যি করে বলতে পারি। না—না—না, ঘটির জলে হাতটা আগে ধুয়ে ফেলো পুঁটু—যাকে তাকে ত নয়,—এ-সব মানুষকে কি করে দিতে-থুতে হয় শেখো!

পুঁটু যথা আদেশ সযত্নে কর্তব্য প্রতিপালন করিল। অতএব, অসময়ে ট্রেনের মধ্যে অযাচিত প্যাঁড়া ও দধি জুটিল। খাইতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাগ্যে যত অঘটন ঘটে। এইবার পুঁটুর জন্য হাজার টাকা দামের পাত্র না মনোনীত হইয়া উঠি। বর্মায় ভালো চাকরি করি এ খবরটা তাঁহারা আগের বারেই পাইয়াছিলেন।

রাঙাদিদি অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং আত্মীয়জ্ঞানে পুঁটু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণ, আমি ত আর পর নই!

বেশ মেয়েটি। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের, ফরসা না হোক, দেখিতে ভালোই। ঠাকুর্দা তাহার গুণের বিবরণ দিয়া শেষ করিতে পারেন না এমনি অবস্থা ঘটিল। লেখাপড়ার কথায় রাঙাদিদি বলিলেন, ও এমনি গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে যে, তোদের আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। ও বাড়ির নন্দরানীকে এমনি একখানি চিঠি লিখে দিয়েছিল যে, সাত-দিনের দিন জামাই পনর দিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ কেহ ইঙ্গিতেও করিলেন না। সেরূপ ব্যাপার যে একটা ঘটিয়াছিল তাহা কাহারও মনেই নাই।

পরদিন দেশের স্টেশনে গাড়ি থামিলে আমাকে নামিতেই হইল। তখন বেলা বোধ করি দশটার কাছাকাছি। সময়ে স্নানাহার না করিলে পিত্ত পড়িবার আশঙ্কায় দু'জনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আনিয়া আদর-যত্নের আর অবধি রহিল না। পুঁটুর বর যে আমিই, পাঁচ-সাতদিনে এ-সম্বন্ধে গ্রামের মধ্যে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। এমন কি পুঁটুরও না।

ঠাকুর্দার ইচ্ছা আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম সমাধা হইয়া যায়। পুঁটুর যে যেখানে আছে আনিয়া ফেলিবারও একটা কথা উঠিল। রাঙাদিদি পুলকিতচিত্তে কহিলেন, মজা দেখেচ, কে যে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেচে, আগে থাকতে কারও বলবার জো নাই।

আমি প্রথমটা উদাসীন, পরে চিন্তিত, তারপরে ভীত হইয়া উঠিলাম। সায় দিয়াছি কি দিই নাই—ক্রমশঃ নিজেরই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। ব্যাপার এমনি দাঁড়াইল যে, না বলিতে সাহস হয় না, পাছে বিশ্রী কিছু-একটা ঘটে। পুঁটুর মা এখানেই ছিলেন, একটা রবিবারে হঠাৎ বাপও দেখা দিয়া গেলেন। আমাকে কেহ যাইতেও দেয় না, আমোদ-আহ্লাদ ঠাট্টা-তামাশাও চলে—পুঁটু যে ঘাড়ে চাপিবেই, শুধু দিন-ক্ষণের অপেক্ষা—উত্তরোত্তর এমনি লক্ষণই চারিদিক দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। জালে জড়াইতেছি—মনে শান্তিও পাই না—জাল কাটিয়া বাহির হইতেও পারি না। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিল। ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন কোষ্ঠী আছে কিনা। সেটা ত দরকার।

জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা কি পুঁটুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া সত্যিই স্থির করেচেন?

ঠাকুর্দা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, সত্যিই? শোন কথা একবার!

কিন্তু আমি ত এখনো স্থির করিনি।

করোনি? তা হলে করো। মেয়ের বয়েস বারো-তেরোই বলি আর যাই করি, আসলে ওর বয়েস হ'ল সতেরো-আঠারো। এর পরে ও মেয়ে বিয়ে দেবো আমরা কেমন করে?

কিন্তু সে দোষ ত আমার নয়!

দোষ তবে কার? আমার বোধ হয়?

ইহার পরে মেয়ের মা ও রাঙাদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী মেয়েরা পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। কান্নাকাটি, অনুযোগ অভিযোগের আর অন্ত রহিল না। পাড়ার পুরুষেরা কহিল, এতবড় শয়তান আর দেখা যায় না, উহার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া এক কথা, মেয়ের বিবাহ দেওয়া আর-এক কথা। সুতরাং ঠাকুর্দা চাপিয়া গেলেন। তারপরে শুরু হইল অনুনয়-বিনয়ের পালা। পুঁটুকে আর দেখি না, সে বেচারা লজ্জায় বোধ করি কোথাও মুখ লুকাইয়া আছে। ক্লেশবোধ হইতে লাগিল। কি দুর্ভাগ্য লইয়াই উহারা আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে! শুনিতে পাইলাম ঠিক এই কথাই উহার মা বলিতেছে,—ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়,—পোড়া শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবে না ত হবে কার?

কলিকাতায় যাইবার পূর্বে ঠাকুর্দাকে ডাকিয়া বাসার ঠিকানা দিলাম, বলিলাম, আমার একজনের মত নেওয়া দরকার, তিনি বললেই আমি সম্মত হবো।

ঠাকুর্দা গদগদকণ্ঠে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, দেখো ভাই, মেয়েটাকে মেরো না। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন অমত না করেন।

বলিলাম, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না, বরঞ্চ খুশি হয়েই সম্মতি দেবেন।

ঠাকুর্দা আশীর্বাদ করিলেন,—কবে তোমার বাসায় যাব দাদা?

পাঁচ-ছ'দিন পরেই যাবেন।

পুঁটুর মা, রাঙাদিদি রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া চোখের জলের সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! কিন্তু এ ভালোই হইল যে, একপ্রকার কথা দিয়া আসিলাম। রাজলক্ষ্মী এ বিবাহে যে লেশমাত্র আপত্তি করিবে না এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

দুই

স্টেশনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল; পরেরটা আসিতে ঘণ্টা-দুই দেরি। সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছি,—বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্তকয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?

হাঁ।

আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর। এই বলিয়া সে সবেগে আমার হাত মলিয়া দিল, সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, চল্ আমাদের বাড়ি। কোথা যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না,—চল্।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর-চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্বেও এড়াইবার জো ছিল না, সুতরাং আজ রাত্রের মত সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহুল্য, তাহার উল্লাস ও আত্মীয়তার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার মত শক্তি আজ আমার নাই। কিন্তু সে নাছোড়-বান্দা। আমার ব্যাগটা সে নিজেই তুলিয়া লইল, কুলি ডাকিয়া বিছানাটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া আমাকে কহিল, ওঠ্।

পরিত্রাণ নাই,—তর্ক করা বিফল।

বলিয়াছি গহর আমার পাঠশালার বন্ধু। আমাদের গ্রাম হইতে তাহাদের বাড়ি এক ক্রোশ দূরে, একই নদীর তীরে। বাল্যকালে তাহারই কাছে বন্দুক ছুঁড়িতে শিখি। তাহার বাবার একটা সেকেলে গাদাবন্দুক ছিল, সেই লইয়া নদীর ধারে, আমবাগানে, ঝোপঝাড়ে

দু'জনে পাখি মারিয়া বেড়াইতাম, ছেলেবেলা কতদিন তাহাদের বাড়িতে রাত কাটাইয়াছি,—তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া আমার ফলারের যোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমিজমা চাষ-আবাদ অনেক ছিল।

গাড়িতে বসিয়া গহর প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলি, শ্রীকান্ত?

যেখানে যেখানে ছিলাম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি করো গহর?

কিছুই না।

তোমার মা ভালো আছেন?

মা বাবা দু'জনেই মারা গেছেন—বাড়িতে আমি একলা আছি।

বিয়ে করোনি?

সেও মারা গেছে।

মনে মনে অনুমান করিলাম এইজন্যই যাহাকে হোক ধরিয়া লইয়া যাইতে তাহার এত আগ্রহ। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সেই গাদাবন্দুকটা আছে?

গহর হাসিয়া কহিল, তোর মনে আছে দেখছি। সেটা আছে, আর একটা ভালো বন্দুক কিনেছিলাম, তুই শিকারে যেতে চাস্ ত সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি আর পাখি মারিনে—বড় দুঃখ লাগে।

সে কি গহর, তখন যে এই নিয়ে দিনরাত থাকতে?

তা সত্যি, কিন্তু এখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

গহরের আর-একটা পরিচয় আছে—সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত, যে-কোন সময়ে, যে-কোন বিষয়ে অনেকটা পাঁচালীর ধরনে। ছন্দ, মাত্রা, ধ্বনি ইত্যাদি কাব্যশাস্ত্র-বিধি মানিয়া চলিত কিনা সে জ্ঞান আমার তখনও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধ, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী তাহার মুখে ছড়ায় শুনিয়া আমরা সেকালে পুনঃপুনঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম, এ আমার মনে আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর, তোমার যে একদিন কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ণ রচনার শখ ছিল, সে সঙ্কল্প আছে, না গেছে?

গেছে! গহর মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সে কি যাবার রে! ঐ নিয়েই ত বেঁচে আছি। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন ঐ নিয়েই থাকব। কত লিখেচি, চল্ না আজ তোকে সমস্ত রাত্রি শোনাব, তবু ফুরোবে না।

বল কি গহর!

নয়ত কি তোরে মিথ্যে বলচি?

প্রদীপ্ত কবি-প্রতিভায় তাহার চোখমুখ ঝকঝক করিতে লাগিল। সন্দেহ করি নাই, শুধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলাম মাত্র, তথাপি, পাছে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়, আমাকে ধরিয়া বসাইয়া সে সারারাত্রি ব্যাপিয়া কাব্যচর্চা করে, এই ভয়ে শঙ্কার সীমা রহিল না। প্রসন্ন করিতে বলিলাম, না গহর, তা বলিনি, তোমার অদ্ভুত শক্তি আমরা সবাই স্বীকার করি, তবে ছেলেবেলার কথা মনে আছে কিনা তাই শুধু বলছিলাম। তা বেশ বেশ—এ একটা বাঙ্গালাদেশের কীর্তি হয়ে থাকবে।

কীর্তি? নিজের মুখে কি আর বলব ভাই, আগে শোন, তারপরে হবে কথা।

কোনদিক দিয়াই নিস্তার নাই। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিলাম, সকাল থেকেই শরীরটা এমন বিশ্রী ঠেকচে যে মনে হচ্ছে ঘুমোতে পেলে—

গহর কানও দিল না, বলিল, পুষ্পক-রথে সীতা যেখানে কাঁদতে কাঁদতে গয়না ফেলে দিচ্চেন, সে জায়গাটা যারা যারা শুনেচে চোখের জল রাখতে পারেনি, শ্রীকান্ত।

চোখের জল যে আমিই রাখিতে পারিব সে সম্ভাবনা কম। বলিলাম, কিন্তু—

গহর কহিল, আমাদের সেই বুড়ো নয়নচাঁদ চক্রবর্তীকে তোর মনে আছে ত, তার জ্বালায় আমি আর পারিনে। যখন-তখন এসে বলবে, গহর, সেইখানটা একবার পড় দেখি,

শুনি। বলে, বাবা, তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস্—তোর গায়ে আসল ব্রহ্মরক্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্চি।

নয়নচাঁদ নামটা খুব সচরাচর মেলে না, তাই মনে পড়িল। বাড়ি গহরদের গ্রামেই। জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই চক্কোত্তি বুড়ো ত? যার সঙ্গে তোমার বাবার লাঠালাঠি মালি-মোকদ্দমা চলছিল?

গহর বলিল, হাঁ, কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন—তার জমি, বাগান, পুকুর, মায় বাস্তুসমেত বাবা দেনার দায়ে নিলেম করে নিয়েছিল; আমি কিন্তু তার পুকুর আর ভিটেটা ফিরিয়ে দিয়েচি। ভারী গরীব—দিনরাত চোখের জল ফেলত, সে কি আর ভাল শ্রীকান্ত!

ভাল ত নয়ই। চক্রবর্তীর কাব্য-প্রীতিতে এমনি কিছু-একটা আন্দাজ করিতেছিলাম, বলিলাম, এখন চোখের জল ফেলা থেমেচে ত?

গহর কহিল, লোকটি কিন্তু সত্যিই ভালোমানুষ। দেনার জ্বালায় একসময়ে যা করেছিল অমন অনেকেই করে। ওর বাড়ির পাশেই বিঘে-দেড়েকের একটা আমবাগান আছে, তার প্রত্যেক গাছটাই চক্কোত্তির নিজের হাতে পোঁতা। নাতি-নাতনী অনেকগুলি, কিনে খাবার পয়সা নেই—তা ছাড়া আমার কেই-বা আছে, কেই-বা খাবে।

সে ঠিক। ওটাও ফিরিয়ে দাও গে।

দেওয়াই উচিত শ্রীকান্ত। চোখের সামনে আম পাকে, ছেলেপুলেগুলোর নিঃশ্বাস পড়ে—আমার ভারি দুঃখ হয় ভাই। আমের সময় আমার বাগানগুলো ত সব ব্যাপারীদের জমা করেই দিই—ও বাগানটা আর বিক্রি করিনে, বলি, চক্কোত্তিমশাই, তোমার নাতিরা যেন পেড়ে খায়। কি বলিস রে, ভালো না?

নিশ্চয়ই ভালো। মনে মনে বলিলাম, বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি যৎকিঞ্চিৎ গুছাইয়া লইতে পারে হানি কি? তা ছাড়া গহর কবি। কবি মানুষের অত বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগ্রাহী রসিক সুজনদের ভোগেই না লাগে?

চৈত্রের প্রায় মাঝামাঝি। গাড়ির কপাটটা গহর অকস্মাৎ শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, দক্ষিণে বাতাসটা টের পাচ্ছিস শ্রীকান্ত?

পাচ্চি।

গহর কহিল, বসন্তকে ডাক দিয়ে কবি বলেচেন, "আজ দখিন দুয়ার খোলা—"

কাঁচা মেঠো রাস্তা, এক ঝাপটা মলয়ানিল রাস্তার শুকনো ধুলা আর রাস্তায় রাখিল না, সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি বসন্তকে ডাকেন নি, তিনি বলেচেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ-দোর খোলা—সুতরাং গাড়ির দরজা বন্ধ না করলে হয়ত সে-ই এসে হাজির হবে।

গহর হাসিয়া কহিল, গিয়ে একবার দেখবি চল্। দুটো বাতাবি লেবুর গাছে ফুল ফুটেচে, আধক্রোশ থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সুমুখের জামগাছটা মাধবী ফুলে ভরে গেছে, তার একটা ডালে মালতীর লতা, ফুল এখনো ফোটেনি, কিন্তু থোপা থোপা কুঁড়ি। আমাদের চারিদিকেই ত আমের বাগান, এবার মৌলে মৌলে গাছ ছেয়ে গেলে, কাল সকালে দেখিস মৌমাছির মেলা। কত দোয়েল, কত বুলবুলি, আর কত কোকিলের গান। এখন জ্যোৎস্না রাত কিনা, তাই রাত্রিতেও কোকিলদের ডাকাডাকি থামে না। বাইরের ঘরের দক্ষিণের জানালাটা যদি খুলে রাখিস তোর দু'চোখে আর পলক পড়বে না। এবার কিন্তু সহজে ছেড়ে দিচ্চিনে ভাই, তা আগে থেকে বলে রাখচি। তা ছাড়া খাবার ভাবনাও নেই, চক্কোত্তিমশাই একবার খবর পেলে হয়, তোরে গুরুর আদর করবে।

তাহার আমন্ত্রণের অকপট আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলাম। কতকাল পরে দেখা কিন্তু ঠিক সেদিনের সে গহর—এতটুকু বদলায় নাই—তেমনি ছেলেমানুষ—তেমনি বন্ধু-সম্মিলনে তাহার অকৃত্রিম উল্লাসের ঘটা।

গহররা মুসলমান ফকির-সম্প্রদায়ের লোক। শুনিয়াছি তাহার পিতামহ বাউল, রাম-প্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। তাহার একটা পোষা শালিক পাখির

অলৌকিক সঙ্গীত-পারদর্শিতার কাহিনী তখনকার দিনে এদিকে প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তেজারতি ও পাটের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করিয়া ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, অথচ ছেলে পাইল না বাপের বিষয়-বুদ্ধি, পাইয়াছে ঠাকুর্দার কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ। সুতরাং, পিতার বহুশ্রমার্জিত জমিজমা চাষ-আবাদের শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহা শঙ্কা ও সন্দেহের বিষয়।

সে যাই হোক, বাড়িটা তাহাদের দেখিয়াছিলাম ছেলেবেলায়। ভালো মনে নাই। এখন হয়ত তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে কবির বাণী-সাধনার তপোবনে। আর একবার চোখে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল।

তাহাদের গ্রামের পথ আমাদের পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে পড়ে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে-পড়ার সঙ্গে আজকের চোখে-দেখার একেবারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম—অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এদিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লেকে জানে অনুযোগ-অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু 'পথকর' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে-পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ-সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।

সেই পথের বহুকাল-সঞ্চিত স্তূপীকৃত ধূলাবালির বাধা ঠেলিয়া গাড়ি আমাদের কেবলমাত্র চাবুকের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল, এমনি সময়ে গহর অকস্মাৎ উচ্চ-কোলাহলে ডাক দিয়া উঠিল, গাড়োয়ান, আর না, আর না—থামো, থামো—একদম রোকো।

সে এমন করিয়া উঠিল, যেন এ পাঞ্জাব-মেলের ব্যাপার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম-ব্রেক চক্ষের নিমিষে কসিতে না পারিলে সর্বনাশের সম্ভাবনা।

গাড়ি থামিল। বাঁ-হাতি পথটা তাহাদের গ্রামে ঢুকিবার। নামিয়া পড়িয়া গহর কহিল, নেমে আয় শ্রীকান্ত। আমি ব্যাগটা নিচ্ছি, তুই নে বিছানাটা,—চল।

গাড়ি বুঝি আর যাবে না?

না। দেখচিস্ নে পথ নেই!

তা বটে। দক্ষিণে ও বামে শিয়াকুল ও বেতসকুঞ্জের ঘন-সম্মিলিত শাখা-প্রশাখায় পল্লীবীথিকা অতিশয় সংকীর্ণ। গাড়ি ঢোকার প্রশ্নই অবৈধ, মানুষেও একটু সাবধানে কাত হইয়া না ঢুকিলে কাঁটায় জামা-কাপড়ের অপঘাত অনিবার্য। অতএব কবির মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য। সে ব্যাগটা কাঁধে করিল, আমি বিছানাটা বগলে চাপিয়া গোধূলিবেলায় গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম।

কবিগৃহে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুমান করিলাম আকাশে বসন্ত-রাত্রির চাঁদও উঠিয়াছে। তিথিটা ছিল বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি, অতএব আশা করিয়া রহিলাম, গভীর নিশীথে চন্দ্রদেব মাথার উপরে আসিলে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে। গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণুবন, খুব সম্ভব তাহার কোকিল, দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশ শিস দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ক অসংখ্য বেণুপত্ররাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান-আঙিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, দৃষ্টিমাত্রই ঝরাপাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্তে গর্জন করিয়া উঠে। চাকর আসিয়া বাহিরের ঘর খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, গহর তক্তপোশটা দেখাইয়া কহিল, তুই এই ঘরেই থাকবি। দেখিস কিরকম হাওয়া।

অসম্ভব নয়। দেখিলাম, দখিনা-বায়ে রাজ্যের শুকনা লতাপাতা গবাক্ষপথে ভিতরে ঢুকিয়া ঘর ভরিয়াছে, তক্তপোশ ভরিয়াছে, মেঝেতে পা ফেলিতে গা ছমছম করে। খাটের পায়ার কাছে ইঁদুরে গর্ত খুঁড়িয়া একরাশ মাটি তুলিয়াছে, দেখাইয়া বলিলাম, গহর, এ ঘরে কি তোমরা ঢোকো না?

গহর বলিল, না, দরকারই হয় না। আমি ভেতরেই থাকি। কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।

তা যেন দিলে, কিন্তু গর্তটায় সাপ থাকতে পারে ত?

চাকরটা বলিল, দুটো ছিল, আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বার হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে জানলে মিঞা?

গহর হাসিয়া কহিল, ও মিঞা নয়, ও আমাদের নবীন। বাবার আমলের লোক। গরুবাছুর চাষবাস দেখে, বাড়ি আগলায়। আমাদের কোথায় কি আছে না আছে সব জানে।

নবীন হিন্দু বাঙ্গালীও বটে, পৈতৃককালের লোকও বটে। এই পরিবারের গরুবাছুর চাষবাস হইতে বাড়িঘরদোরের অনেক কিছু জানাও তাহার অসম্ভব নয়, তথাপি সাপের সম্বন্ধে ইহার মুখের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ইহাদের বাড়িসুদ্ধ সকলকে দখিনা হাওয়ায় পাইয়া বসিয়াছে। ভাবিলাম, হাওয়ার লোভে সর্পযুগলের বহির্গমন আশ্চর্য নয় মানি, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ?

গহর বুঝিল আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই, কহিল, তুই ত থাকবি খাটে, তোর ভয়টা কিসের? তা ছাড়া ওঁরা থাকেন না আর কোথায়? কপালে লেখা থাকলে রাজা পরীক্ষিৎও নিস্তার পান না—আমরা ত তুচ্ছ। নবীন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে খালের মুখে একটা ইট চাপা দিয়ে দিস্। ভুলিস্ নে। কিন্তু কি খাবি বল্ ত শ্রীকান্ত?

বলিলাম, যা জোটে।

নবীন কহিল, দুধ মুড়ি আর ভালো আখের গুড় আছে। আজকের মত যোগাড়—

বলিলাম, খুব খুব, এ বাড়িতে ও জিনিসের আমার অভ্যাস আছে। আর কিছু যোগাড়ের দরকার নেই বাবা, তুমি বরঞ্চ আস্তো দেখে একখানা ইট যোগাড় করে আনো। গর্তটা একটু মজবুত করে চাপা দাও—দখিনে বাতাসে ভরপুর হয়ে ওঁরা যখন ঘরে ফিরবেন তখন হঠাৎ না ঢুকে পড়তে পারেন।

নবীন আলো দিয়া চৌকির তলায় কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল, নাঃ—হবে না।

কি হবে না হে?

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হবে না। খালের মুখ কি একটা বাবু? এক পাঁজা ইট চাই যে। ইঁদুরে মেঝেটা একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেচে।

গহর বিশেষ বিচলিত হইল না, শুধু লোক লাগাইয়া কাল নিশ্চয় ঠিক করিয়া ফেলিতে হুকুম করিয়া দিল।

নবীন হাত-পা ধুইবার জল দিয়া ফলারের আয়োজনে ভিতরে চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খাবে গহর?

আমি? আমার এক বুড়ো মাসী আছেন, তিনিই রান্না করেন। সে যাক, খাওয়া-দাওয়া চুকলে লেখাগুলো তোরে পড়ে শোনাব।

সে আপন কাব্যের অনুধ্যানেই মগ্ন ছিল, অতিথির সুখ-সুবিধার কথা হয়ত চিন্তাও করে নাই, কহিল, বিছানাটা পেতে ফেলি, কি বল? রাত্তিরে দু'জনে একসঙ্গেই থাকব, কেমন?

এ আর এক বিপদ। বলিলাম, না ভাই গহর, তুমি তোমার ঘরে শোও গে, আজ আমি বড় ক্লান্ত, বই তোমার কাল সকালে শুনব।

কাল সকালে? তখন কি সময় হবে?

নিশ্চয় হবে।

গহর চুপ করিয়া একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, কিংবা একটা কাজ করলে হয় না শ্রীকান্ত? আমি পড়ে যাই, তুমি শুয়ে শুয়ে শোনো। ঘুমিয়ে পড়লেই আমি উঠে যাবো, কি বলো? এই বেশ মতলব,—না?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম, না ভাই গহর, তাতে তোমার বইয়ের মর্যাদা নষ্ট হবে। কাল আমি সমস্ত মন দিয়ে শুনব।

গহর ক্ষুণ্ণমুখে বিদায় লইল। কিন্তু বিদায় করিয়া নিজের মনটাও প্রসন্ন হইল না।

এই এক পাগল! ইতিপূর্বে ইশারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিলাম তাহার কাব্যগ্রন্থ সে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে চায়। মনে আশা, সংসারে একটা নূতন সাড়া পড়িবে। সে লেখাপড়া

বেশি করে নাই, পাঠশালায় ও স্কুলে সামান্য একটু বাঙলা ও ইংরাজি শিখিয়াছিল মাত্র। মনও ছিল না, বোধ হয় সময়ও পায় নাই! কবে কোন্ শৈশবে সে কবিতা ভালোবাসিয়াছে, হয়ত এ মুগ্ধতা তাহার শিরার রক্তে প্রবহমান, তারপরে জগতের বাকী সব-কিছুই তাহার চক্ষে অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। নিজের অনেক রচনাই তাহার মুখস্থ, গাড়িতে বসিয়া গুন-গুন করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বাগ্দেবী তাঁহার স্বর্ণপদ্মের একটি পাপড়ি খসাইয়াও এই অক্ষম ভক্তটিকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন। কিন্তু অক্লান্ত আরাধনার একাগ্র আত্মনিবেদনে এ বেচারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, বারো বৎসর পরে এই দেখা। এই দ্বাদশ-বর্ষ ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কথার পরে কথা গাঁথিয়া শ্লোকের পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এ-সব কোন্ কাজে লাগিবে? কাজেও লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকোয়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।

অতি প্রত্যুষেই ডাকাডাকি করিয়া গহর আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল; তখন হয়ত সবে সাতটা বাজিয়াছে, কিংবা বাজেও নাই। তাহার ইচ্ছা বসন্তদিনের বঙ্গের নিভৃত পল্লীর অপরূপ শোভাসৌন্দর্য স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হই। তাহার ভাবটা এমনি, যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্ষ্যাপার মত, অনুরোধ এড়াইবার জো নাই, অতএব হাত-মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। প্রাচীরের গায়ে আধমরা একটা জামগাছের অর্ধেকটায় মাধবী ও অর্ধেকটায় মালতীলতা—কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অত্যন্ত নির্জীব চেহারা—তথাপি একটায় গোটাকয়েক ফুল ফুটিয়াছে, অপরটায় সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে। তাহার ইচ্ছা গোটাকয়েক ফুল আমাকে উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাঠপিঁপড়া যে ছোঁবার জো নাই। সে এই বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল যে, আর একটু বেলা হইলে আঁকশি দিয়া অনায়াসে পাড়াইয়া দিতে পারিবে।—আচ্ছা, চলো।

নবীন প্রাতঃক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ সুনির্বাহের উদ্যোগপর্বে দম ভরিয়া তামাক টানিয়া প্রবল-বেগে কাশিতেছিল, থুথু ফেলিয়া ঢোক গিলিয়া অনেকটা সামলাইয়া লইয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, বনেবাদাড়ে মেলাই যাবেন না বলে দিচ্ছি।

গহর বিরক্ত হইয়া উঠিল—কেন রে?

নবীন জবাব দিল, গোটা দুত্তিন শিয়াল ক্ষেপেচে—গরু-মনিষ্যি একসাই কামড়ে বেড়াচ্চে।

আমি সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলাম।—কোথায় হে নবীন?

কোথায় সে কি দেখে রেখেচি? আছেই কোন্ ঠাঁই ঝোপেঝাড়ে। যান ত একটু চোখ রেখে চলবেন।

তাহলে কাজ নেই ভাই গহর।

বাঃ রে! এই সময়টায় শিয়াল-কুকুর একটু ক্ষেপেই, তা বলে লোকজন রাস্তায় চলবে না নাকি? বেশ ত!

এও দখিনা হাওয়ার ব্যাপার। অতএব, প্রকৃতির শোভা দেখিতে সঙ্গে যাইতেই হইল, পথের দু'ধারে আমবাগান। কাছে আসিতেই অগণিত ছোট ছোট পোকা চড়চড় পটপট শব্দে আম্রমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চটচটে আঠার মত হইয়াছে, সেগুলা জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটুগাছের কুঞ্জ, মুকুলিত বিকশিত পুষ্পসম্ভারে একান্ত নিবিড়। মনে পড়িয়া গেল নবীনের সতর্কবাণী। গহরের মতে কালটা ক্ষেপিবার উপযোগী। সুতরাং ঘেঁটুফুলের শোভা সময়মত আর একদিন নাহয় উপভোগ করা যাইবে, আজ গহর ও আমি, অর্থাৎ নবীনের 'গরু-মনিষ্যি' একটু দ্রুতপদেই স্থান-ত্যাগ করিলাম।

বলিয়াছি আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদেরও গ্রামপ্রান্তে প্রবাহিত। বর্ষার পরিস্ফীত জলধারা বসন্তসমাগমে একান্ত শীর্ণ, সেদিনের স্রোতশ্চালিত অপরিমেয় পানা ও শৈবাল আজ শুষ্ক তটভূমিতে পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। পরপারে দূরে কয়েকটা শিমুলগাছে অজস্র রাঙ্গা ফুল ফুটিয়া আছে চোখে পড়িল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা কবির কাছেও এখন যেন বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকিল। বলিল, চল্, ঘরে ফিরি।

তাই চলো।

আমি ভেবেছিলাম তোর এ-সব ভালো লাগবে।

বলিলাম, লাগবে ভাই লাগবে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এ-সব তুমি কবিতায় লিখো, পড়ে আমি খুশিই হবো।

তাই বোধ হয় গাঁয়ের লোক ফিরেও চায় না।

না। দেখে দেখে তাদের অরুচি ধরে গেছে। চোখের রুচি আব কানের রুচি এক নয় ভাই। যারা মনে করে কবির বর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে মোহিত হয়ে যায়, তারা জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাপারই তাই। চোখে যা সাধারণ ঘটনা, হয়ত-বা সামান্য সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন সৃষ্টি। তুমি দেখতে পাও সেও সত্যি, আমি যে দেখতে পেলাম না সেও সত্যি। এর জন্যে তুমি দুঃখ করো না গহর।

তবুও ফিরিবার পথে সে কত কি যে আমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিল তাহার সংখ্যা নাই। পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম পর্যন্ত যেন তাহার চেনা। কি একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধ হয় ঔষধের প্রয়োজনে চাঁচিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনও আঠা ঝরিতেছে, গহর হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল—অন্তরে সে যে কি বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। চক্রবর্তী যে তাহার সমুদয় হারানো বিষয় ফিরিয়া পাইতেছিল, সে কেবল কৌশল বিস্তার করিয়া নয়—তাহার হেতু ছিল গহরের নিজেরই স্বভাবের মধ্যে। ব্রাহ্মণের প্রতি অনেকখানি ক্রোধ আমার আপনিই পড়িয়া গেল। চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না, কারণ, শোনা গেল তাঁহার গৃহে গুটি-দুই নাতির 'মায়ের অনুগ্রহ'-দেখা গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ওলাবিবি এখনো দেখা দেন নাই—পচা পুকুরের জল আর একটু শুকাইবার অপেক্ষায় আছেন।

সে যাই হোক, বাড়িতে ফিরিয়া গহর তাহার পুঁথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেও, তাহা অত্যন্ত বিরল। বলিল, না পড়া হলে কিন্তু ছাড়া পাবে না, শ্রীকান্ত। সত্যি করে তোমাকে মত দিতে হবে।

এ আশঙ্কা ছিলই। স্পষ্ট করিয়া রাজী হইতে পারি এ সাহস ছিল না, তথাপি দিনের পর দিন করিয়া কবির বাটীতে কাব্য-আলোচনায় এ যাত্রায় আমার সাতদিন কাটিল। কাব্যের কথা থাক কিন্তু নিবিড় সাহচর্যে মানুষটির যে পরিচয় পাইলাম তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি বিস্ময়কর।

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্মায় গিয়ে। আমাদের দু'জনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দু'ভায়ে এখানেই একসঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

হাসিয়া বলিলাম, আমি ত তোমার মত কবি নই ভাই, গাছপালার ভাষাই বুঝিনে, তাদের সঙ্গে কথা কইতেও পারিনে, পারব কেন এই বনের মধ্যে বাস করতে? দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠবো যে!

গহর গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, আমি কিন্তু সত্যিই ওদের ভাষা বুঝি, ওরা সত্যিই কথা কয়—তোরা পারিস নে বিশ্বাস করতে?

বলিলাম, বিশ্বাস করা যে শক্ত এটা তুমিও ত বোঝো!

গহর সহজেই স্বীকার করিয়া লইল; কহিল, হাঁ তাও বুঝি।

একদিন সকালে তাহার রামায়ণের অশোকবনের অধ্যায়টা কিছুক্ষণ পড়ার পরে সে

হঠাৎ বই মুড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা শ্রীকান্ত, তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলি?

. কাল অনেক রাত্রি জাগিয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত আমার এই শেষ চিঠিই লিখিয়াছিলাম। ঠাকুর্দার কথা, পুটুর কথা, তাহার দুর্ভাগ্যের বিবরণ সমস্তই তাহাতে ছিল। তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলাম একজনের অনুমতি চাহিয়া লইব—সে ভিক্ষাও তাহাতে ছিল। পাঠান হয় নাই, চিঠিটা তখনও আমার পকেটে পড়িয়া। গহরের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালোবাসিস, যদি কখনো সেদিন আসে, আমাকে জানাস শ্রীকান্ত।

জেনে তোমার কি হবে?

কিছুই না। তখন শুধু তোদের মধ্যে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আসব।

আচ্ছা।

আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে খবর দিস। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে, সে আমার কাজে লাগল না—কিন্তু তোদের হয়ত কাজে লেগে যাবে।

তাহার বলার ধরনটা এমনি যে, শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পড়িতে চায়। বলিলাম, আচ্ছা, তাও জানাব। কিন্তু আশীর্বাদ ক'রো সে প্রয়োজন যেন না হয়।

আবার যাবার দিনে গহর পুনরায় আমার ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইল। প্রয়োজন ছিল না, নবীন ত লজ্জায় প্রায় আধমরা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কানও দিল না। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া সে মেয়েমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার মাথার দিব্যি রইল শ্রীকান্ত, চলে যাবার আগে আবার একদিন এসো, যেন আর একবার দেখা হয়।

আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কথা দিলাম দেখা করিতে আবার আসিব।

কলকাতায় পৌঁছে কুশল সংবাদ দেবে বলো?

এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। যেন কত দূরেই না চলিয়াছি।

কলিকাতার বাসায় গিয়া যখন পেঁৗছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। চৌকাঠে পা দিয়াই যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল সে আর কেহ নহে, স্বয়ং রতন।

এ কি রে, তুই যে?

হ্যাঁ, আমিই। কাল থেকে বসে আছি—একখানা চিঠি আছে।

বুঝিলাম সেই প্রার্থনার উত্তর। কহিলাম, চিঠি ডাকে দিলেও ত আসত?

রতন বলিল, সে ব্যবস্থা চাষাভুষো মুটেমজুর গেরস্ত লোকদের জন্য। মার চিঠি একটা লোক না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে পাঁচ শ মাইল ছুটে হাতে করে না আনলে খোয়া যায়। জানেন ত সব, কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছেন।

পরে শুনিয়াছিলাম রতনের এ অভিযোগ মিথ্যা। কারণ সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া এ চিঠি হাতে করিয়া আনিয়াছে। এখন মনে হইল গাড়ির ভিড়ে ও আহারাদির অব্যবস্থায় তাহার মেজাজ বিগড়াইয়াছে! হাসিয়া কহিলাম, উপরে আয়। চিঠি পরে হবে, চল তোর খাবার জোগাড়টা আগে করে দিই গে।

রতন পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, চলুন।

তিন

সশব্দ উদ্গারে চমকিত করিয়া রতন দেখা দিল।

কি রতন, পেট ভরলো?

আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি যাই বলুন বাবু, আমাদের কলকাতায় বাঙালী বামুনঠাকুর ছাড়া রান্নার কেউ কিছু জানে না। ওদের ঐসব মেড়ুয়া মহারাজগুলোকে ত জানোয়ার বললেই হয়।

উভয় প্রদেশের রান্নার ভালমন্দ, অথবা পাচকের শিল্পনৈপুণ্য লইয়া রতনের সঙ্গে

কখনো তর্ক করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। কিন্তু রতনকে যতদূর জানি তাহাতে বুঝিলাম সুপ্রচুর ভোজনে সে পরিতুষ্ট হইয়াছে। না হইলে পশ্চিমা পাচকদের সম্বন্ধে এমন নিরপেক্ষ সুবিচার করিতে পারিত না। কহিল, গাড়ির ধকলটা ত সামান্য নয়, একটু আড়মোড়া ভেঙ্গে গড়িয়ে না নিলে—

বেশ ত রতন, ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, একটা বিছানা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে। কাল সব কথা হবে।

কি জানি কেন, চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা ছিল না। মনে হইতেছিল, সে যাহা লিখিয়াছে তাহা ত জানিই।

রতন ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। আগাগোড়া গালা দিয়া শিলমোহর করা। বলিল, বারান্দার ঐ দক্ষিণের জানালার ধারে বিছানাটা পেতে ফেলি, মশারি খাটাবার হাঙ্গামা নেই,—কলকাতা ছাড়া এমন সুখ কি আর কোথাও আছে! যাই--

কিন্তু খবর সব ভাল ত রতন?

রতন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, তাই ত দেখাস। গুরুদেবের কৃপায় বাড়ির বাইরেটা গুলজার, ভেতরে দাসদাসী, বঙ্কুবাবু, নতুন বৌমা এসে ঘরদোর আলো করেছেন, আর সবার ওপরে স্বয়ং মা আছেন যে বাড়ির গিন্নী—এমন সংসারকে নিন্দে করবে কে? আমি কিন্তু অনেক কালের চাকর, জাতে নাপতে--রত্নাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই ত সেদিন ইস্টিশনে চোখের জল সামলাতে পারিনি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি, আপনার সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্মে পতিত হবো না।

কিছুই বুঝিলাম না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, বঙ্কুবাবুর বয়সও হ'ল, যা হোক একটু বিদ্যেসিদ্যে শিখে মানুষও হয়েছেন। ভাবচেন বোধ হয় কিসের জন্য আর পরবশে থাকা? দানপত্রের জোরে মেরে ত সব নিয়েছেন। মোটামুটি যে বেশ কিছু মেরেচেন তা মানি, কিন্তু সে কতক্ষণ বাবু?

স্পষ্ট এখনও হইল না, কিন্তু একটা আবছায়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, স্বচক্ষেই ত দেখেছেন মাসে অন্ততঃ দুবার করে আমার চাকরি যায়। অবস্থা মন্দ নয়, রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাইনে কেন? পারিনে। এটুকু জানি, যাঁর দয়ায় হয়েচে তাঁর একটা নিশ্বাসেই আশ্বিনের মেঘের মত সমস্ত উবে যাবে, চোখের পাতা ফেলবার সময় দেবে না। ও তো মায়ের রাগ নয়, ও আমার দেবতার আশীর্বাদ।

এখানে পাঠককে একটু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, রতন ছেলেবেলায় কিছু-কাল প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়াছিল।

একটু থামিয়া কহিল, মায়ের বারণ তাই কখনো বলিনে। ঘরে যা-কিছু ছিল খুড়োরা ঠকিয়ে নিলে, একঘর যজমান পর্যন্ত দিলে না। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বার হলাম, কিন্তু পূর্বজন্মের তপিস্যে ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরি জুটে গেল। সমস্ত দুঃখই শুনলেন, কিন্তু কিছুই তখন বললেন না। বছরখানেক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিনকয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আবার আসবি ত? যাবার দিনে হাতে একটা পুঁটুলি গুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিস নে বাবা, যা তোর গেছে এই দিয়ে ফিরিয়ে নি গে যা। খুলে দেখি পাঁচ শ' টাকা। প্রথমে নিজের চোখ-দুটোকেই বিশ্বাস হ'ল না, ভয় হল বুঝি-বা জেগে জেগেই স্বপন দেখচি। আমার সেই মাকেই বঙ্কুবাবু এখন ব্যাঁকাট্যারা কথা কয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজগজ করে। ভাবি, এর আর বেশি দিন নয়, মা লক্ষ্মী টললেন বলে।

আমি এ আশঙ্কা করি নাই, নিরুত্তরে শুনিতে লাগিলাম।

মনে হইল রতন কিছুদিন হইতেই ক্রোধে ও ক্ষোভে ফুলিতেছে। কহিল, মা যখন দেন দু'হাতে ঢেলে দেন। বঙ্কুকেও দিয়েচেন। তাই ও ভেবেচে নেঙড়ানো মৌচাকের আর

দাম কি, বড়জোর এখন জ্বালানোই চলে। তাই ওর এত অগ্রাহ্য। মুখ্যু জানে না যে, আজও মায়ের একখানা গয়না বিক্রি করলে অমন পাঁচখানা বাড়ি তৈরি হয়।

আমিও জানিতাম না। হাসিয়া বলিলাম, তাই নাকি? কিন্তু সে-সব আছে কোথায়?

রতন হাসিল, কহিল, আছে তাঁরই কাছে। মা অত বোকা নন। এক আপনার পায়েই সমস্ত উজোড় করে দিয়ে তিনি ভিখিরী হতে পারেন, কিন্তু আর কারও জন্যে নয়। বঙ্কু জানে না যে, আপনি বেঁচে থাকতে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর রতন বেঁচে থাকতে তাঁর চাকরের ভাবনা হবে না। সেদিন কাশী থেকে আপনার অমনি করে চলে আসা যে মা'র বুকে কি শেল বিঁধেচে, বঙ্কুবাবু তার কি খবর রাখে? গুরুঠাকুরই বা তার সন্ধান পাবে কোথায়?

কিন্তু আমাকে যে তিনি নিজেই বিদায় করেচেন, এ খবর ত তুমি জান রতন?

রতন জিভ কাটিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এতটা বিনয় কখনো তাহার পূর্বে দেখি নাই। বলিল, আমরা চাকরবাকর বাবু, এ-সব কথা আমাদের কানেও শুনতে নাই। ও মিথ্যে।

রতন আড়মোড়া ভাঙিয়া একটু গড়াইয়া লইতে প্রস্থান করিল। বোধ করি কাল আটটার পূর্বে আর তার দেহটা 'ধাতে' আসিবে না।

দুটো বড় খবর পাওয়া গেল। একটা এই যে, বঙ্কু বড় হইয়াছে। পাটনায় যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন বয়স তাহার ষোল-সতেরো। এখন একুশ বৎসরের যুবক। উপরন্তু এই পাঁচ-ছয় বৎসরের ব্যবধানে সে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শৈশবের এই সকৃতজ্ঞ স্নেহ যদি আজ যৌবনের আত্মসম্মানবোধে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে, বিস্ময়ের কি আছে?

দ্বিতীয় সংবাদ—না বঙ্কু, না গুরুদেব, রাজলক্ষ্মীর গভীরতম বেদনার কোনও সন্ধান আজও তাঁহাদের জানা নাই।

মনের মধ্যে এই কথা-দুটাই বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সযত্ন-অঙ্কিত শিলমোহরের গালার ছাপগুলা দেখিয়া লইয়া চিঠি খুলিলাম।

তাহার হাতের লেখা বেশি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু স্মরণ হইল হস্তাক্ষর দুষ্পাঠ্য না হইলেও ভাল নয়। কিন্তু এই পত্রখানি সে অত্যন্ত সাবধানে লিখিযাছে, বোধ হয়, তাহার ভয়, বিরক্ত হইয়া আমি না ফেলিয়া রাখি। যেন আগাগোড়া সবটুকুই সহজে পড়িতে পারি।

আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে যুগের মানুষ। প্রণয়-নিবেদন আতিশয্য ত দূরের কথা, 'ভালবাসি' এমন কথাও কখনো সুমুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে লিখিয়াছে চিঠি—আমার প্রার্থনার অনুকূলে অনুমতি দিয়া। তবু কি-জানি কি আছে, পড়িতে কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সেদিন তাহার পড়াশুনা সাঙ্গ হইয়াছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পরবর্তীকালে ঘরে বসিয়া হয়ত সামান্য কিছু বিদ্যাচর্চা করিয়া থাকিবে। অতএব, ভাষাব ইন্দ্রজাল, শব্দের ঝঙ্কার, পদবিন্যাসের মাধুরী তাহার পত্রের মধ্যে আশা করা অন্যায়। সর্বদা প্রচলিত সামান্য গোটা-কয়েক কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর সে কি করিবে? একটা অনুমতি দিয়া মামুলি শুভকামনা করিয়া দু ছত্র লেখা—এই ত? কিন্তু খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের কিছুই আর মনে রহিল না। পত্র দীর্ঘ নয়, কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গি যত সহজ ও সরল ভাবিয়াছিলাম তাহাও নয়। আমার আবেদনের উত্তর সে এইরূপ দিয়াছে—

কাশীধাম

প্রণামান্তে সেবিকার নিবেদন—

তোমার চিঠিখানা এইবার নিয়ে এক শ' বার পড়লুম। তবু ভেবে পেলুম না তুমি ক্ষেপেচ না আমি ক্ষেপেচি। ভেবেচো, বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই, বিদায়

দেবার কর্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নেই।

ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন্ শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত ঝরে পড়তো, রাঙ্গামালার সে রাঙ্গা-রং তুমি চিনতে পারনি, বালিকার পূজোর অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায় তোমারি বুকের 'পরে রক্তরেখায় যে লেখা এঁকে দিত সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁর চোখে সংসারের কিছুই বাদ পড়ে না আমার সে নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তার পরে এলো দুর্যোগের রাত, কালো মেঘে দিলে আমার আকাশের জ্যোৎস্না ঢেকে। কিন্তু সে সত্যিই আমি না আর কেউ, এ জীবনে যথার্থই ও-সব ঘটেছিল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেচি, ভাবতে গিয়ে অনেক সময় ভয় হয় বুঝি-বা আমি পাগল হয়ে যাব। তখন সমস্ত ভুলে যাঁকে ধ্যান করতে বসি তাঁর নাম বলা চলে না। কাউকে বলতেও নেই। তাঁর ক্ষমাই আমার জগদীশ্বরের ক্ষমা। এতে ভুল নেই, সন্দেহ নেই, এখানে আমি নির্ভয়।

হাঁ, বলছিলুম, তার পরে, এলো আমার দুর্দিনের রাত্রি কলঙ্কে দিলে দু'চোখের সকল আলো নিবিয়ে। কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকী নেই?

আছে। অব্যাহত অপরাধের মাঝে মাঝে তাকে আমি বার বার দেখতে পেয়েচি। তাই যদি না হ'তো, বিগত দিনের রাক্ষসটা যদি আমার অনাগতর সমস্ত মঙ্গলকে নিঃশেষে গিলে খেতো, তবে তোমাকে ফিরে পেতুম কি করে? আমার হাতে এনে আবার তোমাকে দিয়ে যেতো কে?

আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায় আমাকে তা সাজে না। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে আজ যৌবনের দাবি আর করিনে! আমাকে তুমি ভুল বুঝো না—যত অধমই হই, ও-কথা যদি ঘৃণাক্ষরেও তোমার মনে আসে তার বাড়া লজ্জা আমার নেই। বঙ্কু বেঁচে থাক, সে বড় হয়েছে, তার বৌ এসেছে—তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে বার হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইব কি করে?

যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে—পুঁটু? আর আমি ফিরে আসব তোমার বাড়ির বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তার পরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?

হয়ত প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাব? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার। তবে নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না,- কিন্তু ঋণটা অস্বীকার ক'রো না যেন।

তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছ শুধু ভার বোঝা। এমনিই অন্ধ তোমরা।

জিজ্ঞেস করি, তোমাকে ত ফিরে পেয়েছিলুম আমার তেইশ বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায়? তুমি এত ভাবতে পার, আর এটা ভাবতে পারো না?

আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ কেন জানো? স্বর্গের জন্যে নয়, সে আমি চাইনে। আমার কামনা মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো তার মানে কি?

ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে,—তাকে নির্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ত থাকলো আমার জপতপ পূজা-অর্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব।

স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাইনে। কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি করে থাকো, সে বুদ্ধি ত্যাগ ক'রো। তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও নিতে পারবো না। আমাকে জানো বলেই জানিয়ে দিলুম যে-সূর্য অস্ত যাবে তার পুনরুদয়ের অপেক্ষায় বসে থাকার আমার আর সময় হবে না। ইতি—

রাজলক্ষ্মী

বাঁচা গেল। সুনিশ্চিত কঠোর অনুশাসনের চরম লিপি পাঠাইয়া একটা দিকে আমাকে সে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। এ জীবনে ও ব্যাপার লইয়া ভাবিবার আর কিছু রহিল না। কিন্তু কি করিতে পারিব না তাহাই নিঃসংশয়ে জানিলাম, কিন্তু অতঃপর কি আমাকে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী একেবারে নির্বাক। হয়ত উপদেশ দিয়া আর একদিন চিঠি লিখিবে, কিংবা আমাকেই সশরীরে তলব করিয়া পাঠাইবে, কিন্তু আপাততঃ ব্যবস্থা যাহা হইল তাহা অত্যন্ত চমৎকার। এদিকে ঠাকুর্দা মহাশয় সম্ভবতঃ কাল সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন; ভরসা দিয়া আসিয়াছি চিন্তার হেতু নাই, অনুমতি পাওয়ায় বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু যাহা আসিয়া পৌঁছিল তাহা নির্বিঘ্ন অনুমতিই বটে! রতন নাপিতের হাতে সে যে চেলি এবং টোপর পাঠায় নাই এই ঢের।

ও-পক্ষে দেশের বাটীতে বিবাহের আয়োজন নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে। পুঁটুর আত্মীয়-স্বজনও কেহ কেহ হযত আসিয়া হাজির হইতেছে এবং প্রাপ্তবয়স্কা অপরাধী মেয়েটা হয়ত এতদিনে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পরিবর্তে একটুখানি সমাদরের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। ঠাকুর্দাকে কি বলিব জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সেই কথাটা বলিব ইহাই ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহার নির্মম তাগাদা ও লজ্জাহীন যুক্তি ও ওকালতি মনে মনে আলোচনা করিয়া অন্তরটা একদিকে যেমন তিক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ব্যর্থ প্রত্যাবর্তনের নিরাশায় ক্ষিপ্ত পরিজনগণের ঐ দুর্ভাগা মেয়েটাকে অধিকতর উৎপীড়নের কথা মনে করিয়াও হৃদয় তেমনি ব্যথিত হইয়া আসিল। কিন্তু উপায় কি? বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। পুঁটুর কথা ভুলিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল গঙ্গামাটির কথা। জনবিরল সেই ক্ষুদ্র পল্লীস্মৃতি কোনদিন মুছিবার নয়। এ জীবনের গঙ্গা-যমুনাধারা একদিন এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে এবং স্বল্পকাল পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া আবার একদিন এইখানেই বিযুক্ত হইয়াছে। একত্রবাসের সেই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি শ্রদ্ধায় গভীর, স্নেহে মধুর, আনন্দে উজ্জ্বল, আবার তাদের মতই নিঃশব্দ বেদনায় নিরতিশয় স্তব্ধ। বিচ্ছেদের দিনেও আমরা প্রবঞ্চনার পরিবাদে কেহ কাহাকেও কলঙ্ক-লিপ্ত করি নাই, লাভ-ক্ষতির নিষ্ফল বাদপ্রতিবাদে গঙ্গামাটির শান্ত গৃহখানিকে আমরা ধূমাচ্ছন্ন করিয়া আসি নাই। সেখানের সবাই জানে আবার একদিন আমরা ফিরিয়া আসিব, আবার শুরু হইবে আমোদ-আহ্লাদ, শুরু হইবে ভূস্বামিনীর দীনদরিদ্রের সেবা ও সৎকার। কিন্তু সে সম্ভাবনা যে শেষ হইয়াছে, প্রভাতের বিকশিত মল্লিকা দিনান্তের শাসন মানিয়া লইয়া নীরব হইয়াছে, এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না।

চোখে ঘুম নাই, বিনিদ্র রজনী ভোরের দিকে যতই গড়াইয়া আসিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ রাত্রি যেন না পোহায়। এই একটিমাত্র চিন্তাই এমনি করিয়া যেন আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বিগত কাহিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে, বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ কুটীরখানি মনের উপর ভূতের মত চাপিয়া বসে, অনুক্ষণ গৃহকর্মে নিযুক্তা রাজলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হাত-দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ জীবনে পরিতৃপ্তির আস্বাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই। কিন্তু আজ ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কোথায়। সে জানে আমি সুস্থ নই, যে-কোনদিন অসুখে পড়িতে পারি, তখন কোথাকার কে এক পুঁটু আমাকে ঘিরিয়া শয্যা জুড়িয়া বসিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর কোনো কর্তৃত্বই নাই, এতবড় দুর্ঘটনা মনের মধ্যে সে ঠাঁই দিতে পারে না। সংসারের সব-কিছু হইতেই নিজেকে সে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু এ বস্তু অসম্ভব,—এ তাহার অসাধ্য। মরণ তুচ্ছ এর কাছে, রহিল তাহার গুরুদেব, রহিল তাহার জপতপ ব্রত-উপবাস। সে মিথ্যা ভয় আমাকে চিঠির মধ্যে দেখায় নাই।

ভোরের সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, রতনের ডাকে যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা হইয়াছে। সে কহিল, কে একটি বুড়ো ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ি করে এইমাত্র এলেন।

এ ঠাকুর্দা। কিন্তু গাড়ি ভাড়া করিয়া? সন্দেহ জন্মিল।

রতন কহিল, সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে আছে।

এ পুঁটু। এই নির্লজ্জ মানুষটা তাহাকে কলিকাতার বাসায় পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। সকালের আলো তিক্ততায় ম্লান হইয়া উঠিল। বলিলাম, তাঁদের এই ঘরে এনে বসাও রতন আমি মুখহাত ধুয়ে আসচি, এই বলিয়া নীচে স্নানের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর্দাই আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, যেন আমিই অতিথি,—এসো দাদা, এসো। শরীরটা বেশ ভালো ত?

আমি প্রণাম করিলাম। ঠাকুর্দা হাঁকিলেন, পুঁটু গেলি কোথায়?

পুঁটু জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল।

ঠাকুর্দা কহিলেন, ওর পিসিমা বিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়। পিসেমশাই হাকিম—পাঁচ শ' টাকা মাইনে। ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হয়ে এসেছে—ঘর-সংসার ফেলে পিসির বার হবার জো নেই, তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম, বললুম, পরের হাতে তুলে দেবার আগে ওকে একবার দেখিয়ে আনি গে। ওর দিদিমা আশীর্বাদ করে বললে, পুঁটি এমনি অদৃষ্ট যেন তোরও হয়।

আমি কিছু বলিবার পূর্বে নিজেই বলিলেন, আমি কিন্তু সহজে ছাড়চি নে ভায়া। হাকিমই হোন আর যেই হোন, আত্মীয় ত—দাঁড়িয়ে থেকে কাজটি সমাধা করে দিতে হবে—তবে তাঁর ছুটি। জানোই তো দাদা, শুভকর্মে বহু বিঘ্ন—শাস্ত্রে কি যে বলে—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি,—অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকলে কারুর টুঁ-শব্দ করবার ভরসা হবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে ত বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে। কিন্তু হাকিম কিনা, ওদের বাশই আলাদা।

পুঁটুর পিসেমশাই হাকিম। খবরটা অবান্তর নয়—তাৎপর্য আছে।

নতুন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া রতন সযত্নে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, ঠাকুর্দা ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্চে না?

রতন তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে হাঁ দেখেচেন বৈ কি। দেশের বাড়িতে বাবুর অসুখের সময়ে।

ওঃ—তাই ত বলি। চেনা মুখ!

আজ্ঞে হাঁ। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

ঠাকুর্দার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত লোক, বোধ হয় সমস্ত কথাই তাঁহার স্মরণ হইল। নীরবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেরুবার সময়ে দিনটা দেখিয়ে এসেছিলাম, বেশ ভালো দিন, আমার ইচ্ছে আশীর্বাদের কাজটা অমনি সেরে রেখে যাই। নতুনবাজারে সমস্ত কিনতে পাওয়া যায়, চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না? কি বলো?

কিছুতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কোনমতে শুধু বলিয়া ফেলিলাম, না।

না? না কেন? বেলা বারটা পর্যন্ত দিনটা ত বেশ ভাল। পাঁজি আছে?

বলিলাম, পাঁজির দরকার নেই। বিবাহ আমি করতে পারব না।

ঠাকুর্দা হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। গলাটা বেশ শান্ত ও গম্ভীর করিয়া কহিলেন, উদ্যোগ-আয়োজন একরকম সম্পূর্ণ বললেই হয়। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার ত নয়—কথা দিয়ে এসে এখন না বললে চলবে কেন?

পুঁটু পিছন ফিরিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে এবং দ্বারের আড়ালে রতন কান পাতিয়া রাখিয়াছে বেশ জানি।

বলিলাম, কথা দিয়ে যে আসিনি তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। বলেছিলাম একজনের অনুমতি পেলে রাজী হতে পারি।

অনুমতি পাওনি?

না।

ঠাকুর্দা একমুহূর্ত থামিয়া বলিলেন, পুঁটির বাপ বলে, সর্বরকমে সে হাজার টাকা দেবে। ধরাধরি করলে আর দু-এক শ' উঠতে পারে। কি বল হে?

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তামাকটা আর একবার পালটে দেব কি?

'দাও। তোমার নামটি কি বাপু?

রতন।

রতন? বেশ নামটি—থাক কোথায়?

কাশীতে।

কাশী? ঠাকুরুনটি বুঝি আজকাল কাশীতেই থাকেন? কি করচেন সেখানে?

রতন মুখ তুলিয়া বলিল, সে খবরে আপনার দরকার?

ঠাকুর্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাগ করো কেন বাপু, রাগের ত কিছু নেই। গাঁয়ের মেয়ে কিনা, তাই খবরটা জানতে ইচ্ছে করে। হয়ত তাঁর কাছে গিয়ে পড়তেই বা হয়। তা ভাল আছে ত?

রতন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর্দা সবলে কয়েকটা টান দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—দাঁড়াও ত বাপু, পায়খানাটা একবার দেখিয়ে দেবে। ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কিনা' বলিতে বলিতে তিনি রতনের আগেই ব্যস্ত-দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পুঁটু মুখ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, দাদামশায়ের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। বাবা হাজার টাকা কোথায় পাবেন যে দেবেন? অমনি করে পরের গয়না চেয়ে দিদির বিয়ে,—এখন তারা দিদিকে আর নেয় না। তারা বলে, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

এই মেয়েটি এত কথা আমার সঙ্গে পূর্বে কহে নাই, কিছু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা সত্যিই কি হাজার টাকা দিতে পারেন না?

পুঁটু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কখ্খনো না। বাবা রেলে চল্লিশ টাকা মোটে মাইনে পান, আমার ছোটভাইয়ের ইস্কুলের মাইনের জন্যে আর পড়াই হ'ল না। সে কত কাঁদে। বলিতে বলিতে তাহার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, তোমার কি শুধু টাকার জন্যেই বিয়ে হচ্ছে না?

পুঁটু কহিল, হাঁ, তাই ত। আমাদের গাঁয়ের অমূল্যবাবুর সঙ্গে বাবা সম্বন্ধ করে-ছিলেন। তার মেয়েরাই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন বলেই ত সে বিয়ে বন্ধ হ'ল। এবারে বাবা বোধ হয় আর কারু কথা শুনবেন না, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন।

বলিলাম, পুঁটু, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

পুঁটু সলজ্জে মুখ নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।

কিন্তু আমিও ত তোমার চেয়ে চোদ্দ-পনের বছরের বড়?

পুঁটু এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি আর কোথাও কখনো সম্বন্ধ হয়নি?

পুঁটু মুখ তুলিয়া খুশি হইয়া বলিল, হয়েছিল ত। আপনাদের গ্রামের কালিদাস-বাবুকে জানেন? তাঁর ছোট ছেলে। বি এ পাস করেছে, বয়সে আমার চেয়ে কেবল একটু-খানি বড়ো। তার নাম শশধর।

তোমার তাকে পছন্দ হয়?

পুঁটু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিলাম, কিন্তু শশধর তোমাকে যদি পছন্দ না করে?

পুঁটু বলিল, তাই বৈ কি! আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেবল আনাগোনা করত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা করে বলতেন, সে শুধু আমার জন্যেই।

কিন্তু এ বিয়ে হ'ল না কেন?

পুঁটুর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, কহিল, তার বাবা হাজার টাকার গয়না আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। আর কোন্ না পাঁচ শ' টাকা খরচ হবে বলুন? এ ত জমিদারদের ঘরের

মেয়ের জন্যেই হয়। সত্যি নয়? ওরা বড়লোক, অনেক টাকা ওদের, আমার মা তাদের বাড়ি গিয়ে কত হাতেপায়ে ধরলে, কিন্তু কিছুতে শুনলে না।

শশধর কিছু বললে না?

না, কিছু না। কিন্তু সেও তো বেশি বড় নয়—তার বাপ-মা বেঁচে আছে কিনা।

তা বটে, শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে?

পুঁটু ব্যগ্র হইয়া কহিল, না এখনো হয়নি। শুনচি নাকি শীগ্‌গির হবে।

আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হলে তারা যদি তোমাকে ভালো না বাসে?

আমাকে? কেন ভালবাসবে না? আমি যে রাঁধাবাড়া, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জানি। আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেব।

এর বেশি বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে কি-ই বা জানে! কায়িক পরিশ্রম দিয়াই সে সমস্ত অভাব পূরণ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁদের সব কাজ নিশ্চয় করবে তো?

হাঁ, নিশ্চয় করব।

তা হলে তোমার মাকে গিয়ে বলো, শ্রীকান্তদাদা আড়াই-হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আপনি দেবেন? তাহলে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন?

হাঁ, তাও যাব!

দ্বারপ্রান্তে ঠাকুর্দার সাড়া পাওয়া গেল। কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি প্রবেশ করিলেন—তোফা পায়খানাটি ভায়া! শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। রতন গেল কোথায়, আর এক কলকে তামাক দিক না।

চার

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে, মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো ফললাভ হয় না। সৎপরামর্শ কিছুতেই কেহ শুনে না। কিন্তু সত্য বলিয়াই দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সেই ঘটনাটা বলিব।

ঠাকুর্দা দাঁত বাহির করিয়া আশীর্বাদ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন, পুঁটু বিস্তর পায়ের ধূলো গ্রহণ করিয়া আদেশ পালন করিল, কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলে আমার পরিতাপের অবধি রহিল না। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া কেবলি তিরস্কার করিতে লাগিল যে, কে ইহারা যে বিদেশে চাকরি করিয়া বহু দুঃখে যাহা-কিছু সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই দিয়া দিব? ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই দাতাকর্ণগিরি করিতেই হইবে, তাহার অর্থ কি? কোথাকার কে এই মেয়েটা গাড়িতে অযাচিত প্যাঁড়া এবং দই খাওয়াইয়া আমাকে ত আচ্ছা ফাঁদে ফেলিয়াছে! একটা ফাঁস কাটিতে আর একটা ফাঁসে জড়াইয়া পড়িলাম। পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল এবং এই নিরীহ মেয়েটার প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। আর ঐ শয়তান ঠাকুর্দা। ইচ্ছা করিতে লাগিল লোকটা যেন না আর বাড়ি পৌঁছায়, রাস্তাতেই সর্দিগর্মি হইয়া মারা যায়। কিন্তু সে আশা ভিত্তিহীন, নিশ্চয় জানি, লোকটা কিছুতেই মরিবে না এবং একবার যখন আমার বাসার ঠিকানা জানিয়াছে তখন আবার আসিবে এবং যেমন করিয়া পারে টাকা আদায় করিবে। হয়ত এবার সেই হাকিম পিসেমশায়কে সঙ্গে করিয়া আনিবে। এক উপায় —যঃ পলায়তি। টিকিট কিনিতে গেলাম, কিন্তু জাহাজে স্থানাভাব—সমস্ত টিকিট পূর্বাহ্ণেই বিক্রি হইয়া গেছে, সুতরাং পরের মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সে ছয়-সাত দিনের ব্যাপার।

আর এক পন্থা—বাসা বদল করা। ঠাকুর্দা না খুঁজিয়া পায়। কিন্তু এমন একটি ভাল জায়গা এত শীঘ্র পাওয়াই বা যায় কোথায়? কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভালমন্দর প্রশ্নই অবান্তর—যথারণ্যং তথা গৃহম্—শিকারীর হাত হইতে প্রাণ বাঁচানর দায়!

ভয় ছিল আমার গোপন উদ্বেগটা পাছে রতনের চোখে পড়ে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে

তাহার নড়িবার গা নাই, কাশীর চেয়ে কলিকাতা তাহার বেশি মনে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠির জবাব নিয়ে কি তুমি কালই যেতে চাইচো রতন?

রতন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আজ দুপুরে মাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম, আমার দু'-পাঁচদিন দেরি হবে। মরা সোসাইটি, জ্যান্ত সোসাইটি না দেখে আর ফিরচি নে। আবার কবে কোন্ কালে আসা হবে তার তো কোন ঠিক নেই।

বলিলাম, কিন্তু তিনি তো উদ্বিগ্ন হতে পারেন—

আজ্ঞে না। গাড়ির ধকলটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি, সে কথা লিখে দিয়েছি।

কিন্তু চিঠির জবাবটা--

আজ্ঞে, দিন না। কালই রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়ে দেবোখন। সে বাড়িতে মার চিঠি যমে খুলতেও সাহস করবে না।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নাপিত ব্যাটার কাছে কোন ফন্দিই খাটিল না। সব প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দিল।

যাবার সময় ঠাকুর্দা টাকার কথাটা প্রচার করিয়াই গেছেন। তাহা চিত্তের ঔদার্য অথবা সারল্যের প্রাচুর্য—এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। তিনি সাক্ষী রাখিয়া গেছেন।

রতন ঠিক সেই কথাই পাড়িল, বলিল, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি বাবু।

কি কথা রতন?

রতন একটু দ্বিধা করিয়া বলিল, আড়াই হাজার টাকা তো নিতান্ত তুচ্ছ নয় বাবু—ওরা কে যে ওদের মেয়ের বিয়েতে এতটা টাকা আপনি খামকা দান করবেন বললেন! তা ছাড়া, ঠাকুর্দাই হোক আর যাই হোক, বুড়োটা লোক ভাল নয়। ওকে বলাটা ভাল হয়নি বাবু।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া যেমন অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, মনের মধ্যে তেমনি জোর পাইলাম—ইহাই চাহিতেছিলাম।

তথাপি কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস দিয়া কহিলাম, বলাটা ভাল হয়নি, না রতন?

রতন বলিল, নিশ্চয় ভাল হয়নি বাবু। টাকাটা তো কম নয়। তা ছাড়া, কিসের জন্য বলুন তো?

ঠিক ত! কহিলাম, তাহলে না দিলেই হবে।

রতন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সে ছাড়বে কেন?

কহিলাম, না ছেড়ে করবে কি? লেখাপড়া করে তো দিইনি। আর, তখন আমি এখানে থাকব কি বর্মায় চলে যাব, তাই বা কে জানে।

রতন একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, বলিল, বুড়োকে আপনি চিনতে পারেন নি বাবু, ওদের লজ্জা-শরম মান-অপমান নেই। কেঁদেকেটে ভিক্ষে করেই হোক, আর ভয় দেখিয়ে জুলুম করেই হোক, টাকা ও নেবেই। আপনার দেখা না পেলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ও কাশী গিয়ে মার কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বে। মা বড় লজ্জা পাবেন বাবু, ও মতলবে কাজ নেই।

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। রতন আমার চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। অর্থহীন আকস্মিক করুণার হঠকারিতার জরিমানা আমাকে দিতেই হইবে। নিস্তার নাই।

রতন পাড়াগাঁয়ের ঠাকুর্দাকে যে চিনিতে ভুল করে নাই, বুঝা গেল যখন চতুর্থ দিবসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আশা করিয়াছিলাম এবার নিশ্চয় হাকিম পিসেমশাই সঙ্গে আসিবেন—কিন্তু একাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, দশখানা গ্রামের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে দাদা, সবাই বলচে, কলিকালে এমন কখনো শোনা যায় না। গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় এভাবে উদ্ধার করে দিতে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। আশীর্বাদ করি চিরজীবী হও।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে কবে?

এই মাসের পঁচিশে স্থির হয়েচে, মধ্যে কেবল দশটা দিন বাকী। কাল পাকাদেখা, আশীর্বাদ—বেলা তিনটের পরে বারবেলা, এর ভেতরেই শুভকর্ম সমাধা করে নিতে হবে। কিন্তু তুমি না গেলে বরণ্ড সব বন্ধ থাকবে, তবু কিছুই হতে পারবে না। এই নাও তোমার পুঁটুর চিঠি—সে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছে। কিন্তু তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি স্বেচ্ছায় হারালে তার জোড়া কখনো পাবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁজ-করা একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে দিলেন।

কৌতূহলবশতঃ চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঠাকুর্দা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কালিদাসের পয়সা থাকলে হবে কি, একেবারে ছোটলোক—চামার। চোখের চামড়া বলে তার কোন বালাই নেই। কালই টাকাকড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে, গহনাপত্র নিজের সেকরা দিয়ে গড়িয়ে নেবে—ওর কাউকে বিশ্বাস নেই—এমন কি, আমাকে পর্যন্ত না।

লোকটার মস্ত দোষ। ঠাকুর্দাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না—আশ্চর্য!

পুঁটু স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছে। একপাতা দু'পাতা নয়, চার-পাতাজোড়া ঠাস বুনানি। চার-পাতাই সকাতর মিনতি। ট্রেনে রাঙাদিদি বলিয়াছিলেন, আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। কেবল আজকালকার নয়, সর্বকালের নাটক-নভেল হার মানে তাহা অস্বীকার করিব না। এই লেখার জোরে নন্দরাণীর স্বামীর চৌদ্দ দিনের ছুটি লইয়া সাতদিনের দিন আসিয়া হাজির হইয়াছিল কথাটা বিশ্বাস হইল।

অতএব, আমিও পরদিন সকালেই যাত্রা করিলাম। টাকাটা সত্যই সঙ্গে লইয়াছি এবং ভাঙচুর করিয়া প্রতারণা করিতেছি না—ঠাকুর্দা নিজের চক্ষে তাহা যাচাই করিয়া লইলেন, বলিলেন, পথ চলবে জেনে, টাকা নেবে গুণে। আমরা দেবতা নই তো রে ভাই, মানুষ—ভুল হতে কতক্ষণ।

সত্যই ত! রতন কাল রাত্রেই কাশী রওনা হইয়া গেছে। তাহার হাতে চিঠির জবাব দিয়াছি, লিখিয়া দিয়াছি—তথাস্তু। ঠিকানা দিতে পারি নাই ঠিক নাই বলিয়া। এ ত্রুটি যেন সে নিজগুণে ক্ষমা করে, এ প্রার্থনাও জানাইয়াছি।

যথাসময়ে গ্রামে পৌঁছিলাম, বাড়িসুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা ঘুচিল। যত্ন ও সমাদর যাহা পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অভিধানে নাই।

পাকাদেখা ও আশীর্বাদ করার উপলক্ষে কালিদাসবাবুর সহিত পরিচয় হইল। লোকটা যেমন রুক্ষ মেজাজের, তেমনি দাম্ভিক। তাঁহার অনেক টাকা এই কথাটা সকলকে সর্বক্ষণ স্মরণ করানো ছাড়া জগতে তাঁহার যে আর কোন কর্তব্য আছে মনে হয় না। সমস্ত স্বোপার্জিত। সদম্ভে বলিলেন, মশাই, বরাত আমি মানিনে, যা করব তা নিজের বাহুবলে। দেব-দেবতার অনুগ্রহ আমি ভিক্ষে করিনে। আমি বলি দৈবের দোহাই দেয় কাপুরুষে।

বড়লোক বলিয়া এবং ছোটখাটো তালুকদার বলিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং অধিকাংশেরই বোধ করি তিনি মহাজন, এবং দুর্দান্ত মহাজন—অতএব সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথাগুলা স্বীকার করিয়া লইলেন। তর্করত্ন মহাশয় কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং আশপাশ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটা পুরাতন কাহিনীরও সূত্রপাত হইল।

অপরিচিত ও সামান্য ব্যক্তি অনুমানে তিনি অবহেলাভরে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। টাকার শোকে আমার অন্তরটা তখন পুড়িতেছিল, দৃষ্টিটা সহ্য হইল না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, বাহুবল আপনার কি পরিমাণ আছে জানিনে, কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা আমিও স্বীকার করি।

তার মানে?

বলিলাম, মানে আমি নিজেই। বরকেও চিনিনে, কনেকেও না, অথচ টাকা যাচ্ছে আমার এবং সে ঢুকছে গিয়ে আপনার সিন্দুকে। একে বরাত বলে না ত বলে কাকে?

এই বললেন, আপনি দেব-দেবতারও অনুগ্রহ নেন না, কিন্তু আপনার ছেলের হাতের আঙটি থেকে বৌয়ের গলার হার পর্যন্ত তৈরি হবে যে আমারই অনুগ্রহের দানে। হয়ত-বা বৌভাতের খাওয়ানোটা পর্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও বোধ করি সকলে এত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। ঠাকুর্দা কি-সব বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই সুস্পষ্ট বা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল না। কালিদাসবাবু ক্রোধে ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি টাকা দিচ্চেন তা আমি জানব কি করে? এবং দিচ্চেনই বা কেন?

বলিলাম, কেন দিচ্চি সে আপনি বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও চাইনে। কিন্তু দেশসুদ্ধ সকলে শুনেচে, আমি টাকা দিচ্চি, কেবল আপনিই শোনেন নি? মেয়ের মা আপনাদের বাড়িসুদ্ধ সকলের হাতেপায়ে ধরেচে, কিন্তু আপনি বি.এ. পাস-করা ছেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম করতে রাজী হননি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই—এটা ভেবে দেখেন নি আপনার ছেলে কেনবার অত টাকা হঠাৎ তারা পায় কোথায়? যাই হোক, ছেলে-বেচা টাকা অনেকেই নেয়, আপনি নিলেও দোষ নেই, কিন্তু এর পরে গাঁয়ের লোককে বাড়িতে ডেকে টাকার অহঙ্কার আর করবেন না এবং একজন বাইরের লোকের ভিক্ষের দানে ছেলের বিয়ে দিয়েচেন এ কথাটাও মনে রাখবেন।

উদ্বেগ ও ভয়ে সকলের মুখ কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ হয সবাই ভাবিলেন, এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিবে এবং ফটক বন্ধ করিয়া সকলকে লাঠিপেটা না করিয়া কালিদাসবাবু আর কাহাকেও ঘরে ফিরিতে দিবেন না।

কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, টাকা আমি নেব না।

বলিলাম, তার মানে ছেলের বিয়ে আপনি এখানে দেবেন না?

কালিদাসবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নয়, আমি কথা দিয়েচি বিবাহ দেবো—তার নড়চড় হবে না। কালিদাস মুখুয্যে কথার খেলাপ করে না। আপনার নামটি কি?

ঠাকুর্দা ব্যগ্রকণ্ঠে আমার পরিচয় দিলেন।

কালিদাসবাবু চিনিতে পারিয়া কহিলেন, ওঃ—তাই বটে। এর বাপের সঙ্গেই না একবার আমার ভয়ানক ফৌজদারী মামলা বাঁধে?

ঠাকুর্দা বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—কিছুই আপনি বিস্মৃত হন না। এ তারই ছেলে বটে, সম্পর্কে আমারও নাতি হয়।

কালিদাসবাবু প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, তা হোক। আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে এমনি বয়সই হ'ত। শশধরের বিয়েতে এসো বাবা। আমার পক্ষ থেকে সেদিন তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

শশধর উপস্থিত ছিল, সে শুধু সকৃতজ্ঞচক্ষে আমার প্রতি একটিবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় মুখখানি আনত করিল।

আমি উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলাম, বলিলাম, যেখানেই থাকি, অন্ততঃ বৌভাতের দিন এসে নববধূর হাতে অন্ন খেয়ে যাব। কিন্তু অনেক রূঢ় কথা বলেচি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কালিদাসবাবু বলিলেন, রূঢ় কথা যে বলেচ তা সত্যি, কিন্তু আমি ক্ষমাও করেচি। কিন্তু উঠলে চলবে না শ্রীকান্ত, শুভকর্ম উপলক্ষে সামান্য কিছু খাবার আয়োজন করে রেখেচি, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

যে আজ্ঞে, তাই হবে, বলিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

সেদিন পাত্রকে আশীর্বাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ অভ্যাগতগণের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কার্যই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সদুপদেশ সম্বন্ধে যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুঁটুর বিবাহটা তাহারই একটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ। জগতে এই একটিমাত্রই নিজের চোখে দেখিয়াছি। কারণ নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত হতভাগ্য মেয়ের বাপের কান মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয় সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া

হাতজোড় করিয়া বাঘের গ্রাস হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর নির্দয় বলিয়া গালিগালাজ করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্ষোভ কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে, কিন্তু প্রতিকার মিলে না। কারণ, প্রতিকার বরের বাপের হাতে নাই, সে আছে মেয়ের বাপেরই নিজের হাতে।

পাঁচ

গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুক্ষ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে তো ঘরে আসাই হয়নি।

সে কি কথা নবীন! বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে?

একটা? একপাল এসে জুটেছে।

কোথা থাকে তারা?

ঐ ত মুরারিপুরের আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরোদাস বাবাজী ম'লো, তার জায়গায় এসে জুটল এক ছোকরা বৈরাগী, তার গণ্ডা-চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরিগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব, সেখানেই ত প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐসব আউলে-বাউলেগুলোর ধম্মাধম্ম জ্ঞান আছে নাকি? ওরা জাতজম্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাচবিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ-সাতদিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলেনি?

নবীন বলিল, বললে যে কমলিলতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। সে কয়দিন বাবু আখড়ার কাছেও যায়নি। আর যেই আপনি চলে গেলেন, বাবুও অমনি খাতা-কাগজ-কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে ঢুকলেন।

প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়! বৈষ্ণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্যপরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম, নবীন, আখড়াটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে?

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল, আমার অনেক কাজ। আর আপনিও ত এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ-কোশের বেশি নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিধে উত্তরমুখো চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সামনের দীঘির পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলচে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে—ভাবতে হবে না।

আমার যাওয়ার প্রস্তাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে—কীর্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিনরাত। খঞ্জনি-কর্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই, গহরকে ধরে আনি গে।

এবার নবীনও হাসিল, বলিল, হাঁ যান; কিন্তু দেখবেন কমলিলতার কেত্তন শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশে অপরাহ্ণ-বেলায় যাত্রা করিলাম।

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে, দূরে হইতে কীর্তন বা খোল-করতালের শব্দমাত্র পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুলবৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল, নীচে ভাঙ্গাচোরা বেদী একটা আছে, কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পথের রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম, হয়ত ওদিকে কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেদিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই, শীর্ণ সংকীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন নদীর তীরে একখন্ড পরিষ্কৃত গোময়লিপ্ত ঈষদুচ্চ ভূমির উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি—আন্দাজ করিলাম, ইনিই বৈরাগী দ্বারিকদাস—আখড়ার বর্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। লোকটিকে ভদ্র ও উচ্চজাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, রোগা বলিয়া কিছু দীর্ঘকায় বলিয়া চোখে ঠেকে; মাথায় চুল চূড়ার মত করিয়া সুমুখে বাঁধা, দাড়ি-গোঁফ প্রচুর নয়—সামান্যই, চোখেমুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি হইবে বলিয়া বোধ করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না, দু'জনেই নদীর পরপারে পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। সেখানে নানা রঙ ও নানা আকারের টুকরা মেঘের মাঝে ক্ষীণ পান্ডুর তৃতীয়ার চাঁদ এবং ঠিক যেন তাহারই কপালের মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা। বহু নিম্নে দেখা যায় দূর গ্রামান্তের নীল বৃক্ষরাজি—তাহার যেন কোথাও আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, সাদা, পাঁশুটে নানা বর্ণের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের গায়ে তখনও অস্তগত সূর্যের শেষ-দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন দুষ্ট ছেলের হাতে রঙের তুলি পড়িয়া ছবির আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতেছে। তাহার ক্ষণকালের আনন্দ—চিত্রকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ কালো অল্পপরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—যেন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সেকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজস্র কাঠমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং নিকটে কোন গাছে অসংখ্য বকের বাসা হইতে শাবকগণের একটানা ঝুমঝুম শব্দ বিচিত্র মাধুর্যে অবিরাম কানে আসিয়া পশিতেছে। এ সবই ভালো এবং যে দুটা লোক তন্গতচিত্তে জড়ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেখিতে এই জঙ্গলে সন্ধ্যাকালে আসি নাই। নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্টমী আছে, এবং সকলের সেরা বোষ্টমী কমললতা আছে। তাহারা কোথায়?

ডাকিলাম, গহর!

গহর ধ্যান ভাঙ্গিয়া হতবুদ্ধির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই, তোমার শ্রীকান্ত, না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ থামিতে চাহে না এমনি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, বাবাজী, আমাকে হঠাৎ চিনলেন কি করে?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গোঁসাই, ক্রিয়াপদে শেষের ঐ সম্ভ্রমের 'দন্ত্য ন'টি বাদ দিতে হবে। তবে ত রস জমবে।

বলিলাম, তা যেন দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিনলে কি করে?

বাবাজী কহিলেন, হঠাৎ চিনব কেন! তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ-দুটি যে রসের সমুদ্দুর—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে। যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হ'ল তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম, কমললতা দেখব বলেই ত এসেচি গোঁসাই, কৈ সে?

বাবাজী ভারী খুশি হইলেন, কহিলেন, দেখবে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচো। হয়ত ভুলে গেছ, কিন্তু দেখলেই চিনবে, সেই কমললতা। গোঁসাই, ডাকো না একবার তারে! এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহার কাছে সবাই গোঁসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেচে তোমাকে দেখতে।

গহর চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোঁসাই, আমার কথা বুঝি তোমাকে গহর সমস্ত বলেচে?

বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ সমস্ত বলেচে। তারে জিজ্ঞাসা করলাম, গোঁসাই, ছ-সাতদিন আসনি কেন? সে বললে, শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমি যে শীঘ্রই আবার আসবে তাও বলেচে। তুমি বর্মাদেশে যাবে তাও জানি।

শুনিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম, রক্ষা হোক! ভয় হইয়াছিল সত্যই বা ইনি কোন্ অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক, এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আন্দাজটা যে বেঠিক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভাল বলিয়াই ঠেকিল অন্ততঃ অসাধু-প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। কি জানি, কেন ইহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে—অর্থাৎ যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন, একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের,—হয়ত কবিতা ও বৈষ্ণব-রসচর্চায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহরগোঁসাইয়ের সঙ্গে কমললতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই, কিংবা হয়ত সকালের দিকে ছিল, এ বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গেছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখমুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরনটাও যেন পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবী কথা কহিল। সে যে নীচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। সে কিছু-মাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই, চিনতে পার?

বলিলাম, না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি মনে হচ্চে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচ বৃন্দাবনে। বড়গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোনোনি এখনো?

বলিলাম, তা শুনেচি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখন জন্মেও যাইনি।

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বৈ কি। অনেককালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্চে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম তামাশা করিতেছে, কিন্তু আমাকে না বড়গোঁসাইজীকে, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিল, রাত হয়ে আসচে, আর জঙ্গলে বসে কেন? ভেতরে চলো।

বলিলাম, জঙ্গলের পথে আমাদেরও অনেকটা যেতে হবে। বরঞ্চ কাল আবার আসব।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সন্ধান দিলে কে? নবীন?

হাঁ, সেই।

কমললতার খবর বলেনি?

হাঁ, তাও বলেচে।

বোষ্টমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয়নি?

সহাস্যে কহিলাম, হাঁ, তাও দিয়েচে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হুঁশিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল করোনি।

কেন বলো ত?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোঁসাই বলে, তুমি বিদেশে যাচ্চ চাকরি করতে। তোমার ত কেউ নেই, চাকরি করবে কেন?

তবে কি করবো?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ ত আর কেড়ে নিতে পারবে না!

তা জানি। কিন্তু বৈরিগীগিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেচি, ধাতে সয় না বুঝি?

না, বেশিদিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেচি। কিন্তু অন্ধকারে ফিরব কি করে?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেব কেন? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে। তখন যেয়ো। এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গৌর! গৌর!

গৌর গৌর, বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

ছয়

যদিচ ধর্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি, ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন অন্ধিসন্ধি আমি কোন কালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি ধার্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজী ও স্বখ্যাত সাধুজী—কাহাকেও ছোট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধুবর্ষণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙ্গলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি—ফললাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাৎ খাঁটি বস্তু কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না, সঙ্কল্প করিলাম। পুঁটুর বৌভাতের নিমন্ত্রণ আমাকে রাখিতেই হইবে, অন্ততঃ সে-কয়টা দিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের পরিবর্তে বৈষ্ণবী-আখড়ার আশেপাশে কোথাও কাটাইতে পারিলে আর যাই হোক জীবনের সঞ্চয়ে বিশেষ লোকসান ঘটিবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমললতার কথা মিথ্যা নয়, সেথায় কমলের বনই বটে, কিন্তু দলিত-বিদলিত। মত্তহস্তিকুলের সাক্ষাৎ মিলিল না, কিন্তু বহু পদচিহ্ন বিদ্যমান। বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুধ জ্বাল দিতেছে, কেহ ক্ষীর তৈরি করিতেছে, কেহ নাড়ু পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফল-মূল বানাইতেছে—এ-সকল ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার। একজন অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সী বৈষ্ণবী একমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে এবং তাহারই কাছে বসিয়া আর-একজন নানা রঙের ছাপানো ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড সযত্নে কুঞ্চিত করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছে, সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ কাল স্নানান্তে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই, তাহাদের

কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষমাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে নামজপ চলিতেছে। এদিকে বেলা শেষ হইয়া দুই-একটা করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে শুরু করিয়াছে; কমললতা কহিল, চলো ঠাকুর, নমস্কার করে আসবে। কিন্তু আচ্ছা—তোমাকে কি বলে ডাকব বল ত? নতুনগোঁসাই বলে ডাকলে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্যন্ত যখন গহরগোঁসাই হয়েচে তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে। কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না।

কমললতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও নামটা আমার ধরতে নেই—অপরাধ হয়, এসো।

তা যাচ্চি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

কিসের তা তোমার শুনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত!

যে বৈষ্ণবীটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নীচু করিল।

ঠাকুরঘরে কালোপাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি। একটি নয়, অনেকগুলি। এখানেও জনপাঁচ-ছয় বৈষ্ণবী কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিভরে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির, কিন্তু সযত্ন-পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই সঙ্কোচ হয় না, তথাপি কমললতা পূবের বারান্দার একধারে আসন পাতিয়া দিল, কহিল, বসো, তোমার থাকবার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি?

কেন, ভয় কি? আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।

বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ করবে যে!

বৈষ্ণবী কহিল, সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

একাকী বসিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই তাহাদের সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। মিনিট-দশেক পরে কমললতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমিই মঠের কর্ত্রী নাকি?

কমললতা জিভ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী—কেউ ছোট-বড় নেই। এক-একজনের এক-একটা ভার, আমার ওপর প্রভু এই ভার দিয়েছেন। এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

বলিলাম, তাই হবে। আচ্ছা, বড়গোঁসাই, গহরগোঁসাই এঁদের দেখচি নে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তাঁরা এলেন বলে, নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই রাত্রে? আর ঐ নদীতে?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

গহরও?

হাঁ, গহরগোঁসাইও।

কিন্তু আমাকেই-বা স্নান করালে না কেন?

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকে স্নান করাই নে, তারা আপনি করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সেদিন মানা করলেও শুনবে না।

বলিলাম, গহর ভাগ্যবান, কিন্তু আমার ত টাকা নেই, আমি গরীব লোক—আমার প্রতি হয়ত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতটা বোধ হয় বুঝিল এবং রাগ করিয়া কি-যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু বলিল না। তারপরে কহিল, গহরগোঁসাই যাই হোন কিন্তু তুমিও গরীব নয়।

অনেক টাকা দিয়ে যে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করে ঠাকুর তাকে গরীব ভাবে না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য নয়।

বলিলাম, তাহলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা লেখা আছে ঘটবে, আটকান যাবে না—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি পেলে কোথায়?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষে করতে হয়, আমরা সব খবরই শুনতে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাওনি যে, টাকা দিযে দায় উদ্ধার করতে আমার হয়নি?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল, কহিল, না, এ খবর পাইনি। কিন্তু হ'ল কি, বিয়ে ভেঙ্গে গেল?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাঙ্গেনি কিন্তু ভেঙ্গেছেন কালিদাসবাবু—বরের বাপ নিজে। পরের ভিক্ষের দানে ছেলেবেচা-পণের কড়ি হাত পেতে নিতে তিনি লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘটল!

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহরগোঁসাইজীই অন্ধকারে পচা নদীর জলে ডুব মারবে, আর সংসারের কোথাও কোন অঘটন ঘটবে না? তাঁর লীলাই বা প্রকাশ পাবে কি করে বল ত? বলিয়াই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কথাটা আমার ভালো হয় নাই—মাত্রা ছাড়াইয়া গেছে।

বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল, যেন অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিল।

সম্মুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মস্ত একথালা লুচি লইয়া ঠাকুরঘরের দিকে গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ কোন পর্বদিন,—না?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্বদিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ার অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা। কিন্তু আয়োজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশি করে করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দয়া করে যদি দু'দিন থাকো নিজেই সব দেখতে পাবে। দাসীর দাসী আমরা, ওঁর সেবা করা ছাড়া সংসারে আর ত আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া সে মন্দিরের দিকে হাতজোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া, মালা গাঁথা, কাপড় রঙ-করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই করো?

বৈষ্ণবী কহিল, হাঁ, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এ-সব ত কেবল ঘরগৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন কর কখন?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধাবাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপান—একেই বলে সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাসদাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ-দুটি যেন অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা তোমার বাড়ি কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছতলা ত আর চিরকাল ছিল না?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইট-কাঠের তৈরি কোন একটা বাড়ির ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু সে গল্প করার ত এখন সময় নেই, গোঁসাই। এস ত আমার সঙ্গে, তোমার নতুন ঘরটি দেখিয়ে দিই!

চমৎকার ঘরখানি। বাঁশের আলনায় একটি পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐটি পরে ঠাকুরঘরে এস। দেরি ক'রো না যেন! এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একধারে ছোট একটি তক্তপোশে পাতা-বিছানা। নিকটেই জলচৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুলফুল; এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ বোধ হয় ধূপধুনা দিয়া গেছে, তাহার গন্ধ ও ধোঁয়ায় ঘরটি তখনও পূর্ণ হইয়া আছে—ভারী ভাল লাগিল। সারাদিনের ক্লান্তি ত ছিলই, ঠাকুর-দেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং ওদিকের আকর্ষণ ছিল না,—কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কি জানি এ কাহার ঘর, কাহার শয্যা, অজ্ঞাত বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য আমাকে ধার দিয়া গেল—কিংবা হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এ-সকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতঃই ভারী সঙ্কোচ বোধ করে, অথচ আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া-ছিলাম, কে যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুনগোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওঁরা তোমাকে ডাকছেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা-সহযোগে কীর্তনগান কানে গেল, বহুলোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম, এ কমললতা। নবীনের বিশ্বাস এই মিষ্টস্বরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল—অসম্ভব নয় এবং অন্ততঃ অসঙ্গতও নয়।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলেরই দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্তন করিতেছে—মদন-গোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল কি, যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি, নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি—

এই সহজ ও সাধারণ গুটিকয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষঃস্থল মন্থিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন; কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদরধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। এই-সকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমনধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকাদাস মুদ্রিতনেত্রে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না এবং শুধু কেবল ক্ষণকাল পূর্বেই স্নিগ্ধহাস্যপরিহাস-চঞ্চল কমললতাই নয়, সাধারণ গৃহকর্মে নিযুক্তা যে-সকল বৈষ্ণবীদের এইমাত্র সামান্য তুচ্ছ কুরূপা মনে হইয়াছিল, তাহারাও যেন এই ধূপ ও ধুনায় ধূমাচ্ছন্ন গৃহের অনুজ্জ্বল দীপালোকে আমার চক্ষে মুহূর্তকালের জন্য অপরূপ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল, অদূরবর্তী ঐ পাথরের মূর্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্তনের সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিতেছে।

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধতাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম—কেহ লক্ষ্যও করিল না। দেখি, প্রাঙ্গণের একধারে বসিয়া গহর। কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদশব্দে তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল না, কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও নড়িতে পারিলাম না, সেইখানে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, শুধু আমাকেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া এ বাড়ির সকলেই যেন আর এক দেশে চলিয়া গেছে—সেখানের পথ আমি চিনি না। ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধিতে

আমি ইহাদের সকলের বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনি অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কানে গেল,—ওগো নতুনগোঁসাই।

জাগিয়া উঠিয়া বলিলাম, কে?

আমি গো—তোমার সন্ধ্যেবেলার বন্ধু। এত ঘুমোতেও পার!

অন্ধকার ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া কমললতা বৈষ্ণবী। বলিলাম, জেগে থেকে লাভ হ'ত কি? তবু সময়টার একটু সদ্ব্যবহার হ'ল।

তা জানি। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পাবে না?

পাব।

তবে ঘুমোচ্ছ যে বড়?

জানি বিঘ্ন ঘটবে না, প্রসাদ পাবই। আমার সন্ধ্যেবেলাকার বন্ধু রাত্রেও পরিত্যাগ করবে না।

বৈষ্ণবী সহাস্যে কহিল, সে দাবি বৈষ্ণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতক্ষণ। তুমি গহরকে পর্যন্ত গোঁসাই বানিয়েচ, আর আমিই কি এত অবহেলার? হুকুম করলে বোষ্টমের দাসানুদাস হতেও রাজী।

কমললতার কণ্ঠস্বর একটুখানি গভীর হইল, কহিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাশা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়। গহরগোঁসাইজীকেও তুমি ভুল বুঝেছো। তার আপন লোকেরাও তাকে কাফের বলে, কিন্তু তারা জানে না সে খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্মবিশ্বাস সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার ভাব দেখে ত তা মনে হয় না।

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, এসো। একটু ভাবিয়া কহিল, কিংবা প্রসাদ নাহয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই—কি বল?

বলিলাম, আপত্তি নেই। কিন্তু গহর কোথায়? সে থাকে ত দু'জনকে একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে খাবে?

বলিলাম, চিরকালই ত খাই। ছেলেবেলায় ওর মা আমাকে অনেক ফলার মেখে দিয়েছে, তোমাদের প্রসাদের চেয়ে সে তখন কম মিষ্টি হ'ত না। তা ছাড়া গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে কহিল গহর-গোঁসাইজী নেই, কখন চলে গেছে আমরা জানতে পারিনি।

কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠানে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাও না?

বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ আমি দেখেচি। কমললতা, আমার তামাশাতে তুমি রাগ করলে, কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাশা করচো না। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা নয়।

বৈষ্ণবী এ অনুযোগের আর জবাব দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল, অতিথিসেবার ত্রুটি হবে নতুনগোঁসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই গো সন্ধ্যার বন্ধু, বোষ্টম না হয়েও তোমার নতুনগোঁসাইজীর রসবোধ আছে, আতিথ্যের ত্রুটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করে না। রাখো কি আছে—ফিরে এসে দেখবে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অমনি করেই ত খেতে হয়। এই বলিয়া কমললতা নীচে ঠাঁই করিয়া সমুদয় খাদ্যসামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই ঘুম ভাঙিয়া গেল কাঁসরঘণ্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মঙ্গল আরতি শুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্তনের পদ—কানু-গলে বনমালা বিরাজে, রাই-গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে মঞ্জরী-রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে। তারপরে সারাদিন ধরিয়া চলিল ঠাকুরসেবা। পূজা, পাঠ, কীর্তন, নাওয়ানো-খাওয়ানো, গা-মোছানো, চন্দন-মাখানো, মালা-পরানো—ইহার আর বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল পাথরের দেবতারই এই অষ্টপ্রহরব্যাপী অফুরন্ত সেবা সহে, আর কিছু হইলে এতবড় ধকলে কবে ক্ষইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।

কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা সাধন-ভজন কর কখন? সে উত্তরে বলিয়াছিল—এই ত সাধন-ভজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধাবাড়া, ফুল-তোলা, মালা-গাঁথা, দুধ জ্বাল দেওয়া, একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনি জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা—আমাদের আর কোন সাধন-ভজন নেই।

আজ সমস্তদিনের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কথাগুলা তাহার বর্ণে বর্ণে সত্য। অতিরঞ্জন অত্যুক্তি কোথাও নাই। দুপুরবেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম, কমললতা, আমি জানি তুমি অন্য সকলের মত নও। সত্যি বল ত ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কি গো—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান! এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না নতুনগোঁসাই—

আমার কথায় সেই যেন লজ্জা পাইল বেশি। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি ত জানিনে, তাই জিজ্ঞাসা করচি, তোমরা কি সত্যই ভাবো ঐ পাথরের মূর্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে যাবো কিসের জন্য গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো, রক্ত-মাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও থাকবার জো নেই। কিন্তু তা কেন? আর এও বলি, শক্তি আর চৈতন্যর হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছ যে, বলবে পাথরের মধ্যে তার জায়গা হবে না? হয় গো হয়, ভগবানের কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত?

যুক্তি-হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এ ত তা নয়, এ তাহার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকপট উক্তির কাছে হঠাৎ কেমনধারা থতমত খাইয়া গেলাম, তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সত্যিই ত, পাথরই হোক আর যাই হোক, এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের পর বৎসর দিনান্তব্যাপী এই অবিচ্ছিন্ন সেবার জোর পাইত ইহারা কি করিয়া? এমন সোজা হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহারা শিশু ত নয়, ছেলেখেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন যে শ্রান্তির অবসাদে দু'দিনেই এলাইয়া পড়িত। কিন্তু সে ত হয় নাই, বরঞ্চ ভক্তি ও প্রীতির অখণ্ড একাগ্রতায় আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জীবনে পাওয়ার দিক দিয়া সে কি তবে সবই ভুয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকান?

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে?

বলিলাম, ভাবচি।

কাকে ভাবচ?

ভাবচি তোমাকেই।

ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্মাদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার ত মঠের জমিজমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই—খাবো কি?

ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা। কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও ত মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।

কমললতা, তোমার দেশ কোথায়?

কালকেই ত বলেছি গোঁসাই, ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।

তা হলে গাছতলায় আর পথে-পথে না থেকে মঠে থাকো কিসের জন্যে?

অনেকদিন পথে-পথেই ছিলুম গোঁসাই, সঙ্গী পাই ত আবার একবার পথই সম্বল করি।

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ কথা বিশ্বাস হয না, কমললতা। যাকে ডাকবে সেই যে রাজী হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুনগোঁসাই—রাজী হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হাঁ রাজী। নাবালক অবস্থায় যে লোক যাত্রার দলকে ভয় করেনি, সাবালক অবস্থায় তার বোষ্টমীকে ভয় কি!

যাত্রার দলেও ছিলে নাকি?

হাঁ।

তা হলে ত গান গাইতেও পারো।

না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে দেয়নি, তার আগেই জবাব দিয়েছিল। তুমি অধিকারী হলে কি হ'ত বলা যায় না।

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতুম। সে যাক, এখন আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে যাবে। এদেশে যেমন-তেমন করেও ঠাকুরের নাম নিতে পারলে ভিক্ষের অভাব হয না। চলো না গোঁসাই, বেরিয়ে পড়া যাক। বলেছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখোনি, চলো তোমাকে দেখিযে নিযে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটল, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুনগোঁসাই?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারী বিস্ময় জন্মিল; কহিলাম, পরিচয় তো এখনো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আমাকে এতটা বিশ্বাস হ'ল কি করে?

বৈষ্ণবী কহিল চব্বিশ ঘণ্টা ত কেবল একপক্ষেই নয় গোঁসাই, ওটা দু'পক্ষেই। আমার বিশ্বাস, পথে-প্রবাসে আমাকেও তোমার অবিশ্বাস হবে না। কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারী শুভদিন,—চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ ত রইলই—ভাল না লাগে ফিরে এসো, আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল- ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়ে আসা হয়েচে।

কমললতা বলিল, চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি গে।

আমার ঘর? তাই ভাল।

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে, সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে—তাহার একমুহূর্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিযা খাইতে বসিলাম। অতি পরিপাটি প্রসাদ। পলায়নের ষড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে একজন অত্যন্ত জরুরী কাজে কমললতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং একাকী মুখ বুজিয়াই সেবা সমাপ্ত করিতে হইল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না, বাবাজী দ্বারিকাদাসই বা গেলেন কোথায়? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরাঘুরি করিতেছে—কাল সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে ধোঁয়ার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অপ্সরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ দিনের বেলায় কড়া আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যবোধটা তেমন অটুট রহিল না, গা-টা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

সেই শৈবালাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া মন্দস্রোতা সুপরিচিত স্রোতস্বতী এবং সেই লতাগুল্ম-কণ্টকাকীর্ণ তটভূমি এবং সেই সর্পসংকুল সুদৃঢ় বেতসকুঞ্জ ও সুবিস্তৃত বেণুবন। দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশতঃ গা ছমছম করিতে লাগিল। অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথায় একটি লোক আড়ালে বসিয়া ছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষে থাকে! লোকটির বয়স হয়ত আমাদেরই মত আবার বছর-দশেকের বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। খর্বাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের ভ্রূ-দুটাও তেমনি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘে-প্রস্থে বিস্তীর্ণ। বস্তুতঃ এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয় ইতিপূর্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না, দূর হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেয়ালে একজোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলাজোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোশাক-পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মত, কিন্তু যেমন ময়লা তেমনি জীর্ণ।

মশাই!

থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

আপনি এখানে কবে এসেছেন শুনতে পারি কি?

পারেন। এসেছি কাল বৈকালে।

রাত্রিতে আখড়াতে ছিলেন বুঝি?

হাঁ, ছিলাম।

ওঃ!

মিনিটখানেক নীরবে কাটিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লোকটা বলিল, আপনি ত বোষ্টম নয়, ভদ্রলোক— আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে?

বলিলাম, সে খবর তাঁরাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ওঃ! কমলিলতা থাকতে বললে বুঝি?

হাঁ।

ওঃ! জানেন ওর আসল নাম কি? ঊষাঙ্গিনী। বাড়ি সিলেটে, কিন্তু দেখায় যেন ও কলকাতার মেয়েমানুষ! আমার বাড়িও সিলেটে। গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব-চরিত্র?

বলিলাম, না! কিন্তু লোকটার ভাবগতিক দেখিয়া এবার সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রশ্ন করিলাম, কমললতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

আছে না?

কি সেটা?

লোকটা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, কেন, মিথ্যে নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠিবদল করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত?

আমরা দ্বাদশ-তিলি।

আর কমললতারা?

প্রত্যুত্তরে লোকটা তাহার সেই মোটা ভ্রূ-জোড়া ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরা শুঁড়ী ওদের জলে আমরা পা ধুইনে। একবার ডেকে দিতে পারেন?

না। আখড়ায় সবাই যেতে পারে, ইচ্ছে হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাব মশাই, যাব। দারোগাকে দু পয়সা খাইয়ে রেখেচি, পেয়াদা সঙ্গে করে একেবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে আনব। বাবাজীর বাবাও রাখতে পারবে না। শালা রাস্কেল কোথাকার!

আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে কর্কশকণ্ঠে কহিল, তাতে আপনার কি হ'ল? গিয়ে একবার ডেকে দিলে কি শরীর ক্ষয়ে যেত নাকি? ওঃ— ভদ্দরলোক!

আর ফিরিয়া চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলাইতে না পারি এবং এই অতি দুর্বল লোকটার গায়ে হাত দিয়া ফেলি, এই ভয়ে একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিলাম। মনে হইতে লাগিল বৈষ্ণবীর পলাইবার হেতুটা বোধ হয় এইখানেই কোথায় জড়িত।

মনটা বিগড়াইয়াছিল, ঠাকুরঘরে নিজেও গেলাম না, কেহ ডাকিতেও আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলচৌকির উপরে গুটিকয়েক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সযত্নে সাজানো ছিল, তাহারি একখানা হাতে করিয়া প্রদীপটা শিয়রের কাছে আনিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণব-ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নয়, শুধু সময় কাটাইবার জন্য। ক্ষোভের সহিত একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, কমললতা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি যথারীতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার কানে আসিতে লাগিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল কমললতা সেই অবধি কোন তত্ত্বই আমার লয় নাই। আর সেই ভ্রূ-ওয়ালা লোকটা! কোন সত্যই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই?

আরও একটা কথা। গহর কৈ? সেও ত আজ আমার খোঁজ লইল না। ভাবিয়াছিলাম দিনকয়েক এখানেই কাটাইব,—পুঁটুর বিবাহের দিনটি পর্যন্ত কিন্তু সে আর হয় না। হয়ত কালই কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িব।

ক্রমশঃ আরতি ও কীর্তন সমাপ্ত হইল। কল্যকার সেই বৈষ্ণবী আসিয়া আজও বহু যত্নে প্রসাদ রাখিয়া গেল, কিন্তু যেজন্য পথ চাহিয়াছিলাম তাহার দেখা মিলিল না। বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা, আনাগোনার পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা আর নাই জানিয়া আহার করিয়া হাতমুখ ধুইয়া দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল,—নতুনগোঁসাই?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমললতা; আস্তে আস্তে বলিল, আসিনি বলে মনে মনে বোধ হয় অনেক দুঃখ করেছো—না গোঁসাই?

বলিলাম, হাঁ, করেচি।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তার পরে বলিল, বনের মধ্যে ও লোকটা তোমাকে কি বলছিল?

তুমি দেখেছিলে নাকি?

হাঁ।

বলছিল সে তোমার স্বামী অর্থাৎ তোমাদের সামাজিক আচারমতে তুমি তার কণ্ঠিবদল-করা পরিবার।

তুমি বিশ্বাস করেছো?

না, করিনি।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বভাব-চরিত্রের ইঙ্গিত করেনি?

করেছে।

আমার জাত?

হাঁ, তাও।

বৈষ্ণবী একটুখানি থামিয়া বলিল, শুনবে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস? কিন্তু হয়ত তোমার ঘৃণা হবে।

বলিলাম, তবে থাক, ও আমি শুনতে চাইনে।

কেন?

বলিলাম, তাতে লাভ কি কমললতা? তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে। কিন্তু কাল চলে যাবো, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না। নিরর্থক আমার সেই ভালো-লাগাটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে বলো ত?

বৈষ্ণবী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম কি ভাবচ?

ভাবচি, কাল তোমাকে যেতে দেব না।

তবে, কবে যেতে দেবে?

যেতে কোনদিনই দেব না। কিন্তু অনেক রাত হ'লো, ঘুমোও। মশারিটা ভাল করে গোঁজা আছে ত?

কি জানি, আছে বোধ হয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া কহিল, আছে বোধ হয়? বাঃ—বেশ ত! এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোঁসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা-টিপিয়া বাহির হইয়া গেল এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সাত

আজ আমাকে বৈষ্ণবী বার বার করিয়া শপথ করাইয়া লইল তাহার পূর্ব-বিবরণ শুনিয়া আমি ঘৃণা করিব কি না।

বলিলাম, শুনতে আমি চাইনে, কিন্তু শুনলেও ঘৃণা করব না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, কিন্তু করবে না কেন? সে শুনলে মেয়েপুরুষে সবাই ত ঘৃণা করে।

বলিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানিনে কিন্তু তবুও আন্দাজ করতে পারি। সে শুনলে মেয়েরাই যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে সে জানি এবং তার কারণও জানি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমি চাইনে। পুরুষেরাও করে, কিন্তু অনেক সময়ে সে ছলনা, অনেক সময়ে আত্মবঞ্চনা। তুমি যা বলবে তার চেয়েও অনেক কুশ্রী কথা আমি তোমাদের নিজের মুখেও শুনেচি, চোখেও দেখেছি। কিন্তু তবুও ঘৃণা হয় না।

কেন হয় না?

বোধ হয় আমার স্বভাব। কিন্তু কালই ত বলেচি তোমাকে, তার দরকার নেই। শুনতে আমি একটুও উৎসুক নই। তা ছাড়া, কোথাকার কে—সে-সব কাহিনী নাই বা আমাকে বললে।

বৈষ্ণবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল তার পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা গোঁসাই, তুমি পূর্বজন্ম পরজন্ম এ-সব বিশ্বাস করো?

না।

না কেন? এ কি সত্যিই নেই তুমি ভাবো?

আমার ভাবনার জন্য অন্য জিনিস আছে, এ-সব ভাববার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠিনে।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলবো, বিশ্বাস করবে? ঠাকুরের দিকে মুখ করে বলচি, তোমাকে মিথ্যে বলবো না।

হাসিয়া কহিলাম, কোরব গো কমললতা, কোরব। ঠাকুরের দিব্যি না করে বললেও তোমাকে বিশ্বাস কোরব।

বৈষ্ণবী কহিল, তবে বলি। একদিন গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনলাম হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়িতে; ভাবলুম, যে লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না সে রইলো কোন্ ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে ছ-সাত দিন। আবার ভাবলুম, এ কেমনধারা বামুন বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না! তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞাসা করতে গহরগোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। বললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে বললাম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই? নাম শুনে যেন চমকে গেলুম। জানো ত গোঁসাই, ও নামটা আমার করতে নেই!

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈষ্ণবী কহিল, জিজ্ঞেসা করলুম, বন্ধু দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভেতরটায় ঢিপঢিপ করতে লাগল। তুমি ভাববে এমন মানুষ ত দেখিনি—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই,—এ সত্যি?

বলিলাম, তারপর?

বৈষ্ণবী বলিল, তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম, কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজকর্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আসবে, তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাব কবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালোবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে!

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসোনি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাই নে কেন, দু-একদিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাব তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই। এবং ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়হীন মূর্খও নয়, তাহার কথায়বার্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথি-সেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে এবং সেই ভালো লাগাটা প্রশস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তিতে ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রুমোচনে ও মাধুর্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে এমন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, ক্ষণকাল পূর্বেও তাহার কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয় কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি-স্বস্তি রহিল না। জানি না, কোন্ অশুভ লগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ যে এক পুঁটুর জাল কাটিয়া আর এক পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়মোড় গুঁজিয়া পড়িলাম। এদিকে বয়স ত যৌবনের সীমানা ডিঙ্গাইতেছে, এই সময়ে অযাচিত নারীপ্রেমের বন্যা নামিল নাকি, কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচির হইতে পারে তাহা ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবে না, এ মীমাংসা চুকিয়াছে। কিন্তু এখানে আর না। সাধুসঙ্গ মাথায় থাক, স্থির করিলাম, কালই এ স্থান ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই যাঃ! তোমার জন্যে যে চা আনিয়েছি গোঁসাই।

বলো কি? পেলে কোথায়?

শহরে লোক পাঠিয়েছিলুম। যাই, তৈরি করে আনি গে। কোথাও পালিয়ো না যেন।

না। কিন্তু তৈরি করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেইদিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা-পান

আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত নিষেধই আছে, তবু ও জিনিসটা যে আমি ভালবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং শহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানি না, বর্তমানেরও না, কেবল আভাসে এইটুকুই শুনিয়াছি তাহা ভাল নয়, তাহা নিন্দার্হ, শুনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি আমার কাছে সে-কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, শুধু আমিই শুনিতে রাজী হই নাই। আমার কৌতূহল নাই—কারণ প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমললতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানি না কে তাহার এই পরমপূজ্য গুরুজন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত-জনমের স্বপ্নসাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নেই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত,—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত-জনমের রুদ্ধদ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়!

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল; সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্তিত হয়,—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, তোমরা কি শুঁড়ি?

কমললতা হাসিয়া বলিল, না, সোনারবেনে। কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই, ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবই এক হ'লেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাই ত মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েছো।

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মত হয়নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে —এমন শান্ত, আত্মভোলা মিষ্টি মানুষ আর কখনও দেখেচো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলেবেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। কাকে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধল। গহরের বাপ ছিল বদরাগী লোক, আমরা ত ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টাকয়েক পরে চুপি চুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে ফোঁটাকতক জল গড়িয়ে পড়লো। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হ'লো?

বলিলাম, আমরাও ত তাই ভাবলাম। কিন্তু হাসি থামলে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বললেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু! ও দিব্যি নেয়ে-খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে, আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলেপুড়ে মরচি! কি দরকার বলো ত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ অভিমান ধুয়েমুছে নির্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কত বড় গুণ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোঁসাই?

একটু বিব্রত হইলাম। প্রশ্নটা তাহাকে ছাড়িয়া যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, সবই কি নিজে ভুগতে হয় কমললতা, পরের দেখেও শেখা যায়। ঐ ভুরু-ওয়ালা লোকটার কাছে তুমি কি কিছু শেখোনি?

বৈষ্ণবী বলিল, কিন্তু ও ত আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না—একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী নিজেও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তার পরে হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমাকে মিনতি করি গোঁসাই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—

বেশ, বলো।

কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল বলা সহজ নয়। আমারি মত নতমুখে তাহাকেও বহুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু সে হার মানিল না, অন্তর্বিগ্রহে জয়ী হইয়া একসময়ে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আমারও মনে হইল তাহার স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখের 'পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে। বলিল, অহঙ্কার যে মরেও মরে না গোঁসাই। আমাদের বড়গোঁসাই বলে, ও যেন তুষের আগুন, নিবেও নেবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে ধিকিধিকি জ্বলচে। কিন্তু তাই বলে ফুঁ দিয়েও ত বাড়াতে পারব না। আমার এ পথে আসাই যে তা হলে মিথ্যে হয়ে যাবে। শোন। কিন্তু মেয়েমানুষ ত—হয়ত, সব কথা খুলে বলতেও পারব না।

আমার কুণ্ঠার অবধি রহিল না। শেষবারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম, মেয়েদের পদস্খলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই, ও শুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগে না কমললতা। তোমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় অহঙ্কার বিনাশের কোন্ পন্থা মহাজনেরা নির্দেশ করে দিয়েছেন আমি জানিনে, কিন্তু নিজের গোপন পাপ অনাবৃত করার স্পর্ধিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়, এ-সব কাহিনী যাদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ তুমি পাবে কমললতা, আমাকে ক্ষমা কর। এ ছাড়া বোধ হয় কালই আমি চলে যাবো—জীবনে হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।

বৈষ্ণবী কহিল, তোমাকে ত আগেই বলেছি গোঁসাই, প্রয়োজন তোমার নয়, আমার। কিন্তু কালকের পরে আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি সত্যিই বলতে চাও? না কখনো তা নয়, আমার মন বলে আবার দেখা হবে—আমি সেই আশা নিয়েই থাকবো। কিন্তু যথার্থই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কথাই জানতে ইচ্ছে করে না? চিরকাল শুধু একটা সন্দেহ আর অনুমান নিয়েই থাকবে?

প্রশ্ন করিলাম, আজ বনের মধ্যে যে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যাকে তুমি আশ্রমে ঢুকতে দাও না, যার দৌরাত্ম্যে তুমি পালাতে চাচ্চো, সে কি তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

কিসের ভয়ে পালাচ্চি তুমি বুঝেছো গোঁসাই?

হাঁ, এই ত মনে হয়। কিন্তু কে ও?

কে ও! ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রণা। তাই ত অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী—মানুষের উপর থেকে এতবড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও—আমি আবার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আমার সকল সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন আত্মগ্লানি ফুটিয়া উঠিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী কহিল, অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—জগতে অত ভালো বোধ করি কেউ কাউকে বাসেনি।

তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং এই সুরূপা রমণীর তুলনায় সেই ভালবাসার পাত্রটির কুৎসিত কদাকার মূর্তি স্মরণ করিয়া মনও ভারী ছোট হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী বৈষ্ণবী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুঝিল, কহিল, গোঁসাই, এ ত শুধু ওর বাইরেটা—ওর ভিতরের পরিচয়টা শোন।

বলো।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, আমার আরও দু'টি ছোটভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র মেয়ে। বাড়ি আমাদের শ্রীহট্টে, কিন্তু বাবা কারবারী লোক, তাঁর ব্যবসা কলকাতায়

ব'লে ছেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ—মা সংসার নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকেন, আমি পুজোর সময় যদি কখনো দেশে যেতুম মাসখানেকের বেশি থাকতে পারতুম না। আমার ভালোও লাগত না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই, তাঁর নামের জন্যেই গোঁসাই, তোমার নামটা গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। এইজন্যেই নতুনগোঁসাই বলে ডাকি, তোমার ও নামটা মুখে আনতে পারিনে।

বলিলাম, সে আমি বুঝেচি, তারপর?

বৈষ্ণবী কহিল, যার সঙ্গে তোমার আজ দেখা তার নাম মন্মথ, ও ছিল আমাদের সরকার। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়েস যখন একুশ বছর তখন আমার সন্তান-সম্ভাবনা হ'লো—

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, মন্মথর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসায় থাকত, বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালবাসত তার সীমা ছিল না। তাকে ডেকে বললুম, যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি ভাই, আমার এ বিপদে শেষবারের মত আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে এক টাকার বিষ কিনে এনে দাও।

কথাটা প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝলে, মুখখানা তার মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললুম, দেরি করলে হবে না ভাই, তোমাকে এখুনি কিনে এনে দিতে হবে। এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

শুনে যতীনের সে কি কান্না! সে ভাবত আমাকে দেবতা, ডাকত আমাকে দিদি বলে। কি আঘাত, কি ব্যথাই সে যে পেলে, তার চোখের জল আর শেষ হতেই চায় না। বললে, ঊষাদিদি, আত্মহত্যার মত মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার বড় অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি স্থির ক'রে থাকো দিদি, আমি কখনো সাহায্য করব না। এ ছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন কোরব।

তার জন্যেই আমার মরা হ'লো না।

ক্রমশঃ কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তেমনি শান্ত নিরীহ-প্রকৃতির মানুষ। আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায়, দু-তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। তার পরে গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে এলেন। কথা হ'লো মন্মথ এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হবো, তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালা বদল করে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যে শিশু গর্ভে এসেছে মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই যেন অর্ধেক বেদনা মুছে গেল। উদ্যোগ আয়োজন চললো, দীক্ষাই বলো আর ভেখই বলো, তাও আমাদের সাঙ্গ হ'লো, আমার নতুন নামকরণ হ'লো কমললতা। কিন্তু তখনো জানিনে, যে বাবা দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্মথকে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, কি কারণে জানিনে বিয়ের দিনটা দিনকয়েক পেছিয়ে গেল। বোধ হয় সপ্তাহখানেক হবে। মন্মথকে বড় একটা দেখিনে, নবদ্বীপের বাসায় আমি একলাই থাকি। এমনিই ক'দিন যায়, তার পরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হ'লো। স্নান করে, শুচি হয়ে, শান্তমনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে প্রতীক্ষা করে রইলুম।

বাবা বিষন্নমুখে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথর যখন দেখা মিলল, হঠাৎ সমস্ত মনের ভেতরটায় যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে আনন্দের কি ব্যথার ঠিক জানিনে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হ'লো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসি, কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠল না।

আমাদের কলকাতার পুরোনো দাসী কি-সব জিনিসপত্র নিয়ে এলো—সে আমাকে মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছোবার কারণ শুনতে পেলুম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারী হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বললে সে?

বৈষ্ণবী কহিল, বললে, মন্মথ হঠাৎ দশ হাজারের বদলে বিশ হাজার টাকা দাবী করে বসল। আমি কিছুই জানতুম না, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্মথ কি টাকার বদলে রাজী হয়েছে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন? দাসী বললে, উপায় কি দিদিমণি? ব্যাপারটা ত সহজ নয়, প্রকাশ হয়ে পড়লে যে সমাজ-জাত-কুল-মান সব যাবে।

মন্মথ আসল কথাটা শেষকালে প্রকাশ করে দিলে, বললে, দায়ী ত সে নয়, দায়ী তার ভাইপো যতীন। সুতরাং বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় ত বিশ হাজারের কমে পারবে না। তা ছাড়া, পরের ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া—এ কি কম কঠিন!

যতীন তার ঘরে বসে পড়ছিল, তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো হ'লো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর বললে, মিছে কথা।

পিতৃব্য মন্মথ গর্জন করে উঠল—পাজী নচ্ছার নেমকহারাম। যে লোক তোকে ভাতকাপড় দিয়ে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করচে তুই তারই করলি সর্বনাশ! কি কাল-সাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম! ভেবেছিলাম বাপমা-মরা ছেলে মানুষ হবে। ছি ছি! এই না বলে সে বুকে কপালে পটাপট করাঘাত করতে লাগল, বললে এ কথা ঊষা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে আর তুই বলিস, না!

যতীন চমকে উঠে বললে, ঊষাদিদি নিজে বলেছেন আমার নামে? কিন্তু তিনি ত কখ্খনো মিথ্যে বলেন না—এতবড় মিথ্যা অপবাদ তাঁর মুখ থেকে ত কিছুতেই বার হতে পারে না!

মন্মথ আর একবার গর্জন করে উঠল—ফের্! তবু অস্বীকার কর্বি পাজী হতভাগা শয়তান! জিজ্ঞেস কর্ তবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন্।

কর্তা সায় দিয়ে বললেন, হাঁ।

যতীন বললে, দিদি নিজে করেছেন আমার নাম?

কর্তা আবার ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

বাবাকে সে দেবতা বলে জানত, এর পরে আর প্রতিবাদ করলে না, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কি ভাবলে সেই জানে।

রাত্রে কেউ তার খোঁজ করলে না। সকালে কে এসে তার খবর দিলে, সবাই ছুটে গিয়ে দেখলে আমাদের ভাঙ্গা আস্তাবলের এককোণে যতীন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে।

বৈষ্ণবী কহিল, শাস্ত্রে ভাইপোর আত্মহত্যায় খুড়োর অশৌচবিধি আছে কিনা জানিনে গোঁসাই, হয়ত নেই, হয়ত ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়—সে যাই হোক, শুভদিন দিন-কয়েক মাত্র পেছিয়ে গেল—তার পরে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ-শুচি হয়ে মন্মথগোঁসাই মালা-তিলক ধারণ করে অধিনীর পাপ-বিমোচনের শুভ-সঙ্কল্প নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী মালা ঠাকুরের পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। মন্মথর অশৌচ গেল কিন্তু পাপিষ্ঠা ঊষার অশৌচ ইহ-জীবনে আর ঘুচল না নতুনগোঁসাই।

কহিলাম, তার পরে?

বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়াছিল, জবাব দিল না। বুঝিলাম, এবার তাহার সামলাইতে সময় লাগিবে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটুকু শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত কি না ভাবিতেছিলাম, বৈষ্ণবী আর্দ্র মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, দ্যাখো গোঁসাই, পাপ জিনিসটা সংসারে এমন ভয়ঙ্কর কেন জানো?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাসমত জানি একরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুত্তরে কহিল, জানিনে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মত করে বুঝে রেখেচি গোঁসাই। স্পর্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে, কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছুই আমাদের হয়নি। হলে একে এত ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না। কিন্তু তা ত নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বলো ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনিই হয়, এমনি কোরেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষে করেন।

এ নিয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপ-পুণ্যের উপলব্ধি অর্জন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, এর পরে কি হ'লো?

শুনিয়া সহসা সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বল গোঁসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?

সত্যিই বলচি, করে।

বৈষ্ণবী বলিল আমার ভাগ্য যে এ জন্মে আবার তোমার দেখা পেলুম। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিনচারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লো, তাকে গঙ্গার তীরে বিসর্জন দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে এলুম। বাবা কেঁদে বললেন, আমি ত আর থাকতে পারিনে মা। বললুম, না বাবা, তুমি আর থেকো না, তুমি বাড়ি যাও। অনেক দুঃখ দিলুম, আর তুমি আমার জন্যে ভেবো না।

বাবা বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি ত মা?

বললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা ক'রো না।

কিন্তু তোমার মা যে এখনো বেঁচে রয়েচে ঊষা?

বললুম, আমি মরব না বাবা, কিন্তু আমার সতীলক্ষ্মী মা, তাঁকে ব'লো ঊষা মরেছে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে শুনলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ পাবেন।

চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কমললতা বলিতে লাগিল, হাতে টাকা ছিল, বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী জুটে গেল—তারা যাচ্ছিল শ্রীবৃন্দাবনধামে—আমিও সঙ্গ নিলুম।

বৈষ্ণবী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায় কতদিন কেটে গেল।

বলিলাম, তা জানি, কিন্তু কত শত বাবাজীর কত শতসহস্র চোখের দৃষ্টির বিবরণ ত তুমি বললে না কমললতা?

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বাবাজীদের দৃষ্টি অতিশয় নির্মল, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই গোঁসাই।

বলিলাম, না না, অশ্রদ্ধা নয়, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী শুনতে চাইচি কমললতা।

এবার সে হাসিল না বটে, কিন্তু চাপাহাসি গোপন করিতেও পারিল না, কহিল, যে বাবাজী ভালোবাসে তাকে সব কথা খুলে বলতে নেই, আমাদের বোষ্টমের শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বলিলাম, তবে থাক। সব কথায় কাজ নেই, কিন্তু একটা বল, গোঁসাইজী দ্বারিকাদাসকে যোগাড় করলে কোথায়?

কমললতা সঙ্কোচে জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, বলিল, ঠাট্টা করতে নেই, উনি যে আমার গুরুদেব, গোঁসাই।

গুরুদেব! তুমি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছ?

না, দীক্ষা নিইনি বটে, কিন্তু উনি তাঁর মতই পূজনীয়।

কিন্তু এই যে এতগুলি বৈষ্ণবী—সেবাদাসী না কি যে বলে—

কমললতা পুনশ্চ জিভ কাটিয়া বলিল, ওরা আমার মতই ওঁর শিষ্যা। ওদেরও তিনি উদ্ধার করেছেন।

কহিলাম, নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু পরকীয়া সাধনা, না কি এমনি একটা সাধন-পদ্ধতি তোমাদের আছে—তাতে ত দোষ নেই—

বৈষ্ণবী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমরা দূর থেকে আমাদের কেবল ঠাট্টা-তামাশাই করলে, কাছে এসে কখনো ত কিছু দেখলে না, তাই সহজেই বিদ্রূপ করতে পার। আমাদের বড়গোঁসাইজী সন্ন্যাসী, ওঁকে উপহাস করলে অপরাধ হয় নতুনগোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

তাহার কথা ও গাম্ভীর্যে একটু অপ্রতিভ হইলাম। বৈষ্ণবী তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিত-মুখে বলিল, দু'দিন থাকো না গোঁসাই আমাদের কাছে? কেবল বড়গোঁসাইজীর জন্যেই বলচি নে, আমাকে ত তুমি ভালোবাসো, আর কখনো যদি দেখা না-ও হয়, তবু ত দেখে যাবে কমললতা সত্যিই কি নিয়ে সংসারে থাকে। যতীনকে আমি আজো ভুলিনি—দু'দিন থাকো—আমি বলচি তোমাকে, তুমি যথার্থই খুশি হবে।

চুপ করিয়া রহিলাম। ইহাদের সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাহা নয়, জাত-বোষ্টমের মেয়ে টগরের কথাটাও মনে পড়িল, কিন্তু রহস্য করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। যতীনের প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা সকল আলোচনার মাঝখানে রহিয়া রহিয়া আমাকেও যেন উন্মনা করিয়া দিতেছিল।

বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো কি ভালোবাসো নি?

তোমার কি মনে হয় কমললতা?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হ'ল আসলে বৈরিগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মত। বাঁধন তুমি কখনো কোনকালে নেবে না।

হাসিয়া বলিলাম, প্রজাপতির উপমা ত ভাল হ'ল না কমললতা, ওটা যে অনেকটা গালাগালির মত শুনতে। আমার ভালোবাসার মানুষ কোথাও যদি সত্যিই কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ বাধবে।

বৈষ্ণবীও হাসিল, কহিল, ভয় নেই গোঁসাই, সত্যিই যদি কেউ থাকে আমার কথায় সে বিশ্বাসও করবে না, তোমার মধুমাখানো ফাঁকিও সে সারাজীবনে ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের? হোক না ফাঁকি, কিন্তু তার কাছে ত সেই সত্যি হয়ে রইল।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনো সত্যির জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝতে না পারুক, কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের নিরন্তর অশ্রুমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের কাণ্ড দেখেচি ত। এমনি করে এ পথে কত লোকই এলো, এ পথ যাদের সত্যি নয়, জলের ধারাপথে শুকনো বালির মত সমস্ত সাধনাই তাদের চিরদিন আলগা হয়ে রইল, কখনো জমাট বাঁধতে পারলে না।

একটু থামিয়া সে যেন হঠাৎ নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, তারা রসের খবর ত পায় না, তাই প্রাণহীন নির্জীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দু'দিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে, এ কোন্ মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি! এদের দেখেই আমাদের তোমরা উপহাস করতে শেখো—কিন্তু এ কি আমি বাজে বকে মরচি গোঁসাই, এ-সব অসংলগ্ন প্রলাপের তুমি ত একটা কথাও বুঝবে না। কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি

তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

স্বীকার করিলাম যে, তাহার বক্তব্যের প্রথম অংশটা বুঝি নাই, কিন্তু শেষের দিকটার প্রতিবাদে কহিলাম, তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা যে, আমাকে ভালো-বাসার নামই হ'লো দুঃখ পাওয়া?

দুঃখ ত বলিনি গোঁসাই, বলছি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষ্ণবী কহিল, না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের। মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে?

কিছুই যদি না বুঝি আমাকে বলাই বা কেন?

না বলেও যে থাকতে পারিনে গো। প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা। তোমাদের ও আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা; তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। জানো গোঁসাই, ভালোবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মত্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামে না!

কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল না; ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, ও আমাদের সত্যিও নয়, আমাদের আপনও নয়। ওর ছুটোছুটির চঞ্চলতা যেদিন থামে সেইদিনেই কেবল আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। ওগো নতুনগোঁসাই, নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই, কিন্তু ঐ জিনিসটাই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, পাবে না নিশ্চয় জানো?

বৈষ্ণবী বলিল, নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য হইলাম। বলিলাম, বড়াই ত তোমার কাছে কখনো করিনি কমললতা?

সে কহিল, জেনে করোনি, কিন্তু তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন—ওর চেয়ে বড় অহঙ্কারী জগতে আর কিছু আছে নাকি!

কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি করে?

জানলুম তোমাকে ভালবেসেছি বলে।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার দুঃখ আর চোখের জলের প্রভেদটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কমললতা। অবিশ্রাম ভাবের পুজো আর রসের আরাধনার বোধ করি এমনি পরিণামই ঘটে।

প্রশ্ন করিলাম, ভালোবেসেছো এ কি সত্যি কমললতা?

হাঁ সত্যি।

কিন্তু তোমার জপতপ, তোমার কীর্তন, তোমার রাত্রিদিনের ঠাকুরসেবা এ-সবের কি হবে বল ত?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চল না গোঁসাই, সব ফেলে দু'জনে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে ইচ্ছে করে।

বৈষ্ণবী নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা? না, সে শুনে তোমার কাজ নেই। কিন্তু সত্যিই কি কাল যাবে?

হাঁ, সত্যিই কাল যাব।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ আশ্রমে আবার তুমি আসবে, তখন কিন্তু কমললতাকে আর খুঁজে পাবে না গোঁসাই।

আট

এখানে আর একদণ্ডও থাকা উচিত নয় এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তখনি কে যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ইশারায় নিষেধ করে, বলে, যাবে কেন? ছ-সাতদিন থাকবে বলেই ত এসেছিলে—থাক না। কষ্ট ত কিছু নেই।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম, কে ইহারা একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উলটা মতলব দেয়? কাহার কথা বেশি সত্য? কে বেশি আপনার? বিবেক, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি—এম্‌নি কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আজও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল? যাহাকে ভাল বলিয়া মনে করি, ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাড়াইতে বাধা দেয় কেন? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কেন? মন বলিতেছে আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ, চলিয়া যাওয়াই কল্যাণের, তবে পরক্ষণে সেই মনের দু'চোখ ভরিয়া জল দেখা দেয় কিসের জন্য? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন—এই-সব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সান্ত্বনা?

তথাপি যাইতেই হইবে, পিছাইলে চলিবে না। এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলেবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায়বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়, কারণ প্রদর্শন নয়, প্রয়োজনের, কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়,—শুধু, আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই, এই সত্য ঘটনাটা আবিষ্কারের ভার যাহাদের রহিল তাহাদের 'পরে নিঃশব্দে অর্পণ করা।

স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না, ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি শুরু হইবার পূর্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুশকিল, পুঁটুর পণের টাকাটা ছোট ব্যাগ-সমেত কমললতার কাছে আছে, কিন্তু সে থাক। হয় কলিকাতা, নয় বর্মা হইতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই হইবে যে, আমাকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত কমললতাকে বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইবে, পথে-বিপথে বাহির হইবার সুযোগ পাইবে না। এদিকে যে কয়টা টাকা আমার জামার পকেটে পড়িয়া আছে, কলিকাতায় পৌঁছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এমনি করিয়াই কাটিল এবং ঘুমাইব না বলিয়া বার বার সঙ্কল্প করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল বুঝি স্বপ্নে গান শুনিতেছি। একবার ভাবিলাম রাত্রির ব্যাপার হয়ত এখনো সমাপ্ত হয় নাই; আবার মনে হইল প্রত্যূষের মঙ্গল-আরতি বুঝি শুরু হইয়াছে, কিন্তু কাঁসরঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারি না, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধুকণ্ঠের আদরের অনুচ্চ আহ্বান—'রাই জাগো, রাই জাগো, শুক-শারী বলে, কত নিদ্রা যাও লো কালো-মানিকের কোলে'। গোঁসাইজী! আর কত ঘুমোবে গো—ওঠ!

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পূবের জানালা খোলা—সম্মুখের আম্র-শাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ-মঞ্জরীর কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাহারি ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা জায়গায় ফিকে রাঙ্গার আভাস দিয়াছে, —অন্ধকার রাতে সুদূর গ্রামান্তে আগুন লাগার মত—মনের কোথায় যেন একটুখানি ব্যথিত হইয়া উঠে। গোটাকয়েক বাদুড় বোধ করি উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিল, তাহাদের পক্ষতাড়নার অস্ফুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল; বুঝা গেল আর যাই হোক রাত্রিটা শেষ হইতেছে। এটা দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামাপাখির দেশ। হয়ত বা উহাদের রাজধানী,—কলিকাতা শহর। আর ঐ বিরাট বকুলগাছটা তাহাদের লেনদেন কাজকারবারের বড়বাজার—দিনের বেলায় ভিড় দেখিলে অবাক হইতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রঙ-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদের অতি বিচিত্র সমাবেশ। আর রাত্রে আখড়ার চতুর্দিকের বনজঙ্গলে ডালে ডালে তাহাদের অগুণতি আড্ডা! ঘুম-ভাঙ্গার সাড়াশব্দ কিছু কিছু

পাওয়া গেল—ভাবে বোধ হইল চোখেমুখে জল দিয়া তৈরি হইয়া লইতেছে, এইবার সমস্ত দিবসব্যাপী নাচগানের মোচ্ছব শুরু হইবে! সবাই এরা লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ,—ক্লান্তও হয় না, কসরত থামায় না। ভিতরে বৈষ্ণবদলের কীর্তনের পালা যদিবা কদাচিৎ বন্ধ হয়, বাহিরে সে বালাই নাই। এখানে ছোটবড়, ভালোমন্দর বাছবিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক মা-থাক গান তোমাকে শুনিতেই হইবে। এদেশের বোধ করি এইরূপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল কাল সমস্ত দুপুর পিছনের বাঁশবনে গোটা-দুই হর-গৌরী পাখির চড়াগলার পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকের অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতায় আমার দিবানিদ্রার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আমারি ন্যায় বিক্ষুব্ধ কোন একটা ডাহুক নদীর কলমীদলের উপরে বসিয়া ততোধিক কঠিনকণ্ঠে ইহাদের বার বার তিরস্কার করিয়াও স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ভাগ্য ভাল যে এদেশে ময়ূর মিলে না, নহিলে উৎসবের গানের আসরে তাহারা আসিয়া যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়ত আর একটু নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ হইল গতরাত্রির সঙ্কল্পের কথা। কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও জো নাই—প্রহরীর সতর্কতায় মতলব ফাঁসিয়া গেল। রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই, আমার বিছানায় শ্যামও নেই—দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গানোর কি দরকার ছিল বল ত?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোঁসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়িতে কলকাতা যাবার কথা। মুখহাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরি করে আনি গে। কিন্তু স্নান ক'রো না যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়িতে যখন হোক আমি যাবো, কিন্তু তোমার এত উৎসাহ কেন বলো ত?

সে কহিল, আর কেউ ওঠার আগে আমি যে তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসতে চাই গোঁসাই!

স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া ঘরের এই অত্যল্প আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা—স্নান সারিয়া বৈষ্ণবী প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পেঁছে দিযে আশ্রমেই আবার ফিরে আসবে ত?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো, টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, তার পরে বলিলাম, কমললতা, তোমার মিছে এ পথে আসা। একদিন নাম ছিল তোমার ঊষা, আজো সেই ঊষাই আছ -একটুও বদলাতে পারনি।

কেন বল ত?

তুমি বল ত কেন বললে আমাকে টাকা গুণে নিতে? গুণে নিতে পারি বলে কি সত্যই মনে করো? যারা ভাবে একরকম, বলে অন্য রকম তাদের বলে ভণ্ড। যাবার আগে বড়গোঁসাইজীকে আমি নালিশ জানিয়ে যাব আখড়ার খাতা থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টমদলের কলঙ্ক।

সে চুপ করিয়া রহিল।

আমিও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ সকালে আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

নেই? তা হলে আর একটু ঘুমোও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন?

কিন্তু এখন তুমি করবে কি?

আমার কাজ আছে। ফুল তুলতে যাব।

এই অন্ধকারে? ভয় করবে না?

না, ভয় কিসের? ভোরের পুজোর ফুল আমিই তুলে আনি। নইলে ওদের বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটা দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম যে, সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের 'পরেই। কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্বোপরি

সবিনয় কর্মকুশলতায় এই কর্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে, কোথাও ঈর্ষা-বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জনাও জমিতে পায় না। এই আশ্রমলক্ষ্মীটি আজ উৎকণ্ঠ-ব্যাকুলতায় যাই যাই করিতেছে। এ যে কতবড় দুর্ঘটনা, কতবড় নিরুপায় দুর্গতিতে এতগুলি নিশ্চিন্ত নরনারী স্খলিত হইয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া আমারও ক্লেশবোধ হইল। এই মঠে মাত্র দু'টি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি—ইহার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই যেন পারি না এমনি মনোভাব। ভাবিলাম, লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম—এখানে সবাই সমান। কিন্তু একের অভাবে যে কেন্দ্রভ্রষ্ট উপগ্রহের মত সমস্ত আয়তনই দিগ্বিদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে তাহা চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম, আর শোব না কমললতা, চল তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনি গে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করোনি, কাপড় ছাড়োনি, তোমার ছোঁয়া ফুলে পুজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।

বৈষ্ণবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ, আমি নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করতেও পারব ত? তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, কহিল, হঠাৎ বড় দরদ যে গোঁসাই,—আচ্ছা চলো। আমি সাজিটা আনি গে, তুমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘনছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রাশিকৃত শুকনা পাতায় পথের রেখা বিলুপ্ত। বৈষ্ণবী আগে, আমি পিছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে পা দিই! বলিলাম, কমললতা, পথ ভুলবে না ত?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে চলতে হবে!

কমললতা, একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ?

এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়ো না।

গেলে তোমার লোকসান কি?

জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল, মুরারিঠাকুরের একটি গান আছে,—"সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও, জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও"। গোঁসাই, বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশি বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না,—না?

বলিলাম, কি জানি আগে সকালবেলাটা ত কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, একটু পরে গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল,—

> "কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই—
> সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।"

থামিলে বলিলাম, তারপরে?

তারপরে আর জানিনে।

বলিলাম, তবে আর একটা কিছু গাও—

বৈষ্ণবী তেমনি মৃদুকণ্ঠে গাহিল,—

> "চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
> পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।"

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী কহিল, তারপরে আর নেই, এখানেই শেষ।

শেষই বটে! দু'জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারী ইচ্ছা করিতে লাগিল দ্রুতপদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া চলি। জানি সে রাগ করিবে না, বাধা দিবে না, কিন্তু কিছুতেই পাও চলিল না, মুখেও একটা কথা আসিল না, যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ধীরে ধীরে নীরবে বনের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়ে ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান, ঠাকুরের নিত্যপূজার যোগান দেয়। খোলা জায়গায় অন্ধকার আর নাই, কিন্তু ফরসাও তেমন হয় নাই। তথাপি দেখা গেল অজস্র ফুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন সাদা হইয়া আছে। সামনের পাতাঝরা ন্যাড়া চাঁপাগাছটায় ফুল নাই, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাকয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপসা আলোতেও চেনা যায় শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় স্থলপদ্মের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায় শোভায়-সৌরভে ফুলে-ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা।

করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপাডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল—হঠাৎ তোমার হ'লো কি গোঁসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময়-প্রশ্নে মনে মনে ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টাও ঠিক সফল হইল না, শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েচি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদুগুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—"কালা মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুন্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—"

থামাইতে হইল। বলিলাম, যদুনাথ দাস থাক, ওদিকে কাঁসরের বাদ্য শুনতে পাচ্চো কি? ফিরবে না?

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ করিল, "ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—" আচ্ছা নতুনগোঁসাই, জানো মেয়েদের মুখের গান অনেক ভালো লোকে শুনতে চায় না, তাদের ভারী খারাপ লাগে?

বলিলাম, জানি। কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্বর নই।

তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন?

ওদিকে হয়ত আরতি শুরু হয়েছে—তুমি না থাকলে যে তার অঙ্গহানি হবে।

এটি মিথ্যে ছলনা গোঁসাই।

ছলনা হবে কেন?

কেন তা তুমিই জানো। কিন্তু এ কথা তোমাকে বললে কে? আমার অভাবে ঠাকুরের সেবায় সত্যিই অঙ্গহানি হতে পারে এ কি তুমি বিশ্বাস করো?

করি। আমাকে কেউ বলেনি কমললতা—আমি নিজের চোখে দেখেচি।

সে আর কিছু বলিল না, কি একরকম অন্যমনস্কের মত ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েছে—আর না।

স্থলপদ্ম তুললে না?

না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চল এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ—এদিকে বড় কেহ আসে না। তখনো পথ ছিল জনহীন, এখনো তেমনি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, তুমি কি এখান থেকে সত্যিই চলে যাবে?

বার বার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গোঁসাই?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই কেন বার বার এ কথা জানতে চাই,—জানিয়া আমার লাভ কি!

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই জাগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মঙ্গল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙ্গানোর বাদ্য। এ তাঁদেরই সয়।

দু'জনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতূহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সেই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁথে। ডালাটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমললতা সস্নেহ কৌতুকে তর্জন করিয়া বলিল, হাসলি যে পোড়ামুখি?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিল না। কমললতা ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

স্নানাহার যথারীতি এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের গাড়িতে আমার যাবার কথা। বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুরঘরে, ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, নতুনগোঁসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করো না ভাই। পদ্মা মাথা-ধরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনেই হঠাৎ জ্বরে পড়েচে—কি যে হবে জানিনে। এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দু'খানি কুঁচিয়ে দাও না গোঁসাই!

অতএব, ঠাকুরের কাপড় কুঁচাইতে বসিয়া গেলাম, যাওয়া ঘটিল না। পরের দিনও না এবং তার পরের দিনও না। বৈষ্ণবীর প্রত্যুষের ফুল তুলিবার সঙ্গী আমি। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে একটা না একটা কিছু কিছু কাজ আমাকে দিয়া সে করাইয়া লয়। এমনি করিয়া দিনগুলো যেন স্বপ্নে কাটে। সেবায়, সহৃদয়তায়, আনন্দে, আরাধনায়, ফুলে, গন্ধে, কীর্তনে, পাখির গানে কোথাও আর ফাঁক নাই। অথচ সন্দিগ্ধ মন মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া উঠে, এ কি ছেলেখেলা? বাহিরের সকল সংস্রব রুদ্ধ করিয়া গুটিকয়েক নির্জীব পুতুল লইয়া এ কি মাতামাতি? এতবড় আত্মপ্রবঞ্চনায় মানুষ বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু তবু ভালো লাগে, যাই-যাই করিয়াও পা বাড়াইতে পারি না। এ দিকটায় ম্যালেরিয়া কম, তথাপি অনেকেই এই সময়টায় জ্বরে পড়িতেছিল। গহর একটি দিন মাত্র আসিয়াছিল, আর আসে নাই; তাহারও খোঁজ লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারি না—এ আমার হইয়াছে ভালো!

সহসা মনের ভিতরটা ভয় ও ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিল—এ আমি করিতেছি কি! সঙ্গদোষে এই সবই কি সত্য বলিয়া একদিন বিশ্বাসে দাঁড়াইবে নাকি? স্থির করিলাম, আর না—যাই কেননা ঘটুক এই জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পলাইতেই হইবে।

প্রত্যহ রাত্রিশেষে বৈষ্ণবী আসিয়া আমাকে জাগায়। ভোরের সুরে বৈষ্ণবকবিদের ঘুম-

ভাঙ্গানোর গান। ভক্তি ও ভালোবাসার সে কি সকরুণ আবেদন! হঠাৎ সাড়া দিই না, কান পাতিয়া শুনি। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িতে চায়। মশারি তুলিয়া সে দোর-জানালা খুলিয়া দেয়—রাগ করিয়া উঠিয়া বসি এবং মুখহাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গে চলি।

দিনকয়েকের অভ্যাসে আপনি আজ ঘুম ভাঙ্গিল। ঘর অন্ধকার। একবার মনে হইল রাত্রি এখনো পোহায় নাই, কিন্তু সন্দেহ জন্মিল। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম—দেখি রাত কোথায়, সকাল হইয়াছে। কে একজন খবর দিতে কমললতা আসিয়া দাঁড়াইল, এমন অস্নাত, অপ্রস্তুত চেহারা তাহার পূর্বে দেখি নাই।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমারও অসুখ নাকি?

সে ম্লান হাসিয়া কহিল, আজ তুমি জিতেছো গোঁসাই।

কিসে বলো ত?

শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই, সময়ে উঠতে পারিনি।

আজ তবে ফুল তুলতে গেল কে?

উঠানের ধারে আধমরা একটা টগরগাছে সামান্য কয়েকটা ফুল ছিল, তাহাই দেখাইয়া কহিল, এ বেলা যা করে হোক ওতেই চলে যাবে।

কিন্তু ঠাকুরের গলার মালা?

মালা আজ তাঁদের পরাতে পারব না।

শুনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল সেই নির্জীব পুতুলগুলোর জন্যেই; বলিলাম, স্নান করে আমি তুলে এনে দিই?

তা যাও, কিন্তু এত ভোরে নাইতে পাবে না। অসুখ করবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজীকে দেখচি নে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তিনি ত এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

কবে ফিরবেন?

সে ত জানিনে গোঁসাই।

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী দ্বারিকাদাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই—কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি এ লোকটির মধ্যে কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাস্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জন ঘরের মধ্যে কাটে। ইঁহার ধর্মমতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই মানুষটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গি এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশ এমন ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুধু সঙ্কোচ নয়, দুঃখবোধ হয়। আপনিই বুঝা যায় এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্ফল। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসিমুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে, কুণ্ঠায় আমার মুখেও আর কথা রহিল না। তারপর হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছি, তবে একটা কৌতূহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিত্তের শান্তি ও দেহের নির্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার রহস্য, ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কিন্তু সে সুযোগ এ যাত্রায় বোধ করি আর মিলিল না। মনে মনে বলিলাম, আবার যদি কখনো আসা হয় ত তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিগ্রহমূর্তি সচরাচর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এ আশ্রমে সে বিধি ছিল না। ঠাকুরের বৈষ্ণব পূজারী একজন বাহিরে থাকে, সে আসিয়া যথারীতি আজও পূজো করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার 'পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠে। এ কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি আজও

যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধ হয়, এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, এতদিন এখানে আছি, এ বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে? সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও ত একটা কথা আছে!

আরও দুইদিন কাটিল। কিন্তু আর না। কমললতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্মা ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। দ্বারিকাদাস গত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম।

গোঁসাইজী কহিলেন, আজ যাবে গোঁসাই? আবার কবে আসবে?

সে ত জানিনে গোঁসাই।

কমললতা কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবে।

আমাদের কথাটা এঁর কানেও গেছে জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কহিলাম, সে কাঁদতে যাবে কিসের জন্যে?

গোঁসাইজী একটু হাসিয়া কহিলেন, তুমি জানো না বুঝি?

না।

ওর স্বভাবই এমনি। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়।

কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম, যার স্বভাব শোক করা সে করবেই, আমি তাকে থামাব কি দিয়ে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমার পিছনে দাঁড়াইয়া কমললতা।

দ্বারিকাদাস কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, ওর ওপর রাগ ক'রো না গোঁসাই, শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারেনি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক খাটিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার কাছে কাল ও নিজেই বড় দুঃখ করছিল। আর বোষ্টম-বৈরিগীর আদর-যত্ন করবার কিই বা আছে! কিন্তু আবার যদি কখনো তোমার এদিকে আসা হয় ভিখিরীদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত গোঁসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমললতা সেখানেই তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! বিদায়-গ্রহণের প্রাক্কালে কত কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিত্তের দুর্বলতার গ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু উত্যক্ত অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন রূঢ়তায় যে নিজের মর্যাদা খর্ব করিয়া বসিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই!

নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গহরের খোঁজে আসিয়াছে। কাল হইতে এখনও সে গৃহে ফিরে নাই। আশ্চর্য হইয়া গেলাম,—সে কি নবীন, সে ত এখানেও আর আসে না!

নবীন বিশেষ বিচলিত হইল না, বলিল, তবে বোধ হয় কোন্ বনেবাদাড়ে ঘুরচে—নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করেছে—এইবার কখন সাপে কামড়ানোর খবরটা পেলেই নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

তার সন্ধান করা ত দরকার নবীন?

দরকার ত জানি, কিন্তু খুঁজব কোথায়? বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রাণটা ত আর দিতে পারিনে বাবু, কিন্তু তিনি কোথায়? একবার জিজ্ঞেসা করে যেতে চাই যে?

তিনিটা কে?

ঐ যে কমলিলতা।

কিন্তু সে জানবে কি করে নবীন?

সে জানে না? সব জানে!

আর বিতর্ক না করিয়া উত্তেজিত নবীনকে মঠের বাহিরে লইয়া আসিলাম, বলিলাম, সত্যিই কমললতা কিছুই জানে না নবীন। নিজে অসুখে পড়ে তিন-চার দিন সে আখড়ার বাইরেও যায়নি।

নবীন বিশ্বাস করিল না। রাগ করিয়া বলিল, জানে না? ও সব জানে। বোষ্টমী কি মন্তর জানে—ও পারে না কি? কিন্তু পড়তো একবার নবনের পাল্লায়, ওর চোখমুখ ঘুরিয়ে কেত্তন করা বার করে দিতুম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া যেন ভেলকিতে উড়িয়ে দিলে!

তাহাকে শান্ত করার জন্য কহিলাম, কমললতা টাকা নিয়ে কি করবে নবীন? বোষ্টম মানুষ, মঠে থাকে, গান গেয়ে দুটো ভিক্ষে করে ঠাকুর-দেবতার সেবা করে, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া বৈ ত নয়—ওকে টাকার কাঙ্গাল বলে ত আমার বোধ হয় না নবীন!

নবীন কতকটা ঠান্ডা হইয়া বলিল, ওর নিজের জন্যে নয় তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্দরঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। তেমনি চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। বড়বাবাজীটাও লোভী নয়, কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েছে যে। ঠাকুরসেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা ঘি-দুধ নিত্যি চাই। নয়ন চক্কোত্তির মুখে কানাঘুষোয় শুনাচি আখড়ার নামে বিশ বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে। কিছুই থাকবে না বাবু, যা আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুকবে।

বলিলাম, হয়ত গুজব সত্যি নয়। কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চক্কোত্তিও ত কম নয় নবীন।

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিট্‌লে বামুন মস্ত ধাঁড়িবাজ। কিন্তু বিশ্বেস না করি কি করে বলুন। সেদিন খামকা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্তর করে দিলে। অনেক মানা করলুম, শুনলে না। বাপ বহুৎ রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না? শুনুন কথা!

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, আমি কিসের জন্য যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি এ কথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম, কাল কালিদাসবাবুর ছেলের ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিল না।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুদ্‌বেগে একটা সন্দেহ জাগিল—বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়। সেই ভুরুওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদল-করা স্বামিত্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর। এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষ্ণবী সেদিন কৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবে না গোঁসাই। রাগ করবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসে না? হয়ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই। টাকাকড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়।

নবীন চলিয়া গেছে, বকুলতলার সেই ভাঙ্গা বেদীটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম পাঁচটার গাড়ি ধরিতে গেলে দেরি করা আর চলে না। কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটাই এমনি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে, ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি, আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পুঁটুর বৌভাতে অন্নগ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরুদ্দিষ্ট গহরের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান তখন মানা করিবার কেহ নাই। দেখি, পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাকচে গোঁসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পেঁছিতে তোমার রাত হবে নতুনগোঁসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহের মতই সযত্ন আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়। উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুনগোঁসাই, আবার আসবে ত?

তুমি থাকবে ত?

তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?

তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আসতে হবে?

না, সে তোমাকে আমি বলব না।

না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে, বলো?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না সেও তোমাকে আমি বলবো না। তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই কমললতা, কাল যাবো —কিন্তু কিছুতেই এ কথা বলা গেল না।

চললাম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমললতার দেখাদেখি সেও হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

বৈষ্ণবী তাহাকে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কি রে পোড়ারমুখী, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর্।

কথাটায় যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিযা তাহাদের আশ্রম ছাড়িয়া তখন বাহির হইয়া আসিলাম।

নয়

আজ অবেলায় কলিকাতার বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তার পরে এর চেয়েও দুঃখময় বর্মায় নির্বাসন। ফিরিয়া আসিবার হয়ত আর সময়ও হইবে না, প্রয়োজনও ঘটিবে না। হয়ত এই যাওয়াই শেষের যাওয়া। গণিয়া দেখিলাম আজ দশদিন। দশটা দিন জীবনের কতটুকুই বা। তথাপি মনের মধ্যে সন্দেহ নাই দশদিন পূর্বে যে-আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং যে-আমি বিদায় লইয়া আজ চলিযাছি, তাহারা এক নয়।

অনেককেই সখেদে বলিতে শুনিয়াছি, অমুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছে! অর্থাৎ অমুকের জীবনটা যেন সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের মত তাহার অনুমানের পাঁজিতে লেখা নির্ভুল হিসাব। গরমিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁক-কষার বাহিরে দুনিয়ার আর কিছু নাই। জানেও না সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়, একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয় তাহার নির্দেশ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এখানে একটা নিমেষও তীক্ষ্ণতার তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বনবাদাড়ের মধ্য দিয়া এপথ-ওপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্টেশন চলিয়াছিলাম। অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাবার মত। ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—শুধু জানি ওখানে পেঁছিলে যখন হউক গাড়ি একটা জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলোই যেন চেনা। যেন কতদিন এ পথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল সেগুলা বড়, এখন কি করিয়া যেন সঙ্কীর্ণ এবং ছোট্ট হইযা গেছে; কিন্তু ঐ না খাঁয়েদের গলায়-দড়ের বাগান। তাই ত বটে! এ যে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার শেষপ্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শূলের ব্যথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানি না,

কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মত এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মত, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুলগাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরমস্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।

সারি সারি অনেকগুলা বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত এটুকু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় পরিচিত ভারী একটি মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিক-ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল—বাঃ! এ যে আমাদের সেই যশোদা বৈষ্ণবীর আউশফুলের গন্ধ! ছেলেবেলায় ইহার জন্য যশোদার কত উমেদারিই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এদিকে মিলে না, কি জানি সে কোথা হইতে আনিয়া তাহার আঙিনার একধারে পুঁতিয়াছিল। ট্যারা-বাঁকা গাঁটে-ভরা বুড়ো মানুষের মত তাহার চেহারা—সেদিনের মত আজও তাহার সেই একটিমাত্র সজীব শাখা এবং ঊর্ধ্বে গুটিকয়েক সবুজ পাতার মধ্যে তেমনি গুটিকয়েক সাদা সাদা ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টমঠাকুরকে আমরা দেখি নাই, আমাদের জন্মের পূর্বেই তিনি গোলোকে রওনা হইয়াছিলেন। তাহারই ছোট্ট মনোহারী দোকানটি তখন বিধবা চালাইত। দোকান ত নয়, একটি ডালায় ভরিয়া যশোদা মালা-ঘুন্‌সি আর্শি-চিরুনি, আলতা, তেলের মশলা, কাঁচের পুতুল, টিনের বাঁশি প্রভৃতি লইয়া দুপুরবেলায় বাড়ি বাড়ি বিক্রি করিত। আর ছিল তাহার মাছ ধরিবার সাজসরঞ্জাম। বড় ব্যাপার নয়, দু-এক পয়সা মূল্যের ডোরকাঁটা। এই কিনিতে যখন-তখন তাহাকে ঘরে গিয়া আমরা উৎপাত করিতাম। এই আউশগাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত। ফুলের জন্য আমরা উপদ্রব করিলে সে সমাধিটি দেখাইয়া বলিত, না বাবাঠাকুর, ও আমার দেবতার ফুল, তুললে তিনি রাগ করেন।

বৈষ্ণবী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানি না—হয়ত খুব বেশিদিন নয়। চোখে পড়িল গাছের একপারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি, বোধ হয় যশোদারই হইবে। খুব সম্ভব, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। স্তূপের খোঁড়া-মাটি অধিকতর উর্বর হইয়া বিছুটি ও বনচাঁড়ালের গাছে গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—যত্ন করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের পরিচিত বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, সন্ধ্যা-দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া এবং তাহারি উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও তেমনি তেলে তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট্ট ঘরটি এখনো সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই—সহস্র ছিদ্রময় শতজীর্ণ খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণপণে আগলাইয়া আছে।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে। কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকী ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের

মধ্য হইতে ভাঙ্গা চালের নীচে দিয়া গুড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার-প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়। কিন্তু কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করিনি ত?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না, এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ-দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাঙ্গা পাড়ের সেলাইকরা বগ্‌লেস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই—অনশনে অর্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি এমনি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

যাইবার পূর্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটায় একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে দেখা কিছুই গেল না, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা-রানী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় দেবদেবতার প্রতিমূর্তি নূতন কাপড়ের গাঁট হইতে সংগ্রহ করিয়া যশোদা ছবির শখ মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলায় মুগ্ধচক্ষে এগুলি বহুবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেয়ালের কাদা মাখিয়া এগুলি আজও কোনমতে টিঁকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি দুর্দশায় পড়িয়া সেই রঙ-করা হাঁড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার বাণ্ডিল, দেখামাত্রই সে কথা আমার মনে পড়িল। আরও কি কি যেন এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে অন্ধকারে ঠাহর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে প্রাণপণে কিসের যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ির এক কোণে এ যেন মৃতশিশুর পরিত্যক্ত খেলাঘর। গৃহস্থালীর নানা ভাঙ্গাচোরা জিনিস দিয়া সযত্নে রচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে সে ফেলিয়া গেছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার ঝাড়ামোছা করিবার তাগিদ গেছে ফুরাইয়া—পড়িয়া আছে শুধু কেবল জঞ্জালগুলা কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম, সে-বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্‌ বন্ধুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙ্গা ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম, কেন এমন হয়? আর কোন একটা দিনে এ-সব দেখিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, কিন্তু আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাতুর, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারা অজস্রধারায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তখনি গাড়ি মিলিল। কলিকাতার বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে না। টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশি বাজাইয়া সে যাত্রা শুরু করিল। স্টেশনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজলচক্ষে বার বার ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয় না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল—দশটা দিন মানুষের জীবনের কতটুকু, অথচ কতই না বড়!

কাল প্রভাতে কমললতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তার পরে চলিবে তাহার সারা-দিনের ঠাকুরসেবা। কি জানি, দিন-দশেকের সাথী নতুনগোঁসাইকে ভুলিতে তাহার ক'টা দিন লাগিবে!

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি, দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

তাই হোক। তাই যেন হয়।

ছেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষ্যও নাই, জোর করিয়া কোন-কিছু কামনা করিতেও জানি না—সুখ-দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র। তথাপি এতটা কাল কাটিল শুধু পরের দেখাদেখি পরের বিশ্বাসে ও পরের হুকুম তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে দিয়া সুনির্বাহিত হয় না। দ্বিধায় দুর্বল সকল সঙ্কল্প সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ওই অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়া গেলেন। বার বার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম, বার বার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল, চলো না গোঁসাই এখান থেকে যাই, গান গেয়ে পথে-পথে দু'জনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই, কিন্তু আমার বাধিল। আমার নাম দিল সে নতুনগোঁসাই। বলিল, ও নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোঁসাই। তাহার বিশ্বাস আমি তাহার গত জীবনের বন্ধু। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে সাধনায় তাহার বিঘ্ন ঘটিবে না। বৈরাগী দ্বারিকাদাসের শিষ্যা সে, কি জানি কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন!

অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহ ও স্বার্থে মিশামিশি সেই কঠিন লিপি। তবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচ্ছেদে সে আমার শেষ হইয়াছে। হয়ত এ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া দিতে কি কোথায় কেহ আছে? জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে কত কথা কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শিকারের আয়োজনে কুমারসাহেবের সেই তাঁবু, সেই দলবল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন, দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি। যে মরিয়াছে বলিয়া জানিতাম তাহাকে চিনিতে পারি নাই—সেদিন শ্মশানপথে তাহার সে কি ব্যগ্র ব্যাকুল মিনতি! শেষে ক্রুদ্ধ হতাশ্বাসে সে কি তীব্র অভিমান! পথরোধ করিয়া কহিল, যাবে বললেই তোমাকে যেতে দেব নাকি? কৈ যাও ত দেখি! এই বিদেশে বিপদ ঘটলে দেখবে কে? ওরা, না আমি?

এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার ঘুচিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল না।

আরায় পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়িতে আসিয়া জ্বরে পড়িলাম। এখানে সে আসিতে পারে না—এখানে সে মৃত—এর বাড়া লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম—সে ওই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তার পরেও বাঁচিতে বলো নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানি না বলিয়া নয়—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ স্নিগ্ধ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমললতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ। ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া? কি হইবে আমার চাকরিতে? নূতন ত নয়—সেদিনই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হইবে? কেবল কমললতাই ত বলে নাই, দ্বারিকাগোঁসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বঞ্চনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়া কি এ আমন্ত্রণে কোন সত্যই নাই? এতকাল জীবনটা কাটিল যেভাবে, এই কি ইহার শেষ কথা? কিছুই জানিতে বাকী নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি, বলিয়াছি সব ভুয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস ও উপহাসকেই মূলধন করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে কবে লাভ করিয়াছে?

গাড়ি আসিয়া হাওড়া স্টেশনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায় থাকিয়া জিনিসপত্র যা-কিছু আছে, দেনা-পাওনা যা-কিছু বাকী, সমস্তই চুকাইয়া দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। রহিল আমার চাকরি, রহিল আমার বর্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম—রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবু এলেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলাম—রতন, কখন এলি রে?

এসেছি সন্ধ্যাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া—আলিস্যিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বেশ করেছিলে। খাওয়া হয়নি ত?

আজ্ঞে না।

তবেই দেখচি মুশকিলে ফেললি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন খুশি হইয়া কহিল, তবে ত ভালই হয়েছে। আপনার প্রসাদ পেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারব।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাপতে বিনয়ের অবতার! কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। মুখে বলিলাম, তা হলে কাছাকাছি কোন দোকান খুঁজে দ্যাখ যদি প্রসাদের যোগাড় করে আনতে পারিস, কিন্তু শুভাগমন হ'লো কিসের জন্যে? আবার চিঠি আছে নাকি?

রতন কহিল, আজ্ঞে না। চিঠি লেখালেখিতে অনেক ভজকটো। যা বলবার তিনি মুখেই বলবেন।

তার মানে আবার আমাকে যেতে হবে নাকি?

আজ্ঞে না। মা নিজেই এসেচেন।

শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই রাতে কোথায় রাখি কি বন্দোবস্ত করি ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু কিছু ত একটা করা চাই! জিজ্ঞাসা করিলাম, এসে পর্যন্ত কি ঘোড়ার গাড়িতেই বসে আছেন নাকি?

রতন হাসিয়া কহিল, মা সেই মানুষই বটে! না বাবু, আমরা চারদিন হ'লো এসেছি—এই চারটে দিনই আপনাকে দিনরাত পাহারা দিচ্চি। চলুন।

কোথায়? কতদূরে?

দূরে একটু বটে, কিন্তু আমার গাড়ি ভাড়া করা আছে, কষ্ট হবে না।

অতএব, আর একদফা জামা-কাপড় পরিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিতে হইল। শ্যামবাজারের কোন্ একটা গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ি, সুমুখে প্রাচীরঘেরা একটুখানি ফুলের বাগান। রাজলক্ষ্মীর বুড়া দরোয়ান দ্বার খুলিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল; তাহার আনন্দের সীমা নাই—ঘাড় নাড়িয়া মস্ত নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবুজী?

বলিলাম, হাঁ তুলসীদাস, ভালো আছি। তুমি ভালো আছ?

প্রত্যুত্তরে সে তেমনি আর একটা নমস্কার করিল। তুলসী মুঙ্গের জেলার লোক, জাতিতে কুর্মী, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে সে বরাবর বাঙ্গলা রীতিতে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে।

আর একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদের শব্দ-সাড়ায় বোধ করি সেইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, রতনের প্রচণ্ড তাড়ায় সে বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অকারণে অপরকে ধমক দিয়া রতন এ বাড়িতে আপন মর্যাদা বহাল রাখে। বলিল, এসে পর্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রুটি সাঁটচো বাবা, তামাকটুকু পর্যন্ত সেজে রাখতে পারনি? যাও জল্‌দি -

এ লোকটি নূতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত - আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে ফুল-কাটা জাজিম ও গোটা-দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহুব্যবহৃত অত্যন্ত প্রিয় গুড়গুড়িটি এবং ইহারই অদূরে সযত্নে রাখা আমার জরির কাজ-করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষ্মীর নিজের হাতে বোনা, পরিহাসচ্ছলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটিও খোলা, এ ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম একধারে নূতন-কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেমনি নূতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়-জামা। গঙ্গামাটিতে যাইবার পূর্বে এগুলি তৈরি হইয়াছিল। মনেও ছিল না, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা!

যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট দিলুম।

কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থদেহে ওঁকে যে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেচি এই আমার ঢের। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে নূতন চোখে দেখিলাম। দেহে রূপ ধরে না। সেদিনের পিয়ারীকে মনে পড়িল, শুধু কয়েকটা বছরের দুঃখ-শোকের ঝড়জলে স্নান করিয়া যেন সে নবকলেবর ধরিয়া আসিয়াছে। এই দিন-চারেকের নূতন বাড়িটার বিলিব্যবস্থায় বিস্মিত হই নাই, কারণ তাহার একটা বেলার গাছতলার বাসাও সুশৃঙ্খলায় সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আপনাকে আপনি যেন এই ক'দিনেই ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে সমস্ত খুলিয়া ফেলিল—যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে—গোটাকয়েক মাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলা অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরনের কাপড়খানা দামী নয়—সাধারণ মিলের শাড়ি—আটপৌরে, ঘরে পরিবার। মাথার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশেপাশে ঝুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহারা শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অত দেখচ?

দেখ্‌ছি তোমাকে।

নতুন নাকি?

তাই ত মনে হচ্ছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

না।

মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত-দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। দিলে কি করবে বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া উঠিল. কহিল, ছুঁড়ে ফেলে দেবে না ত?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, দিয়েই দেখ না। কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচ নাকি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল. রতন আগে যাক, তারপরে তোমাকে দেখাচ্চি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি। কিন্তু বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার-পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুঁটুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে? জানো, রাতদিন আমার কি করে কেটেচে?

হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানব কি করে?

হাঁ গো হাঁ, হঠাৎ বৈ কি! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক দিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাব। ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেব? রাত বারোটা হয়ে গেল।

বারোটা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি নিজে যাচ্চি। তুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা করে দে।

খাইতে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেষের দিনগুলার কথা মনে পড়িল। তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন রাজলক্ষ্মীর খোঁজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না—রান্নাঘরে তাহার নিজের যাওয়া চাই। কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, ওটা ছিল বিকৃতি। বুঝিলাম, কারণ যাহাই হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাঙ্গ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটুর বিয়ে কেমন হ'লো?

বলিলাম, চোখে দেখিনি, কানে শুনেছি ভালোই হয়েছে।

চোখে দেখনি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

বিবাহের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম, শুনিয়া সে ক্ষণকাল গালে হাত দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক করলে। আসবার আগে পুঁটুকে কিছু একটা যৌতুক দিয়েও এলে না?

সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেয়েটাকে কিছু পাঠিয়ে দেব কিন্তু ছিলে কোথায় বললে না?

বলিলাম, মুরারিপুরে বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বৈ কি। বোষ্টমীরা ওখান থেকেই ত পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসত। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

সেইখানেই ছিলাম।

শুনিয়া যেন রাজলক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দিল—সেই বোষ্টমদের আখড়ায়? মা গো মা—বল কি গো? তাদের যে শুনেচি সব ভয়ঙ্কর ইল্লুতে কাণ্ড! কিন্তু বলিয়াই সহসা উচ্চ-কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল, তা তোমার অসাধ্যি কাজ নেই। আরায় যে মূর্তি দেখেচি! মাথায় জটপাকানো, গা-ময় রুদ্রাক্ষির মালা, হাতে পেতলের বালা—সে অপরূপ—

কথা শেষ করিতে পারিল না, হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। রাগ করিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলাম। অবশেষে বিষম খাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া অনেক কষ্টে হাসি থামিলে বলিল, বোষ্টুমীরা কি বললে তোমায়? নাক-খাঁদা উল্কিপরা অনেকগুলো সেখানে থাকে যে গো।

আর একটা তেমনি প্রবল হাসির ঝোঁক আসিতেছিল, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, এবার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেব। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, মুখে বলিল, সে তোমার মত বীরপুরুষের কাজ নয়।

নিজেই লজ্জায় বেরুতে পারবে না। সংসারে তোমার মত ভীতু মানুষ আর আছে নাকি?

বলিলাম, কিছুই জানো না লক্ষ্মী। তুমি অবজ্ঞা করলে ভীতু বলে, কিন্তু সেখানে একজন বৈষ্ণবী বলত আমাকে অহঙ্কারী—দাম্ভিক।

কেন তার কি করেছিলে?

কিছুই না। সে আমার নাম দিয়েছিল নতুনগোঁসাই। বলতো, গোঁসাই, তোমার মত উদাসীন বৈরাগী-মনের চেয়ে দাম্ভিক মন পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

রাজলক্ষ্মীর হাসি থামিল, কহিল, কি বললে সে?

বললে, এরকম উদাসীন, বৈরাগী-মনের মানুষের চেয়ে দাম্ভিক ব্যক্তি দুনিয়ায় আর খুঁজে মেলে না। অর্থাৎ কিনা আমি দুর্ধর্ষ বীর। ভীতু মোটেই নই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল। পরিহাসে কানও দিল না, কহিল, তোমার উদাসী-মনের খবর সে মাগী পেলে কি করে?

বলিলাম, বৈষ্ণবীদের প্রতি ওরূপ অশিষ্ট ভাষা অতিশয় আপত্তিকর।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা জানি। কিন্তু তিনি তোমার নাম ত দিলেন নতুনগোঁসাই—তাঁর নামটি কি?

কমললতা। কেউ কেউ রাগ করে কমলিলতাও বলে। বলে, ও জাদু জানে। বলে, ওর কীর্তনগানে মানুষ পাগল হয়। সে যা চায় তাই দেয়।

তুমি শুনেচো?

শুনেচি। চমৎকার।

ওর বয়েস কত?

বোধ হয় তোমার মতই হবে। একটু বেশি হতেও পারে।

দেখতে কেমন?

ভালো। অন্ততঃ মন্দ বলা চলে না। নাক-খাঁদা, উল্কিপরা যাদের তুমি দেখেচ তাদের দলের নয়। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেচি। যে ক'দিন ছিলে তোমাকে যত্ন করত ত?

বলিলাম, হাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা করুক। যে সাধ্যি-সাধনায় তোমাকে পেতে হয় তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টম-বৈরাগীর কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাব কোথাকার কে এক কমললতাকে? ছি! এই বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিশ্বাস পড়িল। বোধ হয় একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে হুঁশ হইল। মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিত হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতেছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ছায়াটা তার মস্তবড় বীভৎস জন্তুর মত কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও কত গুণেই না কায়াটাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিলাম তাহার কপালের চুলগুলা ভিজা। বোধ হয় এইমাত্র চোখেমুখে জল দিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এরকম কলকাতায় চলে এলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই এমন মন কেমন করতে লাগল যে কিছুতেই টিঁকতে পারলুম না, ভয় হ'লো বুঝি হার্টফেল করবো—এ জন্মে আর চোখে দেখতে পাব না, এই বলিয়া সে গুড়গুড়ির নলটা আমার মুখ হইতে সরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল, বলিল, একটু থামো। ধুঁয়োর জ্বালায় মুখ পর্যন্ত দেখতে পাইনে এমনি অন্ধকার করে তুলেচো।

গুড়গুড়ির নল গেল, কিন্তু পরিবর্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠোর মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, বৌমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা বলে তাই।

তার বেশি কিছু নয়?

কিছু নয় তা বলিনে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পারো শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি দুঃখ কখনো তোমাকে দিয়েচি লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্যন্ত কত দুঃখই না দিলুম। নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের ওপর তোমার অসম্মান হতে দিলুম—তার শাস্তি এখন তাই দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে চলছে। দেখতে পাচ্চ ত?

হাসিয়া বলিলাম, কৈ না!

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাহলে মন্তর পড়ে কেউ দু'চোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে দিয়েচে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ করেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মত কারো কখনো দেখেচো? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো না, কোথা থেকে এসে জুটল ধর্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে ঠেলে দিলুম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হ'লো না, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলুম।

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া মুছাইয়া দিলে বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরল। খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয় তার মাথামুণ্ড নেই—গুরুদেব তখনো বাড়িতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশ হাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলুম কৈ? মনের মধ্যে হু-হু করে, পুজোয় বসলেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়ল।

কে ধরলে?—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

হাঁ গো দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

তাই দিও, তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দু'দিন কাটল। কোথা দিয়ে যে কাটল জানিনে। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলুম। গঙ্গায় স্নান করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বললুম, মা, চিঠিখানা সময় থাকতে যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আত্মহত্যা করে না মরতে হয়।

আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন বলো ত?

সহসা এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারিনে, বুঝতেও পারিনে।

স্বীকার করো?

করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় একমুহূর্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই বিশ্বাস করো? এ আমাদেরই সম্ভব, পুরুষে সত্যিই এ পারে না!

কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের পাটনার লছমন সাউ। আমাকে সে বারাণসী কাপড় বিক্রি করত। বুড়ো আমাকে বড়ো ভালোবাসত, আমাকে বেটী বলে ডাকত। আশ্চর্য হয়ে বললে, বেটী আপ ইঁহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতুম, বললুম, সাউজী, আমি কলকাতায় যাব, আমাকে একটি বাড়ি ঠিক করে দিতে পার?

সে বললে, পারি। বাঙ্গালীপাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ি ছিল, সস্তায় কিনেছিল; বললে, চাও ত বাড়িটা আমি সেই টাকাতেই তোমাকে দিতে পারি।

সাউজী ধর্মভীরু লোক, তার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজী হয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে টাকা দিলুম, সে রসিদ লিখে দিলে। তারই লোকজন এ-সব জিনিসপত্র কিনে দিয়েচে। ছ-সাতদিন পরেই রতনদের সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এলুম, মনে মনে বললুম

মা অন্নপূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করেচো, নইলে এ সুযোগ কখনো ঘটত না। দেখা তাঁর আমি পাবই। এই ত দেখা পেলুম।

বলিলাম, কিন্তু আমাকে যে শীঘ্রই বর্মা যেতে হবে লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ ত চল না। সেখানে অভয়া আছেন, দেশময় বুদ্ধদেবের বড় বড় মন্দির আছে—এ-সব দেখতে পাব।

কহিলাম, কিন্তু সে যে বড় নোংরা দেশ লক্ষ্মী, শুচিবায়ুগ্রস্তদের বিচার-আচার থাকে না—সে দেশে তুমি যাবে কি করে?

রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি একটা কথা বলিল, ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চেঁচিয়ে বলো শুনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপর অসাড়ের মত তেমনিভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহার উষ্ণ ঘন নিশ্বাস আমার গলার উপরে, গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

দশ

ওগো, ওঠো! কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হ'লো—কত ঘুমোবে?

পাশ ফিরিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলাম ঘুমোতে দিলে কৈ? এই ত সবে শুয়েছি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ছি-ছি, কি বেহায়া তুমি! মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো। নিজে সারারাত কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোলে, বরঞ্চ আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙে যায়। আবার আমাকেই এই কথা! ওঠো বলচি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দোব।

উঠিয়া বসিলাম। বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা। সকালের সেই স্নিগ্ধ আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরূপ মূর্তিই চোখে পড়িল। তাহার স্নান, পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়েপাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্ত-চন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নূতন রাঙা বারাণসী শাড়ি, পূবের জানালা দিয়া একটুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপাহাসি তাহার ঠোঁটের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্চিত ভ্রূ-দুটির নীচে চঞ্চল চোখের দৃষ্টি যেন উচ্ছল আবেগে ঝলমল করিতেছে—চাহিয়া আজও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অত দেখচো বলো ত?

কহিলাম, তুমিই বলো ত কি অত দেখচি?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচো এর চেয়ে পুঁটু দেখতে ভালো কিনা, কমললতা দেখতে ভালো কিনা—না?

বলিলাম, না। রূপের দিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছেও লাগে না সে এমনিই বলা যায়। অত করে দেখতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে যাক গে। কিন্তু গুণে?

গুণে? সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা মানতেই হবে।

গুণের মধ্যে ত শুনলুম কেত্তন করতে পারে।

হাঁ, চমৎকার।

চমৎকার—তা তুমি বুঝলে কি করে?

বাঃ—তা আর বুঝিনে? বিশুদ্ধ তাল, লয়, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে?

বলিলাম, তাল তাকে বলে ছেলেবেলায় যা তোমার পিঠে পড়ত। মনে নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে। কাল খামকা তোমায় ভীতু বলে অপবাদ দিয়েছি বৈ ত নয়, কিন্তু কমললতা শুধু তোমার উদাসী মনের খবরটাই পেলে, তোমার বীরত্বের কাহিনীটা শোনেনি বুঝি?

না, আত্মপ্রশংসা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো। কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে? সেই যে পাঠশালার ছুটি হলে তুমি গাইতে, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বড্ড ভাবের গান। তোমার মুখে শুনলে গোরু-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়ত—মানুষ ত কোন ছার।

রতনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আবার চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি মা, তৈরি হতে দেরি হবে না। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চায়ের বাটিটা হাতে তুলিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিল, আর দেরি ক'রো না, ওঠো। এবার চা ফেলা গেলে রতন খেপে যাবে! ওর অপব্যয় সহ্য হয় না। কি বলিস রতন?

রতন জবাব দিতে জানে। কহিল, আপনার না সইতে পারে মা, কিন্তু বাবুর জন্যে আমার সব সয়। এই বলিয়া সে বাটিটা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইলে রাজলক্ষ্মীকে সে 'আপনি' বলিত, না হইলে 'তুমি' বলিয়া ডাকিত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, রতন তোমাকে সত্যই বড় ভালোবাসে।

বলিলাম, আমারও তাই মনে হয়।

হাঁ। কাশী থেকে তুমি চলে এলে ও ঝগড়া করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। রাগ করে বললুম, আমি যে তোর এত করলুম রতন, তার কি এই প্রতিফল? ও বললে, রতন নেমকহারাম নয় মা। আমিও চললুম বর্মায়, তোমার ঋণ আমি বাবুর সেবা করে শোধ দেব। তখন হাতে ধরে, ঘাট মেনে তবে ওকে শান্ত করি।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে তোমার বিয়ের নেমন্তন্নপত্র এলো।

বাধা দিয়া বলিলাম, মিছে কথা ব'লো না। তোমার মতামত জানার জন্যে—

এবার সেও আমাকে বাধা দিল, কহিল, হাঁগো হাঁ, জানি। রাগ করে যদি লিখতুম করো গে—করতে ত?

না!

না, বৈ কি। তোমরা সব পার।

না, সবাই সব কাজ পারে না।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে মনে কি বুঝলে, কেবলি দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দু'চোখ ছলছল করে আসে। তারপরে, তার হাতে যখন চিঠির জবাব দিলুম ডাকে ফেলতে, সে বললে, না, এ চিঠি ডাকে ফেলতে পারব না—আমি নিজে নিয়ে যাব হাতে করে। বললুম, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি বাবা? রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েচে আমি জানিনে মা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় যেন পদ্মাতীরের তলা ক্ষয়ে গেছে- গাছপালা, বাড়িঘর নিয়ে কখন যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! তোমার দয়ায় আমারও আর অভাব নেই মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারব না, কিন্তু বিশ্বনাথ মুখ তুলে যদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ো, সে বর্তে যাবে।

বলিলাম, ব্যাটা নাপতে কি সেয়ানা!

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আর দেরি ক'রো না, যাও।

দুপুরবেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল পরনে ছিল আটপৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে বারাণসী শাড়ির সমারোহ কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন?

আমি জানিনে।

নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

তা পারি। বর্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলুম জীবনের সবচেয়ে বড় দিনটিতে এটি পরব—তা ছাড়া কখনো পরব না।

তাই পরেছ আজ?

হাঁ, তাই পরেচি আজ।

হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু সে ত হয়েছে, এখন ছাড়ো গে'

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখুনি নাকি কালীঘাটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, এখনি? সে কি করে হবে? তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ত ছুটি পাব।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বলছিল তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু কাল দুটিখানি খেয়েছিলে আবার আজ থেকে শুরু হয়েছে উপবাস। আমি কি স্থির করেচি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখব, যা খুশি তাই আর করতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা হলে ত বাঁচি গো মশাই! খাই-দাই থাকি, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেইজন্যেই আজ তুমি কালীঘাট যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, শুধু আজকের দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব-বাদশা'দের যেমন কেনা-বাঁদী থাকত তার বেশি তোমার কাছে চাইব না।

এত বিনয় কেন বলো ত?

বিনয় ত নয় সত্যি। আপনার ওজন বুঝে চলিনি, তোমাকে মানিনি, তাই অপরাধের পরে অপরাধ করে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই লক্ষ্মীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই—নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের দিনটির জন্য হুকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে।

বলিলাম, নাহয় কাল যেয়ো। নিজেই বললে, সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেছো—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই দেখচি রাতের পর রাত জেগেও তোমার সেবায় আমার কষ্ট হয় না। কিসে আমার সমস্ত অবসাদ যেন মুছে দিয়ে যায়। কতদিন হ'লো ঠাকুর-দেবতা ভুলে ছিলুম, কিছুতে মন দিতে পারিনি—লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে মানা ক'রো না—যাবার হুকুম দাও।

তবে চলো, দু'জনে একসঙ্গে যাই।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, তাই চলো। কিন্তু মনে মনে ঠাকুর-দেবতাকে তাচ্ছিল্য করবে না ত?

বলিলাম, শপথ করতে পারব না, বরঞ্চ তোমার পথ চেয়ে আমি মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার হয়ে দেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিয়ো।

কি বর চাইব বলো।

অন্নের গ্রাস মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কামনাই খুঁজিয়া পাইলাম না। সে কথা স্বীকার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, তুমি বলো ত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইব আয়ু, চাইব স্বাস্থ্য, আর চাইব আমার ওপর এখন থেকে

যেন তুমি কঠিন হতে পার, প্রশ্রয় দিয়ে আর যেন না আমার তুমি সর্বনাশ করো। করতেই ত বসেছিলে।

লক্ষ্মী, এ হ'লো তোমার অভিমানের কথা।

অভিমান ত আছেই। তোমার সে চিঠি কখনো কি ভুলতে পারব!

অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম।

সে হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তা বলে এও আমার সয় না। কিন্তু কঠোর হতে ত তুমি পারবে না, সে তোমার স্বভাব নয়, কিন্তু এ কাজ আমাকে এখন থেকে নিজেই করতে হবে, অবহেলা করলে চলবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কাজটা কি? আরও খাড়া উপোস?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, উপোসে আমার শাস্তি হয় না, বরং অহংকার বাড়ে। ও আমার পথ নয়।

তবে পথটা কি ঠাওরালে?

ঠাওরাতে পারিনি, খুঁজে বেড়াচ্চি।

আচ্ছা, সত্যিই আমি কখনো কঠিন হতে পারি এ তোমার বিশ্বাস হয়?

হয় গো হয়—খুব হয়।

কখ্‌খনো হয় না—এ তোমার মিছে কথা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথাই ত। কিন্তু সেই হয়েছে আমার বিপদ গোঁসাই। কিন্তু বেশ নামটি বার করেছে তোমার কমললতা। কেবল ওগো হ্যাঁগো করে প্রাণ যায়, এখন থেকে আমিও ডাকব নতুনগোঁসাইজী বলে।

স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তবু হয়ত আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে—তাতেও স্বস্তি পাবে। বলো ঠিক না?

হাসিলাম, লক্ষ্মী, স্বভাব কখনো মলেও যায় না। বাদশাহী আমলের কেনা-বাঁদীদের মত কথাই হচ্ছে বটে। এতক্ষণে তারা তোমাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিত।

শুনিয়া রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জল্লাদের হাতে নিজেই ত সঁপে দিয়েছি।

বলিলাম, চিরকাল তুমি এত দুষ্ট যে, কোন জল্লাদের সাধ্য নেই তোমাকে শাসন করে।

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গিয়াই তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি! খাওয়া হয়ে এলো যে! দুধ কৈ? মাথা খাও, উঠে প'ড়ো না যেন। বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, এ, আর সেই কমললতা!

মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা-হাতে সে বাতাস করিতে বসিল, বলিল, এতকাল মনে হ'ত, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বসল না, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে চুল কেটে গয়না খুলে একেবারে তপস্যা জুড়ে দিলুম। ভাবলুম, আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরি হ'লো বলে। এক আপদ তুমি—সে ত বিদায় হ'লো। কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতে থামে না! ইষ্টমন্ত্র গেলুম ভুলে, ঠাকুর-দেবতা করলে অন্তর্ধান, বুক উঠল শুকিয়ে, ভয় হ'লো এই যদি ধর্মের সাধনা, তবে এ-সব হচ্চে কি! শেষে পাগল হবো নাকি!

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গোড়াতে দেবতারা সব ভয় দেখান! টিঁকে থাকলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েচি।

কোথায় পেলে?

এখানে। এই বাড়িতে।

অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দিতে যাব তোমার কাছে! আমার বয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রীতদাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করে না।

দ্যাখো, রাগিও না বলচি। একশ'বার ক্রীতদাসী-ক্রীতদাসী করো ত ভালো হবে না।

আচ্ছা, খালাস দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, স্বাধীন যে কত, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। হাত দিয়ে দেখি ঘামে তোমার কপাল ভিজে--আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল করে, তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে চোখ আর ফিরুতে পারলুম না। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কানা হয়ে ছিলুম কি? ভাবলুম, এ যদি পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম তবে থাক গে আমার ধর্মচর্চা—জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কার কথায়? ও কি, খাচ্চো না যে? সব দুধই পড়ে রইল যে!

আর পারিনে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

না, তাও না।

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে।

যদি হয়েও থাকি সে অনেক দিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাব।

বেদনায় মুখ তাহার পাংশু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবে না। যে শাস্তি পেলুম সে আর ভুলব না। এই আমার মস্ত লাভ। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙে না, নইলে লোভের বশে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! তারপর দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেলুম--মা যেন সব তাপ মুছে নিলেন। বাড়ি এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র। এসেছেন আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কিন্তু সে আমার বুকের রক্ত-নেঙড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে-ওঠা ঝরনার ধারা--আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। আনি গে দুটো ফল? বঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমায় খেতে দিইনি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমার আবার নিশ্বাস পড়িল। এ, আর সেই কমললতা!

কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী নাম দিয়াছিল!

দু'জনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি নয়টা। রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া সহজ-মানুষের মত কাছে আসিয়া বসিল।

বলিলাম, রাজপোশাক গেছে--বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও আমার রাজপোশাকই বটে। কিন্তু রাজার দেওয়া যে! যখন মরব, ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে ব'লো।

তাই হবে। কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি তুমি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে, এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক।

এইখানে? বেশ যা হোক! তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন? কখনো দেখেচো খেতে?

দেখিনি, কিন্তু দেখলে দোষ কি?

তা কি হয়? মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা দেবো কেন?

ও ফন্দি আজ খাটবে না লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেবো না। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা ক'বো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাবো না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেছো। এ আমার সইবে না।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, ফলমূল-মিষ্টান্ন। সে নামমাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েছে আমি খাইনে, কিন্তু কি ক'রে খাব বলো ত? কলকাতায় এসেছিলুম হারা-মকদ্দমার আপিল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন ফিরে আসত, আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না পাছে সে বলে, দেখা হয়েছে, কিন্তু বাবু এলেন না। যে দুর্ব্যবহার করেছি আমার বলবার ত কিছুই নেই।

বলবার দরকার ত নেই। তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

কে তেলাপোকা—তুমি?

তাই ত জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

এটি পরিহাস। কিন্তু হেতু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী আবার ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা লোকদেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বললে তোমাকে ফেরাব কি দিয়ে?

বলিলাম, একটু ভুল হ'লো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারে শ্রীকান্তের এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারনি।

হাতটা ধুয়ে আসি গে, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্ববিধ কাজকর্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল। কহিল, কমললতার গল্প শুনবো, বলো।

যতটা জানি সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বাদ দিলাম, কারণ, ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই ওকে সবচেয়ে বেজেছে। ওর দোষেই সে মারা গেল।

ওর দোষ কিসে?

দোষ বৈ কি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই ত কমললতা ডেকেছিল সকলের আগে আত্ম-হত্যায় সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে তার ঐ পথটাই সকলের আগে চোখে পড়ে গেল। এমনিই হয়, তাই পাপের সহায় হতে কখনো বন্ধুকে ডাকতে নেই—তাতে একের প্রায়শ্চিত্ত পড়ে অপরের ঘাড়ে। ও নিজে বাঁচল, কিন্তু ম'লো তার স্নেহের ধন।

যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না লক্ষ্মী।

তুমি বুঝবে কি করে? বুঝেছে কমললতা, বুঝেছে তোমার রাজলক্ষ্মী।

ওঃ—এই?

এই বৈ কি! আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে?

কিন্তু কালই যে বললে তোমার মনের সব কালি মুছে গেছে— আর কোন গ্লানি নেই—সে কি তবে মিছে?

মিছেই ত। কালি মুছবে ম'লে—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েচি, কিন্তু পারিনে কেবল তোমারই জন্যে!

তা জানি। কিন্তু এ নিয়ে বার বার যদি ব্যথা দাও, আমি এমনি নিরুদ্দেশ হবো, কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না। তুমি সব পারো, তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও বাধা মানে না।

এমন কথা আর বলবে না বলো?

না।

ভাববে না বলো?

তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না?

আমি ত কখনো যাইনে লক্ষ্মী, যখনি দূরে গেছি—তুমি শুধু চাওনি বলেই।

সে তোমার লক্ষ্মী নয়—সে আর কেউ।

সেই আর কেউকেই আজও ভয় করি যে।

না তাকে আর ভয় ক'রো না, সে রাক্ষুসী মরেছে। এই বলিয়া সে আমার সেই হাতটাই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল, তুমি কি সত্যিই বর্মায় যাবে?

সত্যিই যাবো।

কি করবে গিয়ে—চাকরি? কিন্তু আমরা ত দু'জন কতটুকুতেই বা আমাদের দরকার?

কিন্তু সেটুকুও ত চাই!

সে ভগবান দিয়ে দেবেন। কিন্তু চাকরি করতে তুমি পারবে না, ও তোমার ধাতে পোষাবে না।

না পোষালে চলে আসব।

আসবেই জানি। শুধু আড়ি ক'রে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাও।

কষ্ট না করলেই পার।

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল, যাও চালাকি ক'রো না।

বলিলাম, চালাকি করিনি, গেলে তোমার সত্যিই কষ্ট হবে। রাঁধাবাড়া, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা—

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবে ঝি-চাকররা করবে কি?

কোথায় ঝি-চাকর? তার টাকা কৈ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাই থাক। কিন্তু যতই ভয় দেখাও আমি যাবই।

চলো। শুধু তুমি আর আমি। কাজের তাড়ায় না পাবে ঝগড়া করবার অবসর, না পাবে পুজো-আহ্নিক-উপোস করার ফুরসত।

তা হোক গে। কাজকে আমি কি ভয় করি নাকি?

করো না সত্যি, কিন্তু পেরেও উঠবে না। দু'দিন বাদেই ফেরবার তাড়া লাগাবে।

তাতেই বা ভয় কিসের? সঙ্গে করে নিয়ে যাব, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনব। রেখে আসতে হবে না ত! এই বলিয়া সে একমুহূর্ত কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, সেই ভালো। দাস-দাসী লোকজন কেউ নেই, একটি ছোট্ট বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি—যা খেতে দেব তাই খাবে, যা পরতে দেব তাই পরবে—না, তুমি দেখো, আমি হয়ত আর আসতেই চাইব না।

সহসা আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কি ভাবচ?

রাজলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া একটু হাসিল, আমরা কবে যাব?

বলিলাম, এই বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে নাও, তারপরে যেদিন ইচ্ছে চল যাত্রা করি।

সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া আবার চোখ বুজিল।

আবার কি ভাবচ?

রাজলক্ষ্মী চাহিয়া বলিল, ভাবচি একবার মুরারিপুরে যাবে না?

বলিলাম, বিদেশে যাবার পূর্বে একবার দেখা দিয়ে আসব তাঁদের কথা দিয়েছিলাম।

তবে চল কালই দু'জনে যাই।

তুমি যাবে?

কেন ভয় কিসের? তোমাকে ভালোবাসে কমললতা, আর তাকে ভালোবাসে আমাদের গহরদাদা। এ হয়েছে ভালো।

এ-সব কে তোমাকে বললে?

তুমিই বলেছ।

না, আমি বলিনি।

হাঁ, তুমিই বলেছ, শুধু জানো না কখন বলেছ।

শুনিয়া সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

কেন নয়?

সে বেচারাকে ঠাট্টা করে তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কুপিত-কণ্ঠে কহিল, এতকালে আমার এই পরিচয় পেয়েছ তুমি? তোমাকে সে ভালোবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাবো আমি? তোমাকে ভালোবাসাটা কি অপরাধ? আমিও ত মেয়েমানুষ। হয়ত বা তাকে আমিও ভালোবেসে আসব।

কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চল যাই।

হাঁ চল, কাল সকালের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ব দু'জনে—তোমার কোন ভাবনা নেই—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করব না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, ও কি?

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না—কিছু ত নয়!

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমনধারা লাগিল।

এগার

পরদিন আমার অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না, মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলে না, কিন্তু রান্নাঘরের দাসী লালুর মাও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিসপত্র লইয়া রতন ভোরের গাড়িতে রওনা হইয়া গিয়াছে, সেখানকার স্টেশনে নামিয়া সে খান-দুই ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গেও মোটঘাট যাহা বাঁধা হইয়াছে তাহাও কম নয়।

প্রশ্ন করিলাম, সেখানে বসবাস করতে চললে নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু'একদিন থাকব না? দেশের বনজঙ্গল, নদীনালা, মাঠঘাট তুমিই একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-দেশের মেয়ে নই? আমার দেখতে সাধ যায় না?

তা যায় মানি, কিন্তু এত জিনিসপত্র, এত রকমের খাবার-দাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধ্‌হাতে যেতে বলো? আর তোমাকে ত বইতে হবে না, তোমার ভাবনা কিসের?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে? আর এই ভয়টাই বেশি ছিল যে,

বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে স্বচ্ছন্দে মাথায় তুলিবে, কিন্তু মুখে তুলিবে না। কি জানি সেখানে গিয়া কোন একটা ছলে উপবাস শুরু করিবে, না রাঁধিতে বসিবে বলা কঠিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যকার ভদ্র মন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে পারে না। যদিবা এ-সব কিছু করে, হাসিমুখে রহস্যে-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবস্থায় বাহুল্যভার কোনকালেই নাই, তাহাতে সংযম ও উপবাসে সেই দেহটাকে যেন লঘুতার একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার আজিকার সাজসজ্জাটি হইয়াছে বিচিত্র। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আসিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়েপান্ডার সযত্ন-রচিত অলক-তিলক তাহার ললাটে, পরনে তেমনি নানা ফুলে-ফুলে লতায়-পাতায় বিচিত্র খয়ের রঙের বৃন্দাবনী শাড়ি, গায়ে সেই কয়টি অলঙ্কার, মুখের 'পরে স্নিগ্ধ-প্রসন্নতা—আপন মনে কাজে ব্যাপৃত। কাল গোটা-দুই লম্বা আয়না-লাগানো আলমারি কিনিয়া আনিয়াছে, আজ যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কি-সব তাহাতে সে গুছাইয়া তুলিতেছিল। কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাঙরের চোখ-দুটা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে, হীরা ও পান্নাবসানো গলার হারের বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা পাড়ের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি যেন একটা নীলাভ দ্যুতি, টেবিলে চা খাইতে বসিয়া আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া ছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল—বাড়িতে সে জামা অথবা সেমিজ পরিত না। তাই কণ্ঠ ও বাহুর অনেকখানি হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে অনাবৃত হইয়া পড়িত, অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অত পারিনে বাপু! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দিনরাত বিবিয়ানা আর সয় না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের বেশি বাঁধাবাঁধি শুচিবায়ুগ্রস্তদের অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

আলমারির পাল্লা বন্ধ করিয়া হঠাৎ আয়নায় তাহার চোখ পড়িল আমার 'পরে। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগিয়া বলিল, আবার চেয়ে আছ? এভাবে বারে বারে কি আমাকে এত দেখ বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

আমি হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম বিধাতাকে ফরমাশ দিয়ে না জানি কে তোমাকে গড়িয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দ আর কার? আমার পাঁচ-ছ'বছর আগে এসেচো, আসবার সময় তাঁকে বায়না দিয়ে এসেছিলে—মনে নেই বুঝি?

না, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

চালান দেবার সময় কানে কানে তিনি বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু হ'লো চা খাওয়া? দেরি করলে যে আজও যাওয়া হবে না।

নাই বা হ'লো।

কেন বলো ত?

সেখানে ভিড়ের মধ্যে হয়ত তোমাকে খুঁজে পাব না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমাকে পাবে। আমিই তোমাকে খুঁজে পেলে বাঁচি।

বলিলাম, সেও ত ভালো নয়।

সে হাসিয়া কহিল, না, সে হবে না। লক্ষ্মীটি চল। শুনেচি নতুনগোঁসাইয়ের সেখানে একটা আলাদা ঘর আছে, আমি গিয়েই তার খিলটা ভেঙ্গে রেখে দেব। ভয় নেই, খুঁজতে হবে না—দাসীকে এমনই পাবে।

তবে চলো।

আমরা মঠে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন ঠাকুরের মধ্যাহ্নকালীন পূজা সেইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদে এতগুলি প্রাণী অকস্মাৎ গিয়া হাজির, তথাপি কি যে তাহারা খুশি হইল বলিতে পারি না। বড়গোঁসাই আশ্রমে নাই, গুরুদেবকে

দেখিতে আবার নবদ্বীপে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জন-দুই বৈরাগী আসিয়া আমারই ঘরে আস্তানা গাড়িয়াছে।

কমললতা, পদ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং আরও অনেকে আসিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল; কমললতা গাঢ়স্বরে কহিল, নতুনগোঁসাই, তুমি যে এত শীঘ্র এসে আবার আমাদের দেখা দেবে এ আশা করিনি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল, যেন কতকালের চেনা। বলিল, কমললতাদিদি, এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ওঁর মুখে, আরও আগে আসতে চেয়েছিলেন, কেবল আমার জন্যেই ঘটে ওঠেনি। ওটা আমারই দোষে।

কমললতার মুখ ক্ষণকালের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল, পদ্মা ফিক করিয়া হাসিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া সে যে সম্ভ্রান্তঘরের মেয়ে তাহা সবাই বুঝিয়াছে, শুধু আমার সঙ্গে যে তাহার কি সম্বন্ধ ইহাই তাহারা নিঃসন্দেহে ধরিতে পারে নাই। পরিচয়ের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর চোখে কিছুই এড়ায় না, বলিল, কমললতাদিদি, আমাকে চিনতে পারচো না?

কমললতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বৃন্দাবনে দেখনি কখনো?

কমললতাও নির্বোধ নয়, পরিহাসটা সে বুঝিল, হাসিয়া বলিল, মনে ত পড়চে না ভাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না পড়াই ভালো দিদি। আমি এ দেশেরই মেয়ে, কখনো বৃন্দাবনের ধারেও যাইনি,—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে আমাকে দেখাইয়া কহিল, আমরা দু'জনে এক গাঁয়ে এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তুম - দুটিতে যেন ভাইবোন এমনি ছিল ভাব। পাড়ার সুবাদে দাদা বলে ডাকতুম—বোনের মত আমাকে কি ভালোই বাসতেন। গায়ে কখনো হাতটি পর্যন্ত দেননি।

আমার পানে চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, বলচি সব সত্যি নয়?

পদ্মা খুশি হইয়া বলিল, তাই তোমাদের ঠিক একরকম দেখতে। দু'জনেই লম্বা ছিপ-ছিপে—শুধু তুমি ফরসা, আর নতুনগোঁসাই কালো, তোমাদের দেখলেই বোঝা যায়।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইযা বলিল, যাবেই ত ভাই। আমাদের ঠিক একরকম না হয়ে কি কোন উপায় আছে পদ্মা।

ও মা! তুমি আমারও নাম জানো যে দেখচি। নতুনগোঁসাই বলেছে বুঝি?

বলেছে বলেই ত তোমাদের দেখতে এলুম, বললুম, সেখানে একলা যাবে কেন, আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার কাছে ত আমার ভয় নেই—একসঙ্গে দেখলে কেউ কলঙ্কও রটাবে না। আর রটালেই বা কি, নীলকণ্ঠের গলাতেই বিষ লেগে থাকবে, উদরস্থ হবে না।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মেয়েদের এ যে কি রকম ঠাট্টা সে তারাই জানে। রাগিয়া বলিলাম, কেন ছেলেমানুষের সঙ্গে মিথ্যে তামাশা কোরচ বলো ত?

রাজলক্ষ্মী ভালোমানুষের মত বলিল, সত্যি তামাশাটা কি তুমিই নাহয় বলে দাও! যা জানি সরল মনে বলচি, তোমার রাগ কেন?

তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম,—সরল মনে বলচি! কমললতা, এতবড় শয়তান ফাজিল তুমি সংসারে দুটি খুঁজে পাবে না। এর কি একটা মতলব আছে, কখনো এর কথায় সহজে বিশ্বাস ক'রো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন নিন্দে কর গোঁসাই! তা হ'লে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমার মনেই কোন মতলব আছে?

আছেই ত।

কিন্তু আমার নেই। আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।

হাঁ, যুধিষ্ঠির!

কমললতাও হাসিল, কিন্তু সে উহার বলার ভঙ্গিতে। বোধ হয়, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল না, শুধু গোলমালে পড়িল। কারণ সেদিনও আমি ত কোন রমণীর সম্বন্ধেই

নিজের কোন আভাস দিই নাই। আর দিবই বা কি করিয়া। দিবার সেদিন ছিলই বা কি!

কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই তোমার নামটা কি?

আমার নাম রাজলক্ষ্মী। উনি গোড়ার কথাটা ছেড়ে দিয়ে বলেন শুধু লক্ষ্মী। আমি বলি, ওগো, হাঁগো। আজকাল বলচেন নতুনগোঁসাই বলে ডাকতে। বলেন, তবু স্বস্তি পাবো।

পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল—আমি বুঝেচি।

কমললতা তাহাকে ধমক দিল—পোড়ারমুখীর ভারী বুদ্ধি! কি বুঝেচিস্ বল ত?

নিশ্চয় বুঝেচি। বলব?

বলতে হবে না, যা। বলিয়াই সে সস্নেহে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া কহিল, কিন্তু কথায় কথায় বেলা বাড়ছে ভাই, রোদ্দুরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে। খেয়ে কিছু আসোনি জানি—চল, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর প্রসাদ পাব। তুমিও এসো গোঁসাই। এই বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইবার মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের আহ্বান। খাওয়া-ছোঁওয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে, এ সম্বন্ধে সত্যাসত্যর প্রশ্নই অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়—এ তাহার স্বভাব। এ ছাড়া সে বাঁচে না। জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সজীবতা কতদিন কত সংকট হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে সে কথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে বলিবে না—জানিয়াও লাভ নাই। আমি শুধু জানি, যে রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল পাওয়ার বড়। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

তাহার যতকিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ অপরের প্রতি জুলুম ছিল না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অত কষ্ট করার! একালে অত বাছতে গেলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানিনা সে জানে। শুধু তাহার চোখের উপর ভয়ংকর একটা-কিছু না ঘটিলেই সে খুশি। আমার পরোক্ষ অনাচারের কাহিনীতে কখনো-বা সে দুই কান চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করে, কখনো বা গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলে, আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হ'লে! তোমাকে নিয়ে আমার যে সব গেল!

কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জন মঠে যে-কয়টি প্রাণী শান্তিতে বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই, পূর্বাশ্রমের কথা ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই, অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসংকোচ-শ্রদ্ধায় বিতরণ করে এবং প্রত্যাখ্যান করিযাও আজো কেহ ইহাদের অপমানিত করে নাই। কিন্তু এই অপ্রীতিকর কার্যই আজ যদি অনাহূত আসিয়া আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় ত পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি, কমললতা মুখে কিছুই বলিবে না, তাহাকে বলিতেও দিবে না—হয়ত বা শুদ্ধমাত্র একটিবার আমার প্রতি চাহিয়াই মাথা নীচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। এই নির্বাক অভিযোগের জবাব যে কি, এইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম।

এমনি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুনগোঁসাই, দিদিরা তোমাকে ডাকচে। হাতমুখ ধুয়েছো?

না।

তবে এস আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্চে।

প্রসাদটা কি হ'লো আজ?

আজ হ'লো ঠাকুরের অন্নভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে ত সংবাদ আরও ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসাদ কোথায় দিলে?

পদ্মা বলিল, ঠাকুরঘরের বারান্দায়। বাবাজীমশায়ের সঙ্গে তুমি বসবে, আমরা মেয়েরা খাব পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীদিদি নিজে।

সে খাবে না?

না। সে ত আমাদের মত বোষ্টম নয়—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোঁয়া খেলে তার পাপ হয়।

তোমার কমললতাদিদি রাগ করলে না?

রাগ করবে কেন, বরঞ্চ হাসতে লাগল। রাজলক্ষ্মীদিদিকে বললে, পরজন্মে আমরা দু'বোনে গিয়ে জন্মাব এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাব আগে, আর তুমি আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু'বোনে একপাতায় বসে খাব। তখন কিন্তু জাত যাবে বললে মা তোমার কান মলে দেবে।

শুনিয়া খুশি হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কখনো কথায় তাহার সমকক্ষ পায় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মীদিদিও শুনে হাসতে লাগল, বললে, মা কেন দিদি, তখন বড়-বোন হয়ে তুমিই দেবে আমার কান মলে, ছোটর আস্পর্ধা কিছুতেই সইবে না।

প্রত্যুত্তর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত অর্থ কমললতা যেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে কমললতা সে কথায় কান দেয় নাই। বরঞ্চ এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দুজনের ভারি একটি মিল হইয়া গেছে।

বিকালের গাড়িতে বড়গোঁসাই দ্বারিকাদাস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল আরও জনকয়েক বাবাজী। সর্বাঙ্গের ছাপছোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইহারাও অবহেলার নয়। আমাকে দেখিয়া বড়গোঁসাই খুশি হইলেন, কিন্তু পার্ষদগণ গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ, শুনা গেল—ইহাদের একজন নামজাদা কীর্তনীয়া এবং আর একজন মৃদঙ্গের ওস্তাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও সেই বনবাদাড়। বেণু ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে—গায়ের চামড়া বাঁচান দায়। আসন্ন সূর্যাস্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সংকল্প করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচুজাতীয় 'আঁধারমানিক' ফুল ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংসপচা গন্ধে তিষ্ঠিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কবিরা ফুল এত ভালবাসেন, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপহার দিয়া আসে না কেন?

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্তন করিলাম। গিয়া দেখি, সেখানে সমারোহ ব্যাপার! ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজান হইতেছে, আরতির পরে কীর্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুনগোঁসাই, কীর্তন শুনতে তুমি ভালোবাস, আজ মনোহর দাস বাবাজীর গান শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কি চমৎকার!

বস্তুতঃ বৈষ্ণবকবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি-না-বুঝি তবু শেষ পর্যন্ত বসে থাকতাম। কমললতা, তুমি গাইবে না আজ?

কমললতা বলিল, না গোঁসাই, আজ না। আমার ত তেমন শিক্ষা নেই, ওঁদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তা ছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনই ধরে আছে, এখনো সারেনি।

বলিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুনতেই এসেচে। ও ভাবে আমি বুঝি বাড়িয়ে বলেছি।

কমললতা সলজ্জে কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেছো গোঁসাই। তারপরে স্মিতহাস্যে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাব।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্নমুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে আমাকে ডেকে

পাঠিয়ো, আমি নিজে এসে তোমার গান শুনে যাব। আমাকে বলিল, তুমি কীর্তন শুনতে এত ভালোবাস, কৈ আমাকে ত সে কথা কখনো বলোনি?

উত্তর দিলাম, কেন বোলব তোমাকে? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত, দুপুর-বেলাটা কাটত শুকনো শূন্য মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা কাটতে চাইত না—

রাজলক্ষ্মী চট্ করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর যদি বলো পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। তারপর নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরাইয়া বলিল, কমললতাদিদি, বলে এসো ত ভাই তোমার বড়গোঁসাইজীকে, আজ বাবাজীমশায়ের কীর্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাব।

কমললতা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুঁতখুতে ভাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক গে, ভগবানের নাম ত হবে। বিগ্রহমূর্তিগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, ওঁরা হয়ত খুশি হবেন, বাবাজীদের জন্যেও তত ভাবিনে দিদি, কিন্তু আমার এই দুর্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হ'লে বাঁচি।

বলিলাম, হ'লে কিন্তু বকশিশ পাবে।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিল, রক্ষে করো গোঁসাই, সকলের সম্মুখে যেন বকশিশ দিতে এসো না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

শুনিয়া বৈষ্ণবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুশি হইলেই হাততালি দেয়, বলিল, আ—মি—বু—ঝে—চি।

কমললতা তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, দূর হ পোড়ামুখী—চুপ কর। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাৎ কি একটা বলে বসবে।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্তনের আসর বসিল। আজ আলো জ্বলিল অনেকগুলা। মুরারিপুর আখড়া বৈষ্ণবসমাজে নিতান্ত অখ্যাত নয়, নানা স্থান হইতে কীর্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে এরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই মজুত আছে, দেখিলাম সেগুলা হাজির করা হইয়াছে। একদিকে বসিয়া বৈষ্ণবীগণ—সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট অজ্ঞাতকুলশীল অনেকগুলি বৈরাগী মূর্তি—নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহর দাস ও তাঁহার মৃদঙ্গবাদক। আমার ঘরের অধুনা দখলীকার একজন ছোকরা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়মে সুর। এটা প্রচার হইয়াছে যে, কে একজন সম্ভ্রান্তগৃহের মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তিনিই গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিত্তশালিনী। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে দাস-দাসী, আসিয়াছে বহুবিধ খাদ্যসম্ভার, আর আসিয়াছে কে এক নতুনগোঁসাই—সে নাকি এই দেশেরই এক ভবঘুরে।

মনোহর দাসের কীর্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি একসময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমললতার কাছে বসিল। হঠাৎ বাবাজীমশায়ের গলাটা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের লীলা। শুধু দ্বারিকাদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন, কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানা নীলাম্বরী শাড়ি, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীল রঙের জামা। আর সব তেমনি আছে। কেবল সকালের উড়েপাণ্ডার পরিকল্পিত কপালের ছাপছোপ এবেলা অনেকখানি মুছিয়াছে—অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আশ্বিনের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ, নীল আকাশে কখন মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্টশান্ত মানুষ, আমার প্রতি কটাক্ষেও চাহিল না—যেন চেনেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল, সে সেই জানে। কিংবা আমারও ভুল হইতে পারে—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজীমশায়ের গান জমিল না। কিন্তু সে তাঁর দোষে নয়, লোকগুলোর অধীরতায়।

দ্বারিকাদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিবেদন করে শোনাও, শুনে আমরাও ধন্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিল। দ্বারিকাদাস খোলটার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওটায় কোন বাধা জন্মাবে না ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

শুনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহর দাসও মনে মনে কিছু বিস্ময়বোধ করিলেন। কারণ, সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাঁহারা আশা করেন না।

গান শুরু হইল। সঙ্কোচের জড়িমা, অজ্ঞতার দ্বিধা কোথাও নাই—নিঃসংশয়ের কণ্ঠ অবাধ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এ বিদ্যায় সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু বাঙ্গলার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব-কবিগণের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহা কে জানিত! শুধু সুরে তালে লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায় এই সন্ধ্যায় সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত। পাথরের ঠাকুর তাহার সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর দুর্বাসা—কাহাকে বেশি প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই আরাধনা বলা কঠিন। গঙ্গামাটির অপরাধের এতটুকু স্খলনও যদি ইহাতে হয়, কি জানি এ কথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কি না।

সে গাহিতেছিল—

> "একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জরজর ভেল,
> তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলুঁ চিরদুখ অব দূরে গেল।
> তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ আশ,
> পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণনু, কহতহি গোবিন্দদাস॥"

বড়গোঁসাইজীর চোখে ধারা বহিতেছিল; তিনি আবেশ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মল্লিকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয়, ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধুলো সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি চুপি বলিল, এ মালা তোলা রইল, বকশিশের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিয়ে দিতুম। বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অন্ধকারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়িতে প'রে ফেললে আর খুলতে পারবে না এই বুঝি ভয়?

না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা দান করতাম।

উঃ—কি দাতা। সে ত তোমারি থাকত গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেন বলো ত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি, সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই লক্ষ্মী, তোমার কাছে সত্যই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যই আমি রাগ করব।

তা ক'রো। ভাবি এ ঐশ্বর্য আমি রাখব কোথায়?

কেন, চুরি যাবার ভয় নাকি?

না, সে মানুষ ত চোখে দেখতে পাইনে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধরে রাখবার মত বড় জায়গাই বা সে বেচারা পাবে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল না, হাতটা আমার টানিয়া ক্ষণকাল বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল। তারপরে বলিল, এমন করে মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে হাসবে যে! কিন্তু ভাবচি, রাত্রে তোমাকে শুতে দিই কোথায়—জায়গা ত নেই।

না থাক, যেখানে হোক শুয়ে রাত্রিটা কাটবেই।

তা কাটবে, কিন্তু শরীর ত ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে!

তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী চিন্তার সুরে বলিল, দেখচি ত সব, ব্যবস্থা কি করবে জানিনে; কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। যা হোক দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক লোকের ভিড়ে শোবার স্থান ছিল না। সে রাত্রে কোনমতে একটা খোলা বারান্দায় মশারি টাঙ্গাইয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাজলক্ষ্মী খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, হয়ত বা রাত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিল না।

পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম রাশীকৃত ফুল তুলিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবর্তে কমললতা আজ রাজলক্ষ্মীকেই সঙ্গী করিয়াছিল। সেখানে নির্জনে তাহাদের কি কথা হইয়াছে জানি না, কিন্তু আজ তাহাদের মুখ দেখিয়া আমি ভারী তৃপ্তি লাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু দু'জনে—তাহারা কতকালের আত্মীয়। কাল উভয়ে একত্রে একশয্যায় শয়ন করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে খায় না এই লইয়া কমললতা আমার কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবো না গোঁসাই, সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আসচে বারে আমি বড় বোন হয়ে জন্মে ওর দুটি কান ভাল করে মলে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা শর্ত করিয়ে নিয়েছি গোঁসাই। যদি মরি, ওঁকে বোষ্টমিগিরি ইস্তফা দিয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাব না সে খুব জানি, তখন ভূত হয়ে দিদির ঘাড়ে চাপব—সেই সিন্ধবাদের দৈত্যের মত কাঁধে বসে সব কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়ব।

কমললতা সহাস্যে কহিল, তোমার মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারব না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমললতা আসিয়া বলিল, বেশি দেরি ক'রো না গোঁসাই, আর তাকেও সঙ্গে এনো। এদিকে একজন বামুন ধরে এনেচি আজ ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে। যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে। রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তার সাহায্য করতে।

বলিলাম, ভালো করোনি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু তোমার ঠাকুর থাকবে উপবাসী।

কমললতা সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল, অমন কথা ব'লো না গোঁসাই, সে কানে শুনলে এখানে আর জলগ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি কমললতা, কিন্তু তাকে তুমি চিনেছো।

সেও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোঁসাই চিনেছি, শত-লক্ষেও এমন মানুষ তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমি ভাগ্যবান।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাড়ি নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো ভগিনী থাকে সুনাম গ্রামে; নবীন জানাইল সেদেশে কি এক নূতন ব্যাধি আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলেপুলে লইয়া বিপদে পড়িয়াছে,-তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা

করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সংবাদ নাই—নবীন ভয়ে সারা হইয়াছে—কিন্তু কোন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। মুখ্যু চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বার হইনি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয় জানিনে, নইলে ঘরসংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়ি বসে! চক্কোত্তিমশাইকে দিনরাত সাধচি, ঠাকুর দয়া করো, তোমাকে জমি বেচে আমি একশ' টাকা দেব, আমাকে একবার নিয়ে চলো, কিন্তু বিটলে বামুন নড়লে না। কিন্তু এও বলে রাখচি বাবু, আমার মনিব যদি যায় মারা, চক্কোত্তিকে ঘরে আগুন দিয়ে আমি পোড়াব, তারপর সেই আগুনে নিজে মরব আত্মহত্যা করে। অত বড় নেমকহারামকে আমি জ্যান্ত রাখব না।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন?

নবীন কহিল, কেবল শুনেচি গাঁখানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ একটেরে, ইস্টিশান থেকে অনেকদূর যেতে হয় গরুর গাড়িতে। বলিল, চক্কোত্তি জানে, কিন্তু বামুন তাও বলতে চায় না।

নবীন পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে-সকল হইতে কোন হদিস মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে, মাস-দুই পূর্বেও বিধবা মেয়ের বিয়ে বাবদ চক্রবর্তী শ'-দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।

বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অক্ষম দরিদ্রেরা ঠকাইবেই, এ লইয়া ক্ষোভ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শয়তানিও সচরাচর চোখে পড়ে না।

নবীন বলিল, বাবু ম'লেই ওর ভালো,—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বাঁচে। একপয়সাও আর ধার শোধ করতে হয় না।

অসম্ভব নয়। গেলাম দু'জনে চক্রবর্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী, পরদুঃখকাতর ভদ্রব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত ক্ষীণ হইয়াছে যে কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না, এমনকি জেলার নাম পর্যন্ত না। বহু চেষ্টায় একটা টাইম টেবল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সমস্ত রেল-স্টেশন একে একে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু স্টেশনের আদ্যক্ষর পর্যন্ত তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। দুঃখ করিয়া বলিলেন, লোকে কত কি জিনিসপত্র টাকাকড়ি ধার বলে চেয়ে নিয়ে যায় বাবা, মনে করতে পারিনে, আদায়ও হয় না। মনে মনে বলি মাথার ওপর ধর্ম আছেন, তিনিই এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না, গর্জন করিয়া উঠিল, হাঁ, তিনিই তোমার বিচার করবেন, না করেন করব আমি।

চক্রবর্তী স্নেহার্দ্র-মধুরকণ্ঠে বলিলেন, নবীন, মিছে রাগ করিস্ কেন দাদা, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, পারলে কি আর এটুকু করিনে? গহর কি আমার পর? সে যে আমার ছেলের মত রে!

নবীন কহিল, সে-সব আমি জানিনে, তোমাকে শেষবারের মত বলচি, বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ত চল, নইলে যেদিন তাঁর মন্দ খবর পাব সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্রবর্তী প্রত্যুত্তরে ললাটে করাঘাত করিয়া শুধু বলিলেন, কপাল নবীন, কপাল! নইলে তুই আমাকে এমন কথা বলিস!

অতএব, পুনরায় দু'জনে ফিরিয়া আসিলাম। বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষণকাল আশা করিলাম অনুতপ্ত চক্রবর্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, দ্বারের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম চক্রবর্তী পোড়া কলিকাটা ঢালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক সাজিতে বসিয়াছে।

গহরের সংবাদ পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুরঘরের বারান্দায় মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে; বাবাজীরা কেহ নাই, সম্ভবতঃ সুপ্রচুর প্রসাদসেবার পরিশ্রমে নির্জীব হইয়া কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রিকালে আর একদফা লড়িতে হইবে তাহার বলসঞ্চয়ের প্রয়োজন।

উঁকি মারিয়া দেখিলাম ভিড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক; পাঁজিপুঁথি, খড়ি, শেলেট, পেন্সিল প্রভৃতি গণনার যাবতীয় উপকরণ তাঁহার কাছে। আমার প্রতি সর্বাগ্রে চোখ পড়িল পদ্মার, সে চেঁচাইয়া উঠিল, নতুনগোঁসাই এয়েছে।

কমললতা বলিল, তখনি জানি গহরগোঁসাই তোমাকে অমনি ছেড়ে দেবে না, কি খেলে সে—

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—থাক দিদি, ও আর জিজ্ঞাসা ক'রো না।

কমললতা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, রোদ্দুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের ধুলোবালি উঠেচে মাথায়—স্নানটান হয়েচে ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল ছোঁন না, হলেও ত বোঝা যাবে না দিদি।

অবশ্য সর্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অস্নাত অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছে আমি রাজরানী হবো।

কি দিলে?

পদ্মা বলিয়া দিল—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মীদিদির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বলতে পারতাম।

গণক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে—বাঙ্গালী বলিলেই হয়,—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত আমি আর দেখিনি। দেখবেন, আমার হাতদেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম করুন।

বলিলাম, শিমুলফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুলফুলই সই! আমি এর থেকেই বলে দেব আপনি কি চান। এই বলিয়া সে খড়ি দিয়া মিনিট-দুই আঁক কষিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

কি খবর?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মামলা-মকদ্দমা নয়; আপনি কোন লোকের খবর পেতে চান।

খবরটা বলতে পার ঠাকুর?

পারি। খবর ভালো, দু-একদিনেই জানতে পারবেন।

শুনিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম এবং আমার মুখ দেখিয়া সকলেই তাহা অনুমান করিল।

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া বলিল, দেখলে ত। আমি বলচি ইনি খুব ভালো গোণেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না—হেসে উড়িয়ে দাও।

কমললতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের? নতুনগোঁসাই, দেখাও ত ভাই তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করতল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গণক নিজের হাতে লইয়া মিনিট দুই-তিন সযত্নে পর্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়, আপনার ত দেখি মস্ত ফাঁড়া—

ফাঁড়া? কবে?

খুব শীঘ্র। মরণ-বাঁচনের কথা।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে!

গণক আমার হাতটা ছাড়িয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা আর একবার—

না। আমার আর হাত দেখতে হবে না—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গণক তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি ত দর্পণ মাত্র মা, ছায়া যা পড়বে তাই আমার মুখে ফুটবে—

কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে--সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে যেতে পার?

কেন পারব না মা, নিয়ে গেলেই পারি।

আচ্ছা।

দেখিলাম তাহার গ্রহের কোপের প্রতি পুরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমললতা বলিল, চল গোঁসাই তোমার চা তৈরি করে দিই গে—খাবার সময় হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরি করে আনচি দিদি, তুমি ওঁর বসবার জায়গাটা একটু ঠিক করে দাও গে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার জো নেই।

অন্যান্য সকলে গণৎকার লইয়া কলরব করিতে লাগিল, আমরা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আমার দড়ির খাট রতন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দিল, তামাক দিল, মুখহাত ধোবার জল আনিয়া দিল—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটুনির বিরাম নাই, অথচ কর্ত্রী বলিলেন তাহার ছায়া পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। ফাঁড়া আমার আসন্ন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিত, আজ্ঞে না, ফাঁড়া আপনার নয়—আমার।

কমললতা নীচে বারান্দায় বসিয়া গহরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভারী, সুমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া কহিল, দ্যাখো তোমাকে একশো বার বলেচি বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না—বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? তোমাকে গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করচি, কথাটা আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরি করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল - 'খুব শীঘ্র' অর্থে আর কি হইতে পারে?

কমললতা আশ্চর্য হইয়া কহিল, বনেজঙ্গলে গোঁসাই আবার কখন গেল?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি দেখে রেখেচি দিদি? আমার কি সংসারে আর কাজ নেই?

আমি বলিলাম, ও দেখেনি, ওর অনুমান। গণকব্যাটা আচ্ছা বিপদ ঘটিয়ে গেল। শুনিয়া রতন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গণকের দোষটা কি? সে যা দেখবে তাই ত বলবে? পৃথিবীতে ফাঁড়া বলে কি কথা নেই? বিপদ কারও কখনো ঘটে না নাকি?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বৃথা। কমললতাও রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে, সেও চুপ করিয়া রহিল।

চায়ের বাটিটা আমি হাতে করামাত্র রাজলক্ষ্মী কহিল, অমনি দুটো ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসি গে?

বলিলাম, না।

না কেন? না ছাড়া হাঁ বলতে কি ভগবান তোমাকে দেননি? কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অধিকতর উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার চোখ-দুটো অত রাঙ্গা দেখাচ্চে কেন? পচা নদীর জলে নেয়ে আসোনি ত?

না, স্নান আজ করিনি।

কি খেলে সেখানে?

খাইনি কিছুই, ইচ্ছেও হয়নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল, তারপরে জামার ভিতরে আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। কমলদিদি, দেখ ত এ'র গা-টা গরম বোধ হচ্ছে না?

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল, হ'লোই বা একটু গরম রাজু—ভয় কি?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নূতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর যে দিদি!

কমললতা কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোমরা জলে এসে ত পড়োনি? এসেছ আমাদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করব ভাই, তোমার কিছু চিন্তা নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শান্তকণ্ঠ রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল। সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো দিদি। একে এখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, তাতে বার বার দেখেচি ওঁর কিছু একটা হ'লে সহজে সারে না—ভারী ভোগায়। আবার কোথা থেকে এসে ঐ গোণক্কার পোড়ারমুখো ভয় দেখিয়ে দিলে—

দেখালেই বা।

না ভাই দিদি, আমি দেখেচি কিনা ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমললতা স্মিতহাস্যে কহিল, ভয় নেই রাজু, এক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল থেকে গোঁসাই রোদ্দুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেচে, তাতে সময়ে স্নানাহার হয়নি, তাই হযত গা একটু তপ্ত হয়েচে—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর মা আসিয়া কহিল, মা, রান্নাঘরে বামুনঠাকুর তোমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমললতার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার রোগের সম্বন্ধে কমললতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই গেল না বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের ভিতরের কথাটা কমললতা টের পাইল এবং আরও একজন বোধ হয় পাইলেন তিনি বড়গোঁসাইজী নিজে।

যাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, গোঁসাই, তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে ভাই?

নিকটেই দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন জানি আমি।

কমললতা হাসিমুখে কহিল, এ কি-রকম কথা যে একজনের মনে রইল, আর একজনের রইল না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা তাই। ওঁর তখনো ভালো জ্ঞান হয়নি।

কিন্তু উনিই যে বয়সে বড় রে রাজু!

ইঃ ভারি বড়ো! মোটে পাঁচ-ছয় বছরের। আমার বয়স তখন আট-ন' বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হ'লে আমার বর! বর! বর! এই বলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু ও-রাক্ষস তক্ষুনি আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

কমললতা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা খেয়ে ফেললে কি করে?

আমি বলিলাম, ফুলের মালা নয়, পাকা বঁইচিফলের মালা। সে যাকে দেবে সেই খেয়ে ফেলবে।

কমললতা হাসিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই থেকে শুরু হ'লো আমার দুর্গতি। ওঁকে ফেললুম হারিয়ে, তার পরের কথা আর জানতে চেয়ো না দিদি—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না—তারা কত কি-ই না ভাবে! তার পরে অনেকদিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালাম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া হ'লো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ আর একদিন হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কমললতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড়গোঁসাই দিয়েচেন পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিনে তোমরা দু'জনকে দু'জনে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ ক'রো না। আমার ছেলেবেলার সে রাঙ্গা মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই মালাই চিরদিন থাক দিদি।

বলিলাম, কিন্তু সে মালা ত খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁগো রাক্ষস—এইবার আমাকে সুদ্ধ খাও। এই বলিয়া সে হাসিয়া চন্দনের বাটিতে সব কয়টি আঙ্গুল ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ মারিয়া দিল।

সকলে দ্বারিকাদাসের ঘরে গেলাম দেখা করিতে। তিনি কি একটা গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত ছিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, এসো ভাই, ব'সো।

রাজলক্ষ্মী মেজেতে বসিয়া বলিল, বসবার যে আর সময় নেই গোঁসাই। অনেক উপদ্রব করেছি, যাবার আগেই তাই নমস্কার জানিয়ে তোমার ক্ষমা-ভিক্ষে করতে এলুম।

গোঁসাই বলিলেন, আমরা বৈরাগী মানুষ, ভিক্ষে নিতেই পারি, দিতে পারব না ভাই। কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বল ত দিদি? আশ্রমটি যে আজ অন্ধকার হয়ে যাবে।

কমললতা বলিল, সত্যি কথা গোঁসাই—সত্যিই মনে হবে বুঝি আজ কোথাও আলো জ্বলেনি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়গোঁসাই বলিলেন, গানে, আনন্দে, হাসিতে, কৌতুকে এ কয়দিন মনে হচ্ছিল যেন চারিদিকে আমাদের বিদ্যুতের আলো জ্বলচে—এমন আর কখনো দেখিনি। আমাকে বলিলেন, কমললতা নাম দিয়েচে নতুনগোঁসাই, আর আমি নাম দিলাম আজ আনন্দময়ী—

এইবার তাঁহার উচ্ছ্বাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়গোঁসাই, বিদ্যুতের আলোটাই তোমাদের চোখে লাগল, কিন্তু তার কড়কড় ধ্বনি যাদের দিবারাত্র কর্ণরন্ধ্রে পশে তাদের একটু জিজ্ঞাসা ক'রো। আনন্দময়ীর সম্বন্ধে, অন্ততঃ রতনের মতামতটা—

রতন পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনো না গোঁসাই, ওরা দিনরাত আমায় হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসব এই রোগা-পটকা অরসিক লোকটিকে ঘরে তালাবন্ধ করে আসব—ওর জ্বালায় কোথাও গিয়ে যদি আমার স্বস্তি আছে!

বড়গোঁসাই বলিলেন, পারবে না আনন্দময়ী—পারবে না। ফেলে আসতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারব। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোঁসাই, যেন আমি শীগ্‌গির মরি।

বড়গোঁসাই বলিলেন, এ ইচ্ছে ত বৃন্দাবনে একদিন তাঁর মুখেও প্রকাশ পেয়েছে ভাই, কিন্তু পারেন নি। হাঁ, আনন্দময়ী কথাটি তোমার কি মনে নেই? সখি! কারে দিয়ে যাব, তারা কানুসেবার কিবা জানে—

বলিতে বলিতে তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সত্য প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বৈ ত নয়! কিন্তু তুমি জানতে পেরেছ ভাই। তাই বলি, তুমি যেদিন এ প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে আনন্দময়ী—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্বাদ ক'রো না গোঁসাই, এ যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ আশীর্বাদ করো এমনি হেসেখেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি।

কমললতা কথাটা সামলাইয়া লইতে বলিল, বড়গোঁসাই তোমার ভালবাসার কথাটাই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমিও বুঝিয়াছিলাম অনুক্ষণ অন্য ভাবের ভাবুক দ্বারিকাদাস—তাঁহার চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুষ্কমুখে বলিল, একে ত এই শরীর, তাতে একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে—একগুঁয়ে লোক, কারও কথা শুনতে চান না—আমি দিনরাত কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাব কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, যাবার সময়ে কথায় কথায় কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি, আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে মর্মান্তিক আত্মগ্লানি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে,

সর্বপ্রকার হাস্যপরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি যতই কেননা লোকের কাছে আমার রোগাদেহের নিন্দে করো লক্ষ্মী, এ দেহের বিনাশ নেই। আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তুমি তিনসত্যি করো। বলো এ কথা কখনো মিথ্যে হবে না। বলিতে বলিতেই উদ্‌গত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপচাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক হইয়া রহিল। তখন লজ্জায় হাতটা আমার সে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ পোড়ারমুখো গোণক্কারটা মিছিমিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফোঁটা-দুই চোখের জল তাহার গালের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে একে বিদায় লওয়া হইল। বড়গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন এবং পদ্মা কখনো শহর দেখে নাই, সেও সঙ্গে যাইবে।

স্টেশনে পেঁছাইয়া সর্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই 'পোড়ারমুখো গোণক্কার' প্লাটফর্মে কম্বল পাতিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশেপাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আর একদিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল, সেও সঙ্গে যাইবে।

বলিলাম, না, ও যাবে না।

কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ কিছু ত হবে না! আসুক না সঙ্গে।

বলিলাম, না, ভালোমন্দ যাই হোক ও আসবে না। ওকে যা দেবার দিয়ে এখান থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রহশান্তি করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইল। তাহাকে কি দিল জানি না, কিন্তু সে অনেকবার মাথা নাড়িয়া ও অনেক আশীর্বাদ করিয়া সহাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিল।

অনতিবিলম্বে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও যাত্রা করিলাম।

বার

রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে আমার অর্থাগমের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমাদের বর্মা-অফিসের একজন বড়দরের সাহেব ঘোড়দৌড়ের খেলায় সর্বস্ব হারাইয়া আমার জমানো টাকা ধার লইয়াছিলেন। নিজেই শর্ত করিয়াছিলেন, শুধু সুদ নয়, সুদিন যদি আসে মুনাফার অর্ধেক দিবেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্জের চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই আমার সম্বল।

সেটা কত?

আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

কত শুনি?

সাত-আট হাজার।

এ আমাকে দিতে হবে।

সভয়ে কহিলাম, সে কি কথা! লক্ষ্মী দানই করেন, তিনি হাতও পাতেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যয় সয় না। তিনি সন্ন্যাসী ফকিরকে বিশ্বাস করেন না—তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

কি করবে?

করব আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

কিন্তু এটুকু মূলধনে চলবে কেন? তোমার একপাল দাসী-চাকরের পনর দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবে না। এর ওপর আছে গুরু-পুরুত, আছে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা, আছে বহু বিধবার ভরণপোষণ—তাদের উপায় হবে কি?

তাদের জন্য ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবে না। আমার নিজের ভরণপোষণের কথাই ভাবচি বুঝলে?

বলিলাম, বুঝেচি। এখন থেকে কোন একটা ছলনায় আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও—এই ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না তা নয়। সে-সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে, কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেব এখন থেকে সেই হবে আমার ভবিষ্যতের পুঁজি। কুলোয় খাব, না হয় উপোস করব।

তা হলে তোমার অদৃষ্টে তাই আছে।

কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচ সামান্য, কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় করে তুলতে হয় সে বিদ্যে আমি জানি। একদিন বুঝবে আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সন্দেহ কর তা সত্যি নয়।

এ কথা এতদিন বলোনি কেন?

বলিনি বিশ্বাস করবে না বলে। আমার টাকা তুমি ঘৃণায় ছোঁও না, কিন্তু তোমার বিতৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়।

ব্যথিত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এ-সব কথা আজ কেন বলচ লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আজ হঠাৎ ঠেকবে, কিন্তু এ যে আমার রাত্রিদিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্মপথের উপার্জন দিয়ে আমি ঠাকুর-দেবতার সেবা করি? সে অর্থের এককণা তোমার চিকিৎসায় খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচাতে পারতুম? ভগবান আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই এ কথা সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস কর কৈ?

বিশ্বাস করি ত!

না, করো না।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল, কমললতার সঙ্গে পরিচয় তোমার দু'দিনের, তবু তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন দিয়ে শুনলে, তোমার কাছে তার সকল বাধা ঘুচলো—সে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করলে না কোন কথা, কখনো বললে না, লক্ষ্মী, তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বল। কেন জিজ্ঞাসা করনি? করনি ভয়ে। তুমি বিশ্বাস কর না আমাকে, তুমি বিশ্বাস করতে পারো না আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞাসা করিনি, জানতেও চাইনি। নিজে সে জোর করে শুনিয়েচে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত শুনেচ। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাওনি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বলবে নাকি?

না, তা বলব না। কিন্তু তুমি কি কমললতার চেলা? সে যা করচে তোমাকেও তাই করতে হবে?

ও-কথায় আমি ভুলব না। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।

এ ত বড় মুশকিল! আমি চাইনে শুনতে, তবু শুনতেই হবে?

হাঁ, হবে। তোমার ভাবনা, শুনলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না, হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না, সে হবে না—তোমাকে শুনতেই হবে। তুমি

পুরুষমানুষ, তোমার মনে এটুকু জোর নেই যে, উচিত মনে হলে আমাকে দূর করে দিতে পার?

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কবুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে-সকল জোরালো পুরুষদের উল্লেখ করে আমাকে অপদস্থ কোরচ লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ—নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায় দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারব না, হয়ত তখনি ফিরিয়ে আনতে দৌড়াব এবং তুমি 'না' বলে বসলে আমার দুর্গতির অবধি থাকবে না। অতএব, এ-সকল ভয়াবহ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ কর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো, ছেলেবেলায মা আমাকে এক মৈথিলী রাজপুত্রের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন?

হাঁ, আর এক রাজপুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেককাল পরে। সে ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ করে বিদায় করে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এ খবর ত শুনেছিলে?

হাঁ, শুনেছিলাম।

শুনে তুমি কি ভাবলে?

ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী মরে গেল!

এই? আর কিছু না?

আরও ভাবলাম, কাশীতে মরে তবু যা হোক একটা সদ্‌গতি হ'লো। আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল,—যাও—মিথ্যে আহা! আহা! করে তোমাকে দুঃখ জানাতে হবে না। তুমি একটা 'আহা'ও বলোনি আমি দিব্যি করে বলতে পারি। কৈ, আমাকে ছুঁয়ে বল ত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম বলেই যেন মনে পড়চে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক কষ্ট করে অতদিনের পুরানো কথা আর মনে করে কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া থাকিয়া বলিল, আর আমি? কেঁদে-কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম, ভগবান, আমার অদৃষ্টে এ তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে যাঁর গলায় মালা দিয়েছিলুম এ জীবনে তাঁর দেখা কি কখনো পাব না? এমনি অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ক্লেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিষেধ শুনিবে না বুঝিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে অন্তরে কতদিন কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মন নীরবে কত মর্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে, তবু প্রকাশ পাইতে ভরসা পায় নাই পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জন করিয়া আসিয়াছে সে কমললতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচ্ছন্ন কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যা মর্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারি মত সহজ হইয়া দাঁড়াইতে চায়, অদৃষ্টে তাহার যাহাই কেননা ঘটুক। এ বিদ্যা দিয়াছে তাহাকে কমললতা। সংসারে একটিমাত্র মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়াছে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া মনের মধ্যে ভারী একটি তৃপ্তি বোধ করিলাম।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল, রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলেন, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করলেন আমাকে বিক্রি করার—

এবার কার কাছে?

অপর একটি রাজপুত্র—তোমার সেই বন্ধুরত্নটি—যাঁর সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে—কি হ'লো মনে নেই?

বলিলাম, নেই বোধ হয়। অনেকদিনের কথা কিনা। কিন্তু তার পরে?

. রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ষড়যন্ত্র খাটলো না। বললুম, মা তুমি বাড়ি যাও। মা বললেন, হাজার টাকা নিয়েচি যে। বললুম, সে টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও, দালালির টাকা যেমন করে পারি আমি শোধ দেব। বললুম, আজ রাত্রির গাড়িতেই যদি বিদায় না হও মা, কাল সকালেই দেব আমি আপনাকে আপনি বিক্রি করে মা-গঙ্গার জলে। জানো ত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্ছি নে। মা বিদায় হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সংবাদ পেয়ে তুমি দুঃখ করে বলেছিলে—আহা! মরে গেল! এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল, সত্যি হলে তোমার মুখের সেই 'আহা'টুকুই আমার ঢের। কিন্তু এবার যেদিন সত্যিসত্যিই মরব সেদিন কিন্তু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো। ব'লো, পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালাবদল করেচে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালবেসেছে এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসেনি। আমার কানে কানে তখন বলবে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাব।

একি, তুমি কাঁদচো যে!

সে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, নিরুপায় ছেলেমানুষের ওপর তার আত্মীয়স্বজন যত অত্যাচার করেছে, অন্তর্যামী ভগবান কি তা দেখতে পাননি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন, না, চোখ বুজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো, আমার মত পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোনকালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা! কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, লোকে যে বলে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম এক না হলে চলে না, কিন্তু ধর্মেকর্মে তোমার-আমার ত সাপে-নেউলে সম্পর্ক। আমাদের তবে চলে কি করে?

চলে সাপে-নেউলের মতই। একালে প্রাণে বধ করায় হাঙ্গামা আছে, তাই একজন আর একজনকে বধ করে না, নির্মম হয়ে বিদায় করে দেয়, যখন আশঙ্কা হয় তার ধর্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটচে।

তার পরে কি হয়?

হাসিয়া বলিলাম, তার পরে সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। নাকখত দিয়ে বলে আমার অনেক শিক্ষা হয়েচে, এ জীবনে এত ভুল আর করব না, রইল আমার জপতপ, গুরু-পুরুত—আমাকে ক্ষমা কর।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল, ক্ষমা পায় ত?

পায়। কিন্তু তোমার গল্পের কি হ'লো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বলচি। ক্ষণকাল নিষ্পলকচক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলেন। আমাকে একজন বুড়ো ওস্তাদ গানবাজনা শেখাতেন, লোকটি বাঙ্গালী, এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইস্তফা দিয়ে আবার সংসারী হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল মুসলমান স্ত্রী, তিনি শেখাতে আসতেন আমাকে নাচ! তাঁকে বলতুম আমি, দাদামশাই—আমাকে সত্যিই বড় ভালোবাসতেন। কেঁদে বললুম, দাদামশাই, আমাকে তুমি রক্ষে কর, এ-সব আর আমি পারব না। তিনি গরীব লোক, হঠাৎ সাহস করলেন না। আমি বললুম, আমার যে টাকা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে। তারপর কপালে যা আছে হবে, এখন কিন্তু পালাই চলো। তারপরে তাঁদের সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরলুম—এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগরা, জয়পুর, মথুরা—শেষে আশ্রয় নিলুম এসে পাটনায়। অর্ধেক টাকা জমা দিলুম এক মহাজনের গদীতে, আর অর্ধেক টাকা দিয়ে ভাগে খুললুম একটা মনোহারী আর একটা কাপড়ের দোকান। বাড়ি কিনে খোঁজ করে বঙ্কুকে আনিয়ে নিয়ে দিলুম তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে, আর জীবিকার জন্যে যা করতুম সে ত তুমি নিজের চোখেই দেখেচ।

তাহার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম, তুমি বলেই অবিশ্বাস হয় না—আর কেউ হলে মনে হ'তো মিথ্যা বানানো একটা গল্প শুনচি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মিথ্যে বলতে বুঝি আমি পারিনে?

বলিলাম, পার হয়ত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলোনি বলেই আমার বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস কেন?

কেন! তোমার ভয়, মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রুষ্ট হন। তোমাকে শাস্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন।

আমার মনের কথাই বা তুমি জানলে কি করে?

আমার মনের কথাই বা তুমি জানতে পারো কি করে?

আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা নয়।

হলে খুশি হও?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হইনে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশি ভাববে না, এই আমি চাই।

উত্তরে বলিলাম, সেই সে-যুগের মানুষ তুমি—সেই হাজার বছরের পুরানো সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হ'তে পারি। এমনই যেন চিরদিন থাকি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ যুগের মেয়েদের আমি দেখিনি তুমি ভাবচো? অনেক দেখেচি। বরঞ্চ তুমিই দেখনি, কিংবা দেখেচো কেবল বাইরে থেকে। এদের কারুর সঙ্গে আমাকে বদল করো ত দেখি কেমন থাকতে পার? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাকখত দিয়েচি বলে, তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাকে খত।

কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয় তখন ঝগড়া করে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বলতে পারি, এঁদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করেচ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি করেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করিনি তা বলতে পারি। ওগো গোঁসাই, আমিও যে অনেক ঘুরেচি, অনেক দেখেচি। তোমরা যেখানে অন্ধ, সেখানেও যে আমাদের দশজোড়া চোখ খোলা।

কিন্তু সে দেখেচো রঙীন চশমা দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচো। দশজোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বোলব আমার হাত-পা বাঁধা—নইলে এমন জব্দ করতুম যে জন্মে ভুলতে না। কিন্তু সে যাক গে, আমি সে-যুগের মত তোমার দাসী হ'য়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেব না। সংসারে তোমার অনেক কাজ—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্যে তোমার অনেক সময় এবং আরও অনেক কিছু গেছে—আর নষ্ট করতে আমি দেব না।

বলিলাম, এই জন্যেই ত আমি যত শীঘ্র পারি সেই সাবেক চাকরিতে গিয়ে ভর্তি হতে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরি করতে তোমাকে ত দিতে পারব না।

কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি পেরে উঠব না।

কেন পেরে উঠবে না?

প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকী ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান ত উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালাঠি না বাধলে বাঁচি।

তবে একটা কাপড়ের দোকান কর?

তার চেয়ে একটা জ্যান্ত বাঘ-ভালুকের দোকান করে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা করে কি শেষে ভগবান এমনি একটা অকর্মা মানুষ আমাকে দিলেন, যাকে নিয়ে সংসারে এতটুকু কাজ চলে না।

বলিলাম, আরাধনার ত্রুটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে, এখনো কর্মঠ লোক তোমার

মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্ট নীরোগ বেঁটেখাটো জোয়ান, যাকে কেউ হারাতে কেউ ঠকাতে পারবে না, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে টাকাকড়ি দিয়ে নির্ভয়, যাকে খবরদারি করতে হবে না, ভিড়ের মধ্যে যাকে হারিয়ে ফেলবার উৎকণ্ঠা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে আনন্দ—হাঁ ছাড়া যে না বলতে জানে না—

রাজলক্ষ্মী নির্বাকমুখে আমার প্রতি চাহিয়া ছিল, অকস্মাৎ সর্বাঙ্গে তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল।

বলিলাম, ও কি ও?

না, কিছু না।

তবে শিউরে উঠলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে মুখে যে ছবি তুমি আঁকলে তার অর্ধেক সত্যি হলেও বোধ হয় আমি ভয়ে মরে যাই।

কিন্তু আমার মত এমন অকর্মা লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করবো আর কি! ভগবানকে অভিসম্পাত করবো, আর চিরকাল জ্বলেপুড়ে মরবো। এ-জন্মে আর ত কিছু চোখে দেখিনে।

এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

তাদের ফুল তুলে দেব। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাকব, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন্ সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সে সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনোদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে, কোনোদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত যদি কেউ কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুনগোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা-কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানিনে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হ'লো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখিরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতাদিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিয়ো মন্দির গড়িয়ে, ক'রো রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কেই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হ'লো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ত কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি। তফাত যে ঐখানে! আমি পারব, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে।

কি করে জানলে?

জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশি জানি। ঐ ত আমার পুজো, ঐ ত আমার ধ্যান। আহ্নিক শেষ করে কার পায়ে দিই জলাঞ্জলি? কার পায়ে দিই ফুল? সে ত তোমারই।

নীচে হইতে মহারাজের ডাক আসিল, মা, বতন নেই, চায়ের জল তৈরি হয়ে গেছে।

যাই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখনি উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এত ভালোবাসো, এখন থেকে তাই কেন করো না?

তাতে টাকা ত আসবে না?

কি হবে টাকায়? টাকা ত আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর। আনন্দ ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলব আমার মনের মত করে। ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্যপাশে হবে আমার ঠাকুরঘর। এ জন্মে রইল আমার ত্রিভুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর? আনন্দ সন্ন্যাসী-মানুষ, ওখানে চোখ না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না, কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি করে? কবে আসবে সে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েছেন কুশারীমশাই—আনন্দ আসবে বলেচে খুব শীঘ্র, তারপরে সকলে মিলে যাব গঙ্গামাটিতে—থাকব সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে এবার তোমার লজ্জা করবে না?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিতহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা ত কেউ জানে না কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে সঙ সেজেছিলুম? চুল আমার অনেকটা বেড়েচে, আর নাক গেছে বেমালুম জুড়ে—দাগটুকু পর্যন্ত নেই। আর তুমি যে আছ সঙ্গে, আমার সব অন্যায় সব লজ্জা মুছে দিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পেয়েছি সেই হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে, সঙ্গে এনেছে তার স্বামীকে। আমি তারে দেব একটা হার গড়িয়ে।

বলিলাম, তা দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে যদি সুনন্দার পাল্লায় পড়—

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না গো না, সে ভয় আর নেই, তার মোহ আমার কেটেচে। বাপরে বাপ; এমনি ধর্মবুদ্ধি দিলে যে দিনেরাতে না পারি চোখের জল থামাতে, না পারি খেতে শুতে। পাগল হয়ে যে যাইনি এই ঢের। এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তোমার লক্ষ্মী আর যা-ই হোক, অস্থির মনের লোক নয়। সে সত্যি ব'লে একবার যখন বুঝবে তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না। একটুখানি নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, আমার সমস্ত মনটি যেন এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয় এ জীবনের সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিছু চাইনে। এ যদি না ভগবানের নির্দেশ হয় ত আর কি হবে বল ত? প্রতিদিন পুজো করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করিনে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়। তাইত আনন্দ-ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছি তার কাজে এখন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করবো বলে।

বলিলাম, ক'রো।

রাজলক্ষ্মী নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল, সহসা বলিয়া উঠিল, দ্যাখো, এই সুনন্দা মেয়েটির মত এমন সৎ, এমন নির্লোভ, এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখিনি, কিন্তু ওর বিদ্যের ঝাঁজ যতদিন না মরবে ততদিন ও-বিদ্যে কাজে লাগবে না।

কিন্তু সুনন্দার বিদ্যের দর্প ত নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, ইতরের মত নেই—আর সে কথাও আমি বলিনি। ও কত শ্লোক, কত শাস্ত্রকথা, কত গল্প-উপাখ্যান জানে, ওর মুখে শুনে শুনেই ত আমার ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নই, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে—আর তাই ত বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। তবেই দ্যাখো ওর বিদ্যের মধ্যে কোথায় মস্ত ভুল আছে। তাই দেখি ও কাউকেও সুখী করতে পারে না, সবাইকে শুধু দুঃখ দেয়; কিন্তু ওর বড় জা ওর চেয়ে অনেক বড়। সাদামাটা মানুষ, লেখাপড়া জানে না, কিন্তু মনের ভেতরটা দয়া-মায়ায় ভরা। কত দুঃখী দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে—কেউ জানতে পায় না। ঐ যে তাঁতীদের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হ'ল সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হ'তো? তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবো? কখ্‌খনো না। সে করেছে ওর বড় জা কেঁদেকেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাশুরকে চোর বলে

ছোট করে দিলে—এইটেই কি শাস্ত্রশিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ-মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারবে ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্তব্যজ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারে কাউকে কল্যাণ দেবে না তোমাকে বলে দিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম. জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব তুমি শিখলে কার কাছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে। হয়ত তোমারি কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা ত কেবল শেখা নয়, সত্যি করে পাওয়া। হঠাৎ একদিন আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় এ-সব এলো কোথা থেকে। সে যাক গে, এবার গিয়ে কিন্তু বড় কুশারীগিন্নির সঙ্গে ভাব করবো, সেবার তাঁকে অবহেলা করে যে ভুল করেছি, এবার তার সংশোধন হবে। যাবে গঙ্গামাটিতে?

কিন্তু বর্মা? আমার চাকরি?

আবার চাকরি? এই যে বললুম, চাকরি তোমাকে আমি করতে দেব না।

লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বল না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারও ওপর—খাঁটি বৈষ্ণবী-তিতিক্ষার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

তাই বলে যার যা খেয়াল তাতেই সায় দিতে হবে? সংসারে আর কারও সুখ-দুঃখ নেই নাকি? তুমি নিজেই সব!

ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া! সে প্লেগের ভয়ও করেনি, সে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আজ হয়ত আমাকে তুমি পেতে না। আজ তাদের কি হ'লো এ কথা একবার ভাববে না?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো, আনন্দ-ঠাকুরপোকে নিয়ে আমি যাই, বর্মায় গিয়ে তাঁদের ধরে আনি গে। কোন একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমানী, আমি না গেলে হয়ত আসবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেচ তাদের নিতে। দেখো আমার কথা ভুল হবে না।

কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে ত?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেই-ই আমার ভয়। হয়ত পারব না; কিন্তু তার আগে চল না গিয়ে দিনকতক থাকি গে গঙ্গামাটিতে।

সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে একটু। কুশারীমশাই খবর পেয়েচেন পাশের পোড়ামাটি গাঁ-টা তারা বিক্রি করবে। ওটা ভাবচি কিনব। সে বাড়িটাও ভালো করে তৈরি করাব, যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবারে দেখেচি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হ'তো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হ'তো না, কষ্ট হ'তো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথায় কান দিল না, বলিল, আমি দেখেচি সেখানে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে—বেশিদিন শহরে রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয় না, তাই ত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এই ভঙ্গুর দেহটাকে নিয়ে যদি অনুক্ষণ তুমি এত বিব্রত থাকো, মনে শান্তি পাবো না লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এ উপদেশ খুব কাজের, কিন্তু আমাকে না দিয়ে নিজে যদি একটু সাবধানে থাকো হয়ত সত্যিই শান্তি একটু পেতে পারি।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রীতিকর। তাহার নিজের স্বাস্থ্য অটুট, কিন্তু সে সৌভাগ্য যাহার নাই, বিনাদোষেও যে তাহার অসুখ করিতে পারে, এ কথা সে কিছুতেই বুঝিবে না।

বলিলাম, শহরে আমি কোনকালেই থাকতে চাইনে। সেদিন গঙ্গামাটি আমার ভালোই লেগেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলেও আসিনি—এ কথা আজ তুমি ভুলে গেছ লক্ষ্মী!

না গো না, ভুলিনি। সারাজীবনে ভুলব না—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। বলিল, সেবারে তোমার মনে হ'তো যেন কোন্ অচেনা জায়গায় এসে পড়েচো, কিন্তু এবারে গিয়ে দেখো তার আকৃতি-প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে, তাকে আপনার বলে বুঝতে একটুও গোল হবে না। আর কেবল ঘরবাড়ি থাকবার জায়গাই নয়, এবার গিয়ে আমি বদলাব নিজেকে, আর সবচেয়ে বদলে ভেঙে গড়ে তুলব নতুন করে তোমাকে—আমার নতুন-গোঁসাইজীকে! কমললতাদিদি আর যেন না দাবি করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে।

বলিলাম, এই-সব বুঝি ভেবে স্থির করেছো?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই নেব—তার ঋণ পরিশোধ করবো না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাব না? এমনিই নিষ্ফলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেব না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—সংসারে নিত্য নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে, বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই; আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তিবিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বঙ্কুর কি করবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে ত আমাকে আর চায় না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

কিন্তু সে যে তোমার নিকট-আত্মীয়—তাকে যে ছেলেবেলায় মানুষ করে তুলেচো!

সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মানব না। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

কেন নয়? অস্বীকার করবে কি করে?

অস্বীকার করবার ইচ্ছে আমারও ছিল না, এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা তুমিও জানো না। আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে?

শুনেছিলাম লোকের মুখে; কিন্তু তখন ত আমি দেশে ছিলাম না।

না ছিলে না। এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় কোথাও হয়নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যাননি, আমিও কখনো তাঁকে দেখিনি। আমরা দু'বোনে মামার বাড়িতেই মানুষ। ছেলেবেলা জ্বরে জ্বরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত?

আছে।

তবে শোন। বিনাদোষে শাস্তির পরিমাণ শুনলে তোমার মত নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হবে। জ্বরে ভুগি, কিন্তু মরণ হয় না। মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত, হঠাৎ খবর জুটলো দত্তদের বামুনঠাকুর আমাদের ঘর, মামার মতই স্বভাব-কুলীন। বয়স ষাটের কাছে। আমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে তার হাতে দেওয়া হবে। সবাই বললে, এ সুযোগ হারালে আইবুড়ো নাম আর ওদের খণ্ডাবে না। সে চাইলে এক শ', মামা পাইকিরি দর হাঁকলে পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে একসঙ্গে—মেহন্নত কম। সে নাবলো পঁচাত্তরে; বললে, মশাই, দু'-দুটো ভাগনীকে কুলীনে পার করবেন, একজোড়া রামছাগলের দাম দেবেন না? ভোর-রাত্রে লগ্ন, দিদি নাকি জেগে ছিল, কিন্তু আমাকে পুঁটলি বেঁধে এনে উচ্ছুগ্যু করে দিলে। সকাল হতে বাকি পঁচিশ টাকার জন্যে ঝগড়া শুরু হ'লো। মামা বললেন, ধারে কুশণ্ডিকে হোক। সে বললে, সে অত হাবা নয়, এ-সব কারবারে ধারধোর চলবে না। সে গা-ঢাকা দিলে, বোধ হয় ভাবলে মামা খুঁজেপেতে এনে তাকে টাকা দিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন যায়, দু'দিন যায়, মা কাঁদাকাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিয়ে দত্তদের কাছে নালিশ

করেন, কিন্তু বর আর এলো না। তাদের গাঁয়ে খোঁজ নেওয়া হ'লো, সেখানে সে যায়নি। আমাদের দেখিয়ে কেউ বলে আধকপালী, কেউ বলে পোড়াকপালী—দিদি লজ্জায় ঘরের বার হয় না—সেই ঘর থেকে ছ'মাস পরে বার করা হ'লো একেবারে শ্মশানে। আরও ছ'মাস পরে কলকাতার কোন একটা হোটেল থেকে খবর এল বরও সেখানে রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরেচে। বিয়ে আর পুরো হ'লো না।

বলিলাম, পঁচিশ টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐরকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত সে আমার ভাগে পঁচিশ টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি? শুধু একছড়া বঁইচির মালা—তাও কিনতে হয়নি বন থেকে সংগ্রহ হয়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অমূল্য বলে। আর একটা মানুষ দেখাও ত যে আমার মত অমূল্য ধন পেয়েছে?

তুমি বলো ত এ কি তোমার মনের সত্যি কথা?

টের পাও না?

না গো না, পাইনে, সত্যি পাইনে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ঘুমোও—তোমার মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু সে কথা যাক। আমাদের দু'বোনের মত শাস্তিভোগ এদেশে কত শত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয়ত তুমি ভাবচো আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর ক'টা মেলে? এর উত্তরে যদি বলতুম একটা হ'লেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক, তাতেও আমার জবাব হ'তো; কিন্তু সে আমি বলবো না। আমি বলবো, অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই-সব বিধবাদের কাছে যাদের আমি অল্পস্বল্প সাহায্য করি? তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন, তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে আত্মীয়স্বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মায়া?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হ'তো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দুঃখটা দেখতে। এখন থেকে একটি একটি করে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাব।

আমি দেখব না, চোখ বুজে থাকব।

পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাব আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবে না। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ নিজের পূর্বকথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই ত এমনি অত্যাচার। যে-দেশে মেয়ের বিয়ে না হলে ধর্ম যায়, জাত যায়, লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারে না—হাবা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই—সেখানে একটাকে ফাঁকি দিয়ে লোকে অন্যটাকেই বাঁচে, এ ছাড়া সে-দেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই মিলে আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না দিত, দিদি হয়ত মরত না, আর আমি—এজন্মে এমন করে তোমাকে হয়ত পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর, তাই বা কেন? আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিনে হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ নীচে হইতে বালক-কণ্ঠে ডাক আসিল, মাসিমা?

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

ও-বাড়ির মেজবৌয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইঙ্গিতে পাশের বাড়িটা দেখাইয়া সাড়া দিল—ক্ষিতীশ, ওপরে এসো বাবা!

পরক্ষণেই একটি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া প্রথমটা সঙ্কুচিত হইল, পরে নমস্কার করিয়া তাহার মাসিমাকেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু বারো টাকা চাঁদা পড়েছে মাসিমা।

তা পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবধানে সাঁতার কেটো, কোনো দুর্ঘটনা না হয়।

নাঃ—কোন ভয় নেই মাসিমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া তাহার হাতে টাকা দিল, ছেলেটি দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া

নামিতে নামিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, মা বলে দিলেন ছোটমামা পরশু সকালে এসে সমস্ত এস্টিমেট করে দেবেন। বলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিল।

প্রশ্ন করিলাম, এস্টিমেট কিসের?

বাড়িটা মেরামত করতে হবে না? তেতলার ঘরটা আধখানা করে তারা ফেলে রেখেচে, পুরো করতে হবে না?

তা হবে, কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি করে?

বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ির লোক; কিন্তু আর না, যাই—তোমার খাবার তৈরির সময় হয়ে গেল। এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

তের

এক সকালে স্বামীজী আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে রতন জানিত না, বিষণ্ণমুখে আসিয়া আমাকে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েচে। ধলিহারি তাকে, খুঁজে খুঁজে বা'র করেছে ত!

রতন সর্বপ্রকার সাধুসজ্জনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দুচক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, দেখুন, এ আবার মাকে কি মতলব দেয়। টাকা বার করে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্মিক ব্যাটারা জানে!

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ বড়লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাশ করেচে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

হুঃ—বড়লোকের ছেলে! টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এ পথে যায়! এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ বার করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বজ্রানন্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর ভালো ত? দিদি কৈ?

বোধ হয় পুজোয় বসেচেন, সংবাদ পাননি নিশ্চয়ই।

তবে সংবাদটা নিজে দিই গে। পুজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পুজোর ঘরটা কোন্ দিকে দাদা? নাপ্‌তে ব্যাটা গেল কোথায়—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পুজার ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া সেই-দিকে প্রস্থান করিল।

মিনিট-দুই পরে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি, গোটা-পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসি গে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে আনন্দ, অত দূরে যেতে হবে কেন? আর তুমিই বা যাবে কিসের জন্যে, রতন যাক না।

কে, রত্না? ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেচি বলেই হয়ত ও বেছে বেছে পচা মাছ কিনে আনবে—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া; জিভ কাটিয়া বলিল, রতন দোষ নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও-পাড়ায় গেছ—ডেকে সাড়া পাইনি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। রতন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিল না, গম্ভীরমুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্চি মা, কিষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। —বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দের বুঝি বনে না?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারি নে দিদি। ও আপনার হিতৈষী—বাজে লোকজন ঘেঁষতে দিতে চায় না; কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়াটা ভালো হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোটাকয়েক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে একটা রুইমাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মুখহাত ধুয়ে এসো গে ভাই, আমি চা তৈরি করে আনচি। এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ তলব হ'লো কেন?

সে কৈফিয়ত কি আমার দেবার, আনন্দ?

আনন্দ সহাস্যে কহিল, দাদার দেখচি এখনো সেই ভাব—রাগ পড়েনি। আবার গা-ঢাকা দেবার মতলব নেই ত? সেবার গঙ্গামাটিতে কি হাঙ্গামাতেই ফেলেছিলেন। এদিকে দেশ-সুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন, ওদিকে বাড়ির কর্তা নিরুদ্দেশ। মাঝখানে আমি—নতুন লোক—এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি, দিদি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, রতন লোক তাড়াবার উদ্যোগ করলে—সে কি বিভ্রাট! আচ্ছা মানুষ আপনি।

আমিও হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, রাগ এবারে পড়ে গেছে, ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভরসাও নেই। আপনাদের মত নিঃসঙ্গ একাকী লোকেদের আমি ভয় করি। কেন যে নিজেকে সংসারে জড়াতে দিলেন তাই আমি অনেক সময়ে ভাবি।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! মুখে বলিলাম, আমাকে দেখচি তা হলে ভোলোনি, মাঝে মাঝে মনে করতে?

আনন্দ বলিল, না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরও শক্ত। বিশ্বাস না হয় বলুন দিদিকে ডেকে সাক্ষী মানি। আপনার সঙ্গে পরিচয় ত মাত্র দু-তিনদিনের, কিন্তু সেদিন যে দিদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও কাঁদতে বসিনি—সেটা নিতান্তই সন্ন্যাসী-ধর্মের বিরুদ্ধ বলে।

বলিলাম, সেটা বোধ হয় দিদির খাতিরে। তাঁর অনুরোধেই ত এতদূর এলে!

আনন্দ কহিল, নেহাত মিথ্যে নয় দাদা। ওঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয়, যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে শুরু করে। কত ঘরেই তো আশ্রয় নিই, কিন্তু ঠিক এমনটি আর দেখিনে। আপনি ত শুনেচি অনেক ঘুরেচেন, কোথাও দেখেছেন এঁ'র মত আর একটি?

বলিলাম, অনেক—অনেক।

রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে আমার কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, চায়ের বাটিটা আনন্দের কাছে রাখিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক গা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল; আমি বলিলাম, তোমার গুণের কথা। উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই আমি সজোরে তার প্রতিবাদ করছিলাম।

আনন্দ চায়ের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল, হাসির তাড়ায় খানিকটা চা মাটিতে পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিটা অদ্ভুত। ঠিক উলটোটা চক্ষের পলকে মাথায় এলো কি করে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশ্চর্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যের উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তা হলে তুমি বিশ্বাস করো না?

একটুও না।

আনন্দ হাসিয়া কহিল, বানিয়ে বলার বিদ্যেয় আপনিও কম নয় দিদি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—একটুও না।

রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জবলেপুড়ে শিখতে হয়েছে ভাই। তুমি কিন্তু আর দেরি ক'রো না, চা খেয়ে স্নান করে নাও, কাল গাড়িতে তোমার যে খাওয়া হয়নি তা বেশ জানি। ওঁর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনতে গেলে তোমার সমস্ত দিনে কুলোবে না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, আপনাদের মত এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশ্চর্য মিল করে আপনাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

তার নমুনা দেখলে ত?

নমুনা সেই প্রথম দিনে সাঁইথিয়া স্টেশনে গাছতলাতেই দেখেছিলুম। তারপরে আর একটিও কখনো চোখে পড়ল না।

আহা! কথাগুলো যদি ওঁর সামনেই বলতে আনন্দ!

আনন্দ কাজের লোক, কাজের উদ্যম ও শক্তি তাহার বিপুল। তাহাকে কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। দিনরাতে খাওয়ার আয়োজন ত প্রায় ভয়ের কোঠায় গিয়া ঠেকিল। অবিশ্রাম দু'জনের কত পরামর্শই যে হয় তাহার সবগুলো জানি না, শুধু কানে আসিয়াছে যে, গঙ্গামাটিতে একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলা হইবে। ওখানে বিস্তর গরীব এবং ছোটজাতের লোকের বাস, উপলক্ষ বোধ করি তাহারাই; শুনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও চলিবে। এই-সকল বিষয়ে কোনদিন আমার কিছু-মাত্র পটুতা নাই। পরোপকারের বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের নূতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গেছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িয়ো না আনন্দ, তোমার সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড হয়ে যাবে।

শুনিলে প্রতিবাদ করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে আমার অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে!

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েছে গোঁসাই, এমন কথা আর কখনো মুখে আনব না।

তবে কি কোনদিন কিছুই করব না?

কেন করবে না? কেবল অসুখ-বিসুখ করে আমাকে ভয়ে আধমরা করে তুলো না, তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আনন্দ কহিল, দিদি সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো করে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবে না ভাই, যে বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কোথাও ত্রুটি রাখেন নি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোণক্কার পোড়ারমুখো এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে, উনি বাড়ির বা'র হলে আমার বুক ঢিপঢিপ করে—যতক্ষণ না ফেরেন কিছুতে মন দিতে পারিনে।

এর মধ্যে আবার গোণক্কার জুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাত দেখে সে বললে, মস্ত ফাঁড়া—জীবন-মরণের সমস্যা।

দিদি, এ-সব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন, ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটে না?

আনন্দ হাসিয়া কহিল, ঘটতে পারে, কিন্তু হাত গুণে বলবে কি করে দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানিনে ভাই, শুধু আমার ভরসা আমার মত ভাগ্যবতী যে, তাকে কখনো ভগবান এতবড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ স্তব্ধমুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ির লেখাপড়া, বিলি-ব্যবস্থার কাজ চলিতে লাগিল, রাশীকৃত ইট-কাঠ, চুন-সুরকি, দরজা-জানালা আসিয়া পড়িল—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা, চলুন একটু ঘুরে আসি গে।

ইদানীং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল, ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হয়ে যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবে না?

আনন্দ বলিল, গরমে লোকে সারা হচ্ছে দিদি, ঠাণ্ডা কোথায়?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালো ছিল না, বলিলাম, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ উঠতেও তেমন ইচ্ছে হচ্চে না আনন্দ।

আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সন্ধ্যেটা ঘরে বসে থাকলে অনিচ্ছে আরো চেপে ধরবে—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে একটা কাজ করিনে আনন্দ! ক্ষিতীশ পরশু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়ম কিনে দিয়ে গেছে, এখনো সেটা দেখবার সময় পাইনি। আমি দুটো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা দু'জনে বসে শোনো সন্ধ্যাটা কেটে যাবে। এই বলিয়া সে রতনকে ডাকিয়া বাক্সটা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি দিদি?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

দিদির কি সে বিদ্যেও আছে নাকি?

সামান্য একটুখানি। তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলেবেলায় ওঁর কাছেই হাতেখড়ি।

আনন্দ খুশি হইয়া বলিল, দাদাটি দেখচি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরল মনে তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ আনন্দ বুঝিবে না কিছুই, আমার আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয়-বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়ম আসিলে প্রথমে সচরাচর প্রচলিত দুই-একটা 'ঠাকুরদের' গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধচিত্তে কহিল, এ কি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি?

সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ?

সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করতে হবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

শরীরের জন্য আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না?

রাখবার জো নেই হে, শরীর বড় খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল, দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন?

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে। আমার কাছে নয় হে, দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেন নি!

আনন্দ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশি শেখবার সময় পাইনি। সুযোগ যদি হ'লো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করব। কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ ত সময় নেই ভাই, তোমাদের খাবার তৈরি করতে হবে যে।

আনন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর, সময় তাঁদের কম। কিন্তু বয়সে আমি ছোট, আপনার ছোটভাই, আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করব।

রাজলক্ষ্মী স্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাস্থ্য-

হীন দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি যতটুকু জানি তোমাকে আদর করে শেখাব।

কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দাদার মত ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ? ভগবান তাদের হাল ধরবার মজবুত লোক দেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায় --কোন কালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এমনি করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় ভায়া, কথাটা মিলিয়ে দেখো, প্রমাণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল—তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিনকয়েকের মধ্যেই বাড়ির কাজ শুরু হইল, রাজলক্ষ্মী জিনিসপত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল; বাড়ির ভার রহিল বুড়া তুলসী-দাসের 'পরে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চার-পাতা জোড়া চিঠির এই জবাব এল পড়ে দেখ। বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলী অক্ষরে গুটিদুই-তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে, সুখেই আছি বোন। যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার দায় যে তাঁদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়োগোঁসাইজী তাঁহার আনন্দময়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইতি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণাশ্রিতা- কমললতা

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই। কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম একফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই! কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্রতপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মী—কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি কমললতার--অপরিস্ফুট, অজানা--যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভাঙিয়া দিল, বলিল, স্নানের সময় হয়েছে বাবু, মা বলে দিলেন।

স্নানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার জো নাই।

আবার একদিন সকলে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবারে আনন্দ ছিল অনাহূত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়িতে ভিড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয়-অনাত্মীয় কত লোকই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল প্রশ্ন।

রাজলক্ষ্মী কুশারীগৃহিণীকে প্রণাম করিল; সুনন্দা রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটা ত ভালো দেখাচ্চে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমি ত পারলুম না, এবার তোমরা যদি পার এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেললুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিন্নীর বোধ হয় মনে পড়িল, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এদেশের জল-হাওয়ায় উনি দু'দিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না, কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা!

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে শুরু হইল। পোড়ামাটি ক্রয় করার

কথাবার্তা দামদস্তুর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানান্বেষণ প্রভৃতি কিছুতেই কাহারো আলস্য রহিল না।

শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত এ আমার স্বভাব, হয়ত বা ইহা আর কিছু একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ঔদাস্যে কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন আছি কখন নাই। অথচ কোন অসুখ নাই, খাই-দাই থাকি। আনন্দ তাহার ডাক্তারি-বিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়াচাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই রাজলক্ষ্মী সস্নেহ অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওঁকে টানাটানি করে কাজ নেই ভাই, কি হতে কি হবে, তখন আমাদেরই ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে ব্যবস্থা করচেন ভোগার মাত্রা এতে বাড়বে বৈ কমবে না দিদি। এ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী সহজেই স্বীকার হইয়া বলে, সে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্মকালে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না।

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্মের প্রেরণা আমাতে নাই, লড়াই করিয়া হুটোপুটি করিয়া, সংসারে দশজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসার সাধ্যও নাই, সংকল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়িঘর টাকাকড়ি বিষয়-আশয় মানসম্ভ্রম এ-সকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদিবা কখনো কর্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই অচিরকাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছে—শত ঠেলাঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে শুনতে পাই বৈষ্ণবী কমললতার সস্নেহ অনুরোধ—নতুনগোঁসাই এইটি করে দাও না ভাই! ঐ যাঃ—সব নষ্ট করে দিলে? আমার ঘাট হয়েচে গো, তোমায় কাজ করতে বলে—নাও ওঠো। পদ্মা পোড়ারমুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক না, চা খাবার যে তোমার সময় হয়েচে গোঁসাই।

সেদিন চায়ের পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিত পাছে ভাঙ্গে। আজ তাহাদের প্রয়োজন গেছে ফুরাইয়া, তথাপি কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কিনা।

জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া; করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত, তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদুষী সুনন্দার দুর্নিবার্য প্রভাব স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সত্তাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো, কম নও। তোমার চলে যাবার পথ বেয়ে সর্বস্ব যে আমার চোখের পলকে ছুটে পালাবে এ কে জানত বলো? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিনগুলো আমার কেটেছিল কি করে? দম বন্ধ হয়ে মরে যাইনি এই আশ্চর্য। আমি উত্তর দিতে পারি না, শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্বন্ধে আর তাহার ত্রুটি ধরিবার জো নাই। শতকর্মের মধ্যেও শতবার অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাৎ আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুজে একটুখানি শুয়ে পড়ো ত, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই? অত পড়লে চোখ ব্যথা করবে যে!

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে—আসতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী বলে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ?

আনন্দ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, এই অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্ছেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হ'লো কি? না ঘুমোলেও ত তোমার পাঠশালার বাছুরের পাল চরাতে যাবেন না?

দিদি দেখচি ওঁকে মাটি করবেন।

নইলে নিজে যে মাটি। নির্ভাবনায় কাজকর্ম করতে পারিনে।

আপনারা দু'জনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইস্কুল তৈরির কাজে আনন্দের নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই, সম্পত্তি খরিদের হাঙ্গামায় রাজলক্ষ্মী গলদ্ঘর্ম, এমনি সময়ে কলিকাতার বাড়ি ঘুরিয়া বহু ডাকঘরের ছাপছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের সাংঘাতিক চিঠি আসিয়া পৌঁছিল—গহর মৃত্যুশয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে। খবরটা আমাকে যেন শূল দিয়া বিঁধিল। ভগিনীর বাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে জানি না। সে যে এতদূরে পীড়িত তাহাও শুনি নাই—শুনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সংবাদ। দিন-ছয়েক পূর্বের চিঠি, এখনো বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এদেশেও নাই, সে-দেশেও নাই। ও চিন্তা বৃথা।

চিঠি পাইয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল—তোমাকে যেতে হবে ত!

হাঁ।

চলো আমিও সঙ্গে যাই।

সে কি হয়? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথায়?

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুর আখড়ার কথা আর সে মুখে আনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর, সঙ্গে যাবে কে? আনন্দকে বলব?

না। আমার তল্পি বইবার লোক সে নয়।

তবে কিষণ সঙ্গে যাক।

তা যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলো?

সময় পেলে দেব।

না, সে শুনব না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাব, তুমি যতই রাগ করো।

অগত্যা রাজী হইতে হইল এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম, দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেছে। সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মত সাবধান করিয়া কহিল, শরীরের অবহেলা করবে না বলো।

না গো না।

ফিরতে একটা দিনও বেশি দেরি করবে না বলো?

না, তাও করব না।

অবশেষে গরুর গাড়ি রেল-স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করিল।

আষাঢ়ের এক অপরাহ্নবেলায় গহরদের বাটীর সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের প্রবল কণ্ঠের এই বুকফাটা কান্নায় শোকের একটা নূতন মূর্তি চোখে দেখিতে পাইলাম। সে যেমন গভীর,

তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা নাই, ভগিনী নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রু-জলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গিহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহাকে সজ্জাহীন, ভূষণহীন কাঙালবেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকান্তরের যাত্রাপথে শেষ পাথেয় নবীন একাকী দু'হাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা গেল নবীন?

পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

মাটি কোথায় দিলে?

নদীর তীরে, আমবাগানে। তিনিই বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো-বোনের বাড়ি থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, সে জ্বর আর সারল না।

চিকিৎসা হয়েছিল?

এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল—কিছুতেই কিছু হ'লো না। বাবু নিজেই সব জানতে পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আখড়ার বড়গোঁসাইজী আসতেন?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেছেন, তাই রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ আসত না নবীন?

নবীন বলিল, হাঁ, কমললতা।

তিনি কবে এসেছিলেন?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিনদিন তিনি খাননি, শোননি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একটিবার উঠেন নি।

আর প্রশ্ন করিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন—আখড়ায়?

হাঁ।

একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি বলে গিয়েচেন।

কি আছে এতে নবীন?

খুলে দেখুন, বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি দিয়া বাঁধা তাহার কবিতার খাতাগুলো। উপরে লিখিয়াছে, শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ করার সময় হ'ল না। বড়গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন, নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুঁটুলি। খুলিয়া দেখিলাম নানা মূল্যের একতাড়া নোট এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে—ভাই শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচব না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানিনে। যদি না হয় নবীনের হাতে বাক্সটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম কমললতার যদি কাজে লাগে, দিও। না নিলে যা ইচ্ছে হয় ক'রো। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। —গহর।

দানের গর্ব নাই, কাকুতি-মিনতিও নাই। শুধু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই গুটিকয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভকামনা করিয়া তাহার শেষ নিবেদন রাখিয়া গেছে। ভয় নাই, ক্ষোভ নাই, উচ্ছ্বসিত হা-হুতাশে মৃত্যুকে সে প্রতিবাদ করে নাই। সে কবি, মুসলমান ফকির-বংশের রক্ত তাহার শিরায়—শান্তমনে এই শেষ রচনাটুকু সে তাহার বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়া গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত চোখের জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু আর তাহারা নিষেধ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সংকীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি রাঙা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর-সংলগ্ন সেই শুষ্কপ্রায় জামগাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতীলতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাঠ-

পিঁপড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, কত ঝরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশেপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষদান মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসি গে।

বলিলাম, নবীন, বাইরের ঘরটা একবার খুলে দাও না দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি তক্তপোশের একধারে গুটানো, একটি ছোট পেন্সিল, কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজ—এই ঘরে গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা- বন্দিনী সীতার দুঃখের কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি, কতদিন খাইয়াছি, শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া গেছি, সেদিন হাসিমুখে যাহারা সহিয়াছিল আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম, এমনি একটি ছোট নোটের পুঁটুলি তাহার ছেলেদের হাতেও গহর দিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বিষয়-সম্পত্তি যাহা রহিল পাইবে তাহার মামাতো-ভাইবোনেরা, এবং তাহার পিতার নির্মিত একটি মসজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

আশ্রমে পেঁৗছিয়া দেখিলাম মস্ত ভিড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেক সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে এবং হাবভাবে তাহাদের শীঘ্র বিদায় হওবার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈষ্ণবসেবাদি বিধিমতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন যেন একটা বিব্রত উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—পূর্বে কখনো দেখি নাই। আন্দাজ করিলাম হয়ত এতদিন ধরিয়া এতগুলি বৈষ্ণব-পরিচর্যায় তিনি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্মা আসিল আজ তাহার মুখেও হাসি নাই, যেন সংকুচিত- পলাইতে পারিলে বাঁচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতাদিদি এখন বড় ব্যস্ত, না পদ্মা?

না, ডেকে দেব দিদিকে?—বলিয়াই চলিয়া গেল। এ-সমস্তই আজ এমন অপ্রত্যাশিত, খাপছাড়া যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমললতা আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এস গোঁসাই, আমার ঘরে বসবে চল।

আমার বিছানা প্রভৃতি স্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমললতার ঘরে আসিয়া সেগুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায় অনেকগুলো টাকা আছে।

কমললতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা-খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

না।

কখন এলে?

বিকেলবেলা।

যাই তৈরি করে আনি গে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখহাত ধোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

আবার মনে হইল, ব্যাপার কি!

খানিক পরে কমললতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও-বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বহুক্ষণ অভুক্ত—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ আসিয়া পেঁৗছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কৈ তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ! তোমার! তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ মানে বারণ, গোঁসাই। অর্থাৎ ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রুচি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে?

বড়গোঁসাইজীর গুরুদেব। আর তাঁর সঙ্গে এসেচেন যাঁরা—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হন।

অশুচি তুমি? বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

হাঁ তাই।

কিছুই জানি না, তবুও অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম এ মিথ্যে—এ অসম্ভব!

অসম্ভব কেন গোঁসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এতবড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যু-পথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাঁর কাছে ত ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম গোঁসাই।

সংসারের এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দু'জনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজী কি বলেন?

কমললতা কহিল, তাঁর ত কোন উপায় নেই। নইলে কোন বৈষ্ণবই যে এ মঠে আর আসবে না। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবে না, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি করে যেতে হবে তা ভাবিনি গোঁসাই। কেবল কষ্ট হয় পদ্মার কথা মনে করে। ছেলেমানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড়গোঁসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকে নবদ্বীপে, দিদি চলে গেলে সে বড্ড কাঁদবে। যদি পার তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায় আমার নাম করে তাকে রাজুকে দিয়ে দিও—ওর যা ভাল সে তা করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে? নেবে না?

না, আমি ভিখিরি, টাকা নিয়ে আমি কি করবো বলো ত?

তবু যদি কখনো কাজে লাগে—

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, টাকা আমারো ত একদিন অনেক ছিল গো, কি কাজে লাগল? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছ কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেব—অপরের টাকা নিতে যাব কেন?

এ কথায় কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে পুনশ্চ কহিল, না গোঁসাই, আমার টাকা চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেচি, তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ করে দেবেন। লক্ষ্মীটি, আমার জন্যে ভেব না।

পদ্মা ঘরে আসিয়া বলিল, নতুন গোঁসাইয়ের জন্যে প্রসাদ কি এ-ঘরেই আনব দিদি?

হাঁ, এখানেই নিয়ে এস। চাকরটিকে দিলে?

হাঁ, দিয়েছি।

তবু পদ্মা যায় না, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবে না দিদি?

খাবো রে পোড়ারমুখী, খাবো। তুই যখন আছিস তখন না খেয়ে কি দিদির নিস্তার আছে?

পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমললতাকে দেখিতে পাইলাম না, পদ্মার মুখে শুনিলাম, সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানে না। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, রাত্রের

কথা স্মরণ করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়গোঁসাইজীর ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের রামায়ণ। তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।

দ্বারিকাদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, তাই হবে নতুনগোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটি তুলে রাখব।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমললতার অপবাদ তুমি বিশ্বাস কর গোঁসাই?

দ্বারিকাদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখনো না।

তবু ত তাকে চলে যেতে হচ্চে?

আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

তবে কেনই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্তা ত তুমি—তুমি ত তাকে রাখতে পার?

গুরু! গুরু! গুরু! বলিয়া দ্বারিকাদাস অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুঝিলাম গুরুর আদেশ—ইহার অন্যথা নাই।

আজ আমি চলে যাচ্চি গোঁসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন; দেখি চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্ণবেলা সায়াহ্নে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল, কিন্তু কমললতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত, আমাকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিষণ ছটফট করিতেছে—সময় আর নাই—কিন্তু কমললতা ফিরিল না। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই আসিবে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমশঃ প্রত্যয়ে দাঁড়াইল —সে আসিবে না। শেষবিদায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া সে পূর্বাহ্ণেই পলায়ন করিয়াছে, দ্বিতীয় বস্ত্রটুকুও সঙ্গে লয় নাই। কাল আত্মপরিচয় দিয়াছিল ভিক্ষুক বৈরাগিণী বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অক্ষুণ্ণ রাখিল।

যাবার সময় পদ্মা কাঁদিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, দিদি বলেছে আমাকে চিঠি লিখতে—তোমার যা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখে জানিও, পদ্মা।

কিন্তু আমি ত ভালো লিখতে জানিনে, গোঁসাই।

তুমি যা লিখবে আমি তাই পড়ে নেব।

দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি যাই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

চৌদ্দ

সমস্ত পথ চোখ যাহাকে অন্ধকারেও খুঁজিতেছিল, তাহার দেখা পাইলাম রেলওয়ে স্টেশনে। লোকের ভিড় হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, একখানি টিকিট কিনে দিতে হবে গোঁসাই—

সত্যিই কি তবে সকলকে ছেড়ে চললে?

এ ছাড়া ত আর উপায় নেই।

কষ্ট হয় না, কমললতা?

এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করো গোঁসাই, জানো ত সব।

কোথায় যাবে?

যাব বৃন্দাবনে। কিন্তু অত দূরের টিকিট চাইনে—তুমি কাছাকাছি কোন-একটা জায়গার কিনে দাও।

অর্থাৎ আমার ঋণ যত কম হয়। তার পরে শুরু হবে পরের কাছে ভিক্ষে, যতদিন না পথ শেষ হয়। এই ত?

ভিক্ষে কি এই প্রথম শুরু হবে গোঁসাই? আর কি কখনো করিনি?

চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, দাও বৃন্দাবনেরই টিকিট কিনে।

তবে চল এক সঙ্গে যাই।

তোমারো কি ঐ এক পথ নাকি?

বলিলাম, না, এক নয়, তবু যতটুকু এক করে নিতে পারি।

গাড়ি আসিলে দুজনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার বিছানা করিয়া দিলাম।

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ও কি করচ গোঁসাই?

করচি যা কখনো কারো জন্যে করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে।

সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?

সত্যিই মনে রাখতে চাই কমললতা, তুমি ছাড়া যে-কথা আর কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গোঁসাই।

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে ব'সো।

কমললতা বসিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচের সহিত। গাড়ি চলিতে লাগিল কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর পার হইয়া—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পথে বেড়ানর কথা, তাহার মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্ধন, রাধাকুণ্ড-বাসের কথা, কত তীর্থভ্রমণের গল্প, শেষে দ্বারিকাদাসের আশ্রমে মুরারিপুর আশ্রমে আসা। আমার মনে পড়িয়া গেল ঐ লোকটির বিদায়কালের কথাগুলি; বলিলাম, জানো কমললতা, বড়গোঁসাই তোমার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না।

করেন না?

একেবারে না। আমার আসবার সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগল, বললেন, নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি নতুনগোঁসাই, মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ-পথে আসা। মঠে তিনিও থাকবেন না কমললতা এমন নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে।

না, যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন?

যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে, ফিরে যাবে সেখানে?

না।

তাঁরা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান?

তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাব যদি তুমি যেতে বল। আর কারো কথায় না।

কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাব?

এ প্রশ্নের সে উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমললতা? সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। হঠাৎ একসময়ে কানে গেল—নতুনগোঁসাই?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠ, তোমার সাঁইথিয়ায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখানায় তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম সে তাহা ইতিপূর্বেই ভাঁজ করিয়া আমার বেঞ্চের একধারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে?—নিলে না?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোঝা বইবে কে?

দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনোনি—সেও কি বোঝা? দেব দু-একটা বা'র করে?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখিরীর গায়ে মানাবে কেন?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না, কিন্তু ভিখারীকেও খেতে হয়। পোঁছতে আরও দু'দিন লাগবে, গাড়িতে খাবে কি? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাব—তুমি ছোঁবে না?

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, ইস্, রাগ দ্যাখো। ওগো, ছোঁব গো ছোঁব, থাক ও-সব, তুমি চলে গেলে আমি পেটভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও ত গোঁসাই; কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধূলা লইল।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই। নীচে ও উপরে অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি শুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ণ শশী, অপর প্রান্তে ঊষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমনি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ?

বাঁশি বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি—আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ রাখব, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার ব'লে আর তোমাকে আমি অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষপথে তাহার আনত মুখের 'পরে স্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

বড়দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন--সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।

গৃহস্থ-কন্যারা মাটির দীপ সাজাইবার সময় যেমন তৈল ও সলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাঠি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে,—এই ক্ষুদ্র কাঠিটির তখন বড় প্রয়োজন—উসকাইয়া দিতে হয়; এটি না হইলে তৈল এবং সলিতা সত্ত্বেও প্রদীপের জ্বলা চলে না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ। বল, বুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে, তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ যেমন সে উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকীটুকু সে তেমন নীরব আলস্যভরে ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে। তখনই একজন লোকের প্রয়োজন—সে উসকাইয়া দিবে।

সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। এই বাঙ্গলাদেশের সহিত তাঁহার বেশিকিছু সম্বন্ধ ছিল না। এইখানেই সুরেন্দ্র তাহার কুড়ি বৎসর বয়সে এম. এ. পাস করে; কতকটা তাহার নিজের গুণে, কতকটা বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কি না। সুরেন্দ্র বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জীব এ জগতে বাস করে, না এই বিমাতার ইচ্ছাই একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম, শোয়া-বসা, পড়াশুনা, পাস প্রভৃতি সারিয়া লয়। এই বিমাতাটি, নিজের সন্তানের প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রের হেফাজতের সীমা ছিল না। থুথু ফেলাটি পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। এই কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীলোকটির শাসনে থাকিয়া সুরেন্দ্র নামে লেখাপড়া শিখিল, কিন্তু আত্মনির্ভরতা শিখিল না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোন কর্মই যে তাহার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে, ইহা সে বুঝিত না। কখন যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে এবং কখন তাহাকে কি করিতে হইবে, সেজন্য সে সম্পূর্ণরূপে আর একজনের উপর নির্ভর করিত। ঘুম পাইতেছে, কি ক্ষুধা বোধ হইতেছে, অনেক সময় এটাও সে নিশ্চিত ঠাহর করিতে পারিত না। জ্ঞান হওয়া অবধি, তাহাকে বিমাতার উপর ভর করিয়া এই পঞ্চদশ বর্ষ কাটাইতে হইয়াছে। সুতরাং বিমাতাকে তাহার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর, পূর্ব হইতেই তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য তাঁহার নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জন দিতে হইত। আহা, সপত্নীপুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে! পাড়া-প্রতিবাসীরা একমুখে রায়গৃহিণীর সুখ্যাতি না করিয়া উঠিতে পারে না।

সুরেন্দ্রের উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না—তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর-মুহূর্তে যদি তাহার চোখ-মুখ ছলছল করিত, রায়গৃহিণী সেটি জ্বরের পূর্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিন দিনের জন্য তাহার সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে, তাঁহার আরও তীক্ষ্নদৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের অঙ্গে পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার শখ এবং বাবুয়ানা করিবার গুপ্ত ইচ্ছা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্তেই দুই-তিন সপ্তাহের জন্য সুরেন্দ্রের বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

এমনিভাবে সুরেন্দ্রের দিন কাটিতেছিল। এমনি সস্নেহ-সতর্কতার মাঝে তাহার কখনও কখনও মনে হইত, এ জীবনটা বাঁচিবার মত নহে; কখনও বা সে মনে মনে ভাবিত

বুঝি এমনি করিয়াই সকলের জীবনের প্রভাতটা অতিবাহিত হয়। কিন্তু এক-একদিন আশপাশের লোকগুলা গায়ে পড়িয়া তাহার মাথায় বিভিন্ন ধারণা গুঁজিয়া দিয়া যাইত।

একদিন তাহাই হইল। একজন বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে বিলাত যাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সে অনেকের উপকার করিতে পারে। কথাটা সুরেন্দ্রের মন্দ লাগিল না। বনের পাখির চেয়ে পিঞ্জরের পাখিটাই বেশি ছটফট করে। সুরেন্দ্র কল্পনার চক্ষে যেন একটু মুক্ত বায়ু, একটু স্বাধীনতার আলোক দেখিতে পাইতেছিল, তাই তাহার পরাধীন প্রাণটা উন্মত্তের মত পিঞ্জরের চতুর্দিকে ঝটপট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে পিতাকে আসিয়া নিবেদন করিল যে, তাহার বিলাত যাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে-সকল উন্নতির আশা ছিল—তাহাও সে কহিল। পিতা কহিলেন, ভাবিয়া দেখিব। কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছা একেবারে প্রতিকূল। তিনি পিতা-পুত্রের মাঝখানে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া এমনি অট্টহাসি হাসিলেন যে, দুইজনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

গৃহিণী কহিলেন, তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দাও—না হইলে সুরোকে সামলাইবে কে? যে জানে না কখন কি খাইতে হয়, কখন কি পরিতে হয়, তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ? বাড়ির ঘোড়াটাকে সেখানে পাঠান যা, ওকে পাঠানও তাই। ঘোড়া-গরুতে বুঝিতে পারে যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, কি ঘুম পাইয়াছে—তোমার সুরো তাও পারে না। তারপর আবার হাসি।

হাস্যের আধিক্য-দর্শনে রায়মহাশয় বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথও মনে করিল যে, এরূপ অকাট্য যুক্তির বিপক্ষে কোনরূপ প্রতিবাদ করা যায় না। বিলাত যাইবার আশা সে ত্যাগ করিল। তাহার বন্ধু এ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল। কিন্তু বিলাত যাইবার আর কোন উপায় আছে কিনা, তাহাও সে বলিয়া দিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে কহিল যে, এরূপ পরাধীনভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া শ্রেয়ঃ; এবং ইহাও নিশ্চয় যে, এরূপ সম্মানের সহিত এম.এ. পাস করিতে পারে—উদরান্নের জন্য তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না।

সুরেন্দ্র বাটী আসিয়া এ কথা ভাবিতে বসিল। যত ভাবিল, তত সে দেখিতে পাইল যে, বন্ধু ঠিক বলিয়াছে—ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল। সবাই কিছু বিলাত যাইতে পারে না, কিন্তু এমন জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি হইয়াও সকলকে দিন কাটাইতে হয় না।

একদিন গভীর রাত্রে সে স্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া গাড়িতে বসিল, এবং ডাকযোগে পিতাকে পত্র লিখিয়া দিল যে, কিছুদিনের জন্য সে বাড়ি পরিত্যাগ করিতেছে, অনর্থক অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না, এবং সন্ধান পাইলেও যে সে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

রায়মহাশয় গৃহিণীকে এ পত্র দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, সুরো এখন মানুষ হইয়াছে—বিদ্যা শিখিয়াছে—পাখা বাহির হইয়াছে—এখন উড়িয়া পলাইবে না ত কখন পলাইবে!

তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিলেন—কলিকাতায় যাহারা পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে পত্র দিলেন; কিন্তু কোন উপায় হইল না। সুরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিল। এখানে তিরস্কার করিবারও কেহ নাই, দিবানিশি শাসনে রাখিতেও কেহ চাহে না। মুখ শুকাইলে কেহ ফিরিয়া দেখে না, মুখ ভারী হইলেও কেহ লক্ষ্য করে না। এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। এখানে ভিক্ষাও জোটে, করুণারও স্থান আছে, আশ্রয়ও মিলে,—কিন্তু আপনার চেষ্টা চাই; স্বেচ্ছায় কেহই তোমার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।

খাইবার চেষ্টা যে আপনাকে করিতে হয়, আশ্রয়ের স্থানটুকু যে নিজেকে খুঁজিয়া লইতে হয়, কিংবা, নিদ্রা এবং ক্ষুধার মাঝে যে একটু প্রভেদ আছে—এইখানে আসিয়া সে এইবার প্রথম শিক্ষা করিল।

কতদিন হইল সে বাড়ি ছাড়িয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীরটাও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, অর্থও ফুরাইয়া আসিতেছে, বস্ত্রাদি মলিন এবং জীর্ণ হইতে চলিল, রাত্রে শুইয়া থাকিবার স্থানটুকুরও কোন ঠিকানা নাই—সুরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। বাটীতে পত্র লিখিতেও ইচ্ছা হয় না—বড় লজ্জা করে, এবং সকলের উপর যখন তাহার বিমাতার সেই স্নেহ-কঠিন মুখখানি মনে পড়ে, তখন বাটী যাইবার ইচ্ছা একেবারে আকাশকুসুম হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে যে সে কখনও ছিল এ কথা ভাবিতেও তাহার ভয় হয়।

একদিন সে তাহারই মত একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?

লোকটা একটু বোকা ধরনের—না হইলে উপহাস করিত। সে বলিল, চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই। কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?

সুরেন্দ্র বলিল, আমাকে একটা চাকরি করিয়া দিতে পার?

সে কহিল, তুমি কি কাজ জান?

সুরেন্দ্রনাথ কোন কাজই জানিত না, তাই সে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

তুমি কি ভদ্রলোক?—সুরেন্দ্র মাথা নাড়িল।

তবে লেখাপড়া শেখনি কেন?

শিখেছি।

সে লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল, তবে ঐ বড়বাড়িতে যাও। ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে—একটা কিছু কাজ করিয়া দিবেই। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ ফটকের কাছে আসিল। একবার দাঁড়াইল, আবার পিছাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল- আবার ফিরিয়া গেল। সেদিন আর কিছু হইল না। পরদিনও ঐরূপ করিয়া কাটিল। দুই দিন ধরিয়া সে ফটকের নিকট উমেদারি করিয়া তৃতীয় দিবসে অপেক্ষাকৃত সাহস সঞ্চয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি চান?

বাবুকে—

বাবু বাড়ি নেই।

সুরেন্দ্রনাথের বুকখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল—একটা নিতান্ত শক্ত কাজের হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল। বাবু বাড়ি নাই চাকরির কথা, দুঃখের কাহিনী বলিতে হইল না, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরিয়া গিয়া, দোকানে বসিয়া পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া খানিকক্ষণ সে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং মনে মনে রীতিমত আলোচনা করিতে লাগিল যে, পরদিন কেমন করিয়া কথাবার্তা কহিতে পারিলে তাহার নিশ্চিত একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

পরদিন কিন্তু উৎসাহটা তেমন রহিল না। বাটীর যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ফটকের নিকট আসিয়া একেবারে সে দমিয়া পড়িল—পা আর কোন মতেই ভিতরে যাইতে চাহে না। আজ তাহার কিছুতেই মনে হইতেছে না যে, সে নিজের কাজের জন্যই নিজে আসিয়াছে—ঠিক মনে হইতেছিল, যেন জোর করিয়া আর কেহ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দ্বারের কাছে সে আর উমেদারি করিবে না, তাই ভিতরে আসিল। সেই ভৃত্যটার সহিত দেখা হইল। সে বলিল, বাবু বাড়ি আছেন, দেখা করবেন কি?

হাঁ।

তবে চলুন।

এটা আরও কঠিন! জমিদারবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। রীতিমত সাহেবী ধরনের সাজান আসবাবপত্র। কক্ষের পর কক্ষ, মারবেল-প্রস্তরের সোপানাবলী, ঝাড়লণ্ঠন লাল কাপড়ে ঢাকা প্রতি কক্ষে শোভা পাইতেছে, ভিত্তি-সংলগ্ন প্রকাণ্ড মুকুর, কত ছবি, কত ফটোগ্রাফ। এ-সমস্ত অপরের পক্ষে যাহাই হউক, সুরেন্দ্রের নিকট নূতন নহে। কারণ, তাহার পিতার বাটীও দরিদ্রের কুটীর নহে; আর যাহাই হউক, সে দরিদ্র পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয় নাই।

সুরেন্দ্র ভাবিতেছিল—সেই লোকটির কথা, যাহার সহিত দেখা করিতে, অনুনয়-বিনয় করিতে যাইতেছে,—তিনি কি প্রশ্ন করিবেন, এবং সে কি উত্তর দিবে।

কিন্তু এত ভাবিবার সময় নাই—কর্তা সম্মুখে বসিয়া ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, কি প্রয়োজন?

আজ তিন দিন ধরিয়া সুরেন্দ্র এই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গেল, বলিল, আমি—আমি—

ব্রজরাজ লাহিড়ী পূর্ববঙ্গের জমিদার। মাথায় দুই-চারিগাছা চুলও পাকিয়াছে—বাতিকে নহে, ঠিক বয়সেই পাকিয়াছিল। বড়লোক, অনেককে দেখিয়াছিলেন; তাই চট্ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অনেকটা বুঝিয়া লইলেন, কহিলেন, হাঁ বাপু, কি চাও তুমি?

কোন একটা—

কি একটা?

চাকরি—

ব্রজরাজবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমি চাকরি দিতে পারি এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?

পথে একজনের সহিত দেখা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে-ই আপনার কথা—

ভাল। তোমার বাড়ি কোথায়?

পশ্চিমে।

সেখানে কে আছে?—সুরেন্দ্রনাথ সব কথা বলিল।

তোমার পিতা কি করেন?

অবস্থাবৈগুণ্যে সুরেন্দ্র নূতন ধাঁচ শিখিয়াছিল—একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, সামান্য চাকরি করেন।

তাতে চলে না, তাই তুমি উপার্জন করিতে চাও?

হাঁ।

এখানে কোথায় থাকো?

কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই—যেখানে সেখানে।

ব্রজবাবুর দয়া হইল। সুরেন্দ্রনাথকে কাছে বসাইয়া তিনি বলিলেন, তুমি এখনও বালক মাত্র। এই বয়সে বাড়ি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া দুঃখ হইতেছে। আমি নিজে যদিও কোনও চাকরি দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে কিছু যোগাড় হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।

আচ্ছা, বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ব্রজবাবু তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা করিবার নাই?

না।

ইহাতেই তোমার কাজ হইয়া গেল? কি উপায় করিতে পারি, কবে করিতে পারি,—কিছুই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে না?

সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু সহাস্যে বলিলেন, এখন কোথায় যাইবে?

কোন একটা দোকানে।

সেইখানেই আহার করিবে?

প্রতিদিন তাহাই করি।

তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখিয়াছ?

কিছু শিখিয়াছি।

আমার ছেলেকে পড়াইতে পারিবে?

সুরেন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, পারিব।

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, দুঃখে এবং দারিদ্র্যে তাহার মাথার ঠিক নাই, কেননা, কাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং কি শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা না জানিয়াই অতটা আনন্দিত হওয়া তাঁহার নিকটে পাগলামি বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন, যদি সে বলে, আমি বি.এ. ক্লাসে পড়ি, তখন তুমি কি করিয়া পড়াইবে?

সুরেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া বলিল, তা একরকম হইবে—

ব্রজবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, বঙ্কু, এই বাবুটির থাকিবার জায়গা করিয়া দাও, এবং স্নানাহারের যোগাড় দেখ।—পরে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পর আবার ডাকাইয়া পাঠাইব। তুমি আমার বাড়িতেই থাক। যতদিন কোন চাকরির উপায় না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পারিবে।

দ্বিপ্রহরের আহার করিতে গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধবীকে ডাকিয়া কহিলেন, মা, একজন দুঃখী লোককে বাড়িতে স্থান দিয়াছি।

কে, বাবা?

দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। লেখাপড়া বোধ হয় কিছু জানে, কেননা, তোমার দাদাকে পড়াইবার কথা বলাতে, তাহাতেই সে স্বীকার করিয়াছিল। বি.এ. ক্লাসের ছেলেকে যে পড়াইতে সাহস করিতে পারে, অন্ততঃ তোমার ছোট বোনটিকে সে নিশ্চয়ই পড়াইতে পারিবে। মনে করিতেছি সে-ই প্রমীলার মাস্টার থাকুক।

মাধবী আপত্তি করিল না।

সন্ধ্যার পর তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া, ব্রজবাবু তাহাই বলিয়া দিলেন। পরদিন হইতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমীলাকে পড়াইতে লাগিল।

প্রমীলার বয়স সাত বৎসর। সে বোধোদয় পড়ে। বড়দিদি মাধবীর নিকট ফার্স্ট বুকের ভেকের গল্প পর্যন্ত পড়িয়াছিল। সে খাতাপত্র বই, শ্লেট, পেন্সিল, ছবি, লজেঞ্জেস প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল।

Do not move.—সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া দিল—Do not move—নড়িও না।

প্রমীলা পড়িতে লাগিল, Do not move—নড়িও না।

তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া শ্লেট টানিয়া লইল—পেন্সিল হাতে করিয়া আঁক পাড়িয়া বসিল। প্রব্‌লেমের পর প্রব্‌লেম সল্‌ভ হইতে লাগিল—ঘড়িতে সাতটার পর আটটা, তারপর নয়টা বাজিতে লাগিল। প্রমীলা কখনও এ-পাশ কখনও ও-পাশ ফিরিয়া, ছবির পাতা উলটাইয়া, শুইয়া বসিয়া লজেঞ্জেস মুখে পুরিয়া নিরীহ ভেকের সর্বাঙ্গে মসীলিপ্ত করিতে করিতে পড়িতে লাগিল, Do not move—নড়িও না।

মাস্টারমশাই, বাড়ি যাই?

যাও।

সকালবেলাটা তাহার এইরূপেই কাটে। কিন্তু, দুপুরবেলার কাজটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চাকুরির যাহাতে উপায় হয়, এজন্য ব্রজবাবু অনুগ্রহ করিয়া দু-একজন ভদ্রলোকের নামে খানকতক পত্র দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইগুলি পকেটে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সন্ধান করিয়া তাহাদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখে, কত বড় বাড়ি, কয়টা জানালা, বাহিরে কতগুলি ঘর, দ্বিতল কি ত্রিতল, সম্মুখে কোন ল্যাম্প-পোস্ট আছে কি না, তাহার পর সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসে।

কলিকাতায় আসিয়াই সে কতকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়াছিল, বাড়ি হইতেও কতকগুলি লইয়া আসিয়াছিল। এখন সেইগুলি সে গ্যাসের আলোকে অধ্যয়ন করিতে থাকে। ব্রজবাবু কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হয় চুপ করিয়া থাকে, নাহয় বলে, ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ চারি বৎসর হইল ব্রজরাজবাবুর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—বুড়া বয়সের এ দুঃখ বুড়াতেই বোঝে। কিন্তু সে কথা যাক—তাঁহার আদরের কন্যা মাধবী দেবী যে এই তার ষোল বৎসর বয়সেই স্বামী হারাইয়াছে—ইহাই ব্রজরাজের শরীরের অর্ধেক রক্ত শুষিয়া লইয়াছে। সাধ করিয়া ঘটা করিয়া তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। নিজের অনেক টাকা,—তাই অর্থের প্রতি নজর দেন নাই, ছেলেটির বিষয়-আশয় আছে কি না, খোঁজ লন নাই,

শুধু দেখিয়াছিলেন, ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে, রূপবান, সৎ, সাধুচরিত্র—ইহাই লক্ষ্য করিয়া মাধবীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

এগার বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইয়াছিল। তিন বৎসর সে স্বামীর কাছে ছিল। যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা সবই সে পাইয়াছিল।

কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বাঁচিলেন না। মাধবীর এ জীবনের সব সাধ মুছিয়া দিয়া, ব্রজরাজের বক্ষে শেল হানিয়া, তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মরিবার সময় মাধবী যখন বড় কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিয়াছিলেন, মাধবী, তোমাকে যে ছাড়িয়া যাইতেছি, এইটিই আমার সব চেয়ে দুঃখ। মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি যে আজীবন ক্লেশ পাইবে, এইটি আমাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। তোমাকে যে যত্ন করিতে পাইলাম না—

দরবিগলিত অশ্রুরাশি যোগেন্দ্রের শীর্ণবক্ষে ঝরিয়া পড়িল। মাধবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, আবার যখন তোমার পায়ে গিয়া পড়িব, তখন যত্ন করিও—

যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, মাধবী, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও। যার মুখ ক্লিষ্ট মলিন দেখিবে তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিও—আর কি বলিব, মাধবী—আবার উচ্ছ্বসিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—মাধবী তাহা মুছাইয়া দিল।

সৎপথে থাকিও—তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।

সেই অবধি মাধবী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার ছিল, স্বামীর চিতাভস্মের সহিত সবগুলি সে ইহজন্মের মত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। এ জীবনের কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা! বিধবা হইলে কিছু সে-সব যায় না.- মাধবী তখন স্বামীর কথা ভাবে। তিনি যখন নাই, তখন আর কেন? কাহার জন্য পরের হিংসা করিব! কাহার জন্য আর পরের চোখে জল বহাইব! আর এ-সকল হীন প্রবৃত্তি তাহার কোন কালেই ছিল না, বড়লোকের মেয়ে—কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার অতৃপ্ত ছিল না—হিংসা-দ্বেষ কোনদিন শিখেও নাই।

তাহার নিজের হৃদয়ে অনেক ফুল ফোটে, আগে সে ফুলে মালা গাঁথিয়া সে স্বামীর গলায় পরাইয়া দিত। এখন স্বামী নাই, তাই বলিয়া ফুলগাছটি সে কাটিয়া ফেলে নাই। এখনো তাহাতে তেমনি ফুল ফোটে, ভূমে লুটাইয়া পড়ে। এখন সে আর মালা গাঁথিতে যায় না সত্য, গুচ্ছ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া দীন-দুঃখীকে তাহা বিলাইয়া দেয়। যাহার নাই, তাহাকেই দেয়, এতটুকু কার্পণ্য নাই, এতটুকু মুখ ভারী করা নাই।

ব্রজবাবুর গৃহিণী যেদিন পরলোকগমন করেন, সেই দিন হইতে এ সংসারে আর শৃঙ্খলা ছিল না। সবাই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত; কেহ কাহাকেও দেখিত না, কেহ কাহারও পানে চাহিত না। সকলেরই এক-একজন ভৃত্য মোতায়েন ছিল, তাহারা আপন আপন প্রভুর কাজ করিত। রন্ধনশালায় পাচক রন্ধন করিত, বৃহৎ অন্নসত্রের মত লোকে পাত পাড়িয়া বসিয়া খাইত। কেহ খাইতে পাইত, কেহ পাইত না। সে দুঃখ কেহ চাহিয়াও দেখিত না।

কিন্তু যেদিন হইতে মাধবী তাহার ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত রূপ, স্নেহ, মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সবাই কহে, 'বড়দিদি', সবাই বলে মাধবী। বাড়ির পোষা কুকুরটা পর্যন্ত দিনান্তে একবার 'বড়দিদি'কে দেখিতে চাহে। এত লোকের মধ্যে সেও যেন একজনকে স্নেহময়ী সর্বময়ী বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছে। বাড়ির প্রভু হইতে সরকার, গোমস্তা, দাস, দাসী সবাই ভাবে বড়দিদির কথা, সবাই তাহার উপর নির্ভর করে; সকলেরই মনে মনে একটা ধারণা যে, যে কারণেই হোক, এই বড়দিদিটির উপর তাহার একটু বিশেষ দাবি আছে।

স্বর্গের কল্পতরু কখনও দেখি নাই, দেখিব কিনা তাহাও জানি না, সুতরাং তাহার কথা বলিতেও পারিলাম না। কিন্তু, এই ব্রজবাবুর সংসারবর্তী লোকগুলো একটি কল্পতরু পাইয়াছিল। তলায় গিয়া হাত পাতিত, আর হাসিমুখে ফিরিয়া আসিত।

এরূপ পরিবারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একটা নূতন ধরনের জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় দেখিতে পাইল। সকলে যখন একজনেরই উপর সমস্ত ভার রাখিয়াছে, তখন সেও

তাহাদের মতই করিতে লাগিল। কিন্তু, অপরের অপেক্ষা তাহার ধারণা একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ভাবিত, 'বড়দিদি' বলিয়া একটি জীবন্ত পদার্থ বাটীর মধ্যে থাকে, সকলকে দেখে, সব আবদার সহ্য করে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহারই নিকট পাওয়া যায়। কলিকাতায় রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের জন্য নিজে ভাবিবার প্রয়োজনটা সে কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি সে একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত জীবনে কোন একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল, বা পরে ভাবিতে হইবে।

জামা, কাপড়, জুতা, ছাতি, ছড়ি—যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তাহার কক্ষে প্রচুর আছে। রুমালটি পর্যন্ত তাহার জন্য সযত্নে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। প্রথমে কৌতূহল হইত, সে জিজ্ঞাসা করিত, এ-সব কোথা হইতে আসিল? উত্তর পাইত, বড়দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। জলখাবারের থালাটি পর্যন্ত দেখিলে সে আজকাল বুঝিতে পারে, ইহাতে বড়দিদির সযত্ন স্পর্শ ঘটিয়াছে।

অঙ্ক কষিতে বসিয়া একদিন তাহার কম্পাসের কথা মনে পড়িল; প্রমীলাকে কহিল, প্রমীলা! বড়দিদির কাছ থেকে কম্পাস নিয়ে এস।

কম্পাস লইয়া বড়দিদিকে কাজ করিতে হয় না, ইহা তাহার নিকট ছিল না; কিন্তু বাজারে তখনই সে লোক পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেখিল, তাহার টেবিলের উপর প্রার্থিত বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। পরদিন সকালে প্রমীলা কহিল, মাস্টারমশাই, কাল দিদি ঐটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তাহার পর মধ্যে মধ্যে সে এমন এক-আধটা জিনিস চাহিয়া বসিত যে, মাধবী সেজন্য বিপদে পড়িয়া যাইত। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইত। কিন্তু কখনও সে বলে নাই, দিতে পারিব না।

কিংবা কখনও সে হঠাৎ হয়ত প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদির নিকট হইতে পাঁচখানা পুরাতন কাপড় লইয়া এস; ভিখারীদের দিতে হইবে। নূতন-পুরাতন বাছিবার অবসর মাধবীর সব সময় থাকিত না; সে আপনার পাঁচখানা কাপড় পাঠাইয়া দিয়া, উপরের গবাক্ষ হইতে দেখিত—চারি-পাঁচজন দুঃখী লোক কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেছে—তাহারাই বস্ত্রলাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের এই ছোটখাটো আবেদন-অত্যাচার নিত্যই মাধবীকে সহ্য করিতে হইত। ক্রমশঃ এ-সকল এরূপ অভ্যাস হইয়া গেল যে, মাধবীর আর মনে হইত না, একটা নূতন জীব তাহার সংসারে আসিয়া দৈনন্দিন কার্যকলাপের মাঝখানটিতে নূতন রকমের ছোট-খাটো উপদ্রব তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। এই নূতন জীবটির জন্য মাধবীকে আজকাল খুবই সতর্ক থাকিতে হয়, বড় বেশি খোঁজ লইতে হয়। সে যদি সব জিনিস চাহিয়া লইত, তাহা হইলেও মাধবীর অর্ধেক পরিশ্রম কমিয়া যাইত; সে যে নিজের কোন জিনিসই চাহে না -এইটিই বড় ভাবনার কথা। প্রথমে সে জানিতে পারে নাই যে, সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অন্যমনস্কপ্রকৃতির লোক। প্রাতঃকালে চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সে হয়ত খায় না। জলখাবার হয়ত স্পর্শ করিতেও তাহার মনে থাকে না, হয়ত বা কুকুরের মুখে তুলিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। খাইতে বসিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনের সে কোন সম্মানই রাখে না, পাশে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া যায়; যেন কোন দ্রব্যই তাহার মনে ধরে না। ভৃত্যেরা আসিয়া কহে, মাস্টারবাবু পাগলা, কিছু দেখে না, কিছু জানে না—বই নিয়েই বসে আছে।

ব্রজবাবু মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, চাকরির কোনরূপ সুবিধা হইতেছে কি না। সুরেন্দ্র সে কথার ভাসা ভাসা উত্তর দেয়। মাধবী পিতার নিকট সে-সব শুনিতে পায়, সে-ই কেবল বুঝিতে পারে যে, চাকরির জন্য মাস্টারবাবুর একতিল উদ্যোগ নাই, ইচ্ছাও নাই। যাহা আপাততঃ হইয়াছে, তাহাতেই সে পরম সন্তুষ্ট।

বেলা দশটা বাজিলেই বড়দিদির নিকট হইতে স্নানাহারের তাগিদ আসে। ভাল করিয়া আহার না করিলে বড়দিদির হইয়া প্রমীলা অনুযোগ করিয়া যায়। অধিক রাত্রি পর্যন্ত বই লইয়া বসিয়া থাকিলে ভৃত্যেরা গ্যাসের চাবি বন্ধ করিয়া দেয়, বারণ করিলে শুনে না—বড়দিদির হুকুম।

একদিন মাধবী পিতার কাছে হাসিয়া বলিল, বাবা, প্রমীলা যেমন, তার মাস্টারও ঠিক তেমনি।

কেন মা?

দু'জনেই ছেলেমানুষ। প্রমীলা যেমন বোঝে না তার কখন কি দরকার, কখন কি খাইতে হয়, কখন শুইতে হয়, কখন কি করা উচিত, তার মাস্টারও সেইরকম, নিজের কিছুই বোঝে না—অথচ, অসময়ে এমনি জিনিস চাহিয়া বসে যে, জ্ঞান হইলে তাহা আর কেহ চায় না।

ব্রজবাবু বুঝিতে পারিলেন না, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মাধবী হাসিয়া বলিল, তোমার মেয়েটি বোঝে কখন তার কি দরকার?

তা বোঝে না?

অথচ, অসময়ে উৎপাত করে ত?

তা করে।

মাস্টারবাবু তাই করে—

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, ছেলেটি বোধহয় একটু পাগল।

পাগল নয়। উনি বোধ হয় বড়লোকের ছেলে।

ব্রজবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া জানিলে?

মাধবী জানিত না, কিন্তু এমনি বুঝিত। সুরেন্দ্র যে নিজের একটি কাজও নিজে করিতে পারে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, পরে করিয়া দিলে হয়, না করিয়া দিলে হয় না—এই অক্ষমতাই তাহাকে মাধবীর নিকটে ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইত—এটা তাহার পূর্বের অভ্যাস। বিশেষ এই নূতন ধরনের আহার-প্রণালীটা মাধবীকে আরো চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। কোন খাদ্যদ্রব্যই যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কিছুই সে তৃপ্তিপূর্বক আহার করে না—কোনটির উপরই স্পৃহা নাই, এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা,—খাইতে দিলে খায়, না দিলে খায় না—এ-সকল তাহার নিকট বড় রহস্যময় বোধ হইত। একটা অজ্ঞাত করুণাচক্ষুও সেই জন্য এই অজ্ঞাত মাস্টারবাবুর উপর পড়িয়াছিল। সে যে লজ্জা করিয়া চাহে না, তাহা নহে, তাহার প্রয়োজন হয় না, তাই সে চাহে না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কিন্তু আর সময়-অসময় থাকে না—একেবারে বড়দিদির নিকট আবেদন আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধবী মুখ টিপিয়া হাসে, মনে হয়, এ লোকটি নিতান্ত বালকের মত সরল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনোরমা মাধবীর বাল্যকালের সখী, তাহাকে বহুদিন পত্র লেখা হয় নাই, উত্তর না পাইয়া সে বিষম চটিয়া গিয়াছিল। আজ দ্বিপ্রহরের পর একটু সময় করিয়া, মাধবী তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। এমন সময় প্রমীলা আসিয়া ডাকিল, বড়দিদি! মাধবী মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

মাস্টারমশায়ের চশমা কোথায় হারিয়ে গেছে—একটা চশমা দাও। মাধবী হাসিয়া ফেলিল।

তোমার মাস্টারমশায়কে বল গে, আমি কি চশমার দোকান করি? প্রমীলা ছুটিয়া যাইতেছিল। মাধবী তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল, কোথায় যাচ্ছিস?

বলতে।

তার চেয়ে সরকারমশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।

প্রমীলা সরকারমশায়কে ডাকিয়া আনিলে, মাধবী বলিয়া দিল—মাস্টারবাবু চশমা হারিয়েছেন, ভাল দেখে একটা কিনে দাও গে।

সরকার চলিয়া গেলে, সে মনোরমাকে পত্র লিখিল, শেষে লিখিয়া দিল—

প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন—তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়,

ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধ হয়, ইহার পূর্বে সে কখনও বাটীর বাহির হয় নাই —সংসারের কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার একদণ্ডও চলে না। আমার অর্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে,—তোমাদের পত্র লিখিব আর কখন? এখন যদি তোমার শীঘ্র আসা হয়, তাহা হইলে, এই অকর্মণ্য লোকটিকে দেখাইয়া দিব। এমন অকেজো, অন্যমনস্ক লোক, তুমি জন্মে দেখ নাই। খাইতে দিলে খায়, না দিলে চুপ করিয়া উপবাস করে। হয়ত সমস্ত দিনের মধ্যেও তাহার মনেও পড়ে না যে, তাহার আহার হইয়াছে কি না! একদিনের জন্যও সে আপনাকে চালাইয়া লইতে পারে না। তাই ভাবি এমন লোক সংসারে বাহির হয় কেন? শুনিতে পাই, তাহার পিতামাতা আছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ। আমি ত বোধ হয়, এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না!

মনোরমা তামাশা করিয়া উত্তর লিখিল—তোমার পত্রে অন্যান্য সংবাদের মধ্যে জানিতে পারিলাম যে, তুমি বাড়িতে একটি বাঁদর পুষিয়াছ, আর তুমি তার সীতাদেবী হইয়াছ। কিন্তু তবু একটু সাবধান করিয়া দিতেছি। ইতি—মনোরমা।

পত্র পড়িয়া মাধবীর মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর লিখিল—তোমার পোড়া মুখ, তাই কাহাকে কি ঠাট্টা করিতে হয়, জান না।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, প্রমীলা, তোমার মাস্টারমশায়ের চশমা কেমন হয়েছে?

প্রমীলা বলিল, বেশ!

কেমন ক'রে জানলে?

মাস্টারমশায় সেই চশমা চোখে দিয়ে বেশ বই পড়েন—তাই জানলুম।

মাধবী কহিল, তিনি নিজে কিছু বলেন নি?

কিছু না।

একটি কথাও না? ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, কিছু না?

না, কিছু না।

মাধবীর সদাপ্রফুল্ল মুখ যেন মুহূর্তের জন্য মলিন হইল; কিন্তু তখনি হাসিয়া কহিল তোমার মাস্টারকে বলে দিয়ো, তিনি যেন আর হারিয়ে না ফেলেন।

আচ্ছা, বলে দেব।

দূর পাগ্‌লি, তা কি বলতে আছে! তিনি হয়ত কিছু মনে করবেন।

তবে কি বলব না?

না।

শিবচন্দ্র মাধবীর দাদা। মাধবী একদিন তাহাকে ধরিয়া বলিল, দাদা, প্রমীলার মাস্টার রাতদিন কি পড়ে, জান?

শিবচন্দ্র বি.এ. ক্লাসে পড়ে। ক্ষুদ্র প্রমীলার শিক্ষক-শ্রেণীর লোকগুলা তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। উপেক্ষা করিয়া বলিল, নাটক-নভেল পড়ে, আর কি পড়িবে?

মাধবীর বিশ্বাস হইল না। প্রমীলাকে দিয়া একখানা পুস্তক লুকাইয়া আনিয়া, তাহার দাদার হাতে দিয়া বলিল, নাটক-নভেল ব'লে ত বোধ হয় না!

শিবচন্দ্র আগাগোড়া কিছু বুঝিল না, শুধু এইটুকু বুঝিল যে, ইহার একবিন্দুও তাহার জানা নাই এবং এখানি গণিতের পুস্তক।

ভগিনীর নিকট সম্মান হারাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কহিল, এটা অঙ্কের বই, ইস্কুলে নীচের ক্লাসে পড়া হয়। বিষণ্ণমুখে মাধবী প্রশ্ন করিল, কোন পাসের পড়া নয়? কলেজের বই নয়?

শুষ্ক হাসিয়া শিবচন্দ্র বলিল, না, কিছুই নয়।—কিন্তু সেইদিন হইতে শিবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কখনও সুরেন্দ্রের সম্মুখে পড়িত না। মনে মনে ভয় ছিল, পাছে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, পাছে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং পিতার আদেশে তাহাকে প্রাতঃকালটা প্রমীলার সহিত একসঙ্গে এই মাস্টারটার নিকট খাতা-পেন্সিল লইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

কিছুদিন পরে মাধবী পিতাকে কহিল, বাবা, আমি দিনকতকের জন্য কাশী যাব।

ব্রজবাবু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন,—সে কি মা? তুমি কাশী গেলে এ সংসারে কি হইবে?

মাধবী হাসিয়া বলিল, আমি আবার ত আসিব, একেবারে যাইতেছি না ত!

মাধবী হাসিল। পিতার চক্ষে কিন্তু জল আসিতেছিল। মাধবী বুঝিতে পারিল, এরূপ কথা বলা অন্যায় হইতেছে। সামলাইয়া লইবার জন্য কহিল, শুধু দিনকতকের জন্য বেড়াইয়া আসিব।

তা যাও—কিন্তু মা, সংসার চলবে না।

আমি ছাড়া সংসার চলবে না?

চলবে না কেন মা, চলবে! হাল ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেমন ক'রে চলে—এ ও তেমনি চলবে।

কিন্তু কাশী যাওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সেখানে তাহার বিধবা ননদিনী একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করেন, তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে।

কাশী যাইবার দিন সে প্রত্যেককে ডাকিয়া সংসারের ভার দিয়া গেল। বুড়ি দাসীকে ডাকিয়া, পিতা, দাদা ও প্রমীলাকে বিশেষরূপে দেখিবার জন্য অনুরোধ ও উপদেশ দিয়া দিল; কিন্তু মাস্টারের কথা কাহাকেও কহিল না। ভুলিয়া যায় নাই—ইচ্ছা করিয়াই বলিল না। সম্প্রতি তাহার উপর একটু রাগ হইয়াছিল। মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন কি সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই। তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এই অকর্মণ্য সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল। একটা কৌতুক করিতে দোষ কি? সে না থাকিলে ইহার কেমনভাবে দিন কাটে, দেখিতে হানি কি? তাই সে সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রব্লেম সল্‌ভ করিতেছিল। প্রমীলা কহিল, কাল রাত্রে দিদি কাশী গিয়াছেন।

কথাটা তাহার কানে গেল না। কিন্তু দিন দুই-তিন পরে যখন সে দেখিতে পাইল, দশটার সময় আহারের জন্য আর পীড়াপীড়ি হয় না,—কোনদিন বা একটা-দুইটা বাজিয়া যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতে গিয়া দেখে বোধ হয় সেগুলি আর তেমনি পরিষ্কার নাই, জলখাবারের থালাটা তেমন সযত্ন-সজ্জিত নহে। রাত্রে গ্যাসের চাবি কেহ বন্ধ করিতে আসে না, পড়ার ঝোঁকে দুইটা-তিনটা বাজিয়া যায়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, উঠিতে বেলা হয়, সমস্ত দিন চোখের পাতা ছাড়িয়া ঘুম কিছুতেই যাইতে চাহে না। শরীর যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন সুরেন্দ্রনাথের মনে হইল, এ সংসারে একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গরম বোধ হইলে তবে লোকে পাখার সন্ধান করে! সুরেন্দ্রনাথ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, প্রমীলা, বড়দিদি এখানে নাই, না?

সে বলিল, দিদি কাশী গিয়াছেন।

তাইত!

দিন-দুই পরে হঠাৎ প্রমীলার পানে চাহিয়া সে কহিল, বড়দিদি কবে আসবেন?

একমাস পরে!

সুরেন্দ্রনাথ পুস্তকে মনোযোগ করিল। আরও পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ পেন্সিলটা পুস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, প্রমীলা, একমাসের আর কত বাকী?

অনেক দিন।

পেন্সিল তুলিয়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথ চশমা খুলিয়া কাচ দুইটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর চক্ষে দিয়া পুস্তকের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন কহিল, প্রমীলা, বড়দিদিকে তুমি চিঠি লেখ না?

লিখি বৈ কি!

তাড়াতাড়ি আসতে লেখনি?

না।

সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তাইত।

প্রমীলা বলিল, মাস্টারমশায়, বড়দিদি এলে বেশ হয়, না?

বেশ হয়।

আসতে লিখে দেব?

সুরেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল হইয়া বলিল, দাও।

আপনার কথা লিখে দেব?

দাও।

'দাও' বলিতে তাহার কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইল না। কেননা, জগতের কোন আদব-কায়দা সে জানিত না। বড়দিদিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা যে তাহার মানায় না, ভাল শুনিতে হয় না, এটা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। যে না থাকিলে তাহার বড় ক্লেশ হয়, যাহার অবর্তমানে তাহার চলিতেছে না--তাহাকে আসিতে বলায় সে কিছুই অসঙ্গত মনে করিল না।

এ জগতে যাহার কৌতূহল কম, সে সাধারণ মনুষ্য-সমাজের একটু বাহিরে। যে দলে সাধারণ মনুষ্য বিচরণ করে, সে দলে তাহার মেলা চলে না। সাধারণের মতামত তাহার মতামতের সহিত মিশ খায় না। কৌতূহলী হওয়া সুরেন্দ্রের স্বভাব নহে। যতটা তাহার প্রয়োজন, ততটাই সে জানিতে চাহে, তাহার বাহিরে স্বেচ্ছাপূর্বক এক পদও যাইতে তাহার ইচ্ছা হইত না, সময়ও পাইত না। তাই বড়দিদির সম্বন্ধে সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। এতদিন এ সংসারে তাহার অতিবাহিত হইল, এই তিন মাস ধরিয়া সে বড়দিদির উপর ভব দিয়া পরম আরামে কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, এই জীবটি কেমন। কত বড়, কত বয়স, কেমন দেখিতে, কত গুণ, কিছুই সে জানিত না, জানিবার বাসনা হয় নাই, একবার মনেও পড়ে নাই। ইহার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ত লোকের সাধ হয়!

সবাই কহে, বড়দিদি; সেও কহে, বড়দিদি। সবাই তাহার নিকট স্নেহ-যত্ন পায়, সেও পায়। বিশ্বের ভাণ্ডার তাহার নিকট গচ্ছিত আছে, যে চাহে সে পায়—সুরেন্দ্রও লইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের কথা আর কি? মেঘের কাজ—জল বরিষণ করা, বড়দিদির কাজ—স্নেহ-যত্ন করা। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন যে হাত পাতে, সে-ই জল পায়। বড়দিদির নিকট হাত পাতিলে অভীষ্ট-পদার্থ পাওয়া যায়। মেঘের মতই বুঝি সে অন্ধ, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা-হীন। মোটের উপর সে এমনি একটা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল। আসিয়া অবধি সে যে ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছিল—আজও তাহাই আছে। শুধু এই কাশীগমন ঘটনাটির পর হইতে এইটুকু সে বেশি জানিয়াছে যে, বড়দিদি ভিন্ন তাহার একদণ্ডও চলিতে পারে না।

সে যখন বাড়িতে ছিল, তখন তাহার পিতাকে জানিত, বিমাতাকে জানিত। তাঁহাদের কর্তব্য কি তাহা বুঝিত, কিন্তু বড়দিদি বলিয়া কাহারও সহিত পরিচিত হয় নাই যখন পরিচয় হইয়াছে, তখন সে এমনিই বুঝিয়াছে। কিন্তু মানুষটিকে সে চিনে না, জানে না, শুধু নামটি জানে, নামটি চেনে, লোকটি তাহার কেহ নহে। নামটি সর্বস্ব।

লোক যেমন ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পায় না, শুধু নামটি শিখিয়া রাখে, দুঃখে-কষ্টে সেই নামটির সম্মুখে সমস্ত হৃদয় মুক্ত করে, নতজানু হইয়া করুণাভিক্ষা চাহে, চক্ষে জল আসে, মুছিয়া ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে কাহাকে যেন দেখিতে চাহে—কিছুই দেখা যায় না; অস্পষ্ট জিহ্বা শুধু দুইটি কথা অস্ফুট উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যায়। দুঃখ পাইয়া তাই সুরেন্দ্রনাথও অস্ফুটে উচ্চারণ করিল, 'বড়দিদি'!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই, পূর্বদিক রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র। প্রমীলা আসিয়া নিদ্রিত সুরেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল—মাস্টারমশায়! সুরেন্দ্রনাথের অলস চক্ষু দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল—কি প্রমীলা?

বড়দিদি এসেছেন। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিল। প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, চল, দেখে আসি।

এই দেখিবার বাসনাটি তাহার মনে কেমন করিয়া উদয় হইল বলা যায় না, এবং এতদিন পরে কেন যে সে প্রমীলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু সে ভি রে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধবীর কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রমীলা ডাকিল, বড়দিদি!

বড়দিদি অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা কাজ করিতেছিল, কহিল, কি দিদি!

মাস্টারমশাই—

দুইজনে ততক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। মাধবী শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল; মাথার উপর এক হাত কাপড় টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্রনাথ কহিতেছিল, বড়দিদি, তোমার জন্য আমি বড় কষ্টে—মাধবী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিষম লজ্জায় জিভ কাটিয়া মনে মনে বলিল, ছি-ছি!

তুমি চলে গেলে—

মাধবী মনে মনে বলিল, কি লজ্জা!

মাধবী মৃদুকণ্ঠে কহিল, প্রমীলা, মাস্টারমশায়কে বাহিরে যাইতে বল।

প্রমীলা ছোট হইলেও তাহার দিদির আচরণ দেখিয়া বুঝিতেছিল যে, কাজটা ঠিক হয় নাই। বলিল, চলুন মাস্টারমশাই—

অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চল। বেশি কথা সে কহিতে জানিত না, বেশি কথা বলিতে সে চায় নাই, তবে সারাদিন মেঘের পর সূর্য উঠিলে, হঠাৎ যেমন লোকে সেদিকে চাহিতে চায়, ক্ষণকালের জন্য যেমন মনে থাকে না যে সূর্যের পানে চাহিতে নাই, কিংবা চাহিলে চক্ষু পীড়িত হয়, তেমনি একমাস মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে থাকিয়া প্রথম সূর্যোদয়ের সহিত সুরেন্দ্রনাথ পরম আহ্লাদে চাহিয়া দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু ফল যে এরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সে জানিত না।

সেইদিন হইতে তাহার যত্নটা একটু কমিয়া আসিল। মাধবী যেন একটু লজ্জা করিত। বিন্দু দাসী নাকি কথাটা লইয়া একটু হাসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও একটু সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজকাল সে যেন দেখিতে পায়, তাহার বড়দিদির অসীম ভাণ্ডার সসীম হইয়াছে। ভগিনীর যত্ন, জননীর স্নেহ-পরশ যেন তাহার আর গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।

একদিন সে প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদি আমার উপর রাগ করেছেন, না?

প্রমীলা বলিল, হাঁ।

কেন রে?

আপনি অমন ক'রে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন কেন?

যেতে নেই, না?

তা কি যেতে হয়? দিদি খুব রাগ করেছে।

সুরেন্দ্র পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া বলিল, তাইত—

তারপর একদিন দুপুরবেলা মেঘ করিয়া ঝড় জল আসিল। ব্রজরাজবাবু আজ দুদিন হইল বাড়ি নাই; জমিদারি দেখিতে গিয়াছিলেন। মাধবীর হাতে কিছু কাজ ছিল না, প্রমীলাও বড় উপদ্রব করিতেছিল, মাধবী তাহাকে ধরিয়া কহিল, প্রমীলা, তোর বই নিয়ে আয়, দেখি কত পড়েছিস।

প্রমীলা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মাধবী বলিল, নিযে আয়।

বড়দিদি, রাত্তিরে আনব।

না, এখনি আন্। নিতান্ত দুঃখিত মনে তখন সে বই আনিতে গেল। আনিয়া বলিল, মাস্টারমশাই কিছুই পড়ায় নি—খালি আপনি পড়ে। মাধবী জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। আগাগোড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল যে, সত্যই মাস্টারমশাই কিছুই পড়ান নাই; অধিকন্তু সে যাহা শিখিয়াছিল, শিক্ষক নিযুক্ত করিবার পর, এই তিন-চারিমাস ধরিয়া বেশ ধীরে ধীরে সবটুকু ভুলিয়া গিয়াছে। মাধবী বিরক্ত হইয়া বিন্দুকে ডাকিয়া কহিল, বিন্দু, মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে আয় ত, কেন প্রমীলাকে এতদিন একটুও পড়ান নি?

বিন্দু যখন জিজ্ঞাসা করিতে গেল, মাস্টার তখন প্রব্লেম ভাবিতেছিল। বিন্দু কহিল,

মাস্টারমশায়, বড়দিদি বলচেন যে, আপনি ছোটদিদিকে কিছু পড়ান নি কেন? মাস্টারমশায় শুনিতে পাইল না। এবার বিন্দু জোরে বলিল, মাস্টারমশায়?

কি?

বড়দিদি বলচেন—

কি বলচেন?

ছোটদিদিকে পড়ান নি কেন?

অন্যমনস্ক হইয়া সে জবাব দিল,—ভাল লাগে না।

বিন্দু ভাবিল, মন্দ নয়। এ কথা সে মাধবীকে জানাইল। মাধবীর রাগ হইল, সে নীচে আসিয়া দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বিন্দুকে দিয়া বলাইল, ছোটদিদিকে একেবারে পড়ান নি কেন? কথাটা বার দুই-তিন জিজ্ঞাসা করিবার পরে, সুরেন্দ্রনাথ কহিল, আমি পারব না।

মাধবী ভাবিল, এ কেমন কথা!

বিন্দু বলিল, তবে আপনি কি জন্য আছেন?

না থাকলে কোথা যাব?

তবে পড়ান না কেন?

সুরেন্দ্রনাথের এবার চৈতন্য হইল। ফিরিয়া বসিয়া কহিল, কি বলচ?

বিন্দু এতক্ষণ ধরিয়া কি কহিতেছিল, তাহাই আবার আবৃত্তি করিল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন কহিল, সে ত রোজ পড়ে!

পড়ে, কিন্তু আপনি দেখেন কি?

না। আমার সময় হয় না।

তবে এ বাড়িতে কেন আছেন?—সুরেন্দ্র চুপ করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।

আপনি আর পড়াতে পারবেন না?

না। আমার পড়াতে ভাল লাগে না।

মাধবী ভিতর হইতে কহিল, জিজ্ঞাসা কর্ বিন্দু, কেন এতদিন তবে মিছা কথা বলে আসছেন? বিন্দু তাহাই কহিল। শুনিয়া সুরেন্দ্রের প্রব্লেমের জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। একটু দুঃখিত হইল, একটু ভাবিয়া বলিল, তাইত, বড় ভুল হয়েছে।

এই চার মাস ধরে ক্রমাগত ভুল?

হ্যাঁ, তাইত হয়েছে দেখছি—তা কথাটা আমার তত মনে ছিল না।

পরদিন প্রমীলা পড়িতে আসিল না সুরেন্দ্রেরও তত মনে হইল না। তার পরদিনও আসিল না—সেদিনও অমনি গেল।

তৃতীয় দিবস প্রমীলাকে না দেখিতে পাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ একজন ভৃত্যকে কহিল, প্রমীলাকে ডেকে আন।

ভৃত্য ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ছোটদিদি আর আপনার কাছে পড়বেন না।

কার কাছে তবে পড়বে?

ভৃত্য বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, অন্য মাস্টার আসবে।

বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই-তিনখানা বই বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চশমাটা খাপে পুরিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ভৃত্য কহিল, মাস্টারবাবু, এ সময়ে কোথায় যাচ্ছেন?

বড়দিদিকে বলে দিও, আমি যাচ্ছি।

আর আসবেন না?

সুরেন্দ্রনাথ এ কথা শুনিতে পাইল না। বিনা উত্তরে ফটকের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি সুরেন্দ্র ফিরিল না। ভৃত্য তখন মাধবীকে সংবাদ দিল যে, মাস্টারমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন।

কোথায় গেছেন?

তা জানি না। বেলা নটার সময় চলে যান। যাবার সময় আমায় বলে যান যে, বড়দিদিকে ব'লো আমি চলে যাচ্ছি।

সে কি রে? না খেয়ে চলে গেলেন? মাধবী উদ্বিগ্ন হইল।

তারপর সে নিজে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে আসিয়া দেখিল—সব জিনিসপত্রই তেমনি আছে, টেবিলের উপর চশমাটি খাপেমোড়া রাখা আছে, শুধু বই কয়খানি নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল—সুরেন্দ্রনাথ আসিল না। পরদিন মাধবী দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিয়া দিল, তোমরা অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিলে দশ টাকা পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারের লোভে তাহারা ছুটিল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রমীলা কাঁদিয়া কহিল, বড়দিদি, তিনি চলে গেলেন কেন?

মাধবী তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল, বাইরে যা, কাঁদিস নে।

দুইদিন, তিনদিন করিয়া যত দিন যাইতে লাগিল, মাধবী তত অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বিন্দু কহিল, বড়দিদি, তা এত খোঁজাখুঁজি কেন? কলকাতা শহরে আর কি মাস্টার পাওয়া যায় না?

মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তুই দূর হ! একটা মানুষ একটি পয়সা হাতে না নিয়ে চলে গেল, আর তুই বলিস খোঁজাখুঁজি কেন?

তার কাছে একটিও পয়সা নেই, তা কি ক'রে জানলে?

তা আমি জানি, কিন্তু তোর অত কথায় কাজ কি?

বিন্দু চুপ করিয়া গেল। ক্রমে যখন সাতদিন কাটিয়া গেল, অথচ কেহ ফিরিয়া আসিল না, তখন মাধবী একরূপ অন্নজল ত্যাগ করিল। তাহার মনে হইত, সুরেন্দ্রনাথ অনাহারে আছে। যে বাড়ির জিনিস চাহিয়া খাইতে পারে না, পরের কাছে কি সে চাহিতে পারে? তাহার দৃঢ় ধারণা সুরেন্দ্রনাথের কিনিয়া খাইবার পয়সা নাই, ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, ছোটছেলের মত অসহায় অবস্থায় হয়ত বা কোন ফুটপাতে বসিয়া কাঁদিতেছে, নাহয় কোন গাছের তলায় বই মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে।

ব্রজরাজবাবু ফিরিয়া আসিয়া সব কথা শুনিয়া মাধবীকে কহিলেন, কাজটা ভাল হয়নি মা। মাধবী কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিনদিন অনাহারে কাটিল, কলের জলে পয়সা লাগে না, তাই ক্ষুধা পাইলে পেট ভরিয়া জল খাইত।

একদিন রাত্রে অবসন্ন শরীরে সে কালীঘাটে যাইতেছিল, কোথায় নাকি শুনিয়াছিল, সেখানে খাইতে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার মেঘ করিয়াছিল, চৌরঙ্গীর মোড়ে একখানা গাড়ি তাহার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ান কোনরূপ অশ্বের বেগ সংবরণ করিতে পারিয়াছিল। সুরেন্দ্র প্রাণে মরিল না বটে কিন্তু বক্ষে ও পার্শ্বে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। পুলিশ আসিয়া গাড়ি করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। চার-পাঁচদিন অজ্ঞান অবস্থায় অতীত হইবার পর, রাত্রে চক্ষু চাহিয়া কহিল, বড়দিদি!

কলেজের একজন ছাত্র, যে সে-রাত্রে ডিউটিতে ছিল, শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র কহিল, বড়দিদি এসেছেন?

কাল সকালে আসবেন।

পরদিন সুরেন্দ্রের বেশ জ্ঞান হইল, কিন্তু বড়দিদির কথা কহিল না, প্রবল জ্বরে সমস্তদিন ছটফট করিয়া সন্ধ্যার সময় একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি হাসপাতালে আছি?

হ্যাঁ।

কেন?

আপনি গাড়িচাপা পড়েছিলেন।

বাঁচার আশা আছে?

নিশ্চয়।

পরদিন সেই ছাত্রটি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আত্মীয় কেহ এখানে আছেন?

কেহ না।

তবে সে রাত্রে বড়দিদি বলে ডাকছিলেন কাকে? তিনি কি এখানে আছেন?

আছেন, কিন্তু তিনি আসতে পারবেন না। আমার পিতাকে সংবাদ দিতে পারেন?

পারি।

সুরেন্দ্রনাথ পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেই ছাত্রটি সেদিন পত্র লিখিয়া দিল। তাহার পর বড়দিদির সন্ধান লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে আসতে পারেন, আমরা সে বন্দোবস্ত করতে পারি। আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঠিকানা জানতে পারলে তাঁকেও সংবাদ দিতে পারি।

সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ব্রজরাজবাবুর ঠিকানা কহিয়া দিল।

আমার বাসা ব্রজরাজবাবুর বাড়ির নিকটেই, আজ তাঁকে আপনার অবস্থা জানাব। যদি ইচ্ছা করেন, তিনি দেখতে আসতে পারেন।

সুরেন্দ্র কথা কহিল না। মনে মনে বুঝিল—বড়দিদির আসা অসম্ভব। ছাত্রটি কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্রজবাবুকে সংবাদ দিল। ব্রজবাবু চমকিত হইলেন—বাঁচবে ত?

সম্পূর্ণ আশা আছে।

বাড়ির ভিতর গিয়া কন্যাকে কহিলেন, মাধবী, যা ভাবছিলাম তাই হয়েছে। সুরেন গাড়িচাপা পড়ে হাসপাতালে আছে।

মাধবীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

তোমার নাম ক'রে নাকি বড়দিদি বলে ডাকছিল। তুমি দেখতে যাবে? এই সময় পার্শ্বের কক্ষে প্রমীলা ঝনঝন করিয়া কি-সব ফেলিয়া দিল। মাধবী সেইদিকে ছুটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি দেখে এসো, আমি যেতে পারব না।

ব্রজবাবু দুঃখিতভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে বনের পশু, তার উপরে কি রাগ করে?

মাধবী কথা কহিল না। তবে ব্রজবাবু একাকী সুরেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল. কহিলেন, সুরেন, তোমার পিতামাতাকে সংবাদ দিলে হয় না?

সংবাদ দিয়েছি।

কোন ভয় নেই, তাঁরা আসলেই একটা বন্দোবস্ত করে দেব।

ব্রজবাবু টাকাকড়ির জন্য চিন্তা করিয়া কহিলেন, বরং আমাকে তাঁদের ঠিকানা বলে দাও, যাতে তাঁদের এখানে আসার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তা করে দেব।

সুরেন্দ্র কথাটা তেমন বুঝিল না। বলিল, বাবা আসবেন, অসুবিধা আর কি আছে?

ব্রজবাবু বাড়ি ফিরিয়া মাধবীকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন।

সেই অবধি নিত্য তিনি একবার করিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইতেন। তাহার উপর একটা স্নেহ জন্মিয়াছিল। একদিন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মাধবী, তুমি ঠিক বুঝেছিলে, সুরেনের পিতা বেশ অর্থবান লোক।

মাধবী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করে জানলে?

তার পিতা একজন বড় উকিল; কাল রাত্রে তিনি এসেছেন।

মাধবী মৌন হইয়া রহিল। তাহার পিতা কহিলেন, সুরেন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল।

কেন?

ব্রজরাজবাবু কহিলেন, তাহার পিতার সহিত আজ আলাপ হইল। তিনি সে কথা সমস্ত বলিলেন: এই বৎসর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সম্মানের সহিত সুরেন এম. এ. পাস করিলে বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া তাঁহার পিতা সাহস করিয়া পাঠাইতে চাহেন নাই; তাই রাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। সে ভাল হইলে তিনি বাটী লইয়া যাইবেন।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণ করিয়া লইয়া মাধবী বলিল, তাই ভাল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছয় মাস হইল সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মাধবী একটিবার মাত্র মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছিল, আর লেখে নাই।

পূজার সময় মনোরমা পিতৃভবনে আসিয়া মাধবীকে ধরিয়া বসিল, তোর বাঁদর দেখা।

মাধবী হাসিয়া কহিল, বাঁদর কোথায় পাব লো?

মনোরমা তাহার চিবুকে হাত দিয়া সুর করিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিল—

আমি এলাম ছুটে দেখব বলে,
কেমন শোভে পোড়ার বাঁদর—
তোমার ঐ রাঙ্গা চরণতলে।

সেই যে পুষেছিলি?

কবে?

মনোরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে নেই! যে তোকে বৈ আর জানত না?

মাধবী কথাটা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিল, তাই অল্পে অল্পে মুখখানি বিবর্ণ হইতেছিল; তথাপি আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ও—তাঁর কথা? তিনি আপনি চলে গেছেন।

অমন রাঙ্গা পা-দুটি তার পছন্দ হ'ল না?

মাধবী মুখ ফিরাইল—কথা কহিল না। মনোরমা হাত দিয়া আদর করিয়া তাহার মুখ ফিরাইল—কৌতুক করিতে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষে একরাশি জল আসিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া কহিল, একি মাধবী!

মাধবী আর সামলাইতে পারিল না—চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মনোরমার বিস্ময়ের সীমা নাই—একটা উপযুক্ত কথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ কাঁদিতে দিল। তাহার পর জোর করিয়া মুখ হইতে অঞ্চল খুলিয়া লইয়া নিতান্ত দুঃখিত-ভাবে বলিল, একটা সামান্য কৌতুক সইতে পারলে না বোন!

মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যে বিধবা দিদি!

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দুইজনেই নীরবে কাঁদিতে লাগিল। মনোরমা কাঁদিতেছিল মাধবীর দুঃখে—সে বিধবা, তাই বলিয়া। কিন্তু মাধবীর অন্য কারণ ছিল। এখনি না জানিয়া মনোরমা যে ঠাট্টা করিয়াছে, যে তোকে বৈ আর জানত না—মাধবী তাহাই ভাবিতেছিল। এ কথা যে নিতান্ত সত্য, সে তাহা জানিত। অনেকক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, কাজটা কিন্তু ভাল হয়নি।

কোন্ কাজটা?

তা কি ব'লে দিতে হবে বোন?—আমি সব বুঝেছি।

এই ছয় মাস ধরিয়া যে কথা মাধবী প্রাণপণে লুকাইয়া আসিতেছিল, মনোরমার কাছে আর তাহা লুকাইতে পারিল না। ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বড় ছেলে-মানুষের মত কাঁদিল।

শেষকালে মনোরমা বলিল, কিন্তু গেল কেন?

আমি যেতে ব'লেছিলাম।

বেশ ক'রেছিলে—বুদ্ধিমতীর মত কাজ ক'রেছিলে।

মাধবী বুঝিল, মনোরমা কিছুই বোঝে নাই—তাই একে একে সব কথা বুঝাইয়া কহিল। তাহার পর বলিল, কিন্তু তিনি যদি না বাঁচতেন, তাহলে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম। মনোরমা মনে মনে কহিল,—এখনি বা তার কম কি?

সেদিন বড় দুঃখিত হইয়া সে বাড়ি চলিয়া গেল। সেই রাত্রেই কাগজ-কলম লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল—

তুমি ঠিক বলিতে—স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই। আমিও আজ তাহাই বলিতেছি, কেননা, মাধবী আমাকে শিখাইয়াছে। আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতে জানি, তাই তাহাকে দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সাহস হয় না; সমস্ত স্ত্রীজাতিকে দোষ দিই—বিধাতাকে দোষ দিই—

তিনি কি জন্য এত কোমল, এই জলের মত তরল পদার্থ দিয়া নারীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন? এত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এ হৃদয় কে গড়িতে সাধিয়াছিল? তাঁহার চরণে প্রার্থনা, যেন এ হৃদয়গুলা একটু শক্ত করিয়া নির্মাণ করা হয়। আর তোমার চরণে প্রার্থনা, যেন ঐ পায়ে মাথা রাখিয়া ঐ মুখপানে চাহিয়া মরিতে পারি। মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,—সে আমার আজন্মের ধারণা ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। আমাকেও বেশি বিশ্বাস করিও না—শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাইও।

তাহার স্বামী উত্তর লিখিলেন—

যাহার রূপ আছে, সে দেখাইবেই। যাহার গুণ আছে, সে প্রকাশ করিবেই। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যে ভালবাসিতে জানে,—সে ভালবাসিবেই। মাধবীলতা রসাল বৃক্ষ অবলম্বন করে, ইহা জগতের রীতি—তুমি আমি কি করিতে পারি? তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি—সেজন্য চিন্তিত হইও না।

মনোরমা স্বামীর পত্র মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ-উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লিখিল—মাধবী পোড়ামুখী—বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে!

পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিলেন। তাহার পর কৌতুক করিয়া লিখিলেন, —মাধবী পোড়ামুখী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা, বিধবা হইয়া মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে। তোমাদের রাগ হইবার কথা—বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার কোন চিন্তা নাই, এমন সুবিধা কিছুতেই ছাড়িও না। এই অবসরটুকুর মধ্যে পরম আরামে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসিয়া লইও। কিন্তু, কি জান মনোরমা, তুমি আমাকে আশ্চর্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ-ক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী! তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দুইজনে সেটিকে দেখিয়া আসিব।

মনোরমা রাগ করিয়া তাহার উত্তর দিল না।

কিন্তু মাধবীর চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়াছে। কাজকর্মে তেমন বাঁধুনি নাই—একটু ঢিলা রকমের হইয়াছে। সকলকে যত্ন আত্মীয়তা করিবার ইচ্ছা তেমনই আছে, বরং বাড়িয়াছে—কিন্তু সব কাজগুলা আর তেমন মনে থাকে না—মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়।

এখনো সবাই কহে, 'বড়দিদি', এখনো সবাই সেই কল্পতরুটির পানে চাহিয়া থাকে, হাত পাতে, অভীষ্ট ফল পায়; কিন্তু গাছ আর তেমন সরস সতেজ নাই। পুরাতন লোকগুলির মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়—পাছে শুকাইয়া যায়।

মনোরমা নিত্য আসে, অন্যান্য কথা হয়—শুধু এ কথা আর হয় না। মাধবী দুঃখিত হয়, মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে। আর এ-সকল কথার আলোচনা যত না হয়, ততই ভাল। হতভাগী যদি ভুলিতে পারে, মনোরমা এ কথাও ভাবে।

সুরেন্দ্রনাথ আরাম হইয়া পিতার সহিত বাটী চলিয়া গিয়াছে। বিমাতা তাঁহার যত্নটা একটু কম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাই সুরেন্দ্র শরীরে একটু আরাম পাইয়াছে, কিন্তু শরীর বেশ সারিতে পারে নাই—অন্তরে একটু ব্যথা আছে। রূপ-যৌবনের আকাঙ্ক্ষা-পিপাসা এখনো তাহার মনে উদয় হয় নাই,—এ-সব সে জানিত না। পূর্বের মত এখনো সে অন্যমনস্ক, আত্মনির্ভরশূন্য। কিন্তু কাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এইটাই সে খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই সেই যে নিজের কাজ নিজে দেখিতে পারে, তাহাও নহে, আজও পরের পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু পূর্বের মত তেমন আর মনে ধরে না, সব কাজেই যেন একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, একটু খুঁতখুঁত করে। তাহার বিমাতা দেখিয়া শুনিয়া কহেন, সুরো আজকাল বদলে গেছে।

মধ্যে একদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল। বড় কষ্ট হইয়াছিল; চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বিমাতা কাছে বসিয়াছিলেন—তিনিও একটা নূতন জিনিস দেখিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন,

সুরো, কেন বাবা? সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তারপর একখানা পোস্টকার্ড চাহিয়া লইয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়া দিল—বড়দিদি, আমার জ্বর হইয়াছে, বড় কষ্ট হইতেছে।

পত্রখানা ডাকঘরে পৌঁছিল না। প্রথমে শয্যা হইতে মেঝের উপর পড়িল, তাহার পর যে ঘর ঝাঁটাইতে আসিল সে বেদানার খোসা, বিস্কুটের টুকরা, আঙুরের তুলা এবং সেই চিঠিখানি, সব একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল,—সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ধুলো মাখিয়া, হাওয়ায় উড়িয়া, শিশিরে ভিজিয়া, রোদ খাইয়া অবশেষে একটা বাবলা গাছের তলায় পড়িয়া রহিল।

প্রথমে সে একখানি মূর্তিমতী উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিল, তাহার পর একখানি হস্তাক্ষর—কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেল, কিছুই আসিল না। ক্রমে তাহার জ্বর সারিয়া গেল—পথ্য করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর, তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল! ঘটনা যদিও নূতন, কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রের পিতা রায়মহাশয় ইহা বহুদিন হইতে জানিতেন এবং আশা করিতেন। সুরেন্দ্রের মাতামহ পাবনা জেলার একজন মধ্যবিত্ত জমিদার। কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামে জমিদারি; বাৎসরিক আয় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। একে তিনি অপুত্রক খরচপত্র স্বভাবতঃ কম, তাহাতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিলেন। তাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে সমস্ত বৈভব একমাত্র দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ পাইবে রায়মহাশয় ইহা স্থির জানিতেন। তাহাই হইল। রায়মহাশয় সংবাদ পাইলেন, শ্বশুরমহাশয় আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি পুত্রকে লইয়া পাবনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু পৌঁছাইবার পূর্বেই শ্বশুরমহাশয় পরলোকগমন করিলেন।

সমারোহ করিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তি হইল। শৃঙ্খলিত জমিদারিতে আরো শৃঙ্খলার ঘটা পড়িয়া গেল। পরিপক্ক-বুদ্ধি প্রাচীন উকীল রায়মহাশয়ের কড়া বন্দোবস্তে প্রজারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

এখন সুরেন্দ্রের বিবাহ হওয়া আবশ্যক। ঘটকের আনাগোনায় গ্রামময় আন্দোলন পড়িয়া গেল। পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যে বাড়িতে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল, সেই বাড়িতেই ঘটকের দল ঘন ঘন পদধূলি দিয়া পিতামাতাকে আপ্যায়িত ও আশান্বিত করিতে লাগিল—এমন-ভাবে দুই মাস, ছয় মাস অতিবাহিত হইল।

অবশেষে বিমাতা আসিলেন, তাঁহার সম্পর্কের যে-কেহ ছিল, সেও আসিল—বন্ধু-বান্ধবে গৃহ পুরিয়া গেল।

তাহার পর, একদিন প্রভাতে, বাঁশি বাজাইয়া, ঢাকের প্রচণ্ড শব্দ করিয়া, কাঁসির খন্‌খন্‌ আওয়াজে সমস্ত গ্রাম পরিপূরিত করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া আসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রায়মহাশয়ও আর নাই, ব্রজরাজ লাহিড়ীও স্বর্গে গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের বিমাতা স্বর্গীয় স্বামী-দত্ত সমস্ত সম্পত্তি টাকাকড়ি লইয়া পিতৃভবনে বাস করিতেছেন।

আজকাল সুরেন্দ্রনাথের যেমন সুখ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি। একদল লোক কহে, এমন বন্ধুবৎসল, উদারচেতা, অমায়িক ইয়ার-প্রতিপালক জমিদার আর নাই। অন্যদল কহে, এমন উৎপীড়ক, অত্যাচারী জমিদার এ তল্লাটে কখনও জন্মায় নাই।

আমরা জানি এ দুইটা কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের জন্য সত্য, দ্বিতীয়টা তাঁহার ম্যানেজার মথুরনাথবাবুর জন্য সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় আজকাল খুব একদল ইয়ার বসিতেছে। তাহারা পরম সুখে সংসারের সাধ মিটাইয়া লইতেছে। পান-তামাক, মদ-মাংস—কোন ভাবনা তাহাদিগকে করিতে হয় না। চাহিতেও হয় না—আপনি মুখে আসে।

ম্যানেজার মথুরবাবুর ইহাতে খুব উৎসাহ। খরচ যোগাইতে তিনি মুক্তহস্ত। কিন্তু, এজন্য জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না; তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সে ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার জো নাই। ঘর জ্বালাইতে, ভিটা-ছাড়া করিতে, কাছারিঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে আবদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস এবং উৎসাহের সীমা নাই।

প্রজার আকুল ক্রন্দন মাঝে মাঝে শান্তি দেবীর কর্ণে প্রবেশ করে। সে স্বামীকে অনুযোগ করিয়া কহে, তুমি নিজে জমিদারি না দেখলে সব যে জ্বলে পুড়ে যায়!

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গে—তাইত, তাইত, এ-সব কথা কি সত্য?

সত্য নয়? নিন্দায় যে দেশ ভরে গেল—তোমারই কানে কেবল এ-সব পেঁছায় না। চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার নিয়ে বসে থাকলে কি এ-সব কেউ শুনতে পায়? কাজ নেই অমন ম্যানেজারে, দূর করে তাড়িয়ে দাও।

সুরেন্দ্র দুঃখিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া কহে, তাইত, কাল থেকে আমি নিজে সব দেখব। তাহার পর কিছুদিন জমিদারি দেখিবার তাড়া পড়িয়া যায়। মথুরনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠেন, গম্ভীরভাবে তখন কহেন, সুরেনবাবু, এমন করলে কি জমিদারি রাখতে পারবে?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহে, দুঃখীর রক্ত শুষে এমন জমিদারিতে কাজ কি মথুরবাবু?

তবে আমাকে বিদায় দাও, আমি চলে যাই।

সুরেন্দ্রনাথ অমনি নরম হইয়া যায়। তাহার পর যাহা ছিল, তাহাই হয়। সুরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা হইতে আর বাহির হয় না।

সম্প্রতি আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। বাগানবাটী প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে নাকি এলোকেশী বলিয়া কে একটা মানুষ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। নাচিতে গাহিতে খুব মজবুত, দেখিতে-শুনিতেও মন্দ নয়। ভগ্ন-মধুচক্র মৌমাছির মত বৈঠকখানা ছাড়িয়া ঝাঁক বাঁধিয়া ইয়ারের দল সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ রাখিবার স্থান নাই; সুরেন্দ্রনাথকেও তাহারা সেইদিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

আজ তিনদিন হইল—শান্তির স্বামিদর্শন ঘটে নাই। চারদিনের দিন সে স্বামীকে পাইয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, এতদিন ছিলে কোথায়?

বাগানবাড়িতে।

সেখানে কে আছে যে তিনদিন ধরে পড়েছিলে?

তাইত—

সব কথায় তাইত! আমি সমস্ত শুনেছি—বলিতে বলিতে শান্তি কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কি দোষ করেছি যে, আমাকে পায়ে ঠেলছ?

কৈ তা ত' আমি—

আবার কি করে পায়ে ঠেলতে হয়? এর চেয়ে অপমান আমাদের আর কি আছে?

তাইত—তা ওরা সব—

শান্তি যেন সে কথা শুনিতে পাইল না। আরও কাঁদিয়া কহিল, তুমি স্বামী, আমার দেবতা! আমার ইহকাল! আমার পরকাল! আমি কি তোমাকে চিনিনে! আমি ত জানি, আমি তোমার কেউ নই, একদিনের জন্যও তোমার মন পাই না। এ যাতনা তোমাকে বলব কি! পাছে তুমি লজ্জা পাও, পাছে তোমার ক্লেশ হয়, তাই কোন কথা বলি না।

শান্তি, কেন কাঁদ?

কেন কাঁদি! অন্তর্যামী জানেন। তাও বুঝতে পারি যে তুমি অযত্ন কর না—তোমারও মনে ক্লেশ আছে—তুমি আর কি করবে? তাহার পর চক্ষু মুছিয়া বলিল, আমি আজীবন যাতনা পাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি জানতে পারি—

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া স্বহস্তে তাহার চক্ষু মুছিয়া সস্নেহে কহিল, তা হ'লে কি কর, শান্তি?

এ কথার কি আর উত্তর আছে? শান্তি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে শান্তি কহিল, তোমার শরীরও আজকাল ভাল নেই।

আজ কেন, পাঁচ বছর থেকে নেই। যেদিন কলকাতায় গাড়িচাপা পড়েছিলাম, বুকে-পিঠে আঘাত পেয়ে একমাস শয্যায় পড়ে ছিলাম, সে অবধি শরীর ভাল নেই। সে ব্যথা কিছুতেই গেল না, মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হই, কেমন করে বেঁচে আছি।

শান্তি তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকে হাত দিয়া বলিল, চল, দেশ ছেড়ে আমরা কলকাতায় যাই, সেখানে ভাল ডাক্তার আছে—

সুরেন্দ্র সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—তাই চল। সেখানে বড়দিদিও আছেন।

শান্তি বলিল, তোমার বড়দিদিকে আমারও বড় দেখতে ইচ্ছে করে, তাঁকে আনবে ত?

আনব বৈ কি! তাহার পর ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, নিশ্চয় আসবেন, আমি ম'রে যাচ্ছি শুনলে—

শান্তি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—তোমার পায়ে পড়ি, আর ও-সব ব'লো না।

আহা, তিনি যদি আসেন ত আমার কোনো দুঃখই থাকে না।

অভিমানে শান্তির বুক পুড়িয়া গেল। এইমাত্র সে বলিয়াছিল, স্বামীর সে কেহ নহে। সুরেন্দ্র কিন্তু অত বুঝিল না, অত দেখিল না, যাহা বলিতেছিল, তাহাতে বড় আনন্দ হয়,—কহিল, তুমি নিজে গিয়ে বড়দিদিকে ডেকে এনো, কেমন? শান্তি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল।

তিনি এলে দেখতে পাবে, আমার কোন কষ্ট থাকবে না।

শান্তির চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরদিন সে দাসীকে দিয়া মথুরবাবুকে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, বাগানবাটীতে যাহাকে আনা হইয়াছে, এখনি তাহাকে তাড়াইয়া না দিলে, তাহাকে আর ম্যানেজারের কাজ করিতে হইবে না। স্বামীকে শাসাইয়া বলিল, আর যাই হোক, তুমি বাড়ির বা'র হ'লে আমি মাথা-খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।

তাইত, ওঁরা কিন্তু—

আমি 'কিন্তু'র ব্যবস্থা করছি। বলিয়া শান্তি দাসীকে পুনর্বার ডাকিয়া হুকুম দিয়া দিল—দরোয়ানকে ব'লে দে, যেন ঐ হতভাগারা আমার বাড়িতে না ঢুকতে পায়!

আর সুবিধা নাই দেখিয়া মথুরবাবু এলোকেশীকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইয়ারদলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি চুটাইয়া জমিদারি দেখিতে মন দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের সম্প্রতি কলিকাতায় যাওয়া হইল না, বুকের ব্যথাটা আপাততঃ কিছু কম বোধ হইতেছে। শান্তিরও কলিকাতা যাইতে তেমন উৎসাহ নাই। এখানে থাকিয়া যতখানি সম্ভব, সে স্বামীসেবার আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে একজন বিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া দেখাইল। বিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বক্ষের অবস্থা যেমন আছে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই সঙ্গত নহে।

অবসর বুঝিয়া ম্যানেজারবাবু যেরূপ কাজ দেখিতেছিলেন, তাহাতে গ্রামে গ্রামে দ্বিগুণ হাহাকার উঠিল। শান্তি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইত, কিন্তু স্বামীকে জানাইতে সাহস করিত না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বাটীতে ব্রজবাবুর স্থানে শিবচন্দ্র এখন কর্তা। মাধবীর পরিবর্তে নূতন বধূ এখন গৃহিণী। মাধবী এখনও এখানে আছে। তাই শিবচন্দ্র স্নেহ-যত্ন করে, কিন্তু মাধবীর এখানে থাকিতে আর মন নাই! বাড়ির দাস-দাসী, সরকার-গোমস্তা এখনো 'বড়দিদি' বলে, কিন্তু সবাই বুঝে যে, আর একজনের হাতে এখন সিন্দুকের চাবি পড়িয়াছে। তাই বলিয়া শিবচন্দ্রের স্ত্রী যে মাধবীকে অবজ্ঞা বা অমর্যাদা করে তাহা নহে, কিন্তু সে এমন ভাবটি দেখাইয়া যায়, যাহাতে মাধবী বেশ বুঝিতে পারে যে, এই নূতন স্ত্রীলোকটির অনুমতি পরামর্শ ব্যতীত সব কাজ করা এখন আর তাহার মানায় না।

তখন বাপের আমল ছিল, এখন ভাইয়ের আমল হইয়াছে। কাজেই একটু প্রভেদ

ঘটিয়াছে। আগে আদর ছিল, আবদার ছিল—এখন আদর আছে, কিন্তু আবদার নাই। বাপের আদরে সে সর্বময়ী ছিল, এখন 'আত্মীয়-কুটুম্বের' দলে পড়িয়াছে।

এখন যদি কেহ বলেন যে, আমি শিবচন্দ্র কিংবা তাহার স্ত্রীর দোষ দিতেছি, সোজা করিয়া না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিন্দা করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। সংসারে যাহা নিয়ম, যে রীতি-নীতি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। মাধবীর যেন কপাল পুড়িয়াছে, তাহার আপনার বলিবার স্থান নাই, তাই বলিয়া অপরে নিজের দখল ছাড়িবে কেন? স্বামীর দ্রব্যে স্ত্রীর অধিকার, এ কথা কে না জানে? শিবচন্দ্রের স্ত্রী কি শুধু এ কথা বুঝে না? শিবচন্দ্র নাহয় মাধবীর ভ্রাতা, কিন্তু সে মাধবীর কে? পরের জন্য সে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে কেন? মাধবী সব বুঝিতে পারে। বৌ যখন ছোট ছিল, তখন ব্রজবাবু বাঁচিয়া ছিলেন, তখন মাধবীর নিকট প্রমীলাতে ও তাহাতে প্রভেদ ছিল না। এখন কথার অনৈক্য হয়। সে চিরদিন অভিমানিনী, তাই সে সকলের নীচে। কথা সহিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে কথা সহে না। যেখানে তার জোর নাই সেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়। মনে দুঃখ পাইলে নীরবে সহিয়া যায়,- শিবচন্দ্রকে কিছুই বলে না। স্নেহের দোহাই দেওয়া তাহার অভ্যাসের বাহিরে, তাই আত্মীয়তার ধুয়া ধরিয়া অধিকার কায়েম করিতে, তাহার সমস্ত শরীরে মনে ধিক্কার উঠে। সামান্য স্ত্রীলোকের মত ঝগড়া-কলহে তাহার যে কত ঘৃণা তাহা শুধু সে-ই জানে।

একদিন শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, দাদা, আমি শ্বশুরবাড়ি যাব। শিবচন্দ্র বিস্মিত হইল।—সে কি মাধবী, সেখানে ত কেউ নেই!

মাধবী মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ছোট ভাগ্নে কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে আছে, তাকে নিয়ে আমি গোলাগাঁয়ে বেশ থাকব।

পাবনা জেলার গোলাগাঁয়ে মাধবীর শ্বশুরবাড়ি। শিবচন্দ্র অল্প হাসিয়া বলিল, তা কি হয়, সেখানে যে তোর বড় কষ্ট হবে।

কেন কষ্ট হবে দাদা? বাড়িটা এখনো প'ড়ে যায়নি। দু'বিঘা দশ বিঘা জমি-জিরাতও আছে, একটি বিধবার কি তাতে চলে না?

চলার কথা নয়। টাকার ভাবনা নেই, কিন্তু তোর যে বড় কষ্ট হবে মাধবী!

কষ্ট কিছুই নয়।

শিবচন্দ্র কিছু ভাবিয়া বলিল, কেন যাবি বোন? আমাকে সব খুলে বল দেখি, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।—ইতিপূর্বে শিবচন্দ্র বোধ হয় স্ত্রীর নিকট ভগিনীর বিরুদ্ধে কিছু শুনিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তাহাই মনে হইয়াছিল। লজ্জায় মাধবীর সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বলিল, দাদা, তুমি কি মনে কর, আমি ঝগড়া ক'রে তোমার বাড়ি থেকে যাব?

শিবচন্দ্র বড় লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, না না, তা নয়। আমি ও-কথা বলিনে, কিন্তু এ বাড়ি চিরদিনই তোমার, আজ কেন তবে চলে যেতে চাও?

যুগপৎ দুই জনেরই সেই স্নেহময় পিতার কথা মনে পড়িল। দুই জনের চক্ষেই জল দেখা দিল। চোখ মুছিয়া মাধবী বলিল, আবার আসব। তোমার ছেলের যখন পৈতা হবে, তখন নিয়ে এস। এখন যাই!

সে ত আট-দশ বছরের কথা।

যদি বেঁচে থাকি, তা হ'লে আসব।

কোনরূপেই মাধবী এখানে থাকিতে সম্মত হইল না, যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নূতনবৌকে সংসার বুঝাইয়া দিল, দাস-দাসীকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিল। শেষ দিনটিতে শিবচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ-চক্ষে ভগিনীর কাছে আসিয়া বলিল, মাধবী, তোর দাদা কখনো ত তোকে কিছু বলেনি?

মাধবী হাসিল, বলিল—সে কি কথা দাদা?

তা নয়; যদি কোন অশুভক্ষণে, যদি কোনদিন মুখ থেকে অসাবধানে কিছু—

না দাদা, সে-সব কিছু নয়।

সত্যি কথা?

সত্যি!

তবে যা। তোর নিজের বাড়ি যেতে আর মানা করব না। যেখানে ভাল লাগে—। তবে সর্বদা সংবাদ দিতে ভুলিস নি।

প্রথমে মাধবী কাশী গিয়া ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইল, তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া গোলাগাঁয়ে আসিয়া এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে স্বামী-ভবনে প্রবেশ করিল।

তখন গোলাগাঁয়ে চাটুয্যে মহাশয়ের বড় বিপদ ঘটিল। তিনি এবং যোগেন্দ্রের পিতা উভয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। তাই মৃত্যুকালে যোগেন্দ্র যে কয় বিঘা জমি-জায়দাদ ছিল, তাঁহারই হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবিতকালে, তিনি যে-সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, যোগেন্দ্র সে-সকলের বিশেষ কোন সংবাদও লইত না। শ্বশুরমহাশয়ের অনেক টাকা, তাই এই ক্ষুদ্র পিতৃ-দত্ত বিষয়টুকু তাহার যত্নের বাহিরে ছিল। তাহার পর সে মরিবার পর চাটুয্যে মহাশয় ন্যায্য অধিকারে বিনা বাধায় সে-সকল ভোগদখল করিতেছিলেন। এখন বিধবা মাধবী এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সুশৃঙ্খল নিয়মবদ্ধ পাতা সংসারে গোলমাল বাধাইয়া দিল। সুতরাং, চাটুয্যে মহাশয়ের ইহা অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল, এবং মাধবী যে হিংসা করিয়াই এমনটি করিয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, তাইত বৌমা, তোমার দু' বিঘা যে জমি আছে, তার দশ বৎসরের খাজনা মায় সুদসুদ্ধ একশত টাকা বাকি আছে, সেটা না দিলে জমি নিলাম হবার মত হয়েচে। মাধবী ভাগিনেয় সন্তোষকুমারকে দিয়া বলাইল যে, টাকার জন্য চিন্তা নাই এবং অবিলম্বে একশত টাকা বাহিরে পাঠাইয়া দিল। অবশ্য এ টাকা চাটুয্যে মহাশয়ের অন্য কাজে লাগিল।

মাধবী কিন্তু অত সহজে ছাড়িবার লোক নহে, সে সন্তোষকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, শুধু দুই বিঘা জমির উপর নির্ভর করিয়া তাহার স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না, সুতরাং বাকী যে-সব জমি-জায়গা আছে, তাহা কোথায় এবং কাহার নিকট আছে?

চাটুয্যে মহাশয় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিলেন যে, তাহা সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিছু বা বন্দোবস্তে আছে। এই আট-দশ বছর ধরিয়া জমিদারের খাজনা না দিলে জমি-জায়গা কিরূপে থাকা সম্ভব?

মাধবী কহিল, জমির কিছু কি উপস্বত্ব হইত না যে, এই কয়টা টাকা খাজনা দেওয়া হয় নাই? আর যদি যথার্থই বিক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কে বিক্রয় করিয়াছে, এবং এখন কাহার নিকট আছে, সংবাদ পাইলে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যায়। কাগজপত্রই বা কোথায়? চাটুয্যে মহাশয় অবশ্য কিছু জবাব দিয়াছিলেন কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ বিড়বিড় করিয়া কত কি বকিলেন, তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া, নামাবলি কোমরে জড়াইয়া, একখানা থান কাপড় গামছায় বাঁধিয়া লইয়া জমিদারবাবুর কাছারি লালতো-গাঁ অভিমুখে রওনা হইলেন। এই লালতো-গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বাটী, এবং ম্যানেজার মথুরবাবুর কাছারি। ব্রাহ্মণ আট-দশ ক্রোশ বরাবর হাঁটিয়া একেবারে মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—দোহাই বাবা, গরীব ব্রাহ্মণকে বুঝি পথে পথে ভিক্ষে করে খেতে হয়।

এমন ত অনেকে আসে। মথুরবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, হয়েছে কি?

বাবা, রক্ষে কর।

কি হয়েছে তোমার?

বিধু চাটুয্যে তখন মাধবী-দত্ত একশত টাকা দক্ষিণা হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি ধর্মাবতার, আপনি না রক্ষা করলে আমার সর্বস্ব যায়!

আচ্ছা, খুলে বল।

গোলাগাঁয়ের রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূ কোথা থেকে এতদিন পরে ফিরে এসে, আমার সমস্ত দখল করতে চায়।

মথুরবাবু হাসিলেন—সে তোমার সমস্ত দখল করতে চায়, না তুমি তার সর্বস্ব দখল করতে চাও,—কোন্‌টা?

ব্রাহ্মণ তখন হাতে পৈতা জড়াইয়া ম্যানেজারের হাত চাপিয়া ধরিলেন—আমি যে এই দশ বছর থেকে সরকারের খাজনা যুগিয়ে আসচি?

জমি ভোগ করচ, খাজনা দেবে না?

দোহাই আপনার—

ভাবটা মথুরবাবু বেশ বুঝিলেন—বিধবাকে ফাঁকি দিতে চাও ত? ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

কয় বিঘা জমি?

পঁচিশ বিঘা।

মথুরবাবু হিসাব করিয়া বলিলেন, অন্ততঃ তিন হাজার টাকা। জমিদার কাছারিতে কি সেলামি দেবে?

যা হুকুম হবে তাই,—তিন শ' টাকা।

তিন শ' টাকা দিয়ে তিন হাজার টাকা নেবে? আমার দ্বারা কিছু হবে না।

ব্রাহ্মণ শুষ্কচক্ষে জল বাহির করিয়া বলিল, কত টাকা হুকুম হয়?

এক হাজার দিতে পারবে?

তাহার পর গোপনে বহুক্ষণ ধরিয়া দু'জনে পরামর্শ হইল, ফল এই দাঁড়াইল যে, যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকী খাজনা বাবদ দশ বৎসরের সুদে-আসলে দেড়সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল। কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রী হইয়া গেল, এবং দেড়-মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে বাকী খাজনার দায়ে জমিদার সরকার হইতে তাহার মায় বাটীসুদ্ধ নিলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।

মাধবী একজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিল, তোমাদের দেশ কি মগের মুল্লুক?

কেন বল দেখি?

তা নয় ত কি? একজন ঠকিয়ে আমার সর্বস্ব নিতে চায় তোমরা দেখচ না?

সে বলিল, আমরা আর কি করব? জমিদার যদি নিলাম করে, আমরা দুঃখী লোক তাতে কি করতে পারি?

তা যেন হ'ল, কিন্তু আমার বাড়ি নিলাম হবে, আর আমাকে সংবাদ নেই? কেমন তোমাদের জমিদার?

সে তখন সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল, এমন উৎপীড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার, এ দেশে কেহ কখনও পূর্বে দেখে নাই। সে আরও কত কি কহিল। এ যাবৎ যাহা কিছু লোকপরম্পরায় অবগত ছিল, সমস্ত একে একে খুলিয়া বলিলে, মাধবী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর সঙ্গে নিজে দেখা করলে হয় না? ভাগিনেয় সন্তোষ-কুমারের জন্য মাধবী তাহাও করিতে স্বীকৃত ছিল।

সে তখন কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু কথা দিয়া গেল যে, কাল তাহার বোনপোর নিকট সব কথা ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়া বলিবে। তাহার বোনপো দুই-তিনবার লাল্‌তা-গ্রামে গিয়াছিল; জমিদার সরকারের অনেক কথা সে জানিত। এমন কি, সেদিন সে বাগান-বাড়িতে এলোকেশীর সংবাদ পর্যন্ত শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর মাসিমাতা যখন জমিদারবাবুর সহিত রামতনুবাবুর বিধবা পুত্রবধূর দেখা করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তখন সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল, এই বিধবা পুত্রবধূটির বয়স কত?

মাসিমাতা বলিল, কুড়ি-একুশ হবে।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, দেখতে কেমন?

মাসিমাতা কহিল, পরীর মত।

তখন সে মুখভঙ্গী-সহকারে কহিল, দেখা করলে কাজ হ'তে পারে; কিন্তু আমি বলি, তিনি আজ রাত্রেই নৌকা ভাড়া ক'রে বাপের বাড়ি প্রস্থান করুন।

কেন রে?

এই যে বলচ—সে দেখতে পরীর মত।

কেন, তাতে কি?

তাতেই সব। দেখতে পরীর মত হলে জমিদার সুরেন রায়ের কাছে রক্ষে নেই।

মাসিমাতা গালে হাত দিলেন,—বলিস কি, এমন!

বোনপো মৃদু হাসিয়া কহিল, হাঁ, এমন। দেশসুদ্ধ লোক এ কথা জানে।

তবে ত দেখা করা উচিত নয়?

কিছুতেই নয়।

কিন্তু বিষয়-আশয় যে সব যাবে!

চাটুয্যে মহাশয় যখন এর ভিতর আছেন, তখন বিষয়ের আশা নেই। তার উপর গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে—ধর্মটাও কি যাবে?

পরদিন তিনি মাধবীকে সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। জমিদার সুরেন রায়ের কথা সে সমস্ত দিন চিন্তা করিল। মাধবী ভাবিল, সুরেন রায়! নামটি বড় পরিচিত, কিন্তু লোকটির সহিত ত মিলিতেছে না। এ নাম সে কত দিন মনে মনে ভাবিয়াছে। সে আজ পাঁচ বৎসর হইল। ভুলিয়া ছিল,—আবার বহুদিন পরে মনে পড়িল।

স্বপ্নে ও নিদ্রায় মাধবীর সে রাত্রি বড় দুঃখে কাটিল। অনেকবার পুরানো কথাগুলো মনে পড়িতেছিল, অনেকবার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। সন্তোষকুমার তাহার মুখ-পানে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, মামীমা, আমি মা'র কাছে যাব।

মাধবী নিজেও কয়েকবার এ কথা ভাবিতেছিল, কেননা, এখানকার বাস যখন উঠিয়াছে, তখন কাশীবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। সন্তোষের জন্য সে জমিদারের সহিত দেখা করিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিষেধ করিতেছে। তা ছাড়া এখন যেখানেই সে যাক, একটা নূতন ভাবনা, একটা নূতন উপসর্গ হইয়াছে। সেটা এই রূপ-যৌবনের কথা! মাধবী মনে করিল, পোড়াকপাল! এ উৎপাতগুলা কি এখনও দেহটায় লাগিয়া আছে! আজ সাত বৎসর হইল, এগুলা তাহার মনে পড়ে নাই, মনে করাইয়া দিতে কেহ ছিল না। স্বামী মরিবার পর যখন বাপের বাড়ি ফিরিয়া গেল, তখন সকলে ডাকিল, 'বড়দিদি', সবাই ডাকিল 'মা'! এই সম্মানের ডাকগুলি তাহার মনকে আরও বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ছাই রূপ-যৌবন! যেখানে তাহাকে বড়দিদির কাজ করিতে হইত, জননীর স্নেহ-যত্ন বিলাইতে হইত, সেখানে কি এ-সব কথা মনে থাকে! মনে ছিল না, মনে পড়িয়াছে, তাই ভাবনাও হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই 'যৌবনে'র উল্লেখটা! লজ্জায় মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, এখানকার লোকগুলা কি অন্ধ, না পশু! কিন্তু মাধবী ভুল করিয়াছিল—সকলেরই মন তাহার মত একুশ-বাইশ বছরে বৃদ্ধ হইয়া যায় না।

ইহার তিনদিন বাদে যখন জমিদারের পিয়াদা তাহার দ্বারপথে আসন করিয়া বসিল এবং হাঁক-ডাক করিয়া গ্রামবাসীকে জানাইতে লাগিল যে, সুরেন রায় আর একটা নূতন কীর্তি করিয়াছে, তখন মাধবী সন্তোষের হাত ধরিয়া দাসীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল।

বাটীর অদূরেই নদী; মাঝিকে কহিয়া দিল, সোমরাপুরে যাইতে হইবে। একবার প্রমীলাকে দেখিয়া যাইতে হইবে।

গোলাগাঁ হইতে পনর ক্রোশ দূরে সোমরাপুরে প্রমীলার বিবাহ হইয়াছিল। আজি এক বৎসর হইতে সে শ্বশুরঘর করিতেছে। সে হয়ত আবার কলিকাতায় যাইবে, কিন্তু মাধবী তখন কোথায় থাকিবে? তাই একবার দেখা করা।

সকালবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়া চলিল; বাতাস অনুকূল ছিল না, তাই ধীরমন্থর গমনে ক্ষুদ্র নৌকা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া, শিয়াকুল ও বেতঝোপের কাঁটা বাঁচাইয়া, শরঝাড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। সন্তোষকুমারের আনন্দ ধরে না! সে ছইয়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা ও ডগা ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঝিরা কহিল, বাতাস না থামিলে, কাল দুপুর পর্যন্ত নৌকা সোমরাপুরে লাগিবে না।

আজ মাধবীর একাদশী, কিন্তু সন্তোষকুমারের জন্য কোথাও পানসি বাঁধিয়া, পাক

করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইবে। মাঝি কহিল, দিস্তেপাড়ার গঞ্জে নৌকা বাঁধিলে বেশ সুবিধা হইবে, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়।

দাসী কহিল, তাই কর বাপু, যেন দশটা-এগারটার মধ্যে ছেলেটা খেতে পায়।

নবম পরিচ্ছেদ

কার্তিক মাস যায় যায়। একটু শীত পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের উপরের ঘরে জানালার ভিতর দিয়া প্রাতঃসূর্যালোক প্রবেশ করায় বড় মধুর বোধ হইতেছে। জানালার কাছে অনেকগুলি বাঁধা-খাতা ও কাগজপত্র লইয়া টেবিলের এক পাশে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন: আদায়-উসুল, বাকি-বকেয়া, জমা-খরচ, বন্দোবস্ত, মামলা-মকদ্দমার নথীপত্র সব একে একে উলটাইয়া দেখিতেছিলেন। এ-সব দেখাশুনা একরকম আবশ্যকও হইয়া পড়িয়াছিল এবং না হইলে সময়ও কাটে না। শান্তির সহিত এজন্য অনেকখানি ঝগড়া করিতে হইয়াছিল। অনেক করিয়া তবে তাহাকে সে বুঝাইতে পারিয়াছিল যে, অক্ষরের পানে চাহিলেই মানুষের বুকের ব্যথা বাড়িয়া যায় না, কিংবা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। অগত্যা শান্তি স্বীকার করিয়াছে এবং আবশ্যকমত সাহায্যও করিতেছে।

আজকাল স্বামীর উপর তাহার পুরা অধিকার—তাহার একটি কথাও অমান্য হয় না। কোন দিনই হয় নাই, শুধু পাঁচজন হতভাগা ইয়ার-বন্ধু মিলিয়া দিন-কতক শান্তিকে বড় দুঃখ দিতেছিল। স্ত্রীর আদেশে সুরেন্দ্রের বাহির-বাটীতে পর্যন্ত যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শ ও উপদেশ শান্তি প্রাণপণে খাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছে।

এইমাত্র সে কাছে বসিয়া রাঙ্গা ফিতা দিয়া কাগজের বাণ্ডিল বাঁধিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ একখানা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সহসা ডাকিলেন, শান্তি!

শান্তি কোথায় গিয়াছিল—কিছুক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকছিলে?

হাঁ, আমি একবার কাছারিঘরে যাব।

না। কি চাই বল, আমি আনিয়ে দিচ্চি।

কিছু চাই না, একবার মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাই, তোমাকে যেতে হবে না। কিন্তু, এমন সময় তাঁকে কেন?

ব'লে দেব যে অগ্রহায়ণ মাস থেকে তাঁকে আর কাজ করতে হবে না।

শান্তি বিস্মিত হইল; কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর অপরাধ?

অপরাধ যে কি, তা এখন ঠিক বলতে পারচি না, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করচেন। তাহার পর আদালতের সার্টিফিকেট ও কয়েকখানা কাগজপত্র দেখাইয়া কহিলেন, এই দেখ, গোলা-গাঁয়ে একজন বিধবার ঘর-বাড়ি সমস্ত বেনামী নীলামে খরিদ ক'রে নিয়েচে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেনি।

শান্তি দুঃখিত হইয়া কহিল, আহা বিধবা! তবে এ কাজটা ভাল হয়নি—কিন্তু বিক্রি হ'ল কেন?

দশ বৎসরের খাজনা বাকি ছিল; সুদে-আসলে দেড়-হাজার টাকার নালিশ হয়েছিল।

টাকার কথা শুনিয়া শান্তি মথুরনাথের প্রতি একটু নরম হইয়া পড়িল। মৃদু হাসিয়া কহিল, তা ম্যানেজারবাবুর বা দোষ কি? অত টাকা কেমন ক'রে ছেড়ে দেন?

সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল। শান্তি প্রশ্ন করিল, অত টাকা ছেড়ে দেবে?

দেব না ত কি, অসহায় বিধবাকে বাড়ি-ছাড়া করব? তুমি কি পরামর্শ দাও?

কথাটার ভিতর যতটুকু জ্বালা ছিল, সবটুকু শান্তির গায়ে লাগিল। অপ্রতিভ হইয়া দুঃখিতভাবে সে বলিল, না, বাড়ি-ছাড়া করতে বলি না। আর তোমার টাকা তুমি দান করবে, আমি তাতে বাধা দেব কেন?

সুরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, সে নয় শান্তি, আমার টাকা কি তোমার নয়? কিন্তু বল দেখি, আমি যখন না থাকব, তখন তুমি—

ও কি কথা—

তুমি—আমি যা ভালবাসি, তা করবে ত?

শান্তির চোখে জল আসিল, কেননা, স্বামীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, বলিল, ও কথা কেন বল?

বড় ভাল লাগে, তাই বলি। তুমি, আমার কথা, আমার সাধ-ইচ্ছা জেনে রাখবে না শান্তি?

শান্তি চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাথা নাড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, আমার বড়দিদির নাম।

শান্তি অঞ্চল সরাইয়া সুরেন্দ্রের মুখপানে চাহিল।

সুরেন্দ্র একখানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখ, আমার বড়দিদির নাম।

কোথায়?

এই দেখ, মাধবী দেবী যাঁর বাড়ি নীলাম হয়েছে।

একমুহূর্তে শান্তি অনেক কথা বুঝিল। কহিল, তাই বুঝি সমস্ত ফিরিয়ে দিতে চাইছ?

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাই হ'লে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব - সমস্ত—সব!

মাধবীর কথায় শান্তি একটু দুঃখিত হইয়া পড়িল; ভিতরে বোধ হয় একটু হিংসার ভাব ছিল। কহিল, তিনি হয়ত তোমার বড়দিদি নন। শুধু মাধবী নাম আছে। নামেতেই এই!

বড়দিদির নামের একটু সম্মান করব না?

তা কর, কিন্তু তিনি নিজে কিছু জানতে পারবেন না।

তা পারবেন না—কিন্তু আমি কি অসম্মান করতে পারি?

নাম ত এমন কত লোকের আছে।

আছে! তুমি দুর্গা নাম লিখে তাতে পা দিতে পার?

ছি! ও-কি কথা? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে—

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, ঠাকুর-দেবতার নাম নাই নিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, যদি একটি কাজ করতে পার।

শান্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল, কি কাজ?

দেয়ালের গায়ে সুরেন্দ্রনাথের একটি ছবি ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই ছবিটি যদি--

কি?

চারিজন ব্রাহ্মণ দিয়ে নদীর তীরে পোড়াতে পার।

অদূরে বজ্রাঘাত হইলে লোকের যেমন প্রথমে সমস্ত রক্ত নিমেষে সরিয়া যায়, মুখখানা সর্পদষ্ট রোগীর মত নীলবর্ণ হইয়া থাকে, শান্তির প্রথমে সেইরূপ অবস্থা হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখে চোখে রক্ত ফিরিয়া আসিল—তাহার পর করুণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া রাজার অর্ধেক রাজত্ব মানত করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, এই বড়দিদি যিনিই হউক, ইঁহার সম্বন্ধে সে আর কোন কথা কহিবে না। তাহার পরে ঘরে দ্বার দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে অশ্রুমোচন করিল। এ জীবনে এমন কটু কথা সে আর কখনও শোনে নাই।

সুরেন্দ্রনাথও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন, —কাছারিঘরে মথুরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলাগাঁয়ে কার সম্পত্তি নিলাম হয়েছে?

মৃত রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূর।

কেন?

দশ বছরের মাল-গুজারি বাকি ছিল।

কৈ, খাতা দেখি?

মথুরনাথ প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; তাহার পর কহিল, খাতাপত্র এখনও পাবনা থেকে আনা হয়নি।

আনতে লোক পাঠাও। বিধবার থাকবার স্থানটুকু পর্যন্ত রাখোনি?

বোধ হয় নেই।

তবে সে কোথায় থাকবে?

মথুরনাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, এতদিন যেখানে ছিল, সেখানে থাকবে বোধ হয়।

এতদিন কোথায় ছিল?

কলিকাতায়। তাহার পিতার বাটীতে।

পিতার নাম কি জান?

জানি। ব্রজরাজ লাহিড়ী।

বিধবার নাম?

মাধবী দেবী।

নতমুখে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মথুরনাথ ভাবগতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

সুরেন্দ্রনাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, একটা ভাল ঘোড়া, শীঘ্র জিন কষিতে বল—আমি এখুনি গোলাগাঁয়ে যাব। এখান থেকে গোলাগাঁ কতদূর জান?

প্রায় দশ ক্রোশ।

এখন ন'টা বেজেছে—একটার মধ্যে পেঁছিতে পারব।

ঘোড়া আসিলে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া কহিলেন, কোন্ দিকে?

উত্তর দিকে, পরে পশ্চিমে যেতে হবে।

তাহার পর চাবুক খাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ কথা শুনিয়া শান্তি ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিল,—ঠাকুর, এই তোমার মনে ছিল! আর কি ফিরে পাব!

তাহার পর দুজন পাইক ঘোড়ায় চড়িয়া গোলাগাঁ উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। জানালা দিয়া তাহা দেখিয়া শান্তি ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল—মা দুর্গা! জোড়া মোষ দেব—যা চাও, তাই দেব—তাঁকে ফিরিয়ে দাও—বুক চিরে রক্ত দেব—যত চাও—হে মা দুর্গা, যত চাও—যতক্ষণ না তোমার পিপাসা মিটে।

গোলাগাঁ পেঁছিতে আর দুই ক্রোশ আছে। অশ্বের ক্ষুর পর্যন্ত ফেনায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রাণপণে ধূলা উড়াইয়া, আল ডিঙ্গাইয়া, খানা টপকাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য।

ঘোড়ার উপর থাকিয়াই সুরেন্দ্রের গা-বমি-বমি করিয়া উঠিল; ভিতরের প্রত্যেক নাড়ী যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে! তাহার পর টপ্ করিয়া ফোঁটা দুই-তিন রক্ত কষ বহিয়া ধূলিধূসরিত পিরানের উপর পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ হাত দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। একটার পূর্বেই গোলাগাঁয়ে উপস্থিত হইলেন। পথের ধারে দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই গোলাগাঁ?

হাঁ।

রামতনু সান্যালের বাটী?

ঐ দিকে।

আবার ঘোড়া ছুটিল। অল্পক্ষণে বাঞ্ছিত বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারেই একজন সিপাহী বসিয়া ছিল; প্রভুকে দেখিয়া সে প্রণাম করিল।

বাটীতে কে আছেন?

কেউ না।

কেউ না? কোথায় গেলেন?

ভোরেই নৌকা করে চলে গেছেন।

কোথায়—কোন্ পথে?

দক্ষিণ দিকে।

নদীর ধারে ধারে পথ আছে? ঘোড়া দৌড়তে পারবে?

বলিতে পারি না। বোধ হয় নেই।

পুনর্বার ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। ক্রোশ-দুই আসিয়া আর পথ নাই। ঘোড়া চলে না। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তখন সুরেন্দ্রনাথ পদব্রজে চলিলেন। একবার চাহিয়া দেখিলেন—জামার উপর অনেক ফোঁটা রক্ত ধুলোয় জমিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠ বাহিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। নদীতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন, তার পর প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে আর জুতা নাই—সর্বাঙ্গে কাদা, মাঝে মাঝে শোণিতের দাগ! বুকের উপর কে যেন রক্ত ছিটাইয়া দিয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিল। পা আর চলে না—যেন এইবার শুইতে পারিলেই জন্মের মত ঘুমাইয়া পড়িবে—তাই যেন অন্তিম শয্যায় এই জীবনের মহা-বিশ্রামের আশায় সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দেহে যতটুকু শক্তি আছে, সমস্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষশয্যা আশ্রয় করিবে, আর উঠিবে না!

নদীর বাঁকের পাশে—একখানা নৌকা না? কলমীশাকের দল কাটিয়া পথ করিতেছে! সুরেন্দ্র ডাকিল, 'বড়দিদি'! শুষ্ককণ্ঠে শব্দ বাহির হইল না—শুধু দুই ফোঁটা রক্ত বাহির হইল।

'বড়দিদি'—আবার দুই ফোঁটা রক্ত।

কলমীর দল নৌকার গতি রোধ করিতেছে। সুরেন্দ্র কাছে আসিয়া পড়িল।

আবার ডাকিল, 'বড়দিদি'।

সমস্ত দিনের উপবাস ও মনঃকষ্টে মাধবী নির্জীবের মত নিদ্রিত সন্তোষকুমারের পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। সহসা কানে শব্দ পৌঁছিল; পুরাতন পরিচিত স্বরে—কে ডাকে না!

মাধবী উঠিয়া বসিল। ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা-মাখা—মাস্টারমহাশয় না?

ও নয়নতারার মা, মাঝিকে শীগগির নৌকা লাগাতে বল্।

সুরেন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে কাদার উপর শুইয়া পড়িতেছিলেন।

সকলে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিয়া আনিল। মুখে চোখে জল দিল। একজন মাঝি চিনিত, সে কহিল, লাল্‌তা-গাঁয়ের জমিদার। মাধবী ইষ্ট-কবচ সুদ্ধ স্বর্ণহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, লাল্‌তা-গাঁয়ে এই রাত্রে পৌঁছতে পার? সবাইকে এক-একটা হার দেব।

সোনার হার দেখিয়া তাহাদের মধ্যে তিনজন গুণ ঘাড়ে লইয়া নামিয়া পড়িল।

মাঠাকরুন, চাঁদনি রাত; ভোর নাগাদ পৌঁছে দেব।

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?

অঞ্চল দিয়া মাধবী সযত্নে তাহার ওষ্ঠ-সংলগ্ন রক্তবিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

তুমি বড়দিদি?

আমি মাধবী।

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আঃ—তাই!

বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল, এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। অধরের কোণে সরক্ত হাসি তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—বড়দিদি, যে কষ্ট!

তর্‌তর্ ছল্‌ছল্ করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। ছইয়ের ভিতর সুরেন্দ্রের মুখের উপর

চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। নয়নতারার মা একটা ভাঙা পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিলেন, কোথায় যাচ্ছিলে?

মাধবী ভগ্নকণ্ঠে কহিল, প্রমীলার শ্বশুরবাড়ি।

ছিঃ—এমন করে কি কুটুমের বাড়ি যেতে আছে দিদি?

দশম পরিচ্ছেদ

নিজের অট্টালিকায়, তাহার শয়নকক্ষে, বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আছে। পা-দুটি শান্তি কোলে করিয়া অশ্রুজলে ধুইয়া দিতেছে। পাবনায় যতগুলি ডাক্তার-কবিরাজ সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমেও রক্ত বন্ধ করিতে পারিতেছে না। পাঁচ বৎসর পূর্বেকার সেই আঘাতে রক্ত বমন করিতেছে।

মাধবীর অন্তরের কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না। আমি নিজেও ভাল জানি না, বোধ করি, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ি হইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর ফিরাইতে পারে নাই; পাঁচ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখের পানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়—হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, বড়দিদি, সেদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কেমন, শোধ হ'ল ত?

মুহূর্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুণ্ঠিত-মস্তক সুরেন্দ্রের স্কন্ধের পার্শ্বে রাখিল,—যখন জ্ঞান হইল, তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।

পল্লী-সমাজ

এক

বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিল, এই যে মাসি, রমা কৈ গা?

মাসি আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা হ'লে রমা, কি করবে স্থির করলে?

জ্বলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিসের বড়দা?

বেণী কহিল, তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন! রমেশ ত কাল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই করবে বলে বোধ হচ্ছে;—যাবে না কি?

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ি?

বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, সে ত জানি দিদি। আর যেই হোক, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবি নে। তবে শুনচি নাকি ছোঁড়া সমস্ত বাড়ি-বাড়ি নিজে গিয়ে ব'লবে—বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে, তা হ'লে কি বলবে?

রমা সরোষে জবাব দিল, আমি কিছুই বলব না—বাইরের দরোয়ান তার উত্তর দেবে।

পুজোনিরতা মাসির কর্ণরন্ধ্রে এই অত্যন্ত রুচিকর দলাদলির আলোচনা পৌঁছিবামাত্রই তিনি আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনঝির কথা শেষ না হইতেই অত্যুত্তপ্ত খৈএর মত ছিটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, দরোয়ান কেন? আমি বলতে জানিনে? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বলব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখুয্যেবাড়িতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমন্তন্ন করতে আমার বাড়িতে? আমি কিছুই ভুলি নি বেণীমাধব! তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও ত আর আমার যতীন জন্মায় নি—ভেবেছিল, যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তাহ'লে মুঠোর মধ্যে আসবে—বুঝলে না বাবা বেণী! তা যখন হ'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি-সব জপ-তপ, তুকতাক করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোটজাত হয়ে চায় কিনা যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ ক'র্তে! তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্যন্ত পেলে না। ছোটজাতের মুখে আগুন! বলিয়া মাসি যেন কুস্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ ছোটজাতের উল্লেখে বেণীর মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া। রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসিকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, কেন মাসি তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতে-গড়া জিনিস নয়? যে যেখানে জন্মেচে সেই তার ভাল।

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, না রমা, মাসি ঠিক কথাই বলেচেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোটখুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদবি। আর তুকতাকের কথা যদি বল ত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোটখুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচায্যির অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েচে আজকাল রমেশের মুরুব্বি।

মাসি কহিলেন, সে ত জানা কথা বেণী! ছোঁড়া দশ-বারো বছর ত দেশে আসেনি—এত দিন ছিল কোথায়?

কি করে জানব মাসি। ছোটখুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব, আমাদেরও তাই। শুনচি এতদিন নাকি বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাশ করে এসেচে, কেউ বলচে উকিল হয়ে এসেচে, কেউ বলচে সমস্তই ফাঁকি—ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, তখন দুচোখ নাকি জবাফুলের মত রাঙ্গা ছিল।

বটে? তা হ'লে তাকে ত বাড়ি ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়!

বেণী উৎসাহভরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল, পড়ে বৈ কি! সে ত আমার চেয়ে বেশি বড় নয়। তা ছাড়া শীতলাতলার পাঠশালে দুজনেই পড়তাম যে। কিন্তু তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাসতেন।

মাসি আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার ভালবাসার মুখে আগুন। সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে। তাদের মতলব ছিল, তোকে কোনমতে হাত করা।

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মাসি! ছোট-খুড়ীমার যে,—

কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসিকে বলিয়া উঠিল, সে-সব পুরনো কথার দরকার নেই মাসি।

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাক, তাহার জননীর সম্বন্ধে রমার কোথায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিযা বলিলেন, তা বটে, তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠলে চোখের জল ফেলেন।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এ-সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তবে এই ত স্থির হ'ল দিদি, নড়চড় হবে না ত?

রমা হাসিল। কহিল, বড়দা, বাবা বলতেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস নে মা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে ত! তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার জো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে বিষয় ভাগ করে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করার ভার শুধু আমারই উপর যে! আমার ত নয়-ই, আমাদের সংস্রবে যারা আছে, তাদের পর্যন্ত যেতে দেব না। একটু ভাবিয়া কহিল, আচ্ছা বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ি যায়?

বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, সেই চেষ্টাই ত করচি বোন। তুই আমার সহায় থাকিস, আর আমি কোনও চিন্তা করি নে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচার্যি। আর তারিণী ঘোষাল নেই, দেখি এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষা করে!

রমা কহিল, রক্ষে করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি বলে রাখলুম, শত্রুতা করতে এও কম করবে না।

বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উবু হইয়া বসিল। তারপর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিল, রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা, পেকে গেলে আর হবে না তা নিশ্চয় বলে দিচ্চি। বিষয়-সম্পত্তি কি করে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেখে নি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্মূল করতে পারা যায় ত ভবিষ্যতে আর যাবে না; এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়!

সে আমি বুঝি বড়দা।

তুই না বুঝিস কি দিদি! ভগবান তোকে ছেলে গড়তে গড়তে মেয়ে গড়েছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। আচ্ছা, কাল একবার আসব। আজ বেলা হ'ল যাই, বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িল। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে অপরিচিত গম্ভীরকণ্ঠের আহ্বান আসিল—রাণী, কৈ রে?

রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলায় তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীর প্রতি চাহিয়া দেখিল তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই রুক্ষ-মাথা, খালি-পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বেণীর প্রতি চোখ পড়িবামাত্র বলিয়া উঠিল, এই যে বড়দা, এখানে? বেশ চলুন, আপনি না হ'লে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কৈ রাণী কোথায়? বলিয়াই কপাটের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পালাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে! আরে ইস, কত বড় হয়েছিস রে? ভাল আছিস?

রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, চিনতে পাচ্ছিস রে? আমি তোদের রমেশদা!

এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি ভাল আছেন?

হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু আমাকে আপনি কেন রমা? বেণীর দিকে চাহিয়া একটু-খানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, রমার সেই কথাটা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি বড়দা! যখন মা মারা গেলেন, ও তখন ত খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, রমেশদা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।—তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত?

কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে একটিবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিল, আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকি, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি তাই হয়েই তোমাদের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্তও করতে পারচি না।

মাসি আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

রমেশ এই মাসিটিকে ইতিপূর্বে দেখে নাই; কারণ সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষে সেই যে মুখুয্যেবাড়ি ঢুকিয়াছিলেন আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসি বলিলেন, না হলে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা! বলা নেই, কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির ভিতর ঢুকে উৎপাত করতে শরম হয় না তোমার?

রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমি চললুম, বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িল।

রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, কি বোক্‌চ মাসি, তুমি নিজের কাজে যাও না—

মাসি মনে করিলেন, তিনি বোনঝির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিষ মিশাইয়া কহিলেন, নে রমা, বকিস্‌ নে। যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোমাদের মত চক্ষুলজ্জা হয় না। বেণীর অমন ভয়ে পালানর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হ'ত। আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্মবাড়িতে জল তুলতে, ময়দা মাখতে যাবো। তারিণী মরেচে, গাঁ-সুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে,—এ কথা আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর মুখের ওপর বলে গেলেই ত পুরুষমানুষের মত কাজ হ'ত।

রমেশ তখনও নিস্পন্দ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ-সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভিতর হইতে রান্নাঘরে কপাটের শিকলটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল না। মাসি রমেশের নির্বাক ও অত্যন্ত পাংশুবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকব-দরোয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাইনে—একটু হুঁশ করে কাজ ক'রো বাপু—যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্দরলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে আবদার করে বেড়াবে!

তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনও পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলুম।

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমি ত এত কথা জানতাম না—না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম, সেজন্য আমাকে মাপ ক'রো রাণি! বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পালায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসির সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আহ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল, সরিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ, শোনালে বটে মাসি! আমার সাধ্যিই ছিল না অমন করে বলা! এ কি চাকর-দরোয়ানের কাজ রমা! আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিনা, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বার হয়ে গেল। এই ত—ঠিক হ'ল!

মাসি ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিলেন, খুব ত হ'ল জানি; কিন্তু এই দুটো মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বলে গেলেই ত আরও ভাল হ'ত! আর নাই যদি বলতে পারতে, আমি কি বললুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন সরে পড়া উচিত হয়নি!

মাসির কথার ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল, এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, তুমি যখন নিজে বলেচ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েচে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না—

মাসি এবং বেণী উভয়েই যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসি রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, কি বল্‌লি লা?

কিছু না। আহ্নিক করতে বসে ত সাতবার উঠলে—যাও না, ওটা সেরে ফেল না—রান্নাবান্না কি হবে না? বলিতে বলিতে রমা নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেণী শুষ্কমুখে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মাসি?

কি করে জানব বাছা! ও রাজরাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসী-বাঁদীর কর্ম! বলিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে তিনি মুখখানা কালিবর্ণ করিয়া তাঁহার পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দুই

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অর্জিত হইবার একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যক। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাকুলীন বলরাম মুখুয্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুয্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া, বর্ধমান রাজ-সরকারের চাকরি করিয়া এবং আরও কি কি করিয়া এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতৃঋণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাই দুঃখে-কষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষেই নাকি দুই মিতার মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ

কাহারও মুখদর্শন করেন নাই। বলরাম মুখুয্যে যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও ঘোষাল তাঁহার বাটীতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য কথা শুনা গেল, তিনি নিজেই সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্ধেক ভাগ করিয়া নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুয্যে ও ঘোষালবংশ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। ইঁহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকও অস্বীকার করিত না।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ঘোষালবংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট তরফের তারিণী ঘোষাল মোকদ্দমা উপলক্ষে জেলায় গিয়া দিন-ছয়েক পূর্বে হঠাৎ যেদিন আদালতে ছোট-বড় পাঁচ-সাতটা মুলতুবি মোকদ্দমার শেষফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কোথাকার কোন্ অজানা আদালতের মহামান্য শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহাদের কুঁয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বড় তরফের কর্তা বেণী ঘোষাল খুড়োর মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন এবং আরো গোপনে দল পাকাইতে লাগিলেন কি করিয়া খুড়োর আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর খুড়ো-ভাইপোর মুখ দেখাদেখি ছিল না। বহু বৎসর পূর্বে তারিণীর গৃহ শূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাড়ির ভিতরে দাস-দাসী এবং বাইরে মোকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ রুড়কি কলেজে এই দুঃসংবাদ পাইয়া পিতার শেষকার্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘকাল পরে কাল অপরাহ্নে তাহার শূন্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্মবাড়ি। মধ্যে শুধু দু'টা দিন বাকি। বৃহস্পতিবার রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই-একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মরুব্বিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত কেহ আসিবেই না তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য ও তাহার বাড়ির লোকেরা আসিয়া কাজ-কর্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা না থাকিলেও উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিয়াছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বাড়ির ভিতরে কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্যে বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জন-দুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া বৈঠকখানাব বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতিবৃদ্ধ পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ি ঢুকিল। তাঁহার কাঁধে মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গোঁফ তামাকের ধুঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে সেই ভীষণ চশমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। রমেশ চিনিল না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন্ ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যেবংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার বেণী ঘোষালের মুখের সামনে বলে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। একটু থামিয়া বলিল, আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম করে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্মদাস শুধু ধর্মেরই দাস, আর কারো নয়। এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্যভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাত হইতে হুঁকাটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাতে এক টান দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিল।

ধর্মদাস নিতান্ত অত্যুক্তি করেন নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল। তাহারা প্রাঙ্গণের একধারে ভিয়ান চড়াইযাছে—সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কাঙ্গালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে—চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য

থান ফাড়িয়া পাট করিয়া গাদা করিতেছিল—সেদিকেও জনকয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছামিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া ধর্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যুত্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া 'না না' বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড়্ঘড়্ করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্বাগ্রে আসিয়ছিল। সুতরাং ধর্মদাস যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিবার সুবিধা তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। সে এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিল না। ধর্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কাল সকালে, বুঝলে ধর্মদাসদা, এখানে আসব বলে বেরিয়েও আসা হ'ল না—বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলুম, কাজ নেই—তারপর মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বললে জান বাবা রমেশ! বললে, খুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েচ, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, লোকজন খাবে-টাবে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন। তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশ কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত এক মুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বললুম, বেণীবাবু, এই ত পথ, একবার কাঙ্গালী-বিদায়টা দাঁড়িয়ে দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটাও বলি একে! এতটা বয়েস হ'ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাসদা, আমাদের সাধ্যিই বা কি! যাঁর কাজ তিনি উপর থেকে করাচ্চেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বৈ ত নয়!

ধর্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, সে কাসিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলীমশাই বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া ধর্মদাস আরও ভাল কিছু বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিল, তুমি ত আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুতো বোনের খুড়তুতো ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে বাড়ি—সে-সব তারিণীদা জানতেন। তাই যে-কোন কাজ-কর্মে—মামলা-মোকদ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে!

ধর্মদাস প্রাণপণ-বলে কাসি থামাইয়া খিঁচাইয়া উঠিল—কেন, বাজে বকিস্ গোবিন্দ? খক্—খক্—খক্—আমি আজকের নয়—না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বল্লি, আমার জুতো নেই, খালি-পায়ে যাই কি করে? খক্—খক্—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিল। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি! খক্—খক্—খক্—

গোবিন্দ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, এলুম?

এলিনে?

দূর মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী তোর বাবা।

গোবিন্দ তাহার ভাঙ্গা ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিল, তবে রে শালা!

ধর্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া ধরিযা হুঙ্কার দিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিল। রমেশ শশব্যস্তে উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্মদাস লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ও শালার সম্পর্কে আমি বড় ভাই হই কিনা, তাই শালার আক্কেল দেখ—

ওঃ, শালা আমার বড় ভাই! বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

শহরের ময়রারা ভিয়ান ছাড়িয়া চাহিয়া রহিল। চতুর্দিকে যাহারা কাজ-কর্মে নিযুক্ত ছিল, চেঁচামেচি শুনিয়া তাহারা তামাশা দেখিবার জন্য সুমুখে ছুটিয়া আসিল। ছেলে-মেয়েরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল এবং এই-সমস্ত লোকের দৃষ্টির সুমুখে রমেশ লজ্জায় বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান! এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে! বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কাপড়ের থাক দিতে দিতে সমস্তই দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া আসিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, প্রায় শ' চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?

রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভিভূত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই! বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজ-কর্মের বাড়িতে কত ঠেঙ্গাঠেঙ্গি রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়—আবার যে-কে সেই হয়। নিন্ উঠুন চাটুয্যেমশাই—দেখুন দেখি আরও থান ফাড়ব কি না?

ধর্মদাস জবাব দিবার পূর্বেই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল, হয়ই ত! হয়ই ত! ঢের হয়! নইলে বিরদ কর্ম বলেচে কেন? শাস্তরে আছে লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে! সে বছর—তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যে-মশায়ের কন্যা রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিদে নিয়ে রাঘব ভট্চায্যিতে হারাণ চাটুয্যেতে মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেল? কিন্তু আমি বলি ভৈরবভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলেদের একখানা ক'রে দিলেই নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী, সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্মদাসদা?

ধর্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি, বাবাজী! ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেচে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ!

এখন পর্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বস্ত্র-বিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্মাহত হইয়া পড়িল। ইহার সুযুক্তি-কুযুক্তি সম্বন্ধে নহে, এখন এইটাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহারা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এতবড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড করিয়া বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া রমেশ সংক্ষেপে কহিল, আরও দু শ' কাপড় ঠিক করে রাখুন।

তা নইলে কি হয়? ভৈরবভায়া, চল, আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে বল? বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বস্ত্ররাশির নিকটে গিয়া বসিলেন। রমেশ বাটীর ভিতর যাইবার উপক্রম করিতেই ধর্মদাস তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি অনেক কথা কহিলেন। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কাপড় গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী আড়চোখে সব দেখিল।

কৈ গো, বাবাজী কোথায় গো? বলিয়া একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিতশ্মশ্রু প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল। ইহার সঙ্গেও গুটি-তিনেক ছেলেমেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরনে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়। বালক-দুটি কোমরে এক-একগাছি ঘুন্সি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল, এস দীনুদা, ব'সো। বড় ভাগ্যি আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়ল। ছেলেটা একাসারা হয়ে যায়, তা তোমরা—

ধর্মদাস গোবিন্দের প্রতি কট্মট্ করিয়া চাহিল। সে দ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া কহিল, তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না দাদা—বলিয়া তাহার হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিল। দীনু ভট্চায আসন গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া বলিল, আমি ত ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকরুনকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম।

বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারী আয়োজন হচ্চে? পথে আসতে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে ষোলখানা করে লুচি আর চার-জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, তা ছাড়া হয়ত একখানা করে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনুদাকে বলছিলুম বাবাজী,—তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড় একরকম করা ত যাচ্ছে, কিন্তু বেশী একেবারে উঠে পড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েচে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ির টান রয়েচে; কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্মদাসদা, এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনুদা ত পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসচেন। ওরে ও ষষ্ঠিচরণ, তামাক দে না রে! বাবা রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই! নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভিতরে বুঝি ধর্মদাস-গিন্নী এসেচে? খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি ক'রো না বাবা! বিটলে বামুন যতই ফোসলাক্, ধর্মদাস-গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চাবি-টাবি দিও না বাবা, কিছুতে দিও না—ঘি, ময়দা, তেল, নুন অর্ধেক সরিয়ে ফেলবে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়ে তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্যন্ত লোকসান হবে না।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। ধর্মদাস যে তাহার গৃহিণীকে ভাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া দিবার কথা এত গোপনে কহিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আন্দাজ করিয়াছিল কিরূপে?

উলঙ্গ শিশু-দুটা ছুটিয়া আসিয়া দীনুদার কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল—বাবা, সন্দেশ খাব।

দীনু একবার রমেশের প্রতি একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিল, সন্দেশ কোথায় পাব রে?

কেন, ঐ যে হচ্চে, বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া দিল।

আমরাও দাদামশাই, বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আরও তিন-চারটি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল।

বেশ ত, বেশ ত, বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল—ও আচায্যিমশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েচে, খেয়ে ত আসেনি—ওহে ও, কি নাম তোমার? নিয়ে এস ত ঐ থালাটা এদিকে।

ময়রা সন্দেশের থালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল; বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল—ওরে ও খেঁদি, খাচ্ছিস ত, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল্ দেখি?

বেশ বাবা, বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল। দীনু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ তোদের আবার পছন্দ! মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিগর, এ কড়াটা কেমন নামালে—কি বল গোবিন্দভায়া, এখনও একটু রোদ আছে বলে মনে হচ্ছে না?

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে আছে বৈ কি! এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিকের—

তবে কৈ দাও দেখি একটা গোবিন্দভায়াকে, চেখে দেখুক কেমন কলকাতার কারিগর তোমরা! না, না, আমাকে আবার কেন? তবে আধখানা—আধখানার বেশী নয়। ওরে ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—

রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে গোটা-চারেক থালাও নিয়ে আসিস ষষ্ঠীচরণ।

প্রভুর আদেশ মত ভিতর হইতে গোটা-তিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বৃহৎ থালার অর্ধেক মিষ্টান্ন এই তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সদ্‌ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

হাঁ, কলকাতার কারিগর বটে! কি বল ধর্মদাসদা? বলিয়া দীননাথ রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিল। ধর্মদাসদার তখনও শেষ হয় নাই, এবং যদিচ তাঁহার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোঝা গেল এ বিষয়ে তাহার মতভেদ নাই।

হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে! বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তবে মিহিদানাটা একটু পরখ করে দিন।

মিহিদানা? কৈ আনো দেখি বাপু?

মিহিদানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে এই নূতন বস্তুটির সদ্ব্যবহার দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল! দীননাথ মেয়ের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, ওরে ও খেঁদি, ধর্ দিকি মা এই দুটো মিহিদানা।

আমি আর খেতে পারব না বাবা।

পারবি, পারবি। এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বৈ ত নয়! না পারিস্ আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ্, কাল সকালে খাস্, হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! যেন অমৃত! তা বেশ হয়েচে। মিষ্টি বুঝি দুরকম করলে বাবাজী!

রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

অ্যাঁ ক্ষীরমোহন! কৈ সে ত বার করলে না বাপু?

বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া দীননাথ কহিল, খেয়েছিলুম বটে রাধানগরের বোসেদের বাড়িতে। আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি।

রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথাটা বিশ্বাস করা তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না। রাখাল কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ভেতরে বোধ করি আচায্যিমশাই আছেন; যা ত রাখাল, কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দেখি।

সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া বলিল, আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু।

রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, বল গে, আমি আনতে বলচি।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী রমেশের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া চোখ ঘুরাইয়া কহিল, দেখলে দীনুদা, ভৈরবের আক্কেল? এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসির বেশি দরদ। সেই জন্যই আমি বলি—

সে কি বলে তাহা না শুনিয়া রাখাল বলিয়া উঠিল, আচায্যিমশাই কি করবেন? ও-বাড়ি থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে!

ধর্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিল, কে, বড়গিন্নী?

রমেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, জ্যাঠাইমা এসেছেন?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট-বড় দুই ভাঁড়ারই তালাবন্ধ করে ফেলেছেন।

বিস্ময়ে আনন্দে রমেশ দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

তিন

জ্যাঠাইমা!

ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বেণীর বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওয়া উচিত নয়, কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশি বলিয়া মনে হয় না।

রমেশ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য তাঁহার নিটোল

পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখেই দুই-একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁহার দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে এক সময় বড় ভালবাসিতেন। বধূ-বয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাশুড়ী-ননদের যন্ত্রণায় লুকাইয়া বসিয়া এই দু'টি জায়ে যখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম গ্রন্থিবন্ধন হয়। তার পরে, গৃহবিচ্ছেদ, মামলা-মোকদ্দমা, পৃথক হওয়া, কত রকমের ঝড়-ঝাপটা এই দুইটি সংসাবের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিবাদের উত্তাপে বাঁধন শিথিল হইয়াছে, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। বহুবর্ষ পরে সেই ছোটবৌয়ের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহারই হাতে সাজানো এই-সমস্ত বহু পুরাতন হাঁড়ি-কলসির পানে চাহিয়া জ্যাঠাইমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। রমেশের আহ্বানে যখন তিনি চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি আরক্ত আর্দ্র চক্ষু-পল্লবের পানে চাহিয়া রমেশ ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। জ্যাঠাইমা তাহা টের পাইলেন। তাহাতেই বোধ করি, এই সদ্য-পিতৃহীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার লেশমাত্র তিনি বাইরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, চিনতে পারিস্ রমেশ?

জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে যতদিন না সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, ততদিন এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কিছুতে ছাড়িতে চাহেন নাই। সে-ও মনে পড়িল এবং এ-ও মনে হইল সেদিন ও-বাড়িতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ি নাই বলিয়া দেখা পর্যন্ত করেন নাই। তার পর রমাদের বাড়িতে বেণীর সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাহার মাসির নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বিশ্বেশ্বরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছি বাবা, এ সময়ে শক্ত হ'তে হয়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল যেখানে অভিমানের কোন মর্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কহিল, শক্ত আমি হয়েচি জ্যাঠাইমা! তাই যা পারতুম নিজেই করতুম, কেন তুমি আবার এলে?

জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, তুই ত আমাকে ডেকে আনিস নি রমেশ, যে, তোকে তার কৈফিয়ত দেব? তা শোন্ বলি। কাজ-কর্ম হবার আগে আর আমি ভাঁড়ার থেকে খাবার-টাবার কোন জিনিস বা'র হতে দেব না; যাবার সময় ভাঁড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কাল এসে তোর হাত থেকেই নেব। আর কারু হাতে দিস্‌নি যেন। হাঁ রে, সেদিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না। ভাবিয়া কহিল, বড়দা তখন ত বাড়ি ছিলেন না।

প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে সস্নেহে অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, আ আমার কপাল! এই বুঝি? হাঁ রে, দেখা হয়নি বলে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের উপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু তোর কাজ ত তোর করা চাই। যা একবার ভাল করে বল গে যা রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হ'তে তোর কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা যে, কোন লোকের হাতেপায়ে ধরে মিটমাট করে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মী-মানিক আমার, যা একবার—এখন বোধ হয় সে বাড়িতেই আছে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না। বিশ্বেশ্বরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,

বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে ঢের বেশি জানি। তাঁদের কথা শুনিস্ নে। আয় আমার সঙ্গে, তোর বড়দার কাছে একবার যাবি চল।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না জ্যাঠাইমা, সে হয় না। আর বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যাই হোন তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।

সে আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার মনে হইল, জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশি মলিন হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তবে তাই। যখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা কয়ে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিস নি বাবা, কিছুই আটকাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আসবো। বলিয়া বিশ্বেশ্বরী তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন; বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ ম্লানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজী, বড়গিন্নী এসেছিলেন, না?

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

শুনলুম ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেলেন, না?

রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ কহিল, দেখলে ধর্মদাসদা, যা বলেচি তাই। বলি মতলবটা বুঝলে বাবাজী?

রমেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র দীনু ভট্চায তখনও যায় নাই। কারণ তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না। ছেলেমেয়ে লইয়া যাহার দয়ায় পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক দুটো আশীর্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাত-পুরুষের স্তব-স্তুতি না করিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিল না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, এ মতলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া? তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়াছিল; নির্বোধের কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, বোঝো না সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এ-সব ব্যাপারের কি বোঝো যে মানে করতে এসেচ?

ধমক খাইয়া দীনুর নির্বুদ্ধিতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উষ্ণ হইয়া জবাব দিল, আরে এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোনখানে? শুনচ না, গিন্নীমা স্বয়ং এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, ঘরে যাও না ভট্চায। যে জন্যে ছুটে এসেছিলে—গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে, আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেও, আজ আর হবে না। এখন যাও আমাদের ঢের কাজ আছে।

দীনু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠস্বরে থামিয়া গেল—আপনার হ'ল কি গাঙ্গুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন খামকা অপমান করচেন কেন?

গোবিন্দ ভর্ৎসিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্কহাসি হাসিয়া বলিল, অপমান আবার কাকে করলুম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না সত্যি কথাটি বলেচি কি না? ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় ফিরি যে! দেখলে ধর্মদাসদা, দীনে বামনার আস্পর্ধা? আচ্ছা—

ধর্মদাসদা কি দেখিল তা সেই জানে, কিন্তু রমেশ লোকটার নির্লজ্জতা ও স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তখন দীনু রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, না বাবা, গোবিন্দ সত্যকথাই বলেচে। আমি বড় গরীব, সে কথা সবাই জানে! ওঁদের মত আমার

জমি-জমা-চাষ-বাস কিছুই নেই। একরকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-সিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভাল জিনিস ছেলে-পিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেননি—তাই বড়-ঘরে কাজকর্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে ক'রো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে দেখে খুশিই হয়েচেন।

হঠাৎ দীনুর গম্ভীর শুষ্ক চোখ-দু'টা জলে ভরিয়া উঠিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া দু'ফোঁটা সকলের সুমুখেই ঝরিয়া পড়িল। রমেশ মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল। দীনু তাহার মলিন ও শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়প্রান্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, শুধু আমিই নই বাবা। এদিকে আমার মত দুঃখী-গরিব যে যেখানে আছে, তারিণীদার কাছে হাত পেতে কেউ কখনো অমনি ফেরেনি। সে-কথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাও টের পেত না যে! আর তোমাদের জ্বালাতন করব না। নে মা খেঁদি ওঠ, হরিধন চল্‌ বাবা ঘরে যাই, আবার কাল সকালে আসব, আর কি বলব বাবা রমেশ, বাপের মত হও, দীর্ঘজীবী হও।

রমেশ তাহার সঙ্গে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, ভট্‌চায্যিমশাই, এই দুটো-তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখবেন। আর বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু এ বাড়িতে হরিধনের মায়ের যদি পায়ের ধুলো পড়ে ত ভাগ্য বলে মনে করব।

ভট্‌চায্যিমশায় ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, আমি বড় দুঃখী বাবা রমেশ, আমাকে এমন করে বললে যে লজ্জায় মরে যাই।

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্তের জন্য নিজের রূঢ় কথা স্মরণ করিয়া গাঙ্গুলীমশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই সে থামাইয়া দিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, এ যে আমার নিজের কাজ রমেশ, তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাই ত এসেছি, ধর্মদাসদা আর আমি দুই ভায়ে ত তোমার ডাকবার অপেক্ষা রাখিনি বাবা।

ধর্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাসিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাসির ধমকে চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিল, বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই। আমাদের জন্মের ঠিক আছে।

তাহার কুৎসিত কথায় রমেশ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু রাগ করিল না। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহারা শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কতবড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না।

জ্যাঠাইমার সস্নেহ অনুরোধে এবং তাঁহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে পীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকাহাঁকিটাই সবচেয়ে বেশি। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছে, এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদলে রেখো বেণীবাবু! নবাবী কাণ্ডকারখানা শুনলে ত? তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি, তা ত জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর্‌, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা ক'রে বাপের ছাদ্দ করে, তা ত কখন শুনিনি বাবা! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বেণীমাধব-বাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করেচে।

বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিল, তা হলে কথাটা ত বা'র করে নিতে হচ্চে গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া বলিল, সবুর কর না বাবাজী! একবার ভাল করে ঢুকতেই দাও না—তার পরে—বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? এ কি রমেশ বাবাজী? আমরা থাকতে এত রাত্তিরে তুমি কেন বাবা?

রমেশ সে কথার জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বড়দা, আপনার কাছেই এলুম।

বেণী থতমত খাইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিল, আসবে বৈ কি বাবা, একশ' বার আসবে! এ ত তোমারই বাড়ি। আর বড়ভাই পিতৃতুল্য! তাই ত আমরা বেণীবাবুকে বলতে এসেছি, বেণীবাবু, তারিণীদার সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক—আর কেন? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল হালদারমামা? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে বাবা—কে আছিস রে, একখানা কম্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না বেণীবাবু, তুমি বড়ভাই—তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া বড়গিন্নীঠাকরুন যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী চমকাইয়া উঠিল—মা গিয়েছিলেন?

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুশি হইল। কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত খবরটা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, শুধু যাওয়া কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার—করা-কর্ম যা কিছু তিনিই ত করচেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নীঠাকরুনের মত মানুষ কি আর আছে? না হবে কেন? না বেণীবাবু, সামনে বললে খোশামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়? বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। বেণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, আচ্ছা—

গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল, শুধু আচ্ছা নয়, বেণীবাবু! যেতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার উপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কি রকম করা হবে একটা ফর্দ করে ফেলা হোক না কেন? কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কথা কিনা হালদারমামা? ধর্মদাসদা চুপ করে রইলে কেন? কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীতকণ্ঠে বলিল, বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেণী গম্ভীর হইয়া কহিল, মা যখন গেছেন তখন আমার যাওয়া না-যাওয়া—কি বল গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্বেই রমেশ বলিল, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে বড়দা, যদি অসুবিধা না হয় একবার দেখে-শুনে আসবেন।

বেণী চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, দেখলে বেণীবাবু, কথার ভাবখানা!

বেণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দর কথাগুলো মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেণী ঘোষালের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের সুমুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রমেশ? কেন রে?

রমেশ উঠিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, একটু দাঁড়া বাবা, একটা আলো আনতে বলে দি।

আলোয় কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না। বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই একপাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন, এত রাত্তিরে যে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলুম।

তবেই মুশকিলে ফেললি বাবা। এঁরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, চাটুয্যেমশাই—

রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, জানিনে জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জানতেও চাইনে—তুমি যা বলবে তাই হবে।

অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু তখন যে বললি রমেশ, এরাই তোর সবচেয়ে আপনার! তা যাই হোক, আমার মেয়েমানুষের কথায় কি হবে বাবা? এ গাঁয়ে যে আবার—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা কাজ-কর্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।

রমেশ বিশেষ আশ্চর্য হইল না। কারণ, এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা?

সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস এখানে আপনিই সব জানতে পারবি। কারুর সত্যকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে-অপবাদ আছে—তা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী-দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দুদিন আগে যেতুম রমেশ, তা হলে এত উদ্যোগ-আয়োজন কিছুতে করতে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি, বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে যে কি ছিল, তাহার ঠিক মর্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না। এবং কাহারও সত্যকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে পারে, তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না, বরঞ্চ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী বললেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণশূদ্রই নিমন্ত্রণ করে আসব। কিন্তু, তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে; তুমি হুকুম দাও জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, এ-রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ। তাতে ভারি গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয় বাবা। সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেচে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ-রকম হ'লে ত কোনমতে চলতে পারে না রমেশ!

ভাবিয়া দেখিলে রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্র এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্মদাস, গোবিন্দ—এঁরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, শুধু এরা নয় রমেশ, তোমার বড়দা বেণীও সমাজের একজন কর্তা।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করো গে রমেশ! সবেমাত্র বাড়িতে পা দিয়েই এদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।

বিশ্বেশ্বরী কতটা দূর চিন্তা করিয়া যে এরূপ উপদেশ দিলেন, তীব্র উত্তেজনার মুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না; কহিল, তুমি নিজে এইমাত্র বললে জ্যাঠাইমা, নানান্ কারণে এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া, আমি যখন সত্যি-মিথ্যে কারো দোষ-অপরাধের কথাই জানিনে, তখন কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অন্যায়।

জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, আমি তোর গুরুজন, মায়ের মতো। আমার কথাটা না শোনাও ত তোর পক্ষে অন্যায়।

কি করবো জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করেচি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করবো।

তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখ অপ্রসন্ন হইল; বোধ করি বা মনে মনে

বিরক্তও হইলেন; বলিলেন, তা হলে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছলনামাত্র।

জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল, কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমি জানতুম জ্যাঠাইমা, যা অন্যায় নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্বাদ করবে। আমার—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল রমেশ যে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না?

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কাল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবি করিতেছিল, এখন দেখিল, এ দাবির অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর আপন সন্তানের দাবি জায়গা জুড়িয়া আছে। সে ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপা অভিমানের সুরে বলিল, কাল পর্যন্ত তাই জানতুম জ্যাঠাইমা! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা পারি আমি একলা করি. তমি এসো না; তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।

এই ক্ষুণ্ণ অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর রহিল না। কিন্তু আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার ভাঁড়ারঘরের চাবিটা এনে দিই, বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবি আনিয়া রমেশের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘণ্টাকয়েক মাত্র পূর্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন। কিন্তু একটা রাত্রিও কাটিল না, তাহাকে আবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল, না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করেছেন।

চার

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে--বাড়ির ভিতরে আহারের জন্য পাতা পাতিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল হাঁকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রন্ধনশালার কপাটের একপাশে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ বাবা, তুমি গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি, যত দোষ কি এই ক্ষেন্তি বামনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার খুশি শাস্তি দেবে?

গোবিন্দকে দেখিয়াই কহিল, ঐ উনি মুখুয্যেবাড়ির গাছ-পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আমার কাছে আদায় করেন নি কি? গাঁয়ের ষোল আনা শেতলা-পুজোর জন্যে দুজোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেন নি কি? তবে? কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি?

রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী বসিয়া ছিল, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার রমেশের দিকে একবার প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন, যদি আমার নামটাই করলে ক্ষ্যান্তমাসি, তবে সত্যি কথা বলি বাছা! খাতিরে কথা কইবার লোক এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়, সে দেশসুদ্ধ লোক জানে। তোমার মেয়ের প্রাশ্চিত্যও হয়েচে, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি--সব মানি। কিন্তু তাকে যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিইনি! মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—

ক্ষ্যান্তমাসি চীৎকার করিয়া উঠিল, ম'লে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পুড়িয়ে এসো বাছা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোটভাজ যে ঐ ভাঁড়ারঘরে বসে পান সাজচে, সে ত আর বছর মাস-দেড়েক ধরে কোন্ কাশীবাস করে অমন হলদে রোগা শলতেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল শুনি? সে বড়লোকের বড় কথা বুঝি? বেশি ঘাঁটিয়ো না বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙ্গে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।

গোবিন্দ ক্ষ্যাপার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে রে হারামজাদা মাগী—

কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না, বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, মারবি নাকি রে? ক্ষেন্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে তা বলে দিচ্চি। আমার মেয়ে ত রান্নাঘরে ঢুকতে যায়নি; দোরগোড়ায় আসতে না আসতে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান করে বসলো, বলি তার বেয়ানের তাঁতি অপবাদ ছিল না কি? আমি ত আর আজকের নই গো, বলি, আরও বলব, না, এতেই হবে?

রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য ব্যস্ত হইয়া ক্ষ্যান্তর হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সানুনয়ে কহিল, এতেই হবে মাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী ওঠ্ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে বসবি চল্।

পরাণ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্চি। গোবিন্দ! কালীচরণ! তোমাদের মামাকে চাও ত উঠে এসো বলচি। বেণী ঘোষাল যে তখন বলেছিল, মামা, যেয়ো না ওখানে! এমন সব খান্‌কী নটীর কান্ডকারখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই? কালী! উঠে এসো।

মাতুলের পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছর চারেক পূর্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোট ভগ্নীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল—ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে এই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, যে যাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলে সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাণ হালদার আর যদু মুখুজ্যেমশায়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই দুটো মাগীকে কেন বাড়ি ঢুকতে দিয়েচেন, তার জবাব না দিলে আমরা এখানে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়ের লোক, সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন চাল্ সর্বাপেক্ষা লাভজনক ইহা তাহাদের অবিদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা যাহারা যা খুশি বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীনু ভট্‌চায কাঁদ কাঁদ হইয়া বার বার ক্ষ্যান্তমাসি ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙ্গুলী, একবার হালদার মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিক হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্ম যেন লন্ডভন্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল। কিন্তু রমেশ একটি কথা কহিতে পারিল না। একে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কান্ড। সে পাংশুমুখে কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রমেশ!

অকস্মাৎ একমুহূর্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কপাটের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপনিই কখন আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল ইনিই বিশ্বেশ্বরী, ইনিই ঘোষাল-বাড়ির গিন্নীমা।

পল্লীগ্রামে শহরের কড়া পর্দা নাই। তত্রাচ বিশ্বেশ্বরী বড়বাড়ির বধূ বলিয়াই হোক কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং সকলেই বড় বিস্মিত হইল। যাহারা শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার আশ্চর্য চোখ-দুটির পানে চাহিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ থামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেমনি সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গাঙ্গুলীমশায়কে ভয় দেখাতে মানা করে দে রমেশ! আর হালদারমশায়কে আমার নাম করে বল্ যে, আমি সবাইকে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনেচি, সুকুমারীকে অপমান করবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজ-কর্মের বাড়িতে হাঁকাহাঁকি, গালিগালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যাঁর অসুবিধে হবে তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।

বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানে শুনিতে পাইল। রমেশের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না—হইলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাঁড়াইয়া দেখিতেও পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় লইতে দেখিয়া সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল; তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, কে আসিল, না আসিল তাহার খোঁজ লইতে পারে নাই। কিন্তু আর যেই আসুক, জ্যাঠাইমা যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনার অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে একজন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে অস্ফুটে কহিল, বসে পড় না খুড়ো? ষোলখানা লুচি, চারজোড়া সন্দেশ কে কোথায় খাইয়ে-দাইয়ে সঙ্গে দেয় বাবা!

পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়া রাখিল এবং আহারের জন্য পাতা পড়িলে তত্ত্বাবধানের ছুতা করিয়া সকলের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে উপবেশন করিল না। যাহারা তাহার এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল তাহারা সকলেই মনে মনে বুঝিল, গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিবে না। অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত এবং প্রত্যেকেই খুঁদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ি প্রভৃতি বাটীর অনুপস্থিত বালকবালিকার নাম করিয়া যাহা বাঁধিয়া লইলেন তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে।

সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম প্রায় সারা হইয়া গিয়াছে, রমেশ সদর দরজার বাহিরে একটা পেয়ারাগাছের তলায় অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, মনটা তাহার ভাল ছিল না। দেখিল, দীনু ভট্টাচার্য ছেলেদের লইয়া লুচি-মণ্ডার গুরুভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একরূপ অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইতেছে। সর্বপ্রথমে খেঁদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে—

সবাই যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটা বুঝিতে পারিল; পলাইবার পথ থাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বলিয়া আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে কহিল, খেঁদি, এ-সব কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস রে?

তাহাদের ছোট-বড় পুঁটুলিগুলির ঠিক সদুত্তর খেঁদি দিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া দীনু নিজেই একটুখানি শুষ্কভাবে হাসিয়া বলিল, পাড়ার ছোটলোকদের ছেলেপিলেরা আছে ত বাবা, এঁটো-কাঁটাগুলো নিয়ে গেলে তাদের দুখানা-চারখানা দিতে

পারব। সে যাই হোক বাবা, কেন যে দেশসুদ্ধ লোক ওঁকে গিন্নীমা বলে ডাকে তা আজ বুঝলুম।

রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের ধার পর্যন্ত আসিয়া—হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভট্‌চায্যিমশাই, আপনি ত এদিকের সমস্তই জানেন, এ গাঁয়ে এত রেষারেষি কেন বলতে পারেন?

দীনু মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হায় রে বাবাজী, আমাদের কুঁয়াপুর ত পদে আছে। যে কাণ্ড এ কদিন ধরে খেঁদির মামার বাড়িতে দেখে এলুম! বিশ ঘর বামুন-কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে কিন্তু চারটে দল। হরনাথ বিশ্বেস দুটো বিলিতি আমড়া পেড়েছিল বলে তার আপনার ভাগ্নেকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে। সমস্ত গ্রামেই বাবা এই রকম—তা ছাড়া মামলায় মামলায় একেবারে শতচ্ছিদ্র!—খেঁদি, হরিধনের হাতটা একবার বদলে নে মা।

রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, এর কি কোন প্রতিকার নেই ভট্‌চায্যিমশাই?

প্রতিকার আর কি করে হবে বাবা—এ যে ঘোর কলি! ভট্টাচার্য একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে একটা কথা বলতে পারি বাবাজী। আমি ভিক্ষে-সিক্ষে করতে অনেক জায়গাতেই ত যাই—অনেকে অনুগ্রহ করেন। আমি বেশ দেখেচি, তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের দয়াধর্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না করে আর ছেড়ে দেয় না। বলিয়া দীনু যেমন ভঙ্গি করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল।

দীনু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, হাসির কথা নয় বাবাজী, অতি সত্য কথা। আমি নিজেও প্রাচীন হয়েচি—কিন্তু—তুমি যে অন্ধকারে অনেকদূর এগিয়ে এলে বাবাজী।

তা হোক ভট্‌চায্যিমশাই, আপনি বলুন।

কি আর বলব বাবা, পাড়াগাঁ-মাত্রই এই রকম। এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ক্ষ্যান্তবামনি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই ওকে ভয় করে। জাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ও-ই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়ায়।

রমেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। দীনু নিজেই বলিতে লাগিল—এই আমার কথা তুমি দেখে নিও বাবা, ক্ষ্যান্তবামনি সহজে নিস্তার পাবে না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার দু-দুটো ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা। কিন্তু যাই বল বাবা, মাগীর সাহস আছে। আর সাহস থাকবে নাই বা কেন? মুড়ী বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে, সকলের সব কথা টের পায়। ওকে ঘাঁটালে কেলেঙ্কারীর সীমা-পরিসীমা থাকবে না তা বলে দিচ্চি। অনাচার আর কোন্ ঘরে নেই বল? বেণীবাবুকেও—

রমেশ সভয়ে বাধা দিয়া বলিল, থাক্, বড়দার কথায় আর কাজ নেই—

দীনু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কহিল, থাক্ বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, কারো কথায় আমার কাজ নেই। কেউ যদি বেণীবাবুর কানে তুলে দেয় ত আমার ঘরে আগুন—

রমেশ আবার বাধা দিয়া কহিল, ভট্‌চায্যিমশাই, আপনার বাড়ি কি আরো দূরে?

না বাবা, বেশি দূর নয়, এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে—কোন দিন যদি—

আসব বৈ কি, নিশ্চয় আসব। বলিয়া রমেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আবার কাল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্তু তার পরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন, বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘজীবী হও—বাপের মত হও। বলিয়া দীনু ভট্‌চায অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্বচন করিয়া ছেলেপুলে লইয়া চলিয়া গেল।

পাঁচ

এ পাড়ার একমাত্র মধু পালের মুদীর দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশ-বারদিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকি দশ টাকা লইয়া যায় নাই বলিয়া রমেশ কি মনে করিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। মধু পাল মহাসমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোটবাবুর আসিবার হেতু শুনিয়া গভীর আশ্চর্যে অবাক হইয়া গেল। যে ধারে, সে উপযাচক হইয়া ঘর বহিয়া ঋণ-শোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথায় কথায় অনেক কথা হইল। মধু কহিল, দোকান কেমন করে চলবে বাবু? দু আনা, চার আনা, এক টাকা, পাঁচ-সিকে করে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাকি পড়ে আছে। এই দিয়ে যাচ্ছি বলে দু'মাসেও আদায় হবার জো নেই। এ কি, বাঁড়ুয্যেমশাই যে' কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ে নখে গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতো জড়ানো, ডান হাতে কচুপাতায় মোড়া চারিটি কুচোচিংড়ি। তিনি ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরে এলুম, তামাক খা' দিকি মধু,—বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, সৈরুবি জেলেনীর আক্কেল দেখলি মধু, খপ্ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে? কালে কালে কি হ'ল বল দেখি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক-কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, হাত ধরে ফেললে আপনার?

ক্রুদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশায় একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আড়াইটি পয়সা শুধু বাকী, তাই বলে খামকা হাটসুদ্ধ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার? কে না দেখলে বল্! মাঠ থেকে বসে এসে গাড়ুটি মেজে নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলুম, হাটটা একেবারে ঘুরে যাই! মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে—আমাকে স্বচ্ছন্দে বললে কিনা, কিছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে! আরে আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস? ডালাটা ফস্ করে তুলে ফেলতেই দেখি না—অম্নি ফস্ করে হাতটা চেপে ধরে ফেললে। তোর সেই আড়াইটা—আর আজকের একটা—এই সাড়ে-তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস মধু?

মধু সায় দিয়া কহিল, তাও কি হয়!

তবে তাই বল না। গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে ষষ্ঠে জেলের ধোপা-নাপতে বন্ধ করে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না?

হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবুটি কে মধু?

মধু সগর্বে কহিল, আমাদের ছোটবাবুর ছেলে যে! সেদিনের দশ টাকা বাকী ছিল বলে নিজে বাড়ি বয়ে দিতে এসেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশায় কুচোচিংড়ির অভিযোগ ভুলিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, আঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাক বাবা। হাঁ, এসে শুনলুম একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনও হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল চোখে দেখতে পেলুম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাঁড়ির হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!

রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু দোকানসুদ্ধ সকলে তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহা কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তামাক সাজিয়া মধু দোকানি বাঁড়ুয্যের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে? একটা চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত?

হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার? হ'লে হবে কি—সেখানে কে থাকতে পারে বল্। যেমনি ধোঁয়া তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস ত জানবি তোর বাপের পুণ্যি!

মধু কখনও কলিকাতায় যায় নাই। মেদিনীপুর শহরটা একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া

দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে ভারি আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলেন কি!

বাঁড়ুয্যে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোর রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না, সত্যি কি মিথ্যে। না মধু, খেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকব সেও ভাল, কিন্তু বিদেশ যাবার নামটি যেন কেউ আমার কাছে আর না করে। বললে বিশ্বাস করবি নে, সেখানে সুষনি-কলমি শাক, চালতা, আমড়া, থোড়, মোচা পর্যন্ত কিনে খেতে হয়। পারবি খেতে? এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেছি। দিবারাত্রি পেট ফুট্‌ফাট্ করে, বুক জ্বালা করে, প্রাণ আইঢাই করে, পালিয়ে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গাঁয়ে বসে জোটে একবেলা একসন্ধ্যা খাব, না জোটে, ছেলেমেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করব, বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জার কথা নেই, কিন্তু মা-লক্ষ্মী মাথায় থাকুক—বিদেশে কেউ যেন না যায়।

তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে যখন সভয়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছে তখন বাঁড়ুয্যে উঠিয়া আসিয়া মধুর তেলের ভাঁড়ের ভিতরে উড়াখি ডুবাইয়া এক ছটাক তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্ধেকটা দুই নাক ও কানের গর্তে ঢালিয়া দিয়া বাকীটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, বেলা হয়ে গেল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পয়সার নুন দে দেখি মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাবো!

আবার বিকেলবেলা? বলিয়া মধু অপ্রসন্নমুখে নুন দিতে তাহার দোকানে উঠিল। বাঁড়ুয্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময়-বিরক্তির স্বরে কহিয়া উঠিলেন, তোরা সব হলি কি মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস দেখি? বলিয়া আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা নুন তুলিয়া ঠোঙ্গায় দিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। গাড়ু হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ঐ ত একই পথ—চল না বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।

চলুন, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু দোকানি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া করুণকণ্ঠে কহিল, বাঁড়ুয্যেমশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অমনি—

বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিল—হাঁ রে মধু, দুবেলা চোখাচোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটা-বেটির মতলবে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা আমার গলে গেল—আর এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল! কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস—দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে?

মধু এতটুকু হইয়া গিয়া অস্ফুটে বলিতে গেল, অনেক দিনের—

হলেই বা অনেক দিনের? এমন করে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না, বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার। দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি; তাই বলি—

রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুইমহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কিন্তু সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।

লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর যাই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি-বিনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসনগ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোটরকমের ইস্কুল মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র পড়ে। দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্নমেন্ট সাহায্য আছে, তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাহিতেছে না; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়াছিল তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে নাহয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে, উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং ঘরের খাইয়া বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেডমাস্টার মহাশয়কে বৈঠক-খানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাস্টার-পণ্ডিত চারিজন এবং তাহাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতি বৎসর মাইনার পরীক্ষায় পাস করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম, বিবরণ পাড়ুইমহাশয় মুখস্থের মত আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দুজন শিক্ষকের কোনমতে, ও গভর্নমেণ্টের সাহায্যে আর-একজনের সঙ্কুলান হয়; শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন-চারি মাস কাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবার করিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া সাত টাকা চারি আনার বেশি আদায় করিতে পারেন নাই।

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচ-ছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয় এবং এই পাঁচ-ছয়টা গ্রামময় তিন-মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র সাত টাকা চারি আনা আদায় হইয়াছে। রমেশ প্রশ্ন করিল, আপনার মাহিনা কত?

মাস্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পনের আনা। কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাস্টার তাহা বুঝাইয়া বলিল, আজ্ঞে গভর্নমেণ্টের হুকুম কিনা, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন—আমি মিথ্যে বলচি নে।

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না?

মাস্টার লজ্জিত হইল। কহিল, কি করব রমেশবাবু! বেণীবাবু এ কয়টি টাকাও দিতে নারাজ।

তিনি কর্তা বুঝি?

মাস্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, তিনিই সেক্রেটারী বটে; কিন্তু তিনি একটি পয়সাও কখনো খরচ করেন না। যদু মুখুয্যেমহাশয়ের কন্যা—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকিলে ইস্কুল অনেক দিন উঠিয়া যাইত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।

রমেশ কৌতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর একটি ভাই এ ইস্কুলে পড়ে না?

মাস্টার কহিল, যতীন ত? পড়ে বৈ কি।

রমেশ বলিল, আপনার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আজ আপনি যান, কাল আমি আপনাদের ওখানে যাব।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হেডমাস্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বিদায় হইল।

ছয়

বিশ্বেশ্বরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনই দশখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না; তাই সে গিয়া রমার মাসিকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে নাকি তক্ষক দাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসিটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়িয়া যে বিষ উদ্‌গীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসের দেহটা কাঠের নয় বলিয়াই হউক, কিংবা এ-কাল সে-কাল নয় বলিয়াই হউক, জ্বলিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশ্বেশ্বরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ, ইহা যে তাঁহার পুত্রের দ্বারাই

সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা কথার জবাব দিতে গেলেও এই স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বসিয়া ছিলেন।

তবে পাড়াগাঁয়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই! রমেশ শুনিতে পাইল। জ্যাঠাইমার জন্য তাহার প্রথম হইতেই বার বার মনের ভিতরে উৎকণ্ঠা ছিল এবং এই লইয়া মাতা-পুত্রে যে একটা কলহ হইবে সে আশঙ্কাও করিয়াছিল। কিন্তু বেণী যে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন করিয়া অপমান ও নির্যাতন করিবে এই কথাটা সহসা তাহার কাছে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে হইল এবং পরমুহূর্তেই তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, ও-বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে; কারণ, যে-লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে, তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাছ-বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না। কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। সেদিন দীনুর কাছে এবং কাল মাস্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারি একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দিকে পরিপূর্ণ মূঢ়তা ও সহস্র প্রকার কদর্য ক্ষুদ্রতার ভিতরে এক জ্যাঠাইমার হৃদয়টুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই মুখুয্যে-বাটীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাস—তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হোক,—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার এই ঘটনায় তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসি ও বোনঝিতে মিলিয়া যে অন্যায় করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু এই দুইটা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে তাহাও কোনমতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। মুখুয্যে ও ঘোষালদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্যদের বাটীর পিছনে 'গড়' বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। এক সময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল; ক্রমশঃ সংস্কার-অভাবে বুজিয়া গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না। কই, মাগুর প্রভৃতি যে-সকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু ছিল। ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল, ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, সরকারমশাই, লোক পাঠান নি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্ছে যে!

সরকার কলম কানে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে ধরাচ্ছে?

আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয্যেদের খোট্টা দরোয়ানটাও আছে দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগ্‌গির পাঠান।

গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না,—আমাদের বাবু মাছ-মাংস খান না।

ভৈরব কহিল, নাই খেলেন, কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত!

গোপাল বলিল, আমরা পাঁচজন ত চাই, বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন। কিন্তু রমেশবাবু একটু আলাদা ধরনের। বলিয়া ভৈরবের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া সহাস্যে একটুখানি শ্লেষ করিয়া কহিল, এ ত তুচ্ছ দুটো সিঙি-মাগুর মাছ আচায্যি-মশাই! সেদিন হাটের উত্তরদিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দু ঘরে ভাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কি করব বাবু? আমার রমেশবাবু আর মুখটা একবার তোলবারও ফুরসত পেলেন না। তারপর পীড়াপীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বললেন, কাঠ? তা আর কি তেঁতুলগাছ নেই? শোন কথা! বললুম, থাকবে না কেন। কিন্তু ন্যায্য অংশ ছেড়ে দেবেনই বা কেন, আর কে কোথায় এমন দেয়? রমেশবাবু বইখানা আবার মেলে

ধরে মিনিট-পাঁচেক চুপ করে থেকে বললেন, সে ঠিক। কিন্তু দুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া করা যায় না!

ভৈরব অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বলেন কি!

গোপাল সরকার মৃদু হাসিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া কহিল, বলি ভাল, আচায্যিমশাই, বলি ভাল! আমি সেই দিন থেকে বুঝেচি, আর মিছে কেন! ছোটতরফের মা-লক্ষ্মী তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্ধান হয়েছেন!

ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু পুকুরটা যে আমার বাড়ির পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।

গোপাল কহিল, বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দিবারাত্রি বই নিয়ে থাকলে, আর শরিকদের এত ভয় করলে কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়? যদু মুখুয্যের কন্যা—স্ত্রীলোক, সে পর্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে ডেকে নাকি সেদিন তামাশা করে বলেছিল, রমেশবাবুকে ব'লো, একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে। এর চেয়ে লজ্জা আর আছে? বলিয়া গোপাল রাগে-দুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বাটীতে স্ত্রীলোক নাই। সর্বত্রই অবারিতদ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙ্গা ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্তব্য-কর্মে উত্তেজিত করিবার জন্য সে সম্পত্তিরক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িবামাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া ঘুমন্ত বাঘের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, কি—রোজ রোজ চালাকি নাকি! ভজুয়া!

তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই চলাকিটা যে কাহার তাহা সে ঠাহর করিতেই পারিল না। ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অত্যন্ত বলবান এবং বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া হুকুম করিয়া দিল—সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেউ বাধা দেয় তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি না আনা সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার একপাটি দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে।

ভজুয়া ত এই চায়। সে তাহার তেলেপাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাঙ্গলাদেশের তেলে-জলে মানুষ; হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচিকে মোটে ভয় করে না। কিন্তু ঐ যে অতি দৃঢ়কায় বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথা কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে ভৈরবের তালু পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিক শুভানুধ্যায়ী, তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময় মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া সকার-বকার চীৎকার করিয়া দুটো কই-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত তাহার হইল না। গালি-গালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব যদি বা একটা হুঙ্কার দিলেন, ভৃত্যটা তাহার ঠোঁটটুকু পর্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক; ফৌজদারীতে জড়াইবার মত তাহার সাহসও নাই, সঙ্কল্পও ছিল না। মুহূর্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ড-হাতে ভজুয়া ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই ভৈরব অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—ওরে ভোজো, যাস্‌নে! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ একদণ্ডও বাঁচব না।

রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই। ভজুয়া অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, এ কথা ঢাকা থাকবে না বাবা। বেণীবাবুর কোপে পড়ে তাহলে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘরদোর পর্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষা করতে পারবে না।

রমেশ ঘাড় হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার

খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, কথাটা ঠিক বাবু।

রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুয়াকে তাহার নিজের কাজে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার আকারেই এই ভৈরব আচার্যের অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সাত

হাঁ রে যতীন, খেলা করছিস, ইস্কুলে যাবিনে?

আমাদের যে আজ কাল দু'দিন ছুটি দিদি!

মাসি শুনিতে পাইয়া কুৎসিত মুখ আরও বিশ্রী করিয়া বলিলেন, মুখপোড়া ইস্কুলের মাসের মধ্যে পনর দিন ছুটি! তুই তাই ওর পিছনে টাকা খরচ করিস্, আমি হ'লে আগুন ধরিয়ে দিতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। ষোল আনা মিথ্যাবাদিনী বলিয়া যাহারা মাসির অখ্যাতি প্রচার করিত তাহারা ভুল করিত। এমনি এক-আধটা সত্য কথা বলিতেও তিনি পারিতেন এবং আবশ্যক হইলে করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

রমা ছোটভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি কেন রে যতীন?

যতীন দিদির কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্চে যে! তারপর চুনকাম হবে--কত বই এসেচে, চার-পাঁচটা চেয়ার টেবিল, একটা আলমারি, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি?

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস কি রে!

হাঁ দিদি সত্যি। রমেশবাবু এসেচেন না--তিনি সব ক'রে দিচ্ছেন। বলিয়া বালক আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুমুখে মাসিকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া এই ছোট-ভাইটির মুখ হইতে সে রমেশের ইস্কুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই-এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া যান, তাহাও শুনিল! হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে যতীন, তোকে তিনি চিনতে পারেন?

বালক সগর্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ--

কি ব'লে তুই তাঁকে ডাকিস?

এইবার যতীন একটু মুশকিলে পড়িল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোর্দণ্ড-প্রতাপ হেডমাস্টার পর্যন্ত যেরূপ তটস্থ হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। ডাকা ত দূরের কথা--ভরসা করিয়া ইহারা কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিদির কাছে স্বীকার করাও ত সহজ নহে! ছেলেরা মাস্টারদিগকে 'ছোটবাবু' বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিল। তাই সে বুদ্ধি খরচ করিয়া কহিল, আমরা ছোটবাবু বলি। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। সে ভাইকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, ছোটবাবু কি রে! তিনি যে তোর দাদা হন। বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস্, এঁকে তেমনি ছোটদা বলে ডাকতে পারিস নে?

বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল--আমার দাদা হন তিনি? সত্যি বল্‌চ দিদি?

তাই ত হয় রে—বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখনি প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু ইস্কুল যে বন্ধ! এই দুটা দিন তাহাকে কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তবে যে-সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই বা সে থাকে কি করিয়া! সে আর একবার ছট্‌ফট্ করিয়া বলিল, এখন যাব দিদি?

এত বেলায় কোথায় যাবি রে? বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া

যতীন খানিকক্ষণ অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এমনি বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে যতীন? বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। বালক হইলেও সে তাহার দিদির কণ্ঠস্বরের কি-রকম একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে প্রাণতুল্য ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাস কখন প্রকাশ পাইত না!

যতীন প্রশ্ন করিল, ছোটদার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল, হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি করে তুমি জানলে?

প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে সে কিংবা গ্রামের আর কেহ কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই তাহাও নয়, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখা-পড়ার জন্য এই অত্যল্পকালের মধ্যেই এরূপ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূর্খ নয়।

যতীন এ লইয়া আর জিদ করিল না। কারণ, ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেই চট্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আচ্ছা দিদি, ছোটদা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না? বড়দা ত রোজ আসেন।

প্রশ্নটা ঠিক যেন একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ ব্যথার মত রমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তথাপি হাসিয়া কহিল, তুই তাকে ডেকে আনতে পারিস্‌ নে?

এখনই যাব দিদি? বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওরে, কি পাগলা ছেলে রে তুই, বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভয়-ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। খবরদার যতীন—কখ্‌খনো এমন কাজ করিস নে ভাই, কখ্‌খনো না। বলিয়া ভাইটিকে সে যেন প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতি দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিয়া যতীন বালক হইলেও এবার বড় বিস্ময়ে দিদির মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একে ত এমনধারা করিতে কখনও সে পূর্বে দেখে নাই, তা ছাড়া ছোটবাবুকে ছোটদাদা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অন্যপথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাঁহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। এমন সময়ে মাসির তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে আসিতেই রমা যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনতিকাল পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি বলি বুঝি রমা ঘাটে চান করতে গেছে' বলি একাদশী বলে কি এতটা বেলা পর্যন্ত মাথায় একটু তেল-জলও দিতে হবে না? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

রমা জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি যাও মাসি, আমি এখন যাচ্ছি।

যাবি আর কখন? বেরিয়ে দেখ্‌গে যা, বেণীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।

মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসির অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া তাহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের উপর মহা কোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা বড় ঝুড়ির প্রায় এক ঝুড়ি। ভাগ করিবার জন্য বেণী নিজেই হাজির হইয়াছেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই—কি মাছ পড়ল হে বেণী? বলিয়া লাঠি হাতে ধর্মদাস প্রবেশ করিল।

তেমন আর কৈ পড়ল! বলিয়া বেণী মুখখানা অপ্রসন্ন করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল, আর দেরি করচিস্‌ কেন রে? শীগ্‌গির করে দু ভাগ করে ফেল না।

জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কি হচ্চে গো রমা? অনেকদিন আসতে পারিনি। বলি, মায়ের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই, বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী বাড়ি ঢুকিলেন।

আসুন, বলিয়া রমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

এত ভিড় কিসের গো? বলিয়া গাঙ্গুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য হইয়া গেলেন—ব্যস! তাইত গা, মাছ বড় মন্দ ধরা পড়েনি দেখচি। বড় পুকুরে জাল দেওয়া হ'ল বুঝি?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহুল্য মনে করিয়া মৎস্য-বিভাগের প্রতি ঝুঁকিয়া রহিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা সমাধা হইয়া গেল। বেণী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকুই চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া ধীবরের প্রতি একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিল এবং মুখুয্যেদের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথার সমান উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে, একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এমনি দুশমনের মত যে, সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলে-বুড়া সবাই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবি গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কর্ত্রী বলিয়া চিনিল তাহা সেই জানে, দূর হইতে মস্ত একটা সেলাম করিয়া 'মা-জী' বলিয়া সম্বোধন করিল এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা যেমনই হোক, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙ্গা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দী-বাঙ্গলা মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশবাবুর ভৃত্য এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। রমা বিস্ময়ের প্রভাবেই হোক, বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক সহসা উত্তর দিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেণীর ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, এই যাও মাৎ।

চাকরটা ভয়ে চার পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। আধ-মিনিট পর্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই, তখন বেণী সাহস করিল, যেখানে ছিল সেইখান হইতে বলিল, কিসের ভাগ?

ভজুয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটা সেলাম দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, বাবুজী, আপকো নেহি পুছা।

মাসি অনেক দূরে রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝন্‌ঝন্ করিয়া বলিলেন, কি রে বাপু মারবি নাকি?

ভজুয়া একমুহূর্ত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণে তাহার ভাঙ্গা গলার ভয়ঙ্কর হাসিতে বাড়ি ভরিয়া উঠিল। খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু প্রায় লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, মা-জী? তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সম্ভ্রমের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুকান ছিল, রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, কি চায় তোর বাবু?

রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুয়া হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য সেই কর্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলো লোকের সুমুখে রমা হীন হইতেও পারে না। তাই কটুকণ্ঠে কহিল, তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল্‌গে যা, যা পারে তাই করুক গে।

বহুৎ আচ্ছা মা-জী। বলিয়া ভজুয়া তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেণীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেও প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহার ব্যবহারে বাড়িসুদ্ধ সকলেই যখন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া হিন্দি-বাঙ্গলায় মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্য ক্ষমা চাহিল এবং কহিল, মা-জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুরধার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন।

বাবুজী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু—বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বুকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয়ত পুকুর-ধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন; বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভজুয়া, যা, মা-জীকে জিজ্ঞেস করে আয় ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না, বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিসুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, বাবুজী বলিয়া দিলেন--আর যে যাই বলুক ভজুয়া, আমি নিশ্চয় জানি মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুটা বাত বার হবে না—সে কখনও পরের জিনিস ছোঁবে না, বলিযা সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবামাত্র বেণী মেয়েলি সরু গলায় আস্ফালন করিয়া কহিল, এমনি করে উনি বিষয় রক্ষে করবেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করছি, আমি আজ থেকে গড়ের একটা শামুক-গুগলিতেও ওকে হাত দিতে দেব না, বুঝলে না রমা, বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। মা-জীর মুখ হইতে কখনো ঝুটা বাত বাহির হইবে না—ভজুয়ার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝমাঝম শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল যেন কোথাও একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। শুদ্ধ এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আঁচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আট

জ্যাঠাইমা!

কে, রমেশ? আয় বাবা, ঘরে আয়। বলিয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। ঘরে পা দিয়াই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ, জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। তাহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত মনে হইল, ইহারা মাসিকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ত্রুটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জার মত নিভৃতে কাছে আসিয়াও বসে। এদিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাগমে রমারও অবস্থাসঙ্কট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এ গ্রামের মেয়ে তাই নয়, রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার-মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও লজ্জা করে, না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তা ছাড়া মাছ লইয়া এই যে সেদিন একটা কান্ড ঘটিয়া গেল। তাই সবদিক বাঁচাইয়া যতটা পারা যায় সে আড় হইয়া বসিয়াছিল। রমেশ আর সেদিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া ধীরে-সুস্থে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?

রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এলে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়!

জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয়ত শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে, উভয়েই বিস্মিত-ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

বালাই ষাট্! ওকি কথা বাপ। বলিয়া বিশ্বেশ্বরীর চোখ-দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল।

রমেশ শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বেশ্বরী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না—বাবা?

রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বার-দুই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্রই খারাপ হয়? তা নয়, শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ড টিঁকতে পাচ্ছিনে, সমস্ত প্রাণটা যেন আমার থেকে থেকে খাবি খেয়ে উঠচে।

শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তোর জন্মস্থান—এখানে টিঁকতে পারছিস নে কেন বল্ দেখি?

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আমি বলতে চাইনে। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জান।

বিশ্বেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সব না জানলেও কতক জানি বটে। কিন্তু সেই জন্যেই ত বলচি, তোর আর কোথায় গেলে চলবে না রমেশ।

রমেশ কহিল, কেন চলবে না জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চায় না।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, চায় না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ডাল-রুটি-খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্যে?

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। আজ কেন যে তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যে পথটা বরাবর স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আট-দশ বৎসর পূর্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে—প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতে সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্য সময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সন্তর্পণে ইহারা পার হয়, কিন্তু বর্ষাকালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটা বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙা তালের ডোঙা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহারা আছাড় খাইয়া, হাত-পা ভাঙিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টামাত্র করে নাই। মেরামত করিতে টাকা-কুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই টাকাটা রমেশ নিজে না দিয়া চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আট-দশদিন পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আট-দশটা পয়সা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসিবার সময় পথের ধারে সেকরাদের দোকানের ভিতরে এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কানে যাওয়ায় সে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, একটা পয়সা কেউ তোরা দিসনে। দেখছিস নে, ওর নিজের গরজটাই বেশি। জুতো পায়ে মস্‌মসিয়ে চলা চাই কিনা! না দিলেও আপনি সারিয়ে দেবে তা দেখিস! তা ছাড়া এতকাল যে ও ছিল না, আমাদের ইস্টিশান যাওয়া কি আটকে ছিল?

কে আর-একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুয্যেমশায় বলছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। খোশামোদ করে দুটো বাবু বাবু করতে পারলেই ব্যস।—তখন হইতে সারা সকালবেলাটা এই দুটো কথা তাহাকে যেন আগুন দিয়া পোড়াইতেছিল।

জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই ঘা দিলেন। বলিলেন, সে ভাঙনটা যে সারাবার চেষ্টা করছিলি তার কি হ'ল?

রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, সে হবে না জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, দেবে না বলে কি হবে না রে? তোর দাদামশায়ের ত তুই অনেক টাকা পেয়েচিস—এই ক'টা টাকা তুই ত নিজেই দিতে পারিস।

রমেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, কহিল, কেন দেব? আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ গাঁয়ের কারো জন্যে কিচ্ছু করতে নেই। রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল, এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে, ভাল করলে গরজ ঠাওরায়, ক্ষমা করাও মহাপাপ; ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল।

জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখ-মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ রাগ করিয়া কহিল, হাসলে যে জ্যাঠাইমা?

না হেসে করি কি বল্ ত বাছা? বলিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিস্ রমেশ, বল্ দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে? একটু থামিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েচেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক বাবা।

কিন্তু এরা যে আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তাই থেকেই কি বুঝতে পারিস নে বাবা, এরা তোর রাগ-অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখবি সমস্তই এক।

সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে আছ মা?—হ্যাঁ রমেশ, তোরা দু'ভাই-বোন কি কথাবার্তা বলিস নে?—না মা, সে ক'রো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা হয়ে গেছে সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দু'জন মনান্তর করে থাকলে ত কিছুতেই চলবে না।

রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনান্তর রাখতে চাইনে জ্যাঠাইমা! রমেশদা—

অকস্মাৎ তাহার মৃদুকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকো না, জ্যাঠাইমা! সেদিন কোন গতিকে ওঁর মাসির হাতে প্রাণে বেঁচেছ; আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তিনি বাড়ি ফিরবেন, বলিয়াই কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিলেন, যাসনে রমেশ, কথা শুনে যা।

রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, না জ্যাঠাইমা; যারা অহঙ্কারের স্পর্ধায় তোমাকে পর্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি ব'লো না বলিয়া তাহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই চলিয়া গেল।

বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসিকে শিখিয়ে দিই, না তার জন্য আমি দায়ী?

জ্যাঠাইমা তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, শিখিয়ে যে দাও না এ কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর জন্যে দায়ী তোমাকে কতকটা হতে হয় বৈ কি মা!

রমা অন্য হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজে অস্বীকার করিয়া বলিল, কেন দায়ী? কখ্খনো না। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি মিথ্যে দোষ দিয়ে অপমান করে গেলেন?

বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, সকলে ত ভেতরের কথা জানতে পারে না মা। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখনো নেই, এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি ত জান না মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েচি, তোমার ওপর ওর কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস; সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে দু'ঘরে যখন ভাগ করে নিলে, তখন ও কারো কথায় কান দেয়নি যে ওর তাতে অংশ ছিল। তাদের মুখের ওপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই—রমা যখন আছে তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি পাবই; সে কখনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি মা, এত বিবাদ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর ওর সেই বিশ্বাসই ছিল যদি না সেদিন গড়পুকুরের—

কথাটার মাঝখানেই বিশ্বেশ্বরী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আনত শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, আজ একটা কথা বলি

মা তোমাকে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই মা সেই জিনিসটিকে তোমরা চারিদিক থেকে ঘা মেরে নষ্ট করে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলচি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।

রমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। খানিক পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেলা গেল, আজ বাড়ি যাই জ্যাঠাইমা, বলিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

নয়

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ি পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার সমস্ত উত্তাপ যেন জল হইয়া গেল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল—এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কি কষ্টই না পাইতেছিলাম। বাস্তবিক, রাগ করি কাহার উপর? যাহারা এতই সংকীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বল-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছুই হইতে পারে না। তাহার মনে পড়িল, দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া কতবার ভাবিয়াছে—আমাদের বাঙ্গালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রাম-গুলিতে সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে, যাহা বহুজনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট সরল গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙ্গালীর সত্যকার ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায় রে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই! নগরের সজীব-চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে, তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই-সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মত রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আজিও সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই-সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে। অথচ সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতিধর্ম নাই বলিয়া শহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা অশ্রদ্ধারও অন্ত নাই।

রমেশ বাড়িতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটি এগার-বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া লিখিতেছিল; উঠিয়া আসিয়া কহিল, ছেলেটি দক্ষিণপাড়ার দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য এসেচে।

ভিক্ষার নাম শুনিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি শুধু ভিক্ষা দিতেই বাড়ি এসেছি সরকারমশাই? গ্রামে কি আর লোক নেই?

গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা বাবু! কিন্তু কর্তা ত কখনও কারুকে ফেরাতেন না, তাই দায়ে পড়লেই এই বাড়ির দিকেই লোকে ছুটে আসে।

ছেলেটির পানে চাহিয়া প্রৌঢ়াটিকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, হাঁ কামিনীর মা, এদের দোষও ত কম নয় বাছা! জ্যান্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত করে দিলে না, এখন মড়া যখন ওঠে না, তখন টাকার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছ! ঘরে ঘটিটা-বাটিটাও কি নেই বাপু?

কামিনীর মা জাতিতে সদ্‌গোপ, এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশেষ না হয় বাপু, গিয়ে দেখবে চল। আর কিছু থাকলেও কি মরা-বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি! চোখে না দেখলেও শুনেচ ত সব? এই ছ মাস ধরে আমার যথাসর্বস্ব এই জন্যই ঢেলে দিয়েচি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে! •

রমেশ এই ব্যাপারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল, এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্তী ছয়মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ শব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয়মাস কাল তাহার সর্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে: আর তাহারও কিছু নাই। সেজন্যে ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেলা ত প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, মড়া পড়েই থাকবে?

সরকার হাসিয়া কহিল, উপায় কি বাবু? অশাস্তর কাজ ত আর হতে পারে না! আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন—যা হোক, মড়া পড়ে থাকবে না: যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে—হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?

ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা কহিল, সিকিটি মুখুয্যেরা দিয়েচে, আর পয়সা চারিটি হালদারমশাই দিয়েচেন। কিন্তু যেমন করেই হোক ন'সিকের কমে ত হবে না! তাই, বাবু যদি—

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তোমরা বাড়ি যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে লোক পাঠিয়ে দিচ্চি। তাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত দুই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, এমন গরীব এ-গাঁয়ে আর কয় ঘর আছে জানেন আপনি?

সরকার কহিল, দু-তিন ঘর আছে, বেশি নেই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল বাবু, শুধু একটা চালতা গাছ নিয়ে মামলা করে দ্বারিক চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা, দু-ঘরই বছর-পাঁচেক আগে শেষ হয়ে গেল। গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, এতদূর গড়াত না বাবু, শুধু আমাদের বড়বাবু আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী দুজনকেই নাচিযে তুলে এতটা করে তুললেন।

তারপরে?

সরকার কহিল, তারপর আমাদের বড়বাবুর কাছেই দু-ঘরের গলা পর্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েচেন। হাঁ, চাষার মেয়ে বটে ওই কামিনীর মা। অসময়ে বামুনের যা করলে এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

রমেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর গোপাল সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে বলিল, তোমার আদেশই মাথায় তুলে নিলাম জ্যাঠাইমা! মরি এখানে সেও ঢের ভালো কিন্ত এ দুর্ভাগা গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।

দশ

মাস-তিনেক পরে একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুষ্করিণীটিকে দুধ-পুকুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে এমনি অভিভূত হইয়া অভদ্রভাবে তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কথা মনে হইল না। মেয়েটির বয়স বোধ করি কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে যে?

রমেশের বিস্ময়ের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাকে চেনেন?

মেয়েটি কহিল, চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন?

রমেশ কহিল, আজই ভোরবেলা। আমার মামার বাড়ি থেকে মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা আসেন নি।

এখানে কোথায় আছেন?

রমেশ কহিল, কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি। কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। যেখানে হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।

সঙ্গে চাকর আছে ত?

না, আমি একাই এসেছি।

বেশ যা হোক, বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দুজনের চোখাচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে বোধ করি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, তবে আমার সঙ্গেই আসুন; বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল, আমি যেতে পারি, কেননা, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়; কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। আপনার পরিচয় দিন।

তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পুজোটা সেরে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব, বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল। একি ভীষণ উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল; তাহার মুখ, গঠন, প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত রমেশের পরিচিত; অথচ বহুদিন-রুদ্ধ স্মৃতির কবাট কোনমতেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল না।

আধঘণ্টা পরে পূজা সারিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আসিল, রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল; কিন্তু তেমনই অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য প্রাকারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?

মেয়েটি উত্তর দিল, না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।

কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল, নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হ'ত। আমি রমা।

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া পান দিয়া বিশ্রামের জন্য নিজের হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া রমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সেই শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রমেশের মনে হইল, তাহার এই তেইশ বর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বিদেশে পরাশ্রয়ে কাটিয়াছে। খাওয়াটার মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোন অবস্থাতেই থাকিতে পারে ইহা সে জানিতই না। তাই আজিকার এই অচিন্তনীয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে মাধুর্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাহার আহারের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিতান্ত সাধারণ ভোজ্য ও পেয় দিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইয়াছে। এই জন্য তাহার বড় ভাবনা ছিল পাছে তাহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিন্দা হয়। হায় রে পর! হায় রে তাদের নিন্দা! খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা যে তাহার নিজের কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ববিধ দ্বিধা-সঙ্কোচ সজোরে ছিনাইয়া লইয়া, এই খাওয়ার জায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া আজ সে তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে! আজ ত কোন লজ্জার বাধাই তাহাকে দূরে রাখিতে পারিল না! এই আহার্যের স্বল্পতার ত্রুটি শুধু যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সুমুখে আসিয়া বসিল। আহার নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের

ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়েও কত বেশি, তাহা আর কেহ যদি না জানিল, যিনি সব জানেন তাঁহার কাছে ত গোপন রহিল না।

দিবানিদ্রা রমেশের অভ্যাস ছিল না। তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নব-বর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল। অর্ধনিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা না-আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মৃদুকণ্ঠ তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আজ যখন বাড়ি যাওয়া হবে না, তখন এইখানেই থাকুন।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু যাঁর বাড়ি তাঁকে এখনো ত দেখতে পেলাম না। তিনি না বললে থাকি কি করে?

রমা সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তর করিল, তিনি বলচেন থাকতে। এ বাড়ি আমার।

রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ স্থানে বাড়ি কেন?

রমা বলিল, এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই বটে, কিন্তু এমন সময় সময় হয় যে, পা বাড়াবার জায়গা থাকে না।

রমেশ কহিল, বেশ ত তেমন সময় নাই এলে?

রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তারকনাথ ঠাকুরের উপর বোধ করি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা বলিল, তেমন ভক্তি আর কৈ? কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত!

রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে আপনি কি খান?

রমেশ হাসিয়া কহিল, যা জোটে তাই খাই। আমার খেতে বসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

রমা কহিল, এত বৈরাগ্য কেন?

ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল, না। এ শুধু আলস্য।

কিন্তু পরের কাজে ত আপনার আলস্য দেখিনে?

রমেশ কহিল, তার কারণ আছে। পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাব-দিহিতে পড়তে হয়। নিজের কাজেও হ'তে হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয়।

রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন, কিন্তু যাদের নেই?

রমেশ বলিল, তাদের কথা জানিনে রমা। কেননা, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেবারও কোন ধরাবাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা না-থাকার হিসেব তিনিই জানেন যিনি ইহ-পরকালের ভার নিয়েচেন।

রমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু পরকালের চিন্তা করবার বয়স ত আপনার হয়নি। আপনি আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।

রমেশ হাসিয়া বলিল, তার মানে তোমার আরও হয়নি। ভগবান তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক, কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে আজই যে আমার শেষ দিন নয়, এ কথা কখনও মনে করিনে।

তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল, তাহা বোধ করি বৃথা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আপনাকে সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে ত দেখলুম না। মন্দিরের মধ্যে কি আছে না-আছে, তা নাহয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে বসে গণ্ডূষ করাটাও কি ভুলে যাচ্ছেন?

রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল, ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করিনে। কিন্তু এ কথা কেন?

রমা বলিল, পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশি কিনা, তাই জিজ্ঞেসা করচি।

রমেশ ইহার জবাব দিল না। তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। রমা

আস্তে আস্তে বলিল, দেখুন আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোনদিন কামনা করে না। বলিয়া আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি মরবার জন্যে যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি তা সত্যি নয় বটে, কিন্তু বেশিদিন বেঁচে থাকবার কথা মনে হলেও আমাদের ভয় হয়। কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও ত সে কথা খাটে না! আপনাকে জোর করে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা; কিন্তু সংসারে ঢুকে যখন পরের জন্যে মাথাব্যথা হওয়াটা নিজেরই নিতান্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হবে, তখন আমার এই কথাটি স্মরণ করবেন।

প্রত্যুত্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল,—আমি তোমাকে স্মরণ করেই বলচি, আজ আমার এ কথা কোনমতেই মনে হচ্চে না। আমি তোমার ত কেউ নই রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী বলে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার ত মনে হয় পরের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তারা পাগল হয়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা বসে চুপ করে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েচ। এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।

কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল, এ ভুলতে আপনার বেশি দিন লাগবে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ বলেই মনে পড়বে।

রমেশ কোনও উত্তর করিল না।

রমা কহিল, দেশে গিয়ে যে নিন্দে করবেন না এই আমার ভাগ্য।

রমেশ আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না রমা, নিন্দেও করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতির বাইরে।

রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এগার

দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্নবেলায় একটু ধরণ করিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারির হিসাবপত্র দেখিতেছিল; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটবাবু, এ যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।

রমেশ অবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কি?

চাষীরা কহিল, এক শ' বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। এক শ' বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তর ধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণ ধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু-শ' টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষীরা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে

এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে ত আর চলবে না, এখনি সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।

বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কোন্ বাঁধটা?

রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর ক'টা আছে বড়দা? না কাটলে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন।

বেণী কহিল, সেই সঙ্গে দু-তিন শ' টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা দেবে কে? চাষারা, না তুমি?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরীব, তারা দিতে ত পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেব সে ত বুঝতে পারিনে!

বেণী জবাব দিল, তা হলে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে ত আমি বুঝতে পারিনে!

হালদারের দিকে চাহিয়া বলিল, খুড়ো, এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দরোয়ান নেই? তার পায়ের নাগরাজুতো নেই? যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা কর গে; জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে। বলিয়া বেণী হালদারের সঙ্গে একযোগে হিঃ হিঃ করিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিল।

রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীত-ভাবে বলিল, ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু-শ' টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বেণী হাতটা উলটাইয়া বলিল, হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও ত দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্যে দু-দুশ' টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কি?

যেন ভারি হাসির কথা! বেণী একবার এপাশ একবার ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, থুথু ফেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিল, খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে চল, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধটুকরা উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়েচেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে! ওরা খাবে কি? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল,—আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম, তার মত হ'লে আপনার একার অমতে কিছু হবে না।

বেণীর মুখ গম্ভীর হইল; বলিল, বেশ, গিয়ে দেখ গে তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া, তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি ত ছেলেমানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে করে তবে ছেড়েছিল। কি বল খুড়ো?

খুড়োর মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না। বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসির সেই প্রথম দিনের নিষেধবাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা

ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। দু'জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল; সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে? তা ছাড়া বড়দার মত নেই।

নেই জানি। তাঁর একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, জল বার করে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ কহিল, অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তা হলে অনুমতি দিলে?

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

রমা মুখ তুলিয়াই বোধ করি রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল, তা ছাড়া, বিষয় আমার ভাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ কহিল, না, অর্ধেক তোমার।

রমা বলিল, শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে; তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা, এ ক'টা টাকা? তোমার অবস্থা এ দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্চি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিও না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, নাহয় তাই; ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই নাহয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

তাহার মৃদুস্বরে বিদ্রূপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি! চিরকাল ভেবেচি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে; কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি নীচ, অতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কি আমি?

রমেশ কহিল, তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি; পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর মুখে যা বেধেচে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি—কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কি করব, তাও এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনই জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা কর গে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা

কহিল, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে, কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না।

রমেশ প্রশ্ন করিল, কেন?

রমা কহিল, কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

তাহার মুখ যে কিরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ্য করিতে পারিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, একটু ভাবলেই তা টের পাবে। কিন্তু তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই। যাই হোক, বাগ্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চললুম।

মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ-সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই জলকাদায় সন্ধ্যার পর কোথায় যাস, রমা?

একবার বড়দার ওখানে যাব মাসি।

দাসী কহিল, পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। ছোটবাবু এমনি রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েচেন যে, সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরীব-দুঃখী সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেচে।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙ্গা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা গলায় অনুনয় করিতেছেন, কথা শোন আকবর, থানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল-বংশের ছেলে নই আমি। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা, তুমি একবার বল না, চুপ করে রইলে কেন?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, সাবাস! হাঁ—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই ত বলচি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার হিন্দুস্থানী চাকরটার?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

আকবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই 'বাপ্' করে বসে পড়ল, বড়বাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা; সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে এতবড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাকরান, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে

যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সমঝে দেখ্ রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক' সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদাল মারচে, ওদের মুন্ডু ক'টা ফাঁক করে দিয়ে যাই!

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা —তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে—

তাহারা তিন বাপ-বেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়বাবু, চোখে দেখ্‌লি জানতি পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

বেণী কহিল, নাহয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেন্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভাল করে আর একবার বুঝিয়ে বল না। এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, দিদিঠাক্‌রান, ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না? দিদিঠাক্‌রান, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাক্‌রান, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোঠ দেখাতে পারি না। ওঠ রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না। বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুনয়, বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড় অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়েও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল; ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়া ছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বার

ছেলেবেলায় একদিন রমেশ রমাকে ভালবাসিয়াছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষী ভালবাসা তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে যে কত গভীর সেদিন তারকেশ্বরে ইহা সে প্রথম অনুভব

করিয়াছিল এবং সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়াছিল যেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রমার সমস্ত সম্বন্ধ সে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তার পরে সেই নিদারুণ রাত্রির ঘটনার দিন হইতে রমার দিকটাই একেবারে রমেশের কাছে মহামরুর ন্যায় শূন্য ধূ-ধূ করিতেছিল। কিন্তু সে যে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম, শোয়া-বসা, এমন কি, চিন্তা-অধ্যয়ন পর্যন্ত এমন বিস্বাদ করিয়া দিবে, তাহা রমেশ কল্পনাও করে নাই। তাহাতে গৃহবিচ্ছেদ এবং সর্বব্যাপী অনাত্মীয়তায় প্রাণ যখন তাহার একমুহূর্ত আর গ্রামের মধ্যে তিষ্ঠিতে চাহিতেছিল না, তখন নিম্নলিখিত ঘটনায় সে আর একবার সোজা হইয়া বসিল।

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারি। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া রমেশের কাছে উপস্থিত হইল; এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিচ তাহারা তাঁহাদেরই প্রজা, তথাচ তাঁহাদের ছেলেপিলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাস্টারমহাশয়রা কোনমতেই তাহাদের ছেলেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল এমন অন্যায় অত্যাচার ত কখনও শুনিনি! তোমাদের ছেলেদের আজই নিয়ে এস, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্তি ক'রে দেব।

তাহারা জানাইল, যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিন্দুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না; কিন্তু এক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ, ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের স্কুল করিতে ইচ্ছা করে এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়। কলহ-বিবাদে রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল। ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কুঁয়াপুরের হিন্দুপ্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি কথায় বিবাদ করে না; করিলেও তাহারা প্রতি-হাত একনম্বর রুজু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচার-ফলই, সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যেভাবেই হোক, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র-অভদ্র কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোন দিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অবস্থা পাশাপাশি তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসা-দ্বেষের কারণ। অথচ মুসলমানমাত্রই ধর্ম সম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং হইতেও পারে না। আর জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমন কি, ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পল্লীগ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহ-বিবাদের লাঘব করিয়া সখ্য ও প্রীতি-সংস্থাপনে প্রযত্ন করাও পণ্ডশ্রম। সুতরাং এই কয়টা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্য যে বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সেজন্য তাহার অত্যন্ত অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল, ইহারা এমনি খাওয়াখায়ি করিয়াই চিরদিন কাটাইয়াছে এবং এমনি করিয়াই চিরদিন কাটাইতে বাধ্য। ইহাদের ভাল কোনদিন কোনমতেই হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা পাকা করিয়া লওয়া ত চাই!

নানা কারণে অনেকদিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে সেদিকে যায় নাই। আজ ভোরে উঠিয়া সে একেবারে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা তিনি নিজেও জানিতেন না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য হইয়াই দেখিল, জ্যাঠাইমা এত প্রত্যূষেই স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের মেঝেয় বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম

হইলেন না। বইখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত সকালেই যে রে?

রমেশ কহিল, অনেক দিন তোমাকে দেখতে পাইনি জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা স্কুল করচি।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, শুনেচি। কিন্তু আমাদের স্কুলে আর পড়াতে যাস্‌নে কেন বল্‌ ত?

রমেশ কহিল, সেই কথাই বলতে এসেচি জ্যাঠাইমা। এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রম। যারা কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, অভিমান অহঙ্কার যাদের এত বেশি, তাদের মধ্যে খেটে মরায় লাভ কিছুই নেই, শুধু মাঝ থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরং যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় সত্যিকার মঙ্গল হবে, আমি সেইখানেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা কহিলেন, এ কথা ত নতুন নয় রমেশ! পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে কেউ নিজের ওপর নিয়েচে চিরদিনই তার শত্রু-সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায় তুইও তাদের দলে গিয়ে যদি মিশিস্‌, তা হলে ত চলবে না বাবা! এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস?

রমেশ হাসিয়া কহিল, ঐ দ্যাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কানে উঠেচে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনি। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনে।

জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিস নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবি নে?

রমেশ কহিল, ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা। জাতিভেদ আছে তা মানি, কিন্তু একে ভাল বলে মানিনে।

কেন?

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন সে তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই? সমাজে যাকে ছোটজাত করে রাখা হয়েচে, সে যে বড়কে হিংসা করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে—সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করবার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সাংসারিক নিয়ম আছে, আমরা তাকেই স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছি। এই যে মানুষ গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলাফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হলে ভয় পেয়ে যেতে। মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টের পেতে! দেখতে পেতে কেমন করে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসচে এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেচে। তবু ত হিন্দুর হুঁশ হয় না!

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, তোর এত কথা শুনে এখনো ত আমার হুঁশ হচ্ছে না রমেশ! যারা তোদের মানুষ গুণে বেড়ায়, তারা যদি গুণে বলতে পারে, এতগুলো ছোট-জাত শুধুমাত্র ছোট থাকবার ভয়েই জাত দিয়েচে, তা হলে হয়ত আমার হুঁশ হতেও পারে। হিন্দু যে কমে আসচে সে কথা মানি; কিন্তু তার অন্য কারণ আছে। সেটাও সমাজের ত্রুটি নিশ্চয়; কিন্তু ছোটজাতের জাত দেওয়া-দেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট বলে কোন হিন্দুই কোনদিন জাত দেয় না।

রমেশ সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাই ত অনুমান করেন জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, অনুমানের বিরুদ্ধে ত তর্ক চলে না বাবা। কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে, অমুক গাঁয়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্যেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হলেও নাহয় পণ্ডিতের কথায় কান দিতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।

রমেশ তথাপি তর্ক করিয়া কহিল, কিন্তু যারা ছোটজাত তারা যে অন্যান্য বড় জাতকে হিংসা করে চলবে, এ ত আমার কাছে ঠিক কথা বলেই মনে হয় জ্যাঠাইমা!

রমেশের তীব্র উত্তেজনায় বিশ্বেশ্বরী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ঠিক কথা নয় বাবা, একটুকুও ঠিক কথা নয়। এ তোদের শহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড়, সেজন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোটভাই যেমন ছোট বলে বড়ভাইকে হিংসা করে না, দু-একবছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তাব মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্তও কায়েতের সমান হবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না। বড়ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোটভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমন কায়েতেও বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙ্গালীর যা মেরুদণ্ড—সেই পল্লীগ্রামে নয়।

রমেশ মনে মনে আশ্চর্য হইয়া কহিল, তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ও-গাঁয়ে ত এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন করে ত চেপে ধরে না। সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্যন্ত যায়নি, সে ত তুমি জান!

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আছে বৈ কি বাবা! প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েচিস শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে কেবলি বলি, তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাসনে।

প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, তুই বলবি মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশি। কিন্তু তাদের সজীব ধর্মই তাদের সব দিকে শুধরে রেখেচে। একটা কথা বলি রমেশ, পিরপুরে খবর নিলে শুনতে পাবি, জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে করে রেখেছে। সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না বলে। কিন্তু আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে। এ-সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্য; এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, নাহয় না দেবেন, কিন্তু পল্লী-সমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক হইয়া গেল, অন্যদিকে তাহার মন ইহাকেই স্থির-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী তাহা যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ফলটাকেও উপায় বলে ভুল করিস নে বাবা! যেজন্যে তোর মন থেকে সংশয় ঘুচতে চাইচে না, সেই জাতের ছোট-বড় নিয়ে মারামারি করাটা উন্নতির একটা লক্ষণ, কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হলেই নয়, মনে করে যদি তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে যাস, এদিক-ওদিক দুদিক নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কিনা যদি যাচাই করতে চাস রমেশ, শহরের কাছাকাছি দু-চারখানা গ্রাম ঘুরে এসে তাদের সঙ্গে তোর এই কুঁয়া-পুরকে মিলিয়ে দেখিস—আপনি টের পাবি।

কলিকাতার অতি নিকটবর্তী দু-একখানা গ্রামের সহিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চেহারাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পর্দা উঠিয়া গেল এবং গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া সে বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্বানুবৃত্তিরূপে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাসনে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে, তারা যদি তোর মতই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন

করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।

রমেশের রমার কথা মনে পড়িল। তাই আবার অভিমানের সুরে কহিল, দূরে সরে যেতে আমারও আর দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী এই সুরটা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু হেতু বুঝিলেন না। কহিলেন, না রমেশ, সে কিছুতেই হতে পারবে না! যদি এসেচিস, যদি কাজ শুরু করেচিস, মাঝপথে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু ত আমার একার নয়?

জ্যাঠাইমা উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, তোর একার বৈ কি বাবা, শুধু তোরই মা! দেখতে পাসনে, মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোনদিনই কিছু দাবি করেন নি। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পোঁছতে পারেনি, কিন্তু তুই আসবামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি।

রমেশ আর তর্ক করিল না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে বিশ্বেশ্বরীর পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্তব্যের একান্ত নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্বদিকে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইতে দেখিল রমার ছোটভাই যতীন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় আরক্তভাবে ডাকিতেছে, ছোড়দা!

রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাকচ যতীন?

আপনাকে।

আমাকে? আমাকে ছোড়দা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

দিদি।

দিদি? তিনি কি কিছু বলতে তোমাকে পাঠিয়েছেন?

যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে করে তোর ছোড়দার বাড়িতে নিয়ে চল—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল।

রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল, আজ আমার এ কি সৌভাগ্য! কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে, নিজে কষ্ট করে এলে কেন? এস, ঘরে এস।

রমা একবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর যতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, আজ একটা জিনিস ভিক্ষে চাইতে আপনার বাড়িতে এসেচি—বলুন, দেবেন? বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বরা অকস্মাৎ যেন উন্মাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার মনের মধ্যে যে-সকল সংকল্প আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপরূপ দীপ্তিতে নাচিয়া ফিরিতেছিল —সমস্তই একেবারে নিবিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তথাপি প্রশ্ন করিল, কি চাই বল?

তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল, আগে কথা দিন।

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, তা পারিনে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই যে ভেঙ্গে দিয়েছ রমা!

রমা আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমি!

রমেশ বলিল, তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কারুর ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্যকথা বলব! ইচ্ছা হয় বিশ্বাস ক'রো, না হয় ক'রো না। কিন্তু জিনিসটা যদি না

একেবারে মরে নিঃশেষ হয়ে যেত, হয়ত কোনদিনই এ কথা তোমাকে শোনাতে পারতাম না, বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া পুনরায় কহিল, আজ নাকি আর কোন-পক্ষেরই লেশমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, তাই আজ জানাচ্চি, তোমাকে অদেয় আমার সেদিন পর্যন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জান?

রমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু সমস্ত অন্তঃকরণটা তাহার কেমন একটা লজ্জাকর আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, কিন্তু শুনে রাগ ক'রো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেয়ো না। মনে ক'রো, এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র।

রমা মনে মনে প্রাণপণে বাধা দিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মাথা তাহার এমনি ঝুঁকিয়া পড়িল যে, কিছুতেই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। রমেশ তেমনি শান্ত, মৃদু ও নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিযা উঠিল, তোমাকে ভালবাসতাম রমা। আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি, ছেলেবেলায় মার মুখে শুনতাম আমাদের বিয়ে হবে। তারপর যেদিন সমস্ত আশা ভেঙ্গে গেল, সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার তা মনে পড়ে।

কথাগুলো জ্বলন্ত সীসাব মত রমার দুই কানেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল এবং একান্ত অপরিচিত অনুভূতির অসহ্য তীব্র বেদনায় তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু নিষেধ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত নিরুপায় পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রমা রমেশেব বিষাক্ত-মধুর কথাগুলো একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

রমেশ কহিতে লাগিল, তুমি ভাবচ তোমাকে এ-সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে, তখনো চুপ করে ছিলাম। কিন্তু সে চুপ করে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না, কহিল, তবে আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?

রমেশ কহিল, অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদেব কথা হচ্চে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই! যাই হোক, শোন। সেদিন আমার কেন জানিনে, অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন আমাকে ভালবাসতে আজও তা একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব। তার পরে সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি, বাইরে এত গোলমাল কিসের?

বাবু—

গোপাল সরকারের ত্রস্ত-ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরের বাহিরে আসিতেই সে কহিল, বাবু, পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেচে।

কেন?

গোপালের ভয়ে ঠোঁট কাঁপিতেছিল; কোনমতে কহিল, পরশু রাত্তিরে রাধানগরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, আর একমুহূর্ত থেক না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও; পুলিশ খানাতল্লাসি করতে ছাড়বে না।

রমা নীলবর্ণ-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার কোন ভয় নেই ত?

রমেশ কহিল, বলতে পারিনে। কতদূর কি দাঁড়িয়েচে সে ত এখনো জানিনে।

একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সেদিন তাহার নিজের অভিযোগ করা—তার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি যাব না।

রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্তকাল অবাক থাকিয়া বলিল, ছি,—এখানে থাকতে নেই রমা, শীগ্‌গির বেরিয়ে যাও, বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া যতীনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া এই দুটি ভাইবোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

তের

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতির আসামীর সঙ্গে ভজুয়া হাজতে। সেদিন খানাতল্লাশিতে রমেশের বাড়িতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং ভৈরব আচার্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে রাত্রে ভজুয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়ের পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, তথাপি তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই।

বেণী আসিয়া কহিল, রমা, অনেক চাল ভেবে তবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে কি শত্রুকে সহজে জব্দ করা যায়! সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি হাতে করে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল, সে কথা যদি না তুমি থানায় লিখিয়ে রাখতে, আজ কি তা হলে ঐ ব্যাটাকে এমন কায়দায় পাওয়া যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি আরও দুকথা বাড়িয়ে-গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস বোন,—আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলিনে।

রমা এমনি ম্লান হইয়া উঠিল যে বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল, না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয় তাতেই বা কি! জমিদারি করতে গেলে কিছুতেই হট্‌লে ত চলে না।

রমা কোন কথা কহিল না।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু তাকে ত সহজে ধরা চলে না! তবে সেও এবার কম চাল চালল না দিদি! এই যে নূতন একটা ইস্কুল করেচে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই তো মোছলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তা হলে জমিদারি থাকা না-থাকা সমান হবে, তা এখন থেকে বলে রাখচি।

জমিদারির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে রমা বরাবর বেণীর পরামর্শ মতই চলে; ইহাতে দুজনের কোন মতভেদ পর্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তর্ক করিল। কহিল, রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত এতে কম নয়!

বেণীর নিজেরও এ সম্বন্ধে খটকা অল্প ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহাই কহিল, কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়—আমরা দুজনে জব্দ হলেই ও খুশি। দেখচ না এসে পর্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? চারিদিকে ছোটলোকদের মধ্যে ছোটবাবু, ছোটবাবু, একটা রব উঠে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ, আমরা দু-ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশি দিন এ চলবে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া করে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ পর্যন্ত শেষ হতে হবে তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য হইয়াই লক্ষ্য করিল, সংবাদটা শুনাইয়া তাহার কাছে যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনা আশা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। বরঞ্চ মনে হইল, সে হঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেরেছেন?

বেণী কহিল, ঠিক জানিনে। কিন্তু জানতে পারবেই। ভজুয়ার মকদ্দমায় সব কথাই উঠবে।

রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে উঠিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সে-ই যে সকলের অগ্রণী, এই সংবাদটা আর রমেশের অগোচর রহিবে না। খানিক পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়দা?

বেণী কহিল, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, শুনচি ওর দেখাদেখি আরও পাঁচ-ছটা গ্রামে

স্কুল করবার, রাস্তা তৈরি করবার আয়োজন হচ্চে। আজকাল ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি করচে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা-দুটো ইস্কুল আছে বলেই ওদের এত উন্নতি। রমেশ প্রচার করে দিয়েচে, যেখানে নূতন স্কুল হবে, সেইখানেই ও দু-শ' করে টাকা দেবে। ওর দাদামশায়ের যত টাকা পেয়েচে সমস্তই ও এইতে ব্যয় করবে। মোচলমানেরা ত ওকে একটা পীর পয়গম্বর বলে ঠিক ক'রে বসে আছে।

রমার নিজের বুকের ভিতর এই কথাটা একবার বিদ্যুতের মত আলো করিয়া খেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না। সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচায্যি এবার ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি করে তার মেয়ের বিয়ে দেয়, সে আমি একবার ভাল করে দেখব! আরও একটা ফন্দি আছে, দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে! তার পর দেশে ডাকাতি ত লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত, তার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। সেই যে প্রথম দিনটিতেই তুমি বলেছিলে রমা, শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না, সে যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে তা আমিও মনে করিনি।

রমা কোন কথাই কহিল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী এমন বর্ণে বর্ণে সত্য হওয়ার বার্তা পাইয়াও যে নারীর মুখ অহঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, বরঞ্চ নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে যে তাহার কি অবস্থা, সে কথা বুঝিবার শক্তি বেণীর নাই। তা না থাকুক, কিন্তু জিনিসটা এতই স্পষ্ট যে কাহারই দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা ছিল না—তাহারও এড়াইল না। মনে মনে একটু বিস্ময়াপন্ন হইয়াই বেণী রান্নাঘরে যাইয়া মাসির সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, রমা হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আচ্ছা বড়দা, রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদের নিজেদের ভারি কলঙ্কের কথা নয়?

বেণী অধিকতর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

রমা কহিল, আমাদের আত্মীয়, আমরা যদি না বাঁচাই, সমস্ত লোক আমাদেরই ত ছি-ছি করবে।

বেণী জবাব দিল, যে যেমন কাজ করবে সে তার ফল ভুগবে, আমাদের কি?

রমা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু রমেশদা সত্যিই ত আর চুরি-ডাকাতি করে বেড়ান না, বরং পরের ভালর জন্যেই নিজের সর্বস্ব দিচ্চেন, সে কথা ত কারো কাছে চাপা থাকবে না। তার পর আমাদের নিজেদেরও ত গাঁয়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে।

বেণী হি-হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, তোর হ'ল কি বল ত বোন?

রমা এই লোকটার সঙ্গে রমেশের মুখখানা মনে মনে একবার দেখিয়া লইয়া আর যেন সোজা করিয়া মাথা তুলিতেই পারিল না। কহিল, গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে বলবেই; তুমি বলবে, আড়ালে রাজার মাকেও ডান বলে, কিন্তু ভগবান ত আছেন! নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না।

বেণী কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিল, হা রে আমার কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে! শীতলাঠাকুরের ঘরটা পড়ে যাচ্ছে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল, যারা তোমাদের পাঠিয়েচে তাদের বল গে, বাজে খরচ করবার টাকা আমার নেই। শোন কথা! এটা তার কাছে বাজে খরচ? আর কাজের খরচ হচ্ছে মোচলমানদের ইস্কুল করে দেওয়া। তা ছাড়া বামুনের ছেলে—সন্ধ্যে-আহ্নিক কিছু করে না। শুনি মোচলমানের হাতে জল পর্যন্ত খায়। দুপাতা ইংরাজী পড়ে আর কি তার জাতজন্ম আছে দিদি—কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা, সমস্তই তোলা আছে। সে একদিন সবাই দেখতে পাবে।

রমা আর বাদানুবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল বটে, কিন্তু রমেশের অনাচার এবং

ঠাকুর-দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়া মনটা তাহার আবার তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। বেণী নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া মেঝের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেদিন তাহার একাদশী। খাবার হাঙ্গামা নাই মনে করিয়া আজ যেন সে স্বস্তি-বোধ করিল।

চৌদ্দ

বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়াভীতি বাঙ্গলার পল্লী-জননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসব এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না। তিন দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কি না। এই তিন দিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হউক কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর মাসের পর মাস মানুষকে এই রোগভোগ করিতে দেয়, ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। কয়েকদিন পূর্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে; কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া এবং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহাব নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে এ-সকল তাহার নিজের কৃত নহে, বাপ-পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পাবে, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা এবং উদ্যম ব্যয় করিতে অপারগ। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিযায় উজাড় হইতেছে, অথচ আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু সুস্থ হইলেই এইরূপ একটা গ্রাম সে নিজেব চোখে গিয়া পরীক্ষা কবিয়া আসিবে এবং তাহার পরে নিজের কর্তব্য স্থির করিবে। কাবণ, তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল—এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল নিকাশের স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই, যাহা এমনিই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াও চেষ্টা কবিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে লোক দেখিতে পাইবে। অন্ততঃ তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পিরপুরের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন একটা মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু!

অকস্মাৎ কান্নার সুরে আহ্বান শুনিয়া বমেশ মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ভৈরব আচার্য ঘরেব মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার সাত-আট বৎসরের একটি কন্যা সঙ্গে আসিয়াছিল, বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক যে যেখানে ছিল, দোরগোড়ায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্বনাশ হইল, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে, কিছু যেন ঠাহর পাইল না। গোপাল সরকার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ভৈরবের একটা হাত ধরিযা টানিতেই ভৈরব উঠিয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া গোপালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ানক আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এই লোকটা অতি অল্পতেই মেয়েদের মত কাঁদিয়া ফেলে স্মরণ করিয়া রমেশ ক্রমশঃ যখন অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় গোপালের বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে ভৈরব অবশেষে চোখ মুছিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল এবং এই মহাশোকের হেতু বিবৃত

করিতে প্রস্তুত হইল। বিবরণ শুনিয়া রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এতবড় অত্যাচার কোথাও কোনকালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সে কল্পনা করিতেও পারিল না। ব্যাপারটা এই—ভৈরবের সাক্ষ্যে ভজুয়া নিষ্কৃতি পাইলে তাহাকে পুলিশের সন্দেহদৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে বেণীর খুড়-শ্বশুর রাধানগরের সনৎ মুখুয্যে ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগার-শ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং তাহার বাস্তুটা ক্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। যথারীতি সমন বাহির হইয়াছে; কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্যদিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে; অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইনমত সমস্ত মিথ্যা ঋণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না করিয়া কথাটি কহিবার জো নাই। মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে, তাহা জমা দিয়া এই মহা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে! সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে, অথচ সমস্তই যে বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কাজ তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই এবং এই অত্যাচারের যত বড় দুর্গতি ভৈরবের অদৃষ্টে ঘটুক, গ্রামের সকলেই চুপি চুপি জল্পনা করিয়া ফিরিবে, কিন্তু একটি লোকও মাথা উঁচু করিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিবে না, কারণ তাহারা কাহারো সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না এবং পরের কথায় কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না। সে যাই হোক, রমেশ কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসঙ্কোচে অত্যাচার করিবার সাহস ইহারা কোথায় পায় এবং কেমন করিয়া পায় এবং কেমন করিয়া দেশের আইনকেই ইহারা কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং অর্থবল এবং কূটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহা-দিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহতি দেয়, মৃতসমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহাদের দুষ্কৃতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই ইহারা সহস্র অন্যায় করিয়াও সত্যধর্মবিহীন মৃত পল্লী-সমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিরুপদ্রবে এবং যথেচ্ছাচারে বাস করে।

আজ তাহার জ্যাঠাইমার কথাগুলো বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন সেই যে তিনি মর্মান্তিক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, রমেশ, চুলোয় যাক গে তোদের জাতবিচারের ভাল-মন্দ ঝগড়াঝাঁটি; বাবা, শুধু আলো জেলে দে রে, শুধু আলো জেলে দে! গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা ধলো। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যদি ফিরেই এসেছিস বাবা, তবে চলে আর যাসনে। তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস বলেই তোদের পল্লীজননীর এই দুর্দশা। সত্যই ত! সে চলিয়া গেলে ত ইহার প্রতিকারের লেশমাত্র উপায় থাকিত না।

রমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, হায় রে, এই আমাদের গর্বের ধন—বাঙলার শুদ্ধ, শান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ পল্লী-সমাজ! একদিন হয়ত যখন ইহার প্রাণ ছিল, তখন দুষ্টের শাসন করিয়া আশ্রিত নরনারীকে সংসারযাত্রার পথে নির্বিঘ্নে বহন করিয়া চলিবারও ইহার শক্তি ছিল।

কিন্তু আজ ইহা মৃত; তথাপি অন্ধ পল্লীবাসীরা এই গুরুভার-বিকৃত শবদেহটাকে পরিত্যাগ না করিয়া মিথ্যা মমতায় রাত্রিদিন মাথায় বহিয়া বহিয়া এমন দিনের পর দিন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে না। যে বস্তু আর্তকে রক্ষা করে না, শুধু বিপন্ন করে, তাহাকেই সমাজ বলিয়া কল্পনা করার মহাপাপ তাহাদিগকে নিয়ত রসাতলের পথেই টানিয়া নামাইতেছে।

রমেশ আরও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সহসা যেন ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল, আপনি সমস্ত বিষয় নিজে ভাল করে জেনে টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন এবং যেমন করে হোক পুনর্বিচারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে আসবেন। এমন ভয়ংকর অত্যাচার করবার সাহস তাদের আর যেন কোন দিন না হয়।

চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকার ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। রমেশ পুনর্বার যখন নিজের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিল এবং সে যে তামাশা করিতেছে না তা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, তখন অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ন্যায় রমেশের দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া, চেঁচাইয়া, আশীর্বাদ করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রমেশের অপেক্ষা অল্প বলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সেদিন একটা কঠিন কাজ হইত। কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সকলেই বুঝিল বেণী এবং গোবিন্দ এবার সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না। ছোটবাবু যে তাঁহার চিরশত্রুকে হাতে পাইবার জন্যই এত টাকা হাতছাড়া করিয়াছে, তাহা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা কাহারও কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না যে, দুর্বল ভৈরবের পরিবর্তে ভগবান তাহারই মাথার উপর এই গভীর দুষ্কৃতির গুরুভার তুলিয়া দিলেন যে তাহা স্বচ্ছন্দে বহিতে পারিবে।

তারপর মাসখানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রমেশ এই একটা মাস তাহার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া এমনই উৎসাহের সহিত নানাস্থানে মাপ-জোপ করিয়া ফিরিতেছিল যে, আগামী কালই যে ভৈরবের মকদ্দমা তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ সে কথা মনে পড়িয়া গেল রোশনচৌকির সানায়ের সুরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া রমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্যের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন। অথচ সে ত কিছুই জানে না। শুনিতে পাইল, ভৈরব আয়োজন মন্দ করে নাই। গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু রমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কিনা সে খবর বাড়িতে কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাই নয়, তাহার স্মরণ হইল, এতবড় একটা মামলা ভৈরবের মাথার উপর আসন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতে আসে নাই! ব্যাপার কি? কিন্তু এমন কথা তাহার মনে উদয় হইয়াও হইল না যে, সংসারের সমস্ত লোকের মধ্যে ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারে। তাই নিজের এই অদ্ভুত আশংকায় নিজেই লজ্জিত হইয়া রমেশ তখনই একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া একেবারে সোজা আচার্য-বাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, বেড়ার ধারে দুই-তিনটা গ্রামের কুকুর জড় হইয়া এঁটো কলাপাত লইয়া বিবাদ করিতেছে এবং অনতিদূরে রোশনচৌকি-ওয়ালারা আগুন জ্বালাইয়া তামাক খাইতেছে এবং বাদ্যভাণ্ড উত্তপ্ত করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল উঠানে শতছিদ্রযুক্ত সামিয়ানা খাটানো এবং সমস্ত গ্রামেব সম্বল পাঁচ-ছয়টা কেরোসিনের বহু পুরাতন বাতি মুখুয্যে ও ঘোষালবাটী হইতে চাহিয়া আনিয়া জ্বালানো হইয়াছে। তাহারা অল্প-আলোক এবং অপর্যাপ্ত ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খাওয়ানো সমাধা হইয়া গিয়াছিল—বেশি লোক আর ছিল না। পাড়ার মুরুব্বিরা তখন যাই-যাই করিতে-ছিলেন এবং ধর্মদাস হরিহর রায়কে আরও একটুখানি বসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী একটুখানি সরিয়া বসিয়া কে একজন চাষার ছেলের সহিত নিরিবিলি আলাপে রত ছিলেন। এমনি সময়ে রমেশ দুঃস্বপ্নের মত একেবারে প্রাঙ্গণের বুকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেন একমুহূর্তে মসীবর্ণ হইয়া গেল, শত্রুপক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই বাটীতেই এমনভাবে যোগ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। খানিক পরে সে বাটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে—বলি গোবিন্দদা, বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝখানে যেন ভূত দেখিতে পাইল এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া বাটীর

ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুষ্কমুখে একাকী যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাহার মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পিছনে ডাক শুনিল, বাবা রমেশ!

ফিরিয়া দেখিল, দীনু হনহন করিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, চল বাবা, বাড়ি চল।

রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র।

চলিতে চলিতে দীনু বলিতে লাগিল, তুমি ওর যে উপকার করেচ বাবা, সে ওর বাপ-মা করত না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু উপায় ত নেই। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমাদের সকলকেরই ঘর করতে হয়; তাই তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে—বুঝলে না বাবা-- ভৈরবকেও নেহাত দোষ দেওয়া যায় না—তোমরা সব আজকালকার শহরের ছেলে—জাত-টাত তেমন ত কিছু মানতে চাও না—তাইতেই বুঝলে না বাবা—দুদিন পরে, ওর ছোটমেয়েটিও প্রায় বারো বছরের হ'ল ত—পার করতে হবে ত বাবা? আমাদের সমাজের কথা সবই জান বাবা—বুঝলে না বাবা—

রমেশ অধীরভাবে কহিল, আজ্ঞে হাঁ, বুঝেচি।

রমেশের বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দীনু খুশি হইয়া কহিলেন, বুঝবে বৈ কি বাবা, তোমরা ত আর অবুঝ নও। ও ব্রাহ্মণকেই বা দোষ দিই কি করে—আমাদের বুড়োমানুষের পরকালের চিন্তাটা—

আজ্ঞে হাঁ, সে ত ঠিক কথা; বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোকে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। নিজের ঘরের মধ্যে আসিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। আজ এইটা তাহার সবচেয়ে বেশি বাজিল যে, বেণী ও গোবিন্দকেই ভৈরব আজ সমাদরে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং গ্রামের লোক সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও ভৈরবের এই ব্যবহারটা শুধু মাপ করে নাই, সমাজের খাতিরে রমেশকে সে যে আহ্বান পর্যন্ত করে নাই, তাহার এই কাজটাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছে।

হা ভগবান! সে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ কৃতঘ্ন জাতের, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান তুমিই ক্ষমা করতে পারবে?

পনর

এমনি একটা আশঙ্কা যে রমেশের মাথায় একেবারে আসে নাই তাহা নহে। তথাপি পরদিন সন্ধ্যার সময়ে গোপাল সরকার সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্য সত্যই জানাইল যে, ভৈরব আচার্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁঠাল ভাঙিয়া ভক্ষণ করিয়াছে অর্থাৎ সে মকদ্দমায় হাজির হয় নাই এবং তাহা এক-তরফা হইয়া ডিসমিস হইয়া গিয়া তাহাদের প্রদত্ত জমা টাকাটা বেণী প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন একমুহূর্তেই রমেশের ক্রোধের শিখা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন ইহাদের জাল ও জুয়াচুরির দমন করিতে যে মিথ্যা ঋণ সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল, মহাপাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার দ্বারাই নিজের মাথা বাঁচাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই কৃতঘ্নতা কল্যকার অপমানকেও বহু ঊর্ধ্বে ছাপাইয়া আজ রমেশের মাথার ভিতরে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রমেশ যেমন ছিল তেমনি খাড়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। আত্মসংবরণের কথাটা তাহার মনেও হইল না। প্রভুর রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি কোথাও যাচ্চেন?

আসচি, বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভৈরবের বহির্বাটীতে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আচার্যগৃহিণী সন্ধ্যাদীপ-হাতে প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চমূলে আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ রমেশকে সম্মুখে দেখিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া গেলেন। সে কখনও আসে না, আজ কেন আসিয়াছে তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিল।

রমেশ তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল, আচায্যিমশাই কৈ?

গৃহিণী অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু বুঝা গেল তিনি ঘরে নাই। রমেশের গায়ে একটা জামা অবধি ছিল না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তাহার মুখও ভাল দেখা যাইতেছিল না। এমন সময়ে ভৈরবের বড়মেয়ে লক্ষ্মী ছেলে-কোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা?

তাহার জননী পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না।

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, বাবা, কে একটা লোক উঠানে এসে দাঁড়িয়েচে, কথা কয় না।

কে রে? বলিয়া সাড়া দিয়া তাহার পিতা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াতেও সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ চিনিতে তাহার বাকী রহিল না।

রমেশ কঠোরস্বরে ডাকিল—নেমে আসুন, বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বজ্র-মুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল, কেন এমন কাজ করলেন?

ভৈরব কাঁদিয়া উঠিল, মেরে ফেলল রে লক্ষ্মী, বেণীবাবুকে খবর দে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িসুদ্ধ ছেলেমেয়ে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সন্ধ্যার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বহুকণ্ঠের গগনভেদী কান্নার রোলে সমস্ত পাড়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া কহিল, চুপ! বলুন, কেন এ কাজ করলেন?

ভৈরব উত্তর দেবার চেষ্টামাত্র না করিয়া একভাবে চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিল এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা-হেঁচড়া করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং তামাশা দেখিতে আরও বহু লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিতে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রোধান্ধ রমেশ সেদিকে লক্ষ্যই করিল না। শতচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে উন্মত্তের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরঞ্জিত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই একবাড়ি লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল না যে, হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়। গোবিন্দ বাড়ি ঢুকিয়াই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। বেণী উঁকি মারিয়াই সরিতেছিল, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বড়বাবু—বড়বাবু—

বড়বাবু কিন্তু কর্ণপাতও করিল না চোখের নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল, পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, হয়েচে—এবার ছেড়ে দাও।

রমেশ তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, কেন?

রমা দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট-ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই!

রমেশ প্রাঙ্গণপূর্ণ লোকের পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, বাড়ি যাও।

রমেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল। কিন্তু সে চলিয়া গেলে রমার প্রতি তাহার এই নিরতিশয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি একরকম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এবং এমন জিনিসটার এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা পাড়ার লোকের কাহারই যেন মনঃপূত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙ্গুলী আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা আঙুল তুলিয়া মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধমরা করে দিয়ে গেল, এর কি করবে সেই পরামর্শ করো।

ভৈরব দুই-হাঁটু বুকের কাছে জড় করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল, নিরুপায়ভাবে বেণীর মুখপানে চাহিল। রমা তখনও যায় নাই। বেণীর অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি

কহিল, কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নেই বড়দা? তা ছাড়া হয়েচেই বা কি যে এই নিয়ে হৈ-চৈ করতে হবে।

বেণী ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কি রমা!

ভৈরবের বড় মেয়ে তখনও একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সে দলিতা ফণিনীর মত একেবারে গর্জাইয়া উঠিল, তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে গেলে কি করতে বল ত?

তাহার গর্জনে রমা প্রথমটা চমকিয়া গেল। সে যে পিতার মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞ নয়—তা নাহয় নাই হইল; কিন্তু তাহার তীব্রতার ভিতর হইতে এমন একটা কটু শ্লেষের ঝাঁজ আসিয়া রমার গায়ে লাগিল যে সে পরমুহূর্তেই জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাত লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা ক'রো না; কিন্তু আমি কারও হয়েই কোনও কথা বলিনি, ভালর জন্যেই বলেছিলাম।

লক্ষ্মী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ঝগড়ায় অপটু নহে। সে তাড়িয়া আসিয়া বলিল, বটে! ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের মেয়ে বলে কেউ ভয়ে কথা কয় না—নইলে কে না শুনেচে? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিত।

বেণী লক্ষ্মীকে একটা তাড়া দিয়া বলিল, তুই থাম না লক্ষ্মী! কাজ কি ও-সব কথায়?

লক্ষ্মী কহিল, কাজ নেই কেন? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হ'ল, তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন? বাবা যদি মারা যেতেন?

রমা নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল মাত্র। বেণীর কৃত্রিম ক্রোধের স্বর তাহাকে আবার প্রজ্বলিত করিয়া দিল। সে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিল, লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা; আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারত।

লক্ষ্মীও জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ওঃ, তাইতেই বুঝি তুমি মরেচ রমাদিদি?

রমা আর জবাব দিল না। তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বেণীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল ত বড়দা? বলিয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া বেণীর বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখিতে লাগিল।

বেণী ক্ষুব্ধভাবে বলিল, কি করে জানব বোন! লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

লোকে কি বলে?

বেণী পরম তাচ্ছিল্যভাবে কহিল, বললেই বা রমা, লোকের কথাতে ত আর গায়ে ফোসকা পড়ে না; বলুক না।

তাহার এই কপট সহানুভূতি রমা টের পাইল। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোসকা পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চামড়া নেই! কিন্তু লোককে এ কথা বলাচ্চে কে? তুমি?

আমি?

রমা ভিতরের দুর্নিবার ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্মই ত তোমার বাকী নেই—চুরি, জুয়াচুরি, জাল, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকী থাকে কেন?

বেণী হতবুদ্ধি হইয়া হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না।

রমা কহিল, মেয়েমানুষের এর বড় সর্বনাশ যে আর নেই, সে বোঝবার তোমার সাধ্য নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?

বেণী ভীত হইয়া বলিল, আমার লাভ কি হবে! লোকে যদি তোমাকে রমেশের বাড়ি থেকে ভোরবেলা বার হতে দেখে—আমি করব কি?

রমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, এত লোকের সামনে আমি আর বলতে চাইনে। কিন্তু তুমি মনে ক'রো না বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাইনি! কিন্তু এ নিশ্চয় জেনো—আমি মরবার আগে তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাব না।

আচার্যগৃহিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে কোথাও দাঁড়াইয়া ছিলেন; সরিয়া আসিয়া রমার একটা বাহু ধরিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, পাগল হয়েচ মা, এখানে তোমাকে না জানে কে? নিজের কন্যার উদ্দেশে বলিলেন, লক্ষ্মী, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের ন্যমে এ অপবাদ দিসনে রে, ধর্ম সইবেন না। আজ ইনি তোদের যে উপকার করেচেন, তোরা মানুষের মেয়ে হলে তা টের পেতিস, বলিয়া টানিয়া রমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। আচার্য-গৃহিণীর স্বামীর উদ্দেশে এই কঠোর শ্লেষ এবং নিরপেক্ষ সত্যবাদিতায় উপস্থিত সকলেই যেন কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া পড়িল।

এই ঘটনার কার্য-কারণ যত বড় এবং যাই হোক, নিজের কদাকার অসংযমে রমেশের শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এমনি সংকুচিত হইয়া রহিল যে, সে বাটীর বাহির হইতেই পারিল না। তথাপি এত লোকের মধ্য হইতে রমা যে স্বেচ্ছায় তাহার লজ্জার অংশ লইতে আসিয়াছিল, এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত লজ্জার কালোমেঘের গায়ে দিগন্ত-লুপ্ত অতি ঈষৎ বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ক্ষণে ক্ষণে যেন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল। তাই তাহার গ্লানির মধ্যেও পরিতৃপ্তির আনন্দ ছিল। এই দুঃখ ও সুখের বেদনা লইয়া সে যখন আরও কিছুদিন তাহার নির্জন গৃহের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের সংকল্প করিতেছিল, তখন তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাহিরে যে আর একজনের মাথার উপর নিরবচ্ছিন্ন লজ্জা ও অপমানের পাহাড় ভাঙিগয়া পড়িতেছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না। আজ বৈকালে পিরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। এ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূর্বে করিয়া আসিয়াছিল। সেই-মত তাহারা আজ একত্র হইয়া ছোটবাবুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে যাইবার জন্য উঠিতে হইল। কেন তাহা বলিতেছি।

রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই একফোঁটা জমি-জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সংগতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে-কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ মহাজনেরা প্রায় হিন্দু। রমেশ শহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া যাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়া ছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এই-সকল দুর্ভাগাদের মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সে কোমর বাঁধিয়া লাগিল। কিন্তু দুই-একটা কাজ করিয়াই ধাক্কা খাইয়া দেখিল যে, এই-সকল দরিদ্রদিগকে সে যতটা অসহায় ও কৃপাপাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র, নিরুপায় এবং অল্পবুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু বজ্জাতি-বুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয়। মিথ্যা বলিতে ইহারা অবোবদন হয় না এবং ফাঁকি দিতে জানে। প্রতিবেশীর স্ত্রী-কন্যার সম্বন্ধে সৌন্দর্য-চর্চার শখও মন্দ নাই। পুরুষের বিবাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার; অথচ নানা বয়সের বিধবায় প্রতি গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। তাই নৈতিক স্বাস্থ্যও অতিশয় দূষিত। সমাজ ইহাদিগের আছে—তাহার শাসনও কম নয়, কিন্তু পুলিশের সহিত চোরের যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ইহারা ঠিক সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া

রাখিয়াছে। অথচ সর্বসমেত ইহারা এমন পীড়িত, এত দুর্বল, এমন নিঃস্ব যে, রাগ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যা হয়, রমেশের অন্তরটা ঠিক তেমনি করিতেছিল বলিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় সে পিরপুরের নূতন ইস্কুলঘরে পঞ্চায়েত আহবান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ হইল সন্ধ্যার ঝাপসা ঘোর কাটিয়া গিয়া দশমীর জ্যোৎস্নায় জানালার বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের এদিক ওদিক ভরিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও যাই-যাই করিয়া বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময়ে রমা আসিয়া তাহার দোরগোড়ায় দাঁড়াইল। সে স্থানটায় আলো ছিল না, রমেশ বাটীর দাসী মনে করিয়া কহিল, কি চাও?

আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?

রমেশ চমকিয়া উঠিল—এ কি রমা? এমন সময় যে!

যে হেতু তাহাকে সন্ধ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু যেজন্য সে আসিয়াছিল, সে অনেক কথা। অথচ কি করিয়া যে আরম্ভ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমা স্থির হইয়া রহিল। রমেশও কথা কহিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমা প্রশ্ন করিল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?

ভাল নয়। আবার রোজ রাত্রেই জ্বর হচ্ছে।

তা হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ত ভাল হয়।

রমেশ হাসিয়া কহিল, ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি করে?

তাহার হাসি দেখিয়া রমা বিরক্ত হইল। কহিল, আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কি কাজ আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?

রমেশ পূর্বের মতই হাসিয়া জবাব দিল, নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলিনে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে, যা এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু সে ত তুমি বুঝবে না রমা।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকারমশাইকে বলে দিয়ে যান, আমি তাঁর কাজকর্ম দেখবো।

রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে? কিন্তু -

কিন্তু কি?

কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব কি?

রমা অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ কহিল, ই**রে পারে না, কিন্তু আপনি পারবেন।

তাহার দৃঢ়কণ্ঠের এই অভাবনীয় উক্তিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, ভাববার সময় নেই, আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাইলে বিপদ যে কি ঘটিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ভাল, তাই যদি যাই তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করনি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেচ! সে-সব কাণ্ড এত পুরানো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। বরং খুলে বল, আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চলে যেতে হয়ত রাজী হতেও পারি, বলিয়া সে যে-উত্তরের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহা পাইল না।

কতবড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহাও জানা গেল না; রমেশের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরূপ বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্যগোচর হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল, আচ্ছা খুলেই বলচি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ শুষ্ক হইয়া কহিল, এই? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা একটুখানি থামিয়া কহিল, না দিলে দুদিন পরে আমার মহামায়ার পুজোয় কেউ

আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না—আমার বার-ব্রত—এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা স্মরণমাত্র রমা শিহরিয়া উঠিল।

রমেশের আর না শুনিলেও চলিত, কিন্তু থাকিতে পারিল না। কহিল, তার পরে?

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, তারও পরে? না তুমি যাও—আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট ক'রো না; তুমি যাও—যাও এ দেশ থেকে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। ইতিপূর্বে যেখানে যে-কোন অবস্থায় হোক রমাকে দেখিলেই রমেশের বুকের রক্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে শত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজের অন্তরকে সহস্র কটূক্তি করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। হৃদয়ের এই নীরব বিরুদ্ধতায় সে দুঃখ পাইত, লজ্জা অনুভব করিত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া আজ এইমাত্র নিজের গৃহের মধ্যে সেই রমাকে অকস্মাৎ একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়া কল্যকার কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয়-চাঞ্চল্য একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। রমার শেষ কথায় এতদিন পরে আজ সেই হৃদয় স্থির হইল। রমার ভয়-ব্যাকুল নির্বন্ধতায় অখণ্ড স্বার্থপরতার চেহারা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহার অন্ধ হৃদয়েরও আজ চোখ খুলিয়া গেল।

রমেশ গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কারণ, আমার পালাবার হেতুটা যত বড়ই তোমার কাছে হোক, আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, আমাকে এখনই বার হতে হবে।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, আজ কি কোনমতেই যাওয়া হতে পারে না?

না। তোমার দাসী গেল কোথায়?

কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি কথা! এখানে একা এলে কোন্ সাহসে? একজন দাসী পর্যন্ত সঙ্গে করে আনোনি!

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, তাতেই বা কি হ'ত? সেও ত আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না!

তা না পারুক, লোকের মিথ্যা দুর্নাম থেকে ত বাঁচাতে পারত। রাত্রি কম হয়নি রাণী!

সেই বহুদিনের বিস্মৃত নাম! রমা সহসা বলিতে গেল, দুর্নামের বাকী নেই রমেশদা, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া শুধু কহিল, তাতেও ফল হ'ত না রমেশদা। অন্ধকার রাত্রি নয়—আমি বেশ যেতে পারব, বলিয়া আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ষোল

প্রতি বৎসর রমা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত। এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভুষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমন হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত যে, রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত ভাঁড়ে-পাতায় এঁটোতে-কাঁটাতে বাড়িতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, পিরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজসরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমীপূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে। আকাশে সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু মুখুয্যেবাড়ির মস্ত উঠান জনকয়েক ভদ্রলোক ব্যতীত একেবারে শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাড়ির ভিতরে অন্নের বিরাট স্তূপ ক্রমে জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঞ্জনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়িতে পা দিল না।

ইস্! এত আহার্য-পেয় নষ্ট করে দিচ্চে দেশের ছোটলোকের দল? এত বড় স্পর্ধা! বেণী হুঁকা হাতে একবার ভিতরে, একবার বাহিরে হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে

লাগিল—বেটাদের শেখাবো—চাল কেটে তুলে দেবো—এমন করবো, তেমন করবো, ইত্যাদি। গোবিন্দ, ধর্মদাস, হালদার প্রভৃতি এরা রুষ্টমুখে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কোন্ শালার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে! হিন্দু-মুসলমান একমত হইয়াছে, এও ত বড় আশ্চর্য! এদিকে অন্দরে মাসি ত একেবারে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছেন। সেও এক মহামারী ব্যাপার। এই তুমুল হাঙ্গামার মধ্যে শুধু একজন নীরব হইয়া আছে—সে নিজে রমা। একটি কথাও সে কাহারো বিরুদ্ধে কহে নাই, কাহাকেও দোষ দেয় নাই, একটা আক্ষেপ বা অভিযোগের কণামাত্রও এখন পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। একি সেই রমা? সে যে অতিশয় পীড়িত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিজে স্বীকার করে না—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। রোগে রূপ নষ্ট করে—সে যাক্। কিন্তু সে অভিমান নাই, সে রাগ নাই, সে জিদ নাই। ম্লান চোখ-দুটি যেন ব্যথায় ও করুণায় ভরা। একটু লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন ঐ দুটি সজল আবরণের নীচে রোদনের সমুদ্র চাপা দেওয়া আছে—মুক্তি পাইলে বিশ্ব-সংসার ভাসাইয়া দিতে পারে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া রমা প্রতিমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শুভানুধ্যায়ীর দল একেবারে তারস্বরে ছোটলোকের চৌদ্দপুরুষের নাম ধরিয়া গালি-গালাজ করিতে লাগিল। রমা শুনিয়া নিঃশব্দে একটুখানি হাসিল। বোঁটা হইতে টানিয়া ছিঁড়িলে মানুষের হাতের মধ্যে ফুল যেমন করিয়া হাসে—ঠিক তেমনি। তাহাতে রাগ-দ্বেষ, আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি সার্থক কি নিরর্থক তাহাই বা কে জানে!

বেণী রাগিয়া কহিল, না না, এ হাসির কথা নয়, এ বড় সর্বনেশে কথা। একবার যখন জানব এর মূলে কে,—বলিয়া দুই হাতের নখ এক করিয়া কহিল, তখন এই এমনি করে ছিঁড়ে ফেলব।

রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল, হারামজাদা ব্যাটারা এ বুঝিস নে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্, সেই রমেশ নিজে যে জেলে ঘানি টানচে! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে?

রমা কোন কথা কহিল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেড়-মাস হইল রমেশ অবৈধ প্রবেশ করিয়া, ভৈরবকে ছুরি মারার অপরাধে জেল খাটিতেছে। মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই—নূতন ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব কি করিয়া পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না সে বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সংশয় আছে। থানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরনের অপরাধ সে পূর্বেও করিয়াছে এবং আরও অনেক-প্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিশ যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সে কহিয়াছিল, রমেশ বাড়ি ঢুকিয়া আচার্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল, তাহা সে জানে। কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কি না জানে না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কি না, তাহাও স্মরণ হয় না।

কিন্তু এই কি সত্য? জেলার বিচারালয়ে হলফ করিয়া রমা এই সত্য বলিয়া আসিল; কিন্তু যে বিচারালয়ে হলফ করার প্রথা নাই, সেখানে সে কি জবাব দিবে! তাহার অপেক্ষা কে অধিক নিঃসংশয়ে জানিত, রমেশ ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার অস্ত্র থাকা ত দূরের কথা, একটা তৃণ পর্যন্ত ছিল না। সে আদালতে ও-কথা ত কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিবে না—সে কি স্মরণ করিতে পারে এবং কি পারে না! কিন্তু এখানকার আদালতে সত্য বলিবার যে তাহার এতটুকু পথ ছিল না! বেণী প্রভৃতির হাত-ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই। সুতরাং সত্যের মূল্যে তাহাকে যে মিথ্যা অপবাদের গাঢ় কালি নিজের মুখময় মাখিয়া

এই সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন ত অনেককেই হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তা ছাড়া এতবড় গুরুদণ্ডের কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। বড় জোর দু শ'-এক শ' জরিমানা হইবে ইহাই জানিত। বরঞ্চ বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হোক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক্। কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একেবারে ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সেই সময়ে রমা নিজে রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। পরেব মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল এবং কিছুতেই তাহাকে জেরা করিতে দেয় নাই এবং জেলের হুকুম হইয়া গেলে গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কহিয়াছিল, না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সারাজীবন কারারুদ্ধ করবার হুকুম দিলেও আমি আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। বোধ করি, জেল এর চেয়ে ভাল।

ভালই ত। তাহাদের চিরানুগত ভৈরব আচার্য মিথ্যা নালিশ করিয়া যখন তাহার ঋণ শোধ করিল এবং রমা সাক্ষ্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্মরণ করিতে পারিল না তাহার হাতে ছুরি ছিল কি না, তখন আপিল করিয়া মুক্তি চাহিবে সে কিসের জন্য! তাহার সেই দুর্জয় অভিমান বিরাট পাষাণখণ্ডের মত রমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে—কোথাও তাহাকে সে নড়াইয়া রাখিবার স্থান পাইতেছে না। সে কি গুরুভার! সে মিথ্যা বলিয়া আসে নাই, এ কৈফিয়ত তাহার অন্তর্যামী ত কোনমতেই মঞ্জুর করিল না! মিথ্যা বলে নাই বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশও করে নাই। সত্য-গোপনের অপরাধ যে এত বড়, সে যে এমন করিয়া তাহাকে অহরহ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, এ যদি সে একবারও জানিতে পারিত! রহিয়া রহিয়া তাহার কেবলই মনে পড়ে ভৈরবের যে অপরাধে রমেশ আত্মহারা হইয়াছিল, সে অপরাধ কত বড়! অথচ তাহার একটিমাত্র কথায় সে সমস্ত মার্জনা করিয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছাকে এমন করিয়া শিরোধার্য করিয়া কে কবে তাহাকে এত সম্মানিত করিয়াছিল! নিজের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া আজকাল একটা সত্যের সে যেন দেখা পাইতেছিল। যে সমাজের ভয়ে সে এতবড় গর্হিত কর্ম করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্রুর হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে? গোবিন্দের এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা কে না জানে? বেণীর সহিত তাহার সংস্রবের কথা গ্রামের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অথচ সমাজের আশ্রয়ে সে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আছে এবং সেই বেণীই সমাজপতি। তাহারই সামাজিক শৃঙ্খল সর্বাঙ্গে শতপাকে জড়াইয়া রাখাই চরম সার্থকতা! ইহাই হিন্দুয়ানী! কিন্তু যে ভৈরব এত অনর্থের মূল, রমা নিজের দিকে চাহিয়া তাহার উপরেও আর রাগ করিতে পারিল না। মেয়ে তাহার বারো বছরের হইয়াছে—অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে না পারিলে একঘরে হইতে হইবে এবং বাড়িসুদ্ধ লোকের জাত যাইবে। এ প্রমাদের আশঙ্কামাত্রেই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত-পা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সে নিজে তাহার এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে সমাজের ভয় কাটাইতে পারে নাই—গরীব ভৈরব কাটাইবে কি করিয়া! বেণীর বিরুদ্ধতা করা তাহার পক্ষে কি ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার, এ কথা ত কোনমতেই সে অস্বীকার করিতে পারে না।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরা বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকাডাকি, অনুনয়-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেণীবাবুর সামনে হাজির করিয়া দিল। বেণী গরম হইয়া কহিল, এত দেমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা করে মাথা গজিয়েচে রে!

সনাতন কহিল, দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদের থাকে না, ত আমাদের মত গরীবের!

কি বললি রে! বলিয়া হাঁক দিয়া বেণী ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেল; ইহারই সর্বস্ব

যেদিন বেণীর হাতে বাঁধা ছিল, তখনই এই সনাতন দুবেলা আসিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া যাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা!

গোবিন্দ রসান দিয়া কহিল, তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনি, বলি কেন বল্ ত রে?

বুড়ো একটুখানি হাসিয়া কহিল, আর বুকের পাটা! যা করবার সে ত আপনারা আমার করেচেন। সে যাক, কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্তই আর বামুনবাড়িতে পাত পাতবে না। এত পাপ যে মা বসুমতী কেমন করে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি, বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, একটু সাবধানে থাকো দিদিঠাকরুন, পিরপুরের মোচলমান ছোঁড়ারা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে তা ঐ মা দুর্গাই জানেন। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে, বলিয়া সে বেণীর দিকে চাহিল। চক্ষের নিমেষে বেণীর ক্রুদ্ধ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

সনাতন কহিতে লাগিল, ঠাকুরের সুমুখে মিথ্যে বলচি নে বড়বাবু, একটু সামলে-সুমলে থাকবেন। রাত-বিরেতে বার হবেন না—কে কোথায় ওত পেতে বসে থাকবে বলা যায় না ত!

বেণী কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার মত ভীতু লোক বোধ করি সংসারে ছিল না।

এতক্ষণে রমা কথা কহিল। স্নেহার্দ্র-করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের সব এত রাগ?

সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মিথ্যে বলে আর নরকে যাব কেন দিদিঠাকরুন, তাই বটে। মোচলমানদের রাগটাই সবচেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে হিঁদুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন আপনারা—জাফর আলি, আঙ্গুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেচে। শুনি মসজিদে তাঁর নাম করে নাকি নেমাজপড়া পর্যন্ত হয়।

রমার শুষ্ক ম্লান মুখখানি অব্যক্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বেণী অকস্মাৎ সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই তোকে দেবো, দু বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ বেণীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আর ক'টা দিন বা বাঁচব বড়বাবু! লোভে পড়ে যদি এ কাজ করি, মরলে আমাকে তোলা চুলোয় যাক, পা দিয়ে কেউ ছোঁবে না! সে দিনকাল আর নেই বড়বাবু, সে দিনকাল আর নেই! ছোট-বাবু সব উলটে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ কহিল, বামুনের কথা তা হলে রাখবি নে বল্?

সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল, না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু সেদিন পিরপুরের নতুন ইস্কুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছ-কতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি ত আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। যা ক'রে তুমি বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি দিদিঠাকরুন, তুমিই বল দেখি?

রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল। সনাতন উৎসাহিত হইয়া মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল, বিশেষ করে ছোঁড়াদের দল। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে এই দুটো গাঁয়ের যত ছোকরা সন্ধ্যের পর সবাই গিয়ে জোটে জাফর আলির বাড়িতে। তারা ত চারি-দিকে স্পষ্ট বলে বেড়াচ্চে, জমিদার ত ছোটবাবু। আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব—ভয় কারুকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে আমরাও যা, তারাও তাই।

বেণী আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, সনাতন, আমার ওপরেই তাদের এত রাগ কেন বলতে পারিস্?

সনাতন কহিল, রাগ ক'রো না বড়বাবু, কিন্তু আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকী নেই।

বেণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোটলোক সনাতনের মুখে এমন কথাটা শুনিয়াও সে রাগ করিল না, কারণ, রাগ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না—তাহার বুকের ভিতর টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছিল।

গোবিন্দ কহিল, তা হলে জাফরের বাড়িতেই আড্ডা বল্‌? সেখানে তারা কি করে বলতে পারিস্‌?

সনাতন তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিল। শেষে কহিল, কি করে জানিনে, কিন্তু ভাল চাও ত সে মতলব ক'রো না ঠাকুর! তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েচে—এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালতে যেও না ঠাকুর!

সনাতন চলিয়া গেল, বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও কথা কহিবার প্রবৃত্তি রহিল না। রমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতে বেণী বলিয়া উঠিল, ব্যাপার শুনলে রমা?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল, কহিল, শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি যদি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে, এ-সব কিছু হ'ত না। তুমি ত হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়, বলিয়া বেণী ভয়ে ক্রোধে জ্বালায় মুখখানা কি-একরকম করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু এতবড় নির্লজ্জ অভিযোগ সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল। বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া গোটা-দুই আলো এবং পাঁচ-ছয়জন লোক সঙ্গে করিয়া আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ত্রস্ত ভীতপদে প্রস্থান করিল।

সতর

বিশ্বেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আজ কেমন আছিস মা রমা?

রমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী তার শিয়রে আসিয়া বসিলেন এবং মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আজ তিনমাসকাল রমা শয্যাগত। বুক জুড়িয়া কাসি এবং ম্যালেরিয়ার বিষে সর্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ প্রাণপণে ইহার বৃথা চিকিৎসা করিয়া মরিতেছে। সে বুড়া ত জানে না কিসের অবিশ্রাম আক্রমণে তাহার সমস্ত স্নায়ুশিরা অহর্নিশি পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে। শুধু বিশ্বেশ্বরীর মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। রমাকে তিনি কন্যার মতই স্নেহ করিতেন, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না; তাই সে অত্যন্ত স্নেহই রমার সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ন করিয়া দিতেছিল। অপরে যখন ভুল বুঝিয়া, ভুল আশা করিয়া, ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাঁহার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিতেছিলেন, রমার চোখ-দুটি গভীর কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র। যেন বহুদূরের কিছু-একটা অত্যন্ত কাছে করিয়া দেখিবার একাগ্র বাসনায় এরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন, রমা?

কেন জ্যাঠাইমা?

আমি ত তোর মায়ের মত রমা—

রমা বাধা দিয়া বলিল, মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমি ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, তবে সত্যি করে বল দেখি মা, তোর কি হয়েছে?

অসুখ করেচে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

তখন গভীর স্নেহে তাহার রুক্ষ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, সে ত এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা! যা এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে এ সময় মায়ের কাছে লুকোস নে রমা! লুকোলে ত অসুখ সারবে না মা?

জানালার বাইরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই এবং মৃদুমন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, ভাল আছে। মাথার ঘা সারতে এখনও বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে পারবে।

রমার মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন, দুঃখ ক'রো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে, বলিয়া তিনি রমার মুখে বিস্ময়ের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন, ভাবচ, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বলচি? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েচি, কি আনন্দ বেশি পেয়েচি তা আমি বলতে পারিনে। কেননা, আমি জানি যারা অধর্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে, তা হলে সংসার ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোন আত্মীয়-বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তখন কি কেউ ছিল না?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, থাকবে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু সে ত খামকা মেরে বসেনি, নিজে জেলে যাবে ব'লে ঠিক করে তবে তেল বেচতে এসেছিল। তার নিজের রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাঁকের একঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—আর আঘাত করলে না। তা ছাড়া সে বলে গেছে এর পরেও বেণী সাবধান না হলে সে নিজে আর কখনো ফিরুক, না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, তার মানে আরও লোক পিছনে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ছোটলোকদের এত সাহস ত কোনদিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ তারা পেলে?

বিশ্বেশ্বরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে কি তুই নিজে জানিস নে মা, কে দেশের এই ছোটলোকদের বুক এমন করে ভরে দিয়ে গেছে? আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা! তাকে জোর করে নেবালেও সে আশেপাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়। সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুশি সেখানে থাক, বেণীর কথা মনে করে আমি কোনদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। কিন্তু বলা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরী যে জোর করিয়াই একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, তাহা রমা টের পাইল। তাই তাঁহার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বরী পুনশ্চ কহিলেন, রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে পালকিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি কারুকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পর্যন্ত পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি মা যে এক সন্তান বলে ধর্মের শাসন ত মায়ের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করচিনে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই যদি হয়, তবে রমেশদা কোন্ পাপে এ দুঃখ ভোগ করচেন? আমরা যা করে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেচি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, না মা, তা নেই। নেই বলেই বেণী আজ হাসপাতালে। আর তোমার—, বলিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। যে কথা তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা জোর করিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি জানিস মা, কোন কাজই কোনদিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি ক'রে করে, তা সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারল না, কেন একজনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

রমা নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া নীরবে নিঃশ্বাস ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী বলিতে লাগিলেন, এর থেকে আমারও চোখ ফুটেছে রমা, ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না। গোড়ার অনেকগুলো ছোট-বড় সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে আমাকে বলতে এসেছিল, জ্যাঠাইমা, আমার কাজ নেই এদের ভাল করে, আমি যেখান থেকে চলে এসেছি সেইখানেই চলে যাই। তখন আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, না রমেশ, কাজ যদি শুরু করেছিস বাবা, তবে ছেড়ে দিয়ে পালাস নে। আমার কথা সে ত কখনও ঠেলতে পারে না; তাই যেদিন তার জেলের হুকুম শুনতে পেলাম, সেদিন মনে হ'ল ঠিক যেন আমিই তাকে ধরে-বেঁধে এই শাস্তি দিলাম। কিন্তু তার পরে বেণীকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেদিন প্রথম টের পেলাম—না না, তারও জেল খাটবার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া ত জানিনি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিলতে হয় সকলের সঙ্গে, ভালতে-মন্দতে এক না হতে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা ত মনে ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলে না। কিন্তু সে ত আমার চোখে পড়ল না মা; আমি তাকে যেতেও দিলাম না, রাখতেও পারলাম না।

রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তাহা অনুমান করিয়া কহিলেন, না রমা, অনুতাপ আমি সেজন্য করিনে। কিন্তু তুইও শুনে রাগ করিস নে মা, এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোদের অধর্ম যত বড়ই হোক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড়-গলা করেই বলে যাচ্ছি।

রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু এতে তিনি কেন নেবে যাবেন জ্যাঠাইমা? আমাদের অন্যায় অধর্মের ফলে যত বড় যাতনাই তাঁকে ভোগ করতে হোক, আমাদের দুষ্কৃতি আমাদেরই নরকের অন্ধকূপে ঠেলে দেবে, তাঁকে স্পর্শ করবে কেন?

বিশ্বেশ্বরী ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, করবে বৈ কি মা। নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি নাই করে, এমন কি উলটে অপকারই করে, তাতেই বা কি এসে যায় মা, যদি না তার কৃতঘ্নতায় দাতাকে নাবিয়ে আনে! তুই বলচিস মা, কিন্তু তোদের কুঁয়াপুর রমেশকে কি আর তেমনটি পাবে? সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দান করে বেড়াত, ভৈরব তার সেই ডান হাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে।

তারপর একটু থামিয়া নিজেই বলিলেন, কিন্তু কে জানে! হয়ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙ্গা হাতটাই বোধ করি এবার তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে, বলিয়া তিনি গভীর একটা নিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধীরে ধীরে বড় করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা জ্যাঠাইমা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ডভোগ করানর শাস্তি কি?

বিশ্বেশ্বরী জানালার বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্যস্ত রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নিমীলিত দুই চোখের প্রান্ত বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া কহিলেন কিন্তু তোমার ত হাত ছিল না মা। মেয়েমানুষের এতবড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষেরা তোমার ওপর এই অত্যাচার

করেচে, সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদের। তোমাকে ত এর একটি কিছুই বইতে হবে না মা! বলিয়া তিনি তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার একটিমাত্র আশ্বাসেই রমার রুদ্ধ অশ্রু এইবার প্রস্রবণের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, কিন্তু তাঁরা যে তাঁর শত্রু। তাঁরা বলেন, শত্রুকে যেমন করে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। কিন্তু আমার ত সে কৈফিয়ত নেই জ্যাঠাইমা।

তোমারই বা কেন নেই মা? প্রশ্ন করিয়া তিনি দৃষ্টি আনত করিতেই অকস্মাৎ তাঁহার চোখের উপর যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। যে সংশয় মুখ ঢাকিয়া একদিন তাঁর মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিয়া বেড়াইত, সে যেন তাহার মুখোশ ফেলিয়া দিয়া একেবারে সোজা হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল। আজ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্বেশ্বরী বেদনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রমার হৃদয়ের ব্যথা আর তাঁহার অগোচর রহিল না।

রমা চোখ বুজিয়া ছিল, বিশ্বেশ্বরীর মুখের ভাব দেখিতে পাইল না। ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চকিত হইয়া তাহার মাথাটা একটুখানি নাড়িয়া দিয়া সাড়া দিলেন।

রমা কহিল, একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব জ্যাঠাইমা। পিরপুরের জাফর আলির বাড়িতে সন্ধ্যার পর গ্রামের ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদার কথামত সৎ আলোচনাই করত, বদমাইসের দল বলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মতলব চলছিল—আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিয়েচি। কারণ পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষা রাখত না।

শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী শিহরিয়া উঠিলেন—বলিস কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের এই উৎপাত বেণী মিছে করে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা কহিল, আমার মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া নীরবে রমার ললাট চুম্বন করিলেন। বলিলেন, তার মা হয়ে এ যদি না আমি মাপ করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্বাদ করি, এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার এই একটা সান্ত্বনা জ্যাঠাইমা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের চাষাভুষারা এবার ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেচে—তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসার আনন্দে তিনি আমার অপরাধ কি ভুলতে পারবেন না জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী কথা বলিতে পারিলেন না। শুধু তাঁহার চোখ হইতে একফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া রমার কপালের উপর পড়িল। তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রমা ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, কেন মা?

রমা কহিল, শুধু একটা জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম।

বিশ্বেশ্বরী আবার নত হইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

রমা কহিল, সেই জোরে আমি একটা দাবি তোমার কাছে রেখে যাব। আমি যখন আর থাকব না, তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমিও পেয়েচি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী উপুড় হইয়া পড়িয়া বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, চল মা আমরা কোন তীর্থে গিয়ে থাকি। যেখানে বেণী নেই, রমেশ নেই—যেখানে

চোখ তুল্‌লেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেখানেই যাই। আমি সব বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিন তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলে-পুড়ে সেখানে গেলে ত চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল, আমিও তেমনি ক'রেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।

আঠার

কারা-প্রাচীরের বাহিরে যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, বোধ করি উন্মত্ত বিকারেও ইহা রমেশের আশা করা সম্ভবপর ছিল না। ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়া সে জেলের বাহিরে পা দিয়াই দেখিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। স্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদর জড়াইয়া সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান। তাঁহার পশ্চাতে উভয়-বিদ্যালয়ের মাস্টার পণ্ডিত ও ছাত্রের দল, কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেণী সজোরে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় কহিল, রমেশ, ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান, এবার তা টের পেয়েছি। যদু মুখুয্যের মেয়ে যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত করে এমন শত্রুতা করবে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে ভালমতোই দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ, বাইরে এই ছটা মাস আমি যে তুষের আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। হেডমাস্টার পাড়ুইমহাশয় একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রমেশের পায়ের ধূলো মাথায় লইলেন। তাঁহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম করিবার ঘটায় সমস্ত পথটা যেন চষিয়া ফেলিতে লাগিল। বেণীর কান্না আর মানা মানিল না। অশ্রুগদগদকণ্ঠে কহিল, দাদার ওপর অভিমান রাখিস নে ভাই, বাড়ি চল্‌। মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন।

ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল; রমেশ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিল। বেণী সম্মুখের আসনে স্থান গ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া ফেলিলেন। ঘা শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন জাজ্বল্যমান। বেণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উলটাইয়া কহিলেন, কাকে আর দোষ দেব ভাই, আমার নিজের কর্মফল--আমারই পাপের শাস্তি! কিন্তু সে আর শুনে কি হবে? বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাস ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল, কিছু একটা হইয়াছেই। তাই সে কথা শুনিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু বেণী যেজন্য এই ভূমিকাটি করিল, তাহা ফাঁসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে কাটার পরে, সে আবার একটা নিঃশ্বাসের দ্বারা রমেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমার এই একটা জন্মগত দোষ যে কিছুতেই মনে এক মুখে আর করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়, কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হ'ল না।

রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বেণী কণ্ঠস্বর আরও মৃদু ও গম্ভীর করিয়া কহিতে লাগিল, আমার দোষের মধ্যে সেদিন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, এই সর্বনাশ আমাদের করলি! জেল হয়েছে শুনলে যে মা একেবারে প্রাণ-বিসর্জন করবেন! আমরা ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করি—যা করি, কিন্তু তবু ত সে আমার ভাই! তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মার্‌লি, মাকে মার্‌লি! কিন্তু নির্দোষীর ভগবান আছেন। বলিয়া সে গাড়ির বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার যেন নালিশ জানাইল।

রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু মন দিয়া শুনিতে লাগিল। বেণী একটু থামিয়া কহিল, রমেশ, রমার সে উগ্রমূর্তি মনে হলে এখনো হৃৎকম্প হয়, দাঁতে দাঁতে ঘষে বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি? মেয়েমানুষের এত দর্প সহ্য হ'ল না রমেশ! আমিও রেগে বলে ফেললাম, আচ্ছা ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে!

এতক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বেণীর কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা সে জানে না। কিন্তু ঠিক এই কথাটিই সে দেশে পা দিয়াই রমার মাসির মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

বেণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, খুন করা তার অভ্যাস আছে ত। আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি, বরঞ্চ তুমিই উলটে শিখিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমাকে দেখ্‌চ ত? এই ক্ষীণজীবী—বলিয়া বেণী একটু চিন্তা করিয়া লইয়া তুষ্টু কলুর ছেলের কল্পিত বিবরণ নিজের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনার ভাষায় ধীরে ধীরে গ্রথিত করিয়া বিবৃত করিল।

রমেশ রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পর?

বেণী মলিনমুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তার পরে কি আর মনে আছে ভাই! কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে, কিছুই জানিনে। দশ দিন পরে জ্ঞান হয়ে দেখলাম হাসপাতালে পড়ে আছি। এ-যাত্রা যে রক্ষে পেয়েচি সে কেবল মায়ের পুণ্যে—এমন মা কি আর আছে রমেশ!

রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না, কাঠের মূর্তির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু কেবল তাহার দশ অঙ্গুলি জড় হইয়া বজ্র-কঠিন মুঠায় পরিণত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার পরিমাণ করিবারও কাহারও সাধ্য রহিল না। বেণী যে কত মন্দ তাহা সে জানিত। তাহার অসাধ্য যে কিছুই নাই ইহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সংসারে কোন মানুষই যে এত অসত্য এমন অসঙ্কোচে এরূপ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই রমার সমস্ত অপরাধই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামময় যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাত্রি পর্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু গ্লানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা উবিয়া গেল। তাহার অবর্তমানে গ্রামের মধ্যে যে খুব বড় একটা সামাজিক স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই কয়টা মাসের মধ্যেই এতবড় পরিবর্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা ভাবিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেণীর প্রতিকূলতায় যে শক্তি পদে পদে প্রতিহত হইয়া কাজ করিতে পারিতেছিল না, অথচ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই এখন তাহার অনুকূলতায় দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বেণীকে সে আজ আরও একটু ভাল করিয়া চিনিল। এই লোকটাকে এরূপ অনিষ্টকারী জানিয়াও সমস্ত গ্রামের লোক যে তাহার কতদূর বাধ্য, তাহা আজ সে যেমন দেখিতে পাইল এমন কোন দিন নয়। ইহারই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রমেশ মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু তাই নয় রমেশের উপর অন্যায় অত্যাচারের জন্য গ্রামের সকলেই মর্মাহত, সে কথা একে একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমবেত সহানুভূতি লাভ করিয়া এবং বেণীকে সপক্ষে পাইয়া, আনন্দ উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্বে যে-সকল কাজ আরম্ভ করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, আবার পূর্ণোদ্যমে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সঙ্কল্প করিয়া রমেশ কিছু দিনের জন্য, নিজেও এই সকল আমোদ-আহ্লাদে গা ঢালিয়া দিয়া সর্বত্র ছোট-বড় সকল বাড়িতে সকলের কাছে সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সর্বপ্রযত্নে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতেছিল—তাহা রমার প্রসঙ্গ। সে পীড়িত তাহা পথে শুনিয়াছিল; কিন্তু সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ

গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল, শুধু একা রমাই যে তাহার সমস্ত দুঃখের মূল তাহা সবাই জানে। সুতরাং এইখানে বেণী যে মিথ্যা কথা কহে নাই তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে বেণী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল। পিরপুরের একটা বড় বিষয়ের অংশ-বিভাগ লইয়া বহুদিন হইতে রমার সহিত তাহার প্রচ্ছন্ন মনোবিবাদ ছিল, এই সুযোগে সেটা হস্তগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য।

বেণী বাহিরে যাই বলুক, সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত। এখন সে শয্যাগত, মামলা-মকদ্দমা করিতে পারিবে না; উপরন্তু তাহাদের মুসলমান প্রজারাও রমেশের কথা ঠেলিতে পারিবে না। পরে যাই হোক, আপাততঃ বে-দখল করিবার এমন অবসর আর মিলিবে না বলিয়া সে একেবারে জিদ ধরিয়া বসিল। রমেশ আশ্চর্য হইয়া অস্বীকার করিতেই বেণী বহু প্রকারের যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষে কহিল, হবে না কেন? বাগে পেয়ে সে কবে তোমাকে রেয়াৎ করেচে যে, তার অসুখের কথা তুমি ভাবতে যাচ্ছ? তোমাকে যখন সে জেলে দিয়েছিল, তখন তোমার অসুখই বা কোন্ কম ছিল ভাই!

কথাটা সত্য। রমেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। তবু কেন যে তাহার মন কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা করিতে চাহিল না—বেণীর সহস্র কটু উত্তেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায় পীড়িত অবস্থা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি সংকুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গেল; তাহার সুস্পষ্ট হেতু সে নিজেও খুঁজিয়া পাইল না! রমেশ চুপ করিয়া রহিল। বেণী কাজ হইতেছে জানিলে ধৈর্য ধরিতে জানে। সে তখনকার মত আর পীড়াপীড়ি না করিয়া চলিয়া গেল।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরীর কোন দিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা সে পূর্বেও জানিত, কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া সেই অনাসক্তিটা যেন বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেণীর সমভিব্যাহারে যেদিন সে-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন বিশ্বেশ্বরী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সজলকণ্ঠে বারংবার অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি যেন একটা তাহাতে ছিল, যাহাতে সে ব্যথাই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথায় কথায় শুনিল বিশ্বেশ্বরী কাশী-বাস সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিতেছেন, আর ফিরিবেন না; শুনিয়া সে চমকিয়া গেল। কৈ সে ত কিছুই জানে না! নানা কাজে পাঁচ-ছদিনের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু যেদিন হইয়াছিল সেদিন ত তিনি কোন কথা বলেন নাই! যদিচ সে জানিত, তিনি নিজে হইতে আপনার বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোন দিন ভালবাসেন না, কিন্তু আজিকার সংবাদটার সহিত সেদিনের স্মৃতিটা পাশাপাশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাঁহার এই একান্ত বৈরাগ্যের অর্থ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যাঠাইমা সত্যই বিদায় লইতেছেন। এ যে কি, তাঁহার অবিদ্যমানতা যে কি অভাব, মনে করিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন নটা-দশটা। ঘরে ঢুকিতে গিয়া দাসী জানাইল তিনি মুখুয্যেবাড়ি গেছেন।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এমন সময় যে?

এ দাসীটি বহুদিনের পুরানো। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, মার আবার সময়-অসময়। তা ছাড়া, আজ তাঁদের ছোটবাবুর পৈতে কিনা।

যতীনের উপনয়ন?

রমেশ আরও আশ্চর্য হইয়া কহিল, কৈ এ কথা ত কেউ জানে না?

দাসী কহিল, তাঁরা কাউকে বলেন নি। বললেও ত কেউ গিয়ে খাবে না—রমাদিদিকে কর্তারা সব একঘরে করে রেখেচেন কিনা।

রমেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দাসী সলজ্জে ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিল, কি জানি ছোটবাবু—রমাদিদির কি সব

বিশ্রী অখ্যাতি বেরিয়েচে কিনা—আমরা গরীব-দুঃখী মানুষ, সে সব জানিনে ছোটবাবু—বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। এ যে বেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল। কিন্তু ক্রোধ কি জন্য এবং কিসের প্রতিহিংসা কামনা করিয়া সে কোন্ বিশেষ কদর্য ধারায় রমার অখ্যাতিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এ-সকল ঠিকমত অনুমান করাও তাহার দ্বারা সম্ভবপর ছিল না।

উনিশ

সেইদিন অপরাহ্নে একটা অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ মতিলাল সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাপু?

বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল, মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন্ কম? আর হাকিম হুজুর যা কিছু তা আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকেই ত হয়ে থাকেন! কাল যদি আপনি সরকারী চাকরি নিয়ে হাকিম হয়ে বসে বিচার করে দেন, সেই বিচার ত আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে। তখন ত মানব না বললে চলবে না।

কথা শুনিয়া রমেশের বুক গর্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কৈলাস কহিল, আপনাকে আমরা দুজনেই দু'কথা বুঝিয়ে বলতে পারব; কিন্তু আদালতে সেটি হবে না। তা ছাড়া গাঁটের কড়ি মুঠো ভরে উকিলকে না দিতে পারলে সুবিধে কিছুতেই হয় না বাবু। এখানে একটি পয়সা খরচ নেই, উকিলকে খোসামোদ করতে হবে না, পথ হাঁটাহাঁটি করে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি যা হুকুম করবেন, ভাল হোক মন্দ হোক, আমরা তাতেই রাজী হয়ে আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ভগবান সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দুজনে তাই আদালত থেকে ফিরে এসে আপনার চরণেই শরণ নিলাম।

একটা ছোট নালা লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিল-পত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল রমেশের হাতে দিয়া কাল সকালে আসিবে বলিয়া উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সুদূর ভবিষ্যতেও সে কখনো এতবড় আশা মনে ঠাঁই দেয় নাই। তাহার মীমাংসা ইহারা পরে গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু আজ যে ইহারা সরকারী আদালতের বাহিরে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে পথ হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বুক ভরিয়া আনন্দস্রোত ছুটাইয়া দিল। যদিও বেশি কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি তুচ্ছ বিবাদের কথা, কিন্তু এই তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিত্তের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির জন্য ভবিষ্যতে সে কি না করিতে পারিবে তাহার কোথাও কোনো হিসাব-নিকাশ, কুল-কিনারা রহিল না। বাহিরে বসন্ত জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেদিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অন্য কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিত। কিন্তু আজ জ্বালা করা ত দূরের কথা, কোথাও সে একবিন্দু উত্তাপের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে এমন সার্থক করে তুলবেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হয়ে উঠবে, এ যদি তুমি জানতে রমা, বোধ করি কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না।—কে গা?

আমি রাধা, ছোটবাবু! রমাদিদি অতি অবিশ্যি করে একবার দেখা দিতে বলচেন।

রমা সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে। রমেশ অবাক হইয়া রহিল। আজ এ কোন্ নষ্টবুদ্ধি-দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাসৃষ্টি কৌতুক করিতেছেন!

দাসী কহিল, একবার দয়া করে যদি ছোটবাবু—

কোথায় তিনি?

ঘরে শুয়ে আছেন। একটু থামিয়া কহিল, কাল ত আর সময় হয়ে উঠবে না; তাই এখন যদি একবার—

আচ্ছা চল যাই, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। দাসীর নির্দেশমত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিতেই সে শুধুমাত্র যেন মনের জোরেই নিজেকে টানিয়া আনিয়া রমেশের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। ঘরের এককোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল; তাহারই মৃদু-আলোকে রমেশ অস্পষ্ট আকারে রমার যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার শারীরিক অবস্থার কিছু জানিতে পারিল না। এইমাত্র পথে আসিতে আসিতে সে যে রকম সঙ্কল্প মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্মুখে বসিয়া তাহার আগাগোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছ রাণী?

রমা তাহার পায়ের গোড়া হইতে একটুখানি সরিয়া বসিয়া কহিল, আমাকে আপনি রমা বলেই ডাক্‌বেন।

রমেশের পিঠে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। সে একমুহূর্তেই কঠিন হইয়া কহিল, বেশ, তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে—এখন কেমন আছ তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। নইলে নাম যাই হোক, সে ধ'রে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।

রমা সমস্ত বুঝিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন আমি ভাল আছি।

তার পরে কহিল, আমি ডেকে পাঠিয়েছি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েচেন, কিন্তু—

রমেশ কথার মাঝখানেই তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, না হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

কথাটা রমার বুকে যে কত বড় শেলাঘাত করিল তা রমেশ জানিতে পারিল না। সে মৌন-নতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। আমি তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেচি, সে ত আমি জানি। কিন্তু তবু আমি নিশ্চয়ই জানতাম, তুমি আসবে আর আমার এই শেষ অনুরোধও অস্বীকার করবে না।

অশ্রুভারে সহসা তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে রমেশ টের পাইল এবং চক্ষের নিমেষে তাহার পূর্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এত আঘাত-প্রতিঘাতেও সে স্নেহ যে আজিও মরে নাই, শুধু নির্জীব অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়া সে নিজেও আজ বিস্মিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, কি তোমার অনুরোধ?

রমা চকিতের মত মুখ তুলিয়াই আবার অবনত করিল। কহিল, যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্চেন, সেটা আমার নিজের, অর্থাৎ আমার পোনর আনা, তোমাদের এক আনা; সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ পুনর্বার উষ্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, তোমার ভয় নেই, আমি চুরি করতে পূর্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও—তার জন্যে অন্য লোক আছে—আমি দান গ্রহণ করিনে।

পূর্বে হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, মুখুযোদের দান গ্রহণ করায় ঘোষালদের অপমান হয় না। আজ কিন্তু এ কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল, আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্য নেবে না সে-ও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেচি, এটা তারই জরিমানা বলে কেন গ্রহণ কর না।

রমেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা কহিল, আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত করে মানুষ ক'রো। বড় হয়ে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

রমেশের চিত্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল! রমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যতীনের

দেহে তার পূর্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ করবার যে শক্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে আছে শেখালে হয়ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার কোন উত্তর দিল না—জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরটা এমন একটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, যাহার সহিত কোনদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটাব পরে রমেশ মুখ ফিরাইয়া কহিল, দেখ, এ-সকলের মধ্যে আর আমাকে টেন না। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের পর একটুখানি আলোর শিখা জ্বালতে পেরেচি; তাই আমার কেবল ভয় হয় পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা কহিল, আর ভয় নেই রমেশদা, তোমার এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূরে থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা-বিঘ্ন পেয়েচ। আমরা নিজেদের দুর্গতির ভারে তোমাকে নাবিয়ে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েচি। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচ বলেই তোমার ভয় হচ্চে; আগে হলে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাঁই পেত না। তখন তুমি গ্রাম্য-সমাজের অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার ম্লান হবে না—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সহসা জ্যাঠাইমার নামে রমেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; কহিল, ঠিক জানো কি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?

রমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, ঠিক জানি। যিনি সব জানেন এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আজ আশীর্বাদ করে আমাকে বিদায় দাও রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

বজ্রগর্ভ মেঘের মত রমেশের বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। রমা কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বল রাখবে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

রমা বলিল, আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন ঝগড়া ক'রো না।

রমেশ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে?

রমা কহিল, মানে যদি কখনও শুনতে পাও, সেদিন শুধু এই কথাটি মনে ক'রো, আমি কেমন ক'রে নিঃশব্দে সহ্য করে চ'লে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি করে জাগিয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই আছে; তাঁর এই উপদেশটি মনে রেখে আমি সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই কাটিয়ে উঠেচি—এটি তুমিও কোনদিন ভুলো না রমেশদা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা ক্ষণেক পরে কহিল, আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না মনে করে দুঃখ ক'রো না রমেশদা। আমি নিশ্চয়ই জানি, আজ যা কঠিন বলে মনে হ'চ্চে একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে, সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্লেশ নেই। কাল আমি যাচ্চি।

কাল! রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে কাল?

রমা কহিল, জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেইখানেই যাব।

রমেশ কহিল, কিন্তু তিনি ত আর ফিরে আসবেন না শুনচি।

রমা ধীরে ধীরে বলিল, আমিও না। আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্চি।

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা যাও। কিন্তু কেন বিদায় চাইচ সেও কি জানতে পারব না?

রমা মৌন হইয়া রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল, কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে

রেখে চলে গেলে সে তুমিই জানো। কিন্তু আমিও কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি. একদিন যেন তোমাকে সর্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

রমার দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই অত্যন্ত মৃদু-আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজকর্মের উৎসাহ যেন এক নিমেষে এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট ছায়াময় হইয়া গেছে।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ বাড়িতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বিশ্বেশ্বরী যাত্রা করিয়া পালকিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে মুখ লইয়া অশ্রুব্যাকুল-কণ্ঠে কহিল, কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী ডান হাত বাড়াইয়া রমেশের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা! তাতে কাজ নেই। তার পরে বলিলেন, এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলেপুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালাচ্চি রমেশ।

রমেশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথায় সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটার জননীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল এমন আর কোনদিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংসারে তার যে স্থান নেই বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্চি; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এতবড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন! এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরী একটু পরেই কহিলেন, কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ ক'রে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনও অবিশ্বাস করিস নে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর কেউ নেই।

রমেশ বলিতে গেল, কিন্তু জ্যাঠাইমা—

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই রমেশ। তুই যা শুনেচিস সব মিথ্যে, যা জেনেচিস সব ভুল। কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ যেন সমস্ত অন্যায়, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ক'রে চিরদিন এমনি প্রবল হয়ে বয়ে যেতে পারে, এই তোর ওপর তার শেষ অনুরোধ। এইজন্যই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করে গেছে। প্রাণ দিতে বসেচে রে রমেশ, তবু কথা কয়নি।

গতরাত্রে রমার নিজের মুখের দুই-একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্জয় রোদনের বেগ যেন ওষ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া ফেলিল, তাকে ব'লো জ্যাঠাইমা, তাই হবে। বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোনমতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শুভদা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসীতে জলপূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

ঘাটে আরো তিন-চারিজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরানীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পাড়াকুঁদুলি কৃষ্ণঠাকরুনকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপে প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা।

তাই বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দু বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকেই বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসিমা?

এই হারাণ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়া ডুবুচ্চেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝল হারাণ মুখুজ্যেদেব দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে। সেও দুঃখিতা হইল। প্রায় একমাস হইল হারাণের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই কথা মনে করিয়া বলিল, ভগবান কেড়ে নিলে মানুষের হাত কি? আর জন্ম-মৃত্যু কার ঘরে নেই বল!

প্রথমে কথাটার অর্থ কৃষ্ণঠাকুরানী ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, আহা, মাসখানেক হ'ল ছেলে মারা গেছে বটে! সেকথা নয় বিন্দু, সেকথা নয়; মরা-বাঁচা ভগবানের হাতই বটে, কিন্তু এটা—তুই বুঝি কিছু শুনিস নি মা?

বিন্দুবাসিনী কিছু বলিল না, কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পুনশ্চ বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের কথা বুঝি কিছু শুনিস নি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আবার কিসের কথা?

আহা! তাই ত বলছিলাম মা, ভগবান যখন মারেন তখন এমনি করেই মারেন। কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্য ত কষ্ট হয় না, কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার কথা মনে হ'লে। হতভাগী ড্যাক্‌রার হাতে পড়ে ত একদিনের তরেও সুখী হ'ল না।

বিন্দু যেমন মুখপানে চাহিয়াছিল তেমনি রহিল, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ঠাকুরানীরও এত কথা নিরর্থক বলা হয় নাই; যেজন্য তিনি মূল কথাটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডালপালা ছড়াইতে ছিলেন তাহা সমাধা হইল। ঘাটে যতগুলি শ্রোতা ছিল কাহারও বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রহিল না। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিল, হারাণ মুখুজ্যের এমন কি কথা হইতে পারে যাহা তাহারা জানে না, অথচ গ্রামের সকলেই জানে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিন্দু কহিল, পিসিমা, কথাটা কি শুনতে পাইনে?

পি। কেন পাবে না মা? কিন্তু এ ত আর সুখের কথা নয়—তাই বলতে ইচ্ছে করে না, যখনই মনে পড়ে তখনি যেন বুকের মাঝখানটা টনটন করে ওঠে। আহা, ভগবান অমন মেয়ের কপালেও এত কষ্ট লিখেছিলেন!

বি। কিসের কষ্ট?

পি। কষ্ট কি এক রকমের? কত রকমের কত কষ্ট কত যাতনা তা তোদের কি আর বলব?

বি। তবু শুনিই না পিসিমা?

পি। না এখন থাক। কিছুই চাপা থাকবে না, সকলেই শুনতে পাবে—পেয়েচেও। কিছু আগে আর কিছু পরে—তোরাও সবাই শুনতে পাবি।

বি। তুমিই বল না!

পি। না না, আর বলব না। পরের কথাতে আর থাকব না মনে করেচি।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, পিসিমা, আমরা কি তোমার পর? আমি জানি তুমি আমাকে বলবেই।

পি। বিন্দু, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কি তবে মিথ্যা কথা বলব?

বি। কিসের মিথ্যে কথা? মিথ্যা কথা কি তোমাকে বলতে বলেচি?

পি। তবে কেমন করে বলা হয়? এই যে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললাম, পরের কথায় আর থাকব না।

কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী চলিয়া গেলে সকলেই সকলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেহ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, বিশেষ ঠাকুরানীকে এ পর্যন্ত কেহ কখনো কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া যাইতে দেখে নাই। স্নান সমাপ্ত হইলে সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রস্থান করিল। বিন্দু বাটীতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মাতার নিকট আসিয়া বসিল।

তিনি বলিলেন, বিন্দু, এতক্ষণ ধরে কি জলে পড়ে থাকে মা, অসুখ হ'লে কি হবে বল দেখি?

বি। কি আর হবে,—দুদিন ভুগব।

বিন্দুর মাতা হাসিয়া বলিলেন, সোজা কথা, এর জন্যে আর ভাবনা কি!

বিন্দু বলিল, মা, হারাণ মুখুজ্যেদের আবার কি হয়েছে?

মা। কি আবার হবে?

বি। আজ ঘাটে কৃষ্ণপিসিমার কথার ভাবে বোধ হয় তাদের নূতন কিছু একটা ঘটেচে। তুমি কিছু শোননি?

মা। কিছুই না। কি বললে?

বি। বললে যে হারাণ মুখুজ্যেদের ভগবান মাথায় পা দিয়ে ডুবুচ্চেন, কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্যে ত কষ্ট হয় না—কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার জন্যে। এইটুকু বলে আর কিছু বললে না। বলে, পরের কথায় আর থাকব না।

মা। ঠাকরুনের এতদিনের পর ধর্মজ্ঞান জন্মেচে!

বি। মা, সত্যি তুমি কিছু জান না?

মা। কিছু না।

বি। তবে আজ আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে যাব।

মা। কেন? কি দুর্ঘটনা ঘটেচে জানবার জন্যে?

বি। হ্যাঁ—

মা। তুই কি পাগল হয়েছিস? যে কথায় উনি থাকতে চাইলেন না, সে কথাটা তুই জিজ্ঞাসা করতে যাবি?

বি। উনি কে?

বিন্দুর মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, এই কৃষ্ণঠাকরুন।

বি। কৃষ্ণঠাকরুন কি আদর্শ, যে উনি যা না করবেন তা আর কাউকে করতে নেই?

মা। এসব বিষয়ে তা একরকম আদর্শ বৈ কি।

বি। তা হোক, আমি যাব।

মা। পরের কথায় না হয় নাই থাকলে?

বি। আচ্ছা মা, একজন যদি ডুবতে থাকে, 'পরের কথায় কাজ নেই' বলে তাকে আর তুলতে নেই?

মা। তুই ত আর তুলতে যাচ্ছিসনে বিন্দু?

বি। কে ডুবচে জানলে যাব বৈ কি!

বিন্দুর জননী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, তোমার ওদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয়, তোমার বাপের সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে; তোমার কি ওদের বাড়ি যাওয়া ভাল দেখায়?

বি। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয় তা আমি জানি, কিন্তু আমি ত আর তার কাছে যাচ্চি নে। তার স্ত্রীর কাছে যেতে দোষ কি? বেশ বুঝতে পাচ্চি ওদের কিছু একটা হয়েছে: আমরা পাড়া-প্রতিবেশী হয়ে যদি এ সময় চোখ বুজে থাকি তা হ'লে শ্বশুরবাড়িতে আমার আর কেউ মুখ দেখবে না।

মা। অঘোরনাথ কি তোকে পাড়ায় পাড়ায় কার কি হ'ল না হ'ল দেখে বেড়াতে বলেচে যে, তুই ওদের বাড়ির সন্ধান না নিলে উনি আর তোর মুখ দেখবেন না? আর আমি তোর মা হয়ে বারণ কচ্চি সেটা কি শোনবার যোগ্য নয়?

বি। মা, আমাকে যেতেই হবে!

মা। গিয়ে কি শুনবে? হারাণ মুখুজ্যের কি হয়েচে তা বাড়ির কেউ জানে না।

বি। তুমি কি করে জানলে?

মা। তোমার বাপের কাছে শুনেছি।

বি। তবে কি হয়েছে বল।

মা। নন্দীদের তহবিল ভেঙ্গেচে বলে তারা হাজতে দিয়েছে।

বি। নন্দীরা কারা?

মা। বামুনপাড়ার জমিদার। তাদের কাছারিতে হারাণ মুখুজ্যে চাকরি করত।

বি। কত টাকা চুরি করেছে?

মা। প্রায় দু শ' টাকা।

বি। কেউ জামিন হয়নি?

মা। কে আর হবে বল? গাঁয়ে তোমার বাবাকেই সকলে জানে এবং তিনিই কেবল জামিন হতে পারেন কিন্তু তাঁকে ত সে পোড়া মিন্‌সে শত্রু করে রেখেচে। এঁকে একবার জামিন হতে বলেছিল, কিন্তু স্বীকার হননি।

বিন্দু অনেকক্ষণ মৌন হইয়া কি চিন্তা করিল, পরে বলিল, দুপুরবেলা একবার ওদের বাড়ি যাব। এসে পর্যন্ত বউকে একদিনও দেখিনি।

বিন্দুর মাতা বিস্মিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া বলিলেন, এত কথা শুনেও যাবি?

বিন্দু যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল, তাহাতে গৃহিণীর আর কথা কহা হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিন্দু পুনরায় কহিল, আমি ওদের বাড়ি গেলে কারও কোন ক্ষতি নাই। আমি এই বলি মা, পুরুষমানুষদের ঝগড়া মেয়েমহল পর্যন্ত না পেঁছুলেই ভাল।

বেলা হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন; যাইবার সময়ে বলিলেন, ইনি শুনলে বড় রাগ করবেন।

বি। যাতে না শুনতে পান এমনি করে যাব।

মা। নিশ্চয় শুনতে পাবেন।

বি। তুমি শোনালেই পাবেন।

মা। কিন্তু, শুনলে বড় রাগ করবেন।

বিন্দু অন্যমনস্কভাবে কহিল, বাপ-মা সন্তানের উপর রাগ করেন, আবার ভুলে যান, সেজন্য তুমি ভেব না মা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখোপাধ্যায় পরিবার

এ স্থানটার নাম হলুদপুর। গ্রামটি যে জেলায় তাহা আর বলিয়া কাহাকেও ক্লেশ দিতে চাহি না, কারণ এস্থানে কাহাকেও কখনও যাইতে হইবে না। এখানে দেখিবারও কিছু নাই, শুনিবারও কিছু নাই, তবে যদি নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া থাকেন ত আমার বিবরণ পড়িয়া যতটা পারেন উপলব্ধি কবিযা লউন।

শুনিয়াছি এ গ্রামে পূর্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবও, কারণ একে ত ইহা গঙ্গার উপরে স্থাপিত, তাহার উপর বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির বেতবন ও শ্যাকুল ঝোপের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িতভাবে মৌনব্রতধারী যোগী মূর্তির মত বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-একটা ঘাটবাঁধা পুষ্করিণীর মধ্যে গরুবাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও চোখে পড়ে। এই সকল দেখিয়া গ্রামের চিরদিন যে এমনি অবস্থায় কাটে নাই তাহা অনুমান হয়, কিন্তু এখন কেবল দশ-বিশ ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাটী, আর পঞ্চাশ-ষাট ঘর চাষাভুষার কুটীর আর জঙ্গল আর জঙ্গল, এবং তাহারই মধ্যে দিয়া কদাচিৎ দুই-এক ব্যক্তির যাতায়াতের পায়ে-হাঁটা পথ।

এই গ্রামেই শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। বাটীটি দ্বিতল—পুরাতন, ইষ্টক-নির্মিত। উপর তলায় দুটি এবং নিম্নে চারি-পাঁচটি ঘর। চতুর্দিকে একরাশ বাঁশ-ঝাড়, দুই-চারিটা কদলীবৃক্ষের ঝাড়, গোটা-দুই বেলগাছ, গোটা-দুই আমগাছ—একটা কতবেল গাছ—ইহাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটা ও পার্থিব সম্পত্তি।

হলুদপুরের অর্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীদের জমিদার-সরকারে মুখুজ্যে-মহাশয় চাকুরি করিতেন। কুড়িটি টাকা মাহিনা পাইতেন, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত, এখন কিন্তু আর তাহাতে কুলায় না—সর্বদা অনটন, সর্বদা অভাব।

বাটীতে তাঁহার পোষ্যবর্গও অনেকগুলি; স্ত্রী, দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা, এক বিধবা বড় ভগিনী অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর যাহা থাকে, তাঁহারও ছিল। যখন তিনি মাসে কুড়িটি মুদ্রা স্ত্রীর হাতে দিতেন, তখন তাঁহার সংসারে আজকালকার মত নিত্য দৈন্য নিত্য অভাব কেহই টের পায় নাই। স্ত্রী এবং বড়ভগিনী উভয়ে মিলিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইয়া যাইতেন, এখন তাহা করেনও না, সংসারের নিত্য অনটনও কিছুতেই ঘুচে না। আজ চাউল নাই, আজ দাইল নাই, আজ কাষ্ঠ অভাবে রন্ধন হইতেছে না, নিত্য এ-নাই, ও-নাই, তা নাই-এ পড়িয়া মুখুজ্যেমহাশয় অসৎ উপায় উদ্ভাবন করিলেন অর্থাৎ সরকারি তহবিলের কিছু অংশ আপনার ব্যয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী হারাণবাবুকে প্রথমে কেহ সন্দেহ পর্যন্ত করিল না, কিন্তু এ উপায় অধিক দিন চলে না; ক্রমশঃ জমিদারের সন্দেহ হইতে লাগিল; সন্দেহ যখন গাঢ়তর হইয়া উঠিল তখন তিনি একদিন সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে চাহিলেন; খাতায় অনেক ভুল, অনেক গোলমাল প্রকাশ পাইল ও সঙ্গে সঙ্গে চুরিও ধরা পড়িল। হারাণবাবু এযাবৎ বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; জমিদার শ্রীভগবান নন্দী দয়ালু এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হারাণবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, কত টাকা চুরি করিয়াছ?

তাহা জানি না।

জানি না? খাতাপত্র দেখিয়া বোধ হয় তিন হাজারের উপরও চুরি করিয়াছ—এত টাকা কি করিলে?

খরচ করিয়াছি।

খরচ ত করিয়াছ, কিন্তু চুরি করিলে কেন?

কুড়ি টাকায় আমার চলে না, কাজেই চুরি করিতে হয়।

কুড়ি টাকায় তোমার এতদিন চলিয়াছে, এখন না চলিবার কোন কারণ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না; যা হোক, তাই বা আমাকে বল নাই কেন যে, তোমার কুড়ি টাকায়

সংসার চলে না।

বলিলে কি আমাকে বেশি টাকা দিতেন?

হয়ত দিতাম. কিন্তু সেকথা যাউক; যা লইয়াছ তাহার অর্ধেক আমাকে ফিরাইয়া দিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।

কেমন করিয়া দিব. আমার কিছুই নাই।

তোমার কোন জমিজিরাত থাকে ত বিক্রয় করিয়া দাও।

জমিজিরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে. তাহাই বিক্রয় করে লউন।

তোমার স্ত্রী-পুত্র থাকিবে কোথায়?

গাছতলায়।

ভগবানবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া হারাণ মুখুজ্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার চক্ষু অত রাঙা কেন?

কেমন করিয়া জানিব?

তখন হারাণ মুখুজ্যেকে বিদায় দিয়া অন্য একজন আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের বাটীর সংবাদ লইতে পার?

কি সংবাদ লইব?

এইরকম যে ওদের সাংসারিক অবস্থা কেমন. কেমন সম্পত্তি আছে. কোনরূপ দেনাকর্জ আছে কি না—এই সব।

এই লোকটি হারাণবাবুর অনেক কথা জানিত। সে বলিল. আমি যতদূর জানি, মুখুজ্যেমশায়ের সংসারের অবস্থা ভাল নহে. সম্পত্তিও বোধ হয় কিছুই নাই—তবে দেনাকর্জ আছে কি না. বলিতে পারি না।

ভাল করিয়া সংবাদ লইয়া আমাকে জানাইও।

দুইদিন পরে সে বাবুকে জানাইল যে. সাংসারিক অবস্থা যতদূর মন্দ হওয়া সম্ভব মুখুজ্যেমশায়ের তাহা হইয়াছে. অন্যান্য সংবাদ পূর্বে যাহা বিদিত করিয়াছিল. সমস্তই সত্য।

ভগবানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন. মুখুজ্যে কোনরূপ নেশাটেশা করে কি?

আজ্ঞা হাঁ, গাঁজা খান।

তাই সেদিন চোখ অত রক্তবর্ণ দেখিয়াছিলাম; আনুষঙ্গিক আর কোন দোষ আছে কি?

আমলা নতমুখে বলিল. শুনেতে পাই আছে।

তবে এক কাজ কর—কাল কোর্টে গিয়া চুরির অপবাদে মুখুজ্যের নামে নালিশ করিয়া দিও—পুলিসকেও সংবাদ পাঠাইয়া দাও।

পরিশেষে ফল এই দাঁড়াইল যে. মুখুজ্যে মহাশয়কে পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে যাইতে হইল।

নিকট হইলেও হলুদপুরে একথা প্রায় কেহই জানিতে পারিল না; তবে বিন্দুর পিতা ভবতারণ গাঙ্গুলী একথা জানিলেন; বোধ হয় নন্দীরাই তাঁহাকে এ ঘটনা জানাইয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত ও বর্ধিষ্ণু লোক. ইচ্ছা করিলে হারাণ মুখুজ্যেকে অনায়াসে হাজতমুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। সহায়-সম্বলহীন মুখুজ্যেমহাশয় হাজত-গৃহেই পচিতে লাগিলেন। আর এক কথা—কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী এ ঘটনা যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিলেন. তাহা শুধু তিনিই বলিতে পারেন।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এইসময় হারাণবাবুর বাটীর রন্ধনশালার বারান্দায় তাঁহার স্ত্রী ও বড়কন্যা ললনা মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুজনেরই মুখ শুষ্ক. আজ একাদশী—ললনা বালবিধবা; আর তাহার জননী—তিনিও এখন-পর্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই।

ললনা বলিল, মা. আজো বোধ হয় বাবা আসবেন না। মেঘ করে আসছে, যদি জল হয় তাহলে রান্নাঘরে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না; তুমি কেন একটু কিছু খেয়ে নাও না।

ললনার জননী বলিল. আরও একটু দেখি. তিনদিন আসেন নি—আজ যদি আসেন।

মা. বাবা এমনতর ত কখন করেন নি; তিনদিন আসেন নি—আজ যদি না আসেন?

কি করব বল, ভগবান আছেন!

একাদশীর দিন রাসমণি (হারাণবাবুর বড় ভগিনী) বেলা করিয়া স্নান পূজা করিতেন; এখন নিত্যকর্ম সমাপ্ত করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, বৌ, এখন পর্যন্ত খাসনি?

বৌ বিমর্ষভাবে কহিল, আরও একটু দেখ্‌চি।

আমার পিন্ডি—আরও একটু দেখে কি হবে? ড্যাক্‌রা আজ এত বেলায় কি আর আসবে? দেখগে যা—গাঁজা খেয়ে ভোঁ হয়ে কোন মাগীর বাড়ি পড়ে আছে। উপবাস করিলে রাসমণির মেজাজটা একটু খিটখিটে রকমের হইয়া পড়িত; কেহ কোন কথা কহিল না দেখিয়া আরো একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, মুখপোড়া কবে মরবে যে আমাদের হাড় জুড়োবে।

এবার ললনার আর সহিল না। দুঃখিতভাবে বলিল, পিসিমা, একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন?

একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন? কথাটা রাসমণির ভিতরে গিয়া পৌঁছুছিল। অন্তরে ব্যথা পাইলেন এবং রীতিমত লজ্জিত হইলেন; কিন্তু ছোট ললনা যে একথা বলিয়াছে ইহাতেই দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেলেন। তুই সেদিনকার মেয়ে, বুড়োমাগীকে একাদশী-দ্বাদশী শেখাতে আসিস নে। তোরই বাপ হয়, আমার কি কেউ হয় না? বলিতে বলিতে রাসমণির নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল—বাছা আমার তিনদিন বাড়ি আসেনি—বুকের ভিতর যে কি কচ্চে তা ইষ্টিদেবতাই জানতে পাচ্চেন। অঞ্চল দিয়া একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া, আমি বুড়োমানুষ, যদি একটি কথা বলি তাহলে তোরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিস।—কাজ নেই মা, আমি তোদের কোন কথায় আর থাকব না। তবে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌটা মরে যায়, তাই দুকথা বলতে হয়।

ললনা অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহার একটা কথায় এত গভীর অর্থ এবং আনুষঙ্গিক ক্রন্দনাদির কারণ ঘটিতে পারে সে নিজেই জানিত না। —পিসিমা আমার ঘাট হয়েচে, এমন কথা আমি আর বলব না। বাস্তবিক কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। তাহার জননীও বলিলেন, মা, বড় হয়েছ, সব কথা বুঝে বলতে পার না?

তাহার পর সকলের পীড়াপীড়িতে ললনার জননী কিঞ্চিৎ আহার করিলে, বিন্দুবাসিনী আপনার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া হারাণবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই রাসমণি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, বিন্দু এদিকে আর আসে না।

বিন্দু অপ্রতিভ হইবার লোক নহে; সেও সহাস্যে বলিল, তুমিই কোন্ আমাদের ওদিকে যাও দিদি?

যাবার কি আর জো আছে বোন, ছোটছেলেটার ব্যারাম নিয়ে এক-পাও কোথাও নড়বার সাধ্যি নেই।

কি হয়েছে তার?

জ্বর, পিলে, পেটের অসুখ—কিছুই আর বাকি নেই।

বৌ কোথায়?

এই এতক্ষণে মুখে দুটো ভাত দিয়ে ওঘরে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসেচে।

এত বেলা হ'ল কেন?

হারাণের পথ চেয়ে, সে ত তিনদিন থেকে আর বাড়ি আসেনি। যদি আসে, আরো একটু দেখি—এই রকম করে এতটা বেলা হয়ে গেল।

বিন্দু সেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া যে ঘরে বৌ তাহার পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র মাধবের শিয়রে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতেছিল সেইখানে প্রবেশ করিল। মাধব হারাণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, সে আজ একবৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহায় পীড়িত, শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে। পীড়া তাহার এমন কিছু কঠিন নহে; রীতিমত চিকিৎসা হইতে পাইলে এতদিন আরোগ্য হইয়া যাইত, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুতেই সুচিকিৎসা হইতে পাইতেছে না। সামান্য টোটকা ঔষধ, পাঁচন ও কুইনাইনের

উপর ভর করিয়া সে কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারিতেছে না। শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু দুটি জননীর মুখের পানে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, মা, বাবা আজ তিন-চারদিন আমাকে দেখতে আসেন নি কেন?

তিনি এখানে নেই।

কোথায় গিয়েচেন মা?

জননী অল্প ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমার ওষুধ আনতে গেছেন।

বালক প্রফুল্ল হইয়া বলিল, মিষ্টি ওষুধ যেন আনেন, তেতো ওষুধ আমি আর খেতে পারিনে। দেখ মা, ভাল হয়ে আমার আগেকার মত আবার বেড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আগ্রহে আবার বলিয়া উঠিল, মা, আমি ভাল হব ত?

জননীর চক্ষে জল আসিতেছিল; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, জগদীশ্বরের মনে কি আছে তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিন্দু তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিল—কেন ভাল হবে না বাবা? আমি কাছে থেকে তোমাকে সারিয়ে দোব।

মাধব কিংবা তাহার জননী কেহই এ পর্যন্ত বিন্দুর আগমন লক্ষ্য করেন নাই, সহসা দুজনেই চমকাইয়া উঠিলেন।

বিন্দু শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল, শুভদা, খেয়েচিস ত?

হারাণবাবুর স্ত্রীর নাম শুভদা; বিন্দু তাহা অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও সম্মুখে নাম ধরিয়াই ডাকিত। শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তোর বড়মেয়ে কোথা?

বোধ হয় ওপরে আছে।

তবে একবার ডাক, বলিয়া নিজেই ডাকিল, ললনা—ও ললনা!

ললনা উপর হইতে বলিল, কেন?

একবার নেমে আয় ত মা!

ললনা আসিলে তাহার হাতে কন্যাকে দিয়া বলিল, প্রমীলাকে নিয়ে একবার ছোটভাইটির কাছে বস ত মা, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল; তোর মার সঙ্গে ওঘর থেকে দুটো কথা কয়ে আসি।

প্রমীলাকে ললনার হাতে দিয়া শুভদার হাত ধরিয়া বিন্দু একেবারে উপরে আসিয়া বসিল। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌ, হারাণদাদা আজ ক'দিন বাড়ি আসেন নি?

তিন দিন।

কেন আসেন নি কিছু জানিস কি?

না, কিছু না।

বিন্দুবাসিনীর কথার ভাবে তাহার ভয় করিতেছিল, পাছে সে কিছু একটা বলিয়া ফেলে। বিন্দুবাসিনী মৌন রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, শুভদাও ততক্ষণ ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিন্দু বলিল, শুভদা, ইচ্ছে থাকলেও এমন অনেক কথা আছে যা মিষ্টি করে বলা যায় না—জানিস ত?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, জানি—কেন?

হারাণদাদা আজ তিন-চারদিন বাড়ি আসেন নি;—মনে কর্ যদি তাঁর সম্বন্ধেই কোন অশুভ কথা বলতে হয়।

শুভদার সমস্ত শরীর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল;—তিনি বুঝি বেঁচে নেই?

ও কি, কাঁপিচস কেন? কে বললে তিনি বেঁচে নেই?

বেঁচে আছেন?

বালাই, বেঁচে কেন থাকবেন না? বেঁচে আছেন, সুস্থ শরীরে আছেন।

সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে শুনিতে পাইল, তথাপি শুভদা কথা কহিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি?

সেই কথাই বলতে এসেছি, কিন্তু তুই অমন করলে কেমন করে বলি?

শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অমন আর করব না। কি হয়েচে, বল।

চুরি করেছেন বলে নন্দীরা হাজতে দিয়েছে।

হাজতে দিয়েচে? শুভদার সমস্ত মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল,—তবে কি হবে?

বিন্দুবাসিনী স্বাভাবিকস্বরে বলিল, কি আর হবে? খালাস করে আনতে হবে।

তা কি হয়?

হয় না ত কি হাজতে গেলেই লোকে জেলে যায়?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুভদা বলিল, বিন্দু, তোমার বাপের কাছে একবার যাব।

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। সে জানিত শুভদার মুখ দেখিলে পাষাণ গলিবে, কিন্তু ভবতারণ গাঙ্গুলী গলিবে না। তাই অমত করিয়া বলিল, গিয়ে কি হবে?

আমাদের কেউ নেই; তিনি যদি দয়া করে কোন উপায় করে দেন।

যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন; হারাণদাদাতে বাবাতে চিরকাল শত্রুতা, তাই বাবার কাছে গেলে কোন ফল হবে না।

তবে উপায়?

উপায় আমি করে দোব। নাহলে কি শুধু এই খবরটাই দিতে এসেছি? কিন্তু আমি যা বলব তা করতে পাববে?

পারব।

যতই শক্ত হোক?

শুভদা দৃঢ়স্বরে বলিল, হাঁ।

তবে শোন, দু শ না তিন শ টাকা চুরি করেচেন বলে নন্দীরা তাঁর নামে নালিশ করেছে।

দু শ-তিন শ টাকা! শুভদার ভ্রম হইল, এত টাকা কি একসঙ্গে মানুষে চুরি করিতে পারে? আর চুরি করিলেই বা রাখিবে কোথায়?

এত টাকা, বিন্দু, তিনি কখন চুরি করেন নি।

না করে থাকেন ভালই, কিন্তু সেকথায় আমাদের কাজ নেই। এই টাকাটা নন্দীদের দিয়ে খুব অনুনয়-বিনয় করলে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? এত টাকা আমি পাব কোথায়?

সেকথা আমি বলচি। বৌ, এখন লজ্জার সময় নয়; তুমি আমার এই বালা দু গাছা নিয়ে আজ রাত্রে নিজেই ভগবানবাবুর কাছে যাও; তার পর যা ভাল বোঝ করো।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমার বালা দু গাছা?

হাঁ, আমার বালা দু গাছা। এর দাম তিন শ চার শ টাকা হবে; এই দিয়ে সাধ্যসাধনা করলে দয়া করে ছেড়ে দিতেও পারেন।

কিন্তু বিন্দু—

কিন্তু আবার কি? আগে স্বামীকে বাঁচাও, তারপর কিন্তু করো। এখন কি সঙ্কোচ করবার সময় বৌ? আর টাকা শোধ দেবারই বা ভাবনা কি, তোর ছেলে বড় হয়ে শোধ দেবে।

আজই যাব?

হাঁ- আজই।

কার সঙ্গে যাব?

তেমন কেউ বিশ্বাসী লোক আছে কি?

কেউ না।

তবে একলাই যাও। বরং একলা যাওয়াই ভাল; কেননা পাঁচজনে শুনলে পাঁচটা কথা বলতে পারে।

তবে আজ যাই।

হাঁ -আজই যাও। সন্ধ্যার পর একটা ময়লা কাপড় পরে মুখ ঢেকে যেও। কাল এমনি সময় আর একবার আসব।

যাইবার সময় শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিন্দু সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয়। তা নাহলে অন্য উপায়ও আছে—তুই কিছু ভাবিস নে।

তাহার পর অঞ্চল খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া শুভদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া

বলিল, বৌ, আমি তোর মার পেটের বোন। আমাকে কোন লজ্জা নেই, আপাতক এই টাকা নে—ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস।

নীচে আসিয়া বিন্দু কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, বেলা গেল—চল মা, বাড়ি যাই। তাহার পর বিধবা ললনার উপর একটি সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভগবানবাবুর দয়া

তখন দ্বিপ্রহরের সময়, যেসব মেঘ বাতাসের দৌরাত্ম্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার পরেই একটির পর একটি করিয়া মহাসমারোহে বাজনা-বাদ্য বাজাইয়া আবার আকাশের গায়ে জোট বাঁধিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল আজ রাত্রে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। গরম কমিবে--প্রাণ বাঁচিবে। এ বৃষ্টি সকলের মঙ্গলের জন্য, শুধু শুভদা মনে করিল তাহারই কপালদোষে আজ এই দুর্যোগের সূত্রপাত হইয়া আসিল। একে ত হলুদপুরের পথঘাট বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া, তাহাতে আবার গাঢ় মেঘ করিয়াছে, তথাপি শুভদা বালা দু গাছি অঞ্চলে বাঁধিয়া, কাপড়খানি বেশ করিয়া গুছাইয়া পরিয়া একটা বিছানার চাদরে সমস্ত অঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে পূর্বে আর কখন বামুনপাড়ায় যায় নাই, শুধু শুনিয়াছিল মাত্র যে, উত্তরমুখ ধরিয়া চলিলে আধক্রোশ দূরে পাকারাস্তা পাওয়া যায় এবং আর একটু অগ্রসর হইলেই বামুনপাড়া। সেখানে পেঁছিতে পারিলে জমিদারবাড়ি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। কারণ নন্দীদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় সে শুনিযাছিল। হলুদপুরের অন্ধকার পথ ছাড়াইয়া পাকারাস্তা পাওয়াই তাহার বিপদের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া একফোঁটা দুইফোঁটা জল পড়িতে লাগিল; একফোঁটা দুইফোঁটা পরিশেষে মুষলধারায় পরিণত হইল দেখিযা শুভদা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পথ চলা আর অসম্ভব; অন্ধকারে একান্ত দূরের পদার্থও আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রবল বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের শব্দে শুভদার ভিতর পর্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল, চতুর্দিক হইতে বন্য জীবজন্তু ছুটিয়া আসিয়া সেই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে আসিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া সভয়ে চীৎকার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে। শুভদার সহসা মনে হইল, যদি চোর ডাকাইত কেহ আশ্রয় লইতে এইখানেই আসিয়া পড়ে? তাহা হইলে? তাহার প্রাণের ভয় হইল না কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান বালা দু গাছির জন্য ভয় হইল। স্বামীর নিষ্কৃতির কারণ, নিজের আশা-ভরসা সমস্তই এই বালা দু গাছি। সত্রাসে শুভদা বৃক্ষতল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সমস্ত শরীর কর্দমসিক্ত হইয়াছে, গাছ-পালার আঁচড়ে ও কণ্টকে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তথাপি শুভদা পথ বাহিযা চলিতে লাগিল। এক নিমিষের তরে বৃষ্টির উপশম নাই। এক মুহূর্তের জন্য মেঘের শব্দের বিশ্রাম নাই, কোন্ মুখে কোথায় চলিয়াছে তাহারও স্থিরতা নাই, তথাপি বনবাদাড় সরাইতে সরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হইল যেন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথ সম্মুখে দেখা যাইতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটিয়া আসিয়া শুভদা দেখিল যথার্থই পাকা-পথ পাইয়াছে। এখন কিন্তু অন্য কথা। যখন পথ পায় নাই তখন কেবল পথের ভাবনাই ভাবিয়াছিল, এখন কাজের কথা মনে হইতে লাগিল। এত রাত্রে কি করিয়া দেখা হইবে, দেখা হইলেই কি কার্যসিদ্ধি হইবে? সিদ্ধ হউক আর না হউক, এ দুর্যোগে বাটীই বা কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে? ক্রমে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল; কিছুদূর আসিয়াই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও চতুর্দিক-সংলগ্ন রেলিং দেওয়া বাগান দেখিয়া বুঝিতে পারিল ইহাই নন্দীদের

বাটী; কিন্তু কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? আর প্রবেশ করিলেই বা তাঁহার সহিত এত রাত্রে কি করিয়া সাক্ষাৎ করিবে! শুভদার কান্না আসিল; এখন কি হইবে? কি করিয়া বাড়ি যাইবে? পরিশ্রমে, অনাহারে, দুর্ভাবনায় সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল. নন্দীদের বাটীর সম্মুখে যে শিবমন্দির ছিল তাহারই বারান্দার উপর আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই, তবে কমিয়া আসিয়াছিল। বৈশাখের মেঘ যেমন একমুহূর্তে গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তেমনই একমুহূর্তে গগন ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। এ মেঘও দেখিতে দেখিতে আকাশের প্রান্তদেশে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, আবার চাঁদের আলোকে জগৎ অনেক শুভ্রশ্রী ধারণ করিল। শুভদা মনে করিল এইবার ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে। সিক্তবস্ত্র একটু গুছাইয়া লইবার সময় দেখিতে পাইল একজন বৃদ্ধ ভৃত্য হস্তে প্রদীপ লইয়া জমিদারবাটীর ফটক খুলিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার নিকট যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় এইরূপ একটা ক্ষীণ আশায় ভর করিয়া শুভদা প্রস্থান না করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বহুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ প্রথমে অবগুণ্ঠন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল, কোন ভদ্রঘরের স্ত্রী জলের ভয়ে এখানে আশ্রয় লইয়াছিল, এইবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু এখনো সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা?

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না।

কোথায় যাবে বাছা?

শুভদার কথা বলিতে লজ্জা করিতেছিল; কিন্তু এখন মৃদুকণ্ঠে কহিল, জমিদারবাবুদের বাড়িতে।

জমিদারদের বাড়ি ত এই সামনেই; তবে সেখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শুভদা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারদের বাড়িতে কার কাছে যাবে?

বাবুর কাছে।

কোন্ বাবুর কাছে?

ভগবানবাবুর কাছে।

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিল, ভগবানবাবুর কাছে?

হাঁ।

তবে আমার সঙ্গে এস। বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। শুভদা জ্যোৎস্নালোকে বৃদ্ধের পলিতকেশ সৌম্যমূর্তি দেখিয়া অসঙ্কোচে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। ক্রমে ফটক পার হইয়া, বাগান পার হইয়া, একটা কক্ষের দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধ ডাকিল, এই ঘরে এস।

শুভদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষ, সমস্ত মেঝের উপর মূল্যবান কার্পেট বিছানো; সম্মুখে মসলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া বসিবার স্থান। বৃদ্ধ তাহার উপর উপবেশন করিয়া শুভদার আপাদমস্তক দীপালোকে, অবগুণ্ঠনের ঈষৎ ফাঁক দিয়া যতদূর দেখা যায় নিরীক্ষণ করিল। শুভদা সময়ে রূপবতী ছিল। বয়সে ও দুঃখ-কষ্টে পূর্বের সে জ্যোতি এখন আর নাই, তথাপি হীনপ্রভ লাবণ্যের যতটুকু অবশিষ্ট আছে, বৃদ্ধ তাহাতেই মোহিত হইল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিল, বাছা, তোমার ভুল হইয়াছে, বিনোদবাবুর সঙ্গে বোধ হয় তুমি দেখা করিতে চাও।

বিনোদবাবু কে?

বিনোদবাবু ভগবানবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শুভদা কহিল, তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহি না।

তবে কি ভগবানবাবুর নিকটই প্রয়োজন আছে?

হাঁ।

ভগবান নন্দী আমারই নাম; কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখিয়াছি বলে ত মনে হয় না।

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে আমার নিকট কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

শুভদা কথা কহিল না।

ভগবানবাবু আবার বলিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বিনোদের নিকটই থাকিতে পারে; এত রাত্রে আমার নিকট যে তোমার কি প্রয়োজন আছে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারছি না।

তথাপি শুভদা কোনও উত্তর দিল না।

তোমার বাড়ি কোথায়?

হলুদপুরে।

হলুদপুরে? আমার নিকট প্রয়োজন? তুমি কি হারাণের স্ত্রী?

শুভদা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তবে বল কি প্রয়োজন?

শুভদা অঞ্চল হইতে বালা দু গাছি খুলিয়া ধীরে ধীরে ভগবানবাবুর পায়ের নিকট রাখিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিন।

বৃদ্ধ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বালা দু গাছি হাতে লইয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন, তবুও সুখী হইলাম যে সে তোমাকে ইহাও দিয়েছিল। তাহার পর বালা দুটি নীচে রাখিয়া বলিলেন, তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ের হাতের বালা লইতে চাহি না। ছাড়িয়া দিতে হয় অমনিই দেব; বিশেষ সে আমার যাহা লইয়াছে তাহাতে এ অলঙ্কার লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও যা, না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও তা।

শুভদা চক্ষু মুছিয়া বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিবেন ত?

ইচ্ছা ছিল না! সে যেরকম দুশ্চরিত্র তাহাতে তাহার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল, তবুও তোমার জন্য ছাড়িয়া দিব।

শুভদার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। পলিতকেশ বৃদ্ধকে সে ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও মুখ ফুটিয়া আশীর্বাদ করিতে সাহস করিল না; মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বরের চরণে তাঁহার সহস্র মঙ্গল কামনা করিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, আজই বাড়ি যাবে?

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আজই যাইবে।

তোমার সঙ্গে আর কেহ লোক আছে

কেহ না।

কেহ না? তবে এত রাত্রে একাকী যাইও না। একজন লোক সঙ্গে লইয়া যাও।

শুভদা তাহাও অস্বীকার করিয়া একাকী সেই বনের ভিতর দিয়া বাটী ফিরিল।

যখন বাটীতে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ললনা ইতিপূর্বে উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সিক্তবস্ত্রে জননীকে দেখিয়া কহিল, মা, এত ভোরে স্নান করে এসে?

হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামমণি ও দুর্গামণি নাম না রাখিয়া যে শুভদা কন্যা দুইটির নাম ললনা ও ছলনা রাখিয়াছিল, তাহাতে ঠাকুরঝি রাসমণির আর মনস্তাপের অবধি ছিল না।

বাজারের তাদের মত ললনা ছলনা নাম দুটা অষ্টপ্রহর তাঁর কর্ণে বিঁধিতে থাকিত। ললনা নামটা তবু কতক মাফিকসই; কিন্তু ছিঃ—ছলনা আবার কি নাম! ছলনাকে না দেখিতে পারার কারণ অর্ধেক তার ঐ নামটা। লোকে ঠাকুরদের নামে ছেলেমেয়ের নাম

রাখে; কেননা, তাদের ডাকিতেও ভগবানের নাম করা হয়, কিন্তু এ দুটো মেয়েকে ডাকলে যেন পাপের ভার একটু একটু করে বাড়ছে মনে হয়।

ললনাময়ী, ছলনাময়ী হারাণবাবুরই দুই কন্যা। একজন বড়, একজন ছোট; একজন সপ্তদশবর্ষীয়া, একজন একাদশ বর্ষীয়া; একজন বিধবা, একজন অনূঢ়া।

এই ত গেল পরিচয়ের কথা। এখন রূপ-গুণের কথা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে গঙ্গার ঘাটে ললনা স্নান করিতে যাইলে বর্ষীয়সীরা বলাবলি করিতেন, 'ঠাকুর বিধবা করিবেন বলেই ছুঁড়ির এত রূপ দিয়েছিলেন!' ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ডুব দিতে থাকিত। সমবয়স্কারা কানাকানি করিত। কি বলিত তাহারাই জানে, তবে ভাবে বোধ হয় বিশেষ প্রশংসা করিত না। ললনার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে বেশি কথাও কহিত না, বেশি কথায় থাকিতও না—দুই-চারিটা কথা কহিত, স্নান করিত, জল লইত—উঠিয়া বাটী চলিয়া আসিত। কিন্তু ছলনার স্বতন্ত্র কথা। সে অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত, অধিক কথায় থাকিতে ভালবাসিত, আটটার সময় স্নান করিতে গিয়া এগারটার কম বাটী ফিরিয়া আসিত না, গায়ে গহনা নাই বলিয়া মুখ ভারী করিত, মোটা চালের ভাত খাওয়া যায় না বলিয়া কলহ করিত, পাতে মাছ নাই কেন বলিয়া থালসুদ্ধ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত; এইরূপে দিনের মধ্যে শতসহস্র কাজ করিত। তাহারও শরীরে রূপ ধরে না। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, গোলাপপুষ্পের মত মুখখানি। তাহাতে ভ্রূ দুটি যেন তুলি দিয়া চিত্রিত করা, পাতলা দুখানি ঠোঁট পান খাইয়া লাল করিয়া দর্পণ লইয়া নির্জনে ছলনাময়ী আপনার রূপ দেখিয়া আপনি গৌরবে ভরিয়া উঠিত। মনে মনে বলিত, এই বয়সে এত রূপ, না জানি বয়সকালে কি হবে! সমস্ত অঙ্গে কত গহনা থাকিবে; এইখানে বালা, এইখানে অনন্ত, এইখানে বাজু, এইখানে হার, চিক, কণ্ঠমালা, সাতনরি, দশনরি, বিশনরি, আরও কত কি—উঃ, তখন কি হবে! এ আনন্দ ছলনা একা বহিতে পারিত না—ছুটিয়া দিদির কাছে আসিয়া বসিত।

ললনা জিজ্ঞাসা করিত, কি লা? ছুটছিস কেন?

দিদি, আমার রঙটা কি আগেকার চেয়ে কালো হয়ে গেছে?

কালো হবে কেন?

হয় নি? আচ্ছা দিদি, আমাদের গাঁয়ে কেউ গুণতে জানে কি?

কেন?

আমি হাত দেখাব।

কেন?

তারা গুণে বলে দেবে, বড় হলে আমার গয়না হবে কিনা।

ললনার চক্ষে জল আসিত। —হবে দিদি হবে তুই রাজরাণী হবি।

ছলনার লজ্জা করিত। মুখখানি লাল করিয়া ছুটিয়া অন্যত্র পলাইয়া যাইত। গহনা হইবে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল; রাজরাণীর কথা কে বলিয়াছে?

কখন আসিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, দিদি, আমাদের কিছু নেই কেন?

ললনা বলিত, আমরা দুঃখী তাই।

কেন দুঃখী দিদি? গাঁয়ে কে আমাদের মত এমন করে থাকে, এমনতর কষ্ট পায়?

ঈশ্বর যাকে যেমন করেছেন তাকে তেমনি করেই থাকতে হয়।

ঈশ্বর কাউকে এমন করলেন না, কেবল আমাদেরই এমন করলেন?

আমাদের পূর্বজন্মের পাপ।

কি পাপ দিদি?

পাপ কি একরকম আছে বোন? হয়ত কত অকর্ম করেছি। বাপ-মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিনি, লোকের মনে অযথা ক্লেশ দিয়েছি—আরো কত কি হয়ত করেছি।

ছলনার মুখ ম্লান হইল। বলিল, এমনি করেই তবে কি চিরকাল কাটবে? কখন কি সুখ হবে না?

তা কেন ভাই, দুদিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন হবে। তাহার পর ছলনার হাত দুটি সস্নেহে আপনার হাতে লইয়া বলিত, দেখিস দেখি—তোর কত সুখ হবে; কত

ঐশ্বর্য, কত গহনা, কত দাসদাসী—তুই রাজরাণী হবি।

ললনা একথাটা যখন তখন বলিত। ছলনা না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কথা বলিয়া ফেলিল, দিদি তুমি?—

সে জানিত তাহার দিদি বিধবা, তথাপি বালিকাসুলভ চপলতায় একটা কথা আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই ছলনা অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমিও সুখে থাকব বোন ঐ আমাকে মা ডাকছেন।

ললনা চলিয়া গেল। যথার্থই মা তখন ডাকিতেছিলেন। কাছে আসিয়া বলিল, কেন মা?

তোমার বাবা এসেচেন, ঐ ঘরে—

কথা শেষ হইবার পূর্বেই ললনা চলিয়া গিয়াছে।

আহার করিতে বসিলে রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

মুখে গ্রাস তুলিয়া হারাণবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, সে অনেক কথা!

রাসমণি মুখব্যাদান করিলেন, অনেক কথা কি রে?

সে গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া হারাণবাবু পূর্বমত গম্ভীরমুখেই বলিলেন, অনেক কথা এই যে, মাথার উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছে।

রাসমণির বিস্ময়ের সীমা নাই, ভাবনার শেষ নাই; প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, খুলেই বল হারাণ।

হারাণ গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিল, নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কের কথা জান? আমার তাই হয়েছিল। চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে—না, আমার নামে নালিশ করেছিল।

নালিশ করেছিল?

হাঁ, নালিশ করেছিল; কিন্তু মিছে কথা কতক্ষণ থাকে? কিছুই প্রমাণ হ'ল না—আজ মকদ্দমা জিতে তাই বাড়ি আসচি।

ঘোমটার অন্তরালে শুভদা চক্ষু মুছিল। রাসমণি নন্দীদের বহু মঙ্গল কামনা করিলেন, তাহাদিগকে সগোষ্ঠী মুক্তি দিবার জন্য দুর্গার চরণে অনুযোগ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু ওরা চাকরিতে তোকে আর রাখবে কি?

হারাণবাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন—চাকরিতে রাখবে? আমি করলে তবে ত রাখবে? হারামজাদা ভগবান নন্দীর এজন্মে আমি আর মুখ দেখব? যদি বেঁচে থাকি ত প্রতিশোধ নেব—আমাকে যেমন অপমান করেচে, তার শোধ তুলবই তুলব!

রাসমণি কিছুক্ষণ ভয়বিস্মিত চক্ষে বীর ভ্রাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, তাহলে কিন্তু খরচপত্রের—

সে ভাবনা ভেব না দিদি—বেটাছেলে, আমার ভাবনা কি? কালই আর এক জায়গায় চাকরি জুটিয়ে নেব।

হারাণবাবুর কথা যে রাসমণি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, তাহা নহে, তথাপি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া এ দারুণ দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে এসময়ে সকলেরই ইচ্ছা হয়। রাসমণিও তাহাই করিলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়ত সে যাহা বলিতেছে তাহাই করিবে; এ বিপদের সময়ও অন্ততঃ চক্ষু ফুটিবে। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, যা ভাল হয় তাই করিস—নাহলে, অসুখ-বিসুখ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

একটা লম্বাচওড়া উত্তর দিয়া হারাণচন্দ্র আহার শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

এইবার মাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে শুনিয়াছিল পিতা আসিয়াছেন, তাই এতক্ষণ উন্মুখ হইয়া শয্যার উপর বসিয়াছিল। হারাণবাবু নিকটে আসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কেমন আছ মাধব?

আজ ভাল আছি বাবা; তুমি এতদিন আসনি কেন?

হারাণচন্দ্র একটা মনোমত উত্তর খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মাধব সেজন্য অপেক্ষা করিল

না। আবার বলিল, তুমি আমার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলে, না? ওষুধ এনেচ?

হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বলিলেন, এনেছি।

ভাল ওষুধ? খেলেই ভাল হব?

হবে বৈ কি।

বালক প্রফুল্ল হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, তবে দাও।

হারাণচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এখন নয়, রাত্রে খেও।

বালক তাহাতেও সন্তুষ্ট। মৃদু হাসিয়া বলিল, তাই খাব। তাহার পর কিছুক্ষণ পিতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাবা, আমাকে একটা ডালিম কিনে দিও—দেবে?

হারাণচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, দেব।

তাহার পর শুভদা আসিলে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে আনা দুই পয়সা দিতে পারো?

কেন?

আমার দরকার আছে—একজনের ধার আছে, সে চাইতে এসেছে।

শুভদা বাক্স খুলিয়া দুই আনা পয়সা বাহির করিল। হারাণচন্দ্র উঁকি দিয়া দেখিলেন বাক্সে আরো অনেকগুলি পয়সা আছে। হাত পাতিয়া দু' আনা পয়সা লইয়া বলিলেন, থাকে ত আরো আনা চারেক পয়সা দাও—মাধবকে একটা বেদানা কিনে দেব।

শুভদা কাতরভাবে স্বামীর মুখপানে একবার চাহিল। এতগুলি পয়সা একসঙ্গে বাহির করিয়া দিতে বোধ হয় তাহার ক্লেশ হইতেছিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল।

পয়সাগুলি হাতে বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া হারাণচন্দ্র একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কালই আমি এসব শোধ করে দেব।

শুভদা অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িল। সে বিলক্ষণ জানিত, তাহার স্বামীর অর্ধেক কথার কোন অর্থই থাকে না। এখন চলিয়া যাইতেছে দেখিযা শুভদা বলিল, এখন কোথাও যেয়ো না—একটু শুয়ে থাক।

হারাণচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন—তা কি হয়? ঘরে বসে থাকলে কি আমার চলে? রাজ্যের কাজ আমার মাথার উপর পড়ে আছে।

তবে যাও—

তিনি চলিয়া যাইলে শুভদা বাক্স খুলিল। আব একটি টাকা মাত্র আছে। বিন্দুবাসিনী সেদিন যাহা দিয়া গিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই একটি টাকা মাত্র তাহাদের সম্বল। শুভদা বাক্সের একটি নিভৃত কোণে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া মাধবের কাছে আসিয়া বসিল।

মা, কখন বাবা বেদানা আনবেন?

সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল—তথাপি হারাণবাবুর দেখা নাই। মাধব অনেকবার খোঁজ লইল, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর কাঁদিতে লাগিল।

শুভদা কাছে আসিয়া বসিল। ললনা অনেক করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল; প্রথমে সে কিছুতেই ভুলিতে চাহে না, অবশেষে শ্রান্তমনে অবসন্ন শরীরে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি ভোর না হইতেই সে আবার উঠিয়া বসিল—মা, আমার ডালিম এসেচে?

শুভদা চক্ষের জল চাপিযা বলিল, ডালিম তোমাকে খেতে নেই।

কেন?

খেলে অসুখ হবে।

সে উঠিয়া বসিয়াছিল, আবার শুইয়া পড়িল।

পরদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলে হারাণচন্দ্র বাটী আসিলেন। রাসমণি রাগ করিয়া একটা কথাও কহিলেন না। ললনা পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, স্নান করিবার উপকরণ,

হুঁকাতে জল ভরিয়া তামাকু সাজিয়া দিল। হারাণচন্দ্র স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া আহার করিলে, শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—মাধবের বেদানা এনেচ?

ঐ যা—আহা-হা—পকেটে পয়সাগুলো রেখেছিলাম, ছেঁড়া পকেট, সমস্ত পয়সা কোথায় পড়ে গেছে। থাকে ত আজ গণ্ডা-চারেক পয়সা ধার দিও, সন্ধ্যার সময় তোমাকে সমস্ত ফিরিয়ে দেব।

শুভদা ম্লানমুখে বলিল, আর কিছু নেই।

হারাণচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তা কি হয়? তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কখনই ফুরোয় না।

শুভদা মনে মনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, সত্যি কিছু নেই।

কেন থাকবে না? কাল যে দেখলাম অনেকগুলো পয়সা আর একটা টাকা আছে!

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণবাবু আবার বলিলেন, ছিঃ! আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না? সমস্ত টাকাটা দিয়ে বিশ্বাস না হয়, আনা-চারেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয়।

আর আপত্তি করিল না, শুভদা হাত ধুইয়া প্রার্থিত অর্থ বাহির করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থের সদ্ব্যবহার বটে! হারাণচন্দ্র হলুদপুর গ্রাম পার হইয়া বামুনপাড়ায় আসিলেন। তাহার পর একটা গলিপথ ধরিয়া একটা দরমাঘেরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এখানে অনেকগুলি প্রাণী জড় হইয়া এককোণে বসিয়া ছিল। হারাণচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা সাহ্লাদে মহাকলরব করিয়া উঠিল। অনেক প্রীতিসম্ভাষণ হইল; কেহ বাবা বলিয়া ডাকিল, কেহ দাদা বলিয়া ডাকিল, কেহ খুড়ো, কেহ মামা, কেহ মেসো ইত্যাদি বহুমান্যে বহুসম্ভাষিত হইয়া মুরুব্বির মত হারাণচন্দ্র তন্মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন।

অনেক কথা চলিতে লাগিল। অনেক রাজা-উজিরের মুণ্ডপাত করা হইল, অনেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হইল। এটা গুলির দোকান। সংসারের একপ্রান্তে শ্মশান, আর অপরপ্রান্তে গুলির দোকান। শ্মশানে মহারাজাও ভিক্ষুকের সমান হইয়া যান, এখানেও ভিক্ষুক মহারাজার সমান হইয়া দাঁড়ান। টানে টানে অহিফেন মগজে যত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে লাগিল, হৃদয়ের মহত্ত্ব, শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি একে একে তেমনি ফাঁপিয়া ফুলিয়া প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কত দান, কত প্রতিদান! মণি, মুক্তা, হীরক, কাঞ্চন কত রাজ্য, কত রাজকন্যা; টানে টানে অবাধে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। একাধারে এত রত্ন, জগতের তাবৎ বাঞ্ছিত বস্তু অর্ধ আলোকে, অর্ধ আঁধারে, দরমার ঘরে, ভূতলে,—সে ইন্দ্রসভা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনেকগুলি কালিদাস, অনেকগুলি দিল্লীর বাদশাহ, অনেকগুলি নবাব সিরাজদ্দৌলা, অনেকগুলি মিঞা তানসেন একে একে ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। জগতের নীচ লোকের সহিত তাঁহারা মিশিতে পারেন না, কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় করা শোভা পায় না, কাজেই তাঁহারা রাস্তার একপাশ ধরিয়া নিঃশব্দে স্ব স্ব প্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হারাণচন্দ্রও তাঁহাদের মত বাহিরে আসিলেন; কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহার একটু বিভ্রাট ঘটিল। কোথা হইতে সেই হতভাগ্য পীড়িত মাধবের মুখখানা মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেদানার কথাটাও স্মরণ হইল। অপর সকলের মত তিনিও অবশ্য কোন একটা বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মুখপোড়া ছোঁড়ার মুখখানা সে রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া দিল। দিল্লীর বাদশা পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, রাজকোষ প্রায় শূন্য। অতবড় সম্রাটের চারিটি পয়সা ও একটি গাঁজার কলিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। বহুৎ আচ্ছা! তাহাই সহায় করিয়া তিনি নিকটবর্তী একটা গঞ্জিকার দোকানে

প্রবেশ করিলেন।

অধিকারীকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, খুড়ো, চার পয়সার তামাক দাও ত।

. অধিকারী সে আজ্ঞা সত্বর সম্পাদন করিল।

হারাণচন্দ্র তখন মনোমত একটা বৃক্ষতল অন্বেষণ করিয়া লইয়া গঞ্জিকা-সাহায্যে বিশৃঙ্খল রাজত্ব পুনরায় শৃঙ্খলিত করিয়া লইলেন। সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইলে রাত্রি অনেক হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অনেকদূর গিয়া একটা খোড়ো বাড়ির সম্মুখের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, কাত্যায়নী!

কেহ উত্তর দিল না।

আবার ডাকিলেন, বলি কাতু বাড়ি আছ কি?

তথাপি উত্তর নাই।

বিরক্ত হইয়া হারাণচন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বলি বাড়ি থাক ত দরজাটা একবার খুলে দিয়ে যাও না!

এবার অতি ক্ষীণ রমণীকণ্ঠে জবাব আসিল, কে?

আমি—আমি।

আমার বড় শরীর অসুখ—উঠতে পারব না।

তা হবে না। উঠে খুলে দাও।

এবার একজন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়া কালোকোলো মোটাসোটা সর্বাঙ্গে উল্কিপরা মানানসই যুবতী যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতে করিতে আসিয়া খট করিয়া দ্বার মোচন করিল।

উঃ মরি -যে পেটে ব্যথা' অত ষাঁড়-চেঁচাচ্চ কেন?

চেঁচাই কি সাধে? দোর না খুললেই চেঁচামেচি করতে হয়।

যুবতী বিরক্ত হইল—না বাবু, অত আমার সইবে না। আসতে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন যে অমনি করে চেঁচাবে—তা হবে না, অত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

হারাণচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিলেন। তাহার পর কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আহা! পেটে ব্যথা হয়েছে, তা ত আমি জানিনে।

তুমি কেমন করে জানবে? জানে পাড়ার পাঁচজন। কাল থেকে এখন পর্যন্ত পেটে একবিন্দু জলও যায়নি। তা এত রাত্তিরে কেন?

একটু কাজ আছে।

কাজ আবার কি?

বলছি। তুমি একটু তামাক সাজ দেখি।

রমণী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া হাত দিয়া ঘরের একটা কোণ দেখাইয়া বলিল, ঐ কোণে সব আছে। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও, আমাকে আর জ্বালাতন ক'রো না—আমি একটু শুই।

হারাণচন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিল, না না, তোমাকে বলিনি—আমার মনে ছিল না, তুমি শুয়ে থাক, আমিই সেজে নিচ্চি।

তখন তামাকু সাজিয়া হুক্কা হস্তে হারাণচন্দ্র কাত্যায়নীর পার্শ্বে শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিবার পর, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, বড় মৃদু—পাছে গলার স্বর কর্কশ শুনায়, কহিলেন, কাতু, আজ আমাকে গোটা-দুই টাকা দিতে হবে।

কাত্যায়নী কথা কহিল না।

বলি শুনলে? ঘুমুলে কি? আজ আমাকে দুটো টাকা দিতেই হবে।

কাত্যায়নী পার্শ্ব পরিবর্তন করিল, কিন্তু কথা কহিল না।

হারাণচন্দ্র একটু সাহস পাইলেন। হুক্কাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহার গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, দেবে ত?

কাত্যায়নী কথা কহিল, মিছে ভ্যানভ্যান করচ কেন? কোথা থেকে দেব?

কেন, তোমার নেই কি?

না।

আছে বৈ কি! বড় দরকার; আজ এ দয়া আমাকে করতেই হবে।

থাকলে ত দয়া করব।

দুটো টাকা তোমার আছেই। আমি জানি আছে। টাকা অভাবে বাড়িতে আমার খেতে পাচ্চে না, আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েছি; লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে। কাতু, আজ আমাকে বাঁচাও—

থাকলে ত বাঁচাব? আমার একটি পয়সাও নেই।

এইবার হারাণচন্দ্রের ক্রোধ হইল; বলিলেন, কেন থাকবে না? এত টাকা দিলাম, আর আমার অসময়ে দুটো টাকাও বেরোয় না? চাবিটা দাও দেখি, সিন্দুক খুলে দেখি টাকা আছে কি না।

কাত্যায়নীর আঁতে ঘা লাগিল। একটা অবাচ্য অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিল। ক্রোধদৃপ্তলোচনে হারাণের মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কেন, তুমি কে যে তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেব? সে ছোটলোকের মেয়ে, নীচ কথা তাহার মুখে বাধে না। অনায়াসে চীৎকার করিয়া বলিল, যখন রেখেছিলে তখন টাকা দিয়েছিলে, তা বলে তোমার দুঃসময়ে কি সেসব ফিরিয়ে দেব?

হারাণচন্দ্র একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। কাত্যায়নীর মুখের সম্মুখে তিনি কখনই দাঁড়াইতে পারেন না, আজও পারিলেন না। নিতান্ত নরম হইয়া বলিলেন, তবু ভালবেসেও ত একটু উপকার করতে হয়?

ছাই ভালবাসা। মুখে আগুন অমন ভালবাসার। আজ তিনমাস থেকে একটি পয়সা দিয়েচ কি যে ভালবাসব?

ছিঃ! অমন কথা বোলো না কাতু, ভালবাসা কি নেই?

এক তিলও না। আমাদের যেখানে পেট ভরে সেইখানে ভালবাসা। এ কি তোমার ঘরের স্ত্রী যে গলায় ছুরি দিলেও ভালবাসতে হবে? তোমা ছাড়া কি আমার গতি নেই? যেখানে টাকা সেইখানে আমার যত্ন, সেইখানে আমার ভালবাসা। যাও, বাড়ি যাও- এত রাত্তিরে বিরক্ত করো না।

কাতু, সব কি ফুরোলো?

অনেকদিন ফুরিয়েচে। এতদিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিনি। আজ যখন কথা পাড়লে তখন সমস্ত স্পষ্ট করেই বলি; তোমার স্বভাব চরিত্র খারাপ—আমার এখানে আর এস না। বাবুদের টাকা চুরি করে জেলে যাচ্ছিলে—চাকরি-বাকরি নেই, কোন্‌দিন আমার কি সর্বনাশ করে ফেলবে—তার চেয়ে আগেভাগে পথ দেখাই ভাল। এখানে আর ঢুকো না।

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তাই হবে। এখানে আর আসব না। তোমার জন্যে আমার সব হ'ল; তোমার জন্যে আমি চোর, তোমার জন্যে আমি লম্পট, তোমার জন্যে আমি স্ত্রী-পুত্র দেখি না, শেষে তুমিই—

হারাণচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, আজ আমার চোখ ফুটলো—

এবার কাত্যায়নীও নরম হইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর করুন তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা ছোটলোকের মেয়ে, ছোটলোক—কিন্তু এটা বুঝি যে, আগে স্ত্রী-পুত্র বাড়িঘর, তারপর আমরা; আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড়, তার পর শখ, নেশা-ভাঙ। তোমার আমি অহিত চাইনে, ভালর জন্যই বলি—এখানে আর এস না, গুলির দোকানে আর ঢুকো না—বাড়ি যাও, ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র দেখ গে, একটা চাকরি-বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এসো।

কাত্যায়নী শয্যা হইতে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া হারাণচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, এই নিয়ে যাও—

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমার দরকার নেই।

কাত্যায়নী অল্প হাসিল; হাত দিয়া হারাণের মুখখানা তুলিয়া বলিল, যে কিছু জানে না তার কাছে অভিমান ক'রো—এ না নিয়ে গেলে কাল তোমাদের সবাইকে উপুস করতে হবে, তা জান?

কেন?

তোমাদের যে কিছু নেই।

কেমন করে জানলে?

এইমাত্র তুমি যে নিজেই বললে—ছেলেব মুখের খাবার কেড়ে খেয়েচ।

ওঃ—

শুধু তাই নয়। তুমি এত কথা না বললেও আমি আগে থেকেই সমস্ত জানি। আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে সব দেখে এসেছি।

কেন?

প্রথমতঃ মেয়েমানুষের এসব আপনিই দেখতে ইচ্ছে হয়, তার পর সব দেখেশুনে আটঘাট না বেঁধে চললে আমাদের চলে না। তোমরা যত বোকা, মেয়েমানুষ হলেও আমরা তত বোকা নই। তোমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, একবার ঠকলে আর একবার উঠতে পার, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারব না, আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কারো দয়া হবে না। লোকে বলে, 'যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন', আমাদেব সে ভরসাও নেই। তাই সমস্ত জিনিস খুব সাবধানে নিজে না দেখেশুনে চললে কি আমাদের চলে? বুঝেচ?

কাত্যায়নীরও বোধ হয় ক্লেশ হইতেছিল; এসব কথা কহিতে কহিতে সে-মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে একটু ব্যথা অনুভব করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে সমস্ত টাকা দিয়া ফেলিল। হারাণচন্দ্রের মুখখানা একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, যা বললাম সব বুঝেচ? এই টাকাগুলো তোমাব স্ত্রীর হাতে দিও, তবুও দুদিন স্বচ্ছন্দে চলবে। নিজের কাছে কিছুতেই রেখো না। শুনচ?

হারাণচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

অনেক রাত্রি হ'ল, আজ আব কোথাও যেও না। এইখানেই শুয়ে থাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তীকে গ্রামের অর্ধেক লোক 'সদাদাদা' বলিয়া ডাকিত, অর্ধেক লোক 'সদাপাগলা' বলিয়া ডাকিত। এই হলুদপুর গ্রামেই তাহার বাটী। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরেজী ম্লেচ্ছ ভাষা, ইংরেজী শিখিলে ধর্ম নষ্ট হইতে পারে এই আশংকায় তিনি পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখান নাই। আর প্রয়োজনই বা কি? যে দু-দশ বিঘা জমি আছে তাহাতে পরের চাকুরি করিতে হইবে না, তবে মিছামিছি জাতি দিয়া কি হইবে? কেহ বলিত, সে সংস্কৃত ভাষা জানে, কেহ বলিত, জানে না; যাহা হউক এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সে যে পাগল তাহাতে আর মতভেদ নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বীকার করে, তাহার একটু বাতিকের ছিট আছে। জমি দেখে, রামপ্রসাদী গান গাহে, মড়া পোড়ায়, এ-বাটী ও-বাটী করে, এমনি করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটিয়া যায়। দূরসম্পর্কের এক পিসি ভিন্ন সংসারে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই; তাই গ্রামসুদ্ধ লোককে সে আপনার করিয়া লইয়াছে। সকলেই তাহার আত্মীয়, সকলের সহিতই তাহাব সম্পর্কের ডাক, সকল স্থানেই তাহার অবারিত দ্বার।

পূর্বেই বলিয়াছি, সংসারে তাহার কেহ আপনার লোক নাই। বাল্যকালে সদানন্দব পিতা অনেক টাকা পণ দিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে এক বৎসবের মধ্যেই বধূটির মৃত্যু হয়। সেই অবধি, আজ ছয় বৎসর হইল, সদানন্দ একাকী আছে। টাকা জুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হউক, আর ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই হউক, সে আর বিবাহ

করে নাই। তাহাদিগকে অনেক টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত; কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে সে তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিত, অত টাকা পাই কোথায় যে বিবাহ করিব?

আজ অপরাহ্নে আকাশে ভারী মেঘ করিয়াছে। সমস্ত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। প্রকৃতি এমনি ভাব ধরিয়া আছে যেন সে ইচ্ছা করিলে এখনই প্রবলধারে জল ঢালিতে পারে এবং ইচ্ছা না করিলে হয়ত এখনও তিন চারি ঘণ্টা স্থগিত রাখিতে পারে।

পিসি রাসমণি ডাকিয়া বলিলেন, ও ললনা, ঘরে যে একফোঁটা খাবার জল নেই। চট করে ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয় না, মা।

ললনা কলসী কাঁকালে গঙ্গার ঘাটে আসিল। জল লইয়া দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই মেঘ হইতে বড় বড় ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। ললনা হনহন করিয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। আসিবার পথেই সদানন্দর বাটী, পথের ধারের আটচালাঘরের বারান্দায় বসিয়া সে তখন রামপ্রসাদী সুরে কালীনাম গাহিতেছিল। ললনাকে দেখিয়া সে গান থামাইয়া বলিল, ললনা, ভিজচ কেন?

ললনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি গান থামালে কেন?

সদানন্দও হাসিল; হাসি গান তাহার মুখে অষ্টপ্রহর লাগিয়াই আছে। সুর করিয়া বলিল, গান থামিয়া গেছে, তাহার পর স্বাভাবিক স্বরে কহিল, সেকথা যাক, মিছামিছি ভিজো না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

ললনা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল দাঁড়িও না বাড়ি যাও।

সে কি?

পিসিমা বাড়ি নাই, বেশি জল আসিলে যাইবে কেমন করিয়া?

ললনা ভাবিল, সেকথাও বটে; দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া আসিল।

সদানন্দ বলিল, ফিরিলে কেন?

কাল রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল, জলে ভিজলে অসুখ বাড়তে পারে।

তবে যেও না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সদানন্দ তখন আপন মনে গান ধরিল—

> কভু তারে পাব না বুঝি, মিছে হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছি।
> কত জ্বালায় জ্বলে মরি, তুই কি জানবি পাষাণী মা!
> আমার সোনার তরি ডুববে এবার—

ললনা কলসী নামাইয়া গান শুনিতেছিল, মিষ্ট গলায় মিষ্ট গান তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া যাওয়ায় বলিল, ওকি থামিলে যে?

আর গাইব না।

কেন?

আর মনে নাই।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, তবে গাইলে কেন?

আমি অমন গেয়ে থাকি। তাহার পর কিছুক্ষণ আকাশপানে চাহিয়া বলিল, মেঘের উপর পদ্ম ফোটে, তুমি দেখেচ?

ললনা সহাস্যে বলিল, কই না, তুমি দেখেচ?

হ্যাঁ দেখেচি।

কবে দেখলে?

প্রায়ই দেখি। যখন আকাশে মেঘ হয় তখনই দেখতে পাই।

সদানন্দর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া ললনার হাসি আসিল। মুখে কাপড় দিয়া বলিল, তা কি হয়?

কেন হবে না? পদ্ম ত জলেই ফোটে, মেঘেতেও জলের অভাব নেই, তবে সেখানে ফুটবে না কেন?

মাটি না থাকলে শুধু জলেতে কি পদ্ম ফোটে?

সদানন্দ ললনার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল, তাই বটে! সেই জন্যই শুকিয়ে যাচ্ছে।

ললনা আর কিছু কহিল না। সকলেই জানিত সদাপাগলা দিনের মধ্যে অমন অনেক অসম্ভব ও অসংলগ্ন কথা কহিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সদানন্দ আবার কহিল, ললনা, শারদা আর তোমাদের বাটীতে যায় না?

ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বোধ হয় তখনকার মুখ সদানন্দকে দেখাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।

সদানন্দ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, যায় না?

না।

কেন?

তা বলতে পারি না।

সদানন্দ গান ধরিল—

গান থামিল, কিন্তু বৃষ্টি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। বরং আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। ললনা কাঁকে কলসী তুলিয়া লইল। সদানন্দ দেখিয়া বলিল, ওকি, যাও কোথা?

বাড়ি যাই।

এত বৃষ্টিতে যাইলে অসুখ করিবে যে।

কি করব!

ললনা চলিয়া গেলে সদানন্দ আবার গান ধরিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হারাণচন্দ্র যখন স্ত্রীর হস্তে পুরাপুরি দশটি টাকা গুণিয়া দিলেন তখন শুভদার মুখের হাসি ফুটিয়াও ফুটিতে পাইল না, বরং ম্লান হইয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এ টাকা তুমি কোথায় পেলে?

সেও সে টাকা হাসিয়া দিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল, শুভদা তোমার কি মনে হয় এ টাকা আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি?

শুভদা আরও মলিন হইয়া গেল। তাহার পাপ অন্তঃকরণে একথা হয়ত একবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কি বলা যায়? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা কি লওয়া উচিত? চুরি করা ধন খাইবার পূর্বে সে অনাহারে মরিতে পারে, কিন্তু আর সকলে? প্রাণাধিক পুত্রকন্যারা? শুভদা বুঝিল, একথা আলোচনা করিবার এখন সময় নহে, তাই টাকা দশটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

কতক সুখ-স্বচ্ছন্দে আবার দিন কাটিতে লাগিল। হারাণ মুখুজ্যেকে এখন আর বড় একটা হলুদপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটী আসিলে রাসমণি যদি জিজ্ঞাসা করে, তুই সমস্তদিন কোথায় থাকিস রে?

হারাণ বলে, আমার কত কাজ, চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই।

শুভদাও মনে করে তাহাই সম্ভব, কেননা আর সে পয়সা চাহিতে আসে না, কাল শোধ করিয়া দিব বলিয়া আর দুই আনা, চারি আনা ধার করিয়া লইয়া যায় না। সে কোথায় থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব, কেননা আমি তাহা জানি। সে সমস্তদিন অনাহারে অবিশ্রামে চাকরির উমেদারি করিয়া বেড়ায়। কত লোকের কাছে গিয়া দুঃখের কাহিনী কহে, কত আড়তদারের নিকট এমন কি সামান্য দোকানদারদিগের নিকটও খাতাপত্র লিখিয়া দিবে বলিয়া কর্ম প্রার্থনা করে, কিন্তু কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সে অঞ্চলে অনেকেই তাহাকে চিনিত; সেইজন্য কেহই বিশ্বাস করিয়া

রাখিতে চাহে না। সন্ধ্যার সময় হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বাটী ফিরিয়া আইসে; শুভদা ম্লান-মুখে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোথায় খেলে?

হারাণচন্দ্র স্ত্রীর কথায় হাসিবার চেষ্টা করে; বলে, আমার খাইবার অভাব কি? কে আমাকে না জানে?

শুভদা আর কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ তাহার কলসীর জল শুকাইয়া আসিতেছে, টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে; আর দুই-একদিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শুভদা তাহার স্বামীর নিকটে বলিতে পারে না, কাহাকেও জানাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না শুধু আপন মনে যাহা আছে তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করে।

আজ তিন দিবস পরে অনেক রাত্রে স্বামীর শ্রান্ত পা-দুটি টিপিতে টিপিতে শুভদা মনে মনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তর্কবিতর্ক করিয়া মুখ ফুটিয়া কহিল, আর নেই, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে।

হারাণচন্দ্র চক্ষু মুদিয়া সাধারণভাবে বলিলেন, দশ টাকা আর কতদিন থাকে।

আর কোন কথা হইল না। দুজনেই সে রাত্রের মত চুপ করিয়া রহিল। শুভদা ভাবিয়া-ছিল, কাল কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে; কিন্তু পারিল না। বিনা কারণে নিজেই অপরাধী সাজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল, খরচ করিতে করিতে টাকা কেন ফুরাইয়া যায়, এজন্য বিশেষ তিরস্কৃত হইবে। সত্য সত্য তিরস্কৃত হইলে বোধ হয় সে দোষ ক্ষালন করিতে প্রয়াস পাইত, কিন্তু তৎপরিবর্তে সহানুভূতি পাইয়া আর কথা ফুটিল না।

পরদিন ভোর না হইতেই হারাণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। ললনা যেরূপ গৃহকর্ম করে, করিতে লাগিল। রাসমণি নিয়মিত স্নান করিয়া আসিয়া মাটির শিব গড়িয়া ঘরে বসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, শুধু শুভদার হাত পা চলে না, ম্লানমুখে এখানে একবার, ওখানে একবার করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা আটটা বাজে দেখিয়া ললনা কহিল, মা, তুমি আজ ঘাটে গেলে না? বেলা যে অনেক হ'ল।

এই যাই।

ললনা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জননী সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মা?

কিছুই না।

তবে অমন করে বসে আছ যে?

আর কি করব?

সেকি? নাবে না? ভাত চড়াবে না?

শুভদা তাহার চক্ষু দুটি কন্যার মুখের উপর রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ কিছু নেই।

কি নেই?

কিছুই নেই। ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত নেই।

ললনার মুখ শুকাইয়া উঠিল—তবে কি হবে মা? ছেলেরা কি খাবে?

শুভদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, একবার তোর বিন্দুপিসির কাছে গেলে হয় না?

কেন মা?

যদি কিছু দেয়।

ললনা চলিয়া গেলে শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন কথা সে আর কখন বলে নাই, এমন করিয়া ভিক্ষা করিতে কন্যাকে আর কখন সে পাঠায় নাই। সে কথাই তাহার মনে হইতেছিল। লজ্জা করিতেছিল, বুঝি একটু অভিমানও হইয়াছিল। কাহার উপরে? জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত স্বামীর মুখ মনে করিয়া উপরপানে হাত দেখাইয়া বলিত—তাঁর উপরে!

কপোলে হাত দিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে শুভদা বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় এগারোটা

বাজে; এমন সময় ছলনাময়ী একটা বেনে পুতুলের সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে এবং পুঁতির মালায় তাহার হস্তপদহীন ধড়খানা বিভূষিত করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা, ভাত দাও।

শুভদা তাহার মুখপানে চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

ছলনা আবার বলিল, বেলা হয়েচে, ভাত দাও মা।

তথাপি উত্তর নাই।

এ হাতের পুতুল ও হাতে রাখিয়া ছলনা আরো একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, ভাত বুঝি এখনো হয়নি?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেন হয়নি? তুমি বুঝি বেলা পর্যন্ত শুয়েছিলে! তাহার পর কি মনে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উনুনে আগুন পর্যন্ত এখনো পড়েনি বুঝি?

শুভদা বাহির হইতে ক্ষুব্ধভাবে কহিল, এইবার দেব।

ছলনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মার মুখখানা দেখিয়া এইবার যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কাছে বসিয়া বলিল, মা, এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি কেন?

এইবার সব হবে।

মা, তুমি অমন করে আছ কেন?

এই সময়ে ঘরের ভিতর হইতে পীড়িত মাধব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল ও মা!

শুভদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছলনাময়ীও দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি ব'স, আমি মাধবের কাছে গিয়ে বসি।

তাই যা, মা।

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ললনা খিড়কির দ্বার দিয়া ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিন্দুবাসিনী সেখানে নাই। পূর্বরাত্রেই সে শ্বশুরবাটী চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে হঠাৎ যাইতে হইয়াছিল, না হইলে শুভদার সহিত নিশ্চয় একবার দেখা করিয়া যাইত।

ম্লানমুখে ললনা ফিরিয়া আসিল। পথে তাহার কিছুতেই পা চলিতে চাহে না। গাঙ্গুলীবাড়ি যাইবার সময় লজ্জায় তখনও পা চলিতেছিল না। কিন্তু শুধুহাতে ফিরিয়া আসিবার সময় আরো লজ্জা করিতে লাগিল। পথের ধারে একটা গাছতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া অন্য পথে গঙ্গার ঘাটপানে চলিল।

নিকটে চক্রবর্তীদের বাটী। বাহিরে আটচালার পার্শ্বে সদানন্দ একটা গোবৎসকে বহুবিধ সম্বোধন করিয়া আদর করিতেছিল। ললনা সেইখানে প্রবেশ করিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল ললনা, তুমি যে!

পিসিমা বাড়ি আছেন?

না। এইমাত্র কোথায় গেলেন।

ললনা ইতস্ততঃ করিয়া একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ গোবৎসকে ছাড়িয়া দিয়া ললনার মুখপানে চাহিয়া বলিল পিসিমার কাছে দরকার আছে কি?

হাঁ।

তিনি ত বাড়ি নেই, আমাকে বললে হয় না?

ললনাও সেই কথা ভাবিতেছিল, কিন্তু সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র লজ্জায় তাহার সমস্ত বদন লাল হইয়া গেল। বাটীতে কিছু খাইবার নাই সেইজন্য আসিয়াছি--ছি ছি! একথা কি বলা যায়? একদিন না খাইলে কি চলে না? কিন্তু আর সবাই? শুভদাও একদিন ঠিক এই কথাই ভাবিয়াছিল, আজ ললনাও তাহাই ভাবিল—তবু মুখ ফুটে না। যে কখনো এই অবস্থায় পড়িয়াছে, সে-ই জানে ইহা বলা কত কঠিন! সেই কেবল বুঝিবে ভদ্রলোকের একথা বলিতে গিয়া বুকের মাঝে কত আন্দোলন, কত ঘাত-প্রতিঘাত

হইয়া যায়। বলিবার পূর্বে কেমন করিয়া জিহ্বার প্রতি শিরা আপনা-আপনি আড়ষ্ট হইয়া ভিতরে ভিতরেই জড়াইয়া যায়!

ললনা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না; কিন্তু সদানন্দ যেন বুঝিতে পারিল, তাহার মুখ দিয়া ভিতরের ছায়া বুঝি কতক অনুমান করিয়া লইল, তাই হাসিয়া উঠিয়া ললনার হাত ধরিল। সে পাগল: সকলেই জানিত সদাপাগলার মতি স্থির নাই। এমন অনেক কাজ সে করিয়া ফেলিত যাহা অন্যে করিতে পারিত না; অন্যে যাহাতে সঙ্কোচ করিত, সে হয়ত তাহাতে সঙ্কোচ করিত না: অন্যকে যাহা মানাইত না, তাহাকে হয়ত সেটা মানাইয়া যাইত। তাই স্বচ্ছন্দে আসিয়া সে ললনার হাত ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, আজ বুঝি ললনার তার সদাদাদাকে লজ্জা হইতেছে? সদাপাগলাকে বুঝি লজ্জা করিতে হয়? হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, কথা বলিবে না?

সদানন্দের গলার স্বর, কথার ভাব—একরকমের। হাসিতে হাসিতেও সে অনেক সময় এমন কথা বলিত, যাহা শুনিলে চোখের জল আপনি উছলিয়া উঠে। তথাপি ললনা কথা কহে না। এবার সদানন্দ মুখ তুলিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল, কি রে ললনা? কিছু হইয়াছে কি?

ললনা মুখ নীচু করিয়া চক্ষু মুছিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, আমাকে একটা টাকা দাও।

সদানন্দ পূর্বের মত বরং আরো একটু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, এই কথা! এটা বুঝি আর সদাদাদাকে বলা যায় না? কিন্তু টাকা কি হবে?

তখনও লজ্জা! ললনা ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জায় আরো একটু রক্তবর্ণ হইয়া বলিল বাবা বাড়ি নেই।

সদানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটার পরিবর্তে পাঁচটা টাকা আনিয়া ললনার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, মানুষের মত মানুষ হলে তাহাকে লজ্জা করিতে হয়। পাগলকে আবার লজ্জা কি? তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন কিছু প্রয়োজন হইবে তখন ক্ষ্যাপা পাগলাটাকে আগে আসিয়া বলিও। কেমন বলিবে ত?

ললনা দেখিল তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বলিল, এত টাকা কি হইবে?

রাখিয়া দিলে পচিয়া যাইবে না।

তা হোক, এত টাকায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে দেখিয়া সদানন্দ আবার আসিয়া তাহার হাত ধরিল। কাতরভাবে বলিল, ছি, ছেলেমানুষি ক'রো না। টাকার প্রয়োজন না থাকে অন্যদিন ফিরাইয়া দিও। আর একথা কাহাকেও বলিও না; তবে নিতান্ত যদি বলিতে হয়, বলিও যে সদাপাগলা টাকায় চার পয়সা হিসাবে সুদে টাকা ধার দিয়েছে।

দিনমান এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলে আহার করিল, কিন্তু শুভদা সেদিন জলস্পর্শও করিল না। রাসমণি অনেক গালাগালি করিলেন, ললনা অনেক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু কিছুই সেদিন তাহার মুখে উঠিল না।

সন্ধ্যার পর হারাণচন্দ্র রুক্ষ মাথায়, একহাঁটু ধুলো লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রের কোঁচার একপার্শ্বে সের দুই আন্দাজ চাউল, অপরপার্শ্বে একটু লবণ দুটো আলু, দুটো পটল, আরো এমনি কি কি বাঁধা ছিল। একটা পাত্র আনিয়া সেগুলি খুলিয়া রাখিবার সময় শুভদা কাঁদিয়া ফেলিল। চাউল একরকমের নহে; তাহাতে সরু, মোটা আতপ সিদ্ধ সমস্তই মিশ্রিত ছিল। শুভদা বেশ বুঝিতে পারিল, তাঁহার স্বামী তাহাদিগের জন্য এইগুলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার একটু পূর্বে মাধব বলিল, বড়দিদি, আমি বোধ হয় আর ভাল হতে পারব না।

ললনা সস্নেহে ভ্রাতার মস্তকে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল, কেন ভাই ভাল হবে না? আর দুদিনেই তুমি সেরে উঠবে।

কত দুদিন কেটে গেল, কই সেরে ত উঠলাম না।

এইবার সারবে।

আচ্ছা, যদি ভাল না হই?

নিশ্চয় হবে।

যদি না হই?

ললনা তাহার দুর্বল ক্ষীণ হাত দুইটি আপনার হাতে লইয়া অল্প গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ওকথা মুখে আনতে নেই।

মাধব আর কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ললনা কহিল, কিছু খাবি কি?

মাধব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কিছুক্ষণ পরেই ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল। ললনা একটা ছোট কাচের গ্লাসে একটু পাঁচন ঢালিয়া মাধবের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, খাও।

মাধব পূর্বের মত শিরশ্চালন করিল। ঔষধ সে কিছুতেই খাইবে না। সে এরূপ প্রায়ই করিত, তিক্ত ঔষধ বলিয়া কিছুতেই খাইতে চাহিত না, কিন্তু একটু জোর করিলেই খাইয়া ফেলিত।

ললনা বলিল, ছিঃ, দুষ্টামি করে না—খাও।

মাধব হস্তে গ্লাস লইয়া সমস্ত ঔষধটা নীচে ফেলিয়া দিল।

মাধব আর কখনও এরূপ করে নাই। ললনা বিস্মিত হইল, ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, ও কি মাধু!

আমি ওষুধ আর খাব না।

কেন?

মিছামিছি খাব কেন? যদি ভালই হব না, তবে ওষুধ খেয়ে কি হবে?

কে বলেচে ভাল হবে না?

মাধুব চুপ করিয়া রহিল।

ললনা নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, মাধু, আমার কথা শুনবে না?

বালক সুলভ অভিমানে তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

আমার কথা কেউ শোনে না, আমিও কারো কথা শুনব না।

কে তোমার কথা শোনে না?

কে শোনে? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে মা রাগ করেন, বাবা রাগ করেন, পিসিমা কথা কন না, তুমিও রাগ কর, তবে আমি কেন কথা শুনব?

মাধবের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললনা সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি শুনব।

তবে বল, আমি ভাল না হলে কি রোজ এমনি করেই শুয়ে থাকব?

তা কেন?

তবে কি?

ললনার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কোন কথা কহিতে পারিল না।

মাধব তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বড়দিদি, আমাদের ছোটভাই যাদুর অসুখ হয়েছিল, কিন্তু সে ভাল হ'ল না। তার পর মরে গেল। বাবা কাঁদলেন, মা কাঁদলেন, পিসিমা কাঁদলেন, তুমি কাঁদলে—সবাই কাঁদলে—মা আজও কাঁদেন, কিন্তু সে আর

এল না, আমিও যদি তার মত মরে যাই?

ললনা দুই হস্তে নিজের মুখ আবৃত করিল। অন্যসময় হইলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিত, কিন্তু এখন পারিল না। মাধবও কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর পুনর্বার কহিল, বল না বড়দিদি, মরে গেলে কি হবে?

ললনা মুখ আবৃত করিয়াই কহিল, কিছু না--শুধু আমরা কাঁদব। বুঝি সে তখনই কাঁদিতেছিল।

মাধব বুঝিতে পারিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু সে আজ আর ছাড়িবে না; অনেকদিন হইতে যে কথার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা আজ সমস্ত জানিয়া লইবে। তাই পুনর্বার বলিল, দিদি, মরে গিয়ে কোথায় যেতে হয়?

ললনা উপর পানে চাহিয়া বলিল,—ঐখানে- আকাশের উপরে।

আকাশের উপরে? বালক বড় বিস্মিত হইল--কিন্তু সেখানে কার কাছে থাকব?

ললনা অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, আমার কাছে।

মাধব অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। হাসিয়া বলিল, তবে ভাল। আচ্ছা, আমাদের সেখানে বাড়ি আছে?

আছে।

তবে আরো ভাল। আমরা দুজনে সেখানে বেশ থাকব, না?

হাঁ। ললনা মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন তাহাই হয়।

মাধব হাত দিয়া তাহার মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া বলিল, বড়দিদি, সেখানে যা ইচ্ছে তাই খেতে পাওয়া যায়—না?

যায়।

অনেক ডালিম আছে?

আছে।

বালক একগাল হাসিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিল। যেন এত আনন্দ সে একপার্শ্বে একভাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া বলিল, দিদি, কবে যাওয়া হবে?

মাধু!

কি দিদি?

মাকে ছেড়ে তুই কেমন করে যাবি?

কেন, মা-ও ত যাবে!

যদি না যায়?

আমি ডেকে নিয়ে যাব।

তাতেও যদি না যায়?

এইবার মাধব বড় বিষণ্ণ হইল। দিদি, মা কি কখন যাবে না?

যাবে, কিন্তু অনেকদিন পরে।

তা হোক---আমরা আগে যাব; তার পর না হয় মা যাবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

না। একথা মাকে বললে তিনিও যাবেন না—আমাকেও যেতে দেবেন না।

মাধব ভয়ে ভয়ে বলিল, তবে বলব না। তুমি আমাকে ওষুধ দিয়ে খাও গে যাও; আমি শুয়ে থাকি।

ঔষধ খাইয়া, বাতাসা খাইয়া, জল খাইয়া, মাধবচন্দ্র মনের সুখে আকাশের কথা ভাবিতে লাগিল। সেখানে কত কি করিবে, কত ঘুরিয়া বেড়াইবে, কত ডালিম খাইবে, দুই-চারিটা জননীর নিকটে নীচে ফেলিয়া দিবে, ভাল ভাল পাকা ডালিম নিজে খাইয়া খোসাগুলো ছলনাদিদির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিবে, একটি দানাও তাহাতে রাখিবে না, ছলনাদিদি খুব চাহিবে, অনেক চাহিবে---তবে দুটো-একটা ফেলিয়া দিবে,—আরো কত কি শত-সহস্র কর্মের তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিতে করিতে মাধবচন্দ্র সে রাত্রের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

আর ললনা? সেও সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইল। পিসিমা রাসমণি, জননী শুভদা, ছলনা, হারাণচন্দ্র সকলেই ডাকাডাকি করিল, কিন্তু কিছুতেই সে উপরের দ্বার খুলিল না। বড় মাথা ধরিয়াছে—আমাকে ডাকিও না—আমি কিছুতেই উঠিতে পারিব না।

পরদিন হইতে মাধবচন্দ্র একটু অন্যরকম হইয়াছে। সে একে শান্ত, তাহার উপর আরো শান্ত হইয়াছে। ঔষধ খাইতে আর আদৌ আপত্তি করে না; এটা খাব না, ওটা দাও, ও খাব না, তা দাও, এরূপ একবারো বাহানা করে না। আজকাল সর্বদাই প্রফুল্ল। মা যদি কখন জিজ্ঞাসা করেন, মাধু, কিছু খাবি কি? সে বলে, দাও।

কি দেব?

যা হয় দাও।

বড়দিদি কাছে বসিয়া থাকিলে ত আর কথাই নাই। দুজনে চুপি চুপি অনেক কথা কহে, বিস্তর পরামর্শ করে; কিন্তু কেহ আসিয়া পড়িলে চুপ করিয়া যায়।

এখন হইতে হারাণের সংসারে আর তেমন ক্লেশ নাই। যখন বড় কিছু হয় তখনই ললনা দুটো-একটা টাকা বাহির করিয়া দেয়। শুভদা জানে, কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, রাসমণি ভাবে হারাণ কোথা হইতে লইয়া আসে, হারাণ ভাবে, মন্দ কি! যখন কোথা হইতে আসিতেছে, তখন কোথা হইতেই আসুক। আমিই বা কোথা হইতে আনিব? তবে একটা কথা তাঁহার আজকাল প্রায়ই মনে হইতেছে, সে কথাটা আফিমের মৌতাত সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, অভ্যাসটা বুঝি একেবারেই ছাড়িয়া যাইতেছে। আর ছাড়িলেই বা উপায় কি? বাহাল রাখিবার মত আফিম বা কোথা হইতে যোগাইব? যেমন করিয়াই হউক আর যাহা করিযাই হউক পেট ভরিয়া যখন চারিটা খাইতে পাইতেছি, তখন ওজন্য আর মন খারাপ করিব না; সময় ভাল হইলে আবার সবই হইবে, এখন যেমন আছি তেমনিই থাকি।

দিনকতক পরে সদানন্দর পিসিমাতা একদিন তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, বাবা, আমাকে একবার কাশী করিয়া লইয়া আইস; কবে মরিব কিছুই জানা নাই, অন্ততঃ এজন্মে একবার কাশী বিশ্বেশ্বর দেখিয়া লই।

সদানন্দ কোন কিছুতেই আপত্তি করে না, ইহাতেও করিল না। দুই-একদিন পরে কাশী যাইবে স্থির করিল। যাইবার দিন সন্ধ্যাবেলা 'ললনা, ললনা' ডাকিতে ডাকিতে সে একেবারে উপরে আসিয়া উঠিল। ললনা তখন উপরেই ছিল, সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ কোঁচার কাপড়ে করিয়া গোটা-পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া আনিয়াছিল, সেইগুলি খুলিয়া একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়া রাখিয়া বলিল, আমরা আজ কাশী যাইব। কবে ফিরিব বলিতে পারি না। যদি প্রয়োজন হয় এগুলি খরচ করিও।

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—এত টাকা?

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দও হাসিয়া উঠিল—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা বেশি টাকা নহে! দেখিতে অনেকগুলি বটে, কিন্তু খরচের সময় খরচ করিতে অনেক নহে।

কিন্তু এত—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সদানন্দ কি একরূপ হস্তভঙ্গি করিয়া একেবারে নীচে আসিয়া রন্ধনশালায় শুভদার নিকট আসিয়া বসিল।

খুড়িমা, আজ আমরা কাশী যাব।

শুভদা সে কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, কবে আসবে?

তা কেমন করে বলব? তবে পিসিমার কাশী দেখা হলেই ফিরে আসব বোধ হয়। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই এস বাবা। আশীর্বাদ করি নিরাপদে থেক।

সদানন্দ উচ্চ হাসিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন ললনা অর্ধেকগুলি টাকা নিজের নিকট রাখিয়া অপর অর্ধেক মাতৃসকাশে ধরিয়া দিয়া বলিল, মা, যাবার সময় সদাদাদা এই টাকাগুলি দিয়ে গেছেন।

শুভদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেগুলি গুণিতে লাগিলেন। গণনা শেষ করিয়া কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, সদানন্দ আর-জন্মে বোধ হয় আমাদের কেউ ছিল।

ললনা মাথা নাড়িয়া বলিল, বোধ হয়।
এত টাকা কি মানুষে দিতে পারে?
ললনা উত্তর দিল না।
ললনা, সদানন্দ কি পাগল?
কেন?
তবে এমন করে কেন?
দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হওয়া কি পাগলের কাজ?
তবে লোকে পাগল বলে কেন?
ললনা সহাস্যে বলিল, লোকে অমন বলে থাকে।

হারাণ মুখুজ্যের সংসারে আজকাল কষ্ট নাই বলিলেই হয়। খাওয়া-পরা বেশ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল।

কেহ বলিল, হারাণে বেটা নন্দীদের ঢের টাকা মারিয়াছে; কেহ বলিল, বেটা আজকাল একটা বড়লোক। কেহ বলিল, কিছুই নাই—বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। এমনি অনেক কথা হইত। যাহারা পর তাহারা একটু কম কৌতূহলী হইয়া রহিল, যাহারা একটু আত্মীয় তাহারা অধিক কৌতূহলী হইয়া মুখোপাধ্যায়-পরিবার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণঠাকুরানী সহসা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বলি বৌয়ের কি হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া চুকল কি?

শুভদা বলিল, হাঁ, এইমাত্র।

তখন কৃষ্ণঠাকুরানী পানের সহিত তামাকপত্র চর্বণ করিতে করিতে এবং পিক্ ফেলিতে ফেলিতে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করতঃ বলিলেন বৌ, হারাণ আজকাল করছে কি?

কি আর করবেন—চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছেন।

সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা উত্তর করিল না।

কৃষ্ণঠাকুরানী আবার বলিলেন, লোকে বলে হারাণ মুখুজ্যে নন্দীদের ঢের টাকা মেরেচে; সে আজকাল বড়লোক—তার খাবার ভাবনা কি? কিন্তু আমি ত সব কথা জানি, তাই বলি, সংসার এখন চলে কেমন করে?

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, অমনি একরকম করে।

হারামজাদা মাগী বামুনপাড়ার কাতি, সে-ই ত এই দুর্ঘটনা ঘটালে; ইচ্ছা করে মুখপুড়ীকে পাঁশ পেড়ে কাটি।

শুভদা একথা কানে না তুলিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, তোমার খাওয়া হয়েছে?

হাঁ বোন, হয়েছে। সেই হারামজাদীই ত এই সর্বনাশ ঘটালে। হারাণ মুখ্যু কিনা, তাই তার ফাঁদে পা দিলে। তিন হাজার টাকা চুরি করলি, না হয় দু শ' এক শ' মাগীর হাতেই এনে দিতিস! তবু ত কিছু থাকত?

শুভদা বলিল, ঠাকুরঝি, আজ কি রাঁধলে?

কি আর রাঁধব বোন? আজ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাতে-ভাত ছাড়া আর কিছুই করিনি। তা মাগীর কি ছাই একটু পরকালের ভাবনাও আছে? মিন্‌সে দুটো টাকার জন্যে যখন হাতে-পায়ে ধরলে, তখন কিনা ঘর থেকে বের করে দিলে! কিন্তু ভগবান কি নেই? বামুনের যেমন সর্বনাশ করেছে, তোর মতন সতীলক্ষ্মীর যখন চোখের জল ফেলিয়েচে তখন শাস্তি কি হবে না? তুই দেখিস, আমি বললাম

শুভদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, বিন্দু অমন হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি চলে গেল কেন?

ওর শ্বশুরের নাকি রাতারাতি কলেরা হয়েছিল। তা তুই এখন সংসারের কিরকম বন্দোবস্ত করবি?

আমি আর কি করব? ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে।

কৃষ্ণঠাকুরানী একটু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, তা ত হবেই। কিন্তু ভাবনার উপর ভাবনা হচ্ছে এই তোর ছোট মেয়েটা। ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল—এখন তার বিয়ে না দিলে ভালও দেখাবে না বটে, আর লোকেও পাঁচকথা বলবে। তার কি কিছু উপায় হচ্ছে?

শুভদা যখন ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, তখন ললনা সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছলনার কথা সে কতক শুনিতে পাইয়াছিল, এবং কতক অনুমান করিয়া লইয়া বেশ বুঝিল যে, সুসময়ই হউক, আর অসময়ই হউক, বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের বিবাহ না দিলে চলিবে না; সম্ভবতঃ জাতি যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শুক্লা একাদশী রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীতীরের অর্ধবনাবৃত একটা ভগ্ন শিবমন্দিরের চাতালের উপর একজন দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক যেন কাহার জন্য পথ চাহিয়া বহুক্ষণ হইতে বসিয়া আছেন।

যুবকের নাম শারদাচরণ রায়। এই হলুদপুর গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান। লেখাপড়া কতদূর হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্মদক্ষ তাহা বলিতে পারি। বৃদ্ধ পিতার সমস্ত সাংসারিক কর্ম নিজেই নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শারদাচরণের জননী জীবিত নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন হারাণ মুখুজ্যেদের বাটীর সহিত ইঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। রাসমণি ও শারদার জননী উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এখন তিনিও গত হইয়াছেন, আত্মীয়তা বন্ধুত্বও গত হইয়াছে। বিশেষ শারদাচরণের পিতা হরমোহনবাবু দরিদ্রের সহিত কোনরূপে সম্বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না।

এইখানে একটু ললনার কথা বলিয়া রাখি, কেননা, তাহার সহিত এ আখ্যায়িকায় আমাদিগের অনেক প্রয়োজন আছে। বালিকা-কাল হইতেই শারদার সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার পর তাহার বিবাহ হয়। হারাণবাবুর অবস্থা তখন মন্দ ছিল না, ক্ষুদ্র আয়তনে যতখানি সম্ভব, ঘটা করিয়া বড়মেয়ের বিবাহ দেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যে ললনা দুই বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইয়া বাটী ফিরিয়া আইসে। তখনও শারদাচরণের সহিত তাহার ভাব ছিল। সে ভাব কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দুইজনেরই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ক্রমে দুইজনেই বুঝিতে লাগিল যে, এ প্রণয় পরিণামে বড় সুখের হইবে না। শারদাচরণ না বুঝুক কিন্তু ললনা একথা বেশ বুঝিতে লাগিল। ক্রমশঃ ললনা ভালবাসার দোকান-পাট একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সে আর কাছে আসে না, আর আসিতে বলে না, আর ভালবাসা জানায় না, আর গোপনে তেমন করিয়া পত্র লিখে না—দেখিয়া শুনিয়া শারদাচরণ বড় বিপদে পড়িল। প্রথমে সে অনেক বুঝাইল, অনেক আপত্তি প্রকাশ করিল, অনেক যুক্তি দেখাইল, কিন্তু ললনা কর্ণযুগল বন্ধ করিয়া রহিল। একদিন সে একরূপ স্পষ্টই কহিল যে তাহার এসব আর ভাল লাগে না।

শারদাচরণও সেদিবস কুপিত হইল, বলিল, যদি ভাল লাগে না তবে এতদিন লাগিল কেন?

এতদিন ছেলেমানুষ ছিলাম, এখন বড় হইয়াছি।

বড় হইলে বুঝি আর ভাল লাগিতে নাই?

না।

কিন্তু বুঝিয়া দেখ—

কথা শেষ না হইতেই ললনা বলিয়া উঠিল, আর বুঝিয়া কাজ নাই। তুমি আমাকে আর কুপরামর্শ দিও না।

শারদাচরণ চটিয়া উঠিয়া বলিল, আমি বুঝি তোমাকে কুপরামর্শ দিই?

দাও না ত কি?

দিই?

দাও।

তবে এস আজ সব শেষ করে দিই।

ভালই ত।

তোমার সঙ্গে এজন্মে আমি আর কথা ক'ব না।

ক'য়ো না।

তখন দুইজনে দুইজনের গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। সমস্ত পথটা শারদাচরণ গর্জিতে গর্জিতে গেল, সমস্ত পথটা ললনা চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিল।

সে আজ চারি বৎসরের কথা। চারি বৎসর পরে শারদাচরণ আবার ললনার পথ চাহিয়া ভগ্ন মন্দিরে বসিয়া রহিল। সে পূর্বের কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ যাইতেছিল; কিন্তু ললনাই পুনর্বার অনুরোধ করিয়া তাহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে। তাই পূর্বের কথা পুনরায় একটির পর একটি করিয়া তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইতে লাগিল। কেহ বলে, বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে; কেহ বলে, বাল্যপ্রেম দৃঢ় হয় না; কেহ কহে, দৃঢ় হয়। যাহাই হউক এ-বিষয়ে ঠিকঠাক একটা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা নাই। সকল রকমই হইতে পারে; কিন্তু যাহাই হউক, ইহার একটি স্মৃতি চিরদিনের জন্য ভিতরে রহিয়া যায়। যেমন করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হউক না কেন, একটু ক্ষুদ্রতম শিকড় বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে অনেক হাত জমির তলে পাওয়া যায়।

শারদাচরণের অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। আজ চারি বৎসর পরে সে আবার আসিবে, কাছে বসিবে, কথা কহিবে! শারদার ভিতরটা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে যেন অল্প রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু কেন? কেন আসিবে? কেন আমাকে এসময়ে এস্থানে আসিতে অনুরোধ করিল? আর কি সম্বন্ধ আছে?

রাত্রি প্রায় একটা বাজে। একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সেই পথে আসিতে লাগিল। শারদাচরণ ভাবিল, একি ললনা? ললনাই ত বটে, কিন্তু বড় হইয়াছে।

ললনা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। শারদাচরণ সঙ্কোচ ছাড়িয়া বলিল, বসো।

তখন বহুদিন পর দুইজনে মুখোমুখি হইয়া চাঁদের আলোকে ভগ্ন মন্দিরে সেই চাতালের উপর উপবেশন করিল। বহুক্ষণ অবধি কেহ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর শারদাচরণ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, আমাকে এখানে ডাকাইয়া আনিলে কেন?

ললনা মুখ তুলিয়া বলিল, আমার প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

বলিতেছি।

পুনরায় বহুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইলে শারদাচরণ বলিল, কই বলিলে না?

বলিতেছি। পূর্বে তুমি আমাকে ভালবাসিতে, এখন আর বাস কি?

প্রশ্নের ভাবে শারদাচরণ বড় বিস্মিত হইল। কহিল, সে কথা কেন?

কাজ আছে।

যদি বলি এখনও ভালবাসি?

ললনা মৃদু হাসিয়া সলজ্জে বলিল, আমাকে বিবাহ করিবে?

শারদাচরণ একটু পিছাইয়া বসিল। বলিল, না।

কেন করিবে না?

তোমাকে বিবাহ করিলে জাতি যাইবে।

গেলেই বা।

খাইব কি?

খাইবার ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না।

কিন্তু পিতার মত হইবে না।

হইবে। তুমি তাঁহার ত একটিমাত্র সন্তান; ইচ্ছা করিলে মত করিয়া লইতে পারিবে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শারদাচরণ বলিল, তবুও হয় না।

কেন?

অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ পিতার মত হইলেও, তোমাকে বিবাহ করিলেই জাতি যাইবে। জাতি খুইয়ে হলুদপুর তিষ্ঠান আমাদিগের সুখের হইবে না। আর আমার এমন অর্থও নাই যে, তোমাকে লইয়া বিদেশে গিয়া থাকিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে তাহা ফুরাইয়াই যাউক, ইহা আমার ইচ্ছাও বটে, মঙ্গলের কারণও বটে।

ললনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তবে তাহাই হউক। কিন্তু আমার একটি উপকার করিবে?

বল, সাধ্য থাকে ত করিব।

তোমার সাধ্য আছে, কিন্তু করিবে কিনা বলিতে পারি না।

বল; সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমার ভগিনী ছলনাকে বিবাহ কর।

শারদাচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন, তাহার কি পাত্র জুটিতেছে না?

কে জুটিতেছে? আমরা দরিদ্র; দরিদ্রের ঘরে কে সহজে বিবাহ করিবে? শুধু তাই নয়। আমরা কুলীন; অঘরে বিবাহ দিলে হয়ত বর জুটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তোমরা আমাদের পালটি ঘর; তুমি বিবাহ করিলে সবদিকই রক্ষা হয়। বিবাহ করিবে?

আমি পিতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন। তাঁর মত না লইয়া কোন কথাই বলিতে পারিব না।

তবে মত লইয়া বিবাহ কর।

আমি যতদূর জানি, এ বিবাহে তাঁহার মত হইবে না।

ললনা ম্লানভাবে কহিল, কেন মত হইবে না?

তবে তোমাকে বুঝাইয়া বলি। লুকাইয়া কোন ফল নাই। আমার পিতা কিছু অর্থ-পিপাসু; তাঁহার ইচ্ছা যে আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন। তোমরা অবশ্য কিছুই দিতে পারিবে না, তখন বিবাহও হইবে না।

ললনা কাতর হইয়া বলিল, আমরা দরিদ্র, কোথায় কি পাইব? আর তোমাদের অর্থের প্রয়োজন কি? যথেষ্ট ত আছে।

শারদাচরণ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, সেকথা আমি বুঝি, কিন্তু তিনি বুঝিবেন না।

তুমি বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয় বুঝিবেন।

আমি একবার মাত্র বলিব; বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

ললনা নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিল, তবে কেমন করিয়া হইবে?

আমি কি করিব?

তোমার বোধ হয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই।

না।

ছলনার মত কন্যা তুমি সহজে পাইবে না। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্মিষ্ঠা—অধিকন্তু একজন দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার করা হইবে, একজন ব্রাহ্মণের জাতি-কুল রক্ষা করা হইবে এবং আমি চিরদিন তোমার কেনা হইয়া থাকিব। বল, এ বিবাহ তুমি করিবে?

পিতা যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

আজ তোমাকে সকল কথা বলি। হয়ত এজন্মে আর কখন বলিবার অবসর পাইব না, তাহাই বলি—তোমাকে লজ্জা কখন করি নাই, আজও করিব না। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া যাই—তোমাকে চিরদিন ভালবাসিয়া আসিয়াছি, এখনো ভালবাসি। একথা পূর্বে একবার বলিয়াছিলাম, আজ বহুদিন পরে আর একবার শেষ বলিলাম। তুমি, আমার একমাত্র অনুরোধ—বোধ হয় এই শেষ অনুরোধ—রাখিলে না। যা হইবার হইল, আর এমন কখন হইবে না। মিথ্যা তোমাকে এত ক্লেশ দিলাম, সেজন্য ক্ষমা করিও।

শারদাচরণ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ললনা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিল, পিতাকে এবিষয়ে অনুরোধ করিব।

ললনা না ফিরিয়াই বলিল, করিও।

কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞাধীন।
ললনা চলিতে চলিতে বলিল, তাহা ত শুনিলাম।
যদি কিছু করিতে পারি তোমাকে জানাইব।
ভাল।
ললনা, আমাকে ক্ষমা করিও।
করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

আমার নক্সা,—দাও বাবা চার আনা পয়সা। 'গাড্ডিলে'র হাত হইতে চারি আনা তাম্রখণ্ড গুণিয়া লইয়া হারাণচন্দ্র কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া রাখিলেন। যা থাকে কপালে—ধরলাম আট আনা। আট আনা পয়সা হারাণচন্দ্র সম্মুখে শতচ্ছিন্ন চাটায়ের উপর ঠুকিয়া রাখিয়া তাস হাতে লইলেন। সঙ্গীরা সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে স্ব স্ব তাস দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই হাত দুই-তিন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ফের নক্সা—দাও ত চাঁদ টাকা! 'গাড্ডিল' হারাণচন্দ্রকে টাকা দিয়া তাহার সম্মুখে তাস জোড়া নিক্ষেপ করিল। অপরাপর সকলে একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া স্ব স্ব তহবিল হাতড়াইয়া পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

আর চাই—আর চাই—আর চাই?

বস্ কর—আর না।

পনরতে চেপে যাও।

পচে যা—পচে যা বাবা—এই আমার নক্সা!

প্রায় নিশাবসানে হারাণচন্দ্র যখন স্থান পরিত্যাগ করিলেন তখন কোঁচার টিপ টাকায় পয়সায় রীতিমত ভারী। সে রাত্রে তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। পরদিনও এ দোকান সে দোকান করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বেলা চারিটার সময় যখন তিনি বাটীতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার চক্ষু অসম্ভব রক্তবর্ণ; মুখ, নাক, কাপড়, চাদর, সর্বাঙ্গ হইতে গঞ্জিকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

হারাণচন্দ্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলে শুভদা সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, আজ বড় বেলা হয়েচে।

কি করি বল, কাজের গতিকে বেলা হয়ে যায়। তুমি এখনো কি খাওনি?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওনি?

এইবার খাব।

হারাণচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এসব তোমার বড় অন্যায়। আমার কিছুই ঠিক নেই। যদি সমস্ত দিন না আসি, তাহলে কি সমস্ত দিন উপবাসী থাকবে?

দুই-এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়া হারাণচন্দ্র শুভদার পানে চাহিয়া বলিলেন, কাল সকালবেলা তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলে, না?

শুভদা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কই না।

চাওনি? আমি ভেবেছিলাম চেয়েছিলে। পরে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কাল না চেয়ে থাক, দুদিন পরে ত চাইতেই হবে—সে একই কথা। আমার ঐ চাদরের খুঁটে গোটা আষ্টেক টাকা বাঁধা আছে, তা থেকে গোটা পাঁচেক তুমি নিও।

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সে আজ বড় বিস্মিত হইল; বহুদিন হইতে এরূপ কখন হয় নাই। বহুদিন হইল তিনি এরূপ স্বইচ্ছায় শুভদার হাতে টাকা দিতে আসেন নাই। আহারাদি শেষ হইলে শুভদা বলিল, টাকা পেলে কোথায়?

আজ হারাণচন্দ্রের মুখ ফুটিয়া হাসি বাহির হইল। বলিলেন, ওগো, আমাদের টাকার

জন্য ভাবতে হয় না। পুরুষমানুষের পেটে যদি বুদ্ধি থাকে ত তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটায় টাকা ছড়ান থাকে। বুঝেছ?

শুভদা কি বুঝিল সে-ই জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুইমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আজ সন্ধ্যার সময় শুভদা ললনার কাছে বসিয়া নিতান্ত মলিন হইয়া বলিল, ললনা, মা, আজ কি কিছু নেই?

কিছুই নেই মা।

কতদিন ওকথা তুই বলেচিস, কিন্তু তার পরেই দু আনা চার আনা বের করে দিয়েচিস; দ্যাখ মা, যদি কিছু থাকে, নাহলে আজ রাতে জলবিন্দুও কারো মুখে যাবে না।

জননীর কাতর মুখ ও অশ্রুজড়িত গদগদ স্বর শুনিয়া ললনা কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই নেই মা। তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কিছু নেই।

তখন দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। কন্যাকে অনেকটা অবিশ্বাসী করার মত হইয়াছে বলিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু ললনার অশ্রু অন্য কারণে বহিতে লাগিল। সে 'কিছু নাই' বলিয়াও ইহার পূর্বে দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ বাস্তবিকই কিছু দিতে পারিল না। সদানন্দ-প্রদত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রার শেষ বিন্দুটি আজ প্রাতঃকালে নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সকলে কি খাইবে, কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে, না খাইতে দিতে পারিয়া জননীর মন কেমন হইবে, প্রাতঃকালে আবার কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে, এই সব ভাবিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। বিন্দু ছিল, সে এখন নাই; সদানন্দ ছিল, সেও এখানে নাই। শুধু কি তাই? আজ দুইদিন হইতে হারাণচন্দ্রেরও দেখা নাই। সম্ভবতঃ গুলির দোকানে, নাহয় জুয়ার আড্ডায়।

এখানে একটু হারাণচন্দ্রের কথা বলি, তিনি গাঁজা টিপিতেন, গুলি খাইতেন, ছয় পয়সা চারি পয়সা কর্জ করিতেন, দুই আনা চারি আনা শুভদার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া আদায় করিতেন, নিতান্ত দায়ে পড়িলে ফোঁটা কাটিয়া গামর ছাইভস্ম মাখিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের শেষ বৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, কিন্তু জুয়ার মর্ম বিশেষ অবগত ছিলেন না। এখন এইটি হইয়াছে। জুয়াখেলার প্রথম অংশে যেরূপ হয়, অর্থাৎ দুই-চারি পয়সা পাওয়া যায়, দুই-চারি টাকা লাভ হয়—তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, অদৃষ্টও তেমনি গুটাইয়া আসিতে লাগিল। শুভদাকে সেই পাঁচ টাকা দেওয়াই তাঁহার শেষ দেওয়া হইল। তাহার পর যে একেবারে কিছুই পান নাই তাহা নহে। কখন কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আয় অপেক্ষা ব্যয় ভাগটাই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে তিনি হলুদপুরে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। এখন আবার বামুনপাড়ায় তিষ্ঠানও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথিমধ্যে যে-কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় সে-ই কিছু-না-কিছুর জন্য দাবী করিয়া বসে। দুই পয়সা চারি পয়সা, দুই আনা চারি আনা, এমন প্রত্যেক পরিচিত লোকের নিকটই তাঁহার 'কাল দিব' বলিয়া কর্জ করা আছে; প্রতি দোকানদারের তাঁহার নিকট চারি আনা, আট আনা পাওনা আছে। এই সকল কারণে বামুনপাড়ায় তাঁহাকে সচরাচর আর দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে সন্ধ্যার সময় গুলির দোকানটা অনুসন্ধান করিলে একপার্শ্বে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। একটু অধিক রাত্রি হইলে জুয়ার আড্ডাঘরের ঝাঁপ খুলিয়া প্রবেশ করিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অধিক রাত্রিই তাঁহার এইখানে অতিবাহিত হয়। পয়সা নাই বলিয়া নিজে খেলিতে পারেন না, কিন্তু পরের খেলায় বাজি মারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি পয়সা লাভ করেন। খেলিতে বসিয়া কেহ উঠিতে চাহে না, হারাণচন্দ্র সে-সময়ে তামাক সাজিয়া সরবরাহ করেন, বিজেতার পক্ষ টানিয়া দুটো কথা কহিয়া, দুটো রসিকতা করিয়া, হাতে পৈতা জড়াইয়া দুবার দুর্গানাম জপ করিয়া জয়ী পক্ষের মন রাখিয়া, মৌতাতের জোগাড়টা করিয়া লন। যে দিবস কিছু অধিক আদায় হয় সেদিন নিজেই দুহাত খেলিতে বসেন। হয় কিছু পান, নাহয় লাভের অংশ পিপীলিকায়

ভক্ষণ করিয়া ফেলে। দুই-চারি আনা হাতে হইলে সেদিন আর তাহাকে পায় কে? গুলির দোকানে আসিয়া সার্বেকি চালে মুরুব্বির আসন গ্রহণ করেন; অনেককে রাজা-উজির প্রভৃতি উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া শুভদার মুখখানা মনে করিতে করিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অন্ন আছেই। শুভদার জমিদারি কখন ফুরাইবে না; তাঁহার মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা শুভদা কখনও রিক্তহস্ত হইবে না। কাহারও না থাকুক, তাঁহার একমুঠা অন্ন আছেই। কিন্তু বাটী আসিবার সময় তাঁহার একটু মুশকিল হয়; যেন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয়, বাটীর নিকটবর্তী হইয়া পা যেন আর তেমন করিয়া চলিতে চাহে না। অবশেষে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনাকে আরও একটু বিব্রত বোধ করিতে হয়। শুভদা যেরূপভাবে পা ধুইবার জল লইয়া আইসে, যেরূপভাবে পা মুছাইয়া দিতে আইসে, যেরূপ শুষ্কমুখে ভাতের থালাটি সম্মুখে ধরিয়া দিয়া মৌন হইয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে বসিয়া থাকে, তাহাতে হারাণচন্দ্রের মনটাও কেমন কেমন করিতে থাকে, ভাতের গ্রাসগুলো তেমন স্বচ্ছন্দে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। বেলা পাঁচটাই হউক আর রাত্রি তিনটাই হউক—হারাণচন্দ্র দেখিতে পায় শুভদা একইভাবে না খাইয়া না বিশ্রাম করিয়া তাহার ভাতের থালাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে। একবার বলে না কেন এত বেলা হইল; একবার জিজ্ঞাসা করে না এত রাত্রি করিলে কেন? তাহার বিরস মৌন মুখখানাই তাহাকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে; সে বুঝিতে পারে, সে স্বামী হইলেও এত শ্রদ্ধা এত ভক্তির উপযুক্ত নহে, তা এত যত্ন এত আদব সে নির্বিবাদে ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। সে দেখিতে পায়, একজন ক্রমাগত অপরাধ করিয়া আসিতেছে, আর একজন ক্রমাগত ক্ষমা করিয়া যাইতেছে, তাই গুলিখোর গাঁজাখোর হইলেও তাহার চক্ষুলজ্জা করে। শুভদা একবার তিরস্কার করে না, একবার রাগ করে না, একবার ভাবভঙ্গিতেও প্রকাশ করে না যে তুমি অমন করিও না, অমন করিলে আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না। হারাণচন্দ্রের বোধ হয়, যেন তাহার নিজের বিচার তাহাকে নিত্য নিত্য নিজেই করিতে হইতেছে। নিত্য নিত্য এমন করিয়া অবিচার করিতে যেন মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বোধ হয়। যাহা হউক, এমনি করিয়াই দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

অদ্য অনেকরাত্রে হারাণচন্দ্র বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আজ তাঁহার একটু অন্যরূপ ঠেকিল। আজ শুভদা পদপ্রক্ষালনের জল লইয়া আসিল না, নির্দিষ্ট স্থানে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া কেহ বসিয়া নাই। এককোণে একটা প্রদীপ অতি ম্লানভাবে টিপটিপ করিতেছে, দীপালোক উজ্জ্বল করিতে গিয়া হারাণচন্দ্র দেখিলেন তাহাতে তৈল পর্যন্ত নাই। তাঁহার ভয় হইল; আজ দুইদিন তিনি বাটী আইসেন নাই, বুঝি-বা ইহার মধ্যে কিছু হইয়া গিয়াছে। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া হারাণচন্দ্র নিজের মনে কিসব ভাবিতে লাগিলেন।

ভোর হইয়া আসিতেছে তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হারাণচন্দ্র কি ভাবিয়া চোরের ন্যায় শতছিন্ন পাদুকাটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

অলক্ষিতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা হইল না। চাতালের উপর ছলনাময়ী বসিয়াছিল। অত ভোরে সে কখন গাত্রোত্থান করে না, কিন্তু আজ কি জানি কেন উঠিয়া বাহিরে বসিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, তুমি কখন এলে?

হারাণচন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিলেন, কাল রাতে।

আচ্ছা বাবা, তোমার কি আক্কেল বল ত? কাল মা, পিসিমা, বড়দিদি—কেউ একবিন্দু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি, আর তুমি চুপি চুপি জুতো হাতে করে পালিয়ে যাচ্ছ? আজ আমরা কি খাব বল ত?

হারাণচন্দ্রের বোধ হইল ছলনাময়ী যেন তাহার মাথাটা কাটিয়া লইয়াছে। হাতের জুতা আপনা-আপনি খসিয়া নীচে পড়িয়া গেল; থতমত খাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, সত্যি তাই কি?

ছলনা আরও চীৎকার করিয়া ডাকিল, ও পিসিমা, শুনচ বাবার কথা? আমি যেন

মিথ্যে কথা বলচ? কাল সমস্ত রাত মা আর বড়দিদি কেঁদেচে—তুমি তা কেমন করে জানবে বল? শুধু খেতে আসা বৈ ত আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

হারাণচন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, জুতা জোড়াটি হাতে তুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

ছলনা আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, বাবা পালিয়ে গেল।

ছলনা ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, তাহার উপর বিষম দুর্মুখ। কাহাকে কি বলিতে হয়, কখন কি বলিতে হয় সে কখনও শিখে নাই। ললনা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। পিতা চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে ছলনার সম্মুখে আসিয়া বলিল, ছলনা, তোমার একটুও কি বুদ্ধি নেই?

কেন?

কাকে কি বলতে হয় এখনো কি শেখনি? বাবাকে অমন করে কি বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়?

ছলনা কুপিত হইয়া কহিল, আমি তাড়িয়ে দিলাম, না আপনি পালিয়ে গেল!

ছিঃ! বাপকে কি ওকথা বলতে আছে?

কেন বলতে নেই? বাপের মত বাপ হলে তাকে কিছু বলতে নেই, কিন্তু অমনধারা বাপকে সব বলতে আছে। কার বাপ অমন করে দৌড়ে পালিয়ে যায়? কার বাপ অমন করে গাঁজা-গুলি খেয়ে বাইরে পড়ে থাকে? আমি খুব বলব—আরো বলব।

ললনা বিরক্ত হইয়া বলিল, এখান থেকে তুই চলে যা।

আমি কেন চলে যাব, তুই চলে যা। তুই আমার উপর গিন্নিপনা করতে আসিস নে।

হার মানিয়া ললনা মৌনমুখে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, শুভদা রাসমণির কাছে একটা কাংস্যপাত্র রাখিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, বেলা অনেক হ'ল, আজ তিনি বোধ হয় আর আসবেন না? এই ঘটিটা বাঁধা দিয়ে দেখ না যদি কিছু পাওয়া যায়।

রাসমণি শুভদার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বড় লজ্জা করে বৌ।

ললনা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, মা, আমি একবার দেখে আসি।

শুভদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কোথায়?

ললনা মৃদু হাসিয়া একবার পিসিমাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, এই ঘোষেদের দোকানে।

তুই যাবি মা!

কেন, তাতে আর লজ্জা কি? আমি এখানকার মেয়ে; ছেলেবেলা থেকে আমাকে সবাই দেখচে, আমার আর লজ্জা কি? সুসময় অসময় কার ঘরে নেই মা?

ললনা চলিয়া যায় দেখিয়া রাসমণি তাহার হস্ত হইতে ঘটিটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, তবে আমিই যাই।

সেদিন বেলা তিনটার পরে সকলের আহার হইল। সকলে তৃপ্ত হইলে শুভদা ললনাকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ললনা, লুকিয়ে দুটো শজনে শাক ছিঁড়ে আন না মা!

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিল, এত বেলায় কি হবে বল?

আমার দরকার আছে।

কি দরকার মা?

শুভদা অল্প হাসিয়া বলিল, তোর শুনে কি হবে?

কথার ভাবে ললনা যেন কতক বুঝিতে পারিল, বলিল, হাঁড়িতে বুঝি ভাত নেই?

ভাত কেন থাকবে না?

তবে কেন?

গৃহস্থঘর; দুটো সিদ্ধ করে রাখতে দোষ কি?

ললনা কাতর হইয়া বলিল, সত্যি কথা বল না মা, কি হয়েচে?

কি আর হবে?

তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লুকিয়ো না, মা। ললনা পায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, জননী তাহা ধরিয়া ফেলিল। আরো একটু নিকটে আসিয়া তাহার কপালের উপর চুলগুলি কানের পাশে গুঁজিয়া দিতে দিতে প্রসন্নমুখে বলিল, একজনের বেশি ভাত নেই; তিনি যদি আসেন, তাই—

তাই বুঝি তুমি শুধু সজনে পাতা চিবিয়ে থাকবে?

শুভদা পূর্বের মত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, শজনে পাতা কি অখাদ্য?

অখাদ্য নয় বলে কি শুধু খায়?

তা হোক। তখন তুই ত বললি ললনা, সুসময় অসময় কার ঘরে নেই! তাই অসময়ে সুসময়ের কথা মনে রাখতে নেই। আবার যখন ভগবান মাপবেন, তখন আবার সব হবে। তখন— এবার শুভদার চক্ষেও জল আসিয়া পড়িল।

ললনা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জননীর পদপ্রান্তে একরাশি শজিনার পাতা ফেলিয়া দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। একজন ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরিয়া বামুন পাড়ার একটি ক্ষুদ্র মুদির দোকানের একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দোকানটি ক্ষুদ্র। দুই-এক পয়সার খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কেহ বড় একটা এস্থানে আইসে না। কত লোক আসিতেছে; এক পয়সার তৈল কিনিতেছে, দুই পয়সার দাল কিনিতেছে, সিকি পয়সার লবণ কিনিতেছে, তাহার পর চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ভিক্ষুক কিন্তু কোন কথাই কহে না, ক্রয়-বিক্রয় দেখিতেছে ও দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে দোকানদারের চক্ষু সেদিকে পড়িল; তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তুমি কি নেবে গা?

ভিক্ষুক মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না।

দোকানদার বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে মি‌ছে এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়িও না।

এইসময় একজন খরিদ্দার বলিয়া উঠিল, ও বুঝি ভিক্ষে করতে এসেছে!

দোকানদার অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যাও যাও, এখানে কিছু মিলবে না। সন্ধ্যার সময় আবার ভিক্ষে কি?

লোকটা চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঠিক পূর্বস্থানে দাঁড়াইল। দোকানদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আবার এলে যে?

চাল কিনবে?

কি চাল? কত ক'রে?

মোটা চাল।

কৈ দেখি।

লোকটা একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ।

দোকানদার দ্রব্য দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল—এ যে ভিক্ষে করা চাল। ক'টা পয়সা নিবি?

চাউল-বিক্রেতা দোকানদারের মুখপানে চাহিয়া বলিল, দু'আনা।

ইস্—চারটে পয়সা দাম হয় না, আবার দু'আনা? আমি নিতে চাইনে।

লোকটাকে বোধ হয় চিনাইয়া দিতে হইবে না। ইনি আমাদের হারাণচন্দ্র!

হারাণচন্দ্র নিকটবর্তী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দোকানদারের বাপান্ত করিতে করিতে পুঁটুলি খুলিয়া মুঠা মুঠা চাল চর্বণ করিতে লাগিল। এত চাল কি চার পয়সায় দেওয়া যায়? সমস্ত দিনের মেহনতের দাম কি চার পয়সা? আড্ডাধারীর কাছে নিয়ে যাই ত

চারদিনের মৌতাত যোগায়. কিন্তু সেখানে কি যাওয়া যায়? ছিঃ—ব্যাটারা ভিক্ষে-করা চাল চিনে ফেলবে। তা হলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বাড়ি নিয়ে যাব? কিন্তু এ ক'টি চাল কার মুখে দেব? কাজ নেই—

হারাণচন্দ্র পুঁটুলিটি গুছাইয়া বাঁধিয়া আবার সেই দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানদারকে ডাকিয়া বলিল, চাল নাও।

চার পয়সায় দিবি ত?

হাঁ।

তবে ঐ ধামাতে ঢেলে দে।

হারাণচন্দ্র একটা পাত্রে চালগুলি ঢালিয়া দিয়া হাত পাতিল। দোকানদারের নিকট চারিটি পয়সা গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া হারাণচন্দ্র একচোট খুব হাসিয়া লইল। —কেমন ব্যাটাকে ঠকিয়েছি, হারামজাদার যেমন কর্ম তেমন ফল দিয়েছি। অর্ধেক চাল খেয়ে ফেলেছি ব্যাটা ধরতেও পারেনি। দোকানদার যে ধরিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই হারাণচন্দ্র তাহা একবারও মনে করিল না। মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুলিখানার ঝাঁপ খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

আর কাজ নাই; আমরা অন্যত্র যাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আর ত পারি নে মা!

তিনদিন উপবাস করিয়া শুভদা কন্যা ললনার গলা ধরিয়া রুদ্ধাবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললনা সযত্নে মাতৃ-অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিল, কেন মা অমন কর, এদিন কিছু চিরকাল থাকবে না—আবার সুদিন হবে।

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, কিন্তু আর ত সয় না। চোখের উপর তোদের এত দুর্দশা মা হয়ে আর দেখতে পারিনে। আমি মা-গঙ্গার কোলে ডুব দিই, তুই মা যেমন করে পারিস এদের দেখিস। দোরে দোরে ভিক্ষে করিস—উঃ—মা হয়ে আর পারিনে।

শুভদা যেরূপভাবে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যেরূপভাবে কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিল তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। সে আজ অনেকদিনের পর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে; অনেক সহ্য করিয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়াছে. তাই আজ তাহাকে সামলাইতে পারা যাইতেছে না। যে কখনও ক্রোধ করে না, সে ক্রোধ করিলে বড় বিষম হয়; যে বড় শান্ত, তাহাতে ঝড় উঠিলে বড় প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠে; তাই ললনা বড় বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। কোনরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না যে. এমন করিলে সে আর বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বুকখানা যদি ফাটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

গভীর রাত্রে মাতাপুত্রী সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শুভদার স্বামীর জন্য বড় ভয় হইয়াছে। আজ ছয়দিন হইল তিনি বাটী আসেন নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি অপমানে ও লাঞ্ছনার ভয়ে তিনি আত্মঘাতী হইয়াছেন। অপদার্থ বলিয়া কন্যা হইয়াও ছলনা সেদিন যেরূপ অপমানিত করিয়াছিল, যেরূপ গঞ্জনা দিয়াছিল, তাহাতে আত্মঘাতী হওয়া আশ্চর্যের কথা নহে। সেই কথাই অষ্টপ্রহর মনে হইতেছে। আজও নিশাশেষে শুভদা চমকাইয়া উঠিয়া বসিল, ললনাকে তুলিয়া বলিল, ওরে তিনি নাই।

ললনা ঘুমের ঘোরে ভাল বুঝিতে পারিল না, তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কে মা?

আমি স্বপন দেখছিলাম যে তিনি আর নাই।

• কেন মা অমন কর? কথা শেষ করিয়াই ললনা কাঁদিয়া ফেলিল। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল তাহা দুজনেই কাঁদিয়া শেষ করিল।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে কৃষ্ণঠাকুরানী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় পথিপার্শ্বে মুখুজ্যেবাটীতে একবার প্রবেশ করিয়া অঙ্গন হইতে ডাকিলেন, বৌ!

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কি ঠাকুরঝি? ব'স।

আর বসব না দিদি—বেলা হ'ল। নেয়ে যাবার সময় একবার মনে করলাম, বৌকে দেখে যাই।

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

কৃষ্ণঠাকুরানী গলাটা একটু খাট করিয়া বলিলেন, বৌ একবার শুনে যাও ত।

শুভদা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, হারাণের কোন খবর পেলি?

শুভদা বলিল, না।

আজ কতদিন সে বাড়ি আসেনি?

ছ' দিন হল।

ছ' দিন আসেনি? বামুনপাড়ায় কারুকে পাঠাস নি কেন?

কাকে পাঠাব? কে যাবে?

তাও বটে, আমাকে বলিস নি কেন?

শুভদা উত্তর দিল না।

জলের কলসীটি নামিয়া আসিতেছিল; সেটাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, হাতে কিছু টাকাকড়ি আছে কি?

কিছু না।

তবে সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেটা কেমন আছে?

সেই রকমই।

এখন ললনাকে একবার আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিস।

তিনি প্রস্থান করিলে শুভদা ললনাকে ডাকিয়া বলিল, কেষ্টঠাকুরঝি তোকে একবার ডেকে গেছেন, একবার যা।

কেন?

তা জানিনে।

ললনা কৃষ্ণপ্রিয়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিল, পিসিমা দিলেন।

শুভদা মুদ্রা দুইটি অঞ্চলে বাঁধিয়া বলিল, আর কিছু বললেন কি?

হাঁ, বাবা এলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

শুভদা সেদিন ঠাকুরের উদ্দেশে অনেক প্রণাম করিল, পূজার কক্ষস্থিত কালীপট প্রতি বহুক্ষণাবধি যুক্তকরে চাহিয়া রহিল, তুলসীতলায় অনেক মাথা খুঁড়িল, তাহার পর জিনিসপত্র আনাইতে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল।

সেদিন যথাসময়ে মনোমত আহার পাইয়া ছলনাময়ী মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে পুতুলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে ও-পাড়ায় ললিতার নিকট প্রস্থান করিল।

রাত্রে একটু আঁধার হইলে, অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া আজ সমস্ত দিনের পর হারাণচন্দ্র বাটী প্রবেশ করিলেন। ছয় দিবস পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন, আজো তেমনি আছেন, কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তন হইয়াছে শুধু বস্ত্রখানার। বর্ণটা অঙ্গার অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং গুণিয়া দেখিলে বোধ হয় শতাধিক স্থানে গাঁইট-বাঁধা

দেখিতে পাওয়া যাইত। সময়ে যথামত তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া শুভদা কন্যা ললনাকে ডাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা, রোজ যেন তোর মুখ দেখে উঠি—

ললনাও একটু হাসিল—কেন মা?

আজ যে সুখ পেলাম, জন্মেও এমন পাইনি।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনা কৃষ্ণপিসিমাকে যাইয়া বলিল, কাল রাতে বাবা এসেছেন।

কৃষ্ণার মুখ প্রফুল্ল হইল; যেন বড় একটা দুর্ভাবনা তিরোহিত হইল। স্মিতমুখে বলিলেন, এসেচে? ভাল আছে?

হাঁ।

এতদিন কোথায় ছিল?

তা জানিনে।

বৌ জিজ্ঞাসা করেনি?

না।

তোর পিসিমা কিছু বলেনি?

না। তিনি ত বাবার সঙ্গে কথা কন না।

কথা কন না? কেন?

তা জানিনে। পিসিমাই জানেন।

বেলা এগারটার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কলাপাতা-চাপা একটা পাথরের বাটি হাতে করিয়া শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, বৌ, একটু তরকারি এনেচি, হারাণকে দিস।

শুভদা বাটিটি হাতে লইয়া পার্শ্ববর্তী একটা ঘর উদ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ ঘরে আছেন!

কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, তা হোক, এখন আর যাব না, ঘরে সমস্ত জিনিস আদুড় পড়ে আছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অর্ধ উঠান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুভদাকে বলিলেন, বৌ, হারাণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবি?

কি?

এতদিন সে কোথায় ছিল?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

খাওয়াইতে বসাইয়া শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে?

হারাণচন্দ্র মলিনমুখে অধোবদন হইয়া বলিলেন, গাছতলায়।

শুভদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পরদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণপ্রিয়া আবার আসিলেন। নানা কথাবার্তার পর বলিলেন, বৌ, সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিলি?

হাঁ।

কি বললে?

বললেন যে, গাছতলায় ছিলাম।

আবার অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল। উঠিবার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কাপড়ের নীচ হইতে দু'খানা থান কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, ঘরে ছিল তাই নিয়ে এলাম। হারাণকে পরতে দিস।

শুভদা তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ বৌ, হারাণ যদি জিজ্ঞাসা করে, কে দিয়েচে, তাহলে আর কারো নাম করিস। আমার নাম করিস নে।

শুভদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন?

কৃষ্ণপ্রিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না অমনি।

আর যদি নাম করি?

এবার কৃষ্ণপ্রিয়াও সহাস্যে বলিলেন, তা হলে তোর কেষ্টঠাকুরঝির মাথা খাবি।

আবার একদিন-দুইদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। হারাণচন্দ্র এবার আসিয়া অবধি আর বাটির বাহির হন না। শুভদার সে পক্ষে কিছু ভয় দূর হইয়াছে; কিছু দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে, কিন্তু সংসার চলে কিরূপে? দুর্ভাবনার মূল হইয়াছে এইখানেই। কে একদিন একটাকা দান করিল, কে আর-একদিন দুই টাকা ভিক্ষা দিল, এমন করিয়া কি একটা পরিবার প্রতিপালিত হয়? ভাবনার কথা কি শুধু ইহাই? মাধবের মুখ দেখিলে ত শরীরের অর্ধেক রক্ত জল হইয়া যায়; তাহার উপর ছলনা। সে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; বিবাহের বয়স হইয়াছে, এমন কি দুই-চারি মাসের মধ্যে হয়ত সে-বয়স উত্তীর্ণ হইয়াও যাইতে পারে। এদিকে চাহিলে শুভদা আর কূলকিনারা দেখিতে পায় না। মাধবের নিকট পার আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ছলনার নিকট পার নাই। তাহার মুখ দেখিলে রক্ত জল হইয়া যায়, কিন্তু ইহার মুখ দেখিলে শরীরের অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত তরল হইয়া পড়িবার উপক্রম করে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় শুভদা যে প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা আর কেহ না দেখিতে পাইলেও ললনা দেখিতে পাইত। গঙ্গার ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিতে জননী যে হাঁপাইতে থাকেন, ললনা তাহা দেখিতে পাইত; তরকারি কুটিবার সময় আলু-পটলের খোসা ছাড়াইতে গিয়া হাত আটকাইয়া বাধিয়া যায়, ললনা তাহা জানিতে পারিত; গ্রামে শুভদার মত কেহ সুপারি কাটিতে পারিত না, সেই শুভদার সুপারি কাটা আজকাল সরু-মোটা হইয়া যায়, ললনা তাহা বুঝিতে পারিত; আহার কমিযা গিয়াছে, দুইবেলার পরিবর্তে আজকাল বেলা চারিটার সময় একবার দাঁড়াইয়াছে, পীড়াপীড়ি করিলে বলে, আদতে ক্ষুধা নাই। ললনা এসব দেখিত আর লুকাইয়া চক্ষু মুছিত; কখন কখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিত। ইহাতে ফল হইবার হইলে হইতে পারিত, কিন্তু জগতে তাহা হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আজ একাদশী। ললনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, জননী রন্ধন করিতেছেন। চুলার ভিতর দেখিল কি একটা পদার্থ দগ্ধ হইতেছে। চিনিতে না পারিয়া বলিল, ওটা কি মা? কি পোড়াচ্চ?

চারটি সরষের ফুল।

কি হবে?

ছলনা খাবে। আজ নেয়ে আসবার সময় ক্ষেত থেকে তুলে এনেছিল। ভেজে দিতে বলেছিল; কিন্তু তেল ত নেই, তাই কলাপাত জড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চি।

ললনা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

আহারের সময় সাধের সরিষার ফুলের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া ছলনাময়ী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এই বুঝি ভাজা হয়েছে? এ ছাই হয়েছে।

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, একটু পুড়ে গেছে।

আমি খেতে চাইনে; তুমি বুঝি পোড়া জিনিস ভালবাস, তাই নিজের মনের মত করে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে রেখেচ! তা তুমিই খেয়ো—এই রইল। ছলনা মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করিয়া পাতের নীচে নামাইয়া রাখিল।

ছলনা যাহা বলিল তা নিজের বিশ্বাসমত বলিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার মনোমত কোন দ্রব্য না হইলে কর্কশ কথা বলিতে তাহার মত কেহই পারে না।

অনেক গজগজ করিয়া ছলনা আহার করিয়া চলিয়া যাইলে ললনা বলিল, মা, দিন দিন ছলনা মন্দ হয়ে যাচ্চে; ওকে কিছু বল না কেন? আমার ত ওকে কোন কথা বলতে সাহস হয় না। একটা বললে দশটা শুনিয়ে দেয়।

শুভদা একটু ভাবিয়া বলিল, সব মেয়ে কি তোর মত হয় মা? হাতের পাঁচটা আঙ্গুল পাঁচ রকমের হয়। আমি খাওয়াতে পারিনে, পরাতে পারিনে—কাজেই রাগ

করে দুটো কথা বললে সয়ে যেতে হয়।

কিন্তু একি ভাল?

ভাল নয় তা জানি। কিন্তু কি করব? আমার সময় ভাল হলে ছলনাও বলত না, আমাকেও শুনতে হত না।

ললনাও বুঝিল জননীর কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে।

পরদিন প্রায় এই সময়েই সে অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

শুভদা মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি হ'ল?

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণাপিসিমা বললেন, আর কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই। তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বল, না হলে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।

সকল কাজকর্ম সেদিনের মত সম্পন্ন হইলে ললনা মাধবের নিকট আসিয়া বসিল।

মাধব বলিল, দিদি, তার কি হ'ল?

কার কি মাধু?

মাধু একটু থামিয়া বলিল, সেখানে যাবার?

ললনাও অল্প থামিল, অল্প চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, সেই কথাই আজ তোকে বলব মাধু।

মাধব আগ্রহে একেবারে উঠিয়া বসিল—কি দিদি? কবে যাওয়া হবে?

আমি কাল যাব।

কাল যাবে? আর আমি?

আমি আগে যাই, তার পরে যেয়ো।

মাধব ব্যস্ততাসহ বলিল, কেন, একসঙ্গেই যাই চল না!

ললনা বলিল, না, তা হলে মা বড় কাঁদবেন।

মাধব ক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদুক গে।

ছিঃ, তা কি হয়? আমি যাই।

আবার কবে আসবে?

তুমি যেদিন যাবে, সেইদিন আর একবার আসব।

তার মধ্যে আর আসবে না?

না।

আমি কবে যাব?

আমি যেদিন নিতে আসব।

আসবে?

হ্যাঁ।

তুমি গেলে মা কাঁদবেন?

বোধ হয়।

মাধব কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, দিদি, তবে কাজ নেই।

কেন ভাই?

মা কাঁদবে মনে হলে আমার ওখানে যেতেই ইচ্ছে হয় না।

তবে তুই যাবিনে?

মাধব আবার কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, হ্যাঁ যাব।

তবে আমি কাল যাব?

যেয়ো।

আমাকে না দেখতে পেলে কাঁদবি নে?

কবে আমাকে নিতে আসবে?

আর কিছুদিন পরে।

তবে যাও, আমি কাঁদব না।

মাধবের অলক্ষিতে ললনা দুই-এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আমি গেলে এসব কথা মাকে বলো না।

না।

মা যখন যা বলবেন, তাই শুনো—কিছুতে যেন মার মনে কষ্ট না হয়। ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়ো।

খাব।

কিছুক্ষণ থামিয়া ললনা আবার বলিল, মাধু, সদাদাদাকে তোমার মনে আছে?

আছে।

তিনি যদি আসেন—যদি তোমাকে দেখতে আসেন—

তা হ'লে?

তা হলে ব'লো যে দিদি চলে গেছে। কেউ যখন না থাকবে তখন ব'লো।

আচ্ছা।

এইসময় শুভদা আসিয়া বলিলেন, অনেক রাত হয়েচে, তুই শুগে যা মা।

মাধব সে কথার উত্তরে বলিল, মা, দিদি আজ আমার কাছে শোবে।

দিদিকে ছাড়িতে মাধবের তখন কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না। শুভদা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া ললনাকে বলিলেন, তবে তাই শোও--আমি ওপরে ছলনার কাছে শুই গে।

শুভদা চলিয়া গেলেও ভ্রাতা-ভগিনীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তাহার পর মাধবচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সকালবেলায় সে যেসকল গৃহকর্ম করে তাহা এখন পর্যন্ত পড়িয়া আছে। বেলা আট-নয়টা বাজে দেখিয়া শুভদা মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দিদি কোথায়? ছলনাকে বলিলেন, তোর দিদি কোথায় গেল?

সবাই বলিল, বলিতে পারি না।

বেলা অধিক হয় দেখিয়া শুভদা সমস্ত কর্ম নিজেই করিতে লাগিলেন; ছলনাও সেদিন অনেক সাহায্য করিল। আহার্য প্রস্তুত হইল, সকলে আহার করিল—দ্বিপ্রহরও অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ললনার দেখা নাই।

রাসমণি খুঁজিতে গেলেন, ছলনাময়ীও আহার করিয়া পাড়া বেড়াইতে গেল, সেখানে যদি ললনা থাকে ত পাঠাইয়া দিবে। সন্ধ্যার পূর্বে রাসমণি আসিয়া বলিলেন, কোথাও ত তাকে পেলাম না--বাড়ি এসেচে কি?

কই না।

সন্ধ্যার পর ছলনাও ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি এ গাঁয়ে নেই।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু ললনা আসিল না।

হারাণবাবু ফিরিয়া আসিয়া অবধি বাটীর বাহির হন নাই; তিনিও, তাই ত মেয়েটা গেল কোথা, বলিয়া একবার খুঁজিতে বাহির হইলেন। রাত্রি বারোটার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ত, তাই ত—কিছুই যে বোঝা যায় না।

সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন; রাসমণি কাঁদিতে লাগিলেন, ছলনাও কাঁদিল, শুধু মাধবচন্দ্র বড় একটা কিছু বলিল না। সকলের ব্যস্ততা এবং ক্রন্দনাদি দেখিয়া সে একবার কথাটা ভাঙিতে গিয়াছিল, কিন্তু দিদির নিষেধ মনে করিয়া জননীর অশ্রু দেখিয়াও মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন আসিল। সূর্য উঠিল, অস্ত গেল—রাত্রি হইল। আবার প্রভাত হইল, সূর্য উঠিল, অস্ত গেল, কিন্তু ললনা আসিল না। গ্রামের সকলেই একথা শুনিল। ললনাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাই তাহার জন্য সকলেই দুঃখিত হইল। কেহ কাঁদিল, কেহ শুভদাকে বুঝাইতে আসিল, কেহ পাঁচরকম অনুমান করিতে লাগিল, এইরূপে চারি-পাঁচদিন অতিবাহিত হইল।

শুভদা প্রথমে মাধবচন্দ্রের সম্মুখেও ললনার জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার কথা মনে হইল তখন সমস্ত অশ্রু প্রতিষেধ করিল। জননীর অধিক ক্লেশ দেখিলে বোধ হয় সে ভিতরের কথা বলিয়া ফেলিত, কিন্তু যখন দেখিল সব থামিয়া গিয়াছে তখন আর কোন কথা কহিল না।

কিন্তু শুভদা বড় বিস্মিত হইল। বড়দিদির কথা মাধব কেন জিজ্ঞাসা করে না? একবারও বলে না, দিদি কোথায়? একবারও জিজ্ঞাসা করে না, বড়দিদি আসে না কেন? শুভদার অল্প সন্দেহ হইত—মাধব বোধ হয় কিছু জানে; কিন্তু সাহস করিয়া সেকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

আজ ছয় দিবস পরে নন্দ জেলেনী গঙ্গায় মৎস্য ধরিতে ধরিতে আঘাটায় একটা চওড়া লালপেড়ে কাপড় অর্ধ জলে, অর্ধ স্থলে, বালুমাখা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। হারাণবাবুর বাটীর নিকটেই তাহার বাটী; সে ললনাকে ঐ কাপড় অনেকদিন পরিতে দেখিয়াছিল। তাহার সন্দেহ হইল বোধ হয় ঐ বস্ত্র ললনার হইতে পারে। সে আসিয়া একথা রাসমণিকে জানাইল। তিনি ছুটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তাহা ললনারই বটে। কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানা বাটীতে তুলিয়া আনিলেন; শুভদা দেখিলেন, হারাণচন্দ্র দেখিলেন, ছলনা দেখিল, পাড়ার আরো পাঁচজন দেখিল—ঠিক তাহাই বটে! সে কাপড় ললনারই। তাহার হাতের সেলাই করা, তাহার হাতের তালি দেওয়া, তাহার হাতের এককোণে লাল সুতা দিয়া নাম লেখা। আর কি ভুল হয়? শুভদা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল মুখুজ্যেদের ললনা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একদিন মনে হইল তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে. বায়ু-পরিবর্তন না করিলে হয়ত কঠিন পীড়া জন্মাইতে পারে। সুরেন্দ্রবাবুর অনেক আয়। বয়স অধিক নহে; বোধ হয় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না; এই বয়সে অনেক শখ, তাই পাত্রমিত্রের অভাব নাই। দুই-চারিজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে—তোমরা কি বল? সকলেই তখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। তাহারা অনেক দিন হইতে একথা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় এই জন্যই সাহস করিয়া বলে নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না, আমার বিশ্বাস বায়ু-পরিবর্তন করিলেই সব আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ইহাতেও কাহারো সন্দেহ ছিল না। বায়ু-পরিবর্তনের মত ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তোমরা বলিতে পার কোন্ স্থানের বায়ু সর্বাপেক্ষা উত্তম?

তখন অনেকে অনেক স্থানের নাম করিল।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি বলি কিছুদিন জলের উপর বাস করিলে হয় না?

সকলে বলিল, ইহা অতি চমৎকার কথা!

তখন জলযাত্রার ধুম পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড একখানা বজরা নানারূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। দুই-তিনমাসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে সমস্ত বোঝাই করা হইল। তাহার পর দিন দেখিয়া পাঁজি খুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু নৌকায় উঠিলেন। সঙ্গে ইয়ারবন্ধু, গায়ক বাদক অনেক চলিল; তন্মধ্যে একজন গায়িকারও স্থান হইল। মাঝিরা পাল তুলিয়া 'বদর' বলিয়া রূপনারায়ণ নদে বজরা ভাসাইয়া দিল।

অনুকূল বাতাসে পালভরে বৃহৎ বজরা রাজহংসীর ন্যায় ভাসিয়া চলিল। স্থানে স্থানে নোঙ্গর করা হইতে লাগিল; সুরেন্দ্রবাবু সদলবলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে জলে স্থলে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল, অনেকদিন কাটিয়া গেল; তাহার পর বজরা কলিকাতায় আসিয়া লাগিল। অপরাপর সকলের ইচ্ছা ছিল এইস্থানে যেন অধিকদিন থাকা হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে অমত করিয়া বলিলেন, কলকাতার বায়ু অপেক্ষাকৃত দূষিত, এখানে থাকিব না। বজরা উত্তরাভিমুখে চালাও। সুতরাং একদিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া বজরা উত্তরমুখে চলিল।

বজরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিতে লাগিল যে, অনেকদিন বজরায় বাস করা হইয়াছে, বহুত জলকণাসম্পৃক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শরীরে আরাম এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন করা হইয়াছে, এখন বাটী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মুখ দেখিতে পারিলে শরীরের কান্তিটা সম্ভবতঃ আরো একটু বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। এই হিসাবে আর অধিক দূর যাইতে অনেকেই মনে মনে অনিচ্ছুক হইল; আর দুই-একদিন পরে মুখ ফুটিয়া দুই-একজন বলিয়াও ফেলিল, অনেকদিন দেশ ছাড়িয়া আসা হইয়াছে—আপনার শরীরও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে—এখন ফিরিলে হানি কি?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হানি কিছুই নাই, কিন্তু এখন ফিরিব না, তোমাদের যদি বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়ে থাকে ত তোমরা যাও।

সামান্য বাড়ির জন্য, তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্রের জন্য মন খারাপ হইয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে

করিয়া, যাহারা কথা পাড়িয়াছিল তাহারা চুপ করিয়া গেল। সুরেন্দ্রবাবুও আর অন্য কথা বলিলেন না।

বজরা থামিয়া থামিয়া পুনর্বার চলিতে লাগিল; ভিতরে কিন্তু আর পূর্বের মত সুখ নাই। সুরেন্দ্রবাবু ভিন্ন অনেকেই প্রায় বিষণ্ণভাবে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল। তখন দুই দিবস পূর্বে কাপুরুষতা মনে করিয়া যাহারা কথা পাড়িয়াও চাপিয়া গিয়াছিল, তাহারা পৌরুষের গর্ব ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই কথা পাড়িবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। প্রবাসে থাকিয়া বাটী যাইবার কথা—স্ত্রী-পুত্রের মুখ মনে পড়িয়া সেইখানে ফিরিয়া যাইবার একবার বাসনা হইলে তাহা আর কিছুতেই দমন করিয়া রাখা যায় না। একদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই মনে হয় যেন এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদেরও তাহাই হইল। আর তিন-চারিদিনে প্রায় সকলেই লজ্জার মাথা খাইয়া বাটী ফিরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু আপত্তি করিলেন না; তখন বজরা চন্দননগর অতিক্রম না করিতেই প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। ভৃত্যবর্গ ভিন্ন বজরা প্রায় শূন্য হইয়া গেল। বাইরের লোকের মধ্যে কেবল একজন পশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী বাদক ও একজন অনুগৃহীতা নর্তকী রহিল। বাবু তাহাদের লইয়াই চলিলেন—দেশে ফিরিবার কথা একবারও মনে করিলেন না।

একদিন বৈকালে সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বেই পশ্চিমদিকে মেঘ করিয়া আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু একজন মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিচরণ, মেঘ করিয়া আসিতেছে দেখিয়াছ?

আজ্ঞে হাঁ।

ঝড় হইবে বলিয়া বোধ হয় কি?

বৈশেখ-জোষ্টি মাসে ঝড় হওয়া আশ্চর্য কি বাবু?

তবে বজরা বাঁধ।

এখানে কিন্তু গাঁ আছে বলে মনে হচ্চে না; আঘাটায় লাগাব কি?

লাগাবে না ত কি ডুবে মরব?

মাঝি একটু হাসিয়া বলিল, আমি থাকতে সে ভয় নেই বাবু। ঝড় আসবার আগেই লঙ্গর করব।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অত সাহস করিয়া কাজ নাই—তুমি কাছি কর।

অগত্যা হরিচরণ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া বজরা বাঁধিয়া ফেলিল।

সুরেন্দ্রবাবু বজরার ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বাবু গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার ওস্তাদজীকে ডেকে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানী, মাথায় একহস্ত উচ্চ পাগড়ি বাঁধিয়া দাড়িটা কর্ণমূলে জড়াইয়া, গোঁফ মুচড়াইতে মুচড়াইতে আসিয়া বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু পরপারে তীরের অনতিদূরে জলের উপর কালো মত কি একটা পদার্থ ভাসিয়া আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। পদার্থটা একটা মনুষ্য-মস্তক বলিয়া বোধ হইতেছিল—তাহাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছিলেন। ওস্তাদজীর শব্দ প্রথমে কর্ণে প্রবেশ করিল না।

ওস্তাদজী উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু ফিরিয়া চাহিলেন। ওস্তাদজীকে দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, এখন বোধ হয় ঝড় আসিবে না; একটু গীতবাদ্য হউক।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, যো হুকুম।

বাবু আবার সেই পদার্থটা দেখিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই একজন যুবতী আসিয়া নিকটে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। পশ্চাতে ওস্তাদজী বাঁয়াতবলা হাতে করিয়া ছাদের উপর উঠিতেছিল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, তুমি নীচে যাও—বাজনায় আর কাজ নেই; আজ শুধুই গান হউক।

ওস্তাদজী একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া নামিয়া গেল।

ইতিপূর্বে যে স্ত্রীলোকটি গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছিল তাহার নাম জয়াবতী; বয়সে বোধ হয় বিংশতি হইবে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল শরীর—দেখিতে মন্দ নহে; বহুদিবস হইতে সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, সাজসজ্জার আড়ম্বর বেশি কিছু ছিল না। একখানা দেশী কালাপেড়ে শাটি ও দুই-একখানা গহনা পরিয়া শিষ্টশান্ত ঘরের বধূটির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, জয়া, আজ যে তোমাকে সমস্ত দিন দেখি নাই।

মাথার বেদনায় সমস্ত দিন শুয়েছিলাম।

এখন ভাল হয়েছে কি?

জয়াবতী অল্প হাসিয়া বলিল, অল্প।

গান গাইতে পারবে কি?

জয়াবতী আবার হাসিল—হুকুম করুন।

হুকুম আর কি, যা ইচ্ছা হয় গাও।

জয়াবতী গীত গাহিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারস্থিত ভাসমান কৃষ্ণ পদার্থটার পানে চক্ষু রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে কিছুক্ষণ পরে, জয়াবতীর গান শেষ হইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন, জয়া, ওটা নড়ে বেড়াচ্চে—না?

জয়াবতী গান ছাড়িয়া সেটা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, বোধ হয়।

তবে আমার দূরবীনটা। ডাকিয়া বলিলেন, ওরে নীচে থেকে আমার দূরবীনের বাক্সটা নিয়ে আয় ত।

দূরবীন আসিলে বাক্স খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পদার্থটা দেখিয়া দূরবীন বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা?

একজন মানুষ বলে বোধ হয়।

এতক্ষণ ধ'রে জলে কি কচ্চে?

তা জানি নে। দেখলে হয়।

একজন লোক পাঠিয়ে দিন না।

আমি নিজেই যাব। অনুজ্ঞা মত একজন মাঝি অল্পক্ষণ পরে বজরাসংলগ্ন বোট লইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ওপারে চল।

বোট কাছে আসিলে সুরেন্দ্রবাবু দেখিলেন, পদ্মের মত অনিন্দ্যসুন্দর একজন স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া, কাল মেঘের মত একরাশি চুল নীল জলের উপর চতুর্দিকে ভাসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রবাবু আরও নিকটে আসিলেন, তথাপি, স্ত্রীলোকটা উঠিল না বা উঠিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল না, যেমন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, নিকটে কোন গ্রাম আছে কি?

স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি বলতে পারি না। বোধ হয় নাই।

তবে তুমি এখানে কোথা হতে এলে?

স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া রহিল।

তোমার বাড়ি কি নিকটেই?

না; অনেক দূরে।

তবে এখানে কেন?

আমাদের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল।

কবে?

কাল রাত্রে।

তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

বলিতে পারি না।

তুমি এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ কেন? নিকটবর্তী কোন গ্রাম অনুসন্ধান কর নাই কেন?

সে পুনর্বার চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন্দবাবু কথার উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি এখান হইতে কতদূরে হইবে?

প্রায় দশ-বার ক্রোশ।

কোন্ দিকে?

সুরেন্দ্রবাবুর বজরা যেদিকে যাইতেছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐদিকে।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি ঐদিকেই যাইব। আমার বজরায় স্ত্রীলোক আছে, যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে ত আমার সহিত আইস; তোমাকে বাটী পেঁৗছাইয়া দিব।

আবার সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যাইবে?

যাইব।

তবে আইস।

পুনর্বার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, আমার কাপড় ভাসিয়া গিয়াছে।

এইবার সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, সে কিজন্য এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছে। নিজে তীরে নামিয়া মাঝিকে পুনরায় বজরায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্র আনিতে বলিয়া দিয়া বলিলেন, বস্ত্র আসিলে আমার সহিত যাইবে ত?

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, যাইব।

মাঝি বস্ত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিল, অল্পক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন।

বজরায় আসিয়া সুরেন্দ্রবাবু আগন্তুককে জয়াবতীর জিম্মা করিয়া দিলেন; সে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, যত্ন আত্মীয়তা করিয়া তাহাকে আপনার কামরায় সে রাত্রের মত লইয়া গেল।

আহার করাইয়া, পান দিয়া, কাছে বসিয়া জয়াবতী কহিল, ভাই, তোমার নামটি?

আমার নাম মালতী। তোমার নাম?

জয়াবতী। তোমাদের বাড়ি?

মহেশপুরে।

এখান থেকে কত দূরে?

প্রায় দশ-বারো ক্রোশ উত্তরে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথা ভাই?

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কোথাও নয়।

সে কি--বিয়ে হয়নি?

হয়েছিল, কিন্তু সেসব চুকে গেছে।

জয়াবতী একটু দুঃখিতভাবে কহিল, কতদিন?

অনেক দিন। আমার সেসব কথা মনে পড়ে না।

জয়াবতী একথা চাপিয়া দিয়া বলিল, তোমাদের বাড়িতে কে আছে?

কেউ নেই। এক পিসি ছিল, তিনিও বোধ হয় বেঁচে নেই।

জয়াবতী বুঝিল নৌকাডুবির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এ কথারও আন্দোলন

করা উচিত মনে করিল না। কহিল, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সাগরদ্বীপে।

যারা তোমার সঙ্গে ছিল তাদের কি হ'ল?

জানিনে।

এখন বাড়ি যাবে?

তাই ভাবচি।

জয়াবতী অল্প হাসিয়া, অল্প অপ্রস্তুতভাবে বলিল, আমার সঙ্গে যাবে?

নিয়ে গেলেই যাই। তোমার স্বামী আমার অনেক উপকার করেছেন। আর বাড়িতেও আমার কেউ নেই! বাড়ি গেলেও যে কার কাছে থাকব তা ত জানিনে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া জয়াবতী জিভ কাটিয়াছিল; উত্তর শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইল। জয়াবতীর মনে হইল—মালতীকে লইয়া যাওয়া বড় সুখের বিষয় হইবে না। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট—

মালতী বলিল, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

নারায়ণপুরে।

কোথায় যাচ্ছিলে?

বেড়াতে। বাবুর শরীর ভাল নয়, তাই-

আরও দুই-চারিটা কথাবার্তার পর সে রাত্রের মত দুইজনে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রিটা সুরেন্দ্রবাবুর ভাল নিদ্রা হইল না, সেইজন্য অতি প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হাতমুখ ধুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। হাওয়ার জোর ছিল, পাল তুলিয়া মাঝিমাল্লারা বজরা খুলিয়া দিল। একটু বেলা হইলে, জয়াবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকটির কিছু জানতে পেরেছ?

সমস্ত।

বাড়ি কোথায়?

মহেশপুরে।

মহেশপুর কোথায়?

তা জানিনে। এখান থেকে দশ-বার ক্রোশ উত্তরে।

বাপের নাম কি?

জিজ্ঞাসা করিনি।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, সব খবরই জেনেছ দেখচি! স্বামীর নাম কি?

স্বামী নেই।

শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

বলেনি।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জাত জান কি?

না।

নাম জান?

জানি; মালতী।

মালতীর যদি আপত্তি না থাকে ত একবার আমার কামরায় ডাকতে ব'লো—আমি নিজে সব কথা জিজ্ঞাসা করব।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, কামরায় আসুন।

সুরেন্দ্রবাবুও কালবিলম্ব না করিয়া কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচে গালিচার উপর মালতী অধোবদনে বসিয়াছিল। জয়াবতীও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু

সুরেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিবামাত্র সে প্রস্থান করিল। এ সকল সে জানিত; হয়ত তাহার সম্মুখে সব কথা না হইতে পারে, হয়ত কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে তাহা বুঝিত—তাই সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল কি না, সব কথা শুনিবার বাসনা তাহার ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সুরেন্দ্রবাবু একটা কৌচে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নীরবে বহুক্ষণ মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; মুখখানি বড় ম্লান, বড় বিষণ্ণ,—কিন্তু বড় মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল; বর্ণটা বড় সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠব অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তাঁহার বোধ হইল, এতটা রূপ একসঙ্গে তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই। বিধবা—কি জাতি?

সুরেন্দ্রবাবু মুখ ফুটিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নাম কি?

মালতী বলিল, শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তিনি বাটীতেই আছেন?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, না; তিনি নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বলিলেন, বাটীতে আর কে আছে?

এইবার মালতী বহুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বোধ হয় কেহই নাই।

এতদিন কোথায় ছিলে?

সেইখানেই ছিলাম, কিন্তু আমরা সাগরে যাইতেছিলাম, পথের মাঝে নৌকাডুবি হইয়াছে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

কালিপাড়ায়।

সেখানে তোমার কে আছে?

হয়ত কেউ আছে, কিন্তু আমি তাহাদের চিনি না।

কখন সেখানে যাও নাই?

বিবাহের সময় একবারমাত্র গিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমার বাপের বাড়িতেও কেহ নাই, শ্বশুরবাড়িতেও কেহ নাই, অন্ততঃ তুমি জান না—তবে এখন কোথায় যাইবে?

কলিকাতায়।

কলিকাতায়? সেখানে কে আছেন?

কেহ না।

কেহ না? তবে কোথায় থাকিবে?

কাহারও বাটী অনুসন্ধান করিয়া লইব।

তাহার পর?

মালতী মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তুমি রাঁধিতে জান?

জানি।

কলিকাতায় কোথাও রাঁধিতে পাইলে থাকিবে?

হাঁ।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, মালতী, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও ঐ কাজ পাইলে করিবে কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বোধ হইল যেন সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তরে কিছু বিমর্ষ হইলেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, কলিকাতায় যাহা আশা কর, অন্যস্থানে তাহার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ পাইলেও করিবে না কি?

মালতী পূর্বের মত মাথা নাড়িল—কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও আমি যাইব না।

সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ম্লান মুখ দেখিয়া মালতীও বুঝিতে পারিল যে, তাহার কথা সুরেন্দ্রবাবুর মনোমত হয় নাই, সম্ভবতঃ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, যাহারা কলিকাতা চিনে না তাহাদের পক্ষে কলিকাতা অতি মন্দ স্থান; তোমার যাহা অভিলাষ করিও, কিন্তু খুব সাবধানে থাকিও। আর একটা কথা, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী; নারায়ণপুরে বাটী, যদি কখন প্রয়োজন মনে কর আমাকে সংবাদ দিও, কিংবা আমার বাটীতে যাইও। আপদবিপদে উপকার করিলেও করিতে পারি।

মালতী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

আমরা একসপ্তাহ পরে কলিকাতা অভিমুখে ফিরিব। এখন এই বজরাতেই থাক; যখন কলিকাতায় পেঁৗছিব তখন নামিয়া যাইও।

সুরেন্দ্রবাবু চলিয়া যাইলে মালতী সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবুর কথাতে সে বেদনা পাইয়াছিল, কিন্তু কাঁদিবার আরো শত-সহস্র কারণ ছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, বজরায় স্থান দিয়াছেন, আরো অধিক উপকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে কি রাঁধিতে মাত্র কলিকাতায় যাইতেছে? স্নেহময়ী মাতা, পীড়িত ভ্রাতা, নিঃসহায় সংসার, সে কি শুধু রাঁধিয়া নিজের উদর পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে? পাচিকার কর্ম ছল মাত্র। সে অর্থ উপার্জন করিতে চাহে এবং কলিকাতা ভিন্ন অর্থ কোথায়? অর্থোপার্জনের পথও সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মালতী রূপবতী; শরীরে তাহার রূপ ধরে না একথা সে টের পাইয়াছে; কলিকাতা বড় শহর। সেখানে এ রূপ লইয়া গেলে বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না, হয়ত আশাতীত মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে, তাই কলিকাতা যাইতে এত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে! সেখানে তাহার আদর হইবে, দরিদ্র ছিল ধনবতী হইবে, ক্লেশে জীবন কাটিতেছিল এইবার সুখে কাটিবে, তথাপি মালতী কাঁদে কেন? আমরা জানি না—তাহার কথা সে-ই জানে।

পরদিন বজরা হলুদপুর গ্রামের নিম্ন দিয়া চলিতে লাগিল, মালতী খড়খড়ি খুলিয়া বাঁধাঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। ঘাটে জনপ্রাণী নাই—যে আশায় মালতী চাহিয়া রহিল তাহা হইল না! গ্রাম ছাড়িয়া বজরা দূরে চলিয়া গেল, মালতী জানালা বন্ধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়াবতী নিকটে আসিয়া বসিল, চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহে বলিল, কেঁদে আর কি হবে বোন? তাঁদের সময় হয়েছিল, তাই মা গঙ্গা কোলে নিয়েচেন। জয়াবতী ভাবিল, নৌকাডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের জন্যই মালতী কাঁদিতেছে। সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। জয়াবতী মালতী অপেক্ষা বয়সে বড়; তাহাকে স্নেহ করে, ছোট ভগিনীর মত দেখে; বিশেষ, মালতী কলিকাতায় নামিয়া যাইবে শুনিয়া স্নেহ আরো বর্ধিত হইয়াছিল। মালতী উঠিয়া বসিলে জয়াবতী অন্যান্য কথাবার্তায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীধামে মৃত্যু হইলে হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই সদানন্দের পিসিমাতা কাশী যাইলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। সদানন্দ, পুণ্যশরীরা পিসিমাতার দেহ বারাণসী ধামে গঙ্গাবক্ষে দাহ করিয়া চির-শিবলোকবাসের সুব্যবস্থা করিয়া হলুদপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

শূন্য বাটীতে অনেক রাত্রে প্রবেশ করিয়া সদাপাগলা নিজ হস্তে দুটো সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। একবার মনে করিল তখনই হারাণবাবুর বাটীতে গিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিবে, কিন্তু অত রাত্রে দেখাশুনার সুবিধা না হইতে পারে মনে ভাবিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিল। কাশী থাকিয়া সে হারাণবাবুর দুশ্চরিত্রের কথা, শুভদার দুরদৃষ্টের কথা, ললনার হতভাগ্যের কথা মনে করিত; রোগের সেবা করিতে করিতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিয়াও সে উহাদিগকে ভুলিতে পারিত না। মধ্যে একবার পত্র লিখিয়া সংবাদ অবগত

হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কোন পক্ষেই পত্রাদি লিখেন নাই—সদানন্দও তাই প্রায় একমাসকাল কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে সেইসব কথা মনে করিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া, চালাঘরের বাতার পানে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে করিতে লাগিল, মেঘের উপর পদ্মফুল ফুটে কি না? ললনা বলিয়াছিল, মাটি ভিন্ন ফুল ফুটে না—সে কথা সঙ্গত কি না? আর একথা যে বলিয়াছিল, সে কেমন করিয়া জানিল মেঘের উপর পদ্ম ফুটিতে পারে না? যাহা হউক, রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বে সদানন্দ স্থির করিয়া ফেলিল যে, উপরে পদ্ম ফুটিতে পারে, কিন্তু ফুটিয়া অনেকদিন থাকিতে পারে না, শুকাইয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা—শুষ্ক হইয়াই যাইতেছে বোধ হয়।

পরদিন শ্রীমান সদানন্দ চক্রবর্তী ফুল, বেলপাতা, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ইত্যাদি বহু দ্রব্য হস্তে লইয়া একেবারে হারাণবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই শুভদাকে দেখিতে পাইল। শুভদা উঠান ঝাঁট দিতেছিল; খ্যাংরাটা নীচে ফেলিয়া দিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া শুভদা মৃদুস্বরে বলিল, কবে এলে সদানন্দ?

কাল রাত্রে।

সকলে ভাল আছেন?

সদানন্দ দুঃখিতভাবে অল্প হাসিয়া বলিল, সকলের মধ্যে ত পিসিমা; তিনি কাশীতেই স্থান পেয়েচেন।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, কি পেয়েচেন?

পিসিমাতার কাশীতেই মৃত্যু হয়েচে।

শুভদা একথা জানিত না; তাহার এক শোকে আর এক শোক উথলিয়া উঠিল। শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, বাবা, ললনাও নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, নাই? কোথায় গিয়াছে?

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কোথায় আর যাইবে—বাছা সংসারের দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হয়েচে। পাঁচদিন হ'ল গঙ্গার তীরে তার পরনের কাপড়টি পাওয়া গেছে। শুভদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সদানন্দও চক্ষুর জল মুছিল, কিন্তু একফোঁটা কিংবা দুইফোঁটা মাত্র। তাহার পর শুভদা যতক্ষণ না শান্ত হইলেন ততক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। শুভদা শান্ত হইলে বলিল, কিছু বলে যায়নি?

কিছু না।

হারাণকাকা কোথায় আছেন?

শুভদা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, বলিতে পারি না। কখন কখন বাটীতে আসেন বটে।

তিনি এখন কি করিতেছেন?

তাও জানি না।

মাধব কেমন আছে?

পূর্বের মত।

আর সকলে?

ভাল আছে।

সদানন্দ উঠিতেছিল। শুভদা বলিল, তোমার ওখানে রাঁধিবে কে?

আমি নিজে।

শুভদা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এখানে খেলে হয় না?

হবে না কেন? কিন্তু তার দরকার কি, রাঁধতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তা হোক, তুমি এখানে খেয়ো।

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আজ নয়। আজ পিসিমার তর্পণ করতে হবে।

শুভদা ভাবিল, তা হবেও বা, তাই কোন কথা আর বলিল না।

সদানন্দ বাটী আসিয়া একটা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল। তখন বেলা আটটা বাজিয়াছিল, পরে যখন ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে—জ্যোৎস্না রাত্রি ফুটফুট করিতেছে; সদানন্দ বাহিরে আসিয়া একটা বাগান পার হইয়া শারদাচরণের বাটীর পশ্চাতে একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল; চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল, শারদা!

শারদা গৃহে ছিল, সদানন্দর ডাক শুনিতে পাইল। জানালার নিকট আসিয়া বলিল, কে?

সদানন্দ বলিল, আমি।

কে—সদানন্দ?

হাঁ।

কবে এলে?

কাল রাত্রে।

এদিকে কেন? চল, বৈঠকখানায় গিয়া বসি।

না, ওদিকে যাব না, তুমি এখানেই এস।

শারদাচরণ নিকটে আসিলে সদানন্দ বলিল, ললনা মরেছে তা জান কি?

শারদাচরণ বিষণ্ণভাবে কহিল, জানি।

কেন মরিল কোন সংবাদ রাখ কি?

না, তবে বোধ হয় সাংসারিক দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হইয়াছে।

সদানন্দ তাঁহার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আর কিছু জান না?

কিছু না।

সদানন্দর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিয়া বলিল, তুমি পাষণ্ড। সাংসারিক দুঃখকষ্টে একজন মরিতে পারে, আর তুমি সম্মুখে থাকিয়া একটু সাহায্য করিতে পার না?

সদানন্দর ভাবভঙ্গি দেখিয়া শারদাচরণ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার কারণও ছিল; সে এবং সদানন্দ বাল্যসুহৃৎ, উভয়ে উভয়কে বহুদিন হইতে চিনিত। শারদার ছেলেবেলার কথা সদানন্দ সমস্ত অবগত ছিল এবং সেইজন্যই যে আজ তাহাকে কথা শুনাইতে আসিয়াছিল, সদানন্দর সে প্রকৃতি নহে; কিন্তু শারদা অন্যরূপ ভাবিয়া লইল। সে মনে করিল, সদানন্দ ছেলেবেলার সেইসব লইয়া দুটো কথা শুনাইয়া দিতেছে; তাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, সদানন্দ, সে সকল কথায় এখন আর ফল কি? আরো মনে করে দেখ, আমার পিতা জীবিত রহিয়াছেন, তাঁর বর্তমানে ইচ্ছা হইলেই কি আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করিতে পারি? বিশেষ সে আমাকে কিছুই বলে নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইল। কহিল, কিছুই বলে নাই? কিছুই বলিতে আসে নাই?

সম্প্রতি নহে; তবে অনেকদিন পূর্বে একবার আসিয়াছিল।

কি জন্য? কোথায়?

শারদাচরণ বলিল, বলিতেছি। বলিল, প্রায় মাসখানেক পূর্বে অনেক রাত্রে, আমাকে ঐ শিবমন্দিরে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল; আমার যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও গিয়াছিলাম—

সদানন্দ রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যাইবার ইচ্ছা ছিল না?

শারদা ম্লানমুখে বলিল, আর কেন ভাই!

সদানন্দ সেকথা শুনিল না, বলিল, তারপর?

তারপর বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

কাহার সহিত?

তাহার নিজের সহিত।

নিজের? ললনার সহিত? তুমি কি বলিলে?

শারদা আপনার বাল্যকথা স্মরণ করিয়া বড় লজ্জিত হইল; কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি—আমি—তা কি করিব বল? বাবা এখনো বাঁচিয়া আছেন।

সদানন্দ কতকটা ক্রোধে, দুঃখে, কতকটা মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, তোমার বাবার বাঁচিয়া কি লাভ?

এইবার শারদাচরণ কুপিত হইল। পিতার সম্বন্ধে কোন কথা তাহার সহিত না; বলিল, লাভালাভের কথা তিনি ভাল জানেন। আমাদের এবিষয়ে বিচার করিবার কোন অধিকার নাই—ভালও দেখায় না। যা হউক, আমি বলিলাম, তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

সে চলিয়া গেল?

না, তখনও চলিয়া যায় নাই; ছলনাকে বিবাহ করিতে বলিল।

তুমি স্বীকার করিলে না?

শারদাচরণ সদানন্দর মুখ দেখিয়া এবং তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, অস্বীকারও করি নাই; বলিয়াছিলাম পিতার মত হইলে করিতে পারি।

সদানন্দ বলিল, পিতার মত হইল না?

না।

কেন?

বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বলিতেছি শুন; বাবার ইচ্ছা আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন—হারাণবাবু কি তাহা দিতে পারিতেন?

সদানন্দ সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না; বলিল, তোমার পিতা কি আশা করেন?

আমি বলিতে পারি না।

অর্থের আশা পূর্ণিত হইলে আর কোন আপত্তি হইতে পারে কি?

সম্ভবত নহে।

তোমার নিজের কোন আপত্তি নাই?

কিছু না।

তবে দেখা যাউক, বলিয়া সদানন্দ পুনর্বার বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিল।

শারদাচরণ বলিল, কোথায় যাও? একটু বসিবে না?

না।

সদানন্দ, আমার কোন দোষ নাই।

বোধ হয় নাই—ভগবান জানেন—আমি বলিতে পারি না।

রাগ করিলে?

না।

সদানন্দ বাটী ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইল, তাহার পর পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। পথ বাহিয়া গঙ্গাপানে চলিল। ভাগীরথীর ছোট ছোট ঢেউ বাঁধাঘাটের সোপানে ঝলমল ছলছল করিয়া ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া সরিয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, সদানন্দ কিছুক্ষণ সেইগুলি দেখিতে লাগিল; দূরে একখানা বজরা ছপ্‌ছপ্‌ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া আসিতেছে, সদানন্দ অন্যমনে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঘাটের সর্বনিম্ন সোপানের উপর বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আপনার মনে আকাশপানে চাহিয়া গান ধরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেইদিন, রাত্রে জ্যোৎস্নাধৌত প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া ভাঁটার স্রোতে গা ভাসাইয়া, ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালনের মত ছপ্‌ছপ্‌ করিয়া দুটি দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে সুরেন্দ্রবাবুর প্রকাণ্ড বজরা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল।

ছাদের উপরে সুরেন্দ্রবাবু ও জয়াবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, নীচে কামরার জানালা খুলিয়া মালতী গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট রজত ঢেউগুলি গুণিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল। মালতী বুঝিতে পারিল এইবার হলুদপুর আসিতেছে। আরো কিছুক্ষণ আসিয়া গঙ্গাতীরের অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার পার্শ্বে বাঁধাঘাট

চন্দ্রকিরণে ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে তাহাও দেখিল। আর তাহার পশ্চাতে হলুদপুর গ্রাম সুপ্ত নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে। মালতী তথাকার প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক নরনারীর নিদ্রিত মুখ মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, আর ঐ ঘাট—সে যখন ললনা ছিল তখন দুবেলা ঐখানে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, গাত্র ধৌত করিতে আসিত; ঐ ঘাট হইতে পিত্তলকলসী পূর্ণ করিয়া জল না লইয়া গেলে পান করা, রন্ধন করা চলিত না। মালতী এখন মালতী—সে আর ললনা নহে, তবুও তাহাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই। শুভদাকেও ভুলিতে পারা যায় না, মাধবকেও ভুলিতে পারা যায় না, হারাণ মুখুজ্যেকে ভুলিতে পারা যায় না, তাই ভাবিতেছিল আর কাঁদিতেছিল; আর সদাপাগলাকেও সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। ইতিপূর্বেই তাহা মালতী ভাবিয়া দেখিয়াছিল। মালতী ভাবিল, ছলনা, বিন্দু, কৃষ্ণপিসিমা, গিরিজায়া, শৈলবতী, রমা—কেউ না—কেউ না; সদানন্দ তাহার পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা লইয়া স্মৃতির অর্ধেক জড়াইয়া বসিয়া আছে, কর্ণে তাহারই গান শুনিতে পাইতেছে। মালতীর বোধ হইল যেন সদাপাগলার প্রফুল্ল সুর করুণ হইয়া অস্পষ্টভাবে কোথা হইতে তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছে। মালতী বিস্মিত হইল; স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল ঠিক সদানন্দর মত কে গীত গাহিতেছে। বজরাখানা আরও একটু আগাইয়া আসিলে মালতী দেখিল ঘাটের নীচে জলে পা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে, কিন্তু গান তখন বন্ধ হইয়াছে। লোকটি কে তাহা ঠিক চিনিতে না পারিলেও মালতী পরিষ্কার বুঝিল এ সদানন্দ ভিন্ন আর কেহ নহে; পাগল ক্ষ্যাপা লোক ভিন্ন কে আর অত রাত্রে মা গঙ্গাকে গান শুনাইতে আসিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন মালতী পুনর্বার কাঁদিতে বসিল। সদানন্দর কথা যত মনে করিতে লাগিল, তত ললনার কথা মনে পড়িতে লাগিল; শুভদা, ছলনা, মাধব, পিসিমা আর হতভাগা হারাণ মুখুজ্যে—সকলেই সদানন্দর স্মৃতি মাঝখানে রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক রাত্রে মালতী ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল, প্রভাত হইল, ক্রমে সূর্য উঠিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল। মালতী কিন্তু উঠিতে পারিল না। সমস্ত অঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা; গা গরম হইয়াছে, মাথা টন্‌টন্‌ করিতেছে, আরো নানা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। দাসী আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, তোমার যে দেখছি জ্বর হয়েচে। মালতী চুপ করিয়া রহিল। জয়াবতী আসিয়া গায়ে হাত দিল, জানালা খোলা আছে দেখিয়া একটু অনুযোগ করিল। বলিল, এমনি করে কি জানালায় মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে? সমস্ত রাত্রি পুবে হাওয়া লেগে গা গরম হয়েচে।

মালতী মৃদুভাবে বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই জানালা বন্ধ করা হয়নি।

সুরেন্দ্রবাবু একথা শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন। সত্যই জ্বর হইয়াছে। তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল। তাহা হইতে ঔষধ লইয়া খাইতে দিলেন আর জয়াবতীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন খুব সাবধানে রাখা হয়।

জয়াবতী মালতীর কাছে আসিয়া বসিল। কামরার জানালা সার্সী সমস্ত বন্ধ, মালতী কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, এমন কি বজরা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কামরায় জয়াবতী ভিন্ন আর কেহ নাই দেখিয়া মালতী বলিল, দিদি! জয়াবতীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আমরা কতদূর এসেছি জান?

জয়াবতী বলিল প্রায় আট-দশ ক্রোশ হবে।

মালতী তাহা জানিতে চাহে নাই, বলিল, কলকাতা আর কতদূরে?

এখনো প্রায় দু'দিনের পথ।

মালতী চুপ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া লইল। পরে বলিল, দিদি, যদি সে সময়ের মধ্যে ভাল না হই?

জয়াবতী কথার ভাবটা বুঝিতে পারিল। স্ত্রীলোকে এ সময়ে হিংসা রাখে না—তাই একটু হাসিয়া বলিল, তাহলে আমরা তোমাকে জলে ফেলে দোব।

মালতীও একটু হাসিল, কিন্তু সে-হাসিতে এ-হাসিতে একটু প্রভেদ ছিল। বলিল, হ'লে ভাল হ'তো দিদি।

জয়াবতী অপ্রতিভ হইল। কথাটার যে আরো একটু অন্যরূপ মানে হইতে পারে তাহা সে ততটা ভাবিয়া বলে নাই, বলিল, ছিঃ! ওকথা কি বলে?

মালতী চুপ করিয়া রহিল, আর উত্তর করিল না। নিঃশব্দে সে ভাবিয়া দেখিতেছিল যে, জয়াবতীর কথা সত্য হইলে কেমন হয়? ভাল হয় কি? হয় না। মরিতে তাহার সাধ নাই। তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সে মরণের অধিক ক্লেশ পাইতেছে, তথাপি মরিতে পারিবে না; মরণে ভয় নাই, তথাপি মরিবার ইচ্ছা নাই। যাহারা সে ইচ্ছা করিতে পারে তাহাদের দুঃখ তত অধিক নয়। একবিন্দু জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জয়াবতী সস্নেহে তাহা মুছাইয়া বলিল, ভাব কেন বোন? পূবে বাতাস লেগে একটু গা গরম হয়েচে, তাই বলে কি ভাবতে হয়? তাহার পর একটু থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া সাবধান হইয়া বলিল, আর যদি তেমন তেমন হয় তা হলেও ত উপায় আছে, কাছেই কলকাতা—সেখানে ডাক্তার-বদ্দির অভাব কি?

অভাব কিছুরই ছিল না এবং প্রয়োজনও কিছুই হইল না। বজরা যেদিন কলিকাতা আসিয়া পহুঁছিল সেদিন মালতীর আর জ্বর ছিল না, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল, এখনো কিছুই খাইতে পায় নাই। বজরা কলিকাতা ছাড়াইয়া একটু দূরে—পরপারে নোঙ্গর করা হইল। কামরার জানালা খোলা ছিল, মুখ বাড়াইয়া মালতী জাহাজ, মাস্তুল, বড় বড় নৌকা ও প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শ্রেণীর চূড়া দেখিতে লাগিল। মালতীর ভয় হইতেছিল: ভাবিতেছিল এই কি কলিকাতা? তাহা হইলে এত গণ্ডগোলে এত শব্দসাড়ার মধ্যে কে তাহার কথা শুনিতে পাইবে? এত ব্যস্ত শহরে কে তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাইবে? কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহাকে যাইতেই হইবে। যেজন্য এ অসম-সাহসিক কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের মুখ মনে করিয়া নরকে ডুব দিতে বসিয়াছে—ইহকাল পরকাল কোন কথাই মনে স্থান দেয় নাই, তাহাদের মুখ এত শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। আজ না হয় কাল এ আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেই হইবে; আর যখন হইবেই তখন আর ভয় করিয়া লাভ কি?

সে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রচার করিলেন যে, বজরা এস্থানে আরও তিন-চারিদিন বাঁধা থাকিবে। মালতীর শরীর রীতিমত সুস্থ হইলে তবে সে যেখানে ইচ্ছা যাইবে; বজরাও সেইসময়ে খোলা হইবে। মালতী একথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিল। আন্তরিক সে ইহাই প্রার্থনা করিতেছিল; কেননা, যতই প্রয়োজনীয় এবং কর্তব্য হউক না, আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ে যাইতে মনকে তেমন সহজে রাজী করিতে পারা যায় না, ইতিপূর্বেই সে এই মর্মে তাহার সহিত কলহ করিতেছিল—এখন যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেটাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া চলনসই গোছ একরকম করিয়া লইবার মত সময় পাইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে জয়াবতী কলিকাতা ভ্রমণ করিতে যাইবে স্থির হইয়াছিল। গাড়ি, পান্সি ঠিক করিয়া ভৃত্য সংবাদ দিল; জয়াবতী বাবুকে তাহার সহিত যাইতে অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না; মালতী যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাবু নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন—তাহার শরীর ভাল নয়, আবার জ্বর হইতে পারে। তখন অগত্যা জয়াবতী একাই দাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেল।

মালতী কামরার ভিতর শয়ন করিয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবু দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মালতী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া বসিল, সুরেন্দ্রবাবু একটু দূরে উপবেশন করিলেন—অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। তিনি কিছু বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে সাহস হইতেছিল না—অনেকক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, তুমি এইখানেই কি নিশ্চয় নামিয়া যাইবে?

মাথা নাড়িয়া মালতী বলিল, হাঁ।

বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?

মালতী সেইরূপভাবে বলিল, দেখিয়াছি।

কোথায় যাইবে?

তা ত জানি না।

• সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তবে আর কি দেখিয়াছ? আজ নয়, কাল একবার কলিকাতার ভিতরটা দেখিয়া আসিও; তাহার পর যদি নিশ্চিত ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতই ভাল লাগে—যাইও, আমি বারণ করিব না।

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা ম্লানভাবে কহিতে লাগিলেন, তুমি যতটা না ভাবিয়াছ, আমি ততটা ভাবিয়া দেখিয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—হীনবৃত্তি করিতে পারিবে না; ভদ্রলোকের কন্যা ভদ্রসংসারে প্রবেশ করিতে না পারিলে তুমি থাকিতে পারিবে না; এ অবস্থায় নিঃসহায় কেমন করিয়া যে এত বড় শহরে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিবে, আমি বুঝিতে পারি না। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার কহিলেন, আর ভাবিয়া দেখ, তোমার এ বয়সে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া আপনাকে সামলাইয়া চলিতে পারিবে কি? ভয় হয় পাছে পদে পদে বিপদে পড়।

মালতী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, এসকল সে সমস্তই ভাবিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু উপায় ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, মালতী কাঁদিতেছে, পূর্ব্বেও তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন অন্যরূপ মনে হইতে লাগিল; বলিলেন, যাওয়াই কি স্থির করিলে?

মালতী চোখ মুছিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে অনেকেই বোকা মনে করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। যাহারা তাঁহাকে এ আখ্যা প্রদান করিত তাহাদের অপেক্ষাও তিনি বোধ হয় শতগুণ অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের মত কর্ম্ম করিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না। মালতীর মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন, তাহার পর মালতী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে বলিলেন, মালতী, তোমার বড় টাকার প্রয়োজন, না?

তাহার চক্ষুজল আবার উছলাইয়া উঠিল। এত প্রয়োজন বোধ হয় জগতে আর কাহারো নাই।

বড় প্রয়োজন কি?

মালতী কান্না কতকটা শেষ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, বড় প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিলেন, বুঝিতে তাঁহার আর বাকি নাই। পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল, কারণ, এসব লোকেরও যে কাঁদিবার যথার্থ কারণ থাকিতে পারে, সকলেই যে শুধু মন ভোলাইবার জন্য কাঁদে না তাহা তিনি কুসংসর্গ-দোষে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। অল্প হাসিয়া, অল্প চাপিয়া বলিলেন, তবে আর কাঁদিতেছ কেন? তুমি রূপসী, তুমি যুবতী, কলিকাতায় যাইতেছ—এখন আর তোমাকে অর্থের ভাবনা ভাবিতে হইবে না—কলিকাতায় অর্থ ছড়ান আছে দেখিতে পাইবে।

মালতীর বোধ হইল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মাথাটা খসিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে, এখন জানালা গলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মালতী এইরূপে কিছু একটা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বোধ হইল, যেন বাধা পড়িয়াছে, যেন মূর্চ্ছিত হইয়া একজনের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে কোল যেন অগ্নিবিক্ষিপ্ত, বড় কঠিন, বড় উত্তপ্ত, তাহাতে যেন একবিন্দু মাংস নাই—এতটুকু কোমলতা নাই। সমস্ত পাষাণ, সমস্ত অস্থিময়। মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও মালতী শিহরিয়া উঠিল। যখন জ্ঞান হইল তখন যে সে কাহারো ক্রোড়ের উপর শুইয়া আছে তাহা বোধ হইল না; চক্ষু চাহিয়া দেখিল আপনার শয্যাতে শুইয়া আছে, কিন্তু পার্শ্বে সুরেন্দ্রবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল, দুই হাতে মুখ চাপিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, মালতী, কাল প্রাতঃকালে আমি বজরা খুলিয়া দিব, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া মালতী শুনিতে লাগিল—যেজন্য তুমি কলিকাতা যাইতে চাহিতেছ তাহা

তুমি পারিবে না। এ বৃত্তি বোধ হয় তুমি পূর্বে কখন কর নাই, এখনও পারিবে না। তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হয়, যাহা কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভিলাষ হয় আমি দিব।

মালতীর রুদ্ধশ্বাসের সহিত চক্ষুজল বাহির হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিলেন, সযত্নে আপনার ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, মালতী, আমার সহিত চল। আমি খুব ধনী না হইলেও দরিদ্র নহি—তোমার ব্যয় স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারিব; আর বল দেখি, আমি তোমাকে এখানে ফেলিয়া গেলে বাঁচিবে কি? না, আমিই শান্ত মনে বাটী ফিরিতে পারিব? সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে আরো বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, সস্নেহে সে অশ্রু মুছাইলেন—আগ্রহে ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় সঙ্কুচিত সে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেমন যাবে ত?

মালতীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; সে আর সে নয়; সে ললনা নয়, সে মালতী নয়, সে কেহ নয়, শুধু এখন যাহা আছে তাহাই; সুরেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গিনী, আজন্মের প্রণয়িনী; সে সীতা, সে সাবিত্রী, সে দময়ন্তী; সীতা-সাবিত্রীর নাম কেন? সে রাধা, চন্দ্রাবলী; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সুখ, শান্তি, স্বর্গের ক্রোড়ে আবার মান-অপমান কি? ললনা নিস্পন্দ অচেতন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া রহিল; সে ক্রোড় আর অস্থিময়, পাষাণ, অঙ্গারবিক্ষিপ্ত নহে; এখন শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল, মধুময়! ললনার বোধ হইল সে এতদিন শাপগ্রস্ত ছিল, এখন পুনরায় স্বর্গে আসিয়াছে, এতদিন পরে হৃতধন ফিরাইয়া পাইয়াছে। মালতীর সঙ্কুচিত ওষ্ঠ পুনরায় বিস্ফারিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সে ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আর পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া ললনা দেবী স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। তখন সূর্য অস্তগমন করিতেছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়া এ পাপচিত্র দেখিয়া যাইলেন, সে অপরাহ্ণ-সূর্য-রক্ত-করস্পর্শে ললনার মুখমণ্ডল সুরেন্দ্রের চক্ষে সহস্রগুণ অধিক মনোমুগ্ধকর প্রতিভাত হইল; তিনি সহস্র আবেগে, সহস্র তৃষ্ণায় সে-মুখ পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিলেন, মালতী, যাবে ত?

যাব।

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্ত হইলেন—তবে চল এখনি যাই।

কিন্তু দিদি?

কে দিদি?

তোমার স্ত্রী।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গিল। শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রী! সে ত অনেকদিন মরিয়াছে।

জয়াবতী?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাস্য করিলেন; বললেন, জয়া আমার স্ত্রী নয়—তাকে কখন বিবাহ করি নাই।

তবে কি?

কিছু নয়—কিছু নয়। তুমি আমার সব, সে কেহ নয়—তুমি সব—তুমি সমস্ত।

এবার মালতী তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিল, ক্রোড়ে মুখ লুকাইল,—ছিঃ ছিঃ! মুক্তকণ্ঠে কহিল, আমি তোমার চিরদাসী, আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

না, কখন না।

তবে আমাকে নিয়ে চল।

চল।

আজি।

এখনি।

এই সময়ে বাহিরে শত-সহস্র কণ্ঠ নানাকণ্ঠে নানারূপে চীৎকার করিয়া উঠিল, ধর ধর—সরে যাও—তফাৎ—তফাৎ—গেল গেল—ডুবল—হো হো—ঐ যা—সুরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও বাহির হইয়া পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এপারে ওপারে, চতুর্দিকে মাঝিমাল্লা, মুটেমজুর সমস্ত সমবেত হইয়া চীৎকার করিতেছে

এবং কিছু দূরে প্রায় মধ্যগঙ্গায় একখানা পান্‌সি স্টিমারে ধাক্কা লাগিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে।

চক্ষুর নিমিষে সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন কি ঘটিয়াছে; চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওতে আমার জয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্ব হইতে মালতী ধরিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ পাগলের মত ছটফট করিয়া আবার চীৎকার করিলেন, ধরো না, ধরো না—আমার জয়া যায় যে!

ততক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রাণ নৌকাখানি প্রকাণ্ড স্টিমারের তলদেশে ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল। ... ও মাঝিমাল্লা, ভৃত্য প্রভৃতির হস্তে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয়া! জ্ঞান হইলে, প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, জয়া! পার্শ্বে মালতী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল, তাঁহার কথার ভাবে সে আরো অধিক করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। তিনি কিন্তু তাহা দেখিলেন না; একবারমাত্র চাহিয়াছিলেন, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, জয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই?

নিকটে একজন পুরাতন ভৃত্য বসিয়াছিল, সে কাতরভাবে কহিল, না।

পাওয়া যায় নাই? তবে বোধ হয় সে আর বাঁচিয়া নাই।

ভৃত্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বোধ হয়।

সুরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি কত হইয়াছে?

প্রায় দশটা।

দশটা? তবু সংবাদ নাই?

ভৃত্য উত্তর দিল, না।

সুরেন্দ্রবাবু অধিকতর হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করিলেন, বলিলেন, তোমরা সবাই যাও—সমস্ত শহরে সমস্ত গঙ্গার ধারে সন্ধান কর গে।

ভৃত্য মনে মনে ভাবিল, মন্দ হুকুম না! মুখে বলিল, যে আজ্ঞা। পরে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আপনার নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

কক্ষে মালতী ভিন্ন আর কেহ নাই, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। কামরার দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল সেটা আপনার মনে এগারটার পরে বারটা, তাহার পর একটা, দুইটা, তিনটা, চারিটা—তাহার পুঁজিপাটা সমস্ত বাজাইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। সুরেন্দ্রনাথ এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, মালতী পাশে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল, আর চক্ষু মুছিতে লাগিল; তাহারও কষ্ট হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে এবং ততোধিক নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সে ভাবিয়া দেখিতেছিল।

একে ত কলিকাতার গঙ্গা সমস্ত রাত্রিই প্রায় নিদ্রা যান না, এখন আবার চারিটা বাজিয়া গিয়াছে—চতুষ্পার্শ্বে অল্প ঈষৎ বেশ সাড়াশব্দ হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, সমস্ত রাত্রি মিথ্যা জাগিয়া কোন ফল নাই, তুমি শোও গে।

মালতী উঠিয়া যাইতেছিল, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন, বসো, যেও না, তোমাকে কিছু বলিব।

মালতী দুইপদ অগ্রসর হইয়াছিল, পুনরায় সেইখানেই উপবেশন করিল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার চক্ষু রগড়াইলেন, একবার কি বলিবেন তাহা যেন ভাবিয়া লইলেন,

তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিলেন, মালতী, কার পাপে এই হইল?

মালতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; একথা সে বহুবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; উত্তরও একরকম পাইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে তাহার মুখ বন্ধ হইল, কাজেই অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

সুরেন্দ্রবাবুও যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া বলিলেন, সে-সব কথা পরে হইবে, এখন যাও।

মালতী তথা হইতে আপনার কামরায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল কি? না; বাকি রাত্রিটুকু শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। অনেকবার বসিল, অনেকবার শুইল, অনেক দেবদেবীর নাম করিল, অনেক কথা মনে করিল; তাহার পর ভোরবেলায় তন্দ্রার ঝোঁকে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল জয়াবতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন দেখিল সদানন্দ মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে, কখন দেখিল জননী শুভদা আকুলভাবে রোদন করিতেছে। সর্বশেষে বোধ হইল যেন মাধব আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেছে, মালতীর তথায় যাইবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। মালতীর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল প্রাতঃসূর্যকিরণ খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন সমস্তদিন সে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল না; কিছু পূর্বেই তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরদিনও তিনি আসিলেন না; তাহার পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া আপনার কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেদিনও এমনি কাটিল। পরদিন তিনি মালতীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মালতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্নমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একখানা কাগজ লইয়া কি লিখিতেছিলেন, বোধ হয় কোথাও পত্র লিখিতে-ছিলেন। মালতী আড়চক্ষে ভয়ে ভয়ে দেখিল তাঁহার সমস্ত মুখ অতিশয় ম্লান, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আছে, মাথার চুলগুলা নিতান্ত রুক্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বস্ত্রের স্থানে স্থানে এখনো কাদা লাগিয়া আছে, মালতী আপনা-আপনি শিহরিয়া উঠিল, তাহার বোধ হইল যেন নিতান্ত গর্হিত অপরাধে তাহাকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবাবু অর্ধলিখিত কাগজখানা পার্শ্বে রাখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে কি?

মালতী অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আমি আজি বজরা খুলিয়া দিব। পরপারে কলিকাতা—তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার।

কথা শুনিয়া মালতীর চক্ষে জল আসিল, কোন কথা সে কহিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পার্শ্বের কাগজখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, এই পত্রখানা লইয়া সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট যাইও, তিনি তোমার কোনরূপ উপায় করিয়া দিবেন।

টপ্ করিয়া একফোঁটা জল মালতীর চক্ষু হইতে পদতলে কার্পেটের উপর পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবুও বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার নিকট টাকাকড়ি বোধহয় কিছুই নাই?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহা আমি জানিতাম। এই নাও, বলিয়া একটা মনিব্যাগ উপাধানের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ইহাতে যাহা আছে, কোনরূপ উপায় না হইলেও এক বৎসর ইহা হইতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলিবে; তাহার পর ঈশ্বরের আশীর্বাদে যাহা হয় করিও।

আর একফোঁটা জল কার্পেটের উপর আসিয়া পড়িল।

সেদিন উন্মত্ত ছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাহার পাপে এমন ঘটিল? কিন্তু

এখন জ্ঞান হইয়াছে, এখন দেখিতেছি আমারই পাপের এই ফল—তুমি নির্দোষ! আমার জয়াকে আমিই মারিয়া ফেলিয়াছি।

কপালের উপর কয়েক বিন্দু ঘাম জমা হইতেছিল, তিনি হাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ঢের হইয়াছে—আর পাপ করিব না; কিছুদিন সৎপথে থাকিয়া দেখি যদি সুখ পাই।

মালতী দাঁড়াইয়া রহিল; সুরেন্দ্রবাবু পত্রখানা শেষ করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে, মুড়িয়া খামে পুরিয়া শিরোনামা দিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও। শ্যামবাজারে সন্ধান করিয়া লইও, বোধ হয় ইহাতে উপকার হইবে।

কম্পিতহস্তে মালতী পত্রখানা তুলিয়া লইল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, টাকা নাও।

সে তাহাও উঠাইল; দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইল।

সুরেন্দ্রবাবুর ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল; বলিলেন, ধর্মপথে থাকিও--

মালতী আর একপদ অগ্রসর হইল। এবার সুরেন্দ্রনাথের গলা কাঁপিল--মালতী, সেদিন-কার কথা বিস্মৃত হইও—

মালতী দ্বারের হাতল ধরিয়া টানিল, দ্বার অর্ধউন্মোচিত হইল, সুরেন্দ্রনাথের গলা আরো কম্পিত হইল--অসময়ে, কষ্টে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।

মালতী বাহিরে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল; ডাকিলেন, মালতী!

মালতী সেইখানেই দাঁড়াইল।

আবার ডাকিলেন, মালতী!

সে এবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কপাটে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

চক্ষু মুছিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, জয়ার শোক এখনও ভুলি নাই—

মালতী দ্বার ছাড়িয়া সেইখানে উপবেশন করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল।

মালতী, কি লইয়া সংসারে থাকিব? সুরেন্দ্রনাথ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আর বাঁচিব না। এইবার নীচে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মালতী কাছে আসিয়া বসিল, আপনার ক্রোড়ের উপর মাথা তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি যাইব না।

তখন দুইজনেই বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিলেন। মালতী পুনর্বার চক্ষু মুছাইয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিতই ছিল; সেইভাবেই ভগ্নস্বরে বলিলেন, সেদিন তুমি কি বলিয়াছিলে মনে আছে?

কি?

চিরদাসী!

তাই।

সুরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হরিচরণ!

ছাদের উপর হইতে হরিচরণ মাঝি বলিল, আজ্ঞে!

বজরা এখনি খুলিয়া দাও।

এখনি?

এখনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতক্ষণ বজরাখানা দেখা গেল, সদানন্দ গীত বন্ধ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল। আজ তাহার মনটা ভাল ছিল না, নিদ্রাও ভাল হইল না। প্রাতঃকালে শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, আমার এখানে খেলে হয় না?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, কেন হবে না?

আমি তাই মনে করছি; আমার কেউ নেই, দুবেলা এখানেই দুটি খাব।

শুভদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ ত।

পিসিমার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর কতক জমিজমা আছে, সেগুলা আমিই পাইয়াছি, দু-একদিনের মধ্যেই সেখানে যাইয়া আমাকে সব দেখিয়া-শুনিয়া লইতে হইবে।

শুভদা বলিল, তা ত নিশ্চয়, না হলে কে আর দেখিবে?

তাই মনে করিতেছি যে, আমার ধানের গোলাটা এখানেই রাখিব, না হইলে চুরি যাইতে পারে।

শুভদা ভিতরের কথা বুঝিল না। বলিল, এতদিন ত চুরি যায়নি।

না যাউক, কিন্তু এখন ত যাইতে পারে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ইহার দুই-একদিনের মধ্যেই সদানন্দর ধানের গোলা, কলাইয়ের মরাই, আলুর বোঝা, নারিকেলের ডাঁই, গুড়ের জালা সমস্ত একে একে সরিয়া আসিয়া মুখুজ্যে-পরিবারে স্থান গ্রহণ করিল।

দেখিয়া-শুনিয়া শুভদা বলিল, সদানন্দ, লোকে কি বলিবে?

সদানন্দ হাসিয়া উত্তর দিল, জিনিস আমার, লোকের নহে। আমি এইখানে খাই, এইখানে থাকি, আমার জিনিসপত্রও এইখানে থাকিবে।

বাস্তবিক পাড়ার পাঁচজনও পাঁচরকম কথা কহিতে লাগিল; কেহ বলিল, হারাণের বৌ সদাপাগলাকে জাদু করিয়াছে; কেহ কহিল, সদানন্দ একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে; কেহ বা এমন কথাও রটাইল যে, ছলনার সহিত সদার বিবাহ হইতেছে। সদানন্দ একথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল; যে সম্মুখে একথা উত্থাপন করিল তাহাকে হাসিমুখে একটা রামপ্রসাদী গান শুনাইয়া দিল, কাহাকে বা রসিকতা করিয়া বলিল, আমি মরিলে তোমার নামে দুবিঘা জমি লিখিয়া দিয়া যাইব, কাহাকে বা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল, পাগলা মানুষে পাগলামি করে সেজন্য তোমরা ভাবিও না। ক্রমশঃ লোকে মুখ বন্ধ করিতে লাগিল, তবে যাহারা ঈর্ষাপরতন্ত্র তাহারা মনে মনে জ্বলিতে লাগিল। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একথা শুনিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া দিলেন।

বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়া সদানন্দ দুঃখিতভাবে বলিল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন পিসিমার শ্বশুরবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধানের গোলাটা আপনার বাটীতে রাখিয়া যাইব।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওহে সদানন্দ, তোমার পিতাও আমাকে মান্য করিয়া চলিতেন।

আমিও কোনরূপ অমান্য করি নাই।

তবে এমন কথা বলিলে কেন?

সদানন্দ অপ্রতিভভাবে কহিল, আমার সব সময়ে মতিস্থির থাকে না।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আরো রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তুমি উৎসন্ন যাইতেছ।

সদানন্দ মৃদু হাসিল; আপনারা একটু চেষ্টা করিলে না যাইতেও পারিতাম।

তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

যে আজ্ঞা, বলিয়া সদানন্দ বাহিরে আসিয়া খুব একগাল হাসিয়া লইল, তাহার পর গলা ছাড়িয়া রামপ্রসাদী ধরিল।

নিকটে কাঙ্গালীচরণ মাথায় পটলের বোঝা লইয়া হাটে যাইতেছিল, সে চোখে হাসি,

ম্বখে গান দেখিয়া বলিল, কি দাদাঠাকুর, এত আমোদ কিসের?

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, গাঙ্গ্বলিমশায়ের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ ছিল, খ্বব খেয়েছি।

সে বলিল, বটে!

তখন সদানন্দ আজকাল পটলের দর জিজ্ঞাসা করিয়া আর একবার হাসিয়া প্র্বোক্ত গানটার স্বর গলার মধ্যে বেশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া মনের আনন্দে পথ বাহিয়া চলিল, কাঙ্গালীচরণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এখন একটা কথা আছে। কবি বলিয়াছেন, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; সাংসারিক অস্তিত্ব ইহার বড় একটা নাই। একথা সম্প্রর্ণ সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ, হারাণচন্দ্রের যাহা পার্থিব স্বখের শেষ সীমা, শ্বভদা তাহা তেমন উপভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। হারাণচন্দ্র দ্ববেলা পরিতোষে আহার করিতে পান, চাহিলেই দ্বই-চারি আনা পয়সা স্ত্রীর নিকট কর্জ পাইতে পারেন, তাহা পরিশোধ করিবার বালাই মাত্র নাই, বাজারের ভিতর দিয়া এখন উন্নত মস্তকে গমনাগমন করেন, কোন শ্যালকের নিকট একটি পয়সা মাত্র কর্জ নাই, আড্ডাধারী তাঁহার প্র্বপদ সসম্মানে ফিরাইয়া দিয়াছে; আর চাই কি? তবে যেট্বকু বাকি আছে, হারাণচন্দ্র ভাবেন, সদানন্দ আর একট্ব ক্ষেপিলেই তাহা সমাধান করিয়া ফেলিবেন। গ্বলির দোকানটা তখন নিজেই কিনিয়া লইবেন, আর কাত্যায়নী ছোটলোক বেটীর গর্ব রীতিমত খর্ব করিবেন। তাহার এক বৎসরের খোরাক ঋনাং করিয়া তাহার সম্ম্বখে আগাম ফেলিয়া দিয়া বলিবেন, ছোটলোক বেটী! আমাকে হেয় করিস? প্বর্ষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা জানেন না, তা তুই কোন্ ছার। আর ভগবান নন্দী! তার বাটীর সম্ম্বখে যদি আড্ডাঘর না বসাই ত আমার নাম হারাণ নয়। হারাণচন্দ্র এখন গ্বন্গ্বন্ স্বরে গলায় স্বর লইয়া সমস্ত বাম্বনপাড়াটা ঘ্বরিয়া বেড়ান।

কিন্তু শ্বভদা? তাহার কি এক ভাবনা? ভগবান জানেন স্বামীস্বখ সে একদিনের জন্যও পায় নাই; অন্ততঃ তাহার মনে পড়ে না—সে স্বামীর ম্বখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, তাহা সে নিজেই অন্বধাবন করিয়া উঠিতে পারে না; আনন্দে চোখের কোণে জল আইসে, কিন্তু কে তাহা দেখিবে? দেখিবার একজন ছিল, ব্বঝিবার একজন ছিল, কিন্তু সে প্র্বেই গত হইয়াছে। শ্বধ্ব ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে শ্বভদা এই স্বখেই সাংসারিক কাহিনী খতম করিয়া দিতে পারিত; কিন্তু ছলনা দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপায় কি করিয়া হইবে? যে মরিয়াছে সে বাঁচিয়াছে, কিন্তু মাধবের মনে যে কি আছে, শ্বভদা সে তত্ত্ব কিছ্বতেই নির্পণ করিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল চিকিৎসার অনেক স্বযোগ হইয়াছে, যথাসাধ্য চিকিৎসাও হইতেছে, কিন্তু ফল যে কিছ্ব হইতেছে তাহা কিছ্বতেই বোধ হয় না। শ্বভদা একথা ভাবিয়া কপালে করাঘাত করে, ললনার কথা মনে করিয়া আকুলভাবে আপনা-আপনি রোদন করে, আর তাহার নিকট যাইবার কামনা করে; আবার জল আনে, রন্ধন করে, সকলকে খাওয়ায় পরায়—এমনি করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া সদানন্দ শ্বভদার ম্বখপ্রতি চাহিয়া বলিল, ছলনা বড় হয়েছে।

শ্বভদা মলিন ম্বখে বলিলেন, হাঁ।

আর রাখা যায় না, ভালও দেখায় না।

শ্বভদা বলিল, মা দ্বর্গাই জানেন।

সদানন্দ একট্ব হাসিল; বলিল, মা দ্বর্গা ত আর বিবাহ দিয়া যাইবেন না?

শ্বভদা মৌন হইয়া রহিল।

হরমোহনবাবুর ছেলে শারদার সহিত বিবাহ দিলে হয় না!

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না; বলিল, শারদার সঙ্গে?

হাঁ।

তা সম্ভব কি?

অসম্ভবই বা কিসে?

কি জানি! একথাটা শুভদা সম্পূর্ণ হতাশভাবেই বলিল।

পাগলা সদানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া লুকাইয়া একটু হাসিয়া লইল; তাহার পর বলিল, এ বিষয় শারদার নিকট একদিন বলিয়াছিলাম; তাহার অমত নাই।

শুভদার মুখে আগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তখনই তাহা মিলাইয়া গেল; বলিল, কিন্তু তার পিতা? তাঁর কি মত হইবে?

না হইবে কেন?

কেন হইবে না, তাহা শুভদা বুঝিত, ছেলের ইচ্ছাসত্ত্বেও কেন যে বাপের ইচ্ছা হইবে না তাহাও জানিত, কিন্তু খুলিয়া বলিতে পারিত না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কে তাহার পিতার মত করিতে যাইবে? কিন্তু তাহাও বলিল না, শুধু মৌনমুখে কাতর নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পাগলা সে মৌনভাষাও বুঝিল; বলিল, তাহার পিতার মত আমাদেরই চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। কারণ বিবাহ ত দিতেই হইবে।

শুভদা ভয়ে ভয়ে, আশায় নিরাশায়, অস্ফুটে বলিল, হইবে কি?

নিশ্চয় হইবে।

কেমন করিয়া জানিলে?

পাগলা আবার একটু হাসিল; আমি তাহা জানি। আপনি ভাবিবেন না, এ মত আমি নিশ্চয় করিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের কিরূপে মত করিতে হইবে সদানন্দ তাহা বিশেষ বিদিত ছিল, মত যে নিশ্চয় হইবে তাহাও জানিত।

শুভদা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে দুধ আনিতে গেল। কিন্তু দুধের বাটি হাতে লইয়া অসাবধানে তাহাতে বড় একফোঁটা চোখের জল মিলাইয়া ফেলিল। অপ্রতিভভাবে বাহিরে আসিয়া কহিল, সদানন্দ, বসো, ওঘর থেকে দুধটা বদলে নিয়ে আসি।

ওঘরে আসিয়া, দুগ্ধের কড়ায় হাত রাখিয়া শুভদা আরো একটু কাঁদিয়া লইল, সাবধান হইয়া আরো দুই-চারিটা বড় বড় ফোঁটা মৃত্তিকার উপরে ফেলিল, তাহার পর চক্ষু মুছিয়া দুগ্ধ ঢালিতে লাগিল। শুভদা কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্ভেদী রক্তবিন্দু নহে, বরং অসম্ভব আনন্দাশ্রু; ললনার শোকের একফোঁটা জল; স্বামীর বেদনার এক-বিন্দু বারি।

আহার সমাপন করিয়া সদানন্দ মাঠপানে চলিল। সেখানে তাহার ক্ষেত আছে, কৃষাণ কাজ করে, গরুবাছুর চরিয়া বেড়ায়—সেখানে সদানন্দ আলের উপর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, একটা অশ্বত্থমূলে বসিয়া দুই-চারিটা কালীনাম করিল, দুই-চারি ছিলিম তামাকু পোড়াইল, তাহার পর তথা হইতে উঠিয়া হরমোহনবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ হরমোহন তখন নিদ্রান্তে তাম্বূল চর্বণ করিতেছিলেন, কলিকার তাওয়াটা তখনও তত উত্তপ্ত হয় নাই, একটু একটু ধূম নির্গত হইতেছিল মাত্র।

বৃদ্ধ, সদানন্দকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি হে, অনেকদিন যে তোমাকে দেখি নাই?

সদানন্দ বলিল, অনেকদিন কাশীতে ছিলাম।

তাহা শুনিয়াছিলাম। তোমার পিসিমাতার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছি। আসিলে কবে? বসো।

সদানন্দ বিলক্ষণ সপ্রতিভভাবে নিকটেই স্থান গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিল। সদানন্দ মুখবন্ধের ধার ধারে না, মিথ্যা আড়ম্বরের ঘটা তাহার ভাল লাগে না; বসিয়াই বলিল, মহাশয়ের নিকট বিবাহের ঘটক হইয়া আসিয়াছি।

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, কাহার?

আপনার পুত্রের।

বৃদ্ধ এইবার গম্ভীর হইলেন। বিষয়ী লোক সাংসারিক কথাবার্তার সময় হাসি-তামাসাগুলিকে অনেকদূরে বিদায় দিয়া আইসেন। হরমোহনের নিকট তাঁহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা একটা গুরুতর বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে। এতাবৎ এবিষয়ে তাঁহাকে অনেক মাথা ঘামাইয়া আসিতে হইয়াছে, অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে এরূপ জটিল দেনা-পাওনার যুক্তিতর্কে রীতিমত বুদ্ধি পরিচালনা না করিতে পারিলে কিছুতেই একটা ন্যায্য মীমাংসায় আসিতে পারা যায় না, এবং পলিতমুণ্ড, মুণ্ডিতশ্মশ্রু ব্যক্তি ভিন্ন যে ঘটকালির কথা অপর কাহারও মুখেও আসিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। এখন উক্তরূপে গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একজন বালকের মুখে শুনিয়া বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছু দিবস পূর্ব হইতে তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন যে, সদানন্দ আরো একটু অধিক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছে, এবং এখন তাহার ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া বিলক্ষণ রুক্ষভাবে এবং যথারীতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাহার বিবাহ? শারদার?

আজ্ঞা হাঁ।

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বাটীর ভিতরপানে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, ঐদিকে বোধ হয় শারদা আছে, যাও।

তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া একথার অর্থ সদানন্দ বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল, শারদার সহিত আমার প্রয়োজন নাই, আপনার নিকটেই আসিয়াছি।

বৃদ্ধ পূর্বোক্ত প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নিকট?

আজ্ঞা হাঁ।

কেন?

এই যে বলিলাম—আপনার পুত্রের সম্বন্ধ করিতে। শারদার কি বিবাহ দিবেন না?

দিব—কিন্তু সে কথা কেন?

প্রয়োজন না থাকিলেই কি আসিয়াছি?

তোমার প্রয়োজন? আমার সহিত?

আজ্ঞা হাঁ।

কিন্তু তোমার সহিত সেসব কথা হইতে পারে না।

সদানন্দ বুঝিল যে, জগতের এ শ্রেণীর লোকের নিকট, মুখে একবিন্দু হাসির চিহ্নমাত্র থাকিলেও সাংসারিক কোনরূপ কথাবার্তা চলিতে পারে না, মুখখানা তোলোহাঁড়ির মত না করিতে পারিলে, সে যে দেনাপাওনা, টাকাকড়ির কথা একবিন্দুও বুঝিতে পারে তাহা এ সম্প্রদায়ের মনুষ্য ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তখন সদানন্দ চেষ্টা করিয়া যতখানি পারিল ততখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, খুব হইতে পারে। বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের স্বর্গলাভ হইয়াছে; সেই অবধি আমিই তাঁহার সমস্ত বিষয়-আশয় দেখিয়া আসিতেছি। সাংসারিক কথাবার্তা আমাদিগকেও কহিতে হয়; বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়া দেনা-পাওনা মীমাংসা করিতে হয় তাহা অবগত আছি এবং আশা করি সে বিষয়ে আপনিও যতটা বুঝিবেন, আমিও প্রায় ততটাই বুঝিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের এই প্রথম বোধ হইল যে, ইহা ঠিক পাগলের মত বলা হয় নাই। একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অবশ্য দেনাপাওনার মীমাংসা ত একটা করাই চাই।

সদানন্দ হাসি চাপিতে পারে না; তাই আবার একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পূর্বেই মহাশয়কে নিবেদন করিয়াছি যে, সে সব আমার সহিত হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; তাহার কোনরূপ একটা মীমাংসা করিতে আসিয়াছি।

হরমোহন একটু নরম হইলেন। বলিলেন, কাহার কন্যা? কোথায়?

এই গ্রামেই। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা।

হারাণের?

আজ্ঞা হাঁ।

সে কি দিবে?

আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই।

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া লইলেন; তাহার পর বলিলেন, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে কেমন?

আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই; যাহা হউক, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে আমার বিবেচনায় মন্দ নয়। আপনার পুত্র তাহাকে দেখিয়াছে—বিবাহ করিতেও অনিচ্ছুক নহে।

বৃদ্ধ এবার একটু হাসিল। বলিল, তা হইলেই হইল। আর আমাদের গৃহস্থ পরিবারে মোমের পুতুলেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই; দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ না হয় এবং কাজকর্ম্ম করিতে পারে, এই হইলেই হইল।

সদানন্দ বলিল, তা পারিবে।

কিন্তু হারাণ কি দিতে পারিবে? তার অবস্থা ত এখন ভাল নয়।

না, অবস্থা ভাল নয়। তাই বুঝে আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই দিবেন।

বৃদ্ধ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন, উপরোক্ত কথাটা না বলিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিশালী হরমোহন তাহা সহজেই শোধরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা কি জানি বাপু, মেয়ের বিবাহের কিছু খরচ আছেই।

অবশ্য।

তখন হরমোহন অভ্যাসমত অধরের ক্ষীণহাসিটুকু বিদায় দিয়া পাথরের মানুষটি সাজিয়া বলিলেন, এক সহস্র নগদ মুদ্রার কম শারদার বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না।

সদানন্দ সহাস্যে বলিল, তাহাই হইবে।

সদানন্দর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ত নিজের উপরই চটিয়া গেলেন। আপনাকে একটি অতিশয় বৃহদাকার গর্দ্দভ বলিয়া মনে মনে সম্বোধন করিলেন; কেন দেড় সহস্রের কথা কহিলেন না, এ আপসোস তাঁহার হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। যখন কথা বাহির হইয়া গিয়াছে তখন আর ফিবাইতে পারা যায় না; যাহা হউক, মন্দেব যতটা ভাল হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, অবশ্য মেয়েকে গহনা দিতেই হবে।

হবেই।

দান-সামগ্রী রীতিমত আছেই।

আছেই।

তবে আমারও অমত নাই।

তবে একটা দিন স্থির করিয়া ফেলুন।

বৃদ্ধ একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, অবশ্য এ বিবাহ আপনা-আপনির মধ্যেই, আর হারাণও কিছু আমাদের পর নয়, তবুও নিয়মগুলা সব পালন করিয়া চলিতে হইবে।

সদানন্দ একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, নিয়ম আবার কি?

সহাস্যে—নিয়ম এমন কিছুই নয়, তবে লেখাপড়া একটা প্রয়োজন।

বেশ তাহাই হউক।

কিন্তু কাহার সহিত হইবে?

আমারই সহিত হউক।

কবে?

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, এক মাস পরে।

বৃদ্ধ সম্মত হইলেন।

তখন সদানন্দ বলিল, আমার একটি অনুরোধ আছে।

কি বাপু?

এ দেনাপাওনার কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তি না শুনিতে পায়।

কেন?

একটু কারণ আছে।

হরমোহন বৈষয়িক লোক; সদানন্দর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, নিঃশব্দে দান করিতে চাও?

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া, সে নিঃস্বার্থ দয়া দেখিয়া হরমোহনেরও সেইসময়ের জন্য লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি রীতিমত বৈষয়িক লোক, এভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দিলেন না। একটা শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, বাপু, আমাদের বয়েস হইয়াছে, এইজন্য চক্ষুলজ্জাও ততটা নাই, না হইলে হারাণের অবস্থা আমি বিশেষরূপেই জানি। যাহা হউক, তুমি যখন নিঃশব্দে দান করিতে পারিতেছ, তখন আমিও নিঃশব্দে গ্রহণ করিতে পারিব। সেজন্য তুমি চিন্তা করিও না।

সদানন্দ প্রফুল্লমুখে নমস্কার করতঃ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুভদা শুনিলেন, হারাণবাবু শুনিলেন, ছলনাও শুনিল যে, তাহার সহিত শারদার বিবাহ হইতেছে। এ বিবাহ সদানন্দ ঘটাইয়াছে। শুনিয়া রাসমণি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সদানন্দ পূর্বজন্মে শুভদার পুত্র ছিল। সদানন্দর সমক্ষে একথা বলা হইয়াছিল, সে একথা নিরুত্তরে স্বীকার করিয়া লইল, অতঃপর কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

নানা গোলযোগে পড়িয়া তাহার এ পর্যন্ত পিসিমার সম্পত্তি দেখিতে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এখন সময় পাইয়া একথা সে শুভদাকে জ্ঞাত করিল, শুভদা তাহাতে সম্মত হইল; তখন পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া কিছু দিবসের জন্য শ্রীমান সদানন্দ বিদেশযাত্রা করিল। শুভদার সংসার এখন তাহার সংসার হইয়াছে; সুতরাং ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে ভুলিল না, এবং আরো, বিবাহের অপরাপর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য শুভদাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া সদানন্দ মৃত পিসিমাতার সমস্ত জমিজমা বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইল, তাহার পর একজন মুরুব্বি স্থির করিয়া এককথায় তাহাকে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অর্ধ সে-কালের মধ্যেই হলুদপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হরমোহনের সহিত লেখাপড়া করিল, গহনা গড়াইল, জিনিসপত্র আনাইল, বিবাহের দিন স্থির করিল, তাহার পর সময় করিয়া শারদাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এতদিন পর্যন্ত নিভৃতে তাহার সহিত দুটো কথা কহিবার সময় হইয়া উঠে নাই। আজ অনেকদিনের পরে দুজনেই আপসে দুটো কথা কহিতে চাহিল, তাই হাত ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে একস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

উপবিষ্ট হইয়া শারদাচরণ বলিল, সদানন্দ, তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

স। কতক কতক মনে পড়ে বৈ কি।

শা। মনে পড়ে যখন আমি একজনকে বড় ভালবাসতাম, যখন দিবারাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবিতাম, তোমার কাছে কত আশা, কত কল্পনা, কত কি বলিতাম, অভিমান হইলে কত কাঁদিতাম, আর তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে—নাহয় বিদ্রূপ করিতে, সেসব কথা তোমার মনে পড়ে সদানন্দ?

স। তা আর পড়ে না? সে ত সেদিনকার কথা; বোধ হয় সাত-আট বৎসরের অধিক হইবে না—কিন্তু বিদ্রূপ ত কখন করি নাই।

শা। আমার বোধ হইত যেন বিদ্রূপ করিতে। যা হোক, তাহার পর যেদিন সে আমার সব আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিল, অভিমানভরে দুজনেই কথা বন্ধ করিয়া চিরবিদায় লইলাম; সেদিন কত রাত্রি পর্যন্ত তোমার কাছে বসিয়া কাঁদিলাম, সেকথা তোমার মনে আছে ভাই?

স। আছে।

সদানন্দ কিছু অন্যমনস্ক হইল। শারদা কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া অদূরে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া কহিল, ঐখানে সে মরিয়াছে!

সদানন্দ সেকথা যেন শুনিতে পাইল না, আপনমনে গঙ্গায় একখানা নৌকা সাদা পালভরে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া রহিল। শারদা আবার বলিল, ঐখানে ললনা ডুবিয়া মরিয়াছে।

এবার সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোন্‌খানে?

শা। ঐখানে।

স। কেমন করে জানিলে?

শা। ঐখানে তার পরিহিত বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল।

সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল তবে, কাপড়খানা একবার দেখিয়া আসি।

শারদা অল্প হাসিল; কাপড়খানা কি এখনো ঐখানে আছে?

স। চল তবে স্থানটা দেখিয়া আসি।

দুজনে তখন সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ জল লইয়া চোখমুখ ধুইল, তাহার পর পুনর্বার যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

শা। সদানন্দ, আমার বড় অনুতাপ হয়।

স। কেন?

শা। সময়ে সময়ে বোধ হয় আমিই তাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।

স। কেন?

শা। জগদীশ্বর জানেন তার আয়ু শেষ হইয়াছিল কি না, কিন্তু আমার বোধ হয় আমি বিবাহ করিলে সে হয়ত এখনও বাঁচিয়া থাকিত।

সদানন্দ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, যে মরিয়াছে সে নিশ্চয়ই মরিত! তুমি কি করিবে?

শা। তাহা জানি। তবুও যদি তাহার কথা রাখিতাম, যদি বিবাহ করিতাম!

সদানন্দ হাসিল; জাত যাইত যে।

শারদাচরণ তাহা ভাবিল; বলিল, তাহা যাইত।

তবে আর তুমি কি করিবে?

শারদার চোখে জল আসিল। আর কি করিব, কিন্তু এত অনুতাপ হইত না!

সদানন্দ অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, ক্রমশঃ চলিয়া যাইবে।

শা। আহা, যদি তাহার শেষ অনুরোধটাও রক্ষা করিতে পারিতাম!

স। কি অনুরোধ?

শা। বলিয়াছিল, একঘর দরিদ্রের জাতি বাঁচাও—ছলনাকে বিবাহ কর।

সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, ছলনাকে কি বিবাহ করিবে না?

শা। করিব, কিন্তু তার অনুরোধ রক্ষা করা হইল কি?

স। কেন হইল না?

শা। প্রকারান্তরে হইল বটে, কিন্তু—আচ্ছা সদানন্দ, বাবাকে তুমি কি করিয়া সম্মত করিলে?

সদানন্দ মৃদু হাসিল; বললাম, যে তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে।

শা। শুধু এই?

স। আবার কি?

শা। আমি কি বাবাকে চিনি না?

সদানন্দ আবার হাসিল; বলিল, তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

শা। জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কত টাকা দিতে হইবে?

স। সেকথা শুনিয়া তোমার লাভ নাই।

শা। সদানন্দ, এ যে পাপের ধন!

স। আমি আশীর্বাদ করিব যেন তোমার জীবন চিরসুখে কাটে।

শা। সময় হইলে আমি ফিরাইয়া দিব।

স। দিও। বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া আসিয়া যেস্থানে ললনার বস্ত্র পড়িয়াছিল সেস্থানে মাটি তুলিতে লাগিল।

শারদা বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি কর! সন্ধ্যাবেলা মাটি তোল কেন?

সদানন্দ খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পাগলামি করিতেছি।

বাস্তবিক বলিতে কি, শারদাচরণ তাহার কথার সহিত কাজের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইল না; তথাপি বলিল, পাগলামি করিতেছ তাহা ত বলি নাই।

স। তুমি বলিবে কেন, আমি বলিতেছি।

শা। না না, সত্য বল মাটি লইয়া কি করিবে?

স। আমি আজকাল শিবপূজা করি; বাটীতে গঙ্গামাটি নাই তাই লইয়া যাইতেছি।

শারদাচরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ মাটি লইয়া একটা তাল পাকাইল, তাহার পর গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া শারদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল শারদা বাড়ি যাই।

শা। তুমি ওসব কি করিলে?

স। তাহা ত চক্ষেই দেখিলে।

শা। কৈ, শিবপূজার মাটি লইলে না?

স। না। আর শিবপূজা করিব না।

শা। কেন?

স। আর একদিন বলিব।

তখন দুইজনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। বাটী আসিয়া সদানন্দ সেরাত্রের মত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রাত্রে আহার করিবার জন্য ছলনা, পিসিমা ক্রমে ক্রমে ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু সে দ্বার খুলিল না। ভিতর হইতে বলিল, আজ তাহার বড় শরীর খারাপ হইয়াছে। শুভদা দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তখন সদানন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল হইলে সে আবার উঠিল, মাঠে গেল, আহার করিতে আসিল, হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল, নিত্যকর্ম প্রতিদিন যাহা করে তাহাই করিতে লাগিল; কেহ বুঝিল না যে সে প্রতিদিন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে; কাল যেমন ছিল, আজ ঠিক তেমনটি আর নাই! ক্রমে ১৬ই আষাঢ় ছলনার বিবাহের দিন আসিল। আজি সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মনেই উৎসাহ; সদানন্দর বসিবার অবকাশ নাই, হারাণ মুখুজ্যের চীৎকারের শেষ নাই, পিসিমাতার চক্ষুজলের অর্গল নাই- বাটীতে যে আসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিয়া জানাইতেছে যে, এমন সুখের দিনেও ললনার জন্য তাঁহার মনে একতিল সুখ নাই—বোধ হয় অনেকেই তাঁহার সহিত ঐ ব্যথা বুঝিতেছে; কেবল শুভদা আজি বড় শ্রান্ত, বড় ধীর।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অনেক বাজনা-বাদ্য বাজিল, অনেক লোক জমা হইল—তাহার পর শুভক্ষণে শুভলগ্নে ছলনাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

আজ গ্রামময়, কৃপণ হরমোহনের সুখ্যাতির একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; শত্রুতেও মনে মনে স্বীকার করিল যে, হাঁ, মনটা দরাজ বটে!

মুখের সম্মুখে কেহ তাঁহার গুণগান করিলে, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধ হরমোহন বলেন, কি আর করি বল, একটি বৈ ছেলে নয়, তার ওখানে বিবাহ করিতে ইচ্ছা—আমি আর তাহাতে অমত কেন করিব? আর গ্রামের মধ্যে আমরাই ওদের পাল্টি ঘর—প্রতিবাসীকে একটু দেখিতেও হয়!

শারদাচরণ একথা শুনিয়া অলক্ষ্যে ভ্রূ কুঞ্চিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক কাজ ছিল, অনেক কষ্টে তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছে! এখন আরাম করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বেশ লাগে, কিন্তু দুই-চারিদিন পরে সে আরামটা আর তেমন করিয়া উপভোগ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। নিতান্ত আলস্যভাবে নিষ্কর্মার মত বসিয়া থাকিতেও কেমন ব্যাজার বোধ হয়। ছলনাময়ীর বিবাহ দিয়া, লুকাইয়া লুকাইয়া হরমোহনকে বেশ দুপয়সা ঘুষ দিয়া হত্যাপরাধে ধৃত আসামীর খালাস পাওয়ার মত, বিছানায় পড়িয়া মনের আনন্দে পাশবালিশ জড়াইয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া সদানন্দ দুই-চারিদিন নির্বিবাদে কাটাইয়া দিল, তাহার পর বোধ হইতে লাগিল যে, শয্যাটা একটু গরম, বালিশ-গুলো একটু শক্ত হইয়াছে, ঘরটার ভিতর একটু অধিকমাত্রায় অন্ধকার ঢুকিয়াছে, সদানন্দ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সমস্তদিন ধরিয়া হইতেছিল, তাহা তখনও শেষ হয় নাই; কালো মেঘগুলা ছোটখাট বাতাসে দুই-চারি পা করিয়া মাঝে মাঝে সরিয়া দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু জল বর্ষাইতে ছাড়িতেছে না—ছাড়িবেও না, সদানন্দ অন্ততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইল; তাহার পর মাথায় ছাতা দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ এপথ ওপথ করিয়া, কাপড় ভিজাইয়া, এক পা কাদা লইয়া হারাণচন্দ্রের বাটীর ভিতর আসিয়া খাড়া হইল। শুভদা বোধ হয় রন্ধনশালায় ছিলেন, সদানন্দ সেদিকে গেল না; পিসিমাতা সম্ভবতঃ পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে খোঁজও সে লইল না। পা ধুইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া যে ঘরে মাধবচন্দ্র শয়ন করিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকদিন হইতে মাধবচন্দ্রকে আর দেখা হয় নাই, আজ তাহার কথা একটু কহিব। ললনা চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হইয়াছে। নিতান্ত বহুদর্শী বিজ্ঞের মত সকল বিষয়েই সে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া মতামত প্রকাশ করে, যা তা খাইতে চাহে না; যা তা বিষয়ে বাহানা করে না, অনেক সময় প্রায় কথাই কহে না, নিঃশব্দে দার্শনিকের মত বালিশগুলা এক করিয়া হেলান দিয়া আপনমনে বসিয়া থাকে, কেহ তাহার নিকট আসুক আর না আসুক, সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। আজও সেইরূপ বসিয়াছিল; সদানন্দ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সদাদাদা, তুমি আমার কাছে আস না কেন?

স। আমার কত কাজ ছিল ভাই।

মা। সব হয়ে গেছে?

স। হাঁ।

মা। ছোটদিদি কবে ফিরে আসবে?

স। আর তিন-চারদিন পরে।

মা। দেখ সদাদাদা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলা হয় না—

স। কেন?

মা। তোমাকে কখন একলা পাই না, তাই হয় না।

সদানন্দ নিকটে বসিল; বলিল, একলা কেন মাধু?

মা। চুপিচুপি তোমাকে বলতে দিদি বলে গিয়েছিল।

স। কে, মাধু?

মা। দিদি; বড়দিদি যে রাত্তিরে চলে গেল—তুমি তখন এখানে ছিলে না কি না তাই, তুমি ফিরে এলে তোমাকে বলতে বলে গিয়েছিল যে, দিদি চলে গেছে।

সদানন্দ আরো একটু কাছে আসিয়া, তাহার অঙ্গে হাত দিয়া বলিল, কেন গেল মাধু? কেউ গালাগালি দিয়েছিল?

মা। কেউ না।

স। তবে কেন গেল?

মা। আমিও যাব।

স। ছিঃ—

মাধব একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, আর কেউ জানে না। কেবল আমি জানি আর দিদি জানে। সে আমার আগে গেছে—আমার জন্যে সব ঠিক করে আমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে দুজনে খুব সুখে থাকব। মাধবচন্দ্র তাহার মুখখানা অতিরিক্ত প্রফুল্ল করিয়া আবার একটু হাসিল; তাহার পর ফিরিয়া বলিল, দিদি এসে নিয়ে যাবে।

সদানন্দ বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, কবে?

মা। যবে আমার সময় হবে।

স। মাধব, এসব কথা তোমাকে কে শেখালে?

মা। বড়দিদি।

স। সে তোমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল?

মা। হাঁ—

স। আর যদি না নিয়ে যায়?

মা। কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে!

স। যদি না নিয়ে যায়, তাহলে তুমি একা যেতে পারবে কি?

মাধব একটু বিমর্ষ হইল, ভাবিয়া দেখিল; তাহার পর বলিল, কি জানি!

সদানন্দও চুপ করিয়া রহিল। মাধব আবার কহিল, সদাদাদা, সেখানে একলা যাওয়া যায় কি?

স। যায়। না হলে তোমার দিদি গেল কি করে?

মা। আমিও তবে যেতে পারব?

স। পারবে।

মাধব আবার একটু ভাবিল, পরে অধিক দুঃখিতভাবে কহিল, কিন্তু কেমন করে যাব—আমার গায়ে আর একটুও জোর নেই। সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে বলিতে লাগিল, দিদি যখন যায় তখন দিদির গায়ে খুব জোর ছিল, আমি কিন্তু কেমন করে যাব? এখন আমি একবার দাঁড়াতেও পারিনে—অত দূর কি যেতে পারব?

সদানন্দর চক্ষে জল আসিল; অন্ধকারে মাধব তাহা দেখিল না। সদানন্দ দেখিতে লাগিল যে মাধবের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন—তাহার পর সব ফুরাইয়া যাইবে। সে ভাবিল শুভদার কথা, সে ভাবিল ললনার কথা, সে দেখিল, সে একটু ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছে, পাঁচজনকে জড়াইয়া লইয়া আর তেমন চিন্তাশূন্য আনন্দে দিনাতিবাহিত হয় না, কালীনামগুলা আর তেমন করিয়া গাওয়া হয় না, তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, তেমন করিয়া আনন্দ করিতে পারে না। সে সুখী ছিল, অসুখী হইয়াছে, বিবাগী ছিল সংসারী হইয়াছে। চক্ষের জল মুছিয়া সদানন্দ আজ প্রথম মনে করিল যে, বাঁচিয়া থাকিয়া তেমন সুখ হয় না; যে জীবিত আছে তাহারই কষ্ট আছে, যে মরিয়াছে এ জ্বালার সংসারে সে বাঁচিয়াছে। সে রাত্রে সদানন্দ অনেক ভাবিল; যাইবার সময় ললনা তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই, সেকথা মনে পড়িল; মাধবচন্দ্র মরিতেছে, একথাও স্মরণ হইল; আর শুভদা—তাহার মনে হইল যে, ললনা মরিয়া তাহার যত দুঃখকষ্ট সমস্তই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মাধবচন্দ্রের মনেও সে রাত্রে খুব সুখ ছিল না। মধ্য হইতে তাহার একটা দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিয়াছে। এতদিন সে নিশ্চিন্ত ছিল যে, সময় হইলে ললনা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সদাদাদা একটু অন্যরূপ বলিয়াছে—তাহার শরীরে আর একটুও সামর্থ্য নাই, সেস্থলে কেমন করিয়া সে অতদূর যাইতে পারিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক রাত্রে সে নিশ্চয় করিল যে, তাহার দিদি কখন মিথ্যা বলিবে না—যথাসময়ে নিশ্চয় আসিবে। মাধবচন্দ্র তখন অনেকটা শান্তমনে নিদ্রা গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আরো কতদিন কাটিয়া গেল। ছলনা বাপের বাটী ফিরিয়া আসিল, পাড়ার মেয়েরা আর-একবার নূতন করিয়া কন্যা-জামাতা দেখিয়া গেলেন, কত হাসি কত তামাসা গড়াইয়া গেল, হরমোহন নিজে এখানে আসিয়া সকলকে মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া ব্যায়ান-ঠাকুরানীর নমস্কার গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, হারাণচন্দ্র কোমরে ফর্সা চাদর বাঁধিয়া বামুনপাড়ার প্রত্যেক দোকানে একবার করিয়া বসিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিলেন—এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

আজ মাধবচন্দ্রের পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শয্যার উপর ছটফট করিতেছে এবং পার্শ্বে, শিয়রে, পদতলে পিসিমাতা, কৃষ্ণঠাকুরানী, ছলনা প্রভৃতি বসিয়া আছে। শুভদা এখানে নাই—তিনি রন্ধনশালায় বসিয়া কতক রাঁধিতেছেন, কতক কাঁদিতেছেন, সদানন্দ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে, আর হারাণচন্দ্র 'এই আসিতেছি' বলিয়া ঘণ্টাতিন হইল বাহির হইয়াছেন, এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন: কৃষ্ণঠাকুরানী মাধবের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় মনে মনে সময় গুনিতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার একটু পরে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন; তিনি আজ ছয়-সাত দিবস হইতে নিত্য আসিতেছেন, নিত্য দেখিতেছেন, পীড়া কিছুতেই কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তাহা জানিতেন, বাঁচিবে না তাহাও বুঝিয়াছিলেন। আসিবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু সদানন্দর পীড়াপীড়িতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঘরে আসিয়া ডাক্তারে যাহা দেখে তাহা তিনি দেখিলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, সদানন্দবাবু, আজ বেশ সাবধানে থাকিবেন; ছেলেটি বোধ হয় আজ রাত্রে বাঁচিবে না।

সদানন্দও তাহা জানিত।

অনেক রাত্রে হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, চোরের ন্যায় কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের বৃত্তান্ত যতটা সম্ভব অবগত হইলেন, তাহার পর দ্বার ঈষৎ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, এখন কেমন আছে?

কেহ কথা কহিল না। শুধু শুভদা বাহির হইয়া আসিল; খাবার থালা সম্মুখে রক্ষা করিয়া নিকটে বসিল।

হারাণ বলিলেন, মাধু এখন কেমন?

বোধ হয় ভাল নয়।

ভাল নয়?—একটু থামিয়া বলিলেন, আমার শরীরও ভাল নয়।

কি ভাবিয়া তিনি যে একথা বলিলেন, কি মনে করিয়া যে তিনি নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিলেন তাহা বলিতে পারি না এবং ইহাতে সত্যাসত্য কতদূর ছিল তাহাও অবগত নহি—কিন্তু একথা শুভদার কানে প্রবেশ করিল না। হারাণচন্দ্র মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন; স্ত্রীর নিকট শারীরিক অসুস্থতার কথা কহিয়া তাহার একটা স্নেহময় প্রত্যুত্তর না পাওয়া, তাঁহার নিকট এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হইল যে হারাণচন্দ্র আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিলেন। তিনি নেশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সেই সামান্য অপমানাঙ্কুর দুই-চারি মুহূর্তের মধ্যেই মস্তিষ্কের ভিতর বেশ ডালপালা ছড়াইয়া দিল। হারাণচন্দ্র বিরক্তভাবে থালা ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, আর খাব না—শেষে কি মরে যাব? হারাণচন্দ্র উঠিয়া আসিয়া আচমন করিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে নির্দিষ্ট শয্যায় যথারীতি শয়ন করিলেন; মনে মনে বোধ হয় স্থির করিয়া লইলেন যে, তাঁহারও যথেষ্ট অসুখ হইয়াছে।

এদিকে শুভদা হাত ধুইয়া মাধবের নিকটে আসিয়া বসিলেন। দেখিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী বলিলেন, হারাণ কোথায়?

তাঁর শরীর অসুখ হয়েচে—শুয়েছেন।

কৃষ্ণঠাকুরানী একটু মৌন হইয়া রহিলেন; তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন, মানুষের

মায়াদয়া থাকে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জাও ত একটু থাকতে হয়!

রাসমণি একথা শুনিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। কৃষ্ণঠাকুরানী অনেক মুমূর্ষুর পার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অনেক মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ হইল, মাধবের অল্প শ্বাস হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাধব কহিয়া উঠিল, বড় মাথা ধরেচে।

কৃষ্ণপিসিমাতা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া আবার কহিল, বড় পেট কামড়াচ্চে, বড় গা বমিবমি করচে।

সকলে সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা মুখের উপর পড়িতে চেষ্টা করিল।

পুনর্বার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইল—সকলেই মৌন ম্লানমুখে শেষটার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কাতরভাবে মাধব বলিল, বড় তেষ্টা।

পিসিমাতা দুগ্ধের পরিবর্তে মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। আগ্রহে মাধব সেটুকু সম্পূর্ণ পান করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে শ্বাস বাড়িয়া উঠিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিলেন; কৃষ্ণঠাকুরানী নাড়ি দেখিতে জানিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত দেখিয়া সদানন্দকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এবার নীচে শোওয়াইতে হবে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

রাসমণির কর্ণে একথা প্রবেশ করিয়াছিল; তিনি অস্ফুটে কাঁদিয়া উঠিলেন—আর দেখ কি সদানন্দ?

ছলনা কাঁদিয়া উঠিল, কৃষ্ণপিসিমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাধবেরও প্রায়-অচেতন দেহ নীচে নামিয়া আসিল।

বহুক্ষণ পরে মাধব আর একবার হাঁ করিল—কৃষ্ণপিসিমাতা পূর্বের মত তাহাতে আর একটু জল দিলেন। মাধব যেন একটু বল পাইল—একবার চক্ষু চাহিল, তাহার পর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, সদাদাদা,—দিদি—এসেছে।

ছলনাময়ী নিকটে বসিয়াছিল, আজি সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই,—শিহরিয়া সে জননীর আরো নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল; রাসমণির সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আর কিছুক্ষণ পরে, মাধবচন্দ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল, মাথা নাড়িতে লাগিল—প্রবল শ্বাস হইয়াছে; দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী কাঁদিয়া বলিলেন, আর কেন? সময় হয়েচে—রাসমণি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—পরকালের কাজ কর—তুলসীতলা—

সকলেই তখন উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিলেন। চীৎকার-শব্দে হারাণচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাধবকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইতেছে—তিনিও চীৎকার করিয়া পুত্রের শরীর তুলসীতলায় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন—কাঁদিয়া ডাকিলেন, বাবা—মাধু—

সেও বোধ হয় গোঁ-গোঁ করিয়া একবার কহিল, বা—বা।

দশম পরিচ্ছেদ

বিচিত্র হর্ম্যে বিচিত্র কৌচের উপর অপূর্বসুন্দরী মালতী, কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে। নিকটে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সাইড্ বোর্ডের উপর রৌপ্য শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে মালতী একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যে কক্ষে মালতী বসিয়া আছে তাহা অতিরিক্ত সুসজ্জায় সজ্জিত। সমস্ত হর্ম্যতল বহুমূল্য বিচিত্র কার্পেটে মণ্ডিত; দেওয়াল নানাবিধ লতাপাতা ফুলেফলে বিচিত্র, তাহার উপর বহুবিধ তসবির, বহুমূল্য অয়েল পেণ্টিং, অলিওগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতিতে বিশেষ পরিব্যাপ্ত

রহিয়াছে। আশেপাশে বহুবিধ দেয়ালগিরি গৃহসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের বেলওয়ারি কাঁচের ভিতর দিয়া লাল-নীল-সবুজ নানা বর্ণের আলোকখণ্ড ইতস্ততঃ ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড আয়না—আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া গৃহের উজ্জ্বলতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তৎসংলগ্ন মর্মরপ্রস্তরের মেজ এবং শ্বেতপ্রস্তরের ঝরনা, তদুপরি স্থাপিত রহিয়াছে; চতুর্দিকে শ্বেত কৃষ্ণ পীত বর্ণের মনুষ্য প্রতিকৃতি, সে আলোকে জীবন্ত বোধ হইতেছে। এই রাজোচিত হর্ম্যে মালতী—জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমা—একাকী বসিয়া আছে। কত রূপে যে এ পার্থিব সৌন্দর্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া সে বসিয়া আছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধনয়নে সে শোভা দেখিবার জন্য সেখানে আর কেহ ছিল না, তাই মালতী আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে। পাঠ আর ছাই করিতেছে; ছত্রের পর ছত্র সরিয়া যাইতেছে, পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে, কিন্তু একবর্ণও মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। সে ইতিপূর্বেই বোধ হয় কাঁদিতেছিল, কেননা শুষ্ক জলের দাগ এখনও তাহার কপোলের উপর প্রতীয়মান হইতেছে। এ সুখ-ভবনে সে কেন যে কাঁদিতেছিল তাহা জানি না, কিন্তু কাঁদিতেছিল তাহা নিশ্চয়; এবং সেই কান্নাই থামাইবার জন্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। মালতী নিরাভরণা, মালতী সামান্য বস্ত্রপরিহিতা, মালতী কাঁদিতেছিল, মালতীর মনে সুখ নাই। পুস্তক বোর্ডের উপর বন্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল, নিঃশব্দে কৌচের বাজুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিল। পুনর্বার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, এবার তাহা রোধ করিবার প্রয়াস করিল না। কাজেই একটির পর একটি করিয়া অশ্রু কৌচের মখমল চাদরের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; অত পুরু গালিচার উপর পদশব্দ হয় না, কাজেই এ আগমন মালতী জানিতে পারিল না, সে যেমন কাঁদিতেছিল তেমনই কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরো একটু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, মালতী!

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল; বলিল, এসো।

সুরেন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিলেন। তাহার দুটি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে কহিলেন, আবার কাঁদছিলে?

মালতী হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও 'না' বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কেন কাঁদিতেছিলে?

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে তাহার হাত দুটি আরো একটু টিপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃখ এই যে এত চেষ্টাতেও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, হৃদয়ের সহস্র কামনাতেও তোমার মন পাইলাম না।

মালতী একটা উত্তর খুঁজিল কিন্তু পাইল না, আরো একটা কাজ তাহার দ্বারা হইল না। ইতিপূর্বেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যাহা হউক আর কাঁদিবে না, কিন্তু অশ্রুর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিল না। তাহারা যেমন পড়িতেছিল, তেমনিই পড়িতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, কি করিলে যে একজন সুখী হইতে পারে তাহা মানুষে বুঝিতে পারে না এবং দেবতারা পারেন কি না তাও বলিতে পারি না। তৃপ্তির জন্য, সুখের জন্য এ ভবন এমন করিয়া সাজাইলাম, এ দেবীপ্রতিমা এ ভবনে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, কিন্তু সুখী হইতে পারিলাম কি? সুখের কথা ছাড়িয়া দিই—বোধ হয় আমার অসুখের মাত্রাই বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহাকে সুখী করিতে এত করিলাম তাহাকে একদিনের জন্যও সুখী দেখিলাম না, তোমাকে পাইয়া অবধি ও অধরে একতিলের জন্যও হাসির রেখা দেখিলাম না,—বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিতান্ত অধীরভাবে সে অশ্রুমলিন মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন; বলিলেন, মালতী, কতদিন কাটিয়া গেল কিন্তু কিছুতেই কি তুমি প্রফুল্ল হইবে না, কিছুতেই কি একবার হাসিয়া চাহিবে না?

মালতী হাত তুলিয়া চক্ষু মুছিল।

এ সৌন্দর্য যে কি, এ রূপে যে কত মুগ্ধ হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মনের সাধে সাজাইব বলিয়া কত অলঙ্কার আনিলাম, কত বস্ত্র সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু একদণ্ডের তরেও তুমি পরিলে না। মালতী! তুমি কি আমাকে দেখিতে পার না?

মালতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর মস্তক স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, তুমি যে আমাকে দেখিতে পার না তাহা বলি না, কিন্তু আমার আরও অনেক কথা মনে হয়—তুমি আমার অপরাধ লইও না—আমার যাহা মনে হয়—আজ তাহা বলিয়া যাই—আমার বিশ্বাস তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছ, নীচ স্ত্রীলোকে আত্মসুখের জন্যই সে পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং বস্ত্রালঙ্কার ধনরত্ন ঐশ্বর্য ভিন্ন তাহাদের সুখ যে আর কিসে আছে তাহা জানি না, কিন্তু তোমাকে তাহাদের মত বোধ হয় না, সেইজন্য বুঝিতেও পারি না কি করিলে তুমি সুখ পাইবে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তুমি এতদিনে সুখী হইতে—বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন; পরে ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, মালতী! তোমার স্বামী জীবিত আছেন কি?

মালতী ক্রোড়ের উপর মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার স্বামী জীবিত নাই।

তবে বল, তোমাকে বিবাহ করিলে কি সুখী হও? বল—বল, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি।

এইবার মালতী গড়াইয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল, হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তুলিবার চেষ্টা করিলেন না, বুঝিলেন চক্ষের জলে তাঁহার পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে, তথাপি উঠাইলেন না, বরং দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ গত হইল; তাহার পর ম্লানভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন- ভগবান জানেন আমার কি হইয়াছে। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি, কি ও অতুল রূপে উন্মত্ত হইয়াছি তা বলিতে পারি না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আমার আর নাই, ভালমন্দ বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার একটি কথার জন্য প্রাণ পর্যন্তও বুঝি দিতে পারি। ঈশ্বর জানেন, তোমার মন পাইবার জন্য মিথ্যা বলিতেছি না, সত্যই বলিতেছি; আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি—যাহা হইবার হইবে -তুমি একবার বল, তোমাকে বিবাহ করিলেই যদি সুখী হও, তাহাই করিব। জাতি, কুল, মান, এতবড় বংশ, কিছুই মনে করিব না। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ থামিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, তাহার পর মালতী, আমাদিগের মত মনুষ্যের পরিষ্কার পথ পড়িয়া আছে—যখন সহ্য করিতে পারিব না, তখন আত্মহত্যা করিয়া নরকের পানে সোজা চলিয়া যাইব।

মালতী আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ওকথা তুমি বলিও না। তুমি আমার প্রাণ দিয়াছিলে, লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে, দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে—না হইলে এখনও বোধ হয় বাঁচিয়া থাকিতাম না; আমি নীচ, কুৎসিত; কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইতে পারিব না। তোমার দয়া, তোমার স্নেহ, এ জীবনে কখন ভুলিব না—এ সকলের প্রতিশোধ কি আমি এইরূপে দিব?

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিসে প্রতিশোধ হয় তাহা ঈশ্বর জানেন, আমি জানি না। তোমাকে বলিব কি, যে যন্ত্রণা, যে অন্তর্দাহ আজ মাসাধিক কালের উপরও ভোগ করিয়া আসিতেছি। মনে দুঃখ করিও না, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় যে, এত অল্পদিনে স্ত্রীলোকের এরূপ দাস হইয়া পড়িয়াছি; একজন—একজন—তুমি যেই হও—তুমি যেই হও—কিন্তু আমি ত স্বর্গীয় পিতৃপিতামহগণের বংশ সম্মান লুপ্ত করিতেও সম্মত হইয়াছি।

মালতী সেইরূপে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল, আমি তোমার দাসীরও দাসীর যোগ্য নই—আমি কে যে আমার জন্য তুমি এতই সহিবে—তোমার কেশাগ্রও বিসর্জন দিবে? আমি আজন্ম দুঃখী—এত করুণা এ জীবনে কখন পাই নাই। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, যদি শেষ হয়, ঈশ্বর করুন যেন ইহাই আমার শেষ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তাহার পর পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত তুমি সুখ পাইতেছ না।

মালতী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কহিল, আমরা বড় দরিদ্র।

সু। কিন্তু আমি ত দরিদ্র নহি। আমার যাহা আছে, তোমারও ত তাহা আছে।

মা। আমি নিজের কথা বলিতেছি না।

সু। তবে কাহার কথা? তোমার ত কেহ নাই!

মা। ভগবান জানেন এখন আর কেহ আছে কিনা, কিন্তু যখন চলিয়া আসিয়াছিলাম তখন সব ছিল।

সু। সে কি? নৌকাডুবি হইয়া—

মা। সেসব মিছে কথা, নৌকাডুবি আদপে ঘটে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় একবার মনে হইয়াছিল যে, এসকল ছলনা, না সত্য কথা? কিন্তু সে-মুখে ছলনা সম্ভবে না—সে-চক্ষু, সে-অশ্রুজলের মধ্যেও যে প্রতারণা, মিথ্যাকথা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাঁহার তাহা বোধ হইল না। কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন, মালতী।

কি?

সব সত্য?

এবার মালতী মুখপানে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইলেন, স্বহস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, তবে সব কথা খুলিয়া বল।

মালতী ধীরে ধীরে তখন তাঁহার জানুর উপর মাথা রাখিয়া কখন কাঁদিয়া, কখন স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, জন্মাবধি দুঃখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি—কিন্তু আমাদের সব ছিল। পিতা আমার যথাসাধ্য দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগিনী আমি এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইলাম—যাঁহার সহিত বিবাহ হইল তাঁহাকে বোধ হয় একবারের অধিক দেখিতেও পাই নাই। আমি বাপের বাটীতে ছিলাম, সেই অবধি পাঁচ বৎসর প্রায় সেইখানেই থাকিলাম। পিতা আমাদিগের গ্রাম হলুদপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এক জমিদারের নিকটে কর্ম্ম করিতেন। সামান্যই বেতন পাইতেন, কিন্তু তাহাতেই আমাদের একরূপ দুঃখ-কষ্টে চলিয়া যাইত। এইসময় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তোমাদের বাড়িতে তখন কে কে ছিলেন?

মা। সবাই ছিলেন—বাবা, মা, পিসিমা, আমরা দুই বোন, আর একটি ছোট ভাই। তাহার পর চুরির অপরাধে বাবার চাকুরি যায়—সেই অবধি নিত্য ভিক্ষা করিয়া কোনদিন আমাদের আহার হইত, কোনদিন হইত না। মা আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন—চাহিয়া চিন্তিয়া যাহা মিলিত তাহাতে অপরাপর সকলকে খাওয়াইয়া মা প্রায় নিত্য উপবাসী থাকিতেন; এমন কি একসঙ্গে তিনদিনও—এই সময় মালতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, বাবা কিন্তু এসব দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। গাঁজা-গুলি খাইতেন, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেন—হয়ত বা চার-পাঁচদিন ধরিয়া বাড়িতেই আসিতেন না।

আমার ছোটভাই মাধব প্রায় একবৎসর হইতে পীড়ায় ভুগিতেছিল, চিকিৎসা ভিন্ন কিছুতেই আরোগ্য হইতে পারিতেছিল না, বোধ হয় এতদিনে সে আর বাঁচিয়াও নাই—

এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তাহার পর মালতী কৃষ্ণঠাকুরানীর কথা বলিল, সদানন্দর কথা বলিল, শেষে বলিল ছলনার কথা। মালতী কহিল, ছলনার বিবাহের বয়স হইল, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া কেহ বিবাহ করিতে চাহিল না। বিবাহ না হইলে ব্রাহ্মণের ঘরে জাতি যায়—আমাদেরও জাতি যায়-যায় হইল, মা আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পিতা ফিরিয়াও চাহিতেন না, শুধু ভরসা ছিল সদানন্দ, কিন্তু তিনিও তখন দেশে ছিলেন না—কাশীতে তাঁহার পিসিমাতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।

পিতার চাকুরি যাইবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীতে আর কত সাহায্য করিবে? সদাদাদা কাশী যাবার সময় যে পঞ্চাশ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও ফুরাইয়া গেল—এ সময়ের কথা আর বলিতে পারি না—মালতী আবার কাঁদিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথও কাঁদিলেন; কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, আর কাজ নাই—অন্যদিন বলিও।

মালতী চক্ষু মুছিয়া বলিল, আজই বলি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলিত, আমি ভাবিতাম কলিকাতায় গিয়া উপার্জন করিব। একদিন রাত্রে গঙ্গার তীরে আসিলাম, মনে করিলাম তীরে তীরে কলিকাতায় যাইব—তাহা হইলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না, কাহাকেও পথও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। ঘাটে আসিয়া দেখিলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড নৌকা পাল ভরে যাইতেছে, আমি সাঁতার জানিতাম, নৌকা দেখিয়া ভাবিলাম নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া নৌকার হাল ধরিয়া থাকিব। শুনিয়াছিলাম আমাদের দেশ হইতে কলিকাতা অধিক দূর নহে—তবে ঠিক জানিতাম না যে কতদূর। ভাবিলাম রাত্রিশেষে নৌকা নিশ্চয় কলিকাতায় পেঁছিবে, আমিও তখন নামিয়া যাইব। জলে পড়িলাম, সাঁতার দিয়া কিছুদূরে আসিলাম—এই সময়ে কাপড়খানা হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া গেল, আমিও প্রায় ডুবিবার মত হইলাম, কিন্তু বহু ক্লেশে অবশেষে সেখানা খুলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু হাত হইতে সেটা পিছলাইয়া কোথায় সরিয়া গেল, এইসময় নৌকাখানাও কাছে আসিয়া পড়িল; আমার হাতপা-ও ধরিয়া গিয়াছিল—ভাবিলাম আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না—তাই হালটা ধরিয়া ফেলিলাম। নৌকা চলিতে লাগিল, আমিও সাহস করিয়া তাহা ছাড়িতে পারিলাম না, ভয় হইল, তাহা হইলেই ডুবিয়া যাইব। এইরূপ বহুদূর চলিয়া আসিলাম। তখন আর ফিরিয়া যাইবারও উপায় ছিল না! অবশেষে স্থির করিলাম, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে অনেক স্ত্রীলোকেই আসিয়া থাকে, তাহাদের নিকট বস্ত্রও থাকে—ভিক্ষা করিয়া একটা চাহিয়া লইব বিবস্ত্রা দেখিলে স্ত্রীলোকের দয়া হইবেই—। তারপর সব তুমি জান।

সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, যেজন্য এত করিলে এতদিনে তাহার কোন উপায় করিয়াছ কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

সু। তাহা জানি। আর তাই ভাবিতেছি, যে মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিতে পারে না সে কোন্ সাহসে এতটা করিয়াছে।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। মাসে মাসে কত টাকা হইলে তাঁহাদের চলে?

মা। কুড়ি টাকা।

সু। প্রতি মাসে সেখানে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিও।

মা। তুমি দেবে?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন; বলিলেন, দোবো; আরো চাও আরো দোবো।

মালতী মনে মনে কহিল—এতদিনে তাহার জন্ম সার্থক হইল।

সু। তার পরে একটা কাজ করিও—আমাকে বিবাহ করিও—কেননা নরাধম হইলেও—অত শুভ্র হৃদয়ে আমি কলঙ্কের ছাপ লাগিতে দিব না।

মালতী তাঁহার বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, না—

সু। কেন—না? তুমি ভাবিতেছ আমার জাতি যাইবে; কিন্তু আমি এস্থানের জমিদার, আমার অনেক টাকা—যাহার টাকা আছে তাহার জাতি শীঘ্র যায় না।

মা। গোলমাল হইবে।

সু। হইবে। কিন্তু তাহাও অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।

মা। বংশ, কুল, মান, সম্ভ্রম?

সু। মালতী! একদিনের জন্যও সেসকল ভুলতে দাও—জগতে আসিয়া অনেক দ্রব্য পাইয়াছি—কিন্তু সুখ কখন পাই নাই; একদিনের জন্য আমাকে যথার্থ সুখী হইতে দাও।—

কথা শুনিয়া মালতীর ভিতর পর্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা চাপিল। ধীরে ধীরে বলিল, আমি তোমার নিকট চিরদিন থাকিব।

সু। ঈশ্বর করুন তাহাই হউক। তুমি চিরদিন থাকিবে, কিন্তু আমি পারিব কি? তুমি সংসার দেখ নাই, কিন্তু আমি দেখিয়াছি। আমি জানি আমাকে বিশ্বাস নাই। যে প্রেমে তুমি চিরজীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিবে, আমি হয়ত কোনদিন তাহা মাঝখানে ছিন্ন করিয়া পলাইয়া যাইব। মালতী! সময় থাকিতে আমাকে বাঁধিয়া ফেল।

মালতী ভাল করিয়া সমস্ত শুনিল, অনেক দিনের পর আর একবার স্থির হইয়া ভাবিয়া লইল—তাহার পর অকম্পিতকণ্ঠে কহিল, বাঁধিয়াছি, পার ইহাই ছিন্ন করিও। ইহার উপর আর বন্ধনের প্রয়োজন নাই।

সু। তোমার নাই কিন্তু আমার আছে।

মা। থাকুক, কিন্তু বিবাহ হইতে পারে না।

সু। কেন, বিধবাকে কি বিবাহ করিতে নাই?

মা। বিধবাকে বিবাহ করিতে আছে, কিন্তু বেশ্যাকে নাই।—

সুরেন্দ্রনাথের সহসা সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—তুমি কি তাই?

মা। নয় কি? নিজেই ভাবিয়া দেখ দেখি?

সু। ছি ছি!—ওকথা মুখে আনিও না—তোমাকে কত ভালবাসি।

মা। সেইজন্যই মুখে আনিলাম; না হইলে হয়ত বিবাহ করিতেও সম্মত হইতাম।

সু। মালতী!

মা। কি?

সু। সব কথা খুলিয়া বলিবে?

মা। বলিব। তুমি ভিন্ন আমার দেহ পূর্বে কেহ কখন স্পর্শও করে নাই, কিন্তু এক-জনকে মনপ্রাণ সমস্তই মনে মনে দিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে অনেক সাধিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। জাতি যাইবার ভয়ে সে বিবাহ করিল না।

সু। সে মনপ্রাণ ফিরাইয়া লইলে কিরূপে?

মা। সে যেরূপে ফিরাইয়া দিল।

সু। পারিলে?

মালতী একটু মৌন থাকিয়া কহিল, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বেশ্যা—বেশ্যায় সব পারে।

সু। উঃ—সে কি সদানন্দ?

মা। না—আর একজন।

সু। তবে তুমি মানুষ চিনিতে পার নাই—তাহাকে বল নাই কেন? সে তোমাকে ভালবাসিত।

সহসা মালতীর সর্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। সেই পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা! মালতীর মনে পড়িল, সেই বৃষ্টির দিন; সে সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে জল আনিতেছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, ভিজিয়া জ্বর হইবার ভয়ে সদানন্দর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনে পড়িল, সেই প্রথম তাহার নিকট অর্থসাহায্য পাওয়া; তাহার পর নিত্য হাতে গুঁজিয়া দেওয়া; সেই কাশী যাইবার দিন; সেই বালিশের নীচে একরাশ টাকা দেওয়া;—সেই আরো কত কি! মনে পড়িল, দুঃখের সময় সেই সহানুভূতি। নিমিষে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু বহিয়া পড়িবার পূর্বে মালতী তাহা মুছিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কৌচের বাহুতে হেলান দিয়া চক্ষু মুদিয়া অন্য অনেক কথা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, তারপর?

মা। কলিকাতায় যাইতেছিলাম।

সু। তারপর?

মা। দয়া করিয়া পায়ে স্থান দিয়াছ।

পূর্বোক্ত প্রশ্ন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর শুনিয়া তাহা বুঝিলেন। উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, মালতী, তুমি রত্ন। রত্ন কুস্থানে পাইলেও গলায় পরিতে হয়।

মা। কে বলিল? যে রত্ন একজন গলায় পরে, অন্যে হয়ত তাহা পায়ে রাখিতেও ঘৃণা বোধ করেন। তুমি আমাকে চরণে স্থান দিও,—আমি রত্ন, তাহাতেই পরম সৌভাগ্য মনে করিব।

সুরেন্দ্রনাথ অল্প হাসিলেন; বলিলেন, মালতী, আমি ভাবিতাম তুমি বোকা, কিন্তু তা তুমি নও—

মালতী অল্প হাসিল। দুঃখে কষ্টে আজ তাহার অধরে প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল।

এই সময়ে বাহির হইতে দাসী বলিল, বাবু, অঘোরবাবুর জুড়ি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন; অঘোরবাবুর? কিন্তু এ বাগানবাড়িতে কেন?

তিনি বলে পাঠিয়েছেন বড় দরকার।

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, মালতী, এখন তবে আসি।

এস। কিন্তু অঘোরবাবু কে?

পরে শুনিও।

অঘোরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কোথায় বিবাহ করিয়াছেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিলেন—কেন, পরিচয় আছে নাকি?

বোধ হয় কতক আছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতে হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে, কিংবা মানুষে শখ করিয়া কাঁদে, কিংবা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখন পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া একচোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনিতে পাই ইহাতে নাকি বুক-ফাটাফাটি কাণ্ডও বাধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শতহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াই মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানাই ফাটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়; এ ইচ্ছার আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি। তবে কৌতূহল আছে। যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি; বিবর্ণ, শঙ্কিতমুখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি, বুঝি এইবার বা ইহার বুকখানা ফাটিয়া যাইবে দেখিতে পাইব, কিন্তু সে যখন অবশেষে চোখের জল মুছিয়া হৃষ্টপুষ্টভাবে উঠিয়া বসে তখন দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাই। তবে এমন ইচ্ছা করি না যে, তাহাদের বুকখানা ফাটিয়া যাউক, কিন্তু দেখিবার ইচ্ছাও কি জানি কেন এ পোড়া মন হইতে একেবারে ফেলিয়া দিতে পারি না। আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে, মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু-বিসর্জন ভগবান-পদপ্রান্তে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্মবলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে

হয়ত পাগল বলে, আমিও হয়ত পূর্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, কবাট বন্ধ করিয়া মালতী ভূমে লুটাইয়া পড়িল, কত যে কাঁদিল তাহা বলিব না; বুঝি সে ভাবিয়া দেখিতেছিল, বাল্যকালের সে ভালবাসা আর এ ভালবাসায় কত প্রভেদ! মালতী আপনা হারাইয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার উপর গভীর কৃতজ্ঞতাও মিশিয়াছে। ছাই নিজের সুখেচ্ছা! তাহার বোধ হইল তাঁহার জন্য হাসিতে হাসিতে সে নিজের প্রাণটাও দিতে পারে।

মালতী বলিল, প্রাণাধিক তুমি—তোমার একগাছি কেশের জন্য মরিতে পারি, তুমি আমার জন্য কলঙ্কিত হইবে? শুধু আমার জন্য পাঁচজনে পাঁচকথা বলিবে—তাহা তুমি সহিবে? আমি অজ্ঞাতকুলশীলা, কেহ আমাকে জানে না, কেহ আমাকে চিনে না—আমার লজ্জা নাই, কিন্তু তুমি মহৎ—তোমার কলঙ্ক, তোমার লজ্জার কথা জগৎসুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। লোকে বলিবে, তুমি বেশ্যা বিবাহ করিয়াছ, সমাজে তুমি হীন হইবে, মর্মপীড়া অনুভব করিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। ঘাড় নাড়িয়া মালতী কহিল, তাহা হইবে না। এ বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিব না।

মালতী স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল, অশ্রু মুছিয়া যুক্তকরে কহিল, ঠাকুর, তুমি জান, এ জীবনে যত পাপ, যত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সেদিনে ভুলিও না। জগতে আমার আর স্থান নাই, কিন্তু যদি কখন সেদিন হয়, যদি কখন স্বামিস্নেহ হারাইতে হয়—সেদিন তুমি আমাকে লইও—পতিতা হইলেও চরণে স্থান দিও।

সেরাত্রের মত মালতী সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পরদিন হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন না। সমস্তদিন মালতী পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। অনেক রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন, তাঁহার মুখ অপেক্ষাকৃত মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিয়া মালতী কিছু শঙ্কিতা হইল। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, মালতী, সারাদিন বুঝি পথ চেয়ে আছ?

রঞ্জিতমুখে মালতী নিরুত্তর রহিল।

কি করি বল? একদিনের জন্যও মকদ্দমা মেটে না। যার যত আছে, কষ্টও তার ততখানি আছে।

মালতী বলিল, মকদ্দমা কর কেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন, করি কেন? তা পরে বুঝিবে! আগে আমার হও—সমস্ত বিষয় নিজের মনে করিতে শেখ, তার পর বুঝিবে মকদ্দমা করি কেন?

মালতী মৌন হইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মালতী, সেকথা ভাবিয়াছিলে?

মা। কোন্ কথা?

সু। কোন্ কথা! কালিকার কথা আজই ভুলিয়া গেলে?

মা। ভুলি নাই মনে আছে।

সু। তা ত থাকিবেই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছিলে কি?

মা। দেখিয়াছি। বিবাহ কিছুতেই হয় না।

সু। হয় না? সে আবার কি?

মা। সেকথা ত পূর্বেই বলিয়াছি।

সু। বলিয়াছ আমার মাথা আর মুণ্ড। বিবাহ আমি করিবই।

মা। আমি হইতে দিব না। একমাসের উপর হইল এখানে আসিয়াছি; যদি এতই মনে ছিল তবে পূর্বে করিলে না কেন? এখন সবাই জানিয়াছে তুমি মৃত জয়াবতীর স্থানে আর একজনকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছ।

সুরেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্ক হইলেন—বলিলেন, আমিও তা ভাবিতেছিলাম, হোক গে—আমি—

মা। তাহা হইলে আমি বিষ খাইব।

• সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে কথা পরে বোঝা যাইবে। আপাততঃ এখন সাতদিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করিব।

মা। তবে সাতদিনের মধ্যেই আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, কোথায় যাইবে?

মা। যেখানে ইচ্ছা।

সু। মরিবে?

মা। মরিব না--কেননা মরিতে আমি পারিব না। তবে যে পথে ভাসিয়াছিলাম আবার সেই পথেই ভাসিয়া যাব।

সু। তবু বন্ধন পরিবে না?

মা। না।

সেরূপ দৃঢ় স্বর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, মালতী মিথ্যা কহিতেছে না, একটু চিন্তা করিলেন, পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিবে? ইহা তোমাদের স্বধর্ম! ভাল, তাই হউক।

মালতী এবার আর কোন উত্তর দিল না। মৌনমুখে এ তিরস্কার সহ্য করিয়া রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কেহ কোন কথা কহিল না। পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, বাড়িতে টাকা পাঠাইয়াছিলে?

মালতী তখন কাঁদিতেছিল--মাথা নাড়িয়া জানাইল যে পাঠান হয় নাই।

সু। কেন পাঠাও নাই?

মালতী মৌন হইয়া রহিল। এবার তিনি বুঝিলেন যে মালতী কাঁদিতেছে। বলিলেন, হাতে টাকা ছিল না?

মা। না।

সু। কিছুই ছিল না?

মা। না।

সু। এতদিন আসিয়াছ, হাতে কিছুই হয় নাই?

মালতী কাঁদিতে লাগিল--কথা কহিল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রশ্ন বৃথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজেই বেশ জানিতেন যে তাহার নিকট কিছুই নাই। কিছুক্ষণ পরে হাত ধরিয়া নিকটে আনিলেন, পার্শ্বে বসাইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, সাধ করিয়া এমন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকিলে আমি কি করিব বল? একখানা কাপড় পরিবে না, একটা অলঙ্কার অঙ্গে তুলিবে না, কি প্রয়োজন, কি ভালবাস, তা কখন মুখ ফুটিয়া বলিবে না--আমি আর কি করিব বল? তাহার পর পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন, রাখিয়া দাও। ইহা হইতে যাহা ইচ্ছা পাঠাইয়া দিও--বাকি যাহা রহিল, স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিয়ো, আর মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়ো; অল্প হাসিয়া বলিলেন, টাকা জমাইতে শিক্ষা কর।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। ভুলিয়ো না—আজ টাকা পাঠাইয়া দিও।

মা। কেমন করিয়া দিব?

সু। রেজেস্ট্রি করিয়া দিও।

মা। আমি পারিব না। তুমি আর কারো নাম করিয়া পাঠাইয়া দাও।

সু। কেন? ধরা পড়িবার ভয় হয়?

মা। হয়।

সু। তবে আমার উকিল অঘোরবাবুকে বলিয়া দিই। তিনি কলিকাতায় থাকেন, সেখান হইতেই পাঠাইয়া দেবেন।

মা। সেই ভাল! কিন্তু যদি কেহ তাঁহার নিকট সন্ধান লইতে আসে—তা হইলে?

সু। যেমন বুঝিবেন সেইরূপ উত্তর দিবেন।

মা। না। তাঁহাকে বারণ করিয়া দিও যেন কোনরূপে তিনি তোমার নাম না প্রকাশ করেন।

সু। আচ্ছা, তাহাই হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয়াবতী মরিয়াছে, কিন্তু তাহার মা বাঁচিয়া আছে। নারায়ণপুরের কিছু উত্তরে বাসপুর গ্রামে জয়াবতীদের বাটী। সেইখানে জয়া ও তাহার জননী থাকিত। কেমন করিয়া যে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত তাহা তাহারাই জানিত। আর শুনিতে পাই গ্রামের দুই-চারিজন মন্দ লোকও তাহা জানে, কিন্তু আমাদিগের তাহা জানিয়া কোন লাভও নাই, শুনিতে বাসনাও নাই। যাউক সে কথা। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, তাহার পর জানি না কি উপায়ে জয়াবতী নারায়ণপুরের জমিদারবাবুর নিজ ভবনের একাংশে স্থান পাইল। যখন সে পাইল, তখন তাহার মাতাও আসিল; তখন দুইজনে ঘরকন্না পাতাইয়া দিল; কিন্তু জয়ার মার অদৃষ্ট ভাল ছিল না, তাই মাসপাঁচেক যাইতে না যাইতেই মাতা-কন্যার কলহ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে এরূপ হইল যে, দুজনে দুসন্ধ্যা রীতিমত চীৎকার করতঃ উভয়ে উভয়ের মঙ্গল-কামনা এবং আশু সংসার-বন্ধন মুক্ত হইবার বিশেষ প্রার্থনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। এরূপেও দিন কাটিতে লাগিল, আরো ছয় মাস কাটিল। তাহার পর জয়ার মা প্রাসাদ-বাস-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিত্যক্ত পুরাতন ভবনে চলিয়া গেল। বোধ হয় তাহাকে সেখানে যাইতে নিতান্ত বাধ্য করা হইয়াছিল, কেননা যাইবার কালীন সে যেরূপ নির্মমভাবে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এবং কন্যা ও তাহার—কল্যাণ-ভিক্ষা করিতে করিতে গিয়াছিল তাহা দেখিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে, ইচ্ছাসুখে সে এ আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সেই অবধি সুরেন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল যেন সে মাগী কিছুতেই আর এ বাড়িতে না ঢুকিতে পায়। কিন্তু তাহা হইত না। সে মাগী আবার আসিত, আবার প্রবেশ করিত। কিন্তু ফল কিছুই হইত না। বহুবিধ গালিগালাজ, শাপশাপান্ত, অশ্রুপাত, বুকে দারুণ চপেটাঘাত, মস্তকের কেশোৎপাটন এবং পরিশেষে ভৃত্যহস্তের 'অর্ধচন্দ্র', এই লইয়া জয়ার মাকে বাসপুরে ফিরিয়া যাইতে হইত। প্রতি দুইমাস-একমাস ব্যবধানে ইহা নিশ্চয় ঘটিত। বোধ হয় ইহাতে তাহার ভিতরে ভিতরে কিছু লাভ ছিল, না হইলে শুধু এইগুলির জন্যই সে অত পরিশ্রম করিয়া এতদূরে আসিত না; সে যেরূপ চরিত্রের লোক ছিল তাহাতে এগুলি আর কোথায় অনেক কম ক্লেশে উপার্জন করিয়া লইতে পারিত। যাক একথা—এমনও হইতে পারে যে, সে কন্যারত্নকে অতিশয় স্নেহ করিত, এইজন্য বিপথগামিনী হইলেও মায়া কাটাইতে পারিত না—দেখিতে আসিত। এইরূপে চলিত। তাহার পর যখন সে শুনিল যে, জয়াবতী গঙ্গায় ডুবিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে তখন চীৎকার শব্দে বাসপুরের অর্ধেক প্রতি-বাসীকে আপনার বাটীর সম্মুখে একত্র করিয়া ফেলিল।

বাসপুরে অধিকাংশই ছোটলোকের বাস, সেজন্য অধিকাংশ চাষাভুষা লোকের বাটীস্থ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, আধবয়সী, যুবতী প্রভৃতি দর্শকবৃন্দে জয়ার মার দাওয়া দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল। তখন সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে, বাক্‌শক্তিহীন হইয়া এ কাহিনী শুনিল যে, জয়াবতীর গ্রামজোড়া জাহাজখানা প্রায় পাঁচশত দাসদাসীর সহিত কলিকাতার অতল জলতলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

তখন জয়ার মা বলিল, যারা দেখেচে, তারা বলচে যে অত বড় জাহাজ কলকাতা শহরে নেই।

একজন বৃদ্ধা প্রত্যুত্তরে বলিল, তা ত নেই ই।

একজন আধবয়সী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, কত দাম ছিল?

আর বাছা দামের কি আর লেখা-জোখা আছে?

সে চুপ করিল।

জয়ার মা কহিল, নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত দেখতে এসেছিল।

যুবতীরা কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত কেঁদে সারা—বাছাকে সবাই ভালবাসত কিনা!

এইখানে জয়ার মা চোখের কোণে অঞ্চলটা রগড়াইয়া লইল। আর শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মনে মনে প্রার্থনা করিল যে, কি সুকৃতি-বলে পরজন্মে জয়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করা যায়।

জয়ার রূপের কি আদি-অন্ত ছিল? সাক্ষেৎ দুর্গা-প্রতিমে—আহা; কিবা নাক, কিবা চক্ষু, কি ভুরুর ছিরি, কি গড়ন-পেটন, কোনখানে একতিল খুঁত ছিল কি?

যুবতীরা চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, এমন কি দুইজন আধবয়সীও স্বীকার করিল যে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বাবু কি কম ভালবাসতেন? যখন যা বলেচে তখনই তাই পেয়েচে। অত বড় রাজাতুল্য লোকের নজরে পড়া কি সোজা কথা!

একথা মনে মনে প্রায় সকলেই স্বীকার করিল।

আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না—এ শোক কি বরদাস্ত হবে?

ইহাতে কাহারও হয়ত সন্দেহ ছিল, কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ ছাড়িল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর কি হ'ল?

তিনি ভাল আছেন; আলাদা জাহাজে ছিলেন কিনা, তাই রক্ষা পেয়েচেন।

দুজনে কি তবে আলাদা জাহাজে ছিল?

তা ছিল বৈ কি, না হলে কুলুবে কেন? লোকজন ত সঙ্গে কম যায়নি!

তাদের কি হ'ল?

আহা! সবাই ডুবেচে।

সে বেলাটা এমনই কাটিল। 'সন্ধ্যা হয়, ঘরকন্নার কাজ পড়ে আছে' বলিয়া 'কি আর কোরবে বল? তবে এখন আসি', সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। জয়ার মাও একটা যা-তা করিয়া সিদ্ধ পাক করিয়া লইয়া সকাল সকাল দ্বার বন্ধ করিল, আর যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া প্রতিবাসিনীগণের অন্তঃকরণে সেই গ্রাম-জোড়া জাহাজ আর লাটসাহেবের কান্নার কথা জানাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই জয়ার মা নারায়ণপুর অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িল। ক্রমে সে নারায়ণপুরে প্রবেশ করিল। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বৃক্ষের শ্রেণী, সেইসব—সমস্ত পরিচিত। জয়ার মার মনে পড়িল যে, এই পথ দিয়াই সে চলিত, আবার এই পথ দিয়াই বক্ষে আঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। আর সে নাই, তেমন ঝগড়া আর কখন হইবে না, তেমন করিয়া বুক পিটিতেও আর পাইবে না। শত বেদনায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, সহস্রগুণ চীৎকারে তাহা শমিত করিতে করিতে জয়ার মা চলিল। যাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তাহাকে শতকর্ম ফেলিয়াও অন্ততঃ একবার জানালার নিকট আসিতে হইল। ক্রমে সুরেন্দ্রবাবুর অট্টালিকা ঐ সম্মুখে! জয়ার কত স্মৃতি তাহাতে মাখান আছে; জয়ার মা আকুলভাবে ক্রন্দনের তোড় আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সম্মুখের গেট দিয়া পূর্বে সে ঢুকিতে পাইত না; কারণ বাবুর নিষেধ ছিল, কিন্তু এখন সে যেরূপ ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিয়া পড়িল যে, দ্বারবানদিগের বাধা দিতে কিছুতেই সাহস হইল না। সকলেই প্রায় দশহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্রবাবু তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, চীৎকার শব্দে বুঝিলেন জয়ার মা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। আসিয়াই সে জয়াবতীকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য অন্ধভাবে এক আবেদন করিয়া নিকটেই উপবেশন করিল, তাহার পর আর এক আবেদন, আর এক আবেদন, কথা শেষ না হইতেই পুনঃপুনঃ শতসহস্র আবেদন, ভিক্ষা, প্রার্থনা, কৈফিয়ৎ, তলব ইত্যাদি—নানাপ্রকারে সুরেন্দ্রনাথকে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলিল; তৎপশ্চাদ্বর্তী মস্তক ঠোকন, দারুণ বক্ষাঘাত ও সমুষ্টি কেশাকর্ষণ প্রভৃতি আর যাহা ঘটিল তাহা সম্যক বিস্তারিত বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সর্বশেষে জয়ার মা এই বলিয়া শেষ করিল যে, তাহার আর একটি পয়সাও খাইতে নাই, এবং দয়া না করিলে হয় সে অনাহারে মরিবে, নাহয় এইখানে গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহার জয়াবতী যেখানে গিয়াছে সেইখানেই যাইবে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, যা হইবার হইয়াছে, এখন কি হইলে তোমার চলে?

জয়ার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল, বাবা, আমার সামান্যতেই চলিবে- আমি বিধবা, কেউ নাই—কত আর আমার লাগিবে?

সু। তবু কত টাকা চাও?

জ-মা। পনের টাকা মাসে পেলেই আমার চলে।

সু। তাই পাইবে। যতদিন বাঁচিবে, মাসে মাসে কাছারি হইতে ঐ টাকা লইয়া যাইয়ো।

তখন জয়ার মা অনেক আশীর্বাদ করিল, অনেক প্রীতিপ্রদ কথা কহিল, তাহার পর প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর তেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল না, বরং আরো অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। জয়াবতী মরিয়াছে, মা হইয়া সে অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু কিছু সুবিধাও হইয়াছে, যাইবার সময় জয়ার মা একথা মনে করিতে ভুলিল না।

জয়ার মা সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একেবারে চলিয়া গেল না। যেস্থানে দাসদাসীরা থাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পরিচিত দাসদাসী অনেকেই ছিল, জয়ার মার দুঃখে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিল, দুই-একজন কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ার মা অনেক গল্প করিল, সুরেন্দ্রবাবুর দয়ার কথাও প্রকাশ করিল; কিন্তু কথায় কথায় ক্রমশঃ যখন সে শুনিল যে, তাহার জয়াবতীর স্থানে আর একজন সদ্য অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং বাবু তাহাকে বহু সমাদরে বাগানবাটীতে স্থান দিয়াছেন, তখন জয়ার মা অন্য আকৃতি ধারণ করিল। চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল, স্থান কাল বিবেচনাহীন হইয়া সেইখানেই বাগানবাটী-অধিকারিণীর উদ্দেশে বহুবিধ হীনবাক্য গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রন্দনের ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অদম্য উৎসাহে নবীন করিয়া পুনরায় সেই কেশাকর্ষণ সেই বুক-চাপড়ানি। দাসদাসীরা ভীত হইল, শান্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইল শেষে বাবুর ভয় পর্যন্ত দেখাইল, রাগ করিয়া বাবু টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন তাহাও বলিল, কিন্তু জয়ার মা বহুক্ষণাবধি তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। পরিশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া জয়ার মার হস্ত হইতে বহু ক্লেশে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

পথে আসিয়া জয়ার মা বাগানবাটী অভিমুখে চলিল। কন্যাশোক তাহার চতুর্গুণ উথলিয়া উঠিয়াছে, হিংসানল পঞ্জরে পঞ্জরে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার কন্যাকে এ মাগী ডুবাইয়া দিয়া বলপূর্বক সে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গর্জাইতে গর্জাইতে তখন জয়ার মা বাগানবাটীতে প্রবেশ করিল। যে দাসী সম্মুখে পড়িল তাহার পানে ক্রোধকষায়িত নয়নে চাহিয়া বলিল, সে ডাইনী কোথা?

সে বেচারী নূতন লোক, ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া বলিল, ঐ হোথা।

সে যেমন প্রশ্ন করিয়াছিল, তেমনি উত্তর পাইল। সেও প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, জয়ার মাও উত্তরের অর্থ বুঝিতে পারিল না; আর একবার তাহার পানে সেইরূপ চাহিয়া বলিল, কোথা?

সে অঙ্গুলি হেলাইয়া যথেচ্ছা একটা দিক দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ার মা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু এ কি শোভা! কি আসবাব, কি বহুমূল্য সাজসজ্জা! সে পূর্বে সুরেন্দ্রবাবুর বাটীতে অনেকদিন ছিল, সেখানে বহু দ্রব্য দেখিয়াছে, কিন্তু এমন কখনও দেখে নাই। যত দেখিতে লাগিল, তত ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সকল সমস্তই জয়াবতীর হইত, আর কে জানে—হয়ত কোন সময়ে তাহারই বা হইতে পারিত না? এইরূপে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে সে একটা কক্ষে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাইল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দেখিয়া জয়ার মা একজন পরিচারিকা স্থির করিল। ডাকিয়া কহিল, ওগো, তোদের গিন্নী কোথায়?

অস্বাভাবিক কর্কশবচনে সে ফিরিয়া চাহিল। জয়ার মা দেখিল তাহার সামান্য বস্ত্র, গাত্রে অলঙ্কারের নামমাত্র নাই–কিন্তু মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কর্কশ কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল; বলিল, তুমি কে গা?

আমি এইখানে থাকি। আপনি বসুন।

জয়ার মা। তুমি কতদিন আসিয়াছ?

স্ত্রীলোক। প্রায় একমাসের কিছু অধিক।

জয়ার মা। তোমাদের গিন্নী কোথায়? তুমি বুঝি তারি সঙ্গে এসেচ?

স্ত্রীলোকটা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাঁর সঙ্গে কিছু প্রয়োজন আছে কি?

প্রয়োজন আমার ঢের আছে। সেই ডাইনী হারামজাদীর মুণ্ডুটা আজ চিবিয়ে খাব। বলিতে বলিতে তাহার সেই পূর্বভাব, সেই রুক্ষ মুখশ্রী, সেই অমানুষিক চোখের ভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল—জানিস আমি কে? আমি জয়ার মা, আমাকে দেশসুদ্ধ লোক চেনে। হারামজাদী ডাইনী আমার মেয়েকে খেয়েচে—আজ আমি তাকে খাব—খাব—খাব (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ) খাব, তবে যাব, খাব খাব—খাব—সব শেষ কোরে তবে যাব।

স্ত্রীলোকটি রুদ্ধশ্বাসে সে অলৌকিক ভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

ওরে হারামজাদী তোকে খাব (বক্ষে চপেটাঘাত)–ওরে আবাগী—শতেক খোয়ারি—ছেনাল ডাইনী (মস্তকের কেশাকর্ষণ) তোকে খাব—তোকে খাব–তোকে খাব–মা-কালীর পায়ে বুক চিরে রক্ত দেব—আর এমনি কোরে মাথা খুঁড়ে হাড় দেব (ভূমিতলে মস্তক ঠোকন)—ওরে আবাগী, এমনি কোরে এমনি কোরে (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ)—কই, কোথা সে?

যাহার উদ্দেশে এত হইতেছিল, সেই সুমুখে বসিয়াছিল; জয়ার মা কিন্তু তাহা জানিত না, জানিলে বোধহয় সেদিন কিছু একটা ঘটিয়া যাইত।

মালতী নিকটে আসিয়া হাত ধরিল, ধীরে ধীরে বলিল, আপনি চুপ করুন–

আমি চুপ কোরব! তুই হতভাগী সেকথা বলবার কে? আমার মেয়েকে খেয়েচে, আর আমি চুপ কোরে থাকব? (পুনরায় ভূমিতলে মস্তকাঘাত)

মালতী বুঝিল, অত মোটা কার্পেট না থাকিলে জয়ার মা সেদিন আস্ত মাথা লইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিত না। কহিল, তিনি আজ এখানে নাই।

এখানে নাই?

মা। না।

জয়ার মা। আমি কিন্তু এক পাও এখান থেকে নোড়ব না। হারামজাদীকে দেখব, খাব—তবে যাব!

মালতী অল্প হাসিয়া বলিল, যাবেন কেন? স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন। কিন্তু অনেক বেলা হ'ল, খাওয়া-দাওয়া ত এখনও আপনার হয় নাই?

জয়ার মা। খাওয়া-দাওয়া? তা তখন একেবারেই কোরব।

মা। আহা, মেয়ের শোক! মার প্রাণ যে কি কোরচে তা আমিই জানি।

জয়ার মা ঈষৎ নরম হইল, বলিল, তাই বুঝে দেখ বাছা!

মা। তা কি আর বুঝিনে! কিন্তু কি করবেন বলুন—মুখেও ত কিছু দুটো দিতে হয়, পোড়া পেট ত আর মানে না।

জয়ার মা। তা সত্যি কথা।

মা। তাই বলচি, এখানেই দুটো জোগাড় করে দিই–

জয়ার মা। দিবি? তা দে বাছা।

মা। আহা! জয়াদিদি আপনার কথা কত বোলতেন।

জয়ার মা। বোলত? তা বলবে বৈ কি! তুই তাকে দেকেচিস?

মা। আহা—কতদিন একসঙ্গে এলাম—তাঁকে আর দেখিনি?

জয়ার মা। তুই বুঝি তার সঙ্গে ছিলি?

মা। হাঁ, তিনি আমাকে আমার দেশ থেকে তুলে নিয়েছিলেন। কত কথা বোলতেন–তার মধ্যে আপনার কথাই বেশি হোত।

জয়ার মা। তা হবে বৈ কি! সে আমার তেমন মেয়ে ছিল না।

মা। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।

জয়ার মা। আহা, অমন মেয়েও মরে! কিন্তু তোদের এ ডাইনী কোত্থেকে উঠল?

মা। কলকাতা থেকে।

জয়ার মা। মাগী বুঝি বাবুকে ওষুধ করেচে?

মা। শুনতে ত পাই।

জয়ার মা। কিন্তু আমি তার ওষুধ করা আজ ভেঙ্গে দেব।

মা। দিও—মাগী যেমন—তেমনি শোধ দিয়ে তবে যেয়ো।

জয়ার মা। তা যাব। মাগী মন্তর-তন্তর কিছু জানে?

মা। মন্তর-তন্তর? শুনতে পাই কামিখ্যে থেকে শিখে এসেছিল। মানুষকে ভেড়া কোরে রাখতে পারে। এই বাবুকে এমনি করেচে যে, ইনি উঠতে বললে ওঠেন বসতে বললে বসেন।

জয়ার মার মুখখানা কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্কমুখে বলিল, তা মন্তর-তন্তর আমিও জানি।

মা। জানবে না কেন? তা আজ দুপুরবেলা যখন আসবে তখন দেখিয়ে দেব।

জয়ার মা। বাণ মারতে জানে?

মা। জানে বৈ কি!

জয়ার মা। কখন আসবে?

মা। দুপুরবেলা।

জয়ার মা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল যেন দুপুর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ কিন্তু আমার ঢের বরাত আছে-আজ তবে এখন যাই, কাল আসব। জয়ার মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা। না, না, আজ এখানে খেয়ে-দেয়ে যান।

জয়ার মা। বড় দেরি হবে যে।

মা। কিছুই দেরি হবে না!

জয়ার মা। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির নে মা। তোর নামটি কি বাছা?

মা। আমার নাম মালতী।

জয়ার মা। আহা বেশ নাম।

জয়ার মা তখন নীচে আসিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু আহার করিয়া লইল। মালতী নিকটে বসিয়া দেখিল যে, জয়ার মার আহারে তেমন সুবিধা হইল না, উঠিয়া বলিল, তবে এখন যাই মা।

মা। একটা কথা আপনাকে এখনো বলা হয়নি—জয়াদিদির কাছে আমি দশ টাকা ধার নিয়েছিলাম—তা তিনি ত নেই, এখন আপনি যদি দয়া করে আমাকে ঋণমুক্ত করেন।

জয়ার মা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি করি?

মা। সেই দশ টাকা আপনি নিন।

জয়ার মা। আমাকে তুমি দেবে?

মা। হাঁ। মালতী উপর হইতে দশ টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

জয়ার মা অনেকক্ষণ ধরিয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বাছা, তুই নিশ্চয় ভদ্দরঘরের মেয়ে।

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি দুঃখী লোক।

জয়ার মার চোখের কোণে একটু জল আসিল। বলিল, তা হোক—তবুও তুই ভদ্দরের মেয়ে না হলে—এই দেখ্ না কেন—তা সত্যি কথাই বলি, আমার জয়ার হাতে এত টাকা ছিল, কিন্তু মা বলে দশ টাকা কখন একসঙ্গে এমন করে হাতে তুলে দেয়নি। জয়ার মা চোখের কোণ মুছিল।

মা। আমরা দুঃখী লোক, কিন্তু ধর্ম ত আছেন।

জয়ার মা। আছেন; কিন্তু সবাই কি তা জানে?

মা। তা হোক—কাল তবে আসবে?

জয়ার মা। হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ আসব বৈ কি।

মা। আমাদের ঠাকরুনকে তোমার কথা আজ তবে বলে রাখব কি?

জয়ার মা। হ্যাঁ—তা—না তা আর বলে কাজ নেই। কামরূপ হইতে শিক্ষা করা 'বাণ-মারা' বিদ্যাটা জয়ার জননীর মনে বড় শান্তি দিতেছিল না, মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

জয়ার মা শুষ্ক হইয়া বলিল, তবে এখন আসি, মাঝে মাঝে তোর কাছে আসব এখন।

মা। এসো!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

একথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ খুব হাসিয়া বলিলেন, তবে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেল?

মালতী বলিল, ঝগড়া হবে কেন, বরং বেশ ভাব হয়ে গেল।

সু। তবে ভাব করে নিয়েচ?

মা। নিয়েচি।

সু। কিন্তু ও র নিজের মেয়ের সঙ্গে কখন বনতো না। চিরকাল ঝগড়া ছিল।

মা। তা শুনেচি।

সু। কি করে।

মা। নিজেই মনের দুঃখে আমাকে কিছু কিছু বলেচে। মনদুঃখের কারণটা কিন্তু মালতী খুলিয়া বলিল না।

সু। প্রথমে বাড়িতে ঢুকেই বুঝি তোমাকে খুব গালাগালি দিয়েছিল?

মালতী হাসিয়া বলিল, আমাকে দেয়নি! যে ডাইনীকে তুমি কলিকাতা থেকে এনেচ তাকেই দিয়েছিল।

সু। সে ডাইনী ত তুমিই।

মা। আমি কেন হব? আমি ত কলিকাতা থেকে আসিনি।

সু। তা হোক তবু ত তুমিই সে।

মা। আমাকে সে চিনিতেও পারেনি। একটা দাসী মনে করেছিল।

সুরেন্দ্র ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলিলেন, তা ছাড়া অপরে আর কি মনে করতে পারে?

মা। আমিও সেইজন্যে আজ বেঁচেচি—না হলে বোধ হয় আমাকে আস্ত রাখত না।

সু। মেরে ফেলত?

মা। বোধ হয়।

সু। তার পর?

মা। আমি বললাম, সে মাগী এখানে নেই। তাতে বললে যে, সে এলেই তাকে খেয়ে ফেলবে।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে ওষুধ করেচে কি না; আমি বললাম, বোধ হয় করেচে, না হলে বাবু উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন কেন?

সু। আমি বুঝি তাই করি?

মা। কর না কি?

সু। আচ্ছা তা দেখ্‌চি; তার পর?

তার পর জিজ্ঞাসা করলে যে, সে মন্তর-তন্তর জানে কিনা, আমি বললাম, খুব জানে; কামরূপ থেকে শুনতে পাই শিখে এসেচে। বললে, আমিও জানি, কিন্তু বুঝতে পারলাম মনে মনে ভয় পেয়েচে। জিজ্ঞাসা করলে, বাণ মারতে পারে? আমি বললাম, পারে।

সুরেন্দ্রবাবু এবার খুব জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন তখন বুঝি পালিয়ে গেল?

মা। হাঁ।

সু। আর কখন এখানে আসবে না?

মা। আসবে বৈ কি। কিন্তু তোমার সে ডাইনীর কাছে আসবে না—আসে ত আমার কাছে আসবে।

সু। যার কাছে ইচ্ছা আসুক. কিন্তু এখন তুমি আমার কাছে এস। কাছে আসিলে হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন. মালতী. আর কতদিন এমন করে কাটাবে? এমনধারা বেশ চোখে আর দেখা যায় না।

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল. গয়না পরিলে কি রূপ বাড়িবে?

সু। তোমার রূপের সীমা নাই—যার সীমা নাই তাকে বাড়ান যায় না। কিন্তু আমার তৃপ্তির জন্যেও অন্ততঃ -

মা। গয়না পরিতে হবে?

সু। হাঁ।

মা। পরিতে পারি. কিন্তু আগে বল আমাকে গহনা পরাতে তোমার এত জেদ কেন?

সু। যদি বলি. তা হলে মনে দুঃখ পাবে না?

মা। কিছু না!

সু। তবে বলি শোন। তোমার এ নিরাভরণা মূর্তি বড় জ্যোতির্ময়ী—স্পর্শ করিতেও সময়ে সময়ে কি যেন একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে—দেখিলেই মনে হয় যেন আমার পাপগুলা ঠিক তোমারি মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমাকে বলতে কি—তোমার কাছে বসিয়া থাকি. কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশিতে পারি না; তাই তোমাকে অলঙ্কার পরাইয়া একটু ম্লান করিয়া লইব।

মালতী নিঃশব্দে আপনার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল. প্রকাণ্ড দর্পণে তাহা পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও দেখিল। মনে হইল সে বুঝি যথার্থ-ই বড় উজ্জ্বল. বড় জ্যোতির্ময়ী; মনে হইল পুণ্যের অতীত-স্মৃতি এখনও বুঝি সে-দেহ ছাড়িয়া যায় নাই. পবিত্রতার ছায়াখানি এখনও সে-দেহে বুঝি ঈষৎ লাগিয়া আছে। রাত্রে. সহসা নিস্তব্ধ কক্ষে মালতীর ঈষৎ ভ্রম জন্মিল- -সে দেখিল. সম্মুখে মুকুরে এক কলঙ্কিত দেবীমূর্তি, আর পার্শ্বে জীবনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথের অকলঙ্ক দেবমূর্তি।

বিস্ময়ে. আনন্দে মালতী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথ মোহন নটবরবেশে মালতীর মন্দিরে দেখা দিলেন। গলায় মোটা মোটা ফুলের গোড়ে: জুই. বেলা. বকুল. কামিনী প্রভৃতি পুষ্পের একরাশি মালা কণ্ঠ ও বুক ভরিয়া আছে. একহস্তে ফুলের তোড়া. অপর হস্তে মখমল-মণ্ডিত সুন্দর সুগঠন একটা বাক্স: পরিধানে পট্টবস্ত্র. পায়ে জরির জুতা. হেলিতে দুলিতে একেবারে মালতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিল. আজ আবার এ কি?

সু। কি বল দেখি?

মা। তা জানি না।

সুরেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গম্ভীর হইয়া বলিলেন. তুমি পূজা কর?

মা। করি।

সু। তবে তোমার বাড়িতে চন্দন আছে: চন্দন এনে আমাকে সাজিয়ে দাও—আজ আমার বিবাহ!

মা। কার সঙ্গে?

সু। আগে সাজাও. তার পরে শুনিও।

মালতী নীচে হইতে চন্দন ঘষিয়া আনিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া বলিল, এখন বল!

সু। তা কি এখনো বুঝিতে পারনি!

তাহার পর গলদেশ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহাকে পরাইলেন, মখমল-বাক্স হইতে নানাবিধ রত্নজড়িত অলঙ্কার বাহির করিয়া যথাস্থানে যথাক্রমে নিবেশ করিলেন—মালতী জন্মে কখন সেইরূপ দেখে নাই বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল—সব শেষ করিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, তোমাকে বিবাহ করিলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হইলে; আর কোথাও পালাতে পাববে না যে মালা আজ পরাইলাম, জন্ম-জন্মান্তরে তা আর খুলিতে পারিবে না।

উভয়ের চক্ষের জল আসিল, উভয়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর অশ্রু মুছাইয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন বাড়ি চল- আপনাব সংসাব আপনি বুঝিয়া লও—আশীর্বাদ করি এ জীবনে চিরসুখী হও!

মালতী প্রণাম করিয়া পুনর্বার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষের জল আজ তাহার বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। শতবার মুছিল, শতবাব চক্ষু তিতিয়া উঠিল কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন মালতী, আজ পিতা মাতার কথা মনে হইতেছে?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

যাহা ইচ্ছা ছিল তাহাতে তুমি নিজেই বাদ সাধিলে। মনে করিয়াছিলাম, আর এমন করিয়া থাকিব না, তোমাকে যখন পাইয়াছি তখন প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিব আব একবার সংসারী হইব। তোমার পিতা-মাতাকে এখানে আনিব—লোকে তখন যাই বলুক না কেন-আমি নিজে সুখী হইব। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সে আশা এখন দুরাশা।

এখন বাড়ি যাইবে?

মালতী বলিল কোথায়?

যে তোমার বাড়ি—যেখানে আমি থাকি।

এটা কি আমার বাড়ি নয়?

তবে কি সেখানে যাইবে না?

না।

আমিও ঠিক তাই ভাবিয়াছিলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিন দেরি করিয়া কাটে সত্য, কিন্তু তথাপি কাটে, বসিয়া থাকে না। মাধবের মৃত্যুর পর শুভদার দিনও তেমনি করিয়া অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন বর্ষা ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, পথে ঘাটে কাদা-পাঁক, পিছল ছিল- এখন তাহার পরিবর্তে শরৎকাল পড়িয়াছে। সে মেঘ নাই, সে কাদা-পাঁক, পিছল নাই--পথঘাট খটখট করিতেছে; কখন দুই-একখণ্ড শুভ্র মেঘ উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশ বাহিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে। তখন প্রকৃতির নিত্য ম্লানমুখ, নিত্য চোখে অশ্রু ছিল-এখন সেসব আব নাই। কখন কখন সেমুখ ঈষৎ মলিন হয়, দুই-একফোঁটা চোখে জলও আসে দেখিতে পাই—কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসে। অতীতের স্মৃতি-জড়িত দুঃখের শেষ ক্রন্দনটুকুর মত, গগনের কোন অনির্দেশ্য কোণ হইতে 'গুড়্‌গুড়' করিয়া কখনো কাঁদিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহাতে আর গভীরতা নাই। একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না, একথা প্রকৃতি সতীও যেন কতক বুঝিয়াছে। পরিবর্তন ভিন্ন সংসার চলে না। একথা সকলেই বুঝেন—বুঝে না কেবল শুভদার সৃষ্টিকর্তা! জন্মিয়া অবধি আজ পর্যন্ত! শুভদা একথা মনে করিয়া দেখে—আর দেখে শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী। পাড়ার পাঁচজন দেখে--শুভদা ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতেছে, জলেব কলসী কাঁকে লইয়া ধীর মন্থর-গমনে চলিয়া

যাইতেছে, গৃহকর্ম করিতেছে—কিন্তু নিত্য ক্ষীণ, নিত্য বিষাদময়ী!

বর্ষীয়সীরা বলে, ছুঁড়ী আর বাঁচবে না—আহা!

সমবয়সিনীরা বলে, এমন অদৃষ্ট যেন শত্রুরও না হয়—আহা!

পিছনে 'আহা' 'আহা' সবাই বলে, কিন্তু সম্মুখে একথা বলিতে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। সকলেই যেন বুঝিতে পারে, এ 'আহা'-টা শুভদার সম্বন্ধে খাটে না। আর একটা অন্য কিছু—যাহা জগতে নাই, যাহা এ পর্যন্ত কেহ কখন প্রয়োগ করে নাই-প্রয়োগ করিবার অবকাশও আইসে নাই—এমন একটা শব্দ খুঁজিয়া পাইলে যেন বলিবার মত কতকটা হয়। তাই কেহ কিছু বলে না—শুভদা আসিলে চুপ করিয়া থাকে। স্নান করিবার সময় গঙ্গার ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটায়, গোলমাল করে, হাস্য-কলরবে প্রৌঢ়াদিগের শিবপূজার মন্ত্র ভুলাইয়া দেয়, এমনি অনেক উৎপাত করিতে থাকে, কিন্তু শুভদা যখন নিঃশব্দে ঘাটের সর্বশেষপ্রান্তে কলসী নামাইয়া নিতান্ত অস্পর্শীয়া নীচ জাতীয়ার ন্যায় সসঙ্কোচে জলে নামে, তখন বালক-বালিকারাও বুঝিতে পারে যে, এখন আর গোলমাল করিতে নাই, জল ছিটাইতে নাই—এখন চুপ করিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া জননীর বা আর কাহারো আপনার লোকের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে চলিয়া যায়, তখনও কিন্তু তাহারা পূর্বভাব শীঘ্র ফিরিয়া পায় না।

শুভদা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দুঃখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে তাহার বিরক্তি বোধ হয়, সেসব পুরাতন কথা আলোচনা করিতে লজ্জা করে। বাড়িটা আজ সম্পূর্ণ নির্জন হইয়াছে; ছলনা শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, রাসমণি প্রায় সমস্তদিন বাটী আসেন না। আর হারাণ মুখুজ্যে! তা সে আজকাল ভাল ছেলে হইয়াছে। নিত্য দুবেলা বাটী আসে, দুই আনা চারি আনা পূর্বের মত কর্জ চাহিয়া লয়—আবার চলিয়া যায়। শুভদা সমস্ত দুপুরবেলাটা রান্নাঘরের মাটির মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যা হয়—আবার ওঠে, ঘাটে যায়, প্রদীপ জ্বালে, রন্ধন করে—যত্ন করিয়া একথাল অন্ন বাড়িয়া স্বামীর জন্য রাখিয়া দেয় সদানন্দকে আহার করায়। আবার সকাল হয়, আবার বিকাল হয়—আবার রাত্রি আইসে।

নিত্য যেমন হয় তেমনি শুভদা আজও দ্বিপ্রহরের পরে রন্ধনশালায় শুইয়াছিল। বাহিরে পুরুষকণ্ঠে একজন ডাকিল, মাঠাকুরুন!

শুভদা শুনিতে পাইল কিন্তু কথা কহিল না। মনে করিল বুঝি আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছে।

সে আবার ডাকিল বলি মাঠাকুরুন! কেউ বাড়ি আছেন কি?

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কে?

আমি পিয়ন। চিঠি আছে।

শুভদা বড় বিস্মিত হইল—চিঠি কে লিখবে? কাছে গিয়া বলিল, দাও—

অমনি পাবে না মাঠাকুরুন। এখানা রেজেস্ট্রি চিঠি—শ্রীশুভদা দেবীর নামে, তাঁর সই দিতে হবে।

শুভদা রেজেস্ট্রি অর্থ তেমন বুঝিল না—বলিল, দাও—আমারই নাম শুভদা।

পিয়ন চিঠি বাহির করিল, স্বতন্ত্র একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিল—সই দিন।

শুভদা লিখিতে জানিত—বলিল, কালি-কলম দাও।

পিয়ন মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল কালি-কলম আমি পাব কোথায়? আপনার বাড়ি, বাড়িতে কালি-কলম নেই!

শুভদা বলিল, দেখি। তাহার পর উপর-নীচে সর্বত্র খুঁজিয়া ললনার একটা অর্ধভগ্ন দোয়াত পাইল। কালি শুকাইয়া গিয়াছে—জল দিয়া কোনরূপে একরকম করিয়া কালি প্রস্তুত হইল—কিন্তু কলম কোথায়?

হঠাৎ শুভদার মাধবের দপ্তরের কথা মনে পড়িল। উপরের ঘরে এক কোণে একটা ছোট চৌকির উপর বসিয়া মাধব ও ছলনা পাঠ অভ্যাস করিত—ললনা তাহাদের শিক্ষক ছিল। শুভদা উপরে আসিয়া দেখিল—এককোণে সেই চৌকির উপর তেমনিভাবে একটি ছোট কালিলিপ্ত দপ্তর ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডে জড়িত পড়িয়া আছে। শুভদা এদিকে বহুকাল

আইসে নাই, বহুকাল এদিকে চাহে নাই। এটা ললনার ঘর; ললনা মরিয়া পর্যন্ত আজ সে প্রথম এ-ঘরে প্রবেশ করিল। দপ্তরখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে খুলিল—একখানি ভগ্ন শ্লেট, একখানি অর্ধেক বোধোদয়, একটা ধারাপাত, দুটো কঞ্চির কলম, একটা মুখভাঙ্গা শরের কলম, ছোট ছোট দুটি শ্লেট পেন্সিল, পুরাতন পঞ্জিকা হইতে কর্তিত গোটা-পাঁচেক ছবি—টপ্ করিয়া একটা মস্ত বড় ফোঁটা শ্লেটের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কলম লইয়া শুভদা আবার সেগুলি তেমনি সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। কারণ এগুলি মাধবের বড় যত্নের দ্রব্য তাহা সে জানিত।

নীচে আসিয়া শুভদা পত্র গ্রহণ করিল। ঘরে গিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট! নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; পিয়নকে ডাকিতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু পিয়ন ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। বৌমানুষ, চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কাজেই নোট লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুভদা মনে করিয়াছিল, আর একটু পরে সে আপনিই আসিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সেদিনও আসিল না। কিংবা পরদিনও আসিল না। তখন শুভদা এ কথা সদানন্দকে জানাইল। সদানন্দ দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ভুল হয় নাই। এ গ্রামে আপনার নামে আর কেউ নাই—হারাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী—তখন এ আপনারই বটে, কিন্তু কলিকাতায় কে আপনার আছে?

কলিকাতায় আমার কেহ নাই।

পরদিন সদানন্দ ডাকঘরে সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, অঘোরনাথ বসু, উকিল-কলিকাতা হইতে এ টাকা পাঠাইয়াছেন।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, ও নামের কাহাকেও আমি চিনি না।

তবে?

শু। তুমি উপায় কর।

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, উপায় আর কি করিব? টাকা যদি না লওয়া মত হয়, তাহা হইলে ফিরাইয়া দিন।

শু। বাবা, যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে খাইতে পাই নাই, তখনো বোধ হয় এ টাকা নিতাম না। এখন কি দুঃখে টাকা নেব? এ আমার টাকা নয়, তুমি ফিরিয়ে দাও।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ কহিল, আমি কলিকাতায় গিয়া সন্ধান লইব। এ টাকা এখন আপনি রাখিয়া দিন—যদি ফিরাইয়া দিবার হয়, ফিরাইয়া দিব।

শু। তুমি টাকা সঙ্গে লইয়া যাও, মত অমত নাই—একেবারে ফিরাইয়া দিও। সম্ভব, তিনি আর কাহারো বদলে আমাকে পাঠিয়েছেন।

স। যা হয় সেখানে গিয়া স্থির করিব।

শু। তাই করিও।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আপনার প্রশস্ত কাছারিঘরে উকিলবাবু শ্রীঅঘোরনাথ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। সম্মুখে টেবিলের অপর পার্শ্বে নারায়ণপুরের সুরেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর একরাশি মকদ্দমার কাগজপত্র রহিয়াছে, ব্যস্তভাবে দুইজনে তাহারি তদ্বির করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, অঘোরবাবু, বোধ হয় এ মকদ্দমা আমি জিতিতে পারিব না।

অ। এখনো কিছুই বলা যায় না।

সু। বলা বেশ যায়। ঠিক বুঝিতেছি মকদ্দমা হারিতেই হইবে।

অ। কিন্তু হাইকোর্টের উপরও ত আছে?

সু। আছে, কিন্তু ততদূর যাইবার ইচ্ছা নাই।

অ। তবে কি মালপুরের বিষয়টা ছাড়িয়া দিবেন?

সু। না দিয়া আর উপায় কি?

অ। বিস্তর আয় কমিয়া যাইবে।

সু। হাঁ, প্রায় অর্ধেক কমিবে।

অঘোরবাবু মৌন হইয়া রহিলেন। মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, সুরেন্দ্রবাবুর অনুমানই কালে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। এইসময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, বাহিরে একজন আপনার সহিত দেখা করিতে চান।

অঘোরবাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কে?

চিনি না। দেখে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

তবে বল্ গে যা এখন আমার সময় নেই।

কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তিনি যেতে চান না বলেন বড় দরকার আছে।

অঘোরবাবু আরো একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন এঘরেই ডাকিয়া পাঠাব কি?

ক্ষতি কি?

ভৃত্যকে তিনি সেইরূপ অনুমতি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে শিখা, কিন্তু কপালে ফোঁটাতিলক প্রভৃতি কিছুই নাই। অর্ধময়লা উত্তরীয় বসন, সাদা থান পরিধানে পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলা উঠিয়াছে। দুজনেই চাহিয়া দেখিলেন। অঘোরবাবু বলিলেন, বসুন।

ব্রাহ্মণ অদূরে চৌকির উপর স্থান গ্রহণ করিয়া বলিলেন, উকিলবাবু অঘোরনাথ বসু মহাশয়ের—

আমারই নাম অঘোরনাথ।

ব্রা। তবে আপনার নিকটেই প্রয়োজন আছে। যা বলিবার এইখানেই বলিব কি?

অ। স্বচ্ছন্দে বলুন।

তিনি তখন উত্তরীয়-বস্ত্র হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, এ টাকা শুভদা দেবীকে কি আপনি পাঠাইয়াছিলেন?

অঘোরবাবু তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমিই পাঠাইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হলুদপুরে হারাণ মুখুজ্যের বাটীতে শুভদা দেবীকে—

অ। হাঁ, তাই বটে।

ব্রা। কেন?

অ। মনিবের হুকুম।

ব্রা। মনিব কে?

অঘোরবাবু সুরেন্দ্রবাবুর পানে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন তাহা বলিতে নিষেধ আছে।

ব্রা। তবে এ টাকা ফিরাইয়া নিন। যাঁহাকে ইহা পাঠাইয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করিবেন না, আপনাকে তিনি চিনেন না এবং সম্ভবতঃ আপনার মনিবকেও চিনেন না। আমাকে এখানে সমস্ত সংবাদ লইয়া নোটখানা ফিরাইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি বুঝি ভ্রম করিয়া একজনের স্থানে আর একজনের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

অঘোরবাবু হাসিলেন, বলিলেন, এতটা ভ্রম উকিলের হয় না।

ব্রা। না হোক, কিন্তু এখন প্রতিগ্রহণ করুন।

অ। তাহাও পারি না—মনিবের হুকুম ব্যতীত কিছুই করিব না।

ব্রা। তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ দিবেন, আমি অন্যদিন আসিয়া দিয়া যাব। তিনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আপনা হইতেই বলিলেন মহাশয়ের নাম?

আমার নাম সদানন্দ চক্রবর্তী।

সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, আপনি এখানে কোথায় আছেন?

স। কোথায় থাকিব এখনো স্থির করি নাই; বরাবর এখানেই চলিয়া আসিয়াছিলাম এবং সম্ভবতঃ আজই ফিরিয়া যাইব।

সুরেন্দ্রনাথ অঘোরবাবুকে বলিলেন, এখন যাই, রাত্রে আবার আসিব। তাহার পর সদানন্দর পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।

স। বলুন।

সু। এখানে নহে। আমার বাসা নিকটেই, আপত্তি না থাকে ত চলুন সেখানেই যাই—তথায় সমস্ত বলব।

সদানন্দর তাহাতে আপত্তি ছিল না, তখন দুইজনে গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে সদানন্দ কহিলেন, ইহার পূর্বে আপনাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না কিন্তু কিন্তু—আপনি আমাকে কখন দেখিয়াছিলেন কি?

সু। না, দেখি নাই। কিন্তু আপনাকে জানি।

স। কিরূপে?

সু। বাসায় চলুন সেখানেই বলিব।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমিও ব্রাহ্মণ, বেলাও অধিক হইয়াছে—আপনি এখানে আহার করিলে ক্ষতি কি?

কিছু না।

তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শুভদা দেবী দরিদ্র নয় কি?

স। দরিদ্র বটে; কিন্তু তাই বলিয়া

সু। বুঝিয়াছি। তাই বলিয়া দান লইবেন কেন?

স। কতক তাই বটে; বিশেষ দাতার নাম না জানিতে পারিলে—

সু। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? যে দান করিয়াছে, সে-ই বলিতেছে ভুল-প্রমাদ কিছুই ঘটে নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হইয়াছে।

স। কে দান করিয়াছে?

সু। ধরুন, এখন অঘোরবাবুই—

স। অঘোরবাবুর কি অধিকার আছে?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কিন্তু দান করিতে সকলেরই অধিকার আছে।

স। থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেই গ্রহণ করে কি?

সু। করে না; কিন্তু যাহার চলে না সে?

সদানন্দ ঈষৎ বিরক্ত হইল; বলিল, শুভদা দেবীর এরূপ ভিক্ষা না লইলেও চলে।

সু। আজকাল বোধ হয় চলে, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে চলিত কি?

স। সেকথার প্রয়োজন কি? আর আপনি এত জানিলেন কিরূপে?

সু। আমি অনেক কথা জানি। হারাণবাবু উপার্জন করেন না—অধিকন্তু আনুষঙ্গিক নানা দোষ আছে—যে আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালন করে না তাহার সংসার পরের সাহায্য ব্যতীত চলে কি?

সদানন্দ কিছু গোলমালে পড়িল, উপস্থিত কোনরূপ উত্তর করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন, হারাণবাবু এখন কি করেন?

স। কিছু না।

সু। বুঝিয়াছি। আপনার সাহায্যে তবে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়?

স। ভগবান সাহায্য করেন—আমি দরিদ্র।

সু। ছলনার বিবাহ হইয়াছে?

স। হইয়াছে।

সু। কোথায়? কাহার সহিত?

স। আমাদের গ্রামেই। শারদাচরণ রায়ের সহিত।

সু। মাধব কেমন আছে?

স। সে বাঁচিয়া নাই—অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে।

সু। আহা! তাঁর বড় মেয়েটি এখন কোথায়?

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় কিরূপ? সেও ত বাঁচিয়া নাই।

সু। বাঁচিয়া নাই? মরিল কিরূপে?

স। গঙ্গাজলে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

সু। কেমন করিয়া জানিলেন? মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল কি?

স। মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে নাই; কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্র গঙ্গাতীরে পাওয়া গিয়াছিল—তাহাতেই বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছে।

সু। সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ নাই?

স। কিছু না।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা, মনে করুন, যদি এ-টাকা সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

স। কে? ললনা?

সু। ললনা কে? তার নাম কি ললনা ছিল?

স। হাঁ

সু। আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ললনাই বটে! ললনা, ছলনা দুই বোন,—না?

স। হাঁ।

সু। মনে করুন দেখি, যদি সে-ই এ টাকা পাঠাইয়া থাকে?

স। যে মরিয়াছে, সে?

সু। হাঁ, সে-ই। গঙ্গাতীরে তাহার বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে সে মরিয়াছে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখন যদি সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

সদানন্দ বড় বিহ্বল হইল। কিছুক্ষণ অধোবদনে ভাবিয়া বলিল, সে বাঁচিয়া নাই; বাঁচিয়া থাকিলে পত্র লিখিত।

সু। পত্র লিখিতে যদি তাহার লজ্জা বোধ হয়?

স। আমি ললনাকে জানি। লজ্জার কাজ কখনো সে করিবে না; জীবিত থাকিয়া কখনো আত্মগোপন করিবে না!

সু। সে মরে নাই—বাঁচিয়া আছে; সে-ই টাকা পাঠাইয়াছে এবং প্রতি মাসে পাঠাইবে।

সদানন্দ আপনার কপাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, আপনার নাম?

সুরেন্দ্রনাথ রায়।

নিবাস?

নারায়ণপুর।

স। আপনি হারাণবাবুর এত কথা কি করিয়া জানিলেন?

সু। ললনা বলিয়াছে।

স। ললনা বলে কেউ নাই—সে মরিয়াছে।

সু। মরে নাই—সে সুখে আছে।

স। সে স্বর্গে গিয়াছে—

সুরেন্দ্রবাবু চীৎকার করিলেন, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান—

আমি যাই—

দাঁড়ান—আর দুটো কথা—

যদি কখন দেখা হয় বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে—

তাঁর মাকে বলিবেন—

হাঁ—স্বর্গে গিয়াছে।

সদানন্দ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আর ফিরিল না—আর বসিল না।

সে চলিয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণাবধি নির্বাক নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিছু

দিবস পূর্বে হইলে বোধ হয় এখন হাসিতেন, কিন্তু আজ চক্ষুকোণে জল আসিয়া পড়িল। এইসময় বাহিরে ভৃত্য ডাকিয়া বলিল, বাবু, গাড়ি সাজাবে?

হাঁ, সাজাও।—ছিঃ ছিঃ—এমন বিষও মানুষ ইচ্ছা করিয়া খায়!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তথাপি মালতী আপনার কক্ষে বসিয়া 'সীতার বনবাস' পড়িতেছে। অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক চোখ মুছিয়াছে, তথাপি পড়িতেছে। আহা! বড় ভাল লাগে—কিছুতেই ছাড়া যায় না।

এইসময় বাহিরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বড় মোটা গলায় কে ডাকিল, ললনা!

মালতী শিহরিয়া উঠিল—হাতের 'সীতার বনবাস' নীচে পড়িয়া গেল।

ললনা!

মালতীর বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—কে?

এবার হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, ললনা!

তুমি?

হাঁ, আমি; কিন্তু তুমি ধরা পড়িয়াছ। নাম জাল করিয়াছিলে কেন?

কৈ?

আবার মিছে কথা? তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিলেন, সমস্ত শুনিয়া আসিলাম। ললনা ছিলে—মালতী হইয়া বসিয়াছ।

কোথায়?

কলিকাতায়।

কলিকাতায় আমাকে ত কেহ জানে না।

সু। সেখানে কেহ তোমাকে জানে না বটে, কিন্তু যে জানে সে হলুদপুর হইতে আসিয়াছিল।

মা। কে?

সু। তোমার সদাদাদা সেই নোট ফিরাইয়া দিতে অঘোরবাবুর নিকট আসিয়াছিলেন।

মা। নোট ফিরাইয়া দিতে?

সু। হাঁ—

মা। সদাদাদা?

সু। সে-ই।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কথা কও না যে?

মা। সদাদাদা কেমন আছেন?

সু। ভাল আছেন। তোমার মা ভাল আছেন—তাঁর অবস্থা এখন আর মন্দ নয়, তাই তোমার দান গ্রহণ করিবেন না। সদানন্দবাবু তাঁহাদের অবস্থা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

মা। আমার নাম ললনা—সে কথা কেমন করিয়া জানিলে?

সু। সদানন্দ বলিয়াছেন। তাঁহারা সকলে জানেন তুমি জলে ডুবিয়া আত্মঘাতী হইয়াছ।

মালতী নিশ্বাস ফেলিল।

সু। কিন্তু আমি বলিয়াছি যে তুমি বাঁচিয়া আছ এবং সুখে আছ।

মা। তা কেন বলিলে?

সু। তবে কি মিথ্যা বলিব? তুমি বাঁচিয়াও আছ, আর আমার বোধ হয় সুখেও আছ—সুখে নাই কি?

মা। আছি—কিন্তু সেকথা কি সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

সু। না; আমি আপনি বলিয়াছি এবং তোমার মাকেও একথা বলিতে বলিয়াছি।

মা। আমি টাকা পাঠাইয়াছিলাম—তাহাও বলিয়াছ কি?

সু। বলিয়াছি।

মা। তুমি আমার মাথা খাইয়া আসিয়াছ। সে পাগল, একথা গ্রামময় বলিয়া বেড়াইবে। যদি তাহাদিগের নিকট মরিয়াই ছিলাম, তবে কেন বাদ সাধিয়া আবার বাঁচাইলে?

সুরেন্দ্রনাথ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিলেন; তাহার পর বলিলেন, যাহাকে তোমরা পাগল মনে করিতে, সে বাস্তবিক একতিলও পাগল নয়। হয়ত সে কখন পাগল ছিল, কিন্তু সেদিন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা হলুদপুরে তুমি কখন বাঁচিবে না। তুমি যখন আত্মগোপন করিয়াছ, সে কখন তাহা প্রকাশ করিবে না।

মা। কেমন করিয়া জানিলে?

সু। জানিয়াছি! যখন, তোমার জীবিত থাকার কথা তোমার মাকে জানাইতে বলিলাম, সে বলিল—ললনা লজ্জার কাজ কখন করিবে না, আত্মগোপন কখন করিবে না—সে বাঁচিয়া নাই, মরিয়াছে। আমি বলিলাম, সে সুখে আছে। সে বলিল, সে স্বর্গে গিয়াছে। আমি বলিলাম, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান। সে বলিল, আমি যাই—যদি কখন তার দেখা পান, বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে। মালতী, আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম; যে বিষ আমি খাইয়াছি—সে বিষ সেও খাইয়াছে। আমার সুধা হইয়াছে তাহার প্রাণহন্তারক হইয়াছে।

মালতী অধোবদন হইয়া শুনিতেছিল; বড় কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু লজ্জা করিতেছিল।

আর একটা সুখবর—তোমার ছলনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মালতী মুখ তুলিয়া বলিল, হইয়াছে? কোথায়, কার সহিত?

ঐ গ্রামেই। শারদাচরণ না কে—তাহারি সহিত।

মালতী বুঝিতে পারিল। মনে মনে তাহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিল, বিবাহ করে ত সে-ই করিবে, তাহা কতক জানিতাম।

সু। কেমন করিয়া জানিলে? পূর্বে হইতে কি কথাবার্তা ছিল?

মা। না—কথাবার্তা কিছুই ছিল না, তবে আমি এক সময়ে ছলনাকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন পিতার ভয়ে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে আমি মরিয়াছি, এই ভাবিয়া দয়া করিয়া বোধ হয় বিবাহ করিয়াছেন।

সু। পিতার ভয় কেন?

মা। তিনি অতিশয় অর্থপিপাসু লোক। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থলাভ করিবেন।

সু। তাহা বদলাইল কেন? তোমার পিতা নিশ্চয়ই অর্থ দিতে পারেন নাই।

মা। সম্ভব। মালতী মনে ভাবিল, যে ভালবাসায় তুমি ধরা দিয়াছ শারদাচরণের সেই ভালবাসায় শারদাচরণের পিতাও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিল না।

মালতী চিন্তা করিবার আজ অনেক দ্রব্য পাইয়াছে, তাই বেশি কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু মনে পড়িল মাধবের কথা। বলিল, মাধব—তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

সে ভাল আছে।

মালতীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে জাগিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিল। ভাবিল, সদানন্দ আসিয়াছিল—টাকা ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল; আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। আমিও আর পাঠাইব না। তারপর মনে করিল—শারদাচরণ! পূর্বে শত ধন্যবাদ দিয়াছিল, এখন সহস্র ধন্যবাদ তাহাকে মনে মনে দিল—মনে মনে বলিল, তুমি আমার অপরাধ লইও না, তখন তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আর কখন তোমাকে হয়ত দেখিতে পাইব না, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন এ দয়া ভুলিব না। অন্তরে চিরদিন তোমাকে ভক্তি করিয়াছি, চিরদিন করিব।

সে খুঁজিয়া দেখিল শারদার অস্পষ্ট ছায়া এখনও সে হৃদয় হইতে পূর্ণ বিলীন

হইয়া যায় নাই। আজ আরো স্পষ্টীকৃত হইল। মনে মনে বলিল, স্বামী বলেন—সে সদানন্দ; কিন্তু সে শারদা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে সদানন্দ ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথটা সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল। পথে যে-কেহ ডাকিয়া বলিল, দাদাঠাকুর কোত্থেকে? দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ'। —কোথায় গেছলে? সদানন্দ দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাড়ি যাচ্ছি। তাহার হালের গরু ততক্ষণ একজনের বেগুনক্ষেতে ঢুকিয়াছে, সে গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, সদানন্দও পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। সে গরু ফিরাইয়া আনিয়া আপনা-আপনি বলিল, ক্ষেপার মনটা আজ দেখচি বড় ভাল নয়, বেশ লোকটি!

রামুমামা নন্দ ময়রার দোকানঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছিলেন, এক পা ধূলা সদানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, ও সদানন্দ, চার-পাঁচদিন তোমাকে যে দেখিনি, ছিলে কোথা?

সদানন্দ না ফিরিয়া পশ্চাৎদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ওখানে!

কোথায়? বামুনপাড়ায়?

হুঁ।

এতদিন ধরে?

হুঁ। সদানন্দ হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।

রামুমামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর, কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

সদানন্দ সেকথা শুনিল না বা শুনিতে পাইল না, একেবারে শুভদার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নোটখানা নিকটে রাখিয়া বলিল, কোন সন্ধান হইল না।

শুভদা বলিলেন, তবে মিথ্যে ক্লেশ পাইলে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

শুভদা আবার বলিলেন, তবে এ টাকা লইয়া কি করিব?

স। আপনার যাহা ইচ্ছা। টাকা আপনার, ইচ্ছা হয় বিলাইয়া দিন, নাহয় রাখিয়া দিন, যদি কখন সন্ধান পাওয়া যায়, ফিরাইয়া দিবেন।

শুভদা অগত্যা তাহা বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিল।

সদানন্দ বলিল, হারাণকাকা কোথায়?

শুভদা পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া বলিল, শুইয়া আছেন।

কোথাও যান নাই?

গিয়াছিলেন—এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ঝড়বৃষ্টি করিয়া আসিল। শুভদা সকাল সকাল রন্ধনাদি শেষ করিয়া লইলেন। হারাণবাবু আহারাদি করিয়া বলিলেন, কিছু পয়সা দাও।

আজ আর কোথাও যেও না; আকাশে মেঘ কোরে আছে, রাত্রে যদি জল হয়?

হোলেই বা।

তা হ'লে ফিরে আসতে কষ্ট হবে।

কিছু না। আজ অনেক কাজ আছে। যেতেই হবে।

কাজ যাহা ছিল শুভদা তাহা জানিত। তথাপি কহিল, আজ একাদশী; ঠাকুরঝির আবার অসুখ হয়েছে—অঘোরে পড়ে আছেন।

হারাণ তাহা শুনিল না। ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, তালি-দেওয়া চটি-জুতা হাতে লইয়া, কোঁচা গুঁজিয়া জল-কাদার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, স্বভাব!

সে যথার্থই অনুমান করিয়াছিল; রাত্রি একপ্রহর না হইতেই আবার বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আজকাল প্রতি রাত্রে শুভদার অল্প অল্প জ্বর হইত; কিন্তু একথা কাহাকেও বলা দূরে যাউক, সে একরূপ নিজেকেই জানিতে দিত না। রাত্রে যখন শীত করিয়া জ্বর আসিত, শুধু তখনই মনে পড়িত।

বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল, হাতের নিকট যাহা পাইল তাহাই টানিয়া গায়ে দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে শুভদার তন্দ্রাবোধ হইল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত শরীরে তন্দ্রার মোহে শুভদার বোধ হইল, কে যেন দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া জীর্ণ অর্গলটা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার পরেই খট্ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু চাহিয়া সেই আলোকে দেখিল, একজন লোক কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহার হস্তে বংশযষ্টি, সমস্ত বদন ও অঙ্গ মসীলিপ্ত, তাহার উপর শাদা-শাদা চুনের ফোঁটা। শুভদা শিহরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কে গো!

চুপ! সে বজ্রগম্ভীরস্বরে শুভদা আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে বার-দুই ঠকঠক করিয়া লাঠির আওয়াজ করিয়া শয্যার নিকটে আসিয়া কহিল, তোর বাক্সর চাবি দে। গলাটা বড় মোটা, ভারী। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় বুঝি বা সে চেষ্টা করিয়া এরূপ মোটা গলায় কথা কহিতেছে।

শুভদা কথা কহিল না।

সে আবার সেইরূপ স্বরে, লাঠিটা আর একবার সানের উপর ঠুকিয়া বলিল, চাবি দে, না হলে গলা টিপে মেরে ফেলব।

এবার শুভদা উঠিয়া বসিল, বালিশের নীচে হইতে চাবির থোলো লইয়া নিকটে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলিল, আমার বড় বাক্সের ডান দিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, তাই নিও—বাঁ দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে, তাতে যেন হাত দিও না। যেরূপ শান্তভাবে সে কথাগুলি বলিল, তাহাতে বোধ হয় না যে, আর তাহার তিলমাত্রও ভয় আছে।

চুনকালি-মাখা পুরুষ চাবি লইয়া বড় বাক্স খুলিল, বাম দিকে মোটে হস্তনিক্ষেপ করিল না, ডান দিকের খোপ হইতে নোট লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল। শুভদার কথামত সে যেরূপ স্বচ্ছন্দে বাক্স খুলিল এবং ডান দিকের খোপের সন্ধান করিয়া লইল তাহাতে বোধ হয় যেন এসকল তাহার বিশেষ জানাশুনা আছে।

সে চলিয়া যাইবার সময় শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; মৃদু মৃদু কহিল, নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে--একটু সাবধানে ভাঙ্গাইয়ো।

নব-বিধান

এক

এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ঘোষাল পত্নীবিয়োগান্তে পুনশ্চ সংসার পাতিবার সূচনাতেই যদি না বন্ধুমহলে একটু বিশেষ রকমের চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া যাইতেন ত এই ছোট্ট গল্পের রূপ এবং রঙ বদলাইয়া যে কোথায় কি দাঁড়াইত, তাহা আন্দাজ করাও শক্ত। সুতরাং ভূমিকায় সেই বিবরণটুকু বলা আবশ্যক।

শৈলেশ্বর কলিকাতার একটা নামজাদা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক,—বিলাতি ডিগ্রী আছে। বেতন আট শত। বয়স বত্রিশ। মাস-পাঁচেক পূর্বে বছর-নয়েকের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুরুষানুক্রমে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় বাস। বাড়ির মধ্যে ওই ছেলেটি ছাড়া, বেহারা-বাবুর্চি, সহিস-কোচম্যান প্রভৃতিতে প্রায় সাত-আটজন চাকর। ধরিতে গেলে সংসারটা একরকম এইসব চাকরদের লইয়াই।

প্রথমে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছাই ছিল না। ইহা স্বাভাবিক। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও নূতনত্ব নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভবানীপুরের ভূপেন বাঁড়ুজ্যের মেজমেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে এবং সে দেখিতে ভাল। এরূপ কৌতূহলও সম্পূর্ণ বিশেষত্ব-হীন, তথাপি সেদিন সন্ধ্যাকালে শৈলেশ্বরেরই বৈঠকখানায় চায়ের বৈঠকে এই আলোচনাই উঠিয়া পড়িল। তাহার বন্ধুসমাজের ঠিক ভিতরের না হইয়াও একজন অল্প বেতনের ইস্কুল-পণ্ডিত ছিল। চা রসের পিপাসাটা তাহার কোন বড় বেতনের প্রফেসারের চেয়েই ন্যূন ছিল না। পাগলাটেগোছের বলিয়া প্রফেসাররা তাহাকে দিগ্‌গজ বলিয়া ডাকিতেন। সে হিসাব করিয়াও কথা বলিত না, তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিত না। দিগ্‌গজ নিজে ইংরাজী জানিত না, মেয়েমানুষে একজামিন পাশ করিয়াছে শুনিলে রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। ভূপেনবাবুর কন্যার প্রসঙ্গে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে খেলেন; আবার বিয়ে! সংসার করতেই যদি হয় ত উমেশ ভট্‌চায্যির মেয়ে দোষ্টা করলে কি শুনি? ঘর করতে হয় ত তাকে নিয়ে ঘর করুন।

ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু জানিতেন না, তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া গেলেন। দিগ্‌গজ কহিল, সে বেচারার দিকে ভগবান যদি মুখ তুলে চাইলেন ত তাকেই বাড়িতে আনুন—আবার একটা বিয়ে করবেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ! পাশ হয়ে ত সব হবে! রাগে তাহার দুই চক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল। শৈলেশ্বর নিজেও কোনমতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, আরে, সে যে পাগল দিগ্‌গজ!

কেহ কাহাকেও পাগল বলিলে দিগ্‌গজের আর হুঁশ থাকিত না, সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল সব্বাই? আমাকেও লোকে পাগল বলে—তাই বলে আমি পাগল!

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা চাপা পড়িল না। হাসি থামিলে শৈলেশ লজ্জিতমুখে ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিল, আমার জীবনে সে একটা অত্যন্ত unfortunate ব্যাপার। বিলাতে যাবার আগেই আমার বিয়ে হয়, কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে বাবার কি একটা নিয়ে ভয়ানক বিবাদ হয়ে যায়। তা ছাড়া মাথা খারাপ বলে বাবা তাঁকে বাড়িতে রাখতেও পারেন নি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমি আর দেখিনি। এই বলিয়া শৈলেশ জোর করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিল, ওহে দিগ্‌গজ! বুদ্ধিমান! তা' নাহলে কি তাঁরা একবার পাঠাবার চেষ্টাও করতেন না? চায়ের মজলিসে গরহাজির ত কখনো দেখলুম না, কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এলে এ আশা আর করো না। গঙ্গাজল আর গোবর ছড়ার সঙ্গে তোমাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে তবে ছাড়বেন, এ নোটিশ তোমাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখলুম।

দিগ্‌গজ জোর করিয়া বলিল, কখ্‌খনো না!

কিন্তু এ কথায় আর কেহ যোগ দিলেন না। ইহার পরে সাধারণগোছের দুই-চারিটি কথাবার্তার পরে রাত্রি হইতেছে বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রায় এমনি সময়েই প্রত্যহ সভা ভঙ্গ হয়, হইলও তাই। কিন্তু আজ কেমন একটা বিষণ্ণ ম্লান ছায়া সকলের মুখের 'পরেই চাপিয়া রহিল—সে যেন আজ আর ঘুচিতে চাহিল না।

দুই

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না, বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কৃত করিয়া গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না, অপরদিকে তেমনি লজ্জারও অবধি রহিল না। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠার বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী ঊষার বয়স তখন মাত্র এগার। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালীপদবাবু অল্পমূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনোমালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে একপ্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেন না। ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন; অযাচিত, কোনমতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই-সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, বাড়ি গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর-চারেক পরে যখন যথার্থই বাড়ি ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি দুই-ই বদলাইয়া গেছে। অতএব আর-একজন বিলাতফেরতের বিলাতি আদব-কায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে, শৈলেশের পিতা কালীপদবাবুও মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালঙ্কারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এতকালের মধ্যে ও-বাড়ির কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপতপ, পূজো-অর্চনা, গঙ্গাজল ও গোবর লইয়া কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগলামিতে ভায়েরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার শ্রুতিসুখকর নহে; কেবল একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয় না। দিলে শৈলেশের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্নামের আভাসমাত্রও কোন সূত্রে আজও তাহাকে শুনিতে হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল : ভূপেনবাবুর শিক্ষিতা কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ না করিলেই নয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে আনিয়া একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি গৃহিণীপনার ভার দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। বিশেষতঃ সোমেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপে বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ি শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিস্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু ইহা ত চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। লোকটাকে অনেকদিন সে অনেক চা ও বিস্কুট খাওয়াইয়াছে, সে এমনি করিয়া তাহার শোধ দিল!

শৈলেশ আসলে লোক মন্দ ছিল না, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্বল-প্রকৃতির মানুষ। তাই সত্যকার লজ্জার চেয়ে চক্ষুলজ্জাই তাহার প্রবল ছিল। বিদ্যাভিমানের সঙ্গে আর একটা বড় অভিমান তাহার এই ছিল যে, সে জ্ঞানতঃ কাহারও প্রতি লেশমাত্র অন্যায় বা অবিচার করিতে পারে না। বন্ধুরাও মুখে না বলিলেও মনে মনে যে তাহাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপরাধী করিয়া রাখিবে, ইহা বুঝিতে বাকী ছিল না—এই অখ্যাতি সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সারারাত্রি চিন্তা করিয়া ভোর নাগাদ তাহার মাথায় সহসা অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির উদয় হইল। তাহাকে আনিতে পাঠাইলে ত সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমতঃ সে আসিবে না। যদি বা আসে ম্লেচ্ছর সংসার হইতে সে দুদিনেই আপনি পলাইবে। তখন কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। এই দু-পাঁচদিন সোমেনকে তাহার পিসির বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অন্যত্র কোথাও গা-ঢাকা দিয়া থাকিলেই হইল। এত সোজা কথা কেন যে তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল। এই ত ঠিক!

কলেজ হইতে সে সাতদিনের ছুটি লইল। এলাহাবাদে একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজের যাওয়ার কথা তাঁহাকে তার করিয়া দিল এবং বিভাকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, সে নন্দীপুর হইতে ঊষাকে আনিতে পাঠাইতেছে, যদি আসে ত সে যেন আসিয়া সোমেনকে শ্যামবাজারে লইয়া যায়। এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে তাহার দিন-সাতেক বিলম্ব হইবে।

শৈলেশের এক অনুগত মামাত ভাই ছিল, সে মেসে থাকিয়া সদাগরী অফিসে চাকরি করিত। তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, ভূতো, তোকে কাল একবার নন্দীপুরে গিয়ে তোর বৌদিকে আনতে হবে।

ভূতনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, বৌদিটা আবার কে?

তুই ত বরযাত্রী গিয়েছিলি, তোর মনে নেই? উমেশ ভট্‌চায্যির বাড়ি?

মনে খুব আছে, কিন্তু কেউ কারুকে চিনিনে, তিনি আসবেন কেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ কহিল, না আসে নেই—নেই। তোর কি? সঙ্গে বেহারা আর ঝি যাবে। আসবে না বললেই ফিরে আসবি।

ভূতো আশ্চর্য হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা যাব। কিন্তু মারধোর না করে।

শৈলেশ তাহার হাতে খরচপত্র এবং একটা চাবি দিয়া কহিল, আজ রাত্রের ট্রেনে এলাহাবাদে যাচ্ছি। সাত দিন পরে ফিরব। যদি আসে এই চাবিটা দিয়ে ওই আলমারিটা দেখিয়ে দিবি। সংসার খরচের টাকা রইল। পুরো একমাস চলা চাই।

ভূতনাথ রাজী হইয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন মেজদা? খাল খুঁড়ে কুমীব আনচ না ত?

শৈলেশ চিন্তিতমুখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আসবে না নিশ্চয়। কিন্তু লোকতঃ ধর্মতঃ একটা কিছু করা চাই ত! শ্যামবাজারে একটা খবর দিস। সোমেনকে যেন নিয়ে যায়।

রাত্রের পাঞ্জাব মেলে শৈলেশ্বর এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

তিন

দিনকয়েক পরে একদিন দুপুরবেলা বাটীর দরজায় আসিয়া একখানা মোটর থামিল এবং মিনিট-দুই পরেই একটি বাইশ-তেইশ বছরের মহিলা প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের কার্পেটে বসিয়া সোমেন্দ্র একখানা মস্ত বাঁধানো এ্যাল্‌বাম হইতে তাহার নূতন মাকে ছবি দেখাইতেছিল; সেই-ই মহা আনন্দে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, মা, পিসিমা।

ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরনে নিতান্ত সাদাসিধা একখানা রাঙাপেড়ে শাড়ি, হাতে এবং গলায় সামান্য দুই-একখানা গহনা, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক্ হইল।

প্রথমে ঊষাই কথা কহিল। একটু হাসিয়া ছেলেকে বলিল, পিসিমাকে প্রণাম করলে না বাবা?

সোমেনের এ শিক্ষা বোধ করি নূতন, সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল। ঊষা কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঠাকুরঝি, ব'সো!

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে এলেন?

ঊষা বলিল, সোমবারে এসেচি, আজ বুধবার—তাহলে তিন দিন হ'ল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে হবে কেন ভাই, ব'সো।

বিভা ভাব করিতে আসে নাই, বাড়ি হইতেই মনটাকে সে তিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, কহিল, বসবার সময় নেই আমার—ঢের কাজ। সোমেনকে আমি নিতে এসেচি।

কিন্তু এই রূক্ষতার জবাব ঊষা হাসিমুখে দিল। কহিল, আমি একলা কি করে থাকব ভাই? সেখানে বৌয়েদের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ। কেউ একজন কাছে না থাকলে ত আমি বাঁচিনে ঠাকুরঝি। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিল।

এই হাসির উত্তর বিভা কটুকণ্ঠেই দিল। ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বাবা বলেচেন আমার ওখানে গিয়ে থাকতে। আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই সোমেন—যাও ত শীগ্‌গির কাপড় পরে নাও; আমাকে আবার একবার নিউ মার্কেট ঘুরে যেতে হবে।

দুজনের মাঝখানে পড়িয়া সে যেন ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, মা যে যেতে বারণ করচেন পিসিমা? তাহার বিপদ দেখিয়া ঊষা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমাকে যেতে আমি বারণ করচি নে বাবা, আমি শুধু এই বলচি যে, তুমি চলে গেলে একলা বাড়িতে আমার বড় কষ্ট হবে।

ছেলেটি মুখে ইহার জবাব কিছু দিল না, কেবল অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বিমাতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুলের মধ্য দিয়া আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে ঊষা হাসিয়া কহিল, ও যেতে চায় না ঠাকুরঝি।

লজ্জায় ও ক্রোধে বিভার মুখ কালো হইয়া উঠিল, এবং অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস, আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো।

ঊষার ঠোঁটের কোণ-দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, আমরা বুড়োমানুষেই নিজের উচিত ঠিক করে উঠতে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ! ও বোঝেই বা কতটুকু। আর অন্যায় প্রশ্রয়ের কথা যদি তুললে ঠাকুরঝি, আমি অনেক ছেলে মানুষ করেচি, এ-সব আমি সামলাতে জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বিভা কঠোর হইয়া কহিল, দাদাকে তা হলে চিঠি লিখে দেব।

ঊষা কহিল, দিয়ো। লিখে দিয়ো যে, তাঁর এলাহাবাদের হুকুমের চেয়ে আমার কলকাতার হুকুমটাই আমি বড় মনে করি। কিন্তু দেখ ভাই বিভা, আমি তোমার সম্পর্কে এবং বয়সে দুই-ই বড়। এই নিয়ে আমার উপরে তুমি অভিমান করতে পারো না। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কহিল, আজ তুমি রাগ করে একবার বসলে না পর্যন্ত, কিন্তু আর একদিন তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৌদিদির কাছে এসে বসবে, এ কথাও আজ তোমাকে বলে রাখলুম।

বিভা এ কথার কোন উত্তর দিল না, কহিল, আজ আমার সময় নেই—নমস্কার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গাড়িতে বসিয়া হঠাৎ সে উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, বারান্দায় রেলিঙ ধরিয়া ঊষা সোমেনকে লইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চার

সাত দিনের ছুটি, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ-দুই এলাহাবাদে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা শৈলেশ্বর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখের নীচে বারান্দায় বসিয়া সোমেন কতকগুলো কাঠি, রঙ-বেরঙের কাগজ, আঠা, দড়ি ইত্যাদি লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল, পিতার আগমন প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু দেখিবামাত্র সংবর্ধনা করিল, এবং লজ্জিত আড়ষ্টভাবে পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করার ব্যাপারে এখনও সে পটুত্ব লাভ করে নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। খুব মন্দ না লাগিলেও শৈলেশ বিস্মিত হইল। কিন্তু ঐ কাগজ-কাঠি-আঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, ও-সব তোমার কি হচ্চে সোমেন?

সোমেন রহস্যটা এককথায় ফাঁস করিল না, বলিল, তুমি বল ত বাবা, ও কি?

বাবা বলিলেন, আমি কি করে জানব?

ছেলে হাততালি দিয়া মহা আনন্দে কহিল, আকাশ-প্রদীপ।

আকাশ-প্রদীপ! আকাশ-প্রদীপ কি হবে?

ইহার অদ্ভুত বিবরণ সোমেন আজ সকালেই শিখিয়াছে, কহিল, আজ সংক্রান্তি, কাল সন্ধ্যাবেলায় উই উঁচুতে বাঁশ বেঁধে টাঙ্গাতে হবে বাবা! মা বলেন, আমার ঠাকুর্দারা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁদের আলো দেখাতে হয়। তাঁরা আশীর্বাদ করেন।

শৈলেশের মেজাজ গরম হইয়াই ছিল, টান মারিয়া পা দিয়া সমস্ত ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিল, আশীর্বাদ করেন! যত সমস্ত কুসংস্কার—যা পড় গে যা বলচি।

তাহার এত সাধের আকাশ-প্রদীপ ছত্রাকার হইয়া পড়ায় সোমেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। উপরে কোথা হইতে অত্যন্ত মিষ্টকণ্ঠের ডাক আসিল, বাবা সোমেন, কাল বাজার থেকে আমি আরও ভাল একটা আকাশ-প্রদীপ তোমাকে কিনে আনিয়ে দেব, তুমি আমার কাছে এস।

সোমেন চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেশ কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীর বিরক্তমুখে তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই ছোট্ট ঘণ্টার শব্দ হইল—টুন্ টুন্ টুন্ টুন্, কেহ সাড়া দিল না।

আবদুল!

আবদুল আসিল না।

গিরিধারী! গিরিধারী!

গিরিধারীর পরিবর্তে বাঙ্গালী চাকর গোকুল গিয়া পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, আজ্ঞে—

শৈলেশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিল, আজ্ঞে? ব্যাটারা মরেচিস?

গোকুল বলিল, আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না? আবদুল কৈ?

গোকুল কহিল, মা তাকে ছুটি দিয়েছেন, সে বাড়ি গেছে।

ছুটি দিয়েচেন! বাড়ি গেছে! গিরিধারী কোথা গেল?

গোকুল জানাইল, সেও ছুটি পাইয়া দেশে চলিয়া গেছে।

শৈলেশ স্তম্ভিত হইয়া কহিল, বাড়িতে কি লোকজন কেউ আর নেই নাকি?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে আর সবাই আছে।

তাই বা আছে কেন? যা দূর হ—

শৈলেশ্বর নিজেই তখন জুতা খুলিল, কোট খুলিয়া টেবিলের উপরেই জড় করিয়া রাখিল, আলনা হইতে কাপড় লইয়া ট্রাউজার খুলিয়া দূরের একটা চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে সেটা নীচে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল; নেকটাই, কলার প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া নিজের চৌকিতে গিয়া বসিতেই ঠিক সম্মুখে টেবিলের উপর ছোট্ট একটি খাতা তাহার চোখে পড়িল—মলাটে লেখা, সংসার খরচের হিসাব। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। দৈনিক খরচের অঙ্ক—মাছ এত, শাক এত, চাল এত, ডাল এত,—হঠাৎ দ্বারের পর্দা সরানর শব্দে চকিত হইয়া দেখিল, কে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে। সে আর যেই হউক দাসী নয়, তাহা চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শৈলেশ হিসাবের খাতার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। যে আসিল সে তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কি এত বেলায় আবার চা খাবে নাকি? কিন্তু তাহলে আর ভাত খেতে পারবে না।

ভাত খাব না!

না খাও, হাতমুখ ধুয়ে ওপরে চল। অবেলায় স্নান করে আর কাজ নেই, কিন্তু জলখাবার ঠিক করে আমি কুমুদাকে সরবৎ তৈরি করতে বলে এসেচি। চল।

এখন থাক।

ওগো আমি ঊষা—বাঘ-ভাল্লুক নই। আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে কেউ তোমাকে ছি ছি করবে না।

শৈলেশ কহিল, আমি কি বলেচি তুমি বাঘ-ভাল্লুক?

তবে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন?

আমার কাজ ছিল। তুমি বিভার সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন?

ঊষা কহিল, ও তোমার বানানো কথা, তোমাকে সে কখ্খনো লেখেনি আমি ঝগড়া করেচি।

শৈলেশ কহিল, তুমি আবদুলকে তাড়িয়েচ কেন?

কে বলেচে তাড়িয়েচি? সে এক বছরের মাইনে পায়নি, বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করছিল; আমি মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েচি।

শৈলেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, সমস্ত চুকিয়ে দিয়েচ? তা হলে সে আর আসবে না। গিরিধারী গেল কেন?

ঊষা কহিল, এ ত তোমার ভারি অন্যায়! চাকর-বাকরদের মাইনে না দিয়ে আটকে রাখা কেন, তাদের কি বাড়ি-ঘর-দোর নেই নাকি? আমি তাকে মাইনে দিয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

শৈলেশ কহিল, বেশ করেচ। এইবার বশিষ্ঠমুনির আশ্রম বানিয়ে তোলো। সে হিসাবের পাতার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিতেছিল, হঠাৎ একটা বড় অঙ্ক তাহার চোখে পড়িতেই চমকিয়া কহিল, এটা কি? চার-শ' ছ টাকা---

ঊষা উত্তর দিল, ও টাকাটা মুদির দোকানে দিয়েচি। এখনো বোধ করি শ'-দুই আন্দাজ বাকী রইল, বলেচি আসচে মাসে দিয়ে দেব।

শৈলেশ অবাক হইয়া বলিল, ছ-শ' টাকা মুদির দোকানে বাকী?

ঊষা হাসিয়া কহিল, হবে না? কখনো শোধ করবে না, কখনো হিসেব দেখতে চাইবে না—কাজেই দুবছর ধরে এই টাকাটা জমিয়ে তুলেচ।

শৈলেশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, তুমি কি এই দুবছরের হিসেব দেখলে নাকি?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নইলে আর উপায় ছিল কি?

শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপরে যে লজ্জার ছায়া পড়িতেছে, এ কথা এই পাঁচ মিনিটের পরিচয়েও ঊষার চিনিতে বাকী রহিল না, জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ বল ত?

শৈলেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাবচি টাকা যা ছিল, সব ত খরচ করে ফেললে, কিন্তু মাইনে পেতে পনর-ষোল দিন বাকী!

ঊষা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কি ছেলেমানুষ যে, সে হিসেব আমার নেই? পনর দিন কেন, একমাসের আগেও আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসব না। কিন্তু কি কাণ্ড করে রেখেচ বল ত? গোয়ালা বলছিল, তার প্রায় দেড়শ' টাকা পাওনা। ধোপা পাবে পঞ্চাশ টাকার ওপর, আর দর্জির দোকানে যে কত পড়ে আছে, সে শুধু তারাই জানে। আমি হিসেব পাঠাতে বলে পাঠিয়েছি।

শৈলেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, করেচ কি? তারা হয়ত হাজার টাকাই পাওনা বলবে—কিন্তু দেবে কোথা থেকে?

ঊষা নিশ্চিন্তমুখে কহিল, একবারেই দিতে পারব তা ত বলিনি, আমি তিন-চার মাসে শোধ করব। আর কারও কাছে ত কিছু ধার করে রাখোনি? আমাকে লুকিয়ো না।

শৈলেশ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমলা যেতে একজনের কাছে হ্যাণ্ডনোটে দু হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, একটা টাকা সুদ পর্যন্ত দিতে পারিনি।

ঊষা গালে হাত দিয়া বলিল, অবাক কাণ্ড! কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমিও দেখচি এক বছরের আগে আর আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেবে না। কিন্তু আর কিছু নেই ত?

শৈলেশ বলিল, বোধ হয় না। সামান্য কিছু থাকতেও পারে, কিন্তু আমি ত ভেবেচি, এ জন্মে ও আর শোধ দিতে পারব না।

ঊষা কহিল, তুমি কি সত্যিই কখনো ভাবো?

শৈলেশ বলিল, ভাবিনে? কতদিন অর্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যেন দম আটকে এসেচে। মাইনেতে কুলোয় না, প্রতি মাসেই টানাটানি হয়, কিন্তু আমাকে তুমি ভুলিয়ো না। যথার্থ-ই কি আশা কর শোধ করতে পারবে?

ঊষার চোখের কোণ সহসা সজল হইয়া আসিল। যে স্বামীকে সে মাত্র অর্ধঘণ্টা পূর্বেও চিনিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহারই জন্য হৃদয়ের সত্যকার বেদনা অনুভব করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, তুমি বেশ মানুষ ত! সংসার করতে ধার হয়েচে, শোধ দিতে হবে না? কিন্তু এই ক-টা টাকা দিযে ফেলতে আমার ক-দিন লাগবে'

সকলের বড় কষ্ট হবে—

ঊষা জোর দিয়া বলিল, কারও না। তোমরা হয়ত টেরও পাবে না কোথাও কোন পরিবর্তন হয়েচে।

শৈলেশ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, অনেক দিনের মেঘলা আকাশের কোন্ একটা ধার দিয়ে যেন তাহার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

পাঁচ

খাম ও পোস্টকার্ডে বিস্তর চিঠিপত্র জমা হইয়াছিল, এই-সমস্ত পড়িয়া জবাব দিতে, সাময়িক কাগজগুলি একে একে খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে, আরও এমনি সব ছোটখাটো কাজ শেষ করিতে শৈলেশের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাহার কর্মনিরত একাগ্র মুখের চেহারা বাহির হইতে পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিলে এই কর্তব্যনিষ্ঠ ও একান্ত মনঃসংযোগের প্রতি আনাড়ী লোকের মনেব মধ্যে অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মাইবারই কথা। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা এই গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, এক্ষেত্রে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, অধ্যাপক বলিয়াই যে সংসারে ছলনা করার কাজে হঠাৎ কেহ তাঁহাদিগকে হঠাইয়া দিবে এ আশা দুরাশা। হাতের কাজ সমাপ্ত করিয়া শৈলেশবর নিজেই সুইচ টিপিয়া লইয়া আলো জ্বালাইয়া মস্ত মোটা একটা দর্শনের বই লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। যেন তাহার নষ্ট করিবার মুহূর্তের অবসর নাই, অথচ সন্ধ্যার পরে এরূপ কুকর্ম করিতে পূর্বে তাহাকে কোনদিন দেখা যাইত না।

এইরূপে যখন সে অধ্যয়নে নিমগ্ন, বাহিরে পর্দার আড়াল হইতে কুমুদা ডাকিয়া কহিল, বাবু, মা বলে দিলেন আপনার খাবার দেওয়া হয়েচে, আসুন।

শৈলেশ ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ ত আমার খাবার সময় নয়! এখনো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি।

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে তুলে রাখতে বলে দেব?

শৈলেশ কহিল, তুলে রাখাই উচিত। আবদুল না থাকাতেই এই সময়ের গোলযোগ ঘটেচে।

দাসী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া বলিল, সমস্ত তোলাতুলি করাও হাঙ্গামা, আচ্ছা, বল গে আমি যাচ্চি।

আজ খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত নয়, উপরে আসিয়া দেখিল, তাহার শোবার ঘরের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় আসন পাতিয়া অত্যন্ত স্বদেশী প্রথায় স্বদেশী আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, সাবেক দিনের রেকাবি গেলাস বাটি প্রভৃতি মাজাধোয়া হইয়া বাহির হইয়াছে—থালার তিন দিক ঘেরিয়া এই-সকল পাত্রে নানাবিধ আহার্য থরে থরে সজ্জিত, অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ঊষা, এবং তাহাকে ঘেঁষিয়া বসিয়াছে সোমেন।

শৈলেশ আসনে বসিয়া কহিল, তোমাকে ত সঙ্গে খেতে নেই আমি জানি, কিন্তু সোমেন? তাকেও খেতে নেই নাকি?

ইহার উত্তর ছেলেই দিল, আমি রোজ মার সঙ্গে খাই বাবা।

শৈলেশ আয়োজনের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এত-সব রাঁধল কে?

তুমি নাকি?

ঊষা কহিল, হাঁ।

শৈলেশ কহিল, বামুনটাও নেই বোধ হয়। যতদূর মনে আছে তার মাইনে বাকী ছিল না—তাকে কি তা হলে এক বছরের আগাম দিয়েই বিদায় করলে?

ঊষা মুখের হাসি গোপন করিয়া কহিল, দরকার হলে আগাম মাইনেও চাকরদের দিতে হয়, কেবল বাকী রাখলেই চলে না। কিন্তু সে আছে, তাকে ডেকে দেব নাকি?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, থাক। তাকে দেখবার জন্যে আমি ঠিক উতলা হয়ে উঠিনি, তাকেও মাঝে মাঝে রাঁধতে দিও, নইলে যা কিছু শিখেছিল ভুলে গেলে বেচারার ক্ষতি হবে।

আহার করিতে বসিয়া শৈলেশের কত যে ভাল লাগিল তাহা সে-ই জানে। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন—হঠাৎ সেই দিনের কথা মনে পড়িল। পাশের বাটিটা টানিয়া লইয়া কহিল, দিব্যি গন্ধ বেরিয়েছে। গোঁসাইরা মাংস খায় না, তারা কাঁঠালের তরকারিতে গরম মসলা দিয়ে গাছ-পাঁঠা বলে খায়। আমার রুচিটা ঠিক অতখানি উচ্চজাতীয় নয়। তাই কাঁঠাল বরঞ্চ আমার সইবে, কিন্তু গাছ-পাঁঠা সইবে না।

ঊষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন হাসির হেতু বুঝিল না, কিন্তু সে মায়ের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গাছ-পাঁঠা কি মা?

প্রত্যুত্তরে ঊষা ছেলেকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীকে শুধু কহিল, আগে খেয়েই দেখ।

শৈলেশ একটুকরা মাংস মুখে পুরিয়া দিয়া কহিল, না, চারপেয়ে পাঁঠাই বটে, চমৎকার হয়েছে, কিন্তু এ রান্না তুমি শিখলে কি করে?

ঊষার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, রান্না কি শুধু তোমার আবদুলই জানে আমার বাবা ছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েত, তুমি কি ভেবেচ আমি গোঁসাইবাড়ি থেকে আসচি!

শৈলেশ কহিল, এই একবাটি খাবার পরে সে কথা মুখে আনে কার সাধ্য! কিন্তু আমার ত সিদ্ধেশ্বরী নেই, এ কি প্রতিদিন জুটবে?

ঊষা বলিল, কিসের অভাবে জুটবে না শুনি?

শৈলেশ কহিল, আবদুলের শোক ত আমি আজই ভোলবার জো করেচি, দেনা—

ঊষা রাগ করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে বলেচি যে, স্বামী-পুত্রকে না খেতে দিয়ে আমি দেনা শোধ করব? দেনার কথা তুমি আর মুখেও আনতে পারবে না বলে দিচ্ছি।

শৈলেশ কহিল, তোমাকে বলে দিতে হবে না দেনার কথা মুখে আনা আমার স্বভাবই নয়। কিন্তু—

ঊষা বলিল, এতে কোন কিন্তু নেই। খাবার জন্যে ত দেনা হয়নি।

কিসের জন্যে যে হ'ল কিছুই ত জানিনে ঊষা—

ঊষা জবাব দিল, তোমার জেনেও কোন দিন কাজ নেই। দয়া করে এইটি শুধু ক'রো, পাগল বলে আবার যেন নির্বাসনে পাঠিয়ো না।

শৈলেশ নিঃশব্দে নতমুখে আহার করিতে লাগিল। সোমেন কহিল, খাবে চল মা। কালকের সেই জটাই পক্ষীর গল্পটা কিন্তু আজ শেষ করতে হবে। জটাইয়ের ছেলে তখন কি করলে মা?

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, জটাইয়ের ছেলে যাই করুক, এ ছেলেটি ত দেখচি তোমাকে একেবারে পেয়ে বসেচে।

ঊষা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিল, এর কারণ কি জান?

ঊষা কহিল, কারণ আর কি। মা নেই, ছেলেমানুষ একলা বাড়িতে—

তা বটে, কিন্তু মা থাকতেও এত আদর বোধ হয় ও কখনো পায়নি!

ঊষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার এক কথা। আর একটু মাংস আনতে বলে দি? আচ্ছা, না খাও—আমার মাথা খাও, মেঠাই দুটো ফেলে উঠো না কিন্তু!

সমস্ত দিন পরে খেতে বসেচ, এ কথা একটু হিসেব কর।

শৈলেশ হাঁ করিয়া ঊষার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। খাবার জন্য এই পীড়াপীড়ি, এমনি করিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল মাথার দিব্যি দেওয়া—যেন বহুকালের পরে ছেলেবেলায় শোনা গানের একটা শেষ চরণের মত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে নিজেও তাহার মায়ের এক ছেলে—অকস্মাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে যেন তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠিল। মেঠাই ফেলিয়া উঠিবার তাহার শক্তিই রহিল না। ভাঙিয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কোন দিকের কোন হিসাবই আর আমি করব না ঊষা, এ ভারটা তোমাকে একেবারে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

ছয়

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া আবার রবিবার ফিরিয়া আসিল, শৈলেশ ঠাহর পাইল না। সকালে উঠিয়াই ঊষা কহিল, তোমাকে রোজ বলচি কথা শুনচো না, আজ যাও ঠাকুরঝির ওখানে। সে কি মনে করচে বল ত? তুমি কি আমার সঙ্গে তার সত্যিই ঝগড়া করিয়ে দেবে নাকি?

শৈলেশ মনে মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিল, কলেজের যে-রকম কাজ পড়েচে

ঊষা বলিল, তা আমি জানি। কলেজ থেকে ফেরবার মুখেও তাই একবার গিয়ে উঠতে পারলে না!

কিন্তু কি রকম ক্লান্ত হয়ে ফিরতে হয়, সে ত জান না? তোমাকে ত আর ছেলে পড়াতে হয় না।

ঊষা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবার যাও। রবিবারেও ছেলে পড়ানোর ছল করলে বিভা জন্মে আর মুখ দেখবে না। এই বলিয়া সে সহিসকে ডাকাইয়া আনিয়া গাড়ি তৈরি করিবার হুকুম দিয়া কহিল, বাবুকে শ্যামবাজারে পৌঁছে দিয়েই তোরা ফিরে আসিস। গাড়িতে আমার কাজ আছে।

যাবার সময় শৈলেশ ছেলেকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে সে বিমাতার গায়ে ঠেস দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমার কাছে যাইতে সে কোনদিনই উৎসাহ বোধ করিত না, বিশেষতঃ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ভয়ের অবধি রহিল না। ঊষা ক্রোড়ের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, সোমেন থাক, ও নাহয় আর একদিন যাবে।

শৈলেশ কহিল, বিভার ওখানে ও যে যেতে চায় না, সে দেখচি তুমি টের পেয়েচ।

তোমাকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করচি, এই বলিয়া সে হাসিমুখে ছেলেকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া শ্যামবাজার হইতে বাড়ি ফিরিতে শৈলেশের বেলা প্রায় আড়াইটা হইয়া গেল। বিভা, ভগিনীপতি ক্ষেত্রমোহন এবং তাহার সতর-আঠার বছরের একটি অনূঢ়া ভগিনীও সঙ্গে আসিলেন। বিভাকে সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা শৈলেশের ছিল না। সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই আসিল। ঊষার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ বহুবিধ। কেবলমাত্র দাদাকেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনাইয়া তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ হয় নাই; এখানে উপস্থিত হইয়া এতগুলি লোকের সমক্ষে নানাপ্রকার তর্কবিতর্কের মধ্যে ফেলিয়া পল্লীগ্রামের কুশিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূকে সে একেবারে অপদস্থ করিয়া দিবে, এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। দাদার সহিত আজ দেখা হওয়া পর্যন্তই সে অনেক অপ্রিয় কঠিন অনুযোগের সহিত এই কথাটাই বারংবার সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, এতকাল পরে এই স্ত্রীলোকটিকে আবার ঘরে ডাকিয়া আনায় শুধু যে মারাত্মক ভুল হইয়াছে, তাহাই নয়, তাহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতিও প্রকারান্তরে অবমাননা করা হইয়াছে। তিনি যাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা কিসের জন্য? সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করা যাইবে না, কোথাও কোন

সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাহাকে চলিবে না, এমন কি বড়ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেই যাহাকে লজ্জাবোধ হইবে, তাহাকে লইয়া লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

অপরিচিত ঊষার পক্ষ লইয়া ক্ষেত্রমোহন দুই-একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই স্ত্রীর কাছে ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। বিভা রাগ করিয়া বলিল, দাদা মনে করেন আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু আমি সব খবর রাখি। বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই এতকালের খানসামা আবদুলকে তাড়ালেন মুসলমান ব'লে, গিরিধারীকে দূর করলেন ছোটজাত ব'লে। এত যাঁর জাতের বিচার তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই ত আমাদের দায়। আমি ত এমন বৌকে একটা দিনও স্বীকার করতে পারব না, তা যিনিই কেন না যত রাগ করুন।

এ কটাক্ষ যে কাহাকে হইল, তাহা সকলেই বুঝিলেন। শৈলেশ আস্তে আস্তে বলিতে গেল যে, ঠিক সে কারণে নয়, তাহারা নিজেরাই বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কথায় বিভা দাদার মুখের উপরেই জবাব দিল যে, বৌদিদির আমলে তাহাদের এতখানি ব্যগ্রতা দেখা দেয় নাই, কেবল ইনি ঘরে পা দিতে-না-দিতেই তাহারা পলাইয়া বাঁচিল।

এই শ্লেষের আর উত্তর কি? শৈলেশ মৌন হইয়া রহিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, চাকর-বাকর ত সব পালিয়েছে, তোমার এখন চলে কি ক'রে?

শৈলেশ নিস্পৃহকণ্ঠে কহিল, অমনি একরকম যাচ্ছে চলে।

বিভা কহিল, যারা গেছে তারা আর আসবে না, আমি বেশ জানি। কিন্তু বাড়ি ত একেবারে ভট্‌চায্যি-বাড়ি করে রাখলে চলবে না, সমাজ আছে। লোকজন আবার দেখেশুনে রাখো—মানুষে বলবে কি?

শৈলেশ কহিল, না চললে রাখতে হবে বৈ কি!

বিভা বলিল, কি করে যে চলচে সে তোমরাই জান, আমরা ত ভেবে পাইনে। এই বলিয়া সে কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বাপের বাড়ি না গিয়েও পারিনে, কিন্তু গেলে বোধ করি এক পেয়ালা চাও জুটবে না।

ক্ষেত্রমোহন এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়াই ছিলেন, ভাইবোনের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে কথা কহিতে চাহেন নাই, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আগে গিয়েই ত দেখ, চা যদি না পাও তখন নাহয় ব'লো।

বিভা কহিল, আমার দেখাই আছে। প্রথম দিন তাঁর ভাব দেখেই আমি বুঝে এসেচি! এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার অনুযোগ যে একেবারেই সত্য নয়, বস্তুতঃ সেদিন কিছুই দেখিয়া আসিবার মত তাহার সময় বা মনের অবস্থা কোনটাই ছিল না, তাহা উভয়ের কেহ জানিতেন না। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাস্তবিক শৈলেশ, ব্যাপার কি তোমাদের? চাকর-বাকর সমস্ত বিদায় করে দিয়ে কি বোষ্টম-বৈরাগী হয়ে থাকবে নাকি? আজকাল খাচ্চো কি?

শৈলেশ কহিল, ডাল ভাত লুচি তরকারি—

গলা দিয়ে গলচে ওগুলো?

অন্ততঃ গলায় বাঁধচে না এ কথা ঠিক।

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিল, ঠিক তা আমিও জানি। এবং আমার যে সত্যি সত্যিই বাধে তাও নয়, কিন্তু মজা এমনি যে, সে কথা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করবার জো নেই। তুমি কি এমনই বরাবর চালিয়ে যাবে স্থির করেচ নাকি?

শৈলেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, দেখ ক্ষেত্র, যথার্থ কথা বলতে কি, স্থির আমি নিজে কিছুই করিনি, করবার ভারও আমার 'পরে তিনি দেননি। শুধু এইটুকু স্থির করে রেখেচি যে, তাঁর অমতে, তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থায় আর আমি হাত দিচ্চিনে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাকবে না তা বলে দিচ্ছি!

শৈলেশ কহিল, এদিকে যদি রক্ষা নাও থাকে অন্য দিকে একটু রক্ষা বোধ হয় পেয়েচি যে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবে না। বল কি হে,

অহর্নিশি কেবল টাকার ভাবনা, মাসের পনর দিন পার হলেই মনে হয় বাকী পনরটা দিন পার হবে কি করে—সে পথে আর পা বাড়াচ্ছি নে। আমি বেঁচে গেছি ভাই—টাকা ধার করতে আর যেতে হবে না। যে ক'টা টাকা মাইনে পাই সেই আমার যথেষ্ট, এ সুখবরটা এ'র কাছে আমি পেয়ে গেছি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল কি হে? কিন্তু টাকার দুর্ভাবনা কি একা তোমারই ছিল নাকি? আমি যে একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠেচি, সে খবর ত রাখো না।

শৈলেশ বলিতে লাগিল, এলাহাবাদে পালাবার সময় পুরো একটি মাসের মাইনে আলমারিতে রেখে যাই। বলে যাই, একটি মাস পুরো চলা চাই। আগে ত কোন কালেই চলেনি, সোমেনের মা বেঁচে থাকতেও না, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার নিজের হাতেও না। ভেবেছিলাম এ'র হাত দিয়ে যদি ভয় দেখিয়েও চালাতে পারি ত তাই যথেষ্ট। যাদের তাড়ানো নিয়ে বিভা রাগ করছিল, তাদের মুসলমান এবং ছোটজাত বলেই বাস্তবিক তাড়ানো হয়েছে কি না আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু এটা জানি, যাবার সময়ে তারা এক বছরের বাকী মাইনে নিয়ে খুব সম্ভব খুশি হয়েই দেশে গেছে। মুদির দোকানে চার-শ' টাকা দেওয়া হয়েচে, আরও ছোটখাটো কি কি সাবেক দেনা শোধ করে ছোট্ট একখানি খাতায় সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় লেখা—ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ তুমি কি কাণ্ড করে বসে আছো ঊষা, অর্ধেক মাস যে এখনো বাকী—চলবে কি করে? জবাবে বললেন, আমি ছেলেমানুষ নই, সে জ্ঞান আমার আছে। খাবার কষ্ট ত আজও তাঁর হাতে একতিল পাইনি ক্ষেত্র, কিন্তু ডাল-ভাতই আমার অমৃত। আমার দর্জি ও কাপড়ের বিল এবং হ্যাণ্ডনোটের দেনাটা শোধ হয়ে যাক ভাই, নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ক্ষেত্রমোহন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মোটর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনজনেই উঠিয়া বসিলেন। সমস্ত পথটা ক্ষেত্রমোহন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কাহারও কোন কথা বোধ করি তাঁহার কানেই গেল না।

সাত

অল্প কিছুক্ষণেই গাড়ি আসিয়া শৈলেশ্বরের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সাক্ষাৎ মিলিল সোমেনের। সে রেলভাঙ্গা হাতুড়িটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া চৌকাঠে বসিয়া তাহার রেলগাড়ির চাকা মেরামত করিতেছিল—তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া হঠাৎ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না। তাহার কপালে, গালে, দাড়িতে, বুকে, বাহুতে—অর্থাৎ দেহের সমস্ত উপরার্ধটাই প্রায় চিত্র-বিচিত্র করা। গঙ্গার ঘাটের উড়ে পাণ্ডা সাদা, রাঙা, হলুদ রঙ দিয়া নিজের দেশের জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের রাম-সীতা পর্যন্ত সর্বপ্রকার দেবদেবীর অসংখ্য নাম ছাপিয়া দিয়াছে।

বিভা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ দেখিয়েচে বাবা, বেঁচে থেকো!

শৈলেশের এই দুইজনের কাছে যেন মাথা কাটা গেল। স্বভাবতঃ সে মৃদুপ্রকৃতির লোক, যে-কোন কারণেই হউক, হৈচৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে সে পারিত না, কিন্তু ভগিনীর এই অত্যন্ত কটু উত্তেজনা হঠাৎ তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল। ছেলের গালে সশব্দে একটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগা পাজি! কোথা থেকে এই-সমস্ত করে এলি? কোথা গিয়েছিলি?

সোমেন কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, আজ সকালে সে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। শৈলেশ তাহার গলায় একটা ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌ গে, যা বলচি!

তিনজনে আসিয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাই-বোন উভয়েরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর; মিনিট-খানেক কেহই কোন কথা কহিল না, শৈলেশের লজ্জিত বিরস মুখে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, এতটা বাড়াবাড়ি সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু

বিভা কথা না কহিয়াও যেন সগর্বে বলিতে লাগিল, এ-সব তার জানা কথা। এইরূপ হইতেই বাধ্য।

কথা কহিলেন ক্ষেত্রমোহন। তিনি হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, শৈলেশ, তুমি যে একেবারে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে ফেললে হে! ছেলেটাকে মারলে কি বলে! তোমাদের সঙ্গে ত চলাফেরা করাই দায়।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিভা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চায়ের পেয়ালায় তুফান কি রকম! তুমি কি এটাকে ছেলেখেলা মনে করলে নাকি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, অন্ততঃ ভয়ানক কিছু একটা যে মনে হচ্ছে না তা অস্বীকার করতে পারিনে।

তার মানে?

মানে খুব সহজ। আজ নিশ্চয় কি একটা গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, সোমেন সঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্নান করেছে। একটা দিন কলের জলে না নেয়ে দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত কি মহাপাপ হতে পারে আমি ত ভেবে পাইনে।

বিভা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার পরে?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তার পরের ব্যাপারও খুব স্বাভাবিক। ঘাটে বিস্তর উড়ে পান্ডা আছে, হয়ত কেউ দুটো-একটা পয়সার আশায় ছেলেমানুষের গায়ে চন্দনের ছাপ মেরে দিয়েচে। এতে খুনোখুনি কান্ড করবার কি আছে!

বিভা তেমনি ক্রোধের স্বরে প্রশ্ন করিল, এর পরিণাম ভেবে দেখেচ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বিকালবেলা মুখহাত ধোয়ার সময় আপনি মুছে যায়—এই পরিণাম।

বিভা কহিল, ওঃ—এই মাত্র! তোমার ছেলেপুলে থাকলে তুমিও তা হলে এইরকম করতে দিতে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমার ছেলেপুলে যখন নেই, তখন এ তর্ক বৃথা।

বিভা মনে মনে আহত হইয়া কহিল, তর্ক বৃথা হতে পারে, চন্দন ধুয়ে ফেললে উঠে যায় আমি জানি, কিন্তু এর দাগ হয়ত অত সহজে নাও উঠতে পারে। ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ জীবনের পানে চেয়েই কাজটা করতে হয়। আজকার কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় এ কথা আমি একশ' বার বলব, তা তোমরা যাই কেন না বল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তোমরা নয়—একা আমি! শৈলেশ ত চড় মেরে আর গলাধাক্কা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলে—আমি কিন্তু এ আশা করিনে যে, অধ্যাপক-বংশের মেয়ে একদিনেই মেমসাহেব হয়ে উঠবে। তা সে যাই হোক, তোমরা দু ভাইবোন এর ফলাফল বিচার করতে থাকো, আমি উঠলুম।

শৈলেশ চুপ করিয়াই ছিল, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কোথায় হে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, উপরে। ঠাকরুনের সঙ্গে পরিচয়টা একেবারে সেরে আসি, কথা ক'ন কি না একটু সাধ্যসাধনা করে দেখি গে। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরে গেলেন।

উপরে উঠিয়া শোবার ঘরের দরজা হইতে ডাক দিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন, নমস্কার।

ঊষা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন কাছে বসিয়া বোধ করি মায়ের কাজ বাড়াইতেছিল, কহিল, পিসেমশাই।

ঊষা অদূরে একটা চৌকি দেখাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বসুন। তাহার সম্মুখের গোটা-দুই আলমারীর কপাট খোলা, মেঝের উপর অসংখ্য রকমের কাপড় জামা শাড়ি জ্যাকেট কোট পেন্টুলান মোজা টাই কলার—কত যে রাশিকৃত-করা, তাহার নির্ণয় নাই।

ক্ষেত্রমোহন আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনার হচ্ছে কি?

সোমেন স্তূপের মধ্য হইতে একজোড়া মোজা টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এই আর একজোড়া বেরিয়েচে। এইটুকু শুধু ছেঁড়া—চেয়ে দেখ মা!

ঊষা ছেলের হাত হইতে লইয়া একস্থানে গুছাইয়া রাখিল। তাহার রাখিবার শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন একটু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এ কি অনাথ আশ্রমের

ফর্দ তৈরি হচ্ছে, না জঞ্জাল পরিষ্কারের চেষ্টা হচ্ছে? কি করচেন বলুন ত? তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, পল্লী অঞ্চলের নূতন বধূ তাঁহাকে দেখিয়া হয়ত লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে, কিন্তু ঊষার আচরণে সেরূপ কিছু প্রকাশ পাইল না। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না বটে, কিন্তু কথার জবাব সহজকণ্ঠেই দিল; কহিল, এগুলো সব সারাতে পাঠাবো ভাবচি। কেবল মোজাই এত জোড়া আছে যে, বোধ করি দশ বচ্ছর আর না কিনেলও চলে যাবে।

ক্ষেত্রমোহন একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন, এখন কেউ নেই, এই সময় চট করে একটা কথা বলে রাখি। আপনার ননদটিকে দেখে তাঁর স্বামীর স্বরূপটা যেন মনে মনে আন্দাজ করে রাখবেন না। বাইরে থেকে আমার সাজসজ্জা আর আচার-ব্যবহার দেখে আমাকে ফিরিঙ্গি ভাববেন না, আমি নিতান্তই বাঙ্গালী। কেউ গঙ্গাস্নান করে এসেছে শুনলে তাকে আমার মারতে ইচ্ছা করে না, এ কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আরও একটা কথা নিরিবিলিতেই বলে রাখি। সোমেনের মারটা নিজের গায়ে পেতে নিলে শৈলেশ বেচারার প্রতি কিন্তু অবিচার করা হবে। এত বড় অপদার্থ ও সত্যি সত্যিই নয়।

ঊষা এ কথারও কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, এখন আপনি বসুন। আমার জন্যে আপনার সময় না নষ্ট হয়। একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনার লক্ষ্মী হাতের কাজ করা দেখে আমিও গৃহস্থালীর কাজকর্ম একটু শিখে নিই।

ঊষা মেঝের উপর বসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, এ-সব মেয়েদের কাজ, আপনার শিখে লাভ কি?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এর জবাব একদিন আপনাকে দেব, আজ নয়।

ঊষা নীরবে হাতের কাজ করিতে লাগিল; কিন্তু একটু পরেই কহিল, এ-সব ত গরীব-দুঃখীদের কাজ, আপনাদের এ শিক্ষায় ত কোন প্রয়োজনই হবে না।

ক্ষেত্রমোহন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বৌঠাকরুন, বাইরের চাকচিক্য দেখে যদি আপনারও ভুল হয় ত সংসারে আমাদের মত দুর্ভাগাদের ব্যথা বোঝবার আর কেউ থাকবে না। ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোনটিকে আপনার কাছে দিনকতক রেখে যাই। আপনার লক্ষ্মীশ্রীর কতকটাও হয়ত সে তাহলে শ্বশুরবাড়িতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পাবরে।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা অনেকগুলি জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে শুনিতে পাইয়া শুধু বলিলেন, এঁরা সব উপরেই আসচেন দেখচি। শৈলেশের বোন এবং আমার বোনের বাইরের বেশভূষার সাদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরটাও একরকম বলে স্থির করে নেবেন না।

ঊষা শুধু একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি বোধ হয় চিনতে পারব।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বোধ হয়' নিশ্চয় পারবেন, এও আমি নিশ্চয় জানি।

আট

সিঁড়িতে যাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়াছিল তাহারা শৈলেশ, বিভা এবং বিভার ছোট ননদ উমা। শৈলেশ ও বিভা ঘরে প্রবেশ করিল, সকলের পিছনে ছিল উমা; সে চৌকাঠের এদিকে পা বাড়াইতেই, তাহার দাদা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, জুতোটা খুলে এস উমা।

বিভা ফিরিয়া চাহিয়া স্বামীকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, দোষ কি? পায়ে কাঁটাও ফুটবে না, হোঁচটও লাগবে না।

বিভা কহিল, সে আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ জুতো খোলার দরকার হ'ল কিসে তাই শুধু জিজ্ঞাসা করেচি।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুন হিঁদু মানুষ—তা ছাড়া গুরুজনের ঘরের মধ্যে

ওটা পায়ে দিয়ে না আসাই বোধ হয় ভাল।

বিভা স্বামীর পায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, শুধু কেবল ভগিনীকে উপদেশ দেওয়াই নয়, নিজেও তিনি ইতিপূর্বে তাহা পালন করিয়াছেন, দেখিয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল; কহিল, গুরুজনের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা তোমার অসাধারণ সে ভালই, কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। গুরুজনের এটা শোবার ঘর না হয়ে ঠাকুরঘর হলে আজ হয়ত তুমি একেবারে গোবর খেয়ে পবিত্র হয়ে ঢুকতে।

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া ক্ষেত্র হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, গোবরের প্রতি রুচি নেই, ওটা বৌঠাকরুনের খাতিরেও মুখে তুলতে পারতুম না, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে যখন কোন সুবাদই রাখিনে, তখন অকারণে তাঁদের ঘরে ঢুকেও উৎপাত করতুম না। আচ্ছা বৌঠাকরুন, এ ঘরে ত আগেও বহুবার এসেচি, মনে হচ্চে যেন একটা ভাল কার্পেট পাতা ছিল, সেটা তুলে দিলেন কেন?

ঊষা কহিল, ধোয়ামোছা যায় না, বড় নোংরা হয়। শোবার ঘর—

বিভা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, কার্পেট পাতা থাকলে ঘর নোংরা হয়?

ঊষা অহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, হয় বৈ কি ভাই। চোখে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু নীচে তার ঢের ধুলোবালি চাপা পড়ে থাকে।

বিভা বোধ করি ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রবল কণ্ঠে অকস্মাৎ তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ব্যস্ ব্যস্, বৌঠাকরুন, নোংরা চাপা পড়লেই আমাদের কাজ চলে যায়—তার বেশি আর আমরা চাইনে। ও জিনিসটা চোখের আড়ালে থাকলেই আমরা খুশি হয়ে থাকি। কি বল শৈলেশ, ঠিক না?

শৈলেশ কথা কহিল না। বিভার ক্রোধের অবধি রহিল না; কিন্তু সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া সে তর্ক না করিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার স্নেহ ও প্রীতির হয়ত কোন অভাব ছিল না, কিন্তু বাহিরে সাংসারিক আচরণে বাদ-প্রতিবাদের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায়ই প্রকাশ হইয়া পড়িত। লোকের সম্মুখে বিভা তর্কে কিছুতেই হার মানিতে পারিত না, ইহা তাহার স্বভাব। সেই হেতু প্রায়ই দেখা যাইত, এই বস্তুটা পাছে কথায় কথায় বাড়াবাড়িতে গিয়া উপনীত হয়, এই ভয়ে প্রায়ই ক্ষেত্রমোহন বিতণ্ডার মাঝখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িত। কিন্তু আজ তাহার সে ভাব নয়, ইহা ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া বিভা আপনাকে সংবরণ করিল।

বস্তুতঃই তাহার বিরুদ্ধে আজ ক্ষেত্রমোহনের মনের মধ্যে এতটুকু প্রশ্রয়ের ভাব ছিল না। পরের দোষ ধরিয়া কটুকথা বলা বিভার একপ্রকার স্বভাবের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত ইহাতে অশিষ্টতা ভিন্ন আর কোন ক্ষতিই হইত না; কিন্তু এই যে নিরপরাধ বধূটির বিরুদ্ধে প্রথম দিন হইতেই সে একেবারে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে, বিনাদোষে অশেষ দুঃখভোগের পর যে স্ত্রী স্বামীর গৃহকোণে দৈবাৎ স্থানলাভ করিয়াছে, তাহার সেইটুকু স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি আর একজন স্বামীর চিত্ত দুঃখে ও বিরক্তিতে পূর্ণ করিয়া আনিতেছিল। অথচ ইহারই পদধূলির যোগ্যতাও অপরের নাই, এই সত্য চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রমোহনের তিক্ত ব্যথিত চিত্তে বিভার বিরুদ্ধে আর কোন ক্ষমা রহিল না। অথচ এই কথা প্রকাশ করিয়া বলাও এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে তেমনি সুকঠিন। বরঞ্চ যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার আবরণে বাহিরে ইহাকে গোপন করিতেই হইবে।

ক্ষেত্রমোহন ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, উমা, তোমার এই পল্লীগ্রামের বৌদিদির কাছে এসে যদি রোজ দুপুরবেলা বসতে পার, যে-কোন সংসারেই পড় না কেন দিদি, দুঃখ পাবে না তা বলে রাখচি।

উমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। ঊষা মুখ না তুলিয়া বলিল, তা হলেই হয়েচে আর কি! আপনাদের সমাজে ওকে একঘ'রে করে দেবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তা দিক বৌঠাকরুন! কিন্তু ওরা স্বামী-স্ত্রীতে যে পরম সুখে থাকবে তা বাজি রেখে বলতে পারি।

শৈলেশ বিভার প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল, বাজি রাখতে আর হবে না ভাই, এই বলাতেই যথেষ্ট হবে।

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিয়া কহিলেন, আর যাই হোক, আজকের কাজটুকুও যদি মনে রাখতে প্যারে ত নিরর্থক নিত্যনূতন মোজা কেনার দায় থেকেও অন্ততঃ ওর স্বামী বেচারা অব্যাহতি পাবে।

বিভা সেই অবধি চুপ করিয়াই ছিল, আর পারিল না। কিন্তু গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন গোপন করিয়া একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, ওর ভবিষ্যৎ সংসারে হয়ত মোজায় তালি দেবার প্রয়োজন নাও হতে পারে। দিলেও হয়ত ওর স্বামী পরতে চাইবে না। আগে থেকে বলা কিছুই যায় না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যায় বৈ কি। চোখ-কান খোলা থাকলেই বলা যায়। যে সত্যিকারের জাহাজ চালায়, সে জলের চেহারা দেখলেই টের পায় তলা কত দূরে। বৌঠাকরুন, জাহাজে পা দিয়েই যে ধরে ফেলেছিলেন একটু অসাবধানেই তলায় পাঁক গুলিয়ে উঠবে, এতেই আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিই। আর শৈলেশের পক্ষ থেকে ত লক্ষকোটি ধন্যবাদেও পর্যাপ্ত হবার নয়।

ঊষা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে বলিল, নিজের গৃহে নিজের স্বামীর অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করার মধ্যে ধন্যবাদের ত কিছুই নেই ক্ষেত্রমোহনবাবু।

এ কথার জবাব দিল বিভা। সে কহিল, অন্ততঃ নিজের স্ত্রীকে অপমান করার কাজটা হয়ত সিদ্ধ হয়। তা ছাড়া, কাউকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলেই বোধ হয় আর কারুর ভক্তিশ্রদ্ধা উথলে উঠে।

ঊষা মুখ তুলিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিল, স্বামীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার চেষ্টাকে কি উঞ্ছবৃত্তি বলে ঠাকুরঝি?

ক্ষেত্রমোহন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, না, বলে না। পৃথিবীর কোন ভদ্রব্যক্তিই এমন কথা মুখে আনতেও পারে না। কিন্তু স্বামীর চক্ষে স্ত্রীকে নিরন্তর হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে হৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি বলে, আপনার ঠাকুরঝিকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে নিন।

বিভার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। অভিভূতের মত একবার সে বক্তার মুখের দিকে, একবার শৈলেশের মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। এতগুলি লোকের সমক্ষে তাহার স্বামী যে যথার্থই তাহাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারে প্রথমে সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিল না। তার পরে শৈলেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এর পরে আর ত তোমার বাড়িতে আসতে পারিনে দাদা! আমি তা হলে চিরকালের মতই চললুম।

শৈলেশ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঊষা হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমরা ত তোমাকে কোন কথা বলিনি ভাই!

হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল, এবং এই গণ্ডগোলের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। বিভা হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যখন আপনার কেবল শত্রুতাই করচি, তখন এ বাড়িতে আমার আর কিছুতেই প্রবেশ করা উচিত নয়।

ঊষা কহিল, কিন্তু এমন কথা আমি ত কোনদিন মনেও ভাবিনি ঠাকুরঝি!

বিভা কানও দিল না। অশ্রুবিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল, আজ উনি মুখের উপর স্পষ্ট বলে গেলেন, কাল হয়ত দাদাও বলবেন তাঁর নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে কথা কইতে যাওয়া শুধু অপমান হওয়া। উমা, বাড়ি যাও ত এস। এই বলিয়া সে নীচে নামিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বৌদিদি যখন নেই, তখন এ বাড়িতে পা দিতে যাওয়াটাই আমাদের ভুল। এবার, বাড়ির সকল সম্বন্ধই আমার ঘুচল। এই বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেল। শৈলেশ পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া সসঙ্কোচে কহিল, নাহয় আমার লাইব্রেরী ঘরে এসেই একটু বস্ না বিভা।

বিভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। কিন্তু আমার বৌদিদিকে একেবারে ভুলে যেও না দাদা। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, সোমেন বিলাতে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়—দোহাই

তোমার, তাকে নষ্ট হতে দিয়ো না। আজ তাকে যেভাবে চোখে দেখতে পেলুম, এই শিক্ষাই যদি তার চলতে থাকে, সমাজের মধ্যে আর মুখ দেখাতে পারব না।

তাহার অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া শৈলেশ মিনতি করিয়া কহিল, তুই আমার বাইরের ঘরে বসবি চল্ বোন, এমন করে চলে গেলে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। সোমেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কিনা জানি না, কিন্তু অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথাও গিয়ে আর বসতে চাইনে দাদা, কিন্তু সোমেন আমাদের বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, একেবারে আত্মহারা হয়ে যেয়ো না দাদা। এই বলিয়া সে সোজা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার গাড়িতে গিয়া উপবেশন করিল। উমা বরাবর নীরব হইয়াই ছিল, এখনও সে একটি কথাতেও কথা যোগ করিল না, নিঃশব্দে বিভার পার্শ্বে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বিভা, সোমেনকে নাহয় তুই নিয়ে যা। তোর নিজের ছেলেপুলে নেই, তাকে তুই নিজের মত করেই মানুষ করে তোল্।

বিভা এবং উমা উভয়েই একান্ত বিস্ময়ে শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বিভা কহিল, কেন এই নিরর্থক প্রস্তাব করচ দাদা, এ তুমি পারবে না—তোমাকে পারতেও দেব না।

শৈলেশ ঝোঁকের উপর জোর করিয়া উত্তর করিল, আমি পারবই—এই তোকে কথা দিলাম বিভা।

বিভা সন্দিগ্ধকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া কহিল, পার ভালই। তাকে পাঠিয়ে দিয়ো। তাকে উচ্চশিক্ষা দেবার টাকা যদি তোমার না থাকে, আমিও কথা দিচ্চি দাদা, সে ভার আজ থেকে আমি নিলাম। এই বলিয়া সে উমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, উপরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঊষা নীচে তাদের দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরক্ষণে মোটর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শৈলেশ তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। উপরে যাইতে তাহার ইচ্ছাও হইল না, সাহসও ছিল না, সমস্ত কথাই যে ঊষা শুনিতে পাইয়াছে, ইহা জানিতে তাহার অবশিষ্ট ছিল না।

নয়

রাত্রে খাবার দিয়া স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঊষা অন্যান্য দিনের মত নিকটে বসিয়াছিল। শুধু সোমেন আজ তাহার কাছে ছিল না। হয়ত সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিংবা এমনি কিছু একটা হইবে। শৈলেশ আসিল, তাহার মুখ অতিশয় গম্ভীর। হইবারই কথা। ব্যর্থ প্রশ্ন করা ঊষার স্বভাব নয়, আজিকার ঘটনা সম্বন্ধে সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এবং যাহা জানে না তাহা জানিবার জন্যও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। স্ত্রীর এই স্বভাবের পরিচয়টুকু অন্ততঃ শৈলেশ এই কয়দিনেই পাইয়াছিল। আহারে বসিয়া মনে মনে সে রাগ করিল, কিন্তু আশ্চর্য হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আড়চোখে চাহিয়া সে স্ত্রীর মুখের চেহারা দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ঊষা ইচ্ছা করিয়াই আলোটার দিকে আড় হইয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দিনের মত সে খাইতে পারিল না। যেজন্য আজ তাহার আহারে রুচি ছিল না তাহার কারণ আলাদা, তথাপি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও গায়ে পড়িয়া শুনাইয়া দিল যে, অনভ্যস্ত খাওয়া-পরা শুধু দু-চার দিনই চলিতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড় করাইলে আর স্বাদ থাকে না, তখন অরুচি অত্যাচারে গিয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা তর্কের দিক দিয়া যাই হোক, এ ক্ষেত্রে সত্য নয় জানিয়া ঊষা চুপ করিয়া রহিল। মিথ্যা জিনিসটা যে নিশ্চয়ই মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক করিতে কোনদিনই তাহার প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু এমন করিয়া নিঃশব্দে অস্বীকার করিলে প্রতিপক্ষের রাগ বাড়িয়া যায়। তাই শুইতে আসিয়া শৈলেশ খামকা বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার প্রতি

একদিন অতিশয় অন্যায় করেছিলাম তা মানি, কিন্তু তাই বলেই আজ তোমার ছাড়া আর কারও ব্যবস্থাই চলবে না এও ত ভারি জুলুম!

এরূপ শক্ত কথা শৈলেশ প্রথম দিনটাতেও উচ্চারণ করে নাই। ঊষা মনে মনে বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে শুধু বলিল, আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এমন করিয়া অত্যন্ত বিনয়ে কবুল করিয়া লইলে আরও রাগ বাড়ে।

শৈলেশ কহিল, তোমার বোঝা উচিত ছিল। আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সমাজ সমস্ত উলটে দিয়ে যদি এ বাড়িকে তোমার বাপের বাড়ি বানিয়ে তুলতে চাও ত আমাদের মত লোকের পক্ষে বড় মুশকিল হতে থাকে। সোমেনকে বোধ হয় কাল ওর পিসির বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি কি বল?

ঊষা কহিল, ওর ভালর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় ত দিতে হবে বৈ কি!

তাহার বলার মধ্যে উত্তাপ বা শ্লেষ কিছুই ধরিতে না পারিয়া শৈলেশ দ্বিধার মধ্যে পড়িল। কিসের জন্য এ-সব করিতেছে তাহার হেতুও মনের মধ্যে বেশ দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু এই-সকল দুর্বল-প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে, তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অসংগত অভিমানের দ্বার ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে বলেই সকলের বিশ্বাস। যে সব আচার-ব্যবহার রীতিনীতি আমরা মানিনে, মানতে পারিনে, তাই নিয়ে অযথা ভাইবোনের মধ্যে বিবাদ হয়, সমাজের কাছে পরিহাসের পাত্র হতে হয়—এ আমার ভাল লাগে না।

ঊষা প্রতিবাদ করিল না, নিজের দিক হইতে কৈফিয়ত দিবার চেষ্টামাত্র করিল না, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শৈলেশের তাহা কানে গেল। ঊষা নিজে কলহ করে নাই, তাহার পক্ষ লইয়া বিভার প্রতি যত কটু কথা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার একটিও যে ঊষার নিজের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, তাহা এতখানিই সত্য যে সে লইয়া ইঙ্গিত করাও চলে না, ভুলাও যায় না। সুতরাং ক্ষেত্রমোহনের দুষ্কৃতির শাস্তি যে আর একজনের স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে না—ইহাতে প্রতিহিংসার কিছুই যে নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিতে সে পুনশ্চ কহিল, যাকে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে হবে, যে সমাজের মধ্যে তাকে চলাফেরা করতে হবে, ছেলেবেলা থেকে তার সেই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়া আবশ্যক। শিশুকালটা তার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাটতে দেওয়া তার প্রতি গভীর অন্যায় এবং অবিচার করা হবে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিল, এ সম্বন্ধে তোমার বলবার কিছু না থাকে ত স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মুখ বুজে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেই তার জবাব হয় না। সোমেনের সম্বন্ধে আমরা রীতিমত চিন্তা করেই তবে স্থির করেচি।

সোমেন পাশেই ঘুমাইতেছিল। এ বাটীতে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকায় আসিয়া পর্যন্ত ঊষা তাহাকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিত। তাহার নিদ্রিত ললাটের উপর সে সস্নেহে ও সন্তর্পণে বাম হাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, যাই কেননা স্থির কর, ছেলের কল্যাণের জন্যই তুমি স্থির করবে। এ ছাড়া আর কি কেউ কখনও ভাবতে পারে! বেশ ত, তাই তুমি ক'রো।

ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া ঘরের কোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল, এই সামান্য আলোকে শৈলেশ নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অদূরবর্তী শয্যায় শায়িত ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা ছাড়া সে সোমেনের সমস্ত পড়ার খরচ দেবে বলেচে। সে ত কম নয়!

ঊষার কণ্ঠস্বরে কিছুতেই উত্তেজনা প্রকাশ পাইত না। শান্তভাবে কথা কহাই তাহার প্রকৃতি। কহিল, না, সে হতে পারবে না। ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।

শৈলেশ কহিল, সে যে অনেক টাকার দরকার।

ঊষা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, দরকার হয় দিতে হবে। কিন্তু আর রাত জেগো না, তুমি ঘুমোও।

পরদিন অপরাহ্ণকালে শৈলেশ কলেজ ও ক্লাব হইতে বাড়ি ফিরিয়া রান্নার একপ্রকার

সুপরিচিত ও সুপ্রিয় গন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিতচিত্তে তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল পরে চা ও খাবার লইয়া যে ব্যক্তি দর্শন দিলেন, শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সে মুসলমান।

রাত্রে খাবার ঘরে আলো জ্বলিল, এবং সজ্জিত টেবিলের চেহারা দেখিয়া শৈলেশ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিল না যে, ইহার জন্য অত্যন্ত সঙ্গোপনে মন তাহার সত্যই ব্যগ্র এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ডিনার তখনও দুই-একটা ডিসের অধিক অগ্রসর হয় নাই, ঊষা আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া একটু দূরে বসিল।

শৈলেশের মন প্রসন্ন ছিল, ঠাট্টা করিয়া বলিল, ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ঘ্রাণেও যে অর্ধভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

ঊষা অল্প একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ তোমার উচিত নয়। যে শাস্ত্রকে তুমি মান না, গণ না, তার দোহাই দেওয়া তোমার সাজে না।

শৈলেশও হাসিল। কহিল, আচ্ছা হার মানলুম। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই আমিও দেব না, তুমিও কিন্তু পালিয়ো না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, ভাগ্যে কাল খোঁটা দিয়েছিলুম, তাইত আজ এমন বস্তুটি অদৃষ্টে জুটল! ঠিক না ঊষা? কিন্তু খরচপত্র কি তোমার খুব বেশি পড়বে?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। অপব্যয় না হলে কোন খাবার জিনিসেই খুব বেশি পড়ে না। আসচে মাস থেকে আমি নিজেই এ-সব করব ভেবেছিলাম। কিন্তু এইটি দেখ, জিনিসপত্র বৃথা নষ্ট যেন না হয়। আমার খরচের খাতায় যেমনটি লিখে রেখেচি, ঠিক তেমনটি যেন হয়। হবে ত?

শৈলেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন হবে না শুনি?

ঊষা তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কাল সারারাত ভেবে ভেবে আমি যা স্থির করেচি তাকে অস্থির করবার জন্য আমাকে আদেশ ক'রো না, তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

শৈলেশ আর্দ্রচিত্তে কহিল, তা ত আমি কোনদিন করবার চেষ্টা করিনে ঊষা! আমি নিশ্চয় জানি, তোমার সিদ্ধান্ত তোমারই যোগ্য। তার নড়চড় হয়ও না, হওয়া উচিতও নয়। আমি দুর্বল, কিন্তু তোমার মন তেমনি সবল, তেমনি দৃঢ়।

স্বামীর মুখের উপর হইতে ঊষা দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, সত্যিই আর কিছু হবার নয়, আমি অনেক ভেবে দেখেচি।

শৈলেশ নিশ্চয়ই বুঝিল ইহা সোমেনের কথা। সহাস্যে কহিল, ভূমিকা ত হ'ল, এখন স্থির কি করেচ বল ত? আমি শপথ করে বলতে পারি তোমাকে কখনো অন্যথা করতে অনুরোধ করব না।

ঊষা মিনিটখানেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে বলিল, দাদার সংসারে আমার চলে যাচ্ছিল—বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। কাল আবার আমি তাঁদের কাছেই যাব।

তাঁদের কাছে যাবে? কবে ফিরবে?

ঊষা বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, ফিরতে আর আমি পারব না। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি, এখানে আমার থাকা চলবে না। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

কথা শুনিয়া শৈলেশ একেবারে যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন নিরন্তর মুগুর মারিয়া মারিয়া কহিতে লাগিল, যে লৌহকবাট রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার সাধ্য এ দুনিয়ায় কাহারও নাই।

দশ

সকালে ঘুম ভাঙিয়া শৈলেশের প্রথমেই মনে হইল, সারারাত্রি ধরিয়া সে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ঊষা নিত্যনিয়মিত গৃহকর্মে

ব্যাপৃতা,—সোমেন সঙ্গে, বোধ হয় সে খাবার তাগাদায় আছে। সিঁড়িতে নামিবার পথে দেখা হইতে ঊষা মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার চা তৈরি করে ফেলেচে, মুখহাত ধুতে দেরি করলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু। একটু তাড়াতাড়ি নিয়ো।

শৈলেশ কহিল, বেশ ত, তুমি পাঠিয়ে দাও গে, আমার এক মিনিট দেরি হবে না। এই বলিয়া সে যেন লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তাহার বাথরুমে প্রবেশ করিল। মনে মনে কহিল, আচ্ছা ইডিয়ট আমি? দাম্পত্য-কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা জ্ঞান করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, সকালবেলায় এই কথা মনে করিয়া শুদ্ধ তাহার হাসি পাইল তাই নয়, নিজের কাছে লজ্জা বোধ হইল। সংসার করিতে একটা মতভেদ বা দুটা কথা-কাটাকাটি হইলেই স্ত্রী যদি স্বামীগৃহ ছাড়িয়া দাদার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইত, দুনিয়ায় ত তাহা হইলে মানুষ বলিয়া আর কোন জীবই থাকিত না। সোমেনের মা হইলেও বা দু-দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু ঊষার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে গড়া স্ত্রী,—ধর্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়, তাহা হইলে সংসারে আর বাকী থাকে কি? এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাগলামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল। এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে ঊষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজে আরও দুই-চারিজন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। এমনি ধারা শিক্ষা-দীক্ষা পেলেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নবনিযুক্ত মুসলমান খানসামা চা, রুটি, মাখন, কেক প্রভৃতি প্রাতরাশের আয়োজন লইয়া হাজির হইতে তাহার হঠাৎ যেন চমক লাগিল। এই-সকল বস্তুতেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, মাঝে কেবল দিনকয়েক বাধা পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু টেবিলে রাখিয়া দিয়া বেহারা চলিয়া গেলে এই জিনিসগুলির পানে চাহিয়াই আজ তাহার অরুচি বোধ হইল; ঊষা গৃহে আসিয়া পর্যন্ত এই-সকলের পরিবর্তে নিমকি, কচুরি প্রভৃতি স্বহস্ত-রচিত খাদ্যদ্রব্য সকালে চায়ের সঙ্গে আসিত, সে নিজে উপস্থিত থাকিত, কিন্তু আজ তাহার কোনটাই নাই দেখিয়া, তাহার আহারে প্রবৃত্তি রহিল না। শুধু এক পেয়ালা চা কেৎলি হইতে নিজে ঢালিয়া লইয়া খানসামাকে ডাকিয়া সমস্ত বিদায় করিয়া দিয়া শৈলেশ পর্দার বাহিরে একটা অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনির আশায় কান খাড়া করিয়া রাখিল। এবং না-খাওয়ার কৈফিয়ত যে একটু কড়া করিয়াই দিবে, এই মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে অযথা দেরি করিয়া পেয়ালা যখন শেষ করিল, তখন চা ঠাণ্ডা এবং বিস্বাদ হইয়া গেছে; ফিরিয়া আসিয়া লোকটা শূন্য পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না, ঊষা ঘরে প্রবেশ করিল না।

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল, স্নানাহার সারিয়া কলেজের জন্য প্রস্তুত হইবে। খাবার সময় আজও ঊষা অন্যান্য দিনের মত কাছে আসিয়া বসিল; তাহার আগ্রহ, যত্ন বা কথাবার্তার মধ্যে কোন প্রভেদ বাড়ির কাহারও কাছে ধরা পড়িল না, পড়িল শুধু শৈলেশের কাছে। একটা রাত্রির মধ্যে একটা লোক যে বিনা চেষ্টায়, বিনা আড়ম্বরে কতদূরে সরিয়া যাইতে পারে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলেজ যাইবার পোশাক পরিতে এ ঘরে ঢুকিয়া এখন প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল টেবিলের উপরে সংসার-খরচের সেই ছোট্ট খাতাটি। হয়ত কাল হইতেই এমনি পড়িয়া আছে, সে লক্ষ্য করে নাই—না হইলে তাহারই জন্য ঊষা এইমাত্র রাখিয়া গেছে তাহা সম্ভবও নয়, সত্যও নয়। আজও ত মাস শেষ হয় নাই—অকস্মাৎ এখানে ইহার প্রয়োজন হইলই বা কিসে? তথাপি গলায় টাই বাঁধা তাহার অসমাপ্ত রহিল, কতক কৌতূহলে, কতক অন্যমনস্কতাবশে একটি একটি করিয়া পাতা উলটাইয়া একেবারে শেষ পাতায় আসিয়া থামিল। পাতায় পাতায় একই কথা—সেই মাছ, শাক, আলু, পটল, চালের বস্তা, দুধের দাম, চাকরের মাইনে—কাল পর্যন্ত জমা

বইতে খরচ বাদ দিয়া মজুত টাকার অঙ্ক স্পষ্ট করিয়া লেখা। এই লেখা যেদিন আরম্ভ হয়, সেদিন সে এলাহাবাদে। তখনও তাহার হাত ছিল না, আজ এইখানেই যদি ইহার সমাপ্তি ঘটে তাহাতেও তেমনি হাত নাই। বহুক্ষণ পর্যন্ত প্রথম দিনের প্রথম পাতাটির প্রতি শৈলেশ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। এই জিনিসটা সংসারে তাহার দুদিনের ব্যাপার। আগেও ছিল না, পরেও যদি না থাকে ত সংসার অচল হইয়া থাকিবে না,—দুদিন পরে হয়ত সে নিজেই ভুলিবে। তবুও কত কি-ই না মনে হয়। খাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনশ্চ টাই বাঁধার কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া হঠাৎ এই কথাটাই আজ তাহার সবচেয়ে বড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল, এ জগতে কোন কিছুর মূল্যই একান্ত করিয়া নির্দেশ করা চলে না। এই খাতা, এই হিসাব লেখারই একদিন প্রয়োজনের অবধি ছিল না, আবার একদিন সেই-সকলই না কতখানি অকিঞ্চিৎকর হইতে চলিল।

অবশেষে পোশাক পরিয়া শৈলেশ যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ঊষাকে ডাকিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে মন তাহার বারংবার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল, তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিয়া লইবার সাহসও সে নিজের মধ্যে কোনক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

এগার

কলেজের ছুটির পরে শৈলেশ বাটী না ফিরিয়া সোজা বিভার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, অনুমান তাহার নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। ভগিনীপতি আদালতে বাহির হ'ন নাই, এবং ইতিমধ্যেই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার রফা হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া সে তৃপ্তি বোধ করিল। কহিল, কৈ, সোমেনকে আনতে ত লোক পাঠালে না বিভা?

বিভা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, হাতি যে কিনছিল সে নেই।

তার মানে?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি গল্প শোননি? কে একজন মাতাল নাকি নেশার ঝোঁকে রাজার হাতি কিনতে চেয়েছিল। পরদিন ধরে এনে এই বেয়াদপির কৈফিয়ত চাওয়ায় সে হাতজোড় করে বলেছিল, হাতিতে তার প্রয়োজন নেই, কারণ, হাতির যে সত্যিকারের খরিদ্দার সে আর নেই, চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিলেন, এবং পরে হাসি থামিলে বলিলেন, এই গল্পটা শুনিয়ে বৌঠাকরুনকে রাগ করতে বারণ ক'রো শৈলেশ, সত্যিকার খদ্দের আর নেই—সে চলে গেছে। মায়ের চেয়ে পিসির কাছে এসে যদি ছেলে মানুষ হয়, তার চেয়ে নাহয় ধার-ধোর করে বিভাকে একটা হাতিই আমি কিনে দেব। এই বলিয়া তিনি বিভার অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে হাসিতে শৈলেশ যোগ দিল না, এবং পাছে পরিহাসের সূত্র ধরিয়া বিভার সুপ্ত ক্রোধ উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে প্রাণপণে আপনাকে সংবরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষেত্রমোহন লজ্জিত হইয়া কহিলেন, ব্যাপার কি শৈলেশ?

শৈলেশ কহিল, বিভার কথায় সোমেনের সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন হবে না, তখন আবার কোন একটা নূতন ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, অর্থাৎ ডাইনির হাতে ছেলে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না,—না?

শৈলেশ বলিল, এই কটূক্তির জবাব না দিয়েও এ-কথা বলা যেতে পারে যে, ঊষা শীঘ্রই চলে যাচ্চেন।

চলে যাচ্চেন? কোথায়?

শৈলেশ কহিল, যেখান থেকে এসেছিলেন—তাঁর দাদার বাড়িতে।

ক্ষেত্রমোহনের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি স্ত্রীর মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, আমি এই রকমই কতকটা ভয় করেছিলাম শৈলেশ।

বিভা এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, স্বামীর সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের অর্থ সে

বুঝিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমাকে নিমিত্ত করেই কি তুমি এই ব্যবস্থা করতে যাচ্চো? তা যদি হয়, আমি নিষেধ করব না, কিন্তু একদিন তোমাদের দুজনকেই কাঁদতে হবে বলে দিচ্চি।

শৈলেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পরে সে মুসলমান ভৃত্য রাখা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সকালের সেই খাতাটার কথা পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিল, যেতে আমি বলিনি, কিন্তু যেতে বাধাও আমি দেব না। আত্মীয়-বন্ধু-মহলে একটা আলোচনা উঠবে এবং তাতে যশ আমার বাড়বে না তাও নিশ্চয় জানি, কিন্তু প্রকাণ্ড ভুলের একটা সংশোধন হয়ে গেল, তার জন্যে ভগবানকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দেব।

বিভা মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ক্ষেত্রমোহনও বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করিলেন না। শৈলেশ কহিল, তোমাদের কাছে সমস্ত জানানো কর্তব্য বলেই আজ আমি এসেছি। অন্ততঃ তোমরা না আমাকে ভুল কর।

ক্ষেত্রমোহন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, তার সাধ্য কি। হাঁ হে শৈলেশ, ভবানীপুরে সেই যে একবার একটা কথাবার্তা হয়েছিল, ইতিমধ্যে তাঁরা কেউ খবর-টবর নিয়েছিলেন কি?

শৈলেশ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, তোমার ইঙ্গিত এত অভদ্র এবং হীন যে আপনাকে সামলানো শক্ত। তোমাকে কেবল এই বলেই ক্ষমা করা যায় যে, কোথায় আঘাত করচ তুমি জানো না। এই বলিয়া সে ভিতরের উত্তাপে একবার নড়িয়া চড়িয়া আবার সোজা হইয়া বসিল।

ক্ষেত্রমোহন তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অবিচলিতভাবে এবং অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়া কহিলেন, সে ঠিক। জায়গাটা যে তোমার কোথায় আমি ঠাওর করতে পারিনি।

শৈলেশ নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বলিল, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সেদিন যে ব্যবহার করলে,—তাতে আমি আর তোমার কাছে কি বেশি প্রত্যাশা করতে পারি! তোমার দম্ভে ঘা লাগবে বলেই কখনো কিছু বলিনি, কিন্তু বহুপূর্বেই বোধ করি বলা উচিত ছিল।

ক্ষেত্রমোহন মুচকিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, তাই ত হে শৈলেশ, it reminds; স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার! ওটা আজও ঠিক শিখে উঠতে পারিনি, শেখবার বয়সও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—কিন্তু তুমি যদি এ সম্বন্ধে একটা বই লিখে যেতে পারতে ভাই—আচ্ছা, তোমরা ভাইবোনে ততক্ষণ নিরিবিলি একটু পরামর্শ কর, আমি এলাম বলে। এই বলিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ চেঁচাইয়া বলিল, বই লিখতে হয়ত দেবি হতেও পারে, কিন্তু ততক্ষণ শুনে যাও, ওই যে ভবানীপুরের উল্লেখ করে বিদ্রূপ করলে, তাঁরা কেউ আমার খবর নিন বা না নিন, আমাকে উদ্যোগী হয়ে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের বাহির হইতে শুধু জবাব দিলেন, নিশ্চয় হবে। এমনিই ত অযথা বিলম্ব হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই আসিয়া ক্ষেত্রমোহন পটলডাঙ্গার বাড়িতে দেখা দিলেন। শৈলেশ স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ অসময়ে ভগিনীপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কালকের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারের পরে অযাচিত ও এত শীঘ্র ইঁহাকে সে আশা করে নাই। মনে মনে কতকটা লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, আজ কি হাইকোর্ট বন্ধ নাকি?

ক্ষেত্রমোহন সহাস্যে বলিলেন, প্রশ্ন বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, তবে প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিলে নাকি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ততোধিক বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, বোধ করি আমিও বাহুল্য। আমার স্নানের সময় হয়েছে, তাতে বোধ করি তোমার আপত্তি হবে না।

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তুমি যেতে পারো।

বৌঠাকরুন, আসতে পারি?

পূজার ঘর এ গৃহে ছিল না। শোবার ঘরের একধারে আসন পাতিয়া ঊষা আহ্নিকে বসিবার আয়োজন করিতেছিল; কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া ভিজা চুলের উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া আহ্বান করিল, আসুন।

ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিয়াই অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, অসময়ে এসে অত্যাচার করলুম। হঠাৎ বাপের বাড়ি যাবার খেয়াল হয়েচে নাকি? বাবা কি পীড়িত?

ঊষা কহিল, বাবা বেঁচে নেই।

ওঃ—তা হলে মা'র অসুখ নাকি?

ঊষা বলিল, তিনি বাবার পূর্বেই গেছেন।

ক্ষেত্রমোহন ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তাহলে যাচ্ছেন কোথায়? আছে কে? এমন জায়গায় ত কোনমতেই যাওয়া হতে পারে না! শৈলেশের কথা ছেড়ে দিন, আমরাই ত রাজী হতে পারিনে।

ঊষা মুখ নীচু করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, পারবেন না?

না, কিছুতেই না।

কিন্তু এতকাল ত আমার সেই দাদার বাড়িতেই কেটে গেছে ক্ষেত্রবাবু। অচল হয়ে ত ছিল না।

ক্ষেত্রবাবু কহিলেন, যদি নিতান্তই যান, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে তা সত্যি করে বলে যান। না হলে কিছুতেই যেতে পাবেন না।

ঊষা নীরব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, কিন্তু সোমেন?

ঊষা কহিল, তার পিসি আছেন।

ক্ষেত্রমোহন হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিলেন, সে আমার স্ত্রী। আমি তার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

ঊষা মৌন হইয়া রহিল।

পারবেন না ক্ষমা করতে?

ঊষা তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, জগতে অপরাধ যখন আছে, তখন তার দুঃখভোগও আছে, এবং থাকবারই কথা। কিন্তু এর বিচার নেই কেন বলতে পারেন?

ঊষা কহিল, অর্থাৎ, একজনের অপরাধের শাস্তি আর একজনকে পোহাতে হয় কেন? হয় এইমাত্রই জানি, কিন্তু কেন, তা আমি জানিনে ক্ষেত্রমোহনবাবু।

কবে যাবেন?

দাদা নিতে এলেই। কালও আসতে পারেন।

ক্ষেত্রমোহনবাবু ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, একটা কথা আপনাকে কোনদিন জানাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্চে, গোপন রাখলে আমার অপরাধ হবে। আপনার আসবার পূর্বে এ বাড়িতে আর-একজনের আসবার সম্ভাবনা হয়েছিল। মনে হয় সে ষড়যন্ত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ঊষা কহিল, আমি জানি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তাহলে রাগ করে সেই ষড়যন্ত্রটাকেই কি অবশেষে জয়ী হতে দেবেন? এতেই কি—

কথা শেষ হইতে পাইল না। ঊষা শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, জয়ী হোক, পরাস্ত হোক ক্ষেত্রমোহনবাবু, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন—এই বলিয়া ঊষা দুই হাত যুক্ত করিয়া এতক্ষণ পরে ক্ষেত্রমোহনের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল।

সেই দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষেত্রমোহন নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল!

বার

স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ শৈলেশ বন্ধ করিল, কিন্তু ঊষা করিল না। তাহার আচরণে লেশমাত্র পরিবর্তন নাই—সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্ম ঠিক তেম্‌নিই সে করিয়া যাইতেছে। মুখ ফুটিয়া শৈলেশ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, অথচ, সবচেয়ে মুশকিল হইল তাহার এই কথা ভাবিয়া, এ গৃহ যে লোক চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া যাইতেছে সেই গৃহের প্রতি তাহার এতখানি মমতা-বোধ রহিল কি করিয়া? আজ সকালেই তাহার কানে গিয়াছে, দেয়ালের গায়ে হাত মুছিবার অপরাধে ঊষা নূতন ভৃত্যটাকে তিরস্কার করিতেছে। অভ্যাসমত কাজে ভুলভ্রান্তি তাহার নাই যদি-বা হয়, কিন্তু সর্বত্রই তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে এতটুকু শিথিলতাও যে শৈলেশের চোখে পড়ে না! ঊষাকে ভাল করিয়া জানিবার তাহার সময় হয় নাই, তাহাকে সে সামান্যই জানিয়াছে, কিন্তু সেইটুকু জানার মধ্যেই কিন্তু এটুকু জানা তাহার হইয়া গেছে যে, যাবার সংকল্প তাহার বিচলিত হইবে না। অথচ, সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এ বয়সে তাহার সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রকাণ্ড গরমিল যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিশ্রাম নাগরদোলায় পাক খাওয়াইয়া মারিতেছে।

ক্ষেত্রমোহন আসিয়া একেবারে সোজা রান্নাঘরের দরজায় দেখা দিলেন, কহিলেন, প্রসাদ পাবার আর বিলম্ব কত বৌঠাকরুন?

ঊষা মাথার কাপড়টা আরও একটুখানি টানিয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, সে কথা আপনার বড় কুটুম্বটিকে জিজ্ঞাসা করে আসুন, নইলে আমার সব হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ঠকবার পাত্রী আপনি নন, কিন্তু ঠকে গেলাম আমি নিজে। রান্নার বহর দেখে এই ভরা-পেটেও লোভ হয় বৌঠাকরুন, কিন্তু অসুখের ভয় করে। তবে, নেমন্তন্ন ক্যান্‌সেল করলে চলবে না, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনার ছেলেটি কৈ?

ঊষা কহিল, আজ কি যে তার মাথায় খেয়াল এল কিছুতেই ইস্কুলে যাবে না। কোনমতে দুটি খাইয়ে এইমাত্র পাঠিয়ে দিলাম।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনাকে সে বড্ড ভালবাসে! একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ভাল কথা, আপনার সেই বাপের বাড়ি যাবার প্রস্তাবটা কি হ'ল? বাস্তবিক বৌঠাকরুন, রাগের মাথায় আপনার মুখ দিয়েও যদি বেফাঁস কথা বার হয় ত ভরসা করবার সংসারে আর কিছু থাকে না।

ঊষা এ অভিযোগের উত্তর দিল না, নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। তথা হইতে বাহির হইয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের পড়ার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলেশ স্নানান্তে আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিল, মুখ ফিরিয়া চাহিল।

ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজ আজ বন্ধ নাকি হে?

না। তবে প্রথম দু ঘণ্টা ক্লাস নেই।

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা বেশ। কিন্তু বৌঠাকরুনের বাপের বাড়ি যাবার আয়োজন কিরূপ করলে?

শৈলেশ কহিল, আয়োজন যা করবার তিনি গেলে তবে করব। শুনচি কাল তাঁর দাদা এসে নিয়ে যাবেন।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি একটি ইডিয়ট। ও স্ত্রী নিয়ে তুমি পেরে উঠবে না ভাই, তার চেয়ে বরঞ্চ বদ্‌লাবদ্‌লি করে নাও, তুমিও সুখে থাকো, আমিও সুখে থাকি।

শৈলেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, বয়েস ত ঢের হ'ল ক্ষেত্র, এইবার এই অভদ্র রসিকতাগুলো ত্যাগ কর না!

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ত্যাগ কি সাধে করতে পারিনে ভাই, তোমাদের ব্যবহারে পারিনে। তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে বললেন, বাপের বাড়ি চলে যাবো; তুমি অমনি জবাব দিলে, যাবে যাও,—আমার ভবানীপুর এখনও হাতছাড়া হয়নি। এই-সমস্ত কি ব্যবহার? ভাইবোন একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। যাক, আমি সব ভেস্তে দিয়ে এসেচি,

যাওয়া-টাওয়া তাঁর হবে না। তুমি কিন্তু আর খুঁচিয়ে ঘা ক'রো না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন উঃ—ভারি বেলা হয়ে গেল, এখন চললুম, কাল সকালেই আসবো। ফিরিতে উদ্যত হইয়া সহসা গলা খাটো করিয়া কহিলেন, দিন-কতক একটু বনিয়ে চল না শৈলেশ! অধ্যাপকের ঘরের মেয়ে, অনাচার সহ্য করতে পারেন না, খানাটানাগুলো দুদিন না-ই খেলে! তাছাড়া এ-সব ভালও ত নয়,—খরচের দিকটাতেই চেয়ে দেখ না! আচ্ছা, চললুম ভাই, এই বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কখন আসিল, কি বলিয়া, কি করিয়া হঠাৎ সমস্ত ব্যাপার উলটাইয়া দিয়া গেল, সে ভাবিয়াই পাইল না।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল খাবার দেওয়া হইয়াছে। উত্তরের ঢাকা বারান্দায় যথা-নিয়মে আসন পাতিয়া ঠাঁই করা। প্রতিদিনের মত বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া অদূরে ঊষা বসিয়া আছে, শৈলেশ ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে বসিয়া গেল। অনেকবার তাহার ইচ্ছা হইল, ক্ষেত্রর কথাটা মুখোমুখি যাচাই করিয়া লইয়া সময়োচিত মিষ্ট দুটো কথা বলিয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিতে পারিল না, কিছুতেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। এমন কি সোমেনের ছুতা করিয়াও আলোচনা আরম্ভ করিতে পারিল না। অবশেষে খাওয়া সমাধা হইলে নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তের

পরদিন সকালে অবিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলেশ সেইমাত্র হাতমুখ ধুইয়া পড়িবার ঘরে চা খাইতে যাইতেছিল, বাড়ির মধ্যে এই অপরিচিত লোকটিকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? আগন্তুক ঊষার ছোটভাই। সে আপনার পরিচয় দিয়া কহিল, দাদা নিজে আসতে পারলেন না, দিদিকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বেশ ত নিয়ে যান। এই বলিয়া শৈলেশ তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রাতরাশের সর্ববিধ সরঞ্জাম টেবিলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র একবাটি চা ঢালিয়া লইয়া সে নিজের আরাম-কেদারায় আসিয়া উপবেশন করিল, অবশিষ্ট সমস্ত পড়িয়া রহিল, তাহার স্পর্শ করিবারও রুচি হইল না। ঊষার পিতৃগৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার কথা। এ দিক দিয়া অবিনাশকে দেখিয়া তাহার চমকাইবার কিছু ছিল না, এবং আসিয়াছে বলিয়াই যে অপরকে যাইতেই হইবে এমনও কিছু নয়; —হয়ত, শেষ পর্যন্ত যাওয়াই হইবে না,—কিন্তু নিশ্চয় একটা কিছু এ বিষয়ে না জানা পর্যন্ত সমস্ত দেহমন তাহার কি রকম যে করিতে লাগিল তাহার উপমা নাই। আজ সকাল-বেলাতেই ক্ষেত্রমোহনের আসিবার কথা, কিন্তু সে ভুলিয়াই গেল, কিংবা কোন একটা কাজে আবদ্ধ হইয়া রহিল, সহসা এই আশঙ্কাই যেন তাহার সকল আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিল। সে আসিয়া পড়িলে যা হোক একটা মীমাংসা হইয়া যায়। এইটাই তাহার একান্ত প্রয়োজন। অধৈর্যের উত্তেজনায় তাহার কেবলি ভয় করিতে লাগিল, পাছে আপনাকে আর সে ধরিয়া না রাখিতে পারে, পাছে নিজেই ছুটিয়া গিয়া ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, কাল ক্ষেত্রমোহনের সহিত তাহার কি কথা হইয়াছে। শৈলেশ নিজেকে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া ঘড়ির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সময় যখন আর কাটে না, এমনি সময়ে দ্বারের ভারি পর্দা সরাইয়া যে ব্যক্তি সহসা প্রবেশ করিল সে একান্ত প্রত্যাশিত ক্ষেত্রমোহন নয়—অবিনাশ। শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া একখানা বই টানিয়া লইল। তাহার সর্বদেহে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল।

অবিনাশ বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি চোখ পড়িতে ও-ধারের একখানা চেয়ার আরও খানিকটা দূরে টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। গৃহস্বামী অভ্যর্থনা করিবে এ ভরসা বোধ করি তাহার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢোকার একটা কারণ পর্যন্তও

যখন সে জিজ্ঞাসাও করিল না, তখন অবিনাশ নিজেই কথা কহিল। বলিল, এই আড়াইটার গাড়িতেই ত দিদি যেতে চাচ্চেন।

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, চাচ্চেন? কেন, আমার পক্ষ থেকে কি তিনি বাধা পাবার আশঙ্কা করচেন?

অবিনাশ ছেলেমানুষ, সে হঠাৎ কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, আজ্ঞে না।

দরজার বাহিরে চুড়ির শব্দ পাইয়া শৈলেশের মন আরও বাঁকিয়া গেল। বলিল, না, আমার তরফ থেকে তাঁর যাবার কোন নিষেধ নেই।

অবিনাশ নীরব হইয়া রহিল। শৈলেশ প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার আসবার কথা শুনেছিলুম, তিনি এলেন না কেন?

অবিনাশ সঙ্কুচিতভাবে আস্তে আস্তে বলিল, তাঁর আমাকে পাঠাবারও তেমন ইচ্ছে ছিল না।

কেন?

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ বলিল, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে সব কথা বলাও যায় না, বলে লাভও নেই। তবে, তোমার দাদা যদি কখনো জানতে চান ত ব'লো যে, এ ব্যাপারে ঊষার দোষ নেই, দোষ কিংবা ভুল যদি কারও হয়ে থাকে ত সে আমার। তাঁকে আনতে পাঠানোই আমার উচিত হয়নি।

একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, মনে হ'ত বাবা অন্যায় করে গেছেন! দীর্ঘকাল পরে অবস্থাবশে যখন সময় এল, ভাবলুম এবার তার প্রতিকার হবে। তোমার দিদি এলেন বটে, কিন্তু এক দোষ শত দোষ হয়ে দেখা দিল।

ইহার আর উত্তর কি! অবিনাশ মৌন হইয়া রহিল, এমনি সময় সহসা অন্য দিকের দরজা ঠেলিয়া ঘরে ক্ষেত্রমোহন প্রবেশ করিলেন। শৈলেশ চাহিয়া দেখিল, কিন্তু থামিতে পারিল না। কঠিন বাক্যের স্বভাবই এই যে, সে নিজের ভারেই নিজে কঠিনতর হইয়া উঠিতে থাকে। ঊষা অন্তরালে দাঁড়াইয়া; অভ্রান্ত লক্ষ্যে তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ করিবার নির্দয় উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া শৈলেশ বলিতে লাগিল, তোমার ভগিনীকে একদিন বিবাহ করেছিলুম সত্য, কিন্তু সহধর্মিণী তাঁকে কোনমতেই বলা চলে না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ, ধর্ম কিছুই এক নয়—জোর করে তাঁকে গৃহে রাখতে নিজের বাড়িটাকে যদি স্মৃতিশাস্ত্রের টোল বানিয়েও তুলি, কিন্তু আমার একমাত্র ছোটবোন দুঃখে ক্ষোভে পর হয়ে যায়, একটিমাত্র ছেলে কুশিক্ষায় কু-দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ ত কোন-ক্রমেই আমি হতে দিতে পারিনে। তবে তাঁর কাছে আমি এইজন্যে কৃতজ্ঞ যে, মুখ ফুটে আমি যা বলতে পারছিলুম না, তিনি নিজে থেকে সেই দুরূহ কর্তব্যটাই আমার সম্পন্ন করে দিলেন।

ক্ষেত্রমোহন বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। শৈলেশ লাজুক, দুর্বল-স্বভাবের লোক, ভয়ংকর কিছু উচ্চারণ করা তাহার একান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু উন্মাদের মত সে এ কি করিতেছে! ঊষার ছোটভাই লইতে আসিয়াছে এ সংবাদ তিনি ইতিপূর্বেই পাইয়াছিলেন, অতএব অপরিচিত লোকটি যে সে-ই, তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহারই সম্মুখে এ-সব কি? ক্ষেত্রমোহন ব্যগ্র-অনুনয়ে হাত-দুটি প্রায় জোড় করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, দেখবেন, আপনার দিদিকে যেন এ-সব ঘুণাগ্রেও জানাবেন না।

অপরিচিত ছেলেটি দ্বারের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে কিছুই জানাতে হবে না, বাইরে দাঁড়িয়ে দিদি নিজের কানেই সমস্ত শুনতে পাচ্চেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে?—ওইখানে?

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি জবাব দিবার পূর্বেই শৈলেশ স্পষ্ট করিয়া বলিল, হাঁ, আমি জানি ক্ষেত্র, তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে।

উত্তর শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্তব্ধ বিবর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সেইদিন ঘণ্টা দুই-তিন পরে ভগিনীকে লইয়া যখন অবিনাশ স্টেশন অভিমুখে

রওনা হইল, তখন সোমেন তাহার পিসির বাড়িতে, তাহার পিতা কলেজগৃহে এবং ক্ষেত্রমোহন হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া বিভা স্বামীকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কি করচেন দেখলে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, দেখলুম ত হাতে আছে একখানা বই, কিন্তু আসলে করচেন বোধ করি অনুশোচনা।

এ কাজটা তুমি কবে করবে?

কোন্‌টা? বই, না অনুশোচনা?

বিভা কহিল, বই তোমার হাতে আর মানাবে না, আমি শেষের কাজটা বলচি।

ক্ষেত্রমোহন খোঁচা খাইয়া বলিলেন, ভাইকে ডেকে বাপের বাড়ি চলে গেলেই বোধ হয় করতে পারি।

বিভার মন আজ প্রসন্ন ছিল, সে রাগ করিল না। কহিল, ও কাজটা আমি বোধ হয় পেরে উঠবে না। কারণ, হিঁদুয়ানীর জপ-তপ এবং ছুঁই-ছুঁই করার বিদ্যেটা ছেলেবেলা থেকেই শিখে ওঠবার সুবিধে পাইনি।

স্ত্রীর কথায় ক্ষেত্রমোহন আজকাল প্রায়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন, এখন কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে বলিলেন, তোমার অতি বড় দুর্ভাগ্য যে, ও সুযোগ তুমি পাওনি। পেলে হয়ত এতবড় বিড়ম্বনা তোমার দাদার অদৃষ্টে আজ ঘটত না। এই বলিয়া তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চৌদ্দ

ভবানীপুরের সেই সুশিক্ষিতা পাত্রীটিকে পাত্রস্থ করিবার চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হইল, শুধু বিভা এবার স্বামীর আন্তরিক বিরাগের ভয়ে তাহাতে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি নানা প্রকারে দেখাইতে বিরত রহিল না। কন্যাপক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রমোহন একদিন সোজাসুজি প্রশ্ন করিলে শৈলেশ অস্বীকার করিয়া সহজভাবেই কহিল, জীবনের অধিকাংশই ত গত হয়ে গেল ক্ষেত্র, বাকী ক'টা দিনের জন্যে আর নতুন ঝঞ্ঝাট মাথায় নিতে ভরসা হয় না। সোমেন আছে, বরঞ্চ আশীর্বাদ কর তোমরা, সে বেঁচে থাক—এ-সবে আমার আর কাজ নেই।

মানুষের অকপট কথাটা বুঝা যায়, ক্ষেত্রমোহন মনে মনে আজ বেদনাবোধ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি আদালতের ফেরত প্রায়ই আসিতে লাগিলেন।

গৃহে গৃহিণী নাই, সন্তান নাই, গোটা-তিনেক চাকরে মিলিয়া সংসার চালাইতেছে—দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাড়িটা এমনি বিশৃঙ্খলা ছন্নছাড়া মূর্তি ধারণ করিল যে, ক্লেশ অনুভব না করিয়া পারা যায় না। প্রায় মাসাধিককাল পরে সে সেই কথারই পুনরুত্থাপন করিয়া কহিল, তুমি ত মনের ভাব আমার জান শৈলেশ, কিন্তু কেউ একজন বাড়িতে না থাকলে বাঁচা কঠিন। বিশেষ বুড়ো বয়সে—

উমা আজ উপস্থিত ছিল, সে বলিল, বুড়ো বয়সের এখনো ঢের দেরি, এবং তার ঢের আগেই বৌদি এসে হাজির হবেন। রাগ করে মানুষে আর কতকাল বাপের বাড়ি থাকে? এই বলিয়া সে একবার দাদার মুখের প্রতি ও একবার শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু দুজনের কেহই জবাব দিল না। বিশেষতঃ শৈলেশের মুখ যেন সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু উমা চাহিয়াই আছে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ পরে শুধু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, তিনি আর আসবেন না।

উমা অত্যন্ত অবিশ্বাসে জোর করিয়া বলিল, আসবেন না? নিশ্চয় আসবেন। হয়ত এই মাসের মধ্যেই এসে পড়তে পারেন। হাঁ দাদা, পারেন না?

ফিরিয়া আসা যে কত কঠিন দাদা তাহা জানিতেন। যাইবার পূর্বে শৈলেশের মুখের প্রত্যেক কথাটি তাহার বুকে গাঁথা হইয়াছিল, উষা কোনদিন যে সে-সকল বিস্মৃত হইতে পারিবে, তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। বধূর প্রতি শৈলেশের পিতা অপরিসীম

অবিচার করিয়াছে, ফিরিয়া আসার পরে বিভা ঈর্ষাবশে বহুবিধ অপমান করিয়াছে এবং তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে শৈলেশ নিজে তাহার যাবার দিনটিতে। তথাপি হিন্দু নারীর শিক্ষা ও সংস্কার, বিশেষ ঊষার মধুর চরিত্রের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়াটা ক্ষেত্রমোহন কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেন না। এই কথা মনে করিয়া তাঁহার যখনই কষ্ট হইত, তখনই এই বলিয়া তিনি আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিতেন যে, ঊষা নিজের প্রতি অনাদর অবহেলা সহিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যখন তাহার ধর্মাচরণে ঘা দিল, সে আঘাত সে সহিল না। বোধ করি এইজন্যই বহুদিন পরে একদিন যখন তাহার স্বামীগৃহে ডাক পড়িল, তখন এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু অভিমান করে নাই, নিঃশব্দে এবং নির্বিচারে ফিরিয়া আসিয়াছিল। হিন্দু রমণীর এই ধর্মাচরণ বস্তুটির সহিত সংস্কারমুক্ত ও আলোকপ্রাপ্ত ক্ষেত্রমোহনের বিশেষ পরিচয় ছিল না। এখন নিজের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করিয়া আর একজনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আপনাকে বঞ্চিত করিবার শক্তি দেখিয়া তাঁহার নিজেদের সমস্ত সমাজটাকেও যেন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হইত। তিনি মনে মনে বলিতেন, এতখানি সত্যিকার তেজ ত আমাদের কোন মেয়ের মধ্যেই নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইত, বুঝি এই সত্যকারের ধর্ম-বস্তুটাই তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া গেছে। যে বিশ্বাস আপনাকে পীড়িত করিতে পিছাইয়া দাঁড়ায় না, শ্রদ্ধার গভীরতা যাহার দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে দিয়া আপনাকে যাচাই করিয়া লয়, এ বিশ্বাস কৈ বিভার? কৈ উমার? আরও সে ত অনেককেই জানে, কিন্তু কোথায় ইহার তুলনা? ইহারই অনুভূতি একদিকে সঙ্কোচ ও আর-একদিকে ভক্তিতে তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ করিয়া দিতে থাকিত। কারণ, এই কয়টা দিনের মধ্যেই স্বামীকে যে ঊষা কতখানি ভালবাসিয়াছিল এ কথা ত তাঁহার অবিদিত ছিল না। আবার পরক্ষণেই যখন মনে হইত, সমস্ত ভাসিয়া গিয়া এতবড় কাণ্ড ঘটিল কিনা শুধু একজন মুসলমান ভৃত্য লইয়া—যে আচার সে পালন করে না, বাটীর মধ্যে তাহারই পুনঃ প্রচলন একেবারে তাহাকে বাড়ি-ছাড়া করিয়া দিল। অপরে যাই কেন না করুক, কিন্তু বৌঠাকরুনকে স্মরণ করিয়া ইহারই সঙ্কীর্ণ তুচ্ছতায় এই লোকটি যেন একেবারে বিস্ময় ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

উমা প্রশ্ন করিয়া মুখপানে চাহিয়াই ছিল, জবাব না পাইয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, হাঁ দাদা, বললে না?

কি রে?

উমা কহিল, বেশ! আমি বলছিলুম বৌদি হয়ত এই মাসেই ফিরে আসতে পারেন। তোমার মনে হয় না দাদা?

ভগিনীর প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যদি ধরাই যায় তিনি আসবেন না—বহুকাল তাঁর না এসেই কাটছিল, বাকীটাও না এসে কাটতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি অন্য উপায় নেই? আমি সেই কথাই বলচি।

উমা ঠিক বুঝিল না, সে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

শৈলেশ তাহার বিস্মিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাঁর ফিরে আসা আমি সঙ্গত মনে করিনে উমা। তিনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু সহধর্মিণী তাঁকে আমি বলতে পারিনে।

ঊষার বিরুদ্ধে এই অভদ্র ইঙ্গিতে ক্ষেত্রমোহন মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, ধর্মই নেই আমাদের, তা আবার সহধর্মিণী। ও-সব উচ্চাঙ্গের আলোচনায় কাজ নেই ভাই, আমি সংসার চালাবার মত একটা ব্যবস্থার প্রস্তাব করচি।

শৈলেশ গভীর বিস্ময়ে কহিল, ধর্ম নেই আমাদের?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, কোন্‌খানে আছে দেখাও? রোজগার করি, খাইদাই থাকি, ব্যস। আমাদের সহধর্মিণী না হলেও চলে। তখনকার লোকের ছিল শ্রাদ্ধ-শান্তি, পুজো-পাঠ, ব্রত-নিয়ম, ধর্ম নিয়েই তারা মেতে থাকত, তাদের ছিল সহধর্মিণীর প্রয়োজন। আমাদের অত বায়নাক্কা কিসের?

শৈলেশ মর্মাহত হইয়া কহিল, সহধর্মিণী তাই? শ্রাদ্ধ-শান্তি, পুজো-পাঠ—

কথা তাহার শেষ হইল না, ক্ষেত্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাই ভাই তাই, তা ছাড়া আর কিছু নয়। তুমিও হিন্দু, আমিও হিন্দু— without offence পুজোও করিনে, মন্দিরেও যাইনে, কেষ্ট-বিষ্টুকে ধরে খোঁচাখুঁচি করার কু-অভ্যাসও আমাদের নেই—মেয়েরা ত আরও harmless, আমরা সহজ মানুষ—লোক ভাল। কি হবে ভাই আমাদের অত বড় পাঁচ-সাতটা অক্ষরের সহধর্মিণী নিয়ে, ছোট্ট একটু স্ত্রী হলেই আমাদের খাসা চলে যাবে। তুমি ভাই দয়া করে একটু রাজী হও—ভবানীপুরের ওঁরা ভারী ধরেচেন—তোমার বোনটিরও ভয়ানক ইচ্ছে, কথাটা রাখ শৈলেশ।

শৈলেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ কোরচ, ক্ষেত্র!

ব্যাপার দেখিয়া উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রমোহন ভীত হইয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, না ভাই শৈলেশ, না। যদি ও-রকম কিছু করেও থাকি, তোমার চেয়ে আমাকেই আমি বেশি করেচি।

শৈলেশ প্রতিবাদ করিল না, কেবল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পনর

কথাটাকে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে শান্ত হইবার পাঁচ-সাত দিন সময় দিয়া আর একদিন ফিরিয়া আসিয়া তখন ভবানীপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া তিনি উমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু সপ্তাহ গত না হইতেই ছাপরা কোর্টে হঠাৎ একটা মোকদ্দমা পাওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইল। যাইবার পূর্বে পাত্রী-পক্ষ ও পাত্র-পক্ষের তরফে বিভাকে আশা দিয়া গেলেন যে, কেস যতটা হোপলেস মনে হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা নয়। বরঞ্চ, মাছ চারের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, হঠাৎ টোপ গিলিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নয়।

অনেকদিন পরে স্ত্রীর সহিত আজ তাঁহার সদ্ভাবে বাক্যালাপ হইল। উমার মুখে বিভা কিছু কিছু ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, আমি মনে করতুম ঊষা-বৌদিদির তুমি পরম বন্ধু, তুমি যে আবার দাদার বিয়ের উদ্যোগ করতে পারো, মাসখানেক আগে এ কথা আমি ভাবতেও পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মাসখানেক পূর্বে কি আমিই ভাবতে পারতুম? কিন্তু এখন শুধু ভাবা নয়, উচিত বলেই মনে হয়। ঊষা-বৌঠাকরুনের বন্ধু আমি এখনও, এবং চিরদিন তাঁর শুভকামনাই করব; কিন্তু যা হবার নয়, হয়ে লাভ নেই, তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেই বা ফল কি!

বিভা অতি-বিজ্ঞের চাপা হাসি দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, তোমরা পুরুষ-মানুষ বলেই বোধ হয় বৌঠাকরুনটিকে বুঝতে এত দেরি হ'ল, আমি কিন্তু দেখবামাত্রই তাঁকে চিনেছিলুম। তাঁকে নিয়ে আমরা চলতে পারতুম না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, সে ত চোখেই দেখতে পেলুম বিভা, তাঁকে সরে পড়তে হ'ল এবং তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বোঝবার পার্থক্য ঘটেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একটু অন্য রকমের হলে আজ জিনিসটা কি দাঁড়াত এখন সে আলোচনা বৃথা, তবে এ কথা তোমার মানি, ভুল আমার একটু হয়েছিল।

বিভা কহিল, যাক, তা হলেই হ'ল। জপ-তপ আর হিন্দুয়ানীর সুখ্যাতিতে হঠাৎ যে-রকম মেতে উঠেছিলে, আমার ত ভয় হয়েছিল। আমরাও মুসলমান খ্রীস্টান নই, কিন্তু নিজে ছাড়া সবাই ছোট, হাতে খেলে-ছুঁলেই জাত যাবে—এ দর্প কেন? শুধু ভট্চায্যিগিরি ছাড়া আর সব রাস্তাই নরকে যাবার, এ ধারণা তাঁর বাপের বাড়িতে চলতে পারে, কিন্তু এখানে পারে না। আর পারে না বলেই ত স্বামীর আশ্রয়ে তাঁর স্থান হ'ল না।

কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। এমন করিয়া সত্য-মিথ্যায় জড়ানো বলিয়া ক্ষেত্রমোহন

নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, জবাব দিতে পারিলেন না।

এই সময় উমা ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

বিভা তাহার নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, শুধু আপনার জাত বাঁচিয়ে যাওয়াটাই কি বৌদিদির সবচেয়ে বড় হ'ল? ধর, তোমার নালিশটা যদি সত্যি হয়, আমার জন্যে দাদা যদি তাঁকে অপমান করেই থাকেন, তেমন অপমান কি তাঁর জন্যে তুমি আমাকে করনি? তাই বলে কি তোমাকে ছেড়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব? এই কি তুমি বল?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, না, তা আমি বলিনে।

বিভা কহিল, বলতে পারো না আমি জানি। উমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার দাদা হঠাৎ একটা নূতন জিনিসের বাইরেটা দেখেই মজে গিয়েছিলেন। হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামির শিক্ষা আমরা পাইনি, কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে যা পেয়েছিলুম সে ঢের ভদ্র, ঢের সত্য। একটু হাসিয়া কহিল, তোমার দাদার ভারী ইচ্ছে ছিল, বৌঠাকরুনের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখো। বসে শোনবার এখন সময় নেই ভাই, কিন্তু কি কি তার কাছে শিখলে আর কি-ই বা বাকী রয়ে গেল, তোমার দাদাকে নাহয় শোনাও। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছোট ভগিনীর সম্মুখে স্ত্রীর হাতের খোঁচা তাঁহাকে বেশি করিয়াই বিঁধিল, কিন্তু জবাব দিতে পারিলেন না। হিঁদুয়ানীর অনেকখানি হইতেই তাঁহারা ভ্রষ্ট, কিন্তু মেয়েদের আচারনিষ্ঠা সাবেক দিনের জীবন-যাত্রার ধারা কল্পনায় তাঁহাকে অতিশয় আকর্ষণ করিত। এইজন্যেই চোখের উপরে অকস্মাৎ ঊষাকে পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাহারই আচরণে আজ সকলের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গেছে। এই বধূটিকেই কেন্দ্র করিয়া সে যে শিক্ষা ও সংস্কারের কথা আত্মীয়-পরিজন মধ্যে মেয়েদের কাছে সগর্বে বার বার বলিত, সেইখানেই তাহার অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। নিজের জন্য ঊষা নিজেই শুধু দায়ী, তাহার অন্যায় আর কিছু স্পর্শ করে নাই—করিতেই পারে না। এই কথাটা তিনি জোর দিয়া বলিতে চাহিলেও মুখে তাঁহার বাধিয়া যাইত। তাই স্ত্রী চলিয়া গেলে তিনি উমার কাছে কতকটা জবাবদিহির মতই সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, গোঁড়ামি সকল জিনিসেরই মন্দ এ আমি অস্বীকার করিনে উমা—হিঁদুয়ানীর ঐ গলদটাই ঘুচানো চাই—কিন্তু আমরা যে আরও মন্দ এ কথা অস্বীকার করলে ত আরও অন্যায় হবে।

দাদা ও বৌদির বাদ-বিতণ্ডার আলোচনায় উমা চিরদিনই মৌন হইয়া থাকিত, বিভার অনুপস্থিতিতেও তাই এখনও নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

সেই রাত্রে ছাপরা যাইবার পূর্বে ক্ষেত্রমোহন বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার ফিরতে বোধ করি চার-পাঁচ দিন দেরী হবে, ইতিমধ্যে ভবানীপুরে ওঁদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়, ব'লো, শৈলেশকে সম্মত করাতে আমি পারব।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠাকরুন তাহলে আর ফিরবেন না?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, না। যতই ভাবছি, মনে হচ্চে শৈলেশের চেয়ে তাঁর অপরাধই বেশি। তুমি ঠিক কথাই বলেচ। যে শিক্ষায় মানুষকে এতবড় সঙ্কীর্ণ এবং স্বার্থপর করে তোলে, সে শিক্ষার মূল্য এককালে যতই থাক এখন আর নেই। অন্ততঃ আমাদের মধ্যে তার আর পুনঃপ্রচলনের আবশ্যকতা নেই। তাই বটে। বৌঠাকরুনের আচার-বিচারের বিড়ম্বনাই ছিল, বস্তু কিছু ছিল না। থাকলে গৃহাশ্রয় ত্যাগ করতেন না। আচ্ছা চললুম, এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া মোটরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

মফস্বলে মোকদ্দমা সারিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার পাঁচদিনের বদলে দিন-দশেক বিলম্ব হইয়া গেল। বাটীতে পা দিয়া প্রথমেই দেখা মিলিল উমার। সে-ই খবর দিল যে, দিন-দুই পূর্বে মাস-ছয়েকের ছুটি লইয়া শৈলেশবাবু আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছেন, এবং সোমেনকেও স্কুল ছাড়াইয়া এবার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

এমন হঠাৎ যে?

উমা কহিল, কি জানি! সোমেনকে নিতে এসেছিলেন, বললেন, শরীর ভাল নয়।

বিভার ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শরীর ভাল না থাকবারই কথা, কিন্তু সারবার ব্যবস্থা ও নয়। আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু উমা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

ষোল

আরও পাঁচটা জুনিয়র ব্যারিস্টারের যেভাবে দিন কাটে, ক্ষেত্রমোহনের দিনও তেমনি কাটিতে লাগিল। হাতে টাকার টান পড়িলে হিঁদুয়ানী ও সাবেক চালচলনের অশেষ প্রশংসা করেন, আবার অর্থাগম হইলেই চুপ করিয়া যান—যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলে। শৈলেশের তিনি বাস্তবিক শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহাকে চিনিতেন, তাহার মত দুর্বল-প্রকৃতির মানুষকে দিয়ে প্রায় সব কাজই করানো যায়, এই মনে করিয়া তিনি ভবানীপুর এখনও হাতছাড়া করেন নাই। তাহাদের এই বলিয়া ভরসা দিতেন যে, পশ্চিম হইতে ঘুরিয়া আসার যা বিলম্ব। বৌঠাকরুনকে তিনি এখনও প্রায় তেমনি স্নেহ করেন, তেমনি শ্রদ্ধাই প্রায় এখনও তাঁহার প্রতি আছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কাজ নেই। যেখানে থাকুন সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, ধর্মজীবনের তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক, কিন্তু শৈলেশের গৃহস্থালীর মধ্যে আর নয়। নিজের একটা ভুল এখন প্রায়ই মনে হয়, স্বামীকে ঊষা ভালবাসিতে পারে নাই, পারাও কখনও সম্ভব নয়। ছেলেবেলা হইতে কড়া রকমের আচার-বিচারের ভিতর দিয়া ধাতটা তাহার কড়া হইয়াই গেছে, সুতরাং ইহকালের চেয়ে পরকালই তাহার বেশি আপনার। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও তাই এত সহজ হইয়াছে। তাঁহার নিজের মধ্যে যে স্বামী ছিল, ঊষার এই আচরণে সে যেমন ভীত, তেমনি ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইত, সোমেনকে যে সে এত সত্বর ভালবাসিয়াছিল, সেও কেবল সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার কড়া কর্তব্যের দিক দিয়া। সত্যকার স্নেহ নয় বলিয়াই যাবার দিনটিতে তাহার কোথাও কোন টান লাগে নাই।

এমনিভাবেই যখন কলিকাতায় ইঁহাদের দিন কাটিতেছিল, তখন মাস-দুই পরে সহসা এলাহাবাদ হইতে খবর আসিল যে, সোমেনের এই কচি বয়সেই শৈলেশ তাহার পৈতা দিয়াছে, এবং নিজেও এক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গাস্নান একটা দিনের জন্যেও পিতাপুত্রের বাদ যাইবার জো নাই এবং মাছ-মাংস যে পাড়ায় আসে সে পথ দিয়া শৈলেশ হাঁটে না।

শুনিয়া উমা চুপিচুপি হাসিতে লাগিল। বিভা কহিল, তামাশাটি কে করলেন? যোগেশবাবু?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, খবর যোগেশবাবুর কাছ থেকেই এসেচে সত্যি, কিন্তু তামাশা করবার মত ঘনিষ্ঠতা ত তাঁর সঙ্গে নেই!

বিভা কহিল, দাদার বন্ধু ত, দোষ কি? একটু থামিয়া বলিলেন, কেন জানো? বৌদিদির সমস্ত ব্যাপার দাদার কাছেই শুনেছেন এবং এত লোকের মাঝখানে তুমিই শুধু তাঁর গোঁড়ামির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে—তাই এ রসিকতাটুকু তোমার 'পরেই হয়েচে। সহাস্যে বলিতে লাগিল, কেস্ আরম্ভ করবার সময় মাঝে মাঝে বুদ্ধিটা যদি আমার কাছে নাও ত মোকদ্দমা বোধ হয় তোমাকে এত হারতে হয় না। উমা, আজ একটু চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নাও, সাতটার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে কিন্তু লাবণ্য রাগ করবে। তোমার দাদাটিকে আড়ালে ডেকে একটু বলে দিয়ো ভাই, ঠেকলে যেন এখন থেকে কন্‌সাল্ট করেন। পয়সা যারা দেয় তারা খুশি হবে।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবুর হঠাৎ ঠাট্টা করার হেতুটা, যে বৌদিদি ঠিক অনুমান করিয়াছেন তাহা সে বুঝিল।

ইহার দিন পাঁচ-ছয় পরে, একখানা মস্ত চিঠি আনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, যোগেশবাবুর বাবার লেখা। বয়স সত্তর-বাহাত্তর—চাক্ষুষ আলাপ নেই, চিঠিপত্রেই পরিচয়। লোক কেমন ঠিক জানিনে, তবে এটা ঠিক জানি যে, ঠাট্টার সুবাদ আমার সঙ্গে তাঁর নেই।

দীর্ঘ পত্র, বাঙলায় লেখা। আদ্যোপান্ত বার-দুই নিঃশব্দে পড়িয়া বিভা মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি? তোমাকে ত একবার যেতে হয়।

কিন্তু আমার ত এক মিনিটের সময় নেই।

বিভা কহিল, সে বললে হবে না। এ বিপদে আমরা না গেলে আর যাবে কে? এ চিঠির অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, সে যে ঘোরতর বিপদ তাতে ত আর একবিন্দু সন্দেহ নেই!

ক্ষেত্রমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যাই কি করে? এবং গেলেই যে বিপদ কাটবে তারই বা ঠিকানা কি!

দুজনে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশের দ্বারা সমস্তই সম্ভব, মনের জোর বলে যে বস্তু সে তার একেবারে নেই। মরুক গে সে, কিন্তু দুঃখ এইটুকু যে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও সে বিগড়ে তুলচে। যেমন করে পারো এইখানে তোমার বাধা দেওয়া চাই।

বিভা বিষণ্ণ গম্ভীরমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কান্নাকাটি, অভিমান সমস্তই করিতে পারে, কিন্তু ঠেকাইবার সাধ্য তাহার নাই, তাহা সে মনে মনে জানিত। ক্ষেত্রমোহন অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল, কিন্তু একটি জিনিস আমি নিশ্চয় ধরেচি বিভা, উষাকে তোমার দাদা সত্যই ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমেনের মাকে কোনদিন বাসেনি, এ-সব হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া।

বিভা রাগ করিল। কহিল, তাই, এমনি করে তাঁর মন পাওয়ার চেষ্টা করচেন। দেখ, দাদা আমার দুর্বল হতে পারেন, কিন্তু ইতর নন। কারও জন্যেই এই সঙ সাজার ফন্দি মাথায় আসবে না।

এই প্রতিক্রিয়া বস্তুটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার বিভা তাহার কি জানে! শব্দটা শুধু ক্ষেত্রমোহন বইয়ে পড়িয়াছেন, তিনিও ইহার বিশেষ কিছু জানেন না, তাই স্ত্রীর ক্রোধের প্রত্যুত্তরে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অন্ধকারে তর্কযুদ্ধ চালাইতে তাঁহার সাহস হইল না।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া যাই হোক কাজের বেলায় বিভাই জয়ী হইল। স্বামীকে দিন-দুয়ের মধ্যেই কাজকর্ম ফেলিয়া এলাহাবাদ রওনা হইতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনুপূর্বিক যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি অপ্রিয়। যোগেশবাবুর বাটীর কাছেই বাসা, কিন্তু শৈলেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সে গুরুভাইদের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনে বৃন্দাবন গিয়াছে, দেশ হইয়াছে সোমেনের সঙ্গে। তাহার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচারীর বেশ, শাস্ত্রসঙ্গত আচার-বিচার। স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় বোধ করি ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া যান। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমাকে দেখে সে বেচারার দুচোখ ছলছল করতে লাগলো। তার চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন খাবার কষ্টটাই তার বেশি হয়েছে।

এই ছেলেটির প্রতি বিভার এক প্রকারের স্নেহ ছিল, তাহা অত্যন্ত বেশি না হইলেও বিদেশে দুঃখ পাইতেছে শুনিয়া সে সহিতে পারিল না। তাহার নিজের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তাকে জোর করে নিয়ে এলে না কেন?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু ভেবে দেখলুম, তাতে শেষ পর্যন্ত সুফল ফলবে না। ধর্মের ঝোঁকটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি। শৈলেশ আমাদের উপর ঢের বেশি বেঁকে যেত।

বিভা চোখ মুছিয়া কহিল, এত ব্যাপার ঘটেছে জানলে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যেতুম।

সতর

চিঠি লেখালেখি একপ্রকার বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, তথাপি কলিকাতায় আত্মীয়-বন্ধুমহলে শৈলেশের অদ্ভুত কীর্তিকথা প্রচারিত হইতে বাধে নাই। হয়ত বা স্থানে স্থানে বিবরণ একটু ঘোরালো হইয়াই রটিয়াছিল। ভবানীপুরে এ সংবাদ যে গোপন

ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। লজ্জায় বিভা মুখ দেখাইতে পারিত না, শুধু স্বামীর কাছে সে দম্ভ করিয়া বলিত, দাদা আগে ফিরে আসুন, আমার সুমুখে কি করে এ-সব করেন আমি দেখবো।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া থাকিতেন—বিভার দ্বারা বিশেষ কিছু যে হইবে তাহা বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু সমাজের সমবেত মর‍্যাল প্রেসারের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। দুর্বলচিত্ত শৈলেশ হয়ত তাহা বেশি দিন ঠেকাইতে পারিবে না, এ ভরসা তিনি করিতেন।

এদিকে শৈলেশ আরও মাস-চারেক ছুটি বাড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাও শেষ হইতে আর মাস-দুই বাকী। চাকরি ছাড়িতে সে পারিবে না তাহা নিশ্চয়। গঙ্গাস্নান ও ফোঁটা-তিলক যতই কেন না সে প্রয়াগে বসিয়া করুক, শ্রীগুরু ও গুরুভাইয়ের দল এ কুমতলব তাহাকে প্রাণ গেলেও দিবে না। তার পরে ফিরিয়া আসিলে একবার লড়াই করিয়া দেখিতে হইবে।

সেদিন চা খাইতে বসিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এবার কিন্তু ঊষা বৌঠাকরুন এলে তাঁকে তাড়াতাড়ি ভাইকে ডাকিয়ে, আর বাপের বাড়ি পালাবার ফন্দি করতে হবে না। জপ-তপের মধ্যে দুজনের বনবে!

বিভার মুখ মলিন হইল, জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আসার কথা তুমি শুনেচ নাকি!

না।

বিভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, পাড়াগাঁয়ে শুনেচি নানা-রকমের তুকতাক আছে, আচ্ছা, তুমি বিশ্বাস কর?

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, না। যদিও বা থাকে এ-সব করবেন না।

কেন করবেন না?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, বৌঠাকরুনের ওপর আমি খুশি নই, তাঁর প্রতি আমার সে শ্রদ্ধাও আর নেই, কিন্তু এই-সব হীন কাজ যে তিনি করতেই পারেন না তা তোমাকে আমি দিব্যি করে বলতে পারি।

বিভা ঠিক বিশ্বাস করিল না। শুধু ধীরে ধীরে কহিল, যা ইচ্ছে হোক, কিন্তু ছেলেটাকে আমি কেড়ে আনবই, তোমাকেও আমি প্রতিজ্ঞা করে বললুম।

বেহারা আসিয়া খবর দিল, বন্ধু দুখানা বড় কার্পেট চাহিতে আসিয়াছে। বন্ধু শৈলেশের অনেক দিনের ভৃত্য, বিভা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সে কার্পেট নিয়ে কি করবে? বলিতে বলিতে উভয়েই বাহিরে আসিতেই বন্ধু সেলাম করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল।

কার্পেটে হবে কি বন্ধু?

কি জানি মেমসাহেব, গান-বাজনা না কি হবে।

করবে কে?

সাহেবের সঙ্গে তিন চারজন লোক এসেছে, করবে বোধ হয় তারাই।

দাদা এসেছেন?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশ এসেছে?

বন্ধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কাল রাত্রে সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। কার্পেট লইয়া সে প্রস্থান করিলে দুজনেই নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেইদিনটা কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া ক্ষেত্রমোহন পরদিন বিকালে বিভা ও উমাকে সঙ্গে করিয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্যাসমত নীচের লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পড়িল। দরজার সেই ভারী পর্দাটা নাই, ভিতরের সমস্তই চোখে পড়িল। একটা দিনেই বাড়ির চেহারা বদলাইয়া গেছে। বইয়ের আলমারিগুলো আছে, কিন্তু আর কোন আসবাব নাই। মেঝের উপর কম্বল ও তাহাতে ফরসা জাজিম পাতিয়া জন-দুই লোক নধর পরিপুষ্ট-দেহের সর্বত্র হরিনামের ছাপ মারিয়া, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা পরিয়া বসিয়া আছেন, হঠাৎ সাহেব-মেম দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটাইয়া তিনজনে উপরে যাইতেছিলেন, উড়িয়া পাচক-ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়া কহিল, উপরের ঘরে গোঁসাইনি আছেন!

গোঁসাইনিটা কে?

পাচক-ঠাকুর চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কোথায়?

উত্তরে সে উপরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইলে ক্ষেত্রমোহন সেইখানে দাঁড়াইয়া শৈলেশ শৈলেশ করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ছুটিয়া আসিল সোমেন। হঠাৎ তাহার বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া বিভা কাঁদিয়া ফেলিল। পরনে সাদা থান, মাথায় মস্ত টিকি, গলায় তুলসীর মালা, সে দূর হইতে প্রণাম করিল, কিন্তু কাছে আসিল না। উমা ধরিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক, অ-বেলায় আর ছুঁয়ে কাজ নেই। ও-বেচারাকে হয়ত আবার নাইয়ে দেবে। বাবা কোথায় সোমেন?

সোমেন কহিল, প্রভুপাদ শ্রীভাগবত পড়ছেন।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম, শ্রীবাবাকে একবার খবরটা দাও।

তিনি খবর পেয়েচেন, আসচেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে খড়ম পায়ে শৈলেশ নীচে আসিল। থান কাপড়, গায়ে জামা, মাথায় একটা সরু গোছের টিকি ছাড়া বাহিরের চেহারায় তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন নাই, কিন্তু ভিতরের দিকে যে অনেক বদল হইয়া গেছে তাহা চক্ষের পলকেই চোখে পড়ে। অত্যন্ত বিনীত ভাব, মৃদু কথা—উমা ও বিভা প্রণাম করিলে সে দূরে দাঁড়াইয়াই আশীর্বাদ করিল, স্পর্শ করিতে নিকটে আসিল না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাড়িতে একটু বসবার জায়গাও নেই নাকি হে?

শৈলেশ লজ্জিতভাবে কহিল, বাইরের ঘরটা নোংরা হয়ে আছে—পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তাহলে এখনকার মত আমরা বিদায় হই। সোমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এখন চললুম। আমাদের বোধ করি আর বড় একটা প্রয়োজন হবে না, তবু বলে যাই, বসবার জায়গা যদি কখনও একটা হয় ত খবর দিস্ বাবা। চল।

শৈলেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়িতে বিভা কাহারও সহিত একটা কথাও কহিল না, তাহার দুচক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। একটা কথা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া আসিলেন, ও-বাড়িতে তাহাদের আর স্থান নাই। দাদা যা-ই কেন না করুক, সোমেনকে সে জোর করিয়া কাড়িয়া আনিবে বলিয়া বিভা স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। স্নেহের সেই দাম্ভিক উক্তি স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই বার বার মনে পড়িল, কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় ইহার আভাস পর্যন্তও কেহ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ইহার পর মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কথাটা আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু-সমাজে এমন আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে যে, লোকে সত্যের মধ্যেও আর যেন আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। মুখে মুখে অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া সমস্ত জিনিসটা এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে যে কোথাও যাওয়া আসাও বিভার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, অথচ কোনদিকে কোন রাস্তাই কাহারও চোখে পড়িতেছে না। ক্ষেত্রমোহন জানিতেন, সংসারে অনেক উত্তেজনাই কালক্রমে ম্লান হইয়া আসে, ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়া থাকাই তাহার উপায়, শুধু এই পরকালের লোভের ব্যবসাটাই একবার শুরু হইয়া গেলে আর সহজে থামিতে চাহে না। অনিশ্চিতের পথে এই অত্যন্ত সুনিশ্চিতের আশাই মানুষকে পাগল করিয়া যেন নিরন্তর ঠেলা দিয়া চালাইতে থাকে। ইহার উপরেও প্রচণ্ড বিভীষিকা ঊষা; বন্ধু ও শত্রুভাবে সর্বনাশের বনিয়াদ গড়িয়া গেছে সে-ই। কোনমতে একটা খবর পাইয়া যদি আসিয়া পড়ে ত অনিষ্টের বাকী কিছু আর থাকিবে না। কেবল বিভাই নয়, তাহার উল্লেখে উমার, এমনকি ক্ষেত্রমোহনেরও আজকাল গা জ্বলিতে থাকে। বাস্তবিক তাহাকে না আনিলে ত এ বালাই কোনদিনই ঘটার সম্ভাবনা ছিল না।

আজ রবিবারে সকালবেলা স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া এই আলোচনাই করিতেছিলেন। সেই অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসার দিন হইতে ইঁহারা সে-মুখোও আর হন নাই, কিন্তু

সে বাড়ির খবর পাইতে বাকী থাকিত না। গুরুভ্রাতার দল অদ্যাবধি নড়িবার নামটি পর্যন্ত মুখে আনেন না এবং শ্রীগুরু ও গোঁসাই-ঠাকুরানী উপরের ঘরে তেমন কায়েম হইয়াই বিরাজ করিতেছেন। সকাল-সন্ধ্যায় নামকীর্তন অব্যাহত চলিয়াছে, ভোগাদির ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে. এ-সকল সংবাদ বন্ধুজনের মুখে নিয়মিতভাবেই বিভার কানে পৌঁছে; কেবল অতিরিক্ত একটা কথা সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা জায়গা লইয়া শৈলেশ গুরুদেবের আশ্রম তৈরি করার সংকল্প করিয়াছে এবং এই হেতু অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে।

বিভা মলিনমুখে কহিল, যদি সত্যই হয়, দাদাকে কি একবার বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না? ছেলেটা কি চোখের সামনে ভেসেই যাবে?

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি করতে পারি বল?

বিভা চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া কি হইতে পারে সে তাহার কি জানে।

ক্ষেত্রমোহন সহসা বলিয়া উঠিলেন, সেই পর্যন্ত ত আর কখনও যাইনি, আজ চল না একবার যাই।

বিভার বুকের মধ্যেটা আজ সত্যই কাঁদিতেছিল, তাই বোধ হয় আজ তথায় মান-অভিমানের স্থান হইল না, সহজেই সম্মত হইয়া বলিল, চল।

উমাকে আজ তাহারা সঙ্গে লইল না। এই মেয়েটির সম্মুখে লজ্জার মাত্রাটা আজ তাহাদের বাড়াইবার প্রবৃত্তি হইল না। মোটর যখন তাহাদের শৈলেশের বাড়ির সুমুখে আসিয়া থামিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গেছে। বাহিরের ঘরটা আজ খোলা, গুরুভাই-যুগল মেঝের উপরে বসিয়া একটা বড় পুঁটলি কষিয়া বাঁধিতেছেন। ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈলেশবাবু বাড়ি আছেন?

তাঁহারা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শেষে উত্তর দিলেন, না, তিনি পরশু গেছেন নবদ্বীপধামে।

কবে ফিরবেন?

কাল কিংবা পরশু সকালে।

বাবুর ছেলে বাড়িতে আছে?

তাঁহারা উভয়েই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন আছে, এবং তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেলেন।

অতঃপর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুজনের একসঙ্গেই চোখে পড়িল, লাইব্রেরি-ঘরের দ্বারে সেই পুরানো ভারী পর্দাটা আজ আবার ঝুলিতেছে। একটু ফাঁক করিতেই চোখে পড়িল, পূর্বের আসবাবপত্র যথাস্থানে সমস্তই ফিরিয়া আসিয়াছে। বিভা কহিল, ওই দুটো লোককে সরিয়ে দিয়ে দাদা আবার ঘরটায় শ্রী ফিরিয়েচেন। এটুকু সুবুদ্ধিও যে তাঁর আর কখনও হবে আমার আশা ছিল না। কিন্তু বলা তাহার শেষ না হইতেই সহসা পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। সোমেন বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, রবারের একটা বল লুফিতে লুফিতে আসিতেছে। কোথায় বা মালা, কোথায় বা টিকি, আর কোথায় বা তাহার ব্রহ্মচারীর বেশ। খালি গা, কিন্তু পরনে চমৎকার লালপেড়ে জরি বসানো ধুতি, মাথার চুল বাঙ্গালী ছেলেদের মত পরিপাটি করিয়া ছাঁটা, পায়ে বার্নিশ-করা পাম্পসু। সে ছুটিয়া আসিয়া বিভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, মা এসেচেন পিসিমা, রান্নাঘরে রাঁধচেন, চল। এই বলিয়া সে টানিতে লাগিল।

বিভা স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মা এসেচেন, না সোমেন? তাই ত বলি—

কাল দুপুরবেলা এসেছেন। চলুন পিসেমশাই রান্নাঘরে।

চল।

তিনজনে রন্ধনশালার সুমুখে আসিতেই ঊষা সাড়া পাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভা পায়ের জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল। কহিল, কি কাণ্ড হয়েছে দেখলে বৌদি।

ঊষা হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাসিয়া কহিল, দেখলুম বৈ কি ভাই। ছেলেটার আকৃতি দেখে কেঁদে বাঁচিনে। তাড়াতাড়ি মালা-ফালা ছিঁড়ে

ফেলে দিয়ে নাপতে ডাকিয়ে চুল কেটে দিই, নতুন কাপড় জুতো কিনে আনিয়ে পরিয়ে তবে তার পানে চাইতে পারি। আচ্ছা আপনিই বা কি করছিলেন বলুন ত? এই বলিয়া সে কটাক্ষে ক্ষেত্রমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বলবার তাড়াহুড়ো নেই বৌঠাকরুন, ধীরে সুস্থে সমস্তই বলতে পারব, এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু খেতে দিন। ভাল কথা, গুরুভাই দুটি ত দেখলুম, বাহিরে পুঁটলি কষছেন, কিন্তু শ্রীপ্রভুপাদ-যুগলমূর্তির কি করলেন? ওপরে তাঁরা ত নেই?

ঊষা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না, ভয় নেই, তাঁরা নবদ্বীপধামে গেছেন।

বলি, আবার ফিরে আসছেন না ত?

ঊষা তেমনই মৃদু হাসিয়া শুধু কহিল, না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বৌঠাকরুন, আপনার যে এরূপ সুবুদ্ধি হবে এ ত আমাদের স্বপ্নের অগোচর। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-কুমারের স্বহস্তে তুলসীমালা ছিঁড়ে দিয়ে টিকি কেটে দিয়ে—এ-সব কি বলুন ত?

ঊষা হাসিমুখে ক্ষেত্রমোহনের কথা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, বেশ ত, বলবার তাড়াহুড়ো কি জামাইবাবু! ধীরে সুস্থে সমস্তই বলতে পাবব। এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু আপনাদের খেতে দিই।

গ্রন্থ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি ১৩২২ সালের মাঘ মাস থেকে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। তখন লেখাটি 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' নামে ছাপা হয় এবং লেখকের নাম হিসাবে থাকে 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা'। মাঘ এবং ফাল্গুন এই দুমাস লেখকের নাম ছিল শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা। তার পরের দুমাসে ছিল শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার পর থেকে বরাবর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নামই থাকে।

'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' ১৩২২ সালের মাঘে শুরু হয়ে একটানা ধারাবাহিকভাবে ১৩২৩ সালের মাঘ পর্যন্ত চললে, এই তের সংখ্যায় যতটা ছাপা হয়েছিল, ততটা নিয়ে 'শ্রীকান্ত ১ম পর্ব' বই প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকারই মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। প্রকাশের তারিখ—১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৭, মাঘ ১৩২৩। এই 'শ্রীকান্ত ১ম পর্ব' প্রকাশের সময় ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' যা বেরিয়েছিল, তার গোড়ার দিকের কিছুটা বইয়ে বাদ দেওয়া হয়।

এরপর 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' আবার 'ভারতবর্ষে' শুরু হয় ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাস থেকে। চলে ১৩২৫ সালের আশ্বিন পর্যন্ত। মাঝে ১৩২৪ সালের আশ্বিন ও কার্তিক এবং ১৩২৫ সালের শ্রাবণ- তিন মাস বন্ধ থাকে। এই আশ্বিন মাস পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাই নিয়ে 'শ্রীকান্ত ২য় পর্ব' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, ভাদ্র ১৩২৫। প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সই।

'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' তৃতীয় পর্যায়ে আবার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শুরু হয় ১৩২৭ সালের পৌষ থেকে এবং চলে ১৩২৮ সালের পৌষ পর্যন্ত। এবারেও ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে ১৩২৭ সালের চৈত্র এবং ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে। ১৩২৮ সালের পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে তৃতীয় পর্যায় 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'র নবম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এর শেষ বাক্যটি হল 'তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেন না,—তেমনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।' এই শেষ বাক্যটির শেষে আগের সংখ্যাগুলির মত যথারীতি 'ক্রমশঃ'ও ছিল।

মাসের পর মাস কেটে যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের এই অসমাপ্ত 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'কে আর সমাপ্ত করলেন না। ভারতবর্ষের মালিক ও সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের অগণিত পাঠক-পাঠিকার অনুরোধ সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' আর লিখলেনই না। না লেখার হেতু, তিনি তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং চরকা ও খদ্দর প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ের 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' ভারতবর্ষে অসমাপ্ত হয়ে পাঁচ বছরেরও বেশী পড়ে রইল। শেষে বাকি আর ছটা পরিচ্ছেদ লিখে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে না প্রকাশ করে মোট পনর পরিচ্ছেদে একেবারে বই আকারে 'শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব' প্রকাশ করলেন। এই ৩য় পর্ব প্রকাশের তারিখ—১৮ই এপ্রিল ১৯২৭, চৈত্র ১৩৩৩। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সই।

'শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব' বই প্রকাশিত হওয়ার পর আরও পাঁচটা বছর কেটে গেল। 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'র চতুর্থ পর্যায় আর ভারতবর্ষে প্রকাশিতই হল না।

এমন সময় শেষে হঠাৎ দেখা গেল, ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'র বদলে 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব' নামে ছাপা শুরু হয়েছে। এই 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব' বিচিত্রায় একটানা ধারাবাহিকভাবে চলে ১৩৩৯ সালের মাঘ পর্যন্ত। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় বই শেষ করার স্থান, তারিখ ও সময় হিসাবে লেখা ছিল—সামতাবেড়, ২৫শে পৌষ ১৩৩৯। রাত্রি ১১টা।

বিচিত্রায় ঐ বার সংখ্যায় সমাপ্ত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব নিয়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব' গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৩৩এর ১৩ই মার্চ, চৈত্র ১৩৩৯ তারিখে।

শরৎচন্দ্র ১৩৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সামতাবেড় থেকে দিলীপকুমার রায়কে

এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'পঞ্চম পর্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ ক'রে দেবো। অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব ভাল হয়নি, তবে থাকলো এইখানেই রথ।'.

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব খুব ভাল হয়েছে, দিলীপবাবু এ কথা বলা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত ৫ম, পর্ব আর লেখেন নি। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব খুব ভাল লেগেছে বলে যে দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, এ কথা দিলীপবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রেরই একটা চিঠি থেকে জানা যায়। তিনি সামতাবেড থেকে ১৩৪০ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে দিলীপবাবুকে লিখে-ছিলেন—'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভাল লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে,—কারণ, এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন করে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভাল লাগার জন্যেই।'

শুধু শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব কেন, শ্রীকান্তর প্রতিটি পর্বই যে শরৎচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগার জন্য যত্ন করে মন দিয়ে লিখেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তবুও এই শ্রীকান্ত যখন ভারতবর্ষে প্রথম লিখতে শুরু করেন, তখন এই বইটি সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই মনের মধ্যে একটা সংকোচ ছিল, এই বই হয়ত ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপার অনুপযুক্ত। তাই তিনি তখন রেঙ্গুন থেকে ভারতবর্ষ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' যে সত্যই 'ভারতবর্ষে' ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপান এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেইজন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

"যদি বলেন তো আরো লিখি, আরো অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই। তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

"আমার নামটা কোন মতেই প্রকাশ না পায়। এমন কি আপনি ছাড়া, উপেনবাবু ছাড়া (তার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—তা ভালই হোক, মন্দই হোক) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করিয়াছি অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এ সব নেই।"

এখানে উদ্ধৃত পত্রাংশটির মধ্যে যে উপেনবাবুর কথা আছে, তিনি হলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন ভারতবর্ষের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। অপর সম্পাদক ছিলেন জলধর সেন। উপেনবাবু হরিদাসবাবুর আত্মীয় ছিলেন।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' শ্রীকান্ত ১ম পর্ব নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়, গ্রন্থে, 'ভারতবর্ষে' প্রথম বারের প্রকাশিত অংশটার যে অংশ বাদ দেওয়া হয়, ঐ অংশেই যা ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ছিল।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে, সেই সময় ১৩১৪ সালে তাঁর 'বড়দিদি' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তাঁকে জানাতেন যে, শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েও তাঁর লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করলে, তাতে তাঁর আপত্তি থাকবে না। সেই হিসাবে, 'বড়দিদি' ভারতীতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে, একবার তিনি ঐ বই প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তা ছাপেন নি।

ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার কাহিনীটি এই

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে বাস করার সময় প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টদের বাড়িতে থেকে যখন পড়তেন ও অনর্গল গল্প লিখতেন, তাঁর গল্পের খাতা তখন ঐ ভট্ট বাড়িতেই থাকত।

সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে এফ এ. পড়তেন। তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় তাঁদের বাড়িতে চলে আসবার সময় শরৎচন্দ্রের অনুমতিতে বিভূতিভূষণ ভট্টর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের গল্পের দুখানি খাতা নিয়ে এসেছিলেন। সৌরীনবাবুর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তাঁর কলকাতার বন্ধুদের ঐ-সব গল্প পড়িয়ে তাক লাগিয়ে দেবেন।

সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রের গল্পের যে দুটি খাতা নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি খাতায় ছিল—কোরেল, চন্দ্রনাথ, বড়দিদি প্রভৃতি।

সৌরীনবাবু পরে ভট্টবাড়িতে শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর গল্পের খাতা ফেরত পাঠিয়ে দেবার সময় 'বড়দিদি' গল্পটি নকল করে নিয়ে একটি কপি নিজের কাছে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, তিনি তাঁদের হাতে-লেখা 'তরণী' পত্রিকায় ঐ 'বড়দিদি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠে নি। তবে বড়দিদির কপিটি সৌরীনবাবুর কাছেই থেকে যায়।

সৌরীনবাবু পরে তাঁর কাছে রক্ষিত বড়দিদির এই কপিটি কিভাবে 'ভারতী'তে ছেপেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন -

" ১৩১৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবী লাহোর থেকে কলকাতায় আসেন। সে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয় নি—তিনি এসেছিলেন ভারতী প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্র দীপকের অন্নপ্রাশন দেবেন বলে। আমি তখন বি এ পাস করে এটর্ণীর আর্টিকেল আছি এবং 'ল' পড়ছি।

"একদিন দীনেশচন্দ্র সেন এসে আমায় পাকড়াও করে সরলা দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বললেন—এর হাতে ভারতীর ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন। সরলা দেবী আমার হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিলেন এবং তখন বৈশাখ মাসের কপি তৈরির জন্য আমাকে বললেন।

"সরলা দেবী বললেন -ভারতী রেগুলার না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কেউ ভারতীর জন্য লেখা দেবেন না। আমাকে বললেন, উপন্যাস সংগ্রহ করতে। আমার মনে পড়লো শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র কথা। আমি বললাম—উপন্যাস নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। সে গল্পটি দু-তিন মাস চলতে পারে। অপূর্ব লেখা! সরলা দেবী পড়তে চাইলেন। দিলুম তাঁকে পড়তে। পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—চমৎকার! এক কাজ কর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় তিন মাসে ছাপাও। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখকের নাম দিও না, সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমাদের দেরির ত্রুটি ঘুচবে এবং গ্রাহক-গ্রাহিকা বাড়বে! আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের নাম ছাপবে।

"তাই হ'ল। বৈশাখ সংখ্যায় 'বড়দিদি' ছাপা হওয়া মাত্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করার পর সহ-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নেন) রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। গিয়ে অনুযোগ করে বলেন—আপনি আর উপন্যাস লিখবেন না বলেছেন, অথচ এই তো ভারতীর জন্য উপন্যাস লিখেছেন।—কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ অবাক। তিনি বৈশাখের ভারতীতে 'বড়দিদি' যতটুকু ছাপা হয়েছিল পড়লেন। পড়ে তিনি বলেছিলেন—আমার লেখা নয়, তবে খুব শক্তিশালী কোন লেখকের লেখা। তারপর শৈলেশচন্দ্র বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কার লেখা। ধৈর্য ধরুন, লেখকের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সে বছর আষাঢ় মাসের ভারতী বেরিয়েছিল পুজোর পর এবং সে সংখ্যায় 'বড়দিদি' উপন্যাসের শেষে লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেশ বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। ছাপা হবার পর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ আমাকে বার বার বলেছিলেন—'বড়দিদি'র লেখক অসাধারণ শক্তিশালী, অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে এঁকে তোমরা সাহিত্যের আসরে টেনে আনতে পারবে না?" (—শরৎ স্মরণিকা, ৫ম বর্ষ।)

সৌরীনবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' গ্রন্থে 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশ করা সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা থেকেও জানা যায়—"ভারতী তখন রেগুলার না থাকায়

১৩১৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা বেরিয়েছিল কার্তিক মাস নাগাদ অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর নাগাদ।"

'ভারতী'তে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বড়দিদি বই হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন, যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল। বড়দিদি বই প্রকাশ করা সম্বন্ধে ফণিবাবু ১৩৩৫ সালের ৬ই আশ্বিন তারিখের সাপ্তাহিক 'স্বদেশী বাজার' পত্রিকায় তাঁর 'পনের বৎসর পূর্বের শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের নিষেধ অমান্য করিয়াও তাঁহার বড়দিদি আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। ইতিপূর্বে তাঁহার কোন লেখাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।'

বড়দিদি বই হয়ে বেরুলে ফণিবাবু তখন এই বই কয়েকখানা রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বই পেয়ে শরৎচন্দ্র কয়েকদিন পরে ১০.১০.১৩ তারিখে রেঙ্গুন থেকে ফণিবাবুকে লিখেছিলেন—"তোমার প্রেরিত বড়দিদি পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।"

শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজ' গ্রন্থে মোট ১৯টি পরিচ্ছেদ আছে। শরৎচন্দ্র প্রথমে ৯ম পরিচ্ছেদেই এই গ্রন্থ শেষ করবেন স্থির করেছিলেন।

'পল্লী-সমাজ' বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩২২ সালের আশ্বিন অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিন সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আশ্বিন সংখ্যায় মাত্র দু পরিচ্ছেদ ছাপা হয় এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে যথারীতি 'ক্রমশঃ'ও ছাপা থাকে। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৯ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ছাপা হয়, এবং 'ক্রমশঃ' থাকে না।

এই সময় ২২.৯.১৫ তারিখে শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'পল্লী-সমাজের এইরূপে শেষ করিয়া পাঠাইলাম।'

এরপর শরৎচন্দ্র কি ভেবে বা কারও কথায় আরও দশটা পরিচ্ছেদ লেখেন এবং ঐ দশটা পরিচ্ছেদই পরবর্তী পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে ছাপা হয়।

দশম পরিচ্ছেদ শুরু করেন, তারকেশ্বরের দুধপুকুরের সিঁড়িতে রমা ও রমেশের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। তারকেশ্বরের এই দুধপুকুর শরৎচন্দ্রের আগে থেকেই দেখা ছিল। তিনি এনট্রান্স পাস করলে তাঁর মায়ের মানত অনুযায়ী তারকেশ্বরে তারকনাথের কাছে চুল দিতে এসেছিলেন।

ঐ ১৯শ পরিচ্ছেদেই বই শেষ করেন। তখন পল্লী-সমাজ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বই আকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

'শুভদা' শরৎচন্দ্রের বাল্য-রচনা। তবুও এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে। কেন এত পরে প্রকাশিত হ'ল, তার একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটা এই—

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে থাকার সময় যখন প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টদের বাড়িতে বসে অনর্গল লিখতেন ও পড়তেন, সেই সময় বিভূতিবাবুর বোন নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি একবার পড়েছিলেন। ফলে 'শুভদা'র প্রভাব তাঁর প্রথম বয়সের লেখা 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসে বিশেষভাবে পড়ে। এ সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়শ্রী' পত্রিকায় নিরুপমা দেবী নিজেই লিখেছেন—

'তবে একটা কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে গল্পটি (অন্নপূর্ণার মন্দির) লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদার 'শুভদা'র আভাস যে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, ইহা খুবই সত্য।'

'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রকাশিত হলে, শরৎচন্দ্র বইটি পড়ে দেখেন যে, তাতে তাঁর 'শুভদা' উপন্যাসের কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

'শুভদা' প্রকাশিত হলে, পাছে নিরুপমা দেবী হেয় হয়ে পড়েন এই ভেবে শরৎচন্দ্র তাঁর 'শুভদা' উপন্যাস ছাপলেনই না। তবে পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট না করে রেখে দিলেন, এই

আশায় যে, অবসর পেলে পরে গল্পটিকে বদলে আবার নতুন করে লিখবেন। 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল পড়ে রইল। শরৎচন্দ্রের অবসর আর হয়ে উঠল না। তখন শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে একদিন ওটিকে আর না রেখে পুড়িয়ে ফেলাই ঠিক বলে মনস্থ করলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের বাড়িতে থাকতেন। একদিন তিনি তাঁর ভাগ্নে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে (দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে। ইনি শরৎচন্দ্রের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখতেন) বহু পুরাতন কাগজপত্রের সঙ্গে 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিটি পোড়াতে দিলেন।

রামকৃষ্ণবাবু কিন্তু কাগজ পোড়াবার সময় 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে এক ফাঁকে সেটিকে সরিয়ে রাখলেন এবং পরে সেটি এনে শরৎচন্দ্রেরই একটি আলমারির বইয়ের পিছনে লুকিয়ে রাখলেন।

শরৎচন্দ্র 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি পোড়াতে দেওয়ার কয়েক দিন পরেই 'বাল্যস্মৃতি' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে লেখেন--

"ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলোর নাম আমার মনে নাই। একখানা 'অভিমান', মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা, অনেক বন্ধু-বান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না। এখন তিনি ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা! বইখানা কি করিলেন, তিনিই জানেন-- কিন্তু চাইতে ভরসা হয় না! তাঁর সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি! এখন তিনি নাগালের বাইরে, মহাপুরুষ, ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা!

"দ্বিতীয় 'শুভদা'; প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই অর্থাৎ বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতির পরে।"

এই লেখাটি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৩৪৫ সালের আশ্বিনে 'ছোটদের মাধুকরী'তে প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধটি লিখে একজনকে দেওয়ার ক'দিন পরেই কিন্তু শরৎচন্দ্র একদিন সামতাবেড়ের বাড়িতে আলমারির বই ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ শুভদা'র পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পেলেন। দেখে বুঝলেন, রামকৃষ্ণবাবু সেদিন তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র 'বাল্যস্মৃতি' প্রবন্ধটি যাঁকে দিয়েছিলেন, শুধু তখন তাঁকে ওটা ছাপাতে নিষেধ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র কি ভেবে পাণ্ডুলিপিটি আর পোড়ালেন না, না নষ্ট করলেন না--রেখেই দিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, যখন পাণ্ডুলিপিটা রক্ষা পেয়েই গেল, তখন থাক্, পরে পারি তো নতুন করে লিখব। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। তাঁর মৃত্যুর পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এ বইটি প্রকাশ করেন।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এই 'শুভদা'র প্রথম সংস্করণের একখানা জীর্ণ বই আছে। ঐ বইয়ের প্রথমেই প্রকাশকের পক্ষ থেকে এই লেখাটি আছে--

"শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনাবলীর মধ্যে পাষাণ, অভিমান, কোরেল প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। 'শুভদা'ও তাঁহার প্রথম রচনাবলীর অন্যতম, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথম দুই-তিন পৃষ্ঠায় সামান্য দুই একটি কথা বদলান ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারেন নাই। পাণ্ডুলিপিতে যেরূপে ছিল এক্ষণে ঠিক সেইরূপেই ছাপা হইল। পুস্তকে তাঁহার নিজহস্তলিখিত মুখপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। উহাতে দেখা যায় ইহা ১৮৯৮ সালের ২০শে জুন হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিখিত। রচনার মোট সময় ৩৩ দিন। উহা ৪০ বৎসর পূর্বে তাঁহার ২২ বৎসর বয়সে রচিত।"

প্রকাশক লিখেছেন 'কোরেল' পাওয়া যায় নাই। কোরেল পাওয়া গেছে। যাই হোক, এখানে প্রকাশক বলেছেন—'পুস্তকে তাঁহার নিজহস্তলিখিত মুখপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।' এই প্রতিলিপিটি কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের ঐ প্রথম সংস্করণের 'শুভদা'য় নেই। হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের নিজহস্তে লিখিত ঐ মুখপত্রের প্রতিলিপিটি দেখবার জন্য কলকাতা এবং কলকাতার বাইরের বহু গ্রন্থাগারে 'শুভদা'র প্রথম দিকের সংস্করণের খোঁজ করেও কিন্তু কোথাও প্রথম দিকের কোন সংস্করণই পাওয়া গেল না।

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারে এই 'শুভদা'র অষ্টম মুদ্রণের একটি জীর্ণ বই আছে। তাতে প্রথম সংস্করণের প্রথমেই প্রকাশকের যে কথা ছিল, তাই আছে। কেবল একটি বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই বাক্যটা হল—'পুস্তকে তাঁহার নিজহস্তলিখিত মুখপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।' প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিটির সঙ্গে তাঁর লেখার তারিখটা দেওয়া না থাকলেও এই অষ্টম মুদ্রণে তারিখ আছে ১৬।৬।৩৮। যাই হোক্, বোঝা গেল, প্রকাশক হয় এই অষ্টম মুদ্রণ থেকে নয়ত এর আগের কোন সংস্করণ থেকেই বইয়ে ঐ প্রতিলিপিটি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই অষ্টম মুদ্রণের প্রকাশকও ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সই। এরপর এ'রা আরও একবার ছেপে প্রকাশ করেন।

পরে দশম বার প্রকাশিত হয় কনক পাবলিশিং কোম্পানী থেকে। ঐ দশম মুদ্রণের 'শুভদা'য়ও দেখা যায়—অষ্টম সংস্করণে মুদ্রিত প্রকাশকের কথাটাই ছাপা হয়েছে। দশম সংস্করণ কনক পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশ করলেও এ বইয়ের পরিবেশক তখন ছিলেন ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিমিটেড। পরে এ'রাই 'শুভদা'র প্রকাশক হন।

এ'দের প্রকাশিত 'শুভদা'য় প্রকাশকের বক্তব্যে অষ্টম ও দশম মুদ্রণে যা ছিল, তাই থাকলেও এ'রা আবার একটু বদল করেছেন। সেটা এই—আগের সমস্ত সংস্করণে যেখানে ছিল—'রচনার মোট সময় ৩৩ দিন', সেখানে এ'রা ছেপে যাচ্ছেন—'রচনার মোট সময় ৯৯ দিন।'

২০শে জুন থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গণনা করলে হয় ৯৯ দিন। সেই হিসাবেই এ'রা ৩৩এর বদলে ৯৯ দিন ছেপে যাচ্ছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ ৯৯ দিনের প্রতিদিনই কি লিখেছিলেন? এমনও ত হতে পারে, তিনি মাঝে মাঝে কোন কোন দিন না লিখে মোট ৩৩ দিনেই বইটা রচনা করেছিলেন। তাই 'শুভদা'র প্রথমদিকের সংস্করণগুলিতে যে রচনা-কালের মোট সময় ৩৩ দিন আছে, সেইটাই ঠিক বলে মনে হয়। কেননা, প্রকাশক প্রথম সংস্করণে শরৎচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত মুখপত্রের প্রতিলিপি দেখেই ত ঐ কথা লিখেছিলেন।

এবার আর একটা কথা—শুভদার অষ্টম মুদ্রণ থেকে বর্তমান সংস্করণ পর্যন্ত সবারই ঐ প্রকাশকের নিবেদনে ছাপা হয়েছে—'পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল, এক্ষণে ঠিক সেই-রূপেই ছাপা হইল।' এ কথা আদৌ সত্য নয়। কেননা, প্রথম সংস্করণের 'শুভদা'—যা সত্যই পাণ্ডুলিপির অনুরূপ ছিল—তার সঙ্গে এগুলির অনেক প্রভেদ। অষ্টম সংস্করণ অথবা তার আগের কোন সংস্করণ থেকেই এই বইয়ের তখনকার প্রকাশক নিজেই বইয়ে অনেক সংশোধন ও পরিবর্তন করে ছেপেছিলেন। সেই সংশোধিত ও পরিবর্তিত ছাপাই এখনও চলে আসছে।

'শুভদা'র বর্তমানের সংস্করণগুলি যেহেতু শরৎচন্দ্রের নিজের সংশোধিত সংস্করণ নয়, তাই আমরা এই রচনাবলীতে 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিতে যা ছিল তাই অর্থাৎ জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'শুভদা'র প্রথম সংস্করণ অনুযায়ীই দিয়েছি। এতে করে প্রথমতঃ—শরৎচন্দ্রের রচনার অপরের সংশোধিত রূপও দিলাম না, দ্বিতীয়তঃ—শরৎচন্দ্রের অসংশোধিত বাল্য-রচনা কিরূপ ছিল, পাঠক-পাঠিকারা এ থেকে তারও পরিচয় পাবেন।

আরও একটা কথা। শরৎচন্দ্র তাঁর 'বাল্যস্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে।...একখানা 'অভিমান'।...দ্বিতীয় 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই অর্থাৎ বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতির পরে।'

শরৎচন্দ্রের এ কথা ঠিক নয়। তিনি বহু পরে লিখতে গিয়ে এ কথা ভুল লিখেছেন। কারণ, 'শুভদা'র মুখপত্রে তিনি লিখেছিলেন—এর রচনাকাল ১৮৯৮এর ২০শে জুন থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর; অথচ ভারতবর্ষ পত্রিকায় যখন (১৩২৩ সালের চৈত্র, ১৩২৪ সালের

বৈশাখ-আষাঢ়) 'দেবদাস' প্রকাশিত হয়, তখন প্রতি মাসেই ভারতবর্ষে 'দেবদাসের' রচনার তারিখ হিসাবে প্রথমেই ছাপা হয়েছিল—সেপ্টেম্বর ১৯০০।

অতএব এ থেকে দেখা যাচ্ছে, 'দেবদাস' 'শুভদা'র পরের লেখা। এই তারিখের নজির ছাড়াও দুটো বই পড়লেও বোঝা যায়, 'শুভদা' 'দেবদাস' অপেক্ষা আরও কাঁচা রচনা।

শরৎচন্দ্রের 'নববিধান' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন এবং ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের এই বইটি তাঁর অন্যান্য বইএর তুলনায় বিক্রি হয়েছে কম। এর প্রথম প্রকাশকাল (কার্তিক ১৩৩১) থেকে ১৩৬০ সালের আশ্বিন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ২৯ বছরে মাত্র ৮টি সংস্করণ শেষ হয়েছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে তাঁর অন্য বহু বইএরই অনেক বেশী সংস্করণ হয়েছে। এই বহুল প্রচারিত না হওয়ার কারণেই হয়ত 'নববিধানে'র পরবর্তী সংস্করণে ছাপাখানার ভুলও ঢুকেছে কমই। কারণ, একখানি প্রথম সংস্করণ 'নববিধান' পেয়ে তার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ মিলিয়ে পাঠ উদ্ধার করতে গিয়ে দেখা গেল, দুএকটা শব্দ বাদ যাওয়া বা দুএকটা শব্দের পরিবর্তন ছাড়া ভুল তেমন নেইই। একটা ভুল, যেমন—স্নানান্তে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিল, এর বদলে ছাপা হচ্ছিল—স্নানান্তে অভয়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল।

শরৎচন্দ্র

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটি ইষ্টার্ন রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন থেকে মাইল-দুই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র) শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। প্রভাসচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র নামে শরৎচন্দ্রের আরও দুই ছোটভাই এবং অনিলা দেবী ও সুশীলা দেবী নামে দুই বোনও ছিলেন। অনিলা দেবী ছিলেন ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় আর সুশীলা দেবী ছিলেন সবার ছোট।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল এন্ট্রান্স পাস করে কিছুদিন এফ. এ. পড়েছিলেন। তিনি অস্থিরচিত্ত, ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই অল্প কিছুদিন চাকরি করা ছাড়া আর কখনও কিছুই করেন নি। গল্প-উপন্যাস লিখতেন; কিন্তু ঐ অস্থিরচিত্ততার জন্যই কোন লেখা সম্পূর্ণ করতেন না। অভাব-অনটনের জন্য তিনি বেশীর ভাগ সময় স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তাই শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অনেক-গুলো বছর কেটেছিল ভাগলপুরে মামার বাড়িতে।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ২৪-পরগণা জেলার হালিশহরে। কেদারবাবু ভাগলপুরে কালেকটারি অফিসের কেরানি ছিলেন। তিনি ভাগলপুরেই সপরিবারে বাস করতেন। কেদারবাবুর ছোট চার ভাই পরিবারসহ তার কাছেই থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ বছর সেই সময় তাঁর পিতা তাঁকে গ্রামের (দেবানন্দপুরের) প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। শরৎচন্দ্র এখানে দু-তিন বছর পড়েন। পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনি যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমনি ছিলেন দুরন্ত।

শরৎচন্দ্র যখন প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ছিলেন, সেই সময় স্থানীয় সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য দেবানন্দপুরে একটি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল স্থাপিত হলে শরৎ-চন্দ্রের পিতা শরৎচন্দ্রকে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে এনে সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই স্কুলেও শরৎচন্দ্র বছর-তিনেক পড়েন।

এই সময় শরৎচন্দ্রের পিতা বিহারের ডিহিরিতে একটা চাকরি পান। চাকরি পেয়ে তিনি ডিহিরিতে চলে যান। যাবার সময় তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে রেখে যান। পরে তিনি পরিবার ডিহিরিতে নিয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু পড়বার জন্য ভাগলপুরেই থেকে গেলেন। তবে ছুটিতে অবশ্য তিনি মাঝে মাঝে ডিহিরিতে বাবা-মা'র কাছে যেতেন।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে এলে তাঁর মাতামহ তাঁকে ভাগলপুরের দুর্গা-চরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি করে দেন। ঐ ক্লাসে শরৎচন্দ্রের মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্রনাথও পড়তেন। সে বছরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে শরৎচন্দ্র এবং মণীন্দ্রনাথ উভয়েই পাস করেছিলেন।

ছাত্রবৃত্তি পাস করে শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের জেলা স্কুলে সেকালের সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসে অর্থাৎ বর্তমানের ক্লাস ফোর বা চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

ছাত্রবৃত্তিতে তখন ইংরাজী পড়ানো হত না। তবে বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় একটু বেশী করেই পড়ানো হত। শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাস করার ফলে জেলা স্কুলের সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের বাংলা অঙ্ক ইত্যাদি তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল। তাঁকে কেবল ইংরাজীই যা পড়তে হত। ফলে সে বছরের শেষে পরীক্ষায় ইংরাজী এবং অন্যান্য বিষয়েও শরৎচন্দ্র এত বেশী নম্বর পেয়েছিলেন যে, শিক্ষকমশায়রা তাঁকে ডবল

প্রমোশন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সেকালের সেভেন্‌থ্‌ ক্লাস থেকে সিকস্‌থ্‌ ক্লাস টপকে একেবারে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে উঠেছিলেন। তখনকার দিনে স্কুলের নীচের দিক থেকে এইভাবে ক্লাস গণনা হত—নাইন্‌থ্‌ ক্লাস, এইট্‌থ্‌ ক্লাস, সেভেন্‌থ্‌ ক্লাস, সিক-স্‌থ্‌ ক্লাস, ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস, ফোর্‌থ্‌ ক্লাস, থার্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস ও ফার্স্ট ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাস হল বর্তমানের ক্লাস টেন বা দশম শ্রেণী।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র জেলা স্কুলের ফোর্‌থ্‌ ক্লাসে উঠলেন, সেই সময় তাঁর পিতার ডিহিরির চাকরিটিও চলে যায়। শরৎচন্দ্রের পিতা তখন পরিবারবর্গকে নিয়ে আবার দেবানন্দপুরে ফিরে আসেন। শরৎচন্দ্র বাবা-মা'র সঙ্গে দেবানন্দপুরে এসে ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দেই জুলাই মাসে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের ফোর্‌থ্‌ ক্লাসে ভর্তি হলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ফার্স্ট ক্লাসে পড়ার সময় তাঁর পিতা অভাবের জন্য আর স্কুলের মাহিনা দিতে পারলেন না, ফলে শরৎচন্দ্র পড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে রইলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় সতর বছর বয়সে সর্বপ্রথম পাঠশালার সহপাঠী কাশীনাথের নাম নিয়ে 'কাশীনাথ' নামে একটি গল্প লেখেন। এ ছাড়া 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে আরও একটি গল্প লিখেছিলেন। ব্রহ্মদৈত্য গল্পটি পাওয়া যায় না।

দেবানন্দপুরে মতিলালের অভাব ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠায় তিনি তখন বাধ্য হয়ে আবার সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে গেলেন। সেটা তখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গিয়েই আবার স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রবল আগ্রহান্বিত হলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আগ্রহ হলে কি হবে! হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের বকেয়া মাহিনা মিটিয়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনার টাকা কোথায়? ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর মাতামহের মৃত্যু হওয়ায় মামার বাড়ির একান্নবর্তী সংসার ভেঙে যায়। শরৎচন্দ্রের নিজের দুই মামার মধ্যে বড়মামা ঠাকুরদাসের তখন চাকরি ছিল না। ছোটমামা বিপ্রদাস সামান্য বেতনে সেই সবে একটা চাকরিতে ঢুকেছেন। তাঁকে একাই তাঁর নিজের, তাঁর দাদা ঠাকুর-দাসের এবং ভগ্নীপতি মতিলালের সংসার চালাতে হয়।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সময় ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামাদের প্রতিবেশী ছিলেন। পাঁচকড়িবাবুর পিতা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের মাতামহের বন্ধু ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র পাঁচকড়িবাবুকে মামা বলতেন। শরৎচন্দ্রের পড়ার আগ্রহ দেখে পাঁচকড়িবাবুই অবশেষে শরৎচন্দ্রকে তাঁদের স্কুলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র এই তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকেই পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরীক্ষার আগে স্কুলে পরীক্ষার ফি এবং ঐ সঙ্গে দেয় ক' মাসের মাহিনার টাকা জমা দেবার সময়ও শরৎচন্দ্রের ছোটমামা বিপ্রদাসকে স্থানীয় মহাজন গুলজারীলালের কাছে হ্যান্ডনোট লিখে টাকা ধার করতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্রনাথও ঐ বছর এন্ট্রান্স পাস করেন। এন্ট্রান্স পাস করে মণীন্দ্রনাথ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু টাকার অভাবে শরৎচন্দ্রের আর ভর্তি হওয়া হল না। অভাবের জন্যই বিপ্রদাস শরৎচন্দ্রকে কলেজে ভর্তি করাতে পারলেন না।

শরৎচন্দ্রের পড়া হবে না দেখে মণীন্দ্রনাথের মা কুসুমকামিনী দেবীর বড় মায়া হল। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁদের দুই ছোট ছেলেকে পড়াবার বিনিময়ে শরৎচন্দ্রের কলেজে ভর্তি হওয়ার এবং কলেজে প্রতি মাসে মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এর ফলে শরৎচন্দ্র কলেজে ভর্তি হতে সক্ষম হলেন। শরৎচন্দ্র রাত্রে মণীন্দ্রনাথের ছোট দু ভাই সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে পড়াতেন। এঁরা তখন স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়তেন। এঁরা ছাড়া বাড়ির অন্য ছোট ছেলেরাও তাঁর কাছে অমনি পড়ত।

কলেজে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র টাকার অভাবে কলেজের পাঠ্য বইও কিনতে পারেন নি। তিনি মণীন্দ্রনাথের এবং সহপাঠী অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে রাত জেগে পড়তেন এবং সকালেই বই ফেরৎ দিয়ে আসতেন। কলেজে এইভাবে দু বছর পড়েও টেস্ট

পরীক্ষার শেষে এফ.এ. পরীক্ষার ফি মাত্র কুড়ি টাকা জোগাড় করতে না পারায়, শরৎচন্দ্র আর এফ.এ. পরীক্ষাই দিতে পারলেন না। ঠিক এই সময়টায় শরৎচন্দ্র অবশ্য মামার বাড়িতে ছিলেন না। কারণ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হওয়ায় তার কিছুদিন পরেই শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল শ্বশুরালয় ছেড়ে পুত্রকন্যাদের নিয়ে মাইল-খানেক দূরে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে এসেছিলেন। এখানে মতিলাল খোলার ছাওয়া একটা মাটির ঘরে পুত্রকন্যাদের নিয়ে থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলা দেবীর ইতি-পূর্বে হাওড়া জেলায় বাগনান থানার গোবিন্দপুর গ্রামে বিয়ে হয়েছিল। অনিলা দেবী তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র কলেজের পড়া ছেড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবে মিশে অভিনয় ও খেলাধুলা করে কাটাতে লাগলেন। এবং ভাগলপুরের নির্ভীক, পরোপকারী, মহাপ্রাণ এক আদর্শ যুবক রাজেন মজুমদারের সঙ্গে মিশে তাঁর পরোপকারমূলক কাজের সঙ্গী হলেন। (শরৎচন্দ্র পরে তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এঁকেই ইন্দ্রনাথরূপে চিত্রিত করে গেছেন।) শরৎচন্দ্র এই সময় প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টদের বাড়িতে মিশে সেখানে নিজের একটা আস্তানা করেছিলেন এবং সেই আস্তানায় বসে দিন-রাত অজস্র গল্প-উপন্যাস লিখতেন এবং পড়তেন। শরৎচন্দ্র এই সময় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ (মাতামহের তৃতীয় ভ্রাতার পুত্র), এঁদের বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার এবং প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর ছোট বোন নিরুপমা দেবী প্রভৃতিকে নিয়ে একটা সাহিত্য সভাও গঠন করেছিলেন। সপ্তাহে একদিন করে সাহিত্য সভার অধিবেশন হত। সেদিন সভায় সভ্যরা যে যাঁর লেখা পড়তেন। নিরুপমা দেবী সভায় যেতেন না। তিনি তাঁর দাদা বিভূতিবাবুর হাত দিয়ে লেখা পাঠিয়ে দিতেন। সাহিত্য সভার 'ছায়া' নামে হাতে-লেখা একটা মুখপত্রও ছিল। শরৎচন্দ্র এই সময়েই তাঁর বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা প্রভৃতি উপন্যাস এবং অনুপমার প্রেম, আলো ও ছায়া, বোঝা, হরিচরণ প্রভৃতি গল্পগুলি রচনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা দেবানন্দপুরের ঘরবাড়ি সমস্ত বিক্রি করে এর-ওর কাছে চেয়ে-চিন্তে কোন রকমে সংসার চালাতেন। শরৎচন্দ্র এই সময় বনেলী রাজ এস্টেটে অল্প কিছু-দিনের জন্য একটা চাকরি করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন পিতার উপর অভিমান করে সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন এবং সন্ন্যাসী সেজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এই ঘুরে বেড়াবার সময় যখন তিনি মজঃফরপুরে আসেন, তখন একদিন তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ জানতে পারেন। এই জেনেই তিনি ভাগলপুরে এলেন। এসে কোন রকমে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ছোটভাই-দুটিকে আত্মীয়দের কাছে এবং ছোট বোনটিকে বাড়ির মালিক মহিলাটির কাছে রেখে (শরৎচন্দ্রের ছোটমামা পরে একে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনিই এঁর বিয়েও দিয়েছিলেন) ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় এসে তিনি উপেন মামার দাদা কলকাতা হাইকোর্টের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন এবং তাঁর কাছেই ৩০ টাকা মাহিনায় হিন্দী পেপার বুকের ইংরাজী তর্জমা করার একটা চাকরি পান। শরৎচন্দ্র লালমোহনবাবুর বাড়িতে মাস-ছয়েক ছিলেন। এর পর (জানুয়ারী ১৯০৩) এখান থেকে বর্মায় চলে যান। বর্মায় গিয়ে লালমোহনবাবুর ভগ্নীপতি রেঙ্গুনের অ্যাডভোকেট অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার দু-একদিন আগে কলকাতার বৌবাজারে সুরেন মামা ও গিরীন মামার সঙ্গে দেখা করতে গেলে (এঁরা তখন দুজনেই কলকাতায় কলেজে পড়তেন) গিরীন মামার অনুরোধে বসে সঙ্গে সঙ্গেই একটা গল্প লিখে কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটিতে নিজের নাম না দিয়ে সুরেনবাবুর নাম দিয়েছিলেন। গল্পটির নাম 'মন্দির'। দেড়শ গল্পের মধ্যে 'মন্দির' সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গেলে কিছুদিন পরে মেসোমশায় অঘোরবাবু বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে তাঁর একটা অস্থায়ী চাকরি করে দেন। বছর-দুই পরে হঠাৎ অঘোরবাবুর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পরিবারবর্গ রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে চলে আসেন। এই সময় শরৎচন্দ্রের রেলের অডিট অফিসের চাকরিটিও চলে যায়। শরৎচন্দ্র তখন তাঁর রেঙ্গুনের এক বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগুতে যান। পেগু রেঙ্গুন থেকে ৪৫ মাইল উত্তরে। পেগুতে গিয়ে

তিনি গিরীনবাবুর বন্ধু অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। অবিনাশ-বাবুর বাড়ি ছিল শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরের অদূরে বৈদ্যবাটীতে। তাই অবিনাশ-বাবু সেই বিদেশে শরৎচন্দ্রকে নিজের দেশের লোক হিসাবে খুবই আদর-যত্নে রেখেছিলেন।

অবিনাশবাবুর বাড়িতে থাকাকালে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস অফিসের ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একদিন পরিচয় হয়। মণিবাবু শরৎচন্দ্রকে বেকার জেনে পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিজের অফিসে তাঁর একটা চাকরি করে দেন। শরৎচন্দ্র এই চাকরি পেয়েই পেগু থেকে রেঙ্গুনে চলে আসেন। এই চাকরি পাওয়ার আগে শরৎচন্দ্র মাঝে নাঙ্গলাবিনে কিছুদিন এক ধানের ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র মণিবাবুর দেওয়া এই চাকরিই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত করেছিলেন। ১৯১২-তে শরৎচন্দ্রের অফিস বর্মার একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় বেশীর ভাগ সময়টাই থেকেছেন শহরের উপকণ্ঠে বোটাটং-পোজনডং অঞ্চলে। এখানে শহরের কলকারখানার মিস্ত্রীরাই প্রধানত থাকত। শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন। তিনি তাদের চাকরির দরখাস্ত লিখে দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিতেন, অসুখে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, বিপদে সাহায্যও করতেন। মিস্ত্রীরা শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করত এবং দাদাঠাকুর বলে ডাকত। শরৎচন্দ্র এদের নিয়ে একটা সংকীর্তনের দলও করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীপল্লীতে থাকার সময় তাঁর বাসার নীচেই চক্রবর্তী উপাধিধারী এক মিস্ত্রী থাকত। ঐ মিস্ত্রীর শান্তি নামে একটি কন্যা ছিল। চক্রবর্তী এক প্রৌঢ় ও মাতাল মিস্ত্রীর সঙ্গে তার কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করে। চক্রবর্তীর কন্যার কিন্তু এই বিবাহে ঘোর আপত্তি থাকে, তাই চক্রবর্তীর কন্যা একদিন তাকে ঐ বিপদে রক্ষা করবার জন্য শরৎচন্দ্রের পায়ে পড়ে তাঁকে অনুরোধ করে। তখন শরৎচন্দ্র বাধ্য হয়ে নিজেই তাকে বিয়ে করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র স্ত্রী শান্তি দেবীকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন। তাঁদের একটি পুত্রও হয়। পুত্রের বয়স যখন এক বৎসর, সেই সময় রেঙ্গুনেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তি দেবী এবং শিশুপুত্র উভয়েরই মৃত্যু হয়। স্ত্রী ও পুত্রকে হারিয়ে শরৎচন্দ্র তখন গভীর শোকাহত হয়েছিলেন।

শান্তি দেবীর মৃত্যুর অনেকদিন পরে শরৎচন্দ্র ঐ রেঙ্গুনেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিবাহের সময় পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম ছিল মোক্ষদা। বিবাহের পর শরৎচন্দ্র তাঁর মোক্ষদা নাম বদলে হিরন্ময়ী নাম দিয়েছিলেন এবং তখন থেকে তাঁর এই নামই প্রচলিত হয়। বিয়ের সময় হিরন্ময়ী দেবীর বয়স ছিল ১৪।

হিরন্ময়ী দেবীর বাবার নাম কৃষ্ণদাস অধিকারী। তাঁর মূল বাড়ি মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর নিকটে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। কৃষ্ণবাবু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আট বছরের কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে এক মিস্ত্রী বন্ধুর কাছে রেঙ্গুনে এসেছিলেন। তাঁর পুত্র ছিল না। ক্ষীরোদা, সুখদা ও অপর একটি কন্যার আগেই বিয়ে দিয়েছিলেন।

হিরন্ময়ী দেবী যখন রেঙ্গুনের মিস্ত্রীপল্লীতে তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার বিশেষ পরিচয় হয়। এই বিশেষ পরিচয়ের জোরেই হিরন্ময়ী দেবীর বাবা একদিন সকালে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করে বলেন—আমার মেয়েটির এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। একে সঙ্গে নিয়ে একা বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় থাকি! আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে আমায় দায়মুক্ত করেন তো বড় উপকার হয়। আর একান্তই যদি না নিতে চান তো, আমায় কিছু টাকা দিন। আমি মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যাই। দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই।

কৃষ্ণবাবু শেষে শরৎচন্দ্রের কাছে টাকার কথা বললেও, তিনি বিশেষ করে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, যেন তিনিই তাঁর কন্যাটিকে গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও কৃষ্ণবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন।

হিরন্ময়ী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। বিয়ের সময় পর্যন্ত হিরন্ময়ী দেবী লেখাপড়া

জানতেন না। পরে শরৎচন্দ্র তাঁকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী ছেলেবেলা থেকেই শান্তস্বভাবা, সেবাপরায়ণা ও ধর্মশীলা ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখে শান্তিতেই কাটিয়ে গেছেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা, গান-বাজনা এবং সাহিত্য-চর্চাও করতেন। প্রথম দিকে অনেক দিন ছবিও এঁকেছেন। মিস্ত্রী-পল্লীতে বোটাটং-এর ল্যান্সডাউন স্ট্রীটে যখন তিনি একটা কাঠের বাড়ির দুতলায় থাকতেন, সেই সময় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর বাসার নীচের তলায় আগুন লাগে। সেই আগুনে তাঁর কয়েকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি, কিছু অয়েল পেন্টিং এবং এক সাহেবের কাছ থেকে কেনা একটি লাইব্রেরী-সমেত তাঁর বাসাটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

রেঙ্গুনে থাকাকালে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র একবার অফিসে এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। এই সময় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফত যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে একদিন তাঁর পরিচয় হয়। পরিচয় হলে ফণীবাবু তাঁর কাগজে লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে লেখা পাঠিয়ে দেবেন বলে কথা দেন।

ঐ কথা অনুযায়ী শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে তাঁর 'রামের সুমতি' গল্পটি পাঠিয়ে দেন। ফণীবাবু এই গল্প তাঁর কাগজে ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। রামের সুমতি যমুনায় প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র এক গল্প লিখেই একজন মহাশক্তিশালী লেখক হিসাবে সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে পরিচিত হন।

ইতিপূর্বে ১৩১৪ সালে ভারতী পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছিল। তখন অনেকের মত রবীন্দ্রনাথও এই লেখা পড়ে শরৎচন্দ্রকে প্রতিভাবান লেখক বলে বুঝেছিলেন। বিভূতিভূষণ ভট্টর সতীর্থ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের লেখার খাতা থেকে 'বড়দিদি' নকল করে এনেছিলেন এবং পরে শরৎচন্দ্রকে না জানিয়ে এটি ভারতীতে প্রকাশ করেছিলেন।

'রামের সুমতি' প্রকাশিত হলে তখন নবপ্রকাশিত ভারতবর্ষ এবং সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার কর্তৃপক্ষও তাঁদের কাগজের জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে থাকেন। শরৎচন্দ্র যমুনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও লিখতে আরম্ভ করেন। শেষে যমুনা ছেড়ে কেবল ভারতবর্ষেই লিখতে থাকেন এবং ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স তাঁর বইও প্রকাশ করতে শুরু করেন। যমুনা-সম্পাদক ফণী পালই অবশ্য প্রথম তাঁর 'বড়দিদি' উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সময় ফণীবাবুর বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকারও তাঁদের দোকান এম. সি. সরকার এন্ড সন্স থেকে শরৎচন্দ্রের পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি কয়েকটি বই প্রকাশ করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র হঠাৎ দুরারোগ্য পা-ফোলা রোগে আক্রান্ত হন। তখন তিনি স্থির করেন অফিসে এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে কবিরাজী চিকিৎসা করাবেন। অফিসে শেষ দিনে ছুটি চাইতে যাওয়ায় উপরওয়ালা সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হয়। ফলে শরৎচন্দ্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই বরাবরের জন্য রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে চলে আসেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর রেঙ্গুন-জীবনের শেষ দিকে আর মিস্ত্রীপল্লীতে থাকতেন না। এই সময় প্রথমে কিছুদিন ছিলেন ৫৭/৯ লুইস স্ট্রীটে। তারপর ছিলেন ৫৪/৩৬ স্ট্রীটে।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক এসে প্রথমে হাওড়া শহরে ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে ওঠেন। এ বাড়িতে তিনি প্রায় ৮ মাস ছিলেন। তারপর এ বাড়ি ছেড়ে তিনি পাশেই ৪নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে যান। ঐ বাড়িতে তিনি প্রায় ৯ বছর ছিলেন। তারপর এখান থেকে শিবপুর ট্রাম ডিপোর কাছে ৪৯/৪ কালীকুমার মুখার্জী লেনে গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ভাড়া নিয়ে বছরখানেক ছিলেন। এইখানে থাকার সময়েই তিনি তাঁর দিদিদের গ্রাম হাওড়া জেলার বাগনান থানার গোবিন্দপুরের পাশেই সামতাবেড়ের

জায়গা কিনে একটা সুন্দর মাটির বাড়ি তৈরি করান। বাড়িটি একেবারে রূপনারায়ণের গায়েই। শরৎচন্দ্র ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া শহর ছেড়ে তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতে চলে যান।

শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাস রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী বেদানন্দ। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে ছোটভাই প্রকাশকে এনে কাছে রাখেন। পরে তাঁর বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী করে দেন। প্রকাশবাবুর এক কন্যা ও এক পুত্র।

হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই শরৎচন্দ্র তাঁর বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাই ঐ সময়টাকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।

এই বাজে শিবপুরে থাকাকালেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি তখন দেশবন্ধুর আহ্বানে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তিনি হাওড়ায় থাকতেন বলে দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি করেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। মাঝে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে চাইলে দেশবন্ধু তা করতে দেননি।

শরৎচন্দ্র অহিংস কংগ্রেসের একজন ছোটখাট নেতা হলেও বরাবরই কিন্তু ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামী বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা সংক্ষেপে বি ভি দলের সর্বাধিনায়ক প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিপ্লবী শচীন সান্যাল প্রমুখ ছাড়াও বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। বিপিনবাবু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা হতেন। শরৎচন্দ্র বহু বিপ্লবীকে নিজের রিভলবার, বন্দুকের গুলী এবং অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মহাবিপ্লবী সূর্য সেনকেও তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। পরিচয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বিচিত্রার আসরে। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎচন্দ্র বিচিত্রার আসরে ১৩২৪ সালের ১৪ই চৈত্র তারিখে তাঁর বিলাসী গল্পটি পড়েছিলেন।

পরে নানা সূত্রে এঁদের উভয়ের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। শরৎচন্দ্র নানা প্রয়োজনে একাধিকবার শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোয় কবির কাছে গেছেন। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় বাড়ি করলে সেখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি একবার শরৎচন্দ্রের বাড়িতেও গিয়েছিলেন।

কবির সত্তর বছর বয়সের সময় দেশবাসী যখন কলকাতার টাউন হলে তাঁকে অভিনন্দন জানায় সেই অভিনন্দন সভার বিখ্যাত মানপত্রটি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কবিও নিজে একবার শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে যখন থেকে বাস করতে থাকেন, তখন থেকে ঐ অঞ্চলের দরিদ্র লোকদের অসুখে চিকিৎসা করা তাঁর একটা কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোগী দেখে তিনি শুধু ওষুধই দাতব্য করতেন না, অনেকের পথ্যও কিনে দিতেন। হাওড়া শহরে থাকার সময় সেখানেও তিনি এই-রকম করতেন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড় অঞ্চলের বহু দুঃস্থ পরিবারকে বিশেষ করে অনাথ বিধবাদের মাসিক অর্থসাহায্য করতেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় অল্প তিন-চারটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় শেষ দিকে কলকাতার বালীগঞ্জে একটা বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। এটি তৈরি হয়েছিল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাড়িটি দোতলা এবং দেখতে সুন্দর। এই বাড়ির ঠিকানা হল—২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড।

কলকাতায় বাড়ি হলে তিনি কখন কলকাতায়, আবার কখন সামতাবেড়ে—এইভাবে কাটাতেন। কলকাতায় থাকাকালে কলকাতার তখনকার সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দুটি নাম-করা প্রতিষ্ঠান রবিবাসর ও রসচক্রের সদস্যরা তাঁকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। এঁরা কখন কখন শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনাও জানিয়েছেন। রসচক্রের সদস্যরা শরৎচন্দ্রকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করেছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক উপহার দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একবার বি.এ. পরীক্ষায় বাংলার পেপারসেটার বা প্রশ্নকর্তাও নিযুক্ত করেছিলেন। এসব ছাড়া, দেশবাসীও তাঁকে তখন 'অপরাজেয় কথাশিল্পী', 'সাহিত্য সম্রাট' এই আখ্যায় বিভূষিত করেছিলেন। বৈদ্যবাটী যুব সংঘ, শিবপুর সাহিত্য সংসদ, যশোহর সাহিত্য সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ও সাধারণভাবে দেশবাসীর পক্ষ থেকে একাধিকবার তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

শরৎচন্দ্র কেবল গায়ক, বাদক, অভিনেতা ও চিকিৎসকই ছিলেন না, তাঁর চরিত্রে আরও অনেকগুলি গুণ ছিল। তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি সবার আগে চোখে পড়ে, তা হল—মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন দরদী মানুষ। মানুষের, এমন কি জীবজন্তুর দুঃখ-দুর্দশা দেখলে বা তাদের দুঃখের কাহিনী শুনলে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় এজন্য তাঁর চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ত।

পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতিই তাঁর দরদ ছিল বেশী। আবার সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজপরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি তাঁর করুণা ছিল আরও বেশী। পতিতা নারীদের ভুল পথে যাওয়ার জন্য তিনি হৃদয়ে একটা বেদনাও অনুভব করতেন।

জীবজন্তুর প্রতি স্নেহবশতঃ শরৎচন্দ্র বহু বছর সি. এস পি সি. এ. অর্থাৎ কলকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন।

এক সময় অবশ্য তিনি একজন ছোটখাট শিকারীও ছিলেন। তখন ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে এবং বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। পরে এসব ছেড়ে দেন। তিনি বরাবরই দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। সাপুড়েদের মত অতি অনায়াসেই বিষধর সাপও ধরতে পারতেন।

আর তিনি ছিলেন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ, বন্ধুবৎসল ও পত্নীপ্রেমিক। বিলাসী না হলেও কিছুটা সৌখীন ছিলেন—বিশেষ করে বেশভূষায় ও লেখার ব্যাপারে। তিনি ঘরোয়া বৈঠকে খুব গল্প করতে পারতেন। বন্ধুদের সঙ্গে বেশ পরিহাস-রসিকতা করতেন। আত্ম-প্রচারে সর্বদাই বিমুখ ছিলেন এবং নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে কিছু বলা কখন পছন্দ করতেন না।

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ ক'বছর শরীর আদৌ ভাল যাচ্ছিল না। একটা-না-একটা রোগে ভুগছিলেনই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি কিছুদিন জ্বরে ভোগেন। জ্বর ছাড়লে ডাক্তারের উপদেশে দেওঘর বেড়াতে যান। সেখানে তিন-চার মাস থাকেন।

দেওঘর থেকে এসে কিছুদিন সুস্থ থাকার পর শরৎচন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে আবার অসুখে পড়লেন। এবার তাঁর পাকাশয়ের পীড়া দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতে এই রোগ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। যা খান আদৌ হজম হয় না। তার উপর পেটেও যন্ত্রণা দেখা দেয়।

শরৎচন্দ্র এই সময় সামতাবেড়ে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। চিকিৎসা করাবার জন্য কলকাতার বাড়িতে এলেন। কলকাতায় ডাক্তাররা এক্স-রে করে দেখলেন, শরৎচন্দ্রের যকৃতে ক্যানসার ত হয়েইছে, অধিকন্তু এই ব্যাধি তাঁর পাকস্থলীও আক্রমণ করেছে।

এই সময় শরৎচন্দ্র একটি উইল করেন। উইলে তিনি তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে জীবনসত্ত্বে দান করেন। হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের পুত্র বা পুত্ররা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবেন, উইলে এ কথাও লেখা

হয়। (হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর প্রায় ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ ১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৭।)

কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রকে দেখে স্থির করলেন যে, শরৎচন্দ্রের পেটে অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ডাঃ ম্যাকে সাহেবের সুপারিশে শরৎচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য তাঁকে বাড়ি থেকে দক্ষিণ কলকাতার ৫নং সুবার্বন হস্‌পিটাল রোডে একটি ইউরোপীয় নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু এখানে শরৎচন্দ্রকে তাঁর নেশার জিনিস সিগারেট খেতে না দেওয়ায়, তিনি কষ্ট বোধ করতে লাগলেন।

এই নার্সিং হোমে সকালে ও বিকালে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় কাকেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে দিত না। তাছাড়া ইউরোপীয় নার্সরা এদেশীয় লোক বলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নাকি ভাল ব্যবহার করতেন না। এই সব কারণে শরৎচন্দ্র দুদিন পরে সেখান থেকে চলে এসে তাঁর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জীর ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরাসে অবস্থিত 'পার্ক নার্সিং হোমে' ভর্তি হলেন।

শরৎচন্দ্রের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু, শরৎ, রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলা দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে। ইতি ৩১।১২।৩৭

সেই সময়কার বিখ্যাত সার্জন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পেটে অপারেশন করেছিলেন।

অপারেশন করেও শরৎচন্দ্রকে বাঁচানো সম্ভব হ'ল না।

অপারেশন হয়েছিল ১২।১।৩৮ তারিখে। এর পর শরৎচন্দ্র মাত্র আর চারদিন বেঁচে-ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দিনটা ছিল রবিবার, ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী (বাংলা ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ)। এই দিনই বেলা দশটা দশ মিনিটের সময় শরৎচন্দ্র সকলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬১ বৎসর ৪ মাস।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতি-নিধিকে বলেন—'যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।'

এর কয়েকদিন পরে ১২ই মাঘ তারিখে কবি আবার শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে এই কবিতাটি লিখেছিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে।
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

সব শেষে শরৎচন্দ্রের রচিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের একটা কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দেওয়া গেল। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থগুলি ছাড়া শরৎচন্দ্রের কিছু অসমাপ্ত এবং টুকরো লেখাও আছে—

১৯১৩ সেপ্টেম্বর .. বড়দিদি (উপন্যাস)
১৯১৪ মে ... বিরাজ বৌ (উপন্যাস)
জুলাই .. বিন্দুর ছেলে (গল্প-সমষ্টি)

	আগষ্ট	..	পরিণীতা (গল্প)
	সেপ্টেম্বর	...	পণ্ডিতমশাই (উপন্যাস)
১৯১৫	ডিসেম্বর	...	মেজদিদি (গল্প-সমষ্টি)
১৯১৬	জানুয়ারী	...	পল্লী-সমাজ (উপন্যাস)
	মার্চ	..	চন্দ্রনাথ (উপন্যাস)
	আগষ্ট	...	বৈকুণ্ঠের উইল (গল্প)
	নভেম্বর	..	অরক্ষণীয়া (গল্প)
১৯১৭	ফেব্রুয়ারী	...	শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (উপন্যাস)
	জুন	..	দেবদাস (উপন্যাস)
	জুলাই	...	নিষ্কৃতি (গল্প)
	সেপ্টেম্বর	...	কাশীনাথ (গল্প-সমষ্টি)
	নভেম্বর	...	চরিত্রহীন (উপন্যাস)
১৯১৮	ফেব্রুয়ারী	...	স্বামী (গল্প-সমষ্টি)
	সেপ্টেম্বর	...	দত্তা (উপন্যাস)
	সেপ্টেম্বর	..	শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস)
১৯২০	জানুয়ারী	...	ছবি (গল্প সমষ্টি)
	মার্চ	.	গৃহদাহ (উপন্যাস)
	অক্টোবর	..	বামুনের মেয়ে (উপন্যাস)
১৯২৩	এপ্রিল	...	নারীর মূল্য (প্রবন্ধ)
	আগস্ট	...	দেনা-পাওনা (উপন্যাস)
১৯২৪	অক্টোবর	...	নব-বিধান (উপন্যাস)
১৯২৬	মার্চ	...	হরিলক্ষ্মী (গল্প-সমষ্টি)
	আগস্ট	...	পথের দাবী (উপন্যাস)
১৯২৭	এপ্রিল	..	শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (উপন্যাস)
	আগস্ট	.	ষোড়শী ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ)
১৯২৮	আগস্ট	...	রমা ('পল্লী-সমাজে'র নাট্যরূপ)
১৯২৯	এপ্রিল	.	তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)
১৯৩১	মে	.	শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)
১৯৩২	আগস্ট	...	স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)
১৯৩৩	মার্চ	...	শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস)
১৯৩৪	মার্চ	...	অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প-সমষ্টি)
	ডিসেম্বর	...	বিজয়া ('দত্তা'র নাট্যরূপ)
১৯৩৫	ফেব্রুয়ারী	...	বিপ্রদাস (উপন্যাস)
			[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]
১৯৩৮	এপ্রিল	...	ছেলেবেলার গল্প (তরুণপাঠ্য গল্প-সমষ্টি)
	জুন	...	শুভদা (উপন্যাস)

গোপালচন্দ্র রায়